বোখারী শরীফ

(বাংলা তরজমা ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা)

সপ্তম খণ্ড

মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রঃ)

প্রাক্তন প্রিন্সিপাল জামেয়া কোরআনিয়ার

ফয়েজ ও বরকতে

মাওলানা আজিজুল হক সাহেব

মোহাদ্দেছ জামেয়া কোরআনিয়া লালবাগ, ঢাকা

কর্ত্তৃক অনুদিত।

হামিদিয়া লাইব্রেরী

চকবাজার - ঢাকা - ১১

আল্লাহ তায়ালা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মাধ্যমে দ্বীন-ইসলাম দুনিয়াতে পাঠাইয়াছেন। এই দ্বীন-ইসলাম সর্ব্বশেষ দ্বীন; কেয়ামত পর্য্যন্ত এই দ্বীনের কোন পরিবর্ত্তন হইবে না। আল্লাহ তায়ালার অনুমোদিত ও পছন্দিত দ্বীনরূপে এই দ্বীনই প্রবর্ত্তিত থাকিবে—ইহা পবিত্র কোরআনেরই ঘোষণা (৬ পাঃ ৫ রুঃ দ্রষ্টব্য)।

দ্বীন-ইসলাম দুইটি বস্তুর উপর নির্ভরশীল, আল্লার কেতাব—পবিত্র কোরআন, আর রসুলের ছুন্নত—হাদীছ। সুতরাং দ্বীন-ইসলামের স্থায়িত্ব ও অপরিবর্ত্তিত থাকা নির্ভর করে কোরআন ও হাদীছের স্থায়িত্ব ও অপরিবর্ত্তিত থাকার উপর। পবিত্র কোরআন আল্লাহ তায়ালার কালাম, উহার স্থায়িত্বের ব্যবস্থা আল্লাহ তায়ালাই করিয়া দিয়াছেন; সারা পৃথিবীজোড়া অসংখ্য অগণিত গ্রন্থাকারে দৃঢ়রূপে সুরক্ষিত করার সাথে সাথে যুগে যুগে কোটি কোটি মানুষের কণ্ঠেও উহাকে স্থাপিত করিয়া দিয়াছেন, ফলে উহার কোন একটি অক্ষরকেও বিচ্ছিন্ন বা বিলুপ্ত করা সম্ভবই নহে। আর কোরআন আল্লার কালাম; আল্লার অস্তিত্বে এবং গুণাবলীতে কোন পরিবর্ত্তনের অবকাশ নাই; আল্লার কালাম আল্লার গুণা-বলীরই একটি, উহাতেও পরিবর্ত্তনের কোন অবকাশ নাই। এই অকাট্য সত্য ছাড়াও পবিত্র কোরআনের দীর্ঘ চৌদ্দ শত বৎসরের জাগতিক জীবনও চাক্ষুষরূপে প্রমাণিত করে যে, পবিত্র কোরআনে কোন পরিবর্ত্তন আদৌ সম্ভব নহে।

দ্বীন-ইসলামের স্থায়িত্বের অপর স্তম্ভ রসুলের হাদীছ সুসংরক্ষণের ব্যবস্থাও আল্লাহ তায়ালা করিয়া দিয়াছেন। রসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সময় হইতেই ব্যাপক হারে মোসলমানগণ তাঁহার হাদীছ কণ্ঠস্থ করিতে থাকেন; লিপিবদ্ধাকারেও রক্ষিত হইতে থাকে। তাঁহার পরে সময়ের গতি অপেক্ষা দ্রুতবেগে হাদীছ কণ্ঠস্থ ও লিপিবদ্ধ করার ব্যাপক প্রচেষ্টা সম্প্রসারিত হইতে থাকে। এমনকি রসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের তিরোধানের পর শতাব্দি শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় ব্যাপকভাবে লিপিবদ্ধাকারে হাদীছ সংরক্ষণের প্রচেষ্টা দ্রুত অগ্রসর হয়। যাহার বিস্তারিত বিবরণ প্রথম খণ্ডের মুখবন্ধে হাদীছ সংরক্ষণ আলোচনায় বর্ণিত হইয়াছে। এই অভিযানে হাদীছ সমূহ মোহাদ্দেছগণের কণ্ঠস্থেই নয় শুধু, বরং লিখিত সংরক্ষণেরও আয়ত্তে আসিয়া যায়।

অতঃপর ইসলাম সম্প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উহার শত্রুদের ময়দানও বিশালরূপে সম্প্রসারিত হয়। প্রকাশ্য ও মোনাফেক শত্রুরা শক্তি ও অস্ত্রবলে ইসলামের গতি রোধ করায় ব্যর্থ হইয়া ইসলামকে বিকৃত করায় সচেষ্ট হয়। সেই পরিকল্পনায় জাল হাদীছ গড়াইবার পন্থাও তাহারা অবলম্বন করে। এমনকি একশত বৎসরের ব্যবধানে জাল বা কৃত্রিম হাদীছ এড়াইবার ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দেয়। সেমতে সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের সর্বসম্মত কষ্টি-পাথর—সাক্ষী-পরম্পরা তথা ছনদ দ্বারা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় গ্রহণীয় সাব্যস্ত হয় শুধু এইরূপ হাদীছ সঙ্কলনে মোহাদ্দেছগণ বিশেষ তৎপর হন। এই অভিযানে সর্বোচ্চ শৃঙ্গ-শির বিজয়ের মর্য্যাদা লাভ করেন ইমাম বোখারী রহমতুল্লাহে আলাইহে।

যেই সাধনা ইমাম বোখারী (রঃ) এই গ্রন্থ সঙ্কলনে করিয়াছেন উহা ছিল অতি কঠিন ও দীর্ঘ। কারণ, হাদীছ গৃহিত হওয়া নির্ভর করে সাক্ষীর উপর। সাক্ষী নির্ভরশীল হওয়ার জন্য বিচার বিভাগীয় আইনে যে সব শর্ত্ত রহিয়াছে, হাদীছের সাক্ষীর নির্ভরতার জন্য উহা ছাড়া হাদীছ শাস্ত্রে আরও অনেক শর্ত্ত রহিয়াছে। উভয় শ্রেণী শর্ত্তের উচ্চমান সম্বলিত সাক্ষীর মাধ্যমে প্রাপ্ত হাদীছকে "ছহীহ্ হাদীছ" বলা হয়। ইমাম বোখারী (রঃ) স্বীয় গ্রন্থকে সর্ব্বোচ্চমানে পৌঁছাইবার উদ্দেশ্যে হাদীছের সাক্ষী তথা রাবীদের মধ্যে আইনগত ও শাস্ত্রগত শর্ত্তাবলীর সহিত অধিক নির্ভরযোগ্যতার জন্য আরও কিছু বিশেষ সূক্ষ্ম শর্ত্ত সংযোগ করেন। যাহার কারণে ইমাম বোখারী রহমতুল্লাহে আলাইহের এই গ্রন্থ হাদীছ-গ্রন্থাবলীর সর্ব্বোচ্চের আসন অধিকার করিতে সর্ব্বসম্মত রায় লাভে সমর্থ হয়।

ইমাম বোখারী (রঃ) স্বীয় সঙ্কল্পের বাস্তবায়নে এই ত্রিবিধ শর্ত্তাবলী সম্বলিত সাক্ষীযুক্ত হাদীছ চয়নে আত্মনিয়োগ করেন। এই প্রচেষ্টা যে কত কঠিন এবং কত সাধনা ও দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ তাহা একটু লক্ষ্য করিলেই অনুভব করা যায়।

ইমাম বোখারী রহমতুল্লাহে আলাইহের কণ্ঠস্থ ৬,০০০০০ সাক্ষী-পরম্পরা তথা ছনদ মাধ্যমে বহু সংখ্যক মূল হাদীছ ছিল। প্রতিটি ছনদে ছাহাবী পর্য্যন্ত সাধারণতঃ ৩, ৪, ৫ জন মাধ্যম ছিল; দুই জনের মাধ্যম অতি বিরল। এক একটি ছনদ পরীক্ষার জন্য উহার মাধ্যম সমূহের প্রতিটি লোকের জীবন-ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই করা আবশ্যক। এইরূপে ৬,০০০০০ ছনদকে ত্রিবিধ শর্ত্তাবলীর কষ্টিতে যাচাই করিয়া প্রায় ১৬০০ শত মাধ্যম বা রাবীর ছনদ নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। ইহা ছিল ইমাম বোখারীর উদ্দেশ্যের বাহ্যিক দৃষ্টির দুর্গম পথ।

তিনি শুধু ইহা বিজয়ের উপরই ক্ষান্ত হন নাই, আধ্যাত্মিক দৃষ্টির পরীক্ষা-নিরীক্ষাও অনেক করিয়াছেন। বাহ্যিকরূপে পরীক্ষিত এক একটি ছনদকে গ্রহণ করার জন্য উহা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার দরবারে এস্তেখারাহ্ করিয়াছেন। "এস্তেখারাহ্" অর্থ উত্তমটি নির্দ্ধারণে আল্লাহ তায়ালার সরাসরি সাহায্য প্রার্থনা। এই এস্তেখারায় গৃহিত হওয়ার যোগ্য প্রতিপন্ন হইলে পর ইমাম বোখারী (রঃ) গোছল করতঃ দুই রাকাত নামায পড়িয়া উক্ত ছনদের মাধ্যমে প্রাপ্ত মূল হাদীছকে স্বীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এইরূপ পরীক্ষা ও ব্যবস্থাপনায় বাছাইকৃত ৪০০০ ছনদের মাধ্যমে ২৬০২ বা ২৫১৩ খানা মূল হাদীছ অত্র গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। ছয় লক্ষ ছনদের প্রতিটি মাধ্যম তথা রাবীকে ত্রিবিধ শর্ত্তে যাচাইয়ের দুর্গম ও সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে এবং আধ্যাত্মিক ব্যবস্থাবলী সম্পন্ন পূর্ব্বক এই মহাগ্রন্থকে পূর্ণাঙ্গ রূপদানে ইমাম বোখারী রহমতুল্লাহে আলাইহের অমূল্য জীবনের ১৬টি বৎসর তথা প্রায় ৬০০০ (ছয় হাজার) দিন ব্যয় হইয়াছিল। এত বড় জটিল ও কঠিন এবং সুদীর্ঘ কাজকে ১৬ বৎসরে সমাপ্ত করিতেও মহাত্মা ইমাম বোখারী (রঃ)কে কিরূপ অসাধ্য সাধনা করিতে হইয়াছিল তাহা আল্লাহ তায়ালাই জানেন। তাঁহার সেই সুদীর্ঘ ও অসাধারণ সাধনার ফলই হইল মহাগ্রন্থ—"ছহীহ্ বোখারী শরীফ"।

বিগত ১৩৭৪ হিজরী মোতাবেক ১৯৫৪ ইংরাজী সনের পবিত্র রমজান মাসের শেষ দশকে ছের-তাজ রুহানী পিতা মাওলানা শামছুল হক রহমতুল্লাহে আলাইহের অনুমতি প্রাপ্তে তাঁহারই সক্রীয় সাহায্যকে সম্বল করিয়া শায়খুল-ইসলাম হযরত মাওলানা শব্বীর আহমদ (রঃ) এবং হযরত মাওলানা জফর আহমদ ওসমানী (রঃ)—এই দুই মহামনীষীর ফয়েজ ও বরকতের ছায়া-তলে এই নরাধম মহাগ্রন্থ ছহীহ বোখারী শরীফ অনুবাদের কঠিন ও সুদীর্ঘ কার্য্যে আত্মনিয়োগের সূচনা করে। রহমানুর রহীম আল্লাহ তায়ালার অপার কৃপায় ১৩৯১ হিজরী মোতাবেক ১৯৭১ ইংরাজী সনের প্রথম ভাগে সেই অনুবাদ সর্বমোট সাত খণ্ডে সমাপ্ত হয়। সৌভাগ্যক্রমে এস্থলেও পূর্ণ বৎসরের সংখ্যা ষোলই দাঁড়ায়। আল্লাহ তায়ালা তাঁহার কৃপাবলেই যেন ষোল সংখ্যার সামঞ্জস্যের দ্বারা এই অধমকে তাঁহার এক অতি মহাসাধক বান্দার সহিত জড়াইয়া দিয়াছেন। কেয়ামতের দিনও যদি সেই মহাসাধক ইমাম বোখারী রহমতুল্লাহে আলাইহের অসাধারণ মান-মর্য্যাদা ও মর্ত্তবার অণু-কণার সহিত এই অধমকে আল্লাহ তায়ালা তাঁহার করুণাবলে জড়াইয়া দেন তবে অধমের সৌভাগ্যের সীমা থাকিবে কি?

وما ذلك على الله بعزيز

"আল্লাহ তায়ালার পক্ষে ইহা মোটেই অসাধ্য ও কঠিন নহে।"

বিজ্ঞপ্তি

বাংলা বোখারী শরীফের ইহা সর্ব্বশেষ খণ্ড। এই খণ্ডের সমাপ্তিতে একটি সুদীর্ঘ পরিশিষ্ট রহিয়াছে। উক্ত পরিশিষ্টটি মূল বোখারী শরীফের অনুবাদ নহে। অবশ্য একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বোখারী শরীফে বর্ণিত হাদীছের বিবরণকে ঐতিহাসিক ও প্রামাণিক রূপদানে পরিশিষ্টটি অনুবাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে।

মুল বোখারী শরীফেরই বক্তব্য ও হাদীছের সহিত বিষয়বস্তুটির সম্পর্ক থাকায় সমাজের উপকারার্থে মুল গ্রন্থ হইতে ভিন্ন পরিশিষ্ট আকারে বোখারী শরীফের সঙ্গে উহাকে সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইল।

আজিজুল হক
জামেয়া কোরআনিয়া লালবাগ, ঢাকা

সূচী পত্র

রাষ্ট্র বিজ্ঞান অধ্যায়

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ بِاِذْنِهٖ تَقُوْمُ السَّمٰوَاتُ وَبِاسْمِهٖ تُبْدَأُ

الصَّالِحَاتُ وَبِحَمْدِهٖ تَتِمُّ الْحَسَنَاتُ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى

نَبِيِّنَا اَشْرَفِ الْمَخْلُوْقَاتِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ الَّذِيْنَ

بَلَّغُوْا عَنْهُ كُلَّ اٰيَاتٍ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ فِىْ

تَبْلِيْغِ الدِّيْنِ اِلَى الْاٰفَاقِ وَالْجِهَاتِ۔

اَللّٰهُمَّ اَلْحِقْنَا بِهِمْ فِى الدَّارَيْنِ وَاجْعَلْنَا مِنْ خَلْفِهِمْ وَالذُّرِّيَّاتِ

اَللّٰهُمَّ اٰمِيْن

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যাঁহার আদেশে সপ্ত আকাশ সৃষ্ট ও স্থিত। যাঁহার নামে সকল শুভ কার্য্যের শুভ আরম্ভ হয়—যাঁহার প্রশংসা দ্বারা সকল শুভ কার্য্যের পূর্ণতা লাভ হয়।

দরূদ ও সালাম আমাদের নবীজীর প্রতি যিনি সকল সৃষ্টের সেরা এবং তাঁহার পরিবারবর্গ ও ছাহাবীদের প্রতি যাঁহারা তাঁহার প্রতিটি হাদীছকে পৌঁছাইয়াছেন এবং তাঁহাদের প্রতি যাঁহারা দ্বীন-ইসলামকে সকল প্রান্তে ও সকল দিকে পৌঁছাইতে ছাহাবীগণের পূর্ণ অনুসরণ করিয়াছেন।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে তাঁহাদের দলভুক্ত করুন এবং তাঁহাদের অনুসারী বানাইয়া রাখুন এবং তাঁহাদের পরবর্ত্তী বংশধরে পরিণত করুন। আমীন। আমীন!!

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লার নামে

২৩শ অধ্যায়

হৃদয় গলানো উপদেশমালা

---(●)---

স্বাস্থ ও সুযোগের অপচয় করিবে না

২৪১৮। হাদীছঃ— عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ

مِّنَ النَّاسِ اَلصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ

অর্থ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, দুইটি বিশেষ নেয়ামত বা আল্লার দানকে অধিকাংশ লোকেই হেলায় হারাইয়া থাকে। উহাকে কাজে লাগায় না, ফলে উহার অপচয় হয়- (১) স্বাস্থ ও সুস্থতা এবং (২) অবসর ও অবকাশ।

আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার মুল্য

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলিয়াছেন—

اِعْلَمُوْآ اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ......وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

"হে মানবমণ্ডলী! তোমরা জানিয়া বুঝিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়া রাখ, দুনিয়ার জেন্দেগী (যদি আখেরাতের আমল বিহীন হয় তবে উহা) শুধু এই কতিপয় জিনিষের সমবায় মাত্র—(শৈশবে) খেলা-ধুলা, রং-তামাশা, (যৌবনে) ফ্যাসন ও

সাজ-সজ্জার পারি-পাট্য, পরস্পর গর্ব্ব-গরিমা। আর (বার্দ্ধক্যে) ধন-জনের আধিক্য। (অথচ এই সবই অতীব ক্ষণস্থায়ী—এই সবের বাহার মাত্র কিছু দিন থাকে। অতঃপর উহার অবসান হইয়া যায়।) যেরূপ—মেঘমালার বর্ষণে কৃষকের আনন্দদায়ক শস্য-ফসলের শ্যামলতা; (ক্ষেত-খামারের সমুদ্রে যেন সবুজ তরঙ্গ বহিতে থাকে, কিন্তু সেই শ্যামলতা মাত্র কতক দিনের।) তার পরেই উহা শুষ্ক হইয়া যায় এবং সকলেই উহাকে জরদ বর্ণের দেখিতে পায়, অবশেষে উহা খর-কুটায় পরিণত হয়। (দুনিয়ার জেন্দেগী যে সব জিনিষের সমবায় ও সমষ্টি ঐ সব এই শ্রেণীরই ক্ষণস্থায়ী।) পক্ষান্তরে (আখেরাতের সব অবস্থাই চিরস্থায়ী।) আখেরাতে রহিয়াছে ভীষণ আজাব বা আল্লার তরফ হইতে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। (এই উভয়টিই হইবে চিরস্থায়ী অনন্ত অসীম।) প্রকৃত প্রস্তাবে দুনিয়ার জেন্দেগী হইল শুধু ধোঁকার বস্তু। অতএব তোমরা দ্রুত গতিতে অগ্রসর হও প্রভু-পরওয়ারদেগারের মাগফেরাত লাভের প্রতি এবং (তাঁহার সন্তুটি লাভের স্থান) জান্নাতের প্রতি—যাহার পরিমাপ আসমান-জমিন তুল্য। আর উহা তৈরী হইয়া আছে ঐ লোকদের জন্য যাহারা আল্লাহ এবং আল্লার রসুলদের প্রতি ঈমান আনিয়াছে—তাহাদের জন্য উহা আল্লার বিশেষ দান হইবে। যাহাকে উহা দান করা আল্লাহ ইচ্ছা করিবেন দিয়া থাকিবেন। আল্লার দান ও করুণা অতিশয় বড়। (২৭ পারা ছুরা হাদীদ)

২৪১৯। হাদীছ :— عن سهل بن سعد رضى الله تعالى عنه

سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَوْضِعُ سَوْطٍ فِى الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَلَغَدْوَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْرَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا

অর্থ—সাহল (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি শুনিয়াছি, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—বেহেশতের (এক নলও নয়) শুধু এক চাবুক পরিমাণ জায়গা সমস্ত দুনিয়া ও উহার সমুদয় ধন-সামগ্রী হইতে মুল্যবান। এবং আল্লার রাস্তায় তথা আল্লার দ্বীনের কাজে শুধু সকাল বেলা বাহির হওয়ার কিম্বা বিকাল বেলা বাহির হওয়ার মুল্য সমস্ত দুনিয়া ও উহার ধন-সামগ্রীর মুল্য হইতে অধিক। (অর্থাৎ উহার ছওয়াব সমগ্র জগতের সমুদয় ধন-সামগ্রী দান-খয়রাত করা অপেক্ষা অধিক।)

দুনিয়ার সহিত কিরূপ সম্পর্ক রাখিবে ?

২৪২০। হাদীছঃ— عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه

أَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْكِبَىَّ فَقَالَ كُنْ فِى الدُّنْيَا

كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ اَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُوْلُ — اِذَا اَمْسَيْتَ

فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ وَاِذَا اَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ

لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيٰوتِكَ لِمَوْتِكَ

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (আমাকে তাঁহার কথার প্রতি পূর্ণ মনোযোগী করণার্থে) আমার উভয় কাঁধ ধরিয়া বলিলেন, দুনিয়ার মধ্যে এরূপ থাক যেন তুমি একজন বিদেশী মুছাফির, বরং তুমি যেন একজন পথিক।↑

এই উপদেশের পরিপ্রেক্ষিতে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়া থাকিতেন, আজিকার দিনের বিকাল বেলায় নিশ্চয়তার সহিত এই আশা পোষণ করিও না যে, তুমি আগামী কাল ভোরে জীবিত থাকিবে এবং ভোর বেলায় নিশ্চয়তার সহিত এই আশা পোষণ করিও না যে, বিকাল বেলা তুমি জীবিত থাকিবে। (তোমাকে যে কবরে যাইতে হইবে তাহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া চল*)।

আর সুস্থ সবল থাকাকালে এবাদৎ-বন্দেগী বেশী পরিমাণে কর এই ভাবিয়া যে, অসুস্থতায় তাহা করিতে পারিবে না এবং জেন্দেগী থাকিতে ঐ আমল কর যাহা মৃত্যুর পরে কাজে আসে।

↑ অর্থাৎ বিদেশী মুছাফির কোন শহরে উপস্থিত হইলে তথায় যদিও স্থায়ী বাড়ী ঘর তৈরী না করে, কিন্তু অন্ততঃ অস্থায়ীভাবে হইলেও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে কোন পথিক পথ ভ্রমনে সেইরূপ ব্যবস্থাও করে না।

অপর এক হাদীছে পথিক হওয়ার দৃষ্টান্তটি অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, দুনিয়ার সঙ্গে আমার সম্পর্ক এরূপ যে, পথিক পথ ভ্রমন কালে কোন বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া যায় এবং অনতিবিলম্বে উহা ত্যাগ করিয়া পুনঃ ভ্রমন আরম্ভ করে।

* বন্ধনীর মধ্যবর্ত্তী বাক্য কোন কোন রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে। (ফৎহুল বারী)

দীর্ঘ আশা পোষণ সম্পর্কে

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলিয়াছেন—

فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا
إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ

"দোযখ হইতে পরিত্রাণ এবং বেহেশতে প্রবেশের সুযোগ যাহাকে প্রদান করা হইয়াছে সে-ই সফলতা লাভ করিয়াছে ; দুনিয়ার জেন্দেগী ত শুধু মাত্র ধোকার বস্তু।"

আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন —

ذَرْهُمْ يَأْكُلُوْا وَيَتَمَتَّعُوْا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ -

"কাফেরগণ যখন সত্যের প্রতি আসেই না তখন তাহাদের জন্য অনুতাপ অনুশোচণা ত্যাগ করুন। তাহাদিগকে খাওয়া-পরা, আরাম-আয়েশের দীর্ঘ আশা লইয়া অচেতন ভাবে সময় কাটাইতে দিন, অচিরেই তাহারা (তাহাদের কর্ম্মের পরিণাম) উপলব্ধি করিতে পারিবে।"

আলী (রাঃ) বলিয়াছেন ঃ—

اِرْتَحَلَتِ الدُّنْيَا مُدْبِرَةً وَارْتَحَلَتِ الْاٰخِرَةُ مُقْبِلَةً وَلِكُلٍّ وَاحِدَةٍ
مِنْهُمَا بَنُوْنَ فَكُوْنُوْا مِنْ أَبْنَاءِ الْاٰخِرَةِ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا
فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ

"দুনিয়া অগ্রসর হইতেছে গমনে এবং আখেরাত অগ্রসর হইতেছে আগমনে। উভয়েরই এক একটি দল রহিয়াছে। তোমরা আখেরাতের দলভুক্ত হইয়া থাক, দুনিয়ার দলভুক্ত হইও না। স্মরণ রাখিও—এই জেন্দেগী কর্ম্মের জেন্দেগী, হিসাব-নিকাশের জেন্দেগী নহে। এবং আখেরাত হিসাব-নিকাশের জেন্দেগী, কর্ম্মের জেন্দেগী নহে।"

২৪২১। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (আমাদিগকে একটি বিষয় বুঝাইবার জন্য) চতুষ্কোণ-বিশিষ্ট একটি রেখা আঁকিলেন এবং উহার মধ্য ভাগে আর

একটি সরল রেখা আঁকিলেন যাহার দীর্ঘতা ঐ চতুষ্কোণ বিশিষ্ট রেখার বেষ্টনী অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। আর এই সরল রেখার যে অংশ বেষ্টনীর ভিতর রহিয়াছে (উভয় দিক হইতে) উহার প্রতি ধাবমান ছোট ছোট কতকগুলি রেখাও আঁকিলেন।

অতঃপর (দৃষ্টান্ত স্বরূপ বুঝিয়া নেওয়ার জন্য) বেষ্টনীর ভিতর আবদ্ধ রেখার প্রতি ইশারা করিয়া বলিলেন, ইহা হইল মানুষ, আর এই পরিবেষ্টনকারী রেখা হইল মানুষের বয়স-কাল যাহা তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। আর বেষ্টনীর বাহিরে যে রেখা রহিয়াছে উহা হইল মানুষের দীর্ঘ আশা। আর মধ্যবর্ত্তী রেখাটির প্রতি ধাবমান ছোট ছোট রেখাগুলি হইল মানুষের জীবন সংহারক আপদ-বিপদ, রোগ-শোক। এইগুলি পর পর এক একটি মানুষকে আঘাত হানিতে থাকে। (শেষ পর্য্যন্ত যে কোন একটির কবলে তাহার ইহ-জীবনের অবসান ঘটে। এমনকি ঐ সবের সবগুলা এড়াইতে পাড়িলেও বার্দ্ধক্যের দরুণ জীবনীশক্তি নিঃশেষ হওয়াকে মানুষ কোন রকমেই এড়াইতে পরে না।)

২৪২২। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম দৃষ্টান্ত স্বরূপ মানুষকে একটি বিন্দুরূপে কেন্দ্র করিয়া উহার নিকটে ও দুরে কতিপয় রেখা অঙ্কন করতঃ নিকটবর্ত্তী একটি রেখার প্রতি ইশারা করিয়া বলিলেন, ইহা যেন মানুষের জীবনকালের শেষ সীমা। আর দুরের একটি রেখার প্রতি ইশারা করিয়া বলিলেন, এই পর্য্যন্ত হইল মানুষের আশা। সুতরাং মানুষ তাহার আশা পোষণ করিতেই থাকে, কিন্তু সেই আশা পর্য্যন্ত পৌছিবার পূর্ব্বেই তাহার নিকটবর্ত্তী রেখা তথা জীবনকালের শেষ সীমা উপস্থিত হইয়া পড়ে (এবং তাহার মৃত্যু আসিয়া দাঁড়ায়।)

যাট বৎসর বয়সের সুযোগ প্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে সব ওজরই শেষ হইয়া যায়

২৪২৩। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْذَرَ اللّٰهُ إِلَى امْرِئٍ أَخَّرَ أَجَلَهُ إِلَى سِتِّيْنَ سَنَةً

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ঐ ব্যক্তির জন্য কোন ওজরেরই অবকাশ আল্লাহ তায়ালা রাখেন নাই, যাহার বয়স যাট বৎসর পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিয়াছেন।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলিয়াছেন—

أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ

দোযখীরা দোযখের মধ্যে চিৎকার করতঃ বলিতে থাকিবে, হে আমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার! আমাদিগকে দোযখ হইতে বাহির করিয়া পুনঃ আমল করার সুযোগ দান করুণ; আমরা পূর্ব্বেকার খারাব আমল ত্যাগ করিয়া নেক আমল করিব।

তখন আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া বলিবেন, "আমি তোমাদিগকে এই পরিমাণ বয়স দিয়াছিলাম নয় কি যে বয়সের সুযোগে উপদেশ গ্রহণকারী উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে? এতদ্ভিন্ন তোমাদের নিকট বিভিন্ন সতর্ককারীও আসিয়াছিল, কিন্তু তোমরা কাহারও সতর্ক করণে কর্ণপাত কর নাই। (সুদীর্ঘ সুযোগকে হেলায় নষ্ট করায় এবং শত শত সতর্ককারীর সতর্ককরণকে উপেক্ষা করায় প্রমাণিত হইয়াছে যে তোমরা সুযোগের সদ্ব্যবহার কর না।) সুতরাং আজাব ভোগ করিতে থাক। সেমতে এই দুরাচাররা কোন সাহায্যকারী পাইবে না।" (২২ পারা ১৬ রুকু।)

জাহান্নামী কাফেরগণ চিরস্থায়ী আজাব ভোগের অপরাধী সাব্যস্ত হওয়ার এক কারণ ইহাই যে, এই দুরাচাররা প্রকৃত প্রস্তাবেই এরূপ যে তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ হাজার সুযোগ দেওয়া হইলেও তাহারা সুযোগের সদ্ব্যবহার করিবে না। সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহ তায়ালা তাহাদের সম্পর্কে এই কথা ভালরূপেই জানেন। পবিত্র কোরআনেও উহার উল্লেখ রহিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ - بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ - وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

"আশ্চর্য্যজনক অবস্থা হইবে তখন, যখন নাফরমানদিগকে দোযখের সম্মুখে দাঁড় করান হইবে এবং তাহারা বলিবে, আমাদের অতীব আকাঙ্খা যে, আমাদিগকে দুনিয়ায় পুনঃ পাঠান হউক—এইবার আমরা আল্লার নিদর্শন ও আদেশাবলী অস্বীকার করিব না এবং আমরা মোমেন হইয়া যাইব। (তাহাদের এই উক্তি বাস্তবায়ীত হওয়ার নহে,) বরং তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া গিয়াছে ঐ বস্তু

যাহাকে তাহারা পূর্ব্বে স্বীকার করিত না—উপেক্ষা করিত (তথা আখেরাত।) প্রকৃত প্রস্তাবে যদি তাহাদিগকে পুনঃ সুযোগ দানার্থে দুনিয়ায় পাঠাইয়া দেওয়া হয় নিশ্চয় তাহারা ঐ নিষিদ্ধ ও বিদ্রোহীতার কার্য্যেরই পুনারাবৃত্তি করিবে। (সুতরাং বর্ত্তমান উক্তিতে) নিশ্চয় তাহারা মিথ্যাবাদী। (৭ পারা ৯ রুকূ)

সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহ তায়ালার এই বিবৃতি অনুসারে বলা যাইতে পারে, কাফের মোশরেক—দ্বীন অস্বীকারকারী ও উপেক্ষাকারীদের অপরাধ সাধারণ দৃষ্টিতে শুধু তাহাদের বয়স সীমায় সীমাবদ্ধ দেখিলেও বস্তুতঃ উহা সীমাবদ্ধ নহে। তাহারা অসীম সময়ের সুযোগ পাইলে অসীম কালই এই অস্বীকার, উপেক্ষা ও বিদ্রোহীতার মধ্যেই জীবন কাটাইবে। সুতরাং চিরস্থায়ী আজাব তাহাদের পক্ষে সমীচীনই হইবে।

প্রথমোক্ত আয়াতে এই বিষয়ের প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, ৬০।৭০ বৎসরের সুযোগকে হেলায় নষ্ট করিয়াছ। কাল চুল সাদা হওয়া, শক্ত দাঁত খসিয়া পড়া, যৌবনের বাহার চলিয়া গিয়া বার্দ্ধক্য নামিয়া আসা এবং চোখের সামনে দিবা-রাত্র, সমসাময়িক লোকদের মৃত্যু ; এতদ্ভিন্ন রসুল, কোরআন ও উপদেশ দান-কারীদের সতর্ককরণ—এই প্রকারের শত শত সতর্ককারীদের সতর্ককরণকে উপেক্ষা করিয়া তোমরা প্রমাণ করিয়া দিয়াছ যে, অস্বীকার, উপেক্ষা ও বিদ্রোহ তোমাদের মজ্জাগত ; তোমাদেরে পুনঃ দুনিয়ায় পাঠাইলেও তোমরা উহাই করিবে। সুতরাং তোমরা চিরঅপরাধি, অতএব তোমরা চিরস্থায়ী আজাব ভোগ করিতে থাক।

২৪২৪। হাদীছ ঃ— ان ابا هريرة رضى الله تعالى عنه قال

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَا يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِيْرِ شَابًّا فِىْ اثْنَيْنِ فِىْ حُبِّ الدُّنْيَا وَطُوْلِ الْاَمَلِ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি হযরত রসুলুল্লাল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, বৃদ্ধের অন্তর দুইটি জিনিষে যুবক থাকে। একটি হইল দুনিয়ার মহব্বৎ, দ্বিতীয়টি হইল দীর্ঘ আশা।

২৪২৫। হাদীছ ঃ— قال انس رضى الله تعالى عنه قال

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْبَرُ ابْنُ اٰدَمَ وَيَكْبَرُ مَعَهُ اثْنَانِ حُبُّ الْمَالِ وَطُوْلُ الْعُمْرِ

অর্থ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মানুষের বয়স বৃদ্ধি পাইতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার মধ্যে অপর দুইটি জিনিষের তীব্রতাও বৃদ্ধি পাইতে থাকে— (১) ধন-দৌলতের মহব্বৎ ও স্পৃহা (২) দীর্ঘায়ুর আকাঙ্খা।

শোকস্থলে ছওয়াবের উদ্দেশ্যে ছবর করার ফল

২৪২৬। হাদীছ:— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

انَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ مَا لِعَبْدِىْ الْمُؤْمِنِ

عِنْدِىْ جَزَاءٌ اِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنَ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ اِلَّا الْجَنَّةَ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা দিয়া থাকেন, আমি আমার বন্দার কোন মহব্বতের বস্তু উঠাইয়া নিলে পর সেই বন্দা যদি তখন ছওয়াবের আশায় ধৈর্য্য ধারণ করে তবে সে আমার নিকট উহার ফলে বেহেশ্‌ত লাভ করিবেই।

জাগতিক জাঁকজমক এবং উহাতে প্রতিযোগিতা করা হইতে সাবধান থাকা

২৪২৭। হাদীছ:— আবু সায়ীদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তোমাদের পক্ষে সর্ব্বাধিক ভয়ের বস্তু আমি ইহাকে মনে করি যে, আল্লাহ তায়ালা বাহির করিয়া দিবেন তোমাদের জন্য জমিনের সমুদয় সম্পদ। জিজ্ঞাসা করা হইল, জমিনের সম্পদ (বাহির হইলে ভয়ের কারণ) কি? হযরত (দঃ) বলিলেন, দুনিয়ার জাঁকজমক (হইল ভয়ের কারণ, যাহার আধিক্য সম্পদের আধিক্যেই হইবে।)……

এস্থানে আরও একটি হাদীছ উল্লেখ হইয়াছে যাহার অনুবাদ তৃতীয় খণ্ডে ১৪০৮ নম্বরে হইয়াছে। উক্ত হাদীছে নবী (দঃ) বলিয়াছেন, তোমাদের ব্যাপারে দারিদ্রের ভয় আমি করি না; আমি ভয় করি যে, দুনিয়ার আধিক্য ও প্রশস্ততা তোমাদের লাভ হইবে, তোমরা প্রতিযোগিতামূলকভাবে উহার প্রতি অগ্রগামী হইবে এবং উহা তোমাদিগকে ধ্বংস করিবে।

দুনিয়ার চাকচিক্যে ধোকা খাইবে না

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا - وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ

بِاللَّهِ الْغَرُورُ - إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا - إِنَّمَا يَدْعُو

حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحٰبِ السَّعِيرِ -

"হে লোক সকল! (কবর, হাশর ইত্যাদি) যে সব অনুষ্ঠানের সংবাদ আল্লাহ (তাঁহার কালাম বা রসুল মারফত) দান করিয়াছেন তাহা নিশ্চয় বাস্তব। অতএব এই নিকৃষ্ট ক্ষণস্থায়ী জীবন যেন তোমাদেরে ধেঁাকায় ফেলিতে না পারে। এবং ধোকাবাজ শয়তান যেন আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদেরে ধেঁাকায় ফেলিতে না পারে (যে, গর্হিত বস্তুকে আল্লার নৈকট্যের সূত্র ধারণা করায় বা আল্লার ক্ষমার আশা দিয়া নাফরমানী কাজে তোমাকে নির্ভীক বানাইয়া দেয় কিম্বা নিরাশ বানাইয়া তোমাকে আল্লাহ হইতে দুরে নিয়া যায় ইত্যাদি।)

নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু; তাহাকে শত্রুই গণ্য কর। শয়তান তাহার দলকে এমন কাজের দিকে আহ্বান করে যাহার পরিণামে তাহারা দোযখী হয়। (২২ পারা ১৩ রুকু)

নেক লোকদের সংখ্যা হ্রাস পাইতে থাকিবে

২৪২৮। হাদীছ:— عن مرداس رضى الله تعالى عنه

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ

وَتَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ لَا يُبَالِيهِمُ اللّٰهُ بَالَةً

অর্থ—মেরদাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, নেক লোকগণ এক এক করিয়া দুনিয়া হইতে চলিয়া যাইতে থাকিবে। জবের আটা চালনী দ্বারা ছাঁকিলে যেরূপ আটার উত্তম অংশ নীচে পড়িয়া যায় এবং শুধু মাত্র ভূষী বা চোকলা চালনীর উপর থাকে; তদ্রূপ নেক লোকগণ ভূপৃষ্ঠ হইতে নিঃশেষ হইয়া ভূপৃষ্ঠে শুধু মাত্র চোকলার ন্যায় নিকৃষ্ট লোকগণ অবশিষ্ট থাকিয়া যাইবে; আল্লাহ তায়ালা তাহাদের অস্তিত্বের কোন পরওয়াই করিবেন না। (তাহাদের উপরই কেয়ামত বা মহাপ্রলয় কায়েম হইবে।)

ধন-দৌলত একটি পরীক্ষার বস্তু উহা সম্পর্কে সতর্ক থাকিবে

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলিয়াছেন :—

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ - وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

"তোমাদের ধন ও জন তোমাদের পক্ষে পরীক্ষার জিনিষ; (যে ব্যক্তি এই সবের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে তথা এই সবের মোহ কাটাইয়া উঠিয়া আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় রাখিতে পারিবে তাহার জন্য) আল্লাহ তায়ালার নিকট মহাপুরস্কার রহিয়াছে। (২৮ পারা ১৫ রুকু)

২৪২৯। হাদীছ :— عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ

وَالْقَطِيفَةِ وَالْخَمِيصَةِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—ধিক তাহাদের প্রতি যাহারা টাকা-পয়সার গোলাম হয়, কাপড়-চোপড়ের গোলাম হয়, (এমনকি তাহাদের সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি শুধু ঐ সবের উপরই নির্ভর করে—) ঐ সব পাইলেই সন্তুষ্ট, ঐ সব না পাইলে সন্তুষ্টি নাই।

ব্যাখ্যা :—মানুষের কল্যাণকর ও মঙ্গলজনক অবস্থা এই যে, তাহার চিন্তা-ভাবনার গতি এবং অন্তরের টান ও আকর্ষণ আখেরাতের প্রতি হইবে। তাহার সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির মূল বস্তু আখেরাত হইবে। তাহার মন-মগজে আখেরাতের উন্নতির চিন্তাই হইবে অধিক। দুনিয়ার লাভ-নোকছান তাহার সম্মুখে আখেরাতের মোকাবিলায় দ্বিতীয় নম্বরে তথা পেছনে থাকিবে—এই হইল ঈমানদারের বৈশিষ্ট্য।

পক্ষান্তরে উহার বিপরীত অবস্থা অর্থাৎ মন-মগজে ও চিন্তা-ভাবনায় দুনিয়া সর্ব্বাগ্রে ও প্রথম নম্বরে থাকা, চেষ্টা-তদবীরের বেলায় দুনিয়া সর্ব্বাগ্রে থাকা, তালাশে-অন্বেষণে দুনিয়া সর্ব্বাগ্রে থাকা, সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির মূল বস্তু দুনিয়াকে সাব্যস্ত করা তথা দ্বীনের ক্ষতি হইলে ততটুকু অসন্তুষ্টি নাই যতটুকু অসন্তুষ্টি দুনিয়ার ক্ষতি হইলে আসে—এই শ্রেণীর স্বভাব দ্বীনহীন কাফের লোকদের হইতে পারে। পবিত্র কোরআনেও আল্লাহ তায়ালা এই তথ্যটির প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। কাফেরদের স্বভাব ও পরিচয় উল্লেখ করতঃ আল্লাহ তায়ালা বলেন—

فَاَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلّٰى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ـ

ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ

অর্থাৎ কাফেরদের অবস্থা ও স্বভাব হয় এইরূপ যে, আমাকে স্মরণ রাখা হইতে, আমার নছিহতকে গ্রহণ করা হইতে অচেতন ও বিমুখ হইয়া থাকে এবং তাহাদের তৎপরতা, তাহাদের লক্ষ্য দুনিয়ার জেন্দেগীর প্রতিই ; দুনিয়ার জেন্দেগীই তাহাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বুঝ-ব্যবস্থার শেষ সীমা। (২৬ পারা ছুরা নজম)

আলোচ্য হাদীছের তাৎপর্য্যও উহাই যে, আখেরাতের প্রতি যাহাদের তৎপরতা নাই, লক্ষ্য নাই—দুনিয়ার ধন-সম্পদই যাহাদের কাম্য, লক্ষ্য ও সন্তুষ্টি এবং যাহাদের তালাশ ও অন্বেষণ একমাত্র দুনিয়ার ধন-সম্পদ তাহাদের প্রতি ধিক্কার।

২৪৩০। হাদীছ :— ابن عباس رضى الله تعالى عنه يقول

سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَوْكَانَ لِابْنِ اٰدَمَ وَادِيَانِ

مِنْ مَالٍ لَابْتَغٰى ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ اٰدَمَ اِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوْبُ

اللّٰهُ عَلٰى مَنْ تَابَ

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, আদম সন্তানের কাহারও দুই ময়দান ভরা ধন-সম্পদ মৌজুদ থাকিলেও সে (তাহাতে তৃপ্ত না হইয়া) তৃতীয় ময়দান ভরার অভিলাষী হইবে। একমাত্র মাটিই আদম সন্তানের পেটকে ভরিতে পারে। অবশ্য কেহ যদি আল্লার প্রতি ধাবিত হয় তবে আল্লাহ তাহাকে গ্রহণ করেন। (অর্থাৎ যদি কেহ দুনিয়ার লিপ্সা ত্যাগ করিয়া আল্লার সন্তুষ্টি লাভের অভিলাষী হয় তবে তাহার প্রতি আল্লার রহমতের দৃষ্টি হয়, সে ঐরূপ ঘৃণিত স্বভাব হইতে রক্ষা পায়।)

● মানুষের পেট একমাত্র মাটিই ভরিতে পারে এই বাক্যের উদ্দেশ্য মানুষের সীমাহীন লিপ্সার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা কিম্বা ইহার উদ্দেশ্য মৃত্যু। অর্থাৎ মাটির নীচে যাওয়াই তাহার পেট ভরিতে পারে তথা মৃত্যু আসিলেই তাহার লিপ্সার সমাপ্তি হইতে পারে অন্য কোন উপায়ে নহে।

২৪৩১। ছাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) মক্কার মসজিদে-হারামে **মিম্বারের** উপর দাঁড়াইয়া ভাষণ দান কালে বলিয়াছেন, হে লোক সকল! **হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু** আলাইহে অসাল্লাম বলিয়া থাকিতেন, আদম সন্তানকে এক ময়দান ভরা স্বর্ণ প্রদান করা হইলে সে আর এক ময়দান ভরা স্বর্ণ লাভের অভিলাষী থাকিবে। দ্বিতীয় ময়দান প্রদান করা হইলে তৃতীয় ময়দান লাভের অভিলাষী থাকিবে। একমাত্র মাটিই মানুষের পেট ভরাইতে পারে, অবশ্য যে আল্লার প্রতি ধাবিত হয় আল্লাহ তাহাকে গ্রহণ করেন।

২৪৩২। ছাদীছঃ— আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, কোন আদম সন্তানের এক ময়দান ভরা স্বর্ণ লাভ হইলে সে আরও দুই ময়দানের অভিলাষী হইবে। তাহার মুখ একমাত্র মাটির দ্বারাই ভর্ত্তি হইতে পারে। অবশ্য যে আল্লার প্রতি ধাবিত হয় আল্লাহ তাহাকে গ্রহণ করিয়া নেন।

দুনিয়ার আকর্ষনীয় বস্তুসমূহ সম্পর্কে সতর্ক থাকিবে

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ

مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ......

"নারী, সন্তান-সন্ততি, পুঞ্জিভূত স্বর্ণ-রৌপ্য (তথা নগদ ধনরাশি) উত্তম ঘোড়া (তথা ভাল যানবাহন যথা গাড়ী), পশু পাল (তথা বিভিন্ন রকম সম্পদ) এবং ক্ষেত-খামার (তথা স্থাবর সম্পত্তি)—এই সব লোভনীয় বস্তুনিচয়ের ভালবাসা মানুষের জন্য আকর্ষণীয়। (অর্থাৎ মানুষ এই সব বস্তুর ভালবাসায় আকৃষ্ট হইয়া উহার জন্য আল্লার নাফরমানী করিতেও দ্বিধা করে না।)

অথচ এই সবই ক্ষণস্থায়ী জীবনের ক্ষণস্থায়ী ব্যবহারের বস্তু মাত্র। আর একমাত্র আল্লার নিকটই উত্তম পরিণাম। আপনি বলুন, তোমাদিগকে এমন বস্তুর খোঁজ দিব কি যাহা ঐ বস্তু নিচয় হইতে উত্তম?

যাহারা সংযত জীবন-যাপন করে তাহাদের জন্য তাহাদের পরওয়ারদেগারের নিকট বেহেশতের বাগ-বাগিচাসমূহ রহিয়াছে যাহার মধ্যে নদী-নালা প্রবাহমান রহিয়াছে। তথায় তাহারা চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে এবং তাহাদের জন্য তথায় পবিত্রাত্মা পরিণীতাগণ থাকিবে, আর থাকিবে তাহাদের জন্য আল্লার সন্তুষ্টি। আল্লাহ জ্ঞাত আছেন সকল বন্দাদের সম্পর্কে।

সংযত জীবন-যাপনকারী তাহারা যাহারা বলিয়া থাকে, প্রভু হে! আমরা ঈমান গ্রহণ করিয়াছি ; আমাদের সমুদয় গোনাহ ক্ষমা করিয়া দিন এবং দোযখের আজাব হইতে বাঁচাই রাখিবেন। তাহাদের পরিচয় এই যে—তাহারা ধৈর্য্যশীল, সত্যপরায়ণ, আল্লার হুজুরে বিনম্র এবং শেষ রাত্রে ক্ষমা প্রার্থনাকারী"। (৩ পারা ১০ রুকু)

● উক্ত আয়াতে যেই সব বস্তুকে আকর্ষনীয় বলা হইয়াছে ঐ সব বস্তু সম্পর্কে ওমর (রাঃ) এইরূপ দোয়া করিতেন— "আয় আল্লাহ। যে সব জিনিষকে তুমি আমাদের জন্য আকর্ষনীয় বানাইয়াছ আমরা উহার দ্বারা আনন্দিত না হইয়া পারি না, কিন্তু—আয় আল্লাহ! তোমার নিকট আমি এই ভিক্ষা চাই, আমি যেন ঐ বস্তুনিচয়কে সঠিক পথে ব্যয় করিতে সক্ষম হই।

যে মাল আখেরাতের জন্য ব্যয় করা হয় উহাই নিজস্ব

২৪৩৩। হাদীছ :— قال عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهٖ اَحَبُّ اِلَيْهِ مِنْ مَالِهٖ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا مِنَّا اَحَدٌ اِلَّا مَالُهٗ اَحَبُّ اِلَيْهِ قَالَ فَاِنَّ مَالَهٗ مَا قَدَّمَ وَمَالُ وَارِثِهٖ مَا اَخَّرَ

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একদা জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে নিজস্ব ধন-সম্পদ অপেক্ষা উত্তরাধিকারী আত্মীয়-স্বজনের ধন-সম্পদকে অধিক ভালবাসিয়া থাকে? ছাহাবীগণ আরজ করিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! আমরা প্রত্যেকেই নিজস্ব ধন-সম্পদকে অধিক ভালবাসিয়া থাকি। হযরত (দঃ) বলিলেন, জানিয়া বুঝিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়া রাখ যে, তোমাদের প্রত্যেকের জন্য ঐ ধন-সম্পদই নিজস্ব যাহা আখেরাতের জন্য ব্যয় করিয়াছ, আর যাহা জমা রাখিয়াছ উহা উত্তরাধিকারী আত্মীয় স্বজনের মাল।

দুনিয়ার ধনী আখেরাতে দরিদ্র হইবে

আল্লাহ তয়ালা পবিত্র কোরআনে বলিয়াছেন :—

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ - اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ -

وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"যে মানুষের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও ইচ্ছা-আকাঙ্খা দুনিয়ার জেন্দেগী এবং উহারই জাঁকজমক, চাক-চিক্য লাভ করা হয় আমি ঐ শ্রেণীর লোকদিগকে এই দুনিয়ার মধ্যেই তাহাদের চেষ্টা-তদবীরের ফলাফল পুরাপুরীরূপে দিয়া শেষ করিয়া দেই— জাগতিক ফলাফল লাভে তাহারা বঞ্চিত থাকে না (যদি তাহাদের পক্ষে এই ফলাফল লাভের প্রতিবন্ধক কিছু না থাকে)।

এই শ্রেণীর লোকদের ভাগ্যে আখেরাতে দোযখ ভিন্ন আর কিছুই জুটিবে না। এই দুনিয়াতে তাহারা যাহা কিছু করিয়াছে (এমনকি যদিও উহা বাহ্যিক নেক আমলও হয়) সবই বরবার্দ হইয়া যাইবে এবং যাহা কিছু করিতে থাকিবে ঐ সবও নিষ্ক্রিয় প্রতিপন্ন হইবে।" (১২ পারা ২ রুকু)

এস্থলে ইমাম বোখারী (রঃ) পূর্ব্বের অনুদিত এক খানা হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন যাহাতে উল্লেখ আছে, হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, দুনিয়ার ধনীগণই কেয়ামতের দিন বেশী দরিদ্র হইবে। ঐ শ্রেণীর ধনী ব্যতীত যাহাকে আল্লাহ তায়ালা ধন দান করিয়াছেন এবং সে ঐ মাল তাহার চতুর্দিকে (আল্লার সন্তুষ্টি লাভের স্থানে) ব্যয় করিয়াছে, ঐ মাল দ্বারা নেক কাজ করিয়াছে। এস্থলে দ্বিতীয় খণ্ডের ১১৬০ নং হাদীছখানা উল্লেখ হইয়াছে।

ধন সঞ্চয় অপেক্ষা আল্লার পথে ব্যয়ে অধিক আগ্রহশীল ও সন্তুষ্ট হইবে

২৪৩৪। হাদীছ ঃ — আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ওহোদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও যদি আমার লাভ হয় তবে নিশ্চয় আমি আনন্দ পাইব ইহাতে যে, তিনটি দিন অতি বাহিত হওয়ার পূর্ব্বেই যেন উহার কোন অংশও আমার নিকট সঞ্চিত না থাকে ; অবশ্য শুধু ঋণ পরিশোধের পরিমাণ ব্যতিত।

প্রকৃত ধনাঢ্যতা

আল্লাহকে ভুলিয়া যাহারা শুধু দুনিয়াতে লিপ্ত হয় তাহাদের অনেকে ধন-জনের আধিক্য লাভ করে বটে, কিন্তু তাহাদের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ

بَل لَّا يَشْعُرُونَ

"তাহারা কি মনে করিয়া থাকে—আমি যে, তাহাদের ধনে-জনে বাড়াইতেছি ইহা আমার পক্ষ হইতে তাহাদের জন্য দ্রুত মঙ্গল ও কল্যান সাধন! (তাহা নহে,) বরং তাহারা অনুভব করে না (যে, তাহাদের যাতনা ভোগের এবং ব্যাতিব্যস্ত থাকার উহা এক ফাঁদ মাত্র।)" (১৮ পাঃ ৪ রুঃ)

ঐ শ্রেণীর ধনীরা বাস্তবিকই যাতনা ভোগে থাকে। তাহাদের জন্য একটি সাধারণ যাতনা এই যে, ধন বেশী হইলেও তাহাদের তৃপ্তি লাভ হয় না। ফলে তাহারা সর্ব্বদা ব্যাতিব্যস্ত থাকে এবং যাতনা ভোগ করে। মানসিক শান্তি হইতে তাহারা বঞ্চিত থাকে।

এই শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কেই নবী (দঃ) বলিয়াছেন—"আদম-তনয়ের জন্য দুই প্রান্তরপূর্ণ ধন থাকিলে সে তৃতীয়টি পূর্ণ করার জন্য ব্যতিব্যস্ত থাকে। তাহার উদর একমাত্র মাটিই পূর্ণ করে। (অর্থাৎ কবরে যাওয়ার পরই তাহার লিপ্সার অবসান হয়)। অবশ্য কিছু সংখ্যকের প্রতি আল্লার সাহায্য থাকে—(তাঁহারা ঐ রূপ হয় না।)

উল্লেখিত হাদীছ দৃষ্টে আয়াতের তাৎপর্য্য সুস্পষ্ট যে, মনের তুষ্টি না থাকায় ধনবানদের শান্তি লাভ হয় না। অতএব ধনের ধনী অপেক্ষা মনের ধনীই প্রকৃত ধনী।

২৪৩৫। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْغِنٰى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ

وَلٰكِنَّ الْغِنٰى غِنَى النَّفْسِ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, প্রকৃত ধনাঢ্যতা ধন-সম্পত্তির আধিক্য দ্বারা লাভ হয় না; প্রকৃত ধনাঢ্যতা হইল অন্তরের ধনাঢ্যতা।

দারিদ্রের ফজিলত

২৪৩৬। হাদীছ ঃ—সাহ্‌ল ইবনে সায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াচেন, একদা এক ব্যক্তি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকটবর্ত্তী পথে যাইতে ছিল। হযরত (দঃ) ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে তাঁহার নিকট বসা আর এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ব্যক্তিকে তোমরা কিরূপ গণ্য করিয়া থাক? সে বলিল, এই লোকটি অতি উচ্চ শ্রেণীর লোক। খোদার কসম—এই ব্যক্তি কোথাও বিবাহের প্রস্তাব করিলে অবশ্যই তাহার প্রস্তাব কার্য্যকরী হইবে, সুপারিশ করিলে অবশ্যই গ্রহণীয় হইবে।

এই বক্তব্য শ্রবণে হযরত (দঃ) চুপ থাকিলেন। অতঃপর আর এক ব্যক্তি হযরতের নিকট দিয়া যাইতে ছিল, তাহার সম্পর্কেও হযরত (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন। এইবার সে মন্তব্য করিল, এই লোকটি মোসলমানদের মধ্যে একজন দরিদ্র লোক; কোথাও তাহার বিবাহের প্রস্তাব কেহ গ্রাহ্য করিবে না, তাহার সুপারিশ কেহ গ্রহণ করিবে না, তাহার কথার কেহ কোন মূল্য দিবে না।

অতঃপর হযরত (দঃ) বলিলেন, ঐ (প্রথম) ব্যাক্তির ন্যায় লোক জগৎ ভরা হইলেও তাহাদের অপেক্ষা এই (দ্বিতীয়) একজন লোকই উত্তম।

২৪৩৭। হাদীছ ঃ—এমরান ইবনে হোছাইন (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, বেহেশত সম্পর্কে আমি অবগতি লাভ করিয়াছি। তাহাতে দেখিয়াছি; উহার অধিকাংশ অধিবাসী এমন লোকগণ হইবে যাহারা পার্থিব জীবনে দরিদ্র ছিল। দোযখের অবগতিও লাভ করিয়াছি; তাহাতে দেখিয়াছি, উহার অধিকাংশ অধিবাসী হইবে নারী।

ছাহাবীগণের জেন্দেগীর নমুনা

২৪৩৮। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়া থাকিতেন, আল্লাহ ভিন্ন আর কোন মাবুদ নাই—সেই আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি, অনেক সময় আমি ক্ষুধার জ্বালায় পেটকে মাটির সঙ্গে চাপা দিয়া থাকিতাম এবং কোন কোন সময় ক্ষুধার তাড়নায় পেটে পাথর বাঁধিয়া রাখিতাম।

একদা আমি লোকদের চলাচল পথে বসিয়া গেলাম, আবু বকর (রাঃ) আমার নিকট দিয়া যাইতে লাগিলেন। আমি তাঁহাকে কোরআন শরীফের একটি আয়াত জিজ্ঞাসা করিলাম। আমার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, তিনি যেন আমার অনাহারী হওয়ার ইঙ্গিত পাইয়া আমাকে আহারে তৃপ্ত করেন। কিন্তু তিনি চলিয়া গেলেন—আমার উদ্দেশ্য পুরণ করিলেন না। অতঃপর ওমর (রাঃ) সেই পথে যাইতে লাগিলেন, তাঁহাকেও আমি ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনিও চলিয়া গেলেন আমার উদ্দেশ্য পূরণ করিলেন না। অতঃপর হযরত (দঃ) যাইতে লাগিলেন এবং মুস্কি হাসি হাসিলেন। হযরত (দঃ) আমার চেহারা দেখিয়া আমার অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। হযরত (দঃ) আমাকে ডাকিলেন—হে আবু হোরায়রা! আমি আরজ করিলাম, গোলাম উপস্থিত আছি—ইয়া রসুলাল্লাহ! হযরত (দঃ) বলিলেন, আমার গৃহে আস—এই বলিয়া হযরত (দঃ) নিজ গৃহাভিমুখে চলিলেন। আমি তাঁহার পেছনে চলিলাম; হযরত (দঃ) গৃহে প্রবেশ করিলেন, আমি প্রবেশের অনুমতি চাহিলাম হযরত (দঃ) আমাকে অনুমতি দিলেন।

হযরত (দঃ) গৃহে এক পেয়ালা দুধ দেখিতে পাইলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, এই দুধ কোথা হইতে আসিল? গৃহবাসীগণ বলিল, অমুক ব্যক্তি এই দুধ আপনাকে হাদিয়া দিয়াছে। হযরত (দঃ) আমাকে ডাকিলেন—আবু হোরায়রা! আমি আরজ করিলাম, গোলাম হাজির আছি—ইয়া রসুলুল্লাহ! হযরত (দঃ) বলিলেন, ছোফ্‌ফা-বাসীগণকে ডাকিয়া নিয়া আস। ছোফ্‌ফাবাসীগণ সকল মোসলমানদের মেহমান ছিলেন। তাঁহারা মসজিদের বারিন্দায় রাত্রি যাপন করিতেন, তাহাদের বাড়ী-ঘর পরিবার-পরিজন কিছুই ছিল না, তাঁহাদের ব্যয়ভার বহনেরও কেহ ছিল না। হযরতের নিকট কোন দান-খয়রাত আসিলে হযরত (দঃ) তাহা সম্পূর্ণই তাঁহাদের নিকট পাঠাইয়া দিতেন, আর হাদিয়া আসিলে হযরত (দঃ) উহার কিছু অংশ নিজে রাখিতেন এবং অবশিষ্টাংশ তাঁহাদেরকে দিয়া দিতেন।

আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন এই এক পেয়ালা দুধের জন্য ছোফ্‌ফাবাসীগণকে ডাকিয়া আনা আমার মনঃপুত হইল না। আমি ভাবিলাম, এই পরিমান দুধ ছোফ্‌ফাবাসীদের সংখ্যানুপাতে কি? এই দুধ আমি একা পান করিয়া বল-শক্তি লাভ করিতে পারিলে তাহাই শ্রেয়ঃ হইত। পক্ষান্তরে তাহারা সকলে উপস্থিত হইলে ত হযরত (দঃ) নিজ স্বভাবানুযায়ী আমাকেই আদেশ করিবেন প্রথমে ইহা তাহাদের মধ্যে বণ্টন করার জন্য; অবশেষে আমার ভাগ্যে এই দুধ হইতে কি জুটিবে? কিন্তু আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের আদেশ মান্য করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। সুতরাং আমি ছোফ্‌ফাবাসীদের নিকট আসিয়া তাহাদিগকে ডাকিলাম, তাঁহারা হযরতের গৃহাভিমুখে ছুটিলেন এবং গৃহে প্রবেশের অনুমতি চাহিলেন; হযরত (দঃ) অনুমতি দিলেন। তাঁহারা গৃহে আসিয়া বসিলেন। হযরত (দঃ) আমাকে ডাকিলেন—আবু হোরায়রা! আমি আরজ করিলাম, গোলাম হাজির আছি—ইয়া রসুলাল্লাহ! হযরত (দঃ) বলিলেন, দুধের পেয়ালা নিয়া তাহাদেরকে পান করাও। আমি তাহা আরম্ভ করিলাম এবং একের পর এক—প্রত্যেককেই তৃপ্তি সহকারে পান করাইলাম। তাঁহারা সকলে তৃপ্ত হওয়ার পর হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট পৌছিলাম। হযরত (দঃ) পেয়ালা হাতে নিয়া আমার প্রতি দৃষ্টি করিলেন এবং মুস্কি হাসি হাসিলেন। আর বলিলেন, আমি ও তুমিই বাকি! আমি আরজ করিলাম, হাঁ—আমরাই বাকি রহিয়াছি।

হযরত (রাঃ) আমাকে বলিলেন, তুমি বস এবং দুধ পান কর, আমি বসিয়া পান করিলাম। হযরত দঃ) বলিলেন, আরও পান কর, আমি পুনঃ পান করিলাম। হযরত (দঃ) আমাকে বার বার আরও পান কর বলিতে ছিলেন, অবশেষে আমি আরজ করিলাম, খোদার কসম—আমার পেটে আর জায়গা নাই।

অতঃপর দুধের পেয়ালা হযরতের হস্তে দিলাম। হযরত (দঃ) আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করিলেন এবং বিছমিল্লাহ বলিয়া অবশিষ্ট দুধ পান করিলেন।

মধ্য পন্থায় নেক আমলে আত্মনিয়োগ করা

২৪৩৯। হাদীছ ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একদা বলিলেন—

"তোমাদের কাহাকেও তাহার আমল নাজাত বা মুক্তি দিতে পারিবে না।" ছাহাবীগণ আরজ করিলেন, আপনাকেও নয় ইয়া রসুলাল্লাহ? হযরত (দঃ) বলিলেন, আমাকেও আমার আমল নাজাত দিতে পারিবে না যদি না আল্লার রহমত আমাকে আপাদ-মস্তক আবৃত করিয়া নেয়। অবশ্য তোমরা সত্য ও সঠিক পথে অগ্রসর হইতে থাক এবং আল্লার নৈকট্য লাভে সচেষ্ট থাক। আর সকালে বিকালে ও শেষ রাত্রির অন্ধকারে এবাদতের অভ্যাস কর এবং মধ্য পন্থায় নেক আমলে আত্মনিয়োগ করিয়া চল, উদ্দেশ্য স্থলে পৌঁছিতে সক্ষম হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ—অতিশয় চতুর শয়তান যখন কাহারও অন্তরে এবাদৎ-বন্দেগীর স্পৃহা দেখিতে পায় এবং সে বুঝিতে পারে যে, বাধা দিয়া এই স্পৃহাকে দমন করা যাইবে না তখন সে তাহাকে এত অধিক পরিমাণের এবাদতে অকৃষ্ট করে যাহা তাহার নিকট অচিরেই এক অসাধ্য বোঝারূপে পরিগণিত হইবে এবং সে নিজেই হাত-পা গুটাইয়া বসিবে। তাই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের শিক্ষা এই যে, একেবারে কমও নয় আবার অতি অধিকও নয়—বরং মধ্য পন্থার পরিমাণে এবাদৎ অবলম্বন করিবে যাহা সর্ব্বদা আমল করিয়া যাওয়া সহজ সাধ্য হয়।

২৪৪০। হাদীছ ঃ— আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা সত্য ও সঠিক পথে অগ্রসর হইতে থাক এবং আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভে সচেষ্ট থাক। আর সুসংবাদ গ্রহণ কর (যে, উহার দ্বারা তোমরা আল্লার রহমত লাভ করিতে পারিবে এবং আল্লার রহমতের অছিলায়ই বেহেশ্ত লাভ হইবে।) নিশ্চয় জানিয়া রাখিও শুধু আমল কাহাকেও বেহেশতের অধিকারী বানাইতে পারে না। +

\+ বেহেশত এক অসীম অফুরন্ত ও অসংখ্য নেয়ামতরাশির মহল। মানুষের ক্ষুদ্র জীবনের অল্প সংখ্যক আমল দ্বারা উহা লাভ করা সম্ভব হইতে পারে না। উহা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার অসীম রহমতেই লাভ হইতে পারে। অবশ্য আল্লার রহমত পাওয়ার জন্য আমলের আবশ্যক। আমলের দ্বারা আল্লার সন্তুষ্টি হাসিল হইবে, ফলে আল্লাহ তায়ালা তাঁহার করুণা ও কৃপা এবং রহমত দ্বারা বেহেশত দান করিবেন।

ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনিও আপনার আমল দ্বারা বেহেশতের অধিকারী হইতে পারিবেন না? হযরত (দঃ) বলিলেন, আমিও বেহেশত লাভ করিতে পারিব না যাবৎ না আল্লাহ তায়ালা আমাকে আপাদ-মস্তক তাঁহার মাগফেরাত—ক্ষমা ও রহমত দ্বারা আবৃত করিয়া নেন।

২৪৪১। হাদীছঃ— আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ছেরাতে-মোস্তাকীম সোজা পথ তথা দ্বীন-ইসলামের উপর চলিতে থাক। এবং আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করিয়া যাইতে থাক। (এই সাধনায় বিরামহীন হইতে হইবে; কোন স্তরেই আমলকে পর্য্যাপ্ত মনে করিয়া শিথিল হইবে না।) বিশ্বাস রাখিও তোমার আমল (যত পরিমাণেরই হউক উহা অসীম নেয়ামত-ভাণ্ডার) বেহেশতের অধিকারী তোমাকে বানাইতে পারিবে না। জানিয়া রাখিও, যে আমল সর্ব্বদা আদায় করা হয় উহাই আল্লার নিকট অধিক পছন্দনীয় যদিও পরিমাণে কম হয়। (কারণ, দীর্ঘ দিনের অল্প পরিমাণের সমষ্টিও দুই-চার দিনের অধিক পরিমাণ অপেক্ষা অনেক বেশী হইবে।)

ব্যাখ্যাঃ—কোন মানুষ তাহার দীর্ঘ জীবনের আমলকে অধিক দেখিয়া পর্য্যাপ্ত ভাবিতে পারে। এতদ্ভিন্ন নানাবিধ এবাদতের অসাধারণ ছওয়াব ও ফজিলত কোরআন-হাদীছে বর্ণিত আছে। যথা—লাইলাতুল-কদরের এবাদত এবং চাশ্‌তের নামায এবং বিভিন্ন জিকির ও দোয়া। এই সব দৃষ্টে ছওয়াবের জমা (Credit) অনেক বেশী মনে করিয়া কোন কোন লোক শিথিল হইতে চায়। তাহারা বোকা; তাহারা শুধু (Credit) বা জমার হিসাবই দেখে, (Debit) বা ভোগ করিয়া ফেলা ও উঠাইয়া ফেলার হিসাবের প্রতি লক্ষ্যই করে না। অথচ হাদীছে ইহাও আছে—মানুষের শরীরে ও অঙ্গে প্রত্যঙ্গে যতগুলি জোড়া আছে, প্রতি দিন প্রভাতে (ঘুম হইতে উঠিয়া দীর্ঘ সময় ঐগুলি অচল থাকার পর যখন চলমান দেখে তখন) উহার প্রত্যেকটির বিনিময়ে এক একটি ছদ্‌কা দান কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে।

(মেশকাত শরীফ, ১১৬)

এতদ্ভিন্ন পানি, বাতাস, আহার ইত্যাদি অসংখ্য নেয়ামত মানুষ ভোগ করিতেছে। সারা জীবনের এবাদতে একটি নেয়ামতের হক্‌ও ত আদায় হইবে না। অতঃপর বেহেশত হইল চিরস্থায়ী, উহার নেয়ামত হইল অসীম অগণিত। মানুষের বয়স যাহা নিতান্তই সীমিত সময়; এই সময়টুকুর সামান্য এবাদৎ ঐ অসীম চিরস্থায়ী অগণিত নেয়ামতরাশির বিনিময় হইতে পারে কিরূপে? তাই বলা হইয়াছে, কাহারও আমল তাহাকে বেহেশতের অধিকারী বানাইতে পারে না। এমনকি উপরোল্লেখিত হাদীছদ্বয়ে নবী (দঃ) নিজের সম্পর্কেও বলিয়াছেন,

আমার সারা জীবনের আমলও আমাকে বেহেশতের অধিকারী বানাইতে পারিবে না—একমাত্র আল্লাহই যদি আমাকে আপাদমস্তক তাঁহার মাগফেরাত ও রহমতে নিমজ্জিত করিয়া নেন, তবেই আমি বেহেশতে যাইতে পারিব।

অবশ্য আল্লার মাগফেরাত ও রহমত একমাত্র আমলের অছিলায়ই লাভ হইতে পারিবে—ইহা আল্লাহ তায়ালার নির্দ্ধারিত নিয়ম ও বিধান। সীমীত ও অপর্য্যাপ্ত আমলের অছিলায় আল্লাহ তায়ালার অসীম রহমত লাভ হইবে। এবং সেই অসীম রহমতে বেহেশত লাভ হইবে। অতএব বেহেশত লাভে আমলের বাধ্যবাধকতা ও প্রয়োজন অবশ্যই রহিয়াছে। এবং এই সূত্রেই পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে, বেহেশতবাসীগণকে আল্লাহ তায়ালা (Thanks) ও ধন্যবাদ দানে বলিবেন—

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِىْ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ "এই বেহেশত তোমাদেরে দান করা হইল তোমাদের আমলের বদৌলতে।" اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ "তোমাদের আমলের প্রতিদানে তোমারা বেহেশতে প্রবেশ কর।"

২৪৪২। **ছাদীছ**:— আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইল কোন্ প্রকার আমল আল্লাহ তায়ালার নিকট অধিক পছন্দনীয়? নবী (দঃ) বলিলেন, যেই আমল সর্ব্বদা করা হয়—যদিও পরিমাণে কম হয়। তোমাদের জন্য সহজ-সাধ্য পরিমাণ আমলই তোমরা অবলম্বন করিও।

২৪৪৩। **ছাদীছ**:— আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নামায শেষ করিয়াই মিম্বারে আরোহণ করিলেন। এবং মসজিদের সম্মুখস্ত দেওয়ালের প্রতি ইশারা করিয়া বলিলেন, তোমাদেরকে লইয়া এই নামায পড়ার সময়েই বেহেশত-দোযখের দৃশ্য আমাকে এই দেওয়ালের নিকটবর্ত্তী দেখানো হইয়াছে। ভাল এবং মন্দের এই দৃশ্যের তুলনা আর কখনও দেখি নাই।

ব্যাখ্যা:—নামাযের মধ্যে এই দৃশ্য দেখাইবার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, বেহেশত লাভ করিতে হইলে এবং দোযখ হইতে মুক্তি চাহিলে নেক আমল সর্ব্বদা করিয়া যাইতে হইবে।

আজাবের ভয় এবং রহমতের আশা উভয়ের সমন্বয় সাধন করিতে হইবে

বিশিষ্ট মোহাদ্দেছ সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়নাহ (রঃ) বলিয়াছেন, পবিত্র কোরআনের এই আয়াতটি আমার পক্ষে সর্ব্বাধিক চিন্তার কারণ:—

لَسْتُمْ عَلٰى شَيْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ

اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ

এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইহুদ-নাছারা কেতাবধারীগণকে কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছেন—"যাবৎ না তোমরা তৌরাত ইঞ্জিল কেতাব এবং আল্লাহ প্রদত্ত সমুদয় বিষয়াবলীকে পূর্ণরূপে আমল ও প্রতিষ্ঠা কর তাবৎ তোমরা দ্বীনের কোনও স্তরে আছ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবে না।"

আমাদের বেলায় কোরআন সম্পর্কেও ঠিক এই বিধি-বিধানই প্রযোজ্য হইবে।

২৪৪৪। **হাদীছ** :— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ الرَّحْمَةَ يَوْمَ خَلَقَهَا مِائَةَ رَحْمَةٍ فَاَمْسَكَ عِنْدَهٗ تِسْعًا وَّتِسْعِيْنَ رَحْمَةً وَاَرْسَلَ فِىْ خَلْقِهٖ كُلِّهِمْ رَحْمَةً وَّاحِدَةً فَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِىْ عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الرَّحْمَةِ لَمْ يَيْأَسْ مِنَ الْجَنَّةِ وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِىْ عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الْعَذَابِ لَمْ يَاْمَنْ مِنَ النَّارِ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এই বলিতে শুনিয়াছি, আল্লাহ তায়ালা যখন "দয়া" সৃষ্টি করিয়াছেন তখন উহাকে একশত ভাগরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর উহার নিরানব্বই ভাগকে তিনি নিজের নিকট রাখিয়া দিয়াছেন, শুধু এক ভাগ (পশু-পক্ষী, মানব-দানব ইত্যাদি) সমুদয় সৃষ্ট জীবের মধ্যে বন্টন করিয়া দিয়াছেন (যাহার প্রতিক্রিয়ায় মাতা-পিতা নিজ সন্তানের প্রতি এবং আত্মীয়-স্বজন পরস্পর দয়া ও স্নেহ মমতা করিয়া থাকে।)

আল্লাহ তায়ালার নিকট দয়া ও কৃপা যে পরিমাণ রহিয়াছে কাফের ব্যক্তি যদি উহার উপলব্ধি করিতে পারিত তবে সেও বেহেশত লাভের আশা ত্যাগ করিত না। পক্ষান্তরে আল্লাহ তায়ালার নিকট আজাবের ব্যবস্থাও এরূপ রহিয়াছে যে, মোমেনও যদি উহার উপলব্ধি করিতে পারে তবে সেও দোযখ হইতে নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে না।

ব্যাখ্যা ঃ—মোছলেম শরীফের হাদীছে বর্ণিত আছে, কেয়ামতের দিন সৃষ্ট জীবকে প্রদত্ত এই এক ভাগ দয়াও আল্লাহ তায়ালা নিজের জন্য উঠাইয়া লইবেন এবং পূর্ণ একশত ভাগ দয়া ও রহমত লইয়া আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের প্রতি রহমত ও দয়া প্রদর্শন করিবেন।

দুঃখ-কষ্টের উপর ধৈর্য্য ধারন করা তবুও আল্লার নিষিদ্ধ কাজ না করা

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

قُلْ يٰعِبَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ - لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ - وَاَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ - اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ -

"আপনি আমার কথাটি বলিয়া দিন—হে আমার বন্দাগণ যাহারা ঈমান গ্রহণ করিয়াছ! তোমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগরকে ভয় করিয়া জীবন যাপন করিও। যাহারা ভাল কাজ করিবে তাহারা ইহজগতেও ভাল ফল লাভ করিবে। আল্লার জমিন সুপ্রসস্ত ; (ভাল কাজ করায় কোথাও বাধা থাকিলে অন্যত্র সুযোগস্থলে চলি যাও। আল্লার নাফরমানী হইতে বাঁচিবার জন্য কষ্ট করিতে হইলে তাহা অবশ্যই কর। উহাতে কুণ্ঠিত হইও না ; স্মরণ রাখিও—) নিশ্চয় যাহারা (আল্লার নাফরমানী পরিহার করিয়া চলায় দুঃখ-কষ্টের উপর বা লোভ সংবরণ করায়) ধৈর্য্য ধারণকারী হইবে আল্লাহ তাহাদের প্রতিদান পূর্ণ ও বেহিসাব দিবেন।" ২৩পাঃ ১৬রুঃ

● ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, "জীবনের সুখ-শান্তির শর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন ছবর ও ধৈর্য্যকেই পাইয়াছি।"

ধন-জনের সল্পতা ক্ষেত্রেও ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতা থাকিলে সুখ-শান্তি আছে। পক্ষান্তরে ধন-জনের প্রাচুর্য্যতার মধ্যে থাকিয়াও ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতা না থাকিলে সুখ-শান্তি ভাগ্যে জুটে না।

আল্লাহ তায়ালার উপর তাওয়াক্কোল বা ভরসা করা

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলিয়াছেন ঃ—

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ

"যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করিবে তাহার জন্য আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট হইবেন।"

২৪৪৫। হাদীছ ঃ— عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من امتى

سبعون الفا بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى

ربهم يتوكلون

অর্থ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার উম্মতের সত্তর হাজার লোক বিনা-হিসাবে বেহেশতে যাইবে। তাহাদের মধ্যে এই গুণ কয়টি হইবে—মন্ত্র-তন্ত্র, তাহারা গ্রহণ করিবে না। কোন বস্তুকে অশুভ বলিয়া বিশ্বাস করিবে না। আল্লাহ তায়ালার উপর পূর্ণ মাত্রায় ভরসা স্থাপনকারী হইবে।

মুখকে সংযত রাখা

আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে বলিয়াছেন—

ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد

"মানুষ যে কোন বাক্য মুখের বাহির করে উহা সংরক্ষণের জন্য ফেরেশতা তাহার নিকট মোতায়েন থাকে।"

২৪৪৬। হাদীছ ঃ— عن سهل بن سعد رضى الله تعالى عنه

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لى ما بين لحييه

وما بين رجليه اضمن له الجنة

অর্থ—সাহ্‌ল ইবনে সায়াদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার কথা মতে দুইটি বস্তুকে সংযত রাখার দায়িত্ব পালন করিবে আমি তাহার জন্য বেহেশত লাভের দায়িত্ব গ্রহণ করিব। (১) উভয় চোয়ালের মধ্যবর্ত্তী বস্তু (অর্থাৎ জবান। জবানকে সংযত রাখিবে খাওয়ার ব্যাপারে এবং কথার ব্যাপারে।) (২) উভয় রানের মধ্যবর্ত্তী বস্তু (অর্থাৎ জননেন্দ্রিয়কে। উহাকে সংযত রাখিবে ব্যভিচার হইতে।)

২৪৪৭। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان العبد يتكلم بالكلمة

مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا يَزِلُّ بِهَا فِى النَّارِ اَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছেন, মানুষ অসংযত ভাবে—(তাৎপর্য্য ও প্রতিক্রিয়ার প্রতি) লক্ষ্য না করিয়া এমন কথা বলিয়া ফেলে যদ্দরুণ সে দোযখের মধ্যে দুনিয়ার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত দুরত্বের গভীরতায় পতিত হয়।

২৪৪৮। **হাদীছ:—** عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللّٰهِ لَا يُلْقِىْ لَهَا بَالًا يَرْفَعُ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَاتٍ وَاِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللّٰهِ لَا يُلْقِىْ لَهَا بَالًا يَهْوِىْ بِهَا فِىْ جَهَنَّمَ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মানুষ কোন সময় আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি ভাজন বাক্য বলে—হয় ত সে উহার প্রতি মনোযোগও দেয় নাই, তবুও আল্লাহ তায়ালা উহার বদৌলতে তাহার মর্ত্তবা ও মর্য্যাদা অনেক বেশী বাড়াইয়া দেন।

পক্ষান্তরে কোন সময় মানুষ আল্লার অসন্তুষ্টির বাক্য বলিয়া ফেলে—সে হয় ত উহার প্রতি লক্ষ্যও করে নাই, কিন্তু উহার দরুণ সে দোযখে পতিত হইয়া যায়।

আল্লার ভয় অন্তরে জাগরুক রাখা

২৪৪৯। **হাদীছ:—** হোযায়ফা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বর্ণনা করিয়াছেন, তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী এক উম্মতের এক ব্যক্তি স্বীয় আমল সম্পর্কে খারাব ধারণা পোষণ করিত (তাহার চেতনা ও অনুভূতি ছিল যে, তাহার আমল খারাব)। তাই সে তাহার পরিবারের লোকদিগকে বলিল, আমি মরিয়া গেলে আমার দেহকে দগ্ধ করতঃ চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া প্রবল বেগে বায়ু প্রবাহিত হওয়ার দিন সমুদ্রের মধ্যে উহা ছড়াইয়া দিও। পরিবারের লোকজন তাহাই করিল।

আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তির দেহের সমুদয় অংশকে একত্রিত করিলেন এবং পুনঃর্জীবিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এই কার্য্য তুমি কেন করিয়াছিলে? সে আরজ করিল, একমাত্র আপনার ভয়-ভীতির দরুণই আমি এরূপ করিয়া ছিলাম। আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি (দয়া পরবশ হইয়া) তাহার ক্ষমা করিয়া দিলেন।

২৪৫০। হাদীছ ঃ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম পূর্ব্ববর্ত্তী এক উম্মতের একজন লোকের আলোচনা করিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাহাকে যথেষ্ট ধন-জন দান করিয়া ছিলেন। ঐ ব্যক্তির মৃত্যু যখন নিকটবর্ত্তী তখন সে তাহার পুত্রগণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে তোমরা পিতারূপে কেমন মনে কর? তাহারা বলিল, অতি উত্তম! সে বলিল, তোমাদের এই পিতা আল্লার দরবারে ভাল পরিগণিত কোন কাজই করে নাই। অতএব সে আল্লার দরবারে পৌঁছিলে আল্লাহ তাহাকে অবশ্যই আজাব দিবেন। সুতরাং আমার মৃত্যুর পর আমার দেহকে আগুনে পোড়াইবে, আগুনে পুড়িয়া অঙ্গার হইয়া গেলে পর উহাকে পেষণ করিবে। তারপর প্রবল ঝড়ের দিন উহাকে (অর্দ্ধাংশ সমুদ্র এলাকায় এবং অর্দ্ধাংশ স্থল এলালায় ↑) বাতাসে উড়াইয়া দিবে। খোদার কসম—সে তাহার পুত্রদের হইতে খুব পাকা-পোক্তা রূপে এই অঙ্গীকার নিয়া নিল। পুত্রগণ অঙ্গীকার অনুযায়ী কাজ করিল এবং তাহাকে ঐরূপে ঝড়োয়া বাতাসে উড়াইয়া দিল।

(আল্লাহ তায়ালা সমুদ্রকে আদেশ করিলেন, ঐ ব্যক্তির সমুদয় অংশকে একত্রিত করিয়া দেওয়ার এবং স্থলভাগকেও আদেশ করিলেন; ↑) অতঃপর আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ আসিল, "হইয়া যাও" তৎক্ষণাৎ ঐ ব্যক্তি জীবিত হইয়া দাঁড়াইল।

আল্লাহ তায়ালা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আমার বান্দা! তুমি ঐরূপ করিয়াছিলে কেন? সে উত্তর করিল, (আপনি ত সব কিছুই জানেন;) আমি একমাত্র আপনার ভয়ে ভীত হইয়া ঐরূপ করিয়া ছিলাম। আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে এই ব্যবস্থাই গ্রহণ করিয়াছেন যে, তাহার প্রতি রহমত ও দয়া করিয়াছেন (এবং তাহাকে ক্ষমা করিয়াছেন ↑ ।)

● আল্লাহ তায়ালার ভয় অন্তরে উপস্থিত করায় চোখের অশ্রু বহিলে উহার মর্ত্তবা অনেক বেশী। প্রথম খণ্ডে ৪০০নং হাদীছে উল্লেখ আছে, যে ব্যক্তি নির্জ্জনে আল্লাহকে স্মরণ করিয়া অশ্রু বহাইয়াছে সে কেয়ামত দিবসে কঠিন হাশর মাঠে আল্লার রহমতের ছায়া লাভ করিবে।

উম্মতের প্রতি হযরতের দরদ

২৪৫১। হাদীছ— عن ابى موسى رضى الله تعالى عنه قال

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلِىْ وَمَثَلُ مَا بَعَثَنِىَ اللّٰهُ كَمَثَلِ

↑ ↑ ↑ তিনটি বন্ধনীর বিষয় বস্তু ১১১৭ পৃষ্ঠার রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে।

رَجُلٍ أَتَى قَوْمًا فَقَالَ رَأَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنَيَّ وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ فَالنَّجَاءَ فَالنَّجَاءَ فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ فَأَدْلَجُوا عَلَى مَهْلِهِمْ فَنَجَوْا وَكَذَّبَتْهُ طَائِفَةٌ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَاجْتَاحَهُمْ كَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ

অর্থ—আবু মূছা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, (মহাসংবাদ তথা কেয়ামতের সংবাদ এবং তথায় আল্লার আজাব হইতে পরিত্রাণ দানকারী দ্বীন লইয়া মানব সমক্ষে ঝাপাইয়া পড়ার দৃশ্যে) আমার এবং আল্লাহ-প্রদত্ত দ্বীনের দৃষ্টান্ত এরূপ—এক ব্যক্তি স্বীয় জাতির নিকট দৌড়িয়া আসিয়া সংবাদ প্রদান করিল যে, শত্রু বাহিনী আমাদের প্রতি ধাওয়া করিয়াছে—আমি নিজ চোখে দেখিয়া আসিলাম; আমি তোমাদের জন্য আসন্ন বিপদের চরম সতর্ককারী; তোমরা বাঁচিবার জন্য অতি তাড়াতাড়ি যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন কর। ঐ ব্যক্তির সতর্কবাণী ও তাহার পরামর্শ অনুসরণ করিয়া এক দল লোক ব্যতিব্যস্ততা ও তাড়াহুড়া ব্যতিরেকে—সময় থাকিতে রাত্রির অন্ধকারেই সুরক্ষিত আশ্রয়স্থলে চলিয়া গিয়াছে, ফলে তাহারা শত্রুর হাত হইতে সম্পূর্ণ রক্ষা পাইয়াছে। অপর এক দল লোক তাহারা সতর্ককারীকে মিথ্যাবাদী গণ্য করিয়াছে, তাহার কথায় কর্ণপাত করে নাই এবং নিজ স্থানেই রহিয়া গিয়াছে; ফলে ভোর হইতে না হইতেই তাহারা শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং শত্রু বাহিনী তাহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে।

যাহারা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়াছে এবং আমার আনিত জীবন-ব্যবস্থার অনুসরণ করিয়াছে, আর যাহারা আমার বিরোধিতা করিয়াছে এবং আমার আনিত সত্য দ্বীনকে মিথ্যা বলিয়াছে—উভয় দলের অবস্থা উল্লেখিত দুই শ্রেণীর লোকদের অবস্থানুরূপ।

ব্যাখ্যা :—হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বিশ্ব-মানবের জন্য পর-জীবনের আসন্ন আজাব—কবরের আজাব, দোযখের আজাব হইতে সতর্ককারী এবং উহা হইতে রক্ষা পাইবার ব্যবস্থা দ্বীন-ইসলামের প্রতি আহ্বানকারী। যাহারা তাঁহার সতর্কবাণী ও আহ্বানের অনুসরণ করিবে এবং ইহ-জীবন থাকিতেই রক্ষা ব্যবস্থা তথা দ্বীন-ইসলাম অবলম্বন করিবে তাহারা আজাব হইতে সম্পূর্ণ রক্ষা পাইয়া যাইবে। পক্ষান্তরে যাহারা তাঁহাকে মিথ্যাবাদী গণ্য করিয়াছে, তাঁহার আহ্বানে

কর্ণপাত করে নাই; পর-জীবনের প্রভাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা অনন্ত আজাবে পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িবে।

২৪৫২। হাদীছঃ— ابو هريرة رضى الله تعالى عنه انه

سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما مثلى ومثل الناس

كمثل رجل استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه

الدواب التى تقع فى النار يقعن فيها وجعل ينزعهن ويغلبنه

فيقتحمن فيها فانا اخذ بحجزكم عن النار وانتم تقحمون فيها

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি হযরত রসুলল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছেন, মানব জাতির প্রতি আমার যেরূপ দরদ তাহার দৃষ্টান্ত এই—এক ব্যক্তি অগ্নি প্রজ্জলিত করিয়াছে, আগুনের আলো যখন চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে তখন ফরিং ও বিভিন্ন পোকা যেগুলি অগ্নি-আলোর মাতোয়ালা ঐ আগুনে ঝাপাইয়া পড়িতে লাগিল। আর ঐ ব্যক্তি ফরিং ও পোকাগুলিকে থামাইতে চেষ্টা করে, কিন্তু সে ব্যর্থ হয় এবং ঐগুলি আগুনে পড়িতে থাকে।

(হযরত (দঃ) বলেন, হে মানব! তোমাদের ও আমার অবস্থাও তদ্রূপই—) আমি তোমাদের কোমর জড়াইয়া ধরি; তোমরা যেন দোযখে পতিত না হও, কিন্তু তোমরা বলপূর্ব্বক ছুটিয়া যাইয়া দোযখে পতিত হইতে থাক।

অর্থাৎ যেই কার্য্যাবলীর দরুণ দোযখে যাইতে হয় ঐরূপ কার্য্যাবলী হইতে বিরত থাকার জন্য আমি তোমাদিগকে সর্ব্বদা বুঝাইতে থাকি, কিন্তু তোমরা বিরত থাক না—আমার কথা উপেক্ষা করিয়া তোমরা ঐ সব কাজে লিপ্ত হও।

মানুষের সম্মুখে ভয়ঙ্কর অবস্থা আগত

২৪৫৩। হাদীছঃ— ان ابا هريرة رضى الله تعالى عنه يقول

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما اعلم لضحكتم

قليلا ولبكيتم كثيرا

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়া থাকিতেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, (মানুষের সম্মুখে মৃত্যুর পর যে ভয়ঙ্কর অবস্থা আগত

তাহা সম্পর্কে) আমি যাহা জানি তাহা যদি তোমরা জানিতে, তবে খোদার কসম — তোমরা হাসিতে কম, কাঁদিতে বেশী।

২৪৫৪। **হাদীছ ঃ** — আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ভাষণ দিলেন—তাঁহার সেই ভাষণের ন্যায় ভাষণ আর কখনও শুনি নাই। হযরত (দঃ) সেই ভাষণে বলিয়া ছিলেন, আমি যাহা জানি যদি তোমরা তাহা জানিতে, তবে খোদার কসম—তোমরা হাসিতে কম কাঁদিতে বেশী।

আনাছ (রাঃ) বলেন, এতচ্ছ্রবণে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবীগণ নিজ নিজ মুখমণ্ডল কাপড়ের আড়ালে নিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

দোযখে যাওয়ার কাজগুলি অতিশয় লোভনীয়

২৪৫৫। **হাদীছ ঃ**— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ

وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, দোযখকে ঘিরিয়া রাখা হইয়াছে চিত্তাকর্ষক কার্য্যাবলীর দ্বারা এবং বেহেশতকে ঘিরিয়া রাখা হইয়াছে রুচি বিহীন কার্য্যাবলীর দ্বারা।

অর্থাৎ যে সব কাজ করিলে দোযখে যাইতে হয় সেই সব কাজ শয়তান ও নফ্‌ছ তথা প্রবৃত্তির প্ররোচনায় সাধারণতঃ সুরোচক ও চিত্তাকর্ষক হইয়া থাকে। কিন্তু সেই বিকৃত রুচি ও নকল আকর্ষণ ত্যাগী হইতে পারিলেই দোযখ হইতে বাঁচা সম্ভব হইবে। পক্ষান্তরে বেহেশত লাভের জন্য যে সব আমলের আবশ্যক সেইগুলি নফ্‌ছ ও মানব-প্রবৃত্তির নিকট তিক্ত বোধ হইয়া থাকে। অবশ্য নফ্‌ছ ও শয়তানের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া রুহ বা আত্মাকে নফ্‌ছের উপর প্রবল ও প্রধান বানাইয়া নিতে পারিলে তখন সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই বিপরীত হইয়া যায়; মানবের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য তাহাই কাম্য।

বেহেশত-দোযখ মানুষের অতি নিকটে

২৪৫৬। **হাদীছ ঃ**— عن عبد الله رضى الله تعالى عنه

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْجَنَّةُ اَقْرَبُ اِلٰى اَحَدِكُمْ مِنْ

شِرَاكِ نَعْلِهِ وَالنَّارُ مِثْلُ ذٰلِكَ

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, পাদুকার ফিতা পায়ের যত নিকটবর্ত্তী প্রত্যেক মোসলমানের জন্য বেহেশত ততোধিক নিকটবর্ত্তী এবং দোযখও তদ্রূপই।

অর্থাৎ বেহেশত এবং দোযখ উভয়টিই মানুষের অতি নিকটবর্ত্তী তথা মানুষেরই আমলের ফলাফল।

জাগতিক ব্যাপারে নিজ হইতে নিকৃষ্টের প্রতি নজর করা চাই

২৪৫৭। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا نَظَرَ اَحَدُكُمْ اِلٰى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِى الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ اِلٰى مَنْ هُوَ اَسْفَلَ مِنْهُ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের কাহারও যদি নিজের অপেক্ষা অধিক ধন-সম্পদের অধিকারী বা উন্নত দেহের অধিকারীর প্রতি দৃষ্টিপাত হয়, তবে সঙ্গে সঙ্গে নিম্ন স্তরের মানুষের প্রতি দৃষ্টি করিবে।

নেক বা বদের ইচ্ছা উদিত হইলে?

২৪৫৮। হাদীছ ঃ— عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا يَرْوِىْ عَنْ رَبِّهٖ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّاٰتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذٰلِكَ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ لَهٗ عِنْدَهٗ حَسَنَةً كَامِلَةً فَاِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ لَهٗ عِنْدَهٗ عَشْرَ حَسَنَاتٍ اِلٰى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ اِلٰى اَضْعَافٍ كَثِيْرَةٍ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ لَهٗ عِنْدَهٗ حَسَنَةً كَامِلَةً فَاِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ لَهٗ سَيِّئَةً وَاحِدَةً

অর্থ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আল্লাহ তায়ালা হইতে হাদীছ-কুদ্‌সীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা নেক ও বদের ফিরিস্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন; অতঃপর (শরীয়তের মাধ্যমে) উহা বর্ণনাও করিয়া দিয়াছেন। এখন কোন ব্যক্তি কোন নেক কাজের ইচ্ছা করিয়া উহা কার্য্যে পরিণত করিতে না পারিলেও আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য একটি নেক আমলের ছওয়াব লিখিয়া দেন। আর যদি নেক কাজের ইচ্ছা করিয়া উহাকে কার্য্যেও পরিণত করে তবে আল্লাহ তায়ালা নিজ দরবারে তাহার জন্য ঐ একটি নেক আমলের ছওয়াব দশ হইতে সাত শত গুণ, বরং আরও অনেক অধিক গুণ পর্য্যন্ত লিখিয়া রাখেন।

পক্ষান্তরে কেহ কোন গোনাহের কাজের ইচ্ছা করিয়া উহা কার্য্যে পরিণত না করিলে তাহার জন্য পূর্ণ একটি নেক আমলের ছওয়াব লিখিয়া রাখেন। আর যদি ইচ্ছা করিয়া উহা কার্য্যেও পরিণত করে তবে আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য মাত্র একটি গোনাহ লিখিয়া রাখেন।

ছোট ছোট গোনাহ হইতেও বাঁচিতে হইবে

২৪৫৯। হাদীছঃ—আনাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা এক শ্রেণীর গোনাহের কার্য্য করিয়া থাক—যেগুলি তোমাদের দৃষ্টিতে চুল অপেক্ষা অধিক সূক্ষ্ম দেখায়, কিন্তু হযরত নবী রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জমানায় আমরা ঐ শ্রেণীর গোনাহকেও মানুষের পক্ষে ধংসকারী গণ্য করিতাম। (এবং সেই দৃষ্টিতেই উহা হইতে বিরত থাকিতাম।)

নেক আমলের ছওয়াব ভোগ করা শেষ অবস্থার উপর নির্ভরশীল, অতএব শেষ অবস্থা সম্পর্কে শঙ্কিত ও সতর্ক থাকা চাই

অর্থাৎ কেহ সারা জীবন বহু নেক কাজ করিয়া শেষ জীবনে এমন কোন গোনাহ করিল যাহাতে সমস্ত নেক আমল বিনষ্ট হইয়া গেল ঐ ব্যক্তি তাহার নেক আমলের ফল ভোগ হইতে বঞ্চিত হইয়া যাইবে।

তৃতীয় খণ্ডে ১৩৩৮ নং হাদীছে এক ব্যক্তির ঘটনা বর্ণিত আছে। সে জেহাদের মধ্যে অনেক বিরত্বের কাজ করিয়াও উহার ফল ভোগ হইতে বঞ্চিত হইল তাহার শেষ অবস্থা এই হইল যে, আত্মহত্যায় তাহার মৃত্যু হইল। সেই পরিপ্রেক্ষিতে নবী (দঃ) তাহাকে দোযখী বলিয়া প্রচার করিয়া দিলেন।

অতএব মানুষকে জীবনের শেষ অবস্থার জন্য শঙ্কিত ও সতর্ক থাকিতে হইবে।

অসৎ লোকের সঙ্গ অপেক্ষা একা থাকা উত্তম

প্রথম খণ্ডে ১৮নং হাদীছে উল্লেখ আছে যে, দ্বীন রক্ষার্থে লোক-জনের সংসর্গ ত্যাগ করিয়া পাহাড়-পর্ব্বতে নির্জ্জন বাস অবলম্বন করা উত্তম।

লোকদেরকে দেখাইবার উদ্দেশ্যে কাজ করা

২৪৬০। হাদীছ ঃ—জুন্দুব (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (দঃ) বলিয়াছেন—

مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللّٰهُ بِهٖ وَمَنْ يُرَائِيْ يُرَائِي اللّٰهُ بِهٖ

"যে ব্যক্তি প্রসিদ্ধি ও সুখ্যাতি লাভের উদ্দেশ্যে কাজ করিবে আল্লাহ তায়ালা (উহার পরিণামে দুনিয়াতে বা আখেরাতে) তাহার কুখ্যাতি ছড়াইয়া তাহাকে লাঞ্ছিত করিবেন। আর যে ব্যক্তি লোক-দেখানো উদ্দেশ্যে কাজ করিবে আল্লাহ তায়ালা (উহার পরিণামে দুনিয়াতে বা আখেরাতে) তাহার সেই দোষ লোকদের সম্মুখে প্রকাশ করিয়া তাহাকে লাঞ্ছিত করিবেন।"

যে ব্যক্তি সাধনা করিয়া নিজেকে আল্লার গোলামীতে নিয়োজিত রাখিবে

২৪৬১। হাদীছ ঃ—মোয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সাথে একই উটে আরোহিত ছিলাম। আমি তাঁহার পেছনেই ছিলাম; উভয়ের মধ্যে হাওদার খুঁটা ভিন্ন আর কোন কিছুই ছিল না। হযরত (দঃ) আমাকে "হে মোয়াজ" বলিয়া ডাকিলেন। আমি বলিলাম, হাজির আছি—ইয়া রসুলুল্লাহ এবং তাবেদারীর জন্য প্রস্তুত আছি। কিছু সময় চলার পর হযরত (দঃ) পুনরায় ডাকিলেন; আমিও ঐরূপ উত্তর দিলাম। আবার কিছু সময় চলিলেন এবং তৃতীয় বার আমাকে ডাকিলেন এবং আমি ঐ উত্তরই দিলাম। (এইভাবে তিনবার আমার মনোযোগকে আকৃষ্ট করিয়া) অতঃপর বলিলেন, তুমি কি জান, আল্লার হক্ বা দাবী তাঁহার বন্দাদের উপর কি? আমি আরজ করিলাম, আল্লাহ এবং আল্লার রসুলই তাহা ভালরূপে জানেন।

হযরত (দঃ) বলিলেন, আল্লার হক্ তাঁহার বন্দাদের উপর এই যে, তাহারা একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই গোলামী করিবে; তাঁহার সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক করিবে না। (অর্থাৎ এক আল্লাহ ভিন্ন অন্য কিছুরই গোলামী করিবে না।)

আবার কিছু সময় চলিলেন এবং পুনরায় আমাকে ডাকিলেন—হে মোয়াজ! আমি বলিলাম, উপস্থিত আছি—ইয়া রসুলুল্লাহ! এবং তাবেদারীর জন্য প্রস্তুত আছি। এইবার বলিলেন, বন্দাগণ যদি উক্ত দাবী পূরণ করে তবে আল্লার উপর

বন্দাদের দাবী কি ? আমি বলিলাম, আল্লাহ এবং আল্লার রসুলই তাহা ভালরূপে জানেন। হযরত (দঃ) বলিলেন, আল্লার উপর বন্দাদের হক্ এই হইবে যে, তিনি তাহাদিগকে আজাব দিবেন না। (আল্লাহ তায়ালা নিজ দয়ায় উহাকে নিজের উপর বন্দাদের দাবীরূপে সাব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছেন।)

ঔদ্ধত্য পরিহার করিয়া চলিবে

২৪৬২। ছাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জন্য আরোহণের একটি উট ছিল—উহার নাম ছিল "আজ্বা"। উটটি সর্ব্বদাই সর্ব্বাগ্রে থাকিত ; একদা এক বেদুইন একটি উটে চড়িয়া আসিতে ছিল, হযরতের আজ্বা উট সেই উটটির পেছনে পড়িয়া গেল। তাহাতে মোসলমানগণ অসন্তুষ্ট হইল এবং বিস্ময়ের সহিত বলিতে লাগিল, আজ্বা উট পেছনে পড়িয়া গেল! সেই উপলক্ষে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহ তায়ালার নিয়ম এই যে, তিনি কোন জিনিষকে ঔদ্ধত্যের পর্য্যায়ে উঠিবার সুযোগ দিলে তাহাকে পতিত করিয়া থাকেন। (সুতরাং নিজে নিজেই ছোট তথা বিনয়ী হইয়া থাকা ভাল। তাহাতে আল্লার দয়ার দৃষ্টিই হইতে থাকিবে।)

আল্লাহকে ভালবাসিবার পরিচয়

২৪৬৩। ছাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ قَالَ مَنْ عَادٰى لِىْ

وَلِيًّا فَقَدْ اٰذَنْتُهٗ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ اِلَىَّ عَبْدِىْ بِشَيْءٍ اَحَبَّ اِلَىَّ مِمَّا

افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَيَزَالُ عَبْدِىْ يَتَقَرَّبُ اِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتّٰى اَحْبَبْتُهٗ

فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِىْ يَسْمَعُ بِهٖ وَبَصَرَهُ الَّذِىْ يُبْصِرُ بِهٖ وَيَدَهُ الَّتِىْ

يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِىْ يَمْشِىْ بِهَا وَاِنْ سَأَلَنِىْ لَاُعْطِيَنَّهٗ وَلَئِنِ

اسْتَعَاذَنِىْ لَاُعِيْذَنَّهٗ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ اَنَا فَاعِلُهٗ تَرَدُّدِىْ عَنْ

نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَاَنَا اَكْرَهُ مَسَاءَتَهٗ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বর্ণনা করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, যে কোন ব্যক্তি আমার কোন ওলীর সঙ্গে শত্রুতা বাধায় তাহার বিরুদ্ধে আমার পক্ষ হইতে যুদ্ধের ঘোষণা রহিয়াছে।

আর আমার বন্দার জন্য আমার নৈকট্য লাভ করিতে সর্ব্বাধিক প্রিয় ও পছন্দিত বস্তু উহাই যাহা আমি তাহার উপর ফরজ করিয়া দিয়াছি। এবং আমার বন্দা বিভিন্ন নফল এবাদতের দ্বারা আমার নৈকট্য লাভে উন্নতি করিয়া যাইতে পারে। এমনকি সে আমার প্রিয় পাত্র হইয়া যায়; ফলে আমি তাহার কান হইয়া যাই যদ্দারা সে শ্রবণ করে। তাহার চক্ষু হইয়া যাই যদ্দারা সে দেখে। তাহার হাত হইয়া যাই যদ্দারা সে ধরিয়া থাকে। তাহার পা হইয়া যাই যদ্দারা সে চলিয়া থাকে এবং সে আমার নিকট কিছু চাহিলে অবশ্যই আমি তাহাকে উহা দিয়া থাকি। আমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিলে আমি তাহাকে আশ্রয় দেই।

আর একটি কথা এই যে, আমি কোন কাজ করিতে ইতঃস্তত করি না যেরূপ ইতঃস্তত মোমেনের রুহ—জান কবজ করিতে করিয়া থাকি। এস্থলে ইতঃস্ততের কারণ এই যে,। মোমেন (স্বাভাবিকরূপে) মৃত্যুকে তিক্ত বোধ করে এবং তাহার তিক্ততার কাজকে আমি অপ্রিয় গণ্য করিয়া থাকি।

ব্যাখ্যা ঃ— শরীয়ত কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত ফরজ-ওয়াজেব পূর্ণরূপে আদায় করা ব্যতীত অন্য কোন উপাই নাই যদ্দরা মানুষ আল্লার নৈকট্য লাভ করিতে পারে—ইহা আল্লার ঘোষণা। হাঁ—ফরজ-ওয়াজেব আদায় করার সঙ্গে নফল এবাদৎ করিলে তদ্দারা নৈকট্য লাভে অধিক উন্নতি হয়। এমনকি বন্দা আল্লাহ তায়ালার ভালবাসার পাত্র ও প্রিয়পাত্র হওয়ার মর্ত্তবা লাভ করিতে পারে।

আল্লাহ তায়ালার ভালবাসার পাত্র ও প্রিয়পাত্র হওয়ার পরিচয় ও প্রতিক্রিয়া এই যে, সেই মর্ত্তবায় পৌঁছিলে মানুষের নিজ সত্তা আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টিতে বিলীন হইয়া যায়—তাহার সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ব্যবহার আল্লার সন্তুষ্টির কাজে নিবদ্ধ হইয়া যায়। তাহার নিজস্ব সন্তুষ্টির কাজে কোনটিই ব্যবহৃত হয় না; হাঁ—এই অর্থে তাহার সন্তুষ্টির কাজেও ব্যবহৃত হয় যে, সে তাহার সন্তুষ্টির সবটুকুই আল্লার সন্তুষ্টিতে বিলীন করিয়া দিয়াছে। ফলে, সে তাহার চক্ষু দ্বারা ঐ জিনিষকেই দেখে যাহা দেখিলে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন, যাহা দেখিলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হইবেন উহার দিকে সে তাহার চক্ষুকে ব্যবহারই করে না—একমাত্র আল্লার সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টিই তাহার চক্ষুর পরিচালক। এই বিষয়টিকেই আলোচ্য হাদীছে আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন যে, আমি তাহার চক্ষু হইয়া যাই। তাহার প্রতিটি অঙ্গ ও শক্তিই ঐরূপ হইয়া যায়।

বন্দা যখন ঐরূপে আল্লাহতে বিলীন হইয়া যায় তখন আল্লাহও তাহার প্রতিটি আব্‌দারই রক্ষা করেন—যাহা চায় তাহা দেন, যাহা হইতে আশ্রয় চায় তাহা হইতে আশ্রয় দেন।

● মোমেনের রুহ কবজ করিতে আল্লার ইতঃস্তত করার অর্থ—

মানুষ তাহার শত্রু বা বিদ্রোহীকে ঘায়েল করিতে যাইয়া তাহাকে বিনা দ্বিধায় ঘায়েল করিয়া থাকে। কিন্তু যদি নিজের প্রিয়পাত্র আদর-স্নেহের পাত্রকে কোন কারণে ঘায়েল করার আবশ্যক হয় যেমন তাহার দেহে অস্ত্রোপাচার আবশ্যক হয় বা তাহাকে খাত্‌না করিতে হয় তখন তাহার দ্বিধা বোধ ও ইতঃস্ততের সীমা থাকে না। অবশ্য এই দ্বিধা বোধ ও ইতঃস্ততার অর্থ এই হয় না যে, অস্ত্রোপাচার বা খাত্‌নার কাজ বন্ধ রাখা হয়। কাজ ত নিশ্চয়ই করা হয়, কিন্তু চতুর্দিক দিয়া এরূপ ব্যবস্থা করা হয় যাহাতে ঐ প্রিয়পাত্রের কষ্ট কম হয়, ব্যথা কম হয়, অশান্তি কম হয়, যতটুকুও হয় উহারও চিহ্ন মুছিয়া ফেলার সর্ব্বাত্মক চেষ্টা করা হয়। মোমেনের রুহ কবজ করা কালে মোমেনের শান্তির জন্য আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে উহা অপেক্ষা লক্ষগুণ অধিক চেষ্টা ও ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়া থাকে, যাহার বিস্তারিত বিবরণ হাদীছে বর্ণিত আছে। মোমেনের রূহ কবজ করার জন্য ফেরেশতা দলকে বিশেষ আনন্দদায়ক ও আকর্ষণীয় আকৃতি ও সাজ-সজ্জায় পাঠান হইয়া থাকে। ফেরেশতাগণ আসিয়া মোমেনের রুহকে বিশেষ সমাদর সম্ভাষনের সহিত আহ্বান করিয়া থাকেন। সর্ব্বোপরি কথা এই যে, মোমেনের চিরআকাঙ্খিত বেহেশত তাহাকে ঐ সময় খোলা চোখে দেখান হইয়া থাকে—সে বেহেশতের নেয়ামত সমূহ অবলোকন করিতে থাকে, তাহার জন্য সৃষ্ট হুরগণের আহ্বান পাইতে থাকে। এই ধরণের বহু আনন্দ উৎফল্লের ব্যবস্থা সমূহের মধ্যে মোমেনের রুহ কবজ করা হয়। ফলে তাঁহার রুহ এত সহজে বাহির হইয়া আসে যেমন পানি ভরা মশকের মুখের বন্ধন খুলিয়া দিলে উহা হইতে পানি বহিয়া পড়ে এবং শুধুমাত্র মামুলী আঘাতের ন্যায় অতি সামান্য ও মুহূর্ত্তের কষ্ট অনুভব হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে কাফেরের রুহ কবজ করার অবস্থা উহার সম্পূর্ণ বিপরীত যাহার বিবরণ দানেও শরীর শিহরিয়া উঠে।

মোমেনের রুহ কবজ করিতে তাহার আরামের এবং তাহার কষ্ট যাতনা লাঘবের সুব্যবস্থা করা হইয়া থাকে—ইহাই উল্লেখিত তথ্যের তাৎপর্য্য। যেরূপ আদরের ছেলেকে খাত্‌না করাইবার সময় স্নেহশীল পিতা খুবই ইতঃস্তত করিয়া থাকেন। যার ফলে পিতা ছেলের পক্ষে আবশ্যকীয় খাত্‌না ত করান, কিন্তু তাহার আরাম ও কষ্ট-যাতনা লাঘবের বহুবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া থাকেন।

কেয়ামত নিকটবর্ত্তী

২৪৬৪। হাদীছ ঃ— عن سهل رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةُ هٰكَذَا

وَيُشِيْرُ بِاِصْبَعَيْهِ فَيَمُدُّهُمَا

অর্থ—সাহ্‌ল (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার আবির্ভাব ও কেয়ামত উভয়টির ব্যবধান শুধুমাত্র এই দুইটি আঙ্গুলের ব্যবধান স্বরূপ—মধ্যাঙ্গুল ও শাহাদতের আঙ্গুল।

অর্থাৎ মধ্যাঙ্গুল্যের সামান্য একটু পেছনেই রহিয়াছে শাহাদতের আঙ্গুল তদ্রূপ আমার আবির্ভাবের সামান্য পরেই কেয়ামতের অনুষ্ঠান হইবে।

এস্থলে ইমাম বোখারী (রঃ) উল্লেখিত বিষয়-বস্তুর অবিকল এইরূপ হাদীছ আনাছ (রাঃ) এবং আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতেও বর্ণনা করিয়াছেন।

২৪৬৫। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, কোন কোন সময় শিক্ষা-দীক্ষাহীন গ্রাম্য ব্যক্তিগণ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিত এবং জিজ্ঞাসা করিত, কেয়ামত কবে কায়েম হইবে? এরূপ প্রশ্নের উত্তরে হযরত (দঃ) কোন একটি বালককে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন, এই বালক বাঁচিয়া থাকিলে তাহার বৃদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই তোমাদের কেয়ামত কায়েম হইয়া যাইবে।

ব্যাখ্যা ঃ—প্রত্যেকের মৃত্যুই তাহার পক্ষে কেয়ামতের আরম্ভ। কারণ, তখন হইতেই পরকালের অনুষ্ঠানাদি আরম্ভ হইয়া যায়, তাই হযরত (দঃ) প্রশ্নকারীদের বয়সের তুলনায় অতি কম বয়সের বালকের প্রতি ইশারা করিয়া বলিতেন, এই বালকের বৃদ্ধ হওয়ার পূর্ব্বেই তোমার শ্রেণীর লোকদের কেয়ামত আসিয়া যাইবে। অর্থাৎ মৃত্যু আসিয়া যাইবে যাহা তোমাদের পক্ষে কেয়ামতের প্রথম পদক্ষেপ।

কেয়ামতের পূর্ব্বে অস্তের দিক হইতে সূর্য্যের উদয়

২৪৬৬। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَطْلُعَ

الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَاِذَا طَلَعَتْ وَرَاٰهَا النَّاسُ اٰمَنُوْا اَجْمَعُوْنَ فَذٰلِكَ

حِيْنَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِىْ

اِيْمَانِهَا خَيْرًا وَلَتَقُوْمَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا

فَلَا يَتَبَايَعَانِهٖ وَلَا يَطْوِيَانِهٖ وَلَتَقُوْمَنَّ السَّاعَةُ وَقَدِ انْصَرَفَ الرَّجُلُ

بِلَبَنِ لِقْحَتِهٖ فَلَا يَطْعَمُهٗ وَلَتَقُوْمَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يُلِيْطُ حَوْضَهٗ فَلَا يَسْقِىْ

فِيْهِ وَلَتَقُوْمَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ اُكْلَتَهٗ اِلٰى فِيْهِ فَلَا يَطْعَمُهَا

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামত কায়েম হইবে না যাবৎ না সূর্য্য তাহার অস্তের দিক হইতে উদিত হয়। যখন তাহা সংঘটিত হইবে এবং সকল লোকই তাহা অবলোকন করিবে তখন সারা বিশ্ববাসীই ঈমান গ্রহণ করিয়া নিবে। কিন্তু ঐ সময়টি সেই সময় যে (সময় সম্পর্কে পবিত্র কোরআনেই ঘোষণা বিদ্যমান রহিয়াছে যে, এই) সময়ের পূর্ব্বের ঈমানহীনগণের পক্ষে তখনকার ঈমান কোন ফলদায়ক হইবে না। এবং এই সময়ের পূর্ব্বেকার তওবাহীনের পক্ষে তখনকার তওবা কোন ফলদায়ক হইবে না।

কেয়ামত নিশ্চয় কায়েম হইবে এবং এমন দ্রুত ও আকস্মিকরূপে কায়েম হইবে যে, হয় ত ক্রেতা ও বিক্রেতা—দুইজন লোক একখানা কাপড় খুলিয়া লইয়াছে—তাহাদের বিক্রি সম্পন্ন করার বা কাপড় খানা পুনঃ ভাজ করিবারও অবকাশ পাইবে না, ইতিমধ্যেই কেয়ামতের শিঙ্গা বাজিয়া উঠিবে।

আরও শুন! কোন ব্যক্তি স্বীয় গাভীর দুগ্ধ দোহাইয়া লইয়াছে, উহা পান করিবার অবকাশ পাইবে না—ইতিমধ্যেই কেয়ামতের শিঙ্গা বাজিয়া উঠিবে। আরও শুন! কোন ব্যক্তি স্বীয় হাউজের প্ল্যাষ্টার করিয়াছে উহাকে ব্যবহার করার সুযোগ পাইবার পূর্ব্বেই কেয়ামতের শিঙ্গা বাজিয়া উঠিবে।

আরও শুন। এক ব্যক্তি স্বীয় লোক্‌মা মুখের নিকটে নিয়াছে উহা খাইবার সুযোগ পাওয়ার পূর্ব্বেই কেয়ামতের শিঙ্গা বাজিয়া উঠিবে।

নেক লোকের সংখ্যা হ্রাস পাইবে

২৪৩৭। হাদীছ:— ان عبد الله بن عمر رضى الله عنه قال

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّمَا النَّاسُ كَالْاِبِلِ

الْمِائَةِ لَا تَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً

অর্থ:—আবছুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি শুনিয়াছি, হযরত রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, একশত উটের মধ্যে বাহন উপযোগী একটি উটও পাওয়া যায় না (—মানুষের অবস্থাও তদ্রূপই শতের মধ্যে ভাল মানুষ একজন পাওয়াও তুষ্কর।)

আল্লার সঙ্গে মিলনকে যে ভালবাসে আল্লাহ তাহার মিলনকে ভালবাসেন

২৪৬৮। হাদীছ:— ওবাদাহ ইবনে ছামেৎ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহ আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন:—

مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ أَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ كَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ

"যাহার নিকট আল্লার মিলন প্রিয়, আল্লার নিকটও তাহার মিলন প্রিয়। পক্ষান্তরে যাহার নিকট আল্লার মিলন অপ্রিয় আল্লার নিকটও তাহার মিলন অপ্রিয়।

এতচ্ছ্রবণে আয়েশা (রাঃ) বা হযরতের অন্য কোন স্ত্রী প্রশ্ন করিলেন যে, আমাদের সকলেই ত মৃত্যুকে অপ্রিয় ভাবিয়া থাকে! (অর্থাৎ মৃত্যুর পরেই আল্লার সঙ্গে মিলন হয়, স্থতরাং মৃত্যুকে অপ্রিয় মনে করা আল্লার সঙ্গে মিলনকে অপ্রিয় মনে করারই শামিল, অথচ মৃত্যুকে আমাদের সকলেই অপ্রিয় গণ্য করিয়া থাকে।) তদুত্তরে রস্থলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন:—

لَيْسَ ذَاكِ وَلٰكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللّٰهِ وَكَرَامَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ وَأَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللّٰهِ وَعُقُوبَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ فَكَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ وَكَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ

"স্বাভাবিক ভাবে মৃত্যুকে অপ্রিয় মনে করা সূত্রে আল্লার মিলন অপ্রিয় সাব্যস্ত হওয়া এস্থলে ধর্তব্য নহে। এস্থলে যাহা উদ্দেশ্য তাহা এই যে—মোমেন ব্যক্তির যখন মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন তাহাকে আল্লার সন্তুষ্টি ও আল্লার নিকট তাহার আদর-সমাদর, মান-মর্য্যাদার সুসংবাদ শুনান হইয়া থাকে, সেই মুহূর্তে তাহার

নিকট তাহার সম্মুখ জীবন অপেক্ষা কোন বস্তুই প্রিয় বলিয়া গণ্য হয় না। এবং তখন সে আল্লার সঙ্গে মিলনকেই মনে প্রাণে ভালবাসে, আল্লাহও তাহার মিলনকে ভাল বাসেন। পক্ষান্তরে কাফের ব্যক্তির যখন মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন তাহাকে আল্লার আজাব ও শাস্তির পরওয়ানা শুনাইয়া দেওয়া হয়, সেই সময় তাহার সম্মুখ জীবন তাহার নিকট সর্ব্বাধিক বিষ তুল্য অপছন্দনীয় গণ্য হয় এবং সে আল্লার সঙ্গে মিলনকে অপ্রিয় মনে করে আল্লার নিকটও তাহার মিলন অপ্রিয় গণ্য হয়।

২৪৬৯। **হাদীছ ঃ—** عن ابى موسى رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من احب لقاء الله احب الله لقائه ومن كره لقاء الله كره الله لقائه

অর্থ ঃ—আবু মূছা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লার সঙ্গে মিলনকে প্রিয় গণ্য করিবে আল্লাহও তাহার মিলনকে প্রিয় গণ্য করিবেন। পক্ষান্তরে বে ব্যক্তি আল্লার সঙ্গে মিলনকে অপ্রিয় গণ্য করিবে আল্লাহও তাহার মিলনকে অপ্রিয় গণ্য করিবেন।

মৃত্যুর পর ঃ

২৪৭০। **হাদীছ ঃ—**আবু কাতাদাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখ দিয়া একটি জানাজা যাইতে লাগিল। উহাকে লক্ষ্য করিয়া হযরত (দঃ) বলিলেন—

مستريح ومستراح منه

"সে নিজে শান্তি পাইয়াছে বা তাহার হইতে শান্তি লাভ হইয়াছে।"

ছাহাবীগণ এই বাক্যের তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করিলে হযরত (দঃ) বলিলেন, নেককার বন্দার মৃত্যু হইলে সে দুনিয়ার ক্লান্তি শ্রান্তি ও অবসাদ হইতে এবং দুনিয়ার দুঃখ-যাতনা হইতে মুক্তি লাভ করতঃ আল্লার রহমতের আশ্রয়ে যাইয়া শান্তি লাভ করে। পক্ষান্তরে বদকার ব্যক্তির মৃত্যু হইলে মানব-দানব, জল-স্থল, বট-বৃক্ষ, পশু-পক্ষী সবই তাহার উৎপীড়ন ও নির্য্যাতন হইতে রক্ষা পায়—শান্তি লাভ করে।

ব্যাখ্যা ঃ— বদকার মানুষ সাধারণতঃ সকলের জন্যই দুঃখের কারণ হইয়া থাকে, অন্ততঃ তাহার বদকারীর অশুভ প্রতিক্রিয়ায় অনাবৃষ্টি, দুর্য্যোগ দুর্ভোগ ইত্যাদির দ্বারা দুনিয়ার সকল সৃষ্ট জীবেরই অশান্তি ঘটিয়া থাকে।

২৭৭১। হাদীছঃ— انس بن مالك رضى الله تعالى عنه يقول

قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلٰثَةٌ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقٰى مَعَهٗ وَاحِدٌ يَتْبَعُهٗ اَهْلُهٗ وَمَالُهٗ وَعَمَلُهٗ فَيَرْجِعُ اَهْلُهٗ وَمَالُهٗ وَيَبْقٰى عَمَلُهٗ

অর্থ:—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, প্রত্যেক মানুষ মরিয়া যাওয়ার পর তাহার কবর পর্য্যন্ত তিন শ্রেণীর জিনিষ তাহার সঙ্গে যায়। তন্মধ্যে একটি জিনিষ তাহার চিরসঙ্গী হইয়া থাকে অপর দুই জিনিষ (তাহাকে দাফন করিয়া) ফিরিয়া আসে। তাহার সঙ্গে যায় তাহার আত্মীয়-স্বজন, তাহার কিছু মাল (যেমন—চাটি-পাটি ও চাঁদর ইত্যাদি লাশ বহনের ছামান) এবং তাহার আমল। অতঃপর তাহার আত্মীয়-স্বজন ও মাল তাহাকে রাখিয়া চলিয়া আসে, আর তাহার আমল তাহার চিরসঙ্গী হইয়া থাকে।

ইস্রাফীল ফেরেশতার শিঙ্গার ফুঁক

এক আল্লাহ ভিন্ন অন্য সব কিছুই সৃষ্ট, আল্লাহ তায়ালা ইহজগতে কোন জিনিষকেই স্থায়ী করিয়া সৃষ্টি করেন নাই—সব সৃষ্টিই অস্থায়ী, এই সবের বিলুপ্তি অবধারিত। এক সঙ্গে সব সৃষ্টি ফানা তথা বিলুপ্ত করিয়া দেওয়ার যে ব্যবস্থা রহিয়াছে উহাকেই বলে কেয়ামত বা মহাপ্রলয়।

কেয়ামতের প্রথম ধাপ হইল প্রলয় এবং উহারই দ্বিতীয় ধাপ হইল পুনরুত্থান। এই উভয়টিই একমাত্র আল্লাহ তায়ালার কুদরত ও তাঁহার আদেশে হইবে যাহা কোন মাধ্যম ব্যতিরেকেই সংঘটিত হইতে পারে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা স্বীয় স্বেচ্ছাধীন নিয়ম ও রীতি অনুযায়ী উক্ত দুইটি মহাকার্য্যের জন্যও একটি সাধারণ বাহ্যিক সূত্র ও মাধ্যম রাখিয়াছেন—সেইটি হইল ফেরেশতা ইস্রাফীল আলাই-হেচ্ছালামের শিঙ্গার ফুঁক।

অসংখ্য ফেরেশতাদের মধ্যে চার জন বিশিষ্ট ফেরেশতারই একজন হইলেন হযরত ইস্রাফীল (আঃ)। আল্লাহ তায়ালা শিঙ্গাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর ইস্রাফীল (আঃ)কে সৃষ্টি করিয়া ঐ শিঙ্গা তাঁহার হাওয়ালা করিয়াছেন। তিনি ঐ শিঙ্গা লইয়া সর্ব্বদা আল্লাহ তায়ালার আদেশের অপেক্ষায় রহিয়াছেন। প্রথমবার আল্লার আদেশে ঐ শিঙ্গায় ফুঁক দিলে মহাপ্রলয় আসিয়া যাইবে—আসমান-জমিন চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে, পাহাড়-পর্ব্বত ধুলিবৎ এবং তুলাবৎ হইয়া বিলীন

হইয়া যাইবে। সমস্ত জীব মরিয়া যাইবে। এমনকি মৃত্যুর ফেরেশতা স্বয়ং আজরাইল (আঃ)ও মরিয়া যাইবেন। শিঙ্গায় ফুঁকদাতা ফেরেশতা ইস্রাফীল (আঃ)ও মরিয়া যাইবেন এবং পূর্ব্বাপর সকল মৃতদের আত্মাগুলি অচেতন হইয়া পড়িবে। অতঃপর দীর্ঘকাল পরে আল্লাহ তায়ালা পুনরায় ইস্রাফীল (আঃ)কে জীবিত করিবেন এবং শিঙ্গা সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে দ্বিতীয়বার ফুঁক দিতে আদেশ করিবেন। এই ফুঁকের ফলে নূতন রূপে আছমান-জমিন সৃষ্ট হইয়া হাশরের মাঠ তৈরী হইবে এবং পূর্ব্বাপর সকল মৃত জীবিত হইয়া হাশরের মাঠের দিকে ধাবিত হইবে, তখন হইতেই মানুষকে অমর জীবন দান করা হইবে।

শিঙ্গা-ফুঁক সম্পর্কে ৬ষ্ঠ খণ্ড তফছীর অধ্যায়ে বিস্তারিত বিবরণের হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। তিরমিজী শরীফে একটি হাদীছ বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন—

كَيْفَ اَنْعَمُ وَصَاحِبُ الصُّوْرِ قَدِ الْتَقَمَ الْقَرْنَ وَاسْتَمَعَ الْاُذُنَ

مَتٰى يُؤْمَرُ بِالنَّفْخِ

"আমি আনন্দের জীবন কিরূপে যাপন করিতে পারি? অথচ শিঙ্গাওয়ালা শিঙ্গা মূখে লইয়া কান পাতিয়া ফুঁক মারার আদেশের অপেক্ষা করিতেছে।"

এতদ্ভিন্ন পবিত্র কোরআনের বহু আয়াতেও এই বিষয় বর্ণিত রহিয়াছে।

(১) فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ نَفْخَةٌ وَّاحِدَةٌ....... لَا يَاْكُلُهٗ اِلَّا الْخَاطِئُوْنَ

"যখন শিঙ্গায় একবার ফুঁক দেওয়া হইবে এবং (তদ্দ্বারা) সমগ্র ভূমণ্ডল ও পাহাড়-পর্ব্বতকে স্থিতিহীন করিয়া দেওয়ার ফলে ঐ সব চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে। ঐ দিন সেই মহা প্রলয়ের ঘটনা ঘটিয়া যাইবে—আকাশ ফাটিয়া উহা নষ্ট হইয়া যাইবে। ফেরেশতাগণ উহার কিনারায় থাকিবেন। প্রভু পরওয়ার-দেগারের আরশকে আট জন ফেরেশতা নিজেদের উপর বহন করিয়া রাখিবেন। ঐ দিন সকল মানবকে পরওয়ারদেগারের দরবারে উপস্থিত করা হইবে। কাহারও কোন বিষয় গোপন থাকিবে না। যাহার আমলনামা ডান হাতে আসিবে সে আনন্দের সহিত সকলকে তাহার আমলনামা পাঠ করিবার আহ্বান জানাইবে। এবং বলিবে, আমি ত পূর্ব্ব হইতেই হিসাবের সম্মুখীন হওয়ার বিশ্বাসী ছিলাম, ফলে সে শান্তির জীবন লাভ করিবে—বেহেশতে বাস করিবে। যাহার অসংখ্য ফল ফলাদি নিকটে নিকটে থাকিবে। তাহাকে বলিয়া দেওয়া হইবে, আমোদ-ফুর্তির পানাহার উপভোগ করিতে থাক—তোমার ঐ সব আমলের বদৌলতে যাহা তুমি পূর্ব্ব জেন্দেগীতে করিয়াছ।

পক্ষান্তরে যাহার আমলনামা বাম হাতে আসিবে সে অনুতপ্ত হইয়া বলিবে, আমার আমলনামা না পাইলেই ভাল হইত এবং আমার হিসাব না জানিলেই ভাল হইত ! কত ভাল হইত যদি আমার সেই মৃত্যুতেই আমার সমাপ্তি হইয়া যাইত ! আমার ধন-সম্পদ আমার কোনই কাজে আসিল না ! আমার ক্ষমতাও থাকিল না ! ফেরেশতাদিগকে তাহার সম্পর্কে আদেশ করা হইবে—ইহাকে পাকড়াও কর, গলায় ফাঁদ লাগাইয়া দাও এবং দোযখে প্রবেশ করাও। তারপর সত্তর গজ লম্বা এক শৃঙ্খলে তাহাকে বাঁধিয়া দাও। এই ব্যক্তি মহান আল্লার প্রতি ঈমান রাখিত না, গরীব-মিছকিদের খাওয়াইবার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করিত না। আজ এখানে কেহই তাহার বন্ধু হইবে না এবং তাহার কোন খাদ্য জুটিবে না দোযখীদের লহু-পুঁজ ইত্যাদি ব্যতিরেকে—যাহা একমাত্র গোনাহগারগণ ভক্ষণ করিয়া থাকিবে।”

(২) فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ ...... وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ

“শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হইলে পর পরস্পর আত্মীয়তা বিদ্যমান থাকিবে না। পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ থাকিবে না। যাহাদের নেকের পাল্লা ভারি হইবে তাহারাই সফলতা লাভ করিবে। পক্ষান্তরে যাহাদের সেই পাল্লা হালকা হইবে তাহারাই ঐ দল যাহারা নিজেদের ক্ষতি সাধন করিয়াছে। তাহারা চিরকাল দোযখে বাস করিবে—আগুন তাহাদের চেহারাকে জিহ্বা মারিতে থাকিবে ; তাহাতে তাহাদের মুখমণ্ডল বিকৃত হইয়া যাইবে। আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে তিরস্কার করিবেন তোমাদেরে কি আমার আয়াতসমূহ পাঠ করিয়া শুনান হইত না ? এবং তোমরা উহাকে মিথ্যা বলিয়া থাকিতে ! তাহারা বলিবে, হে প্রভু ! আমাদের বদ্‌বখ্‌তি ও দুর্ভাগ্য আমাদিগকে জড়াইয়া ধরিয়া ছিল এবং বাস্তবিকই আমরা ভ্রষ্টের দল ছিলাম। হে প্রভু ! আমাদিগকে এই দোযখ হইতে বাহির করিয়া (পুনঃ সুযোগ) দিন ; যদি আমরা পুনরায় ঐরূপ করি, তবে আমরা ক্ষমাহীন অপরাধী হইব।

আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে বলিবেন, লাঞ্ছিত হইয়া এই দোযখেই চিরকালের জন্য থাক। আমার নিকট কোন কথাই বলিবা না। আমার এক শ্রেণীর বন্দা আমাকে ডাকিয়া বলিত, প্রভু হে ! আমরা ঈমান আনিয়াছি ; আমাদেরকে ক্ষমা কর, আমাদেরকে দয়া কর ; তুমি সর্বোত্তম দয়ালু। তোমরা সেই বন্দাদের প্রতি উপহাস করিতে, বিদ্রূপ করিতে, সেই উপহাসে ও বিদ্রূপে মগ্ন থাকায় আমাকে স্মরণ করার সময় হইত না। আজ আমি সেই বন্দাদের ধৈর্য্যের ফল দান করিয়াছি—তাহারাই সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

আল্লাহ তায়ালা ঐ অপরাধীগণকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমরা দুনিয়াতে কত বৎসর বসবাস করিয়া ছিলে? তাহারা বলিবে মাত্র এক দিন বা এক দিনের কিছু অংশ—আমাদের ত পুর্ণ স্মরণ নাই; গণনাকারীগণকে জিজ্ঞাসা করুন। আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, (তোমাদের উত্তর অবাস্তব হইলেও) প্রকৃত প্রস্তাবে দুনিয়ার জিন্দেগী অল্প সময়েরই ছিল; কতই না ভাল হইত যদি তখন তোমরা এই বিষয়টি উপলব্ধি করিতে! তোমরা ত ধারণা করিয়া ছিলে, আমি তোমাদিগকে উদ্দেশ্যহীন সৃষ্টি করিয়া দিয়াছি এবং তোমাদেরকে আমার নিকট ফিরিয়া আসিতে হইবে না।"

(১৮ পারা—ছুরা মোনেনুন)

(৩) وَنُفِخَ فِى الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ........

"আর (প্রথমবার) শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হইবে, ফলে আসমানসমূহে এবং জমিনে যত জীব রহিয়াছে সবই অচেতন হইয়া পড়িবে (—জীবিতরা মরিয়া যাইবে, মৃতের আত্মা বেহুঁশ হইয়া থাকিবে) শুধুমাত্র তাহারা ব্যতীত যাহাদের সম্পর্কে আল্লার ইচ্ছা হয় (অচেতন না হওয়া। তাঁহারা হইলেন আরশ বহনকারী আট জন ফেরেশতা।)

তারপর (দীর্ঘকাল পরে দ্বিতীয়বার) শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হইবে, ফলে (সকলের চেতনা ও জীবন ফিরিয়া আসিবে এবং মৃতদের আত্মা ও দেহের সম্মিলন হইয়া) অকস্মাৎ সকলেই দাঁড়াইয়া পড়িবে এবং হতবাক হইয়া চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে থাকিবে। ভূমণ্ডল (পুনঃ অস্তিত্বে হাশরের ময়দান রূপ ধারণ করিয়া উহা) স্বীয় প্রভুর নূরে আলোকিত হইয়া উঠিবে। সকলের আমলনামা উপস্থিত রাখিয়া দেওয়া হইবে। পয়গাম্বরগণকে এবং সাক্ষীগণকে উপস্থিত করা হইবে এবং সকলের (আমল অনুসারে) ফয়ছালা করিয়া দেওয়া হইবে। কাহারও প্রতি কোন প্রকার অবিচার করা হইবে না। সকলকেই নিজ নিজ আমলের ফলাফল পূর্ণরূপে প্রদান করা হইবে। আল্লাহ তায়ালা সকলের আমল সম্পর্কে ভালরূপ জ্ঞাত আছেন। (ফয়ছালার মোটামুটি দৃশ্য এই হইবে—)

আল্লাহদ্রোহীগণকে শ্রেণী বিভক্ত রূপে জাহান্নামের প্রতি হাঁকাইয়া নেওয়া হইবে। যখন তাহারা জাহান্নামের নিকটে পৌঁছিবে তখন জাহান্নামের ফটক খোলা হইবে এবং জাহান্নামের প্রহরী ফেরেশতাগণ তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া বলিবেন, তোমাদের নিকট তোমাদেরই স্বজাতীয় আল্লার দ্বীনের বার্ত্তাবাহকগণ আসিয়া ছিলেন না কি—যাঁহারা তোমাদিগকে তোমাদের পরওয়ারদেগারের আদেশ-নিষেধগুলি পড়িয়া শুনাইতেন এবং এই দিনের আগমন সম্পর্কে তোমাদিগকে সতর্ক করিতেন? তাহারা উত্তরে বলিবে, হাঁ—আসিয়া ছিলেন, কিন্তু (আমরা

তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া আল্লাহদ্রোহী হইয়া রহিয়াছিলাম এবং) আল্লাহ-দ্রোহীদের উপর আজাবের আদেশ বলবৎ রহিয়াছে। তাহাদিগকে বলা হইবে, জাহান্নামের ফটকের ভিতরে প্রবেশ কর চিরকালের জন্য। সার কথা এই যে, আল্লার বিধান লঙ্ঘনকারী স্বৈরাচারীদের জন্য জঘন্য কারাগার রহিয়াছে।

পক্ষান্তরে যাহারা আল্লার ভয়-ভক্তির জীবন যাপনকারী ছিল তাহাদিগকে শ্রেণী বিভক্তরূপে বেহেশতের পথে নিয়া আসা হইবে। যখন তাহারা বেহেশতের নিকটে পৌঁছিবে এবং বেহেশতের গেট তাহাদের জন্য পূর্ব্ব হইতেই খুলিয়া রাখা হইয়াছে তখন তাহাদিগকে বেহেশতের প্রহরীগণ বলিবেন, আচ্ছালামু আলাইকুম; সৌভাগ্যশালী আপনারা—আসুন! চিরকালের জন্য বেহেশতে প্রবেশ করুন।" (২৪ পারা—ছুরা যুমার সমাপ্তে)

(৪) وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَجَمَعْنٰهُمْ جَمْعًا ...... لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَمْعًا

"আর শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হইবে ফলে আমি তাহাদের সকলকে একত্রিত করিব এবং সেই দিন বিদ্রোহীগণের সম্মুখে জাহান্নাম উপস্থিত করা হইবে; যাহাদের চক্ষু আমাকে স্মরণ করার নিদর্শন হইতে আড়ালে ছিল এবং আমাকে স্মরণ করার বিষয়বস্তু হইতে তাহাদের কান বধির ছিল।" (১৬ পারা—ছুরা কাহাফ ১১ রুকূ)

(৫) وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ .... وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَاِذَا هُمْ مِّنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ ......فَاِذَا هُمْ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ

"কাফেরগণ বিদ্রূপ করিয়া বলে, মহা প্রলয়ের সংবাদটা কবে বাস্তবায়ীত হইবে যদি তোমরা সত্যবাদী হও? (আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন,) তাহারা একটি ভীষণ শব্দের (শিঙ্গার প্রথম ফুঁকের) প্রতীক্ষায় রহিয়াছে যাহা তাহাদিগকে পাকড়াও করিবে আকস্মিকরূপে—তাহাদের জাগতিক ব্যতিব্যস্ততার মধ্যেই। যাহার ফলে তাহারা নিজ নিজ অবস্থায় ও নিজ নিজ স্থানেই ফানা ও বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। কেহ কোন অন্তিম অনুরোধ করার বা নিজ পরিবারবর্গের নিকট ফিরিয়া যাওয়ার সুযোগও পাইবে না।"

(তারপর দ্বিতীয়বার) আবার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হইবে, ফলে হঠাৎ তাহারা কবর হইতে উঠিয়া স্বীয় প্রভু-পরওয়ারদেগারের (নির্দ্ধারিত হিসাবের স্থান হাশর-ময়দানের) দিকে দ্রুত চলিতে থাকিবে। তখন তাহারা অনুতপ্ত হইয়া বলিবে,

আমাদের ত আর উপায় নাই ! আমাদিগকে কবর হইতে কে বাহির করিয়া আনিল ? উহাই ত সেই মহাসংবাদ যাহা আমাদের দয়াল প্রভু আমাদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন এবং রসুলগণ সত্য সংবাদই পেঁছাইয়া ছিলেন।

শুধু মাত্র একটি ভীষণ আওয়াজ (শিঙ্গার ফুঁক) হইবে ; সঙ্গে সঙ্গে অকস্মাৎ সকলকে আমার দরবারে উপস্থিত করিয়া দেওয়া হইবে।" (২৩ পাঃ ছুরা ইয়াছীন)

(৬) وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ........

"শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হইবে—সেই দিনটি ঐ দিন যে দিন সম্পর্কে সতর্ক করা হইয়াছে। ঐ দিন প্রত্যেকটি মানুষ হাশর-ময়দানের দিকে আসিবে—তাহার সঙ্গে তাহাকে তাড়া করার জন্য একজন ফেরেশতা এবং তাহার আমল সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য আর একজন ফেরেশতা থাকিবেন। (আল্লাহ তায়ালা বলিবেন,) এই দিনটির অবহেলায় তুমি বিভোর ছিলে ! আজ আমি তোমার চোখের পর্দা দুরীভুত করিয়া দিয়াছি—আজ তোমার দৃষ্টিশক্তি তীক্ষ্ণ হইয়াছে। সব কিছু চাক্ষুস দেখিতেছ !"

يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ

"সে দিন লোকগণ বাস্তব একটি শব্দ শুনিতে পাইবে সেই দিনই কবর হইতে হাশর-ময়দানের দিকে বাহির হওয়ার দিন।"

يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ

"যে দিন মাটি ফুড়িয়া তাহারা হাশর-ময়দানের দিকে দৌড়াইতে থাকিবে—এইরূপে সকলকে একত্রিত করা আমার পক্ষে কঠিন নহে।" (২৬ পারা ছুরা কাফ)

(৭) فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ - فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ......

"যখন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হইবে ঐ দিনটি আল্লাহদ্রোহীদের পক্ষে অতিশয় ভয়ঙ্কর ও কঠিন হইবে।" (২৯ পারা ছুরা মোদ্দাচ্ছের)

(৮) أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا ءَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ...... فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ...... هَٰذَا يَوْمُ الدِّينِ

"(কাফেরগণ কেয়ামতকে অস্বীকার পূর্ব্বক বলিয়া থাকে,) আমরা মরিয়া মাটি ও হাড়ে পরিণত হওয়ার পর পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিব কি ? এবং আমাদের

পূর্ব্ব পুরুষগণ (যাহারা বহু পূর্ব্বে মরিয়া গিয়াছে) তাহারাও কি পুনরুজ্জীবিত হইবে ? আপনি বলিয়া দিন হাঁ—এবং তখন তোমরা লাঞ্ছিত হইবে। ঐ ঘটনা শুধু মাত্র একটি ভীষণ গর্জ্জনের মাধ্যমে সংঘটিত হইবে। সঙ্গে সঙ্গে অকস্মাৎ সকল লোকজন জীবিত হইয়া (হতভম্বের ন্যায়) দৃষ্টিপাত করিতে থাকিবে এবং কাফেরগণ বলিবে, আমাদের ত আর বাঁচিবার উপায় নাই ; ইহাইত প্রতিফল ভোগের দিন।”

(২৩ পারা ছুরা ছাফ্‌ফাত)

(৯) يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ........ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ

وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ

“কেয়ামত অনুষ্ঠিত হইবে—যে দিন সারা বিশ্বকে প্রকম্পিত করিয়া দিবে একটি বিশেষ প্রকম্পনকারী (তথা শিঙ্গার প্রথম ফুঁক)। তারপরেই আসিবে পরবর্ত্তী ঘটনা (তথা শিঙ্গার দ্বিতীয় ফুঁক।) সে দিন অনেকের দেল ধড়ফড় করিতে থাকিবে, তাহাদের চক্ষু অবনমিত থাকিবে।

(দুনিয়ার জীবনে) কাফেরগণ বলিয়া থাকে, আমরা ছিন্ন-ভিন্ন হাড়ে পরিণত হওয়ার পরও পুনরুজ্জীবিত হইব কি ? তাহারা বিদ্রূপ করিয়া বলে, তবে ত আমাদের পুনর্ব্বারের জীবন বিশেষ ক্ষতির কারণ হইবে ! আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন—

তোমাদের পুনরুজ্জীবিত হওয়ার ঘটনা শুধু মাত্র একটি হুঁঙ্কারের মাধ্যমে সংঘটিত হইবে—সঙ্গে সঙ্গে সকল লোকজন হাশর-ময়দানের ভূপৃষ্ঠে আসিয়া যাইবে। (৩০ পারা—ছুরা নাযেয়াত)

এইরূপে শিঙ্গার ফুঁকদ্বয়ের বিষয়বস্তু বিভিন্ন বাক্যের মাধ্যমে পবিত্র কোরআনের অগণিত স্থানে বর্ণিত হইয়াছে।

কেয়ামতের বিভিন্ন তথ্য

২৪৭২। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামত দিবসে আল্লাহ তায়ালা সমগ্র ভুমণ্ডলকে মুঠার মধ্যে লইবেন এবং আসমানসমুহকে দক্ষিণ হস্তে লেপটাইয়া লইবেন। অতঃপর বলিবেন, আমিই একমাত্র অধিপতি—সকল ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র আমি। (দুনিয়াতে যাহারা অধিপতি হওয়ার দাবী করিত ক্ষমতার গর্ব করিত আজ তাহারা কোথায় ? ১১০২ পৃঃ)

● এই বিবরণের আরও এক খানা হাদীছ আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, যাহার অনুবাদ ষষ্ঠ খণ্ডে হইয়াছে।

২৪৭৩। **হাদীছ ঃ**—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিন (এক সময় হাশর-ময়দানের) সমগ্র ভূমণ্ডলটি (আল্লাহ তায়ালার অসীম কুদরতে) একটি (সুখাদ্য সুস্বাদু) রুটি হইয়া যাইবে। (উহা অতিশয় বিশাল ও বৃহত হওয়া সত্বেও) মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ তায়ালার কুদরতের হস্ত উহাকে ঐরূপ নাড়াচড়া করিবে যেরূপ তোমাদের কেহ দস্তরখানের উপর তাহার সম্মুখস্থ খাদ্য রুটিকে নাড়াচড়া করিয়া থাকে। উহা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা বেহেশতে আগত লোকদের আতিথ্য ও মেহমানদারী করিবেন।

এই আলোচনা শেষ হইতে না হইতেই এক ইহুদী ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইল। সে হযরত (দঃ)কে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেয়ামতের দিন বেহেশতে আগত লোকদের আতিথ্য ও মেহমানদারী কি হইবে তাহা আপনাকে জ্ঞাত করিব কি ? হযরত (দঃ) বলিলেন, হাঁ—বল ! ইহুদী ব্যক্তি বলিল, সমগ্র ভূমণ্ডল একটি রুটি হইয়া যাইবে—হযরত (দঃ) পূর্ব্বেক্ষণে যেই তথ্য প্রকাশ করিয়া ছিলেন সে ঐ তথ্যই বয়ান করিল। তখন হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদের প্রতি তাকাইলেন এবং হাসিলেন। এমন কি তাঁহার মুখের দাঁত দৃষ্ট হইল। তারপর ঐ ইহুদী ব্যক্তি বলিল, বেহেশতে আগত লোকদের (রুটি খাওয়ার) তরকারি কি হইবে তাহাও আমি জ্ঞাত করিব। তাহাদের তরকারি হইবে গরু এবং মাছ—এত বড় বৃহত মাছ যাহার কলিজার ছোট অংশটি সত্তর হাজার লোক খাইতে পারিবে+।

ব্যাখ্যা ঃ—হিসাব-নিকাশ শেষ হওয়ার পর সমস্ত লোক হাশর-ময়দান হইতে পোল-ছেরাতের উপর আসিয়া যাইবে এবং বেহেশতী ও দোযখী ভিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে। দোযখীগণ পোল-ছেরাতের উপর হইতে নিম্নস্থ জাহান্নামে পতিত হইবে, আর বেহেশতীগণ পোল-ছেরাৎ পার হইয়া বেহেশত এলাকায় আসিরা পৌঁছিবে। সমস্ত লোকজন পোল-ছেরাতে আসিলে হাশর ময়দান খালি হইয়া যাইবে তখনই আল্লাহ তায়ালা ঐ রুটি তৈরি করিবেন এবং বেহেশতের আগত লোকগণ পোল-ছেরাত পার হইয়া সর্ব্ব প্রথম আল্লার তরফ হইতে ঐ রুটির জেয়াফৎ খাইবেন।

হাশর-ময়দানের মাটি বস্তুত ইহজগতেরই মাটি যাহা শিঙ্গার দ্বিতীয় ফুঁকের দ্বারা পুনরুত্থিত হইবে। মাটির মধ্যেই দুনিয়ার শত শত সুস্বাদু বস্তুর স্বাদের মুল পদার্থ রহিয়াছে) আল্লাহ তায়ালা স্বীয় বিচিত্রময় কুদরতের হস্তে যখন বিভিন্ন স্বাদের

+ ইহুদী ব্যক্তি এই সব তথ্য তাহাদের আসমানী কেতাব হইতে জ্ঞাত হইয়া ছিল। তাহারা তাহাদের কেতাবের মূল বিষয়বস্তু বিকৃত করিয়া ছিল, কিন্তু সাধারণ বিষয়াবলীর কিছুটা শুদ্ধও ছিল।

আকর ভূমণ্ডলকে রুটিতে রূপান্তরিত করার জন্য সামগ্রীকরূপে রিফাইন করিয়া নিবেন এবং উহা দ্বারা স্বীয় ভালবাসার বন্দা বেহেশতী মোমেনগণকে স্বাগতমঃ জানাইবার জেয়াফতের রুটি তৈরী করিবেন, তখন উহা যে কি স্বাদের হইবে তাহা একমাত্র আল্লাহই জানেন।

২৪৭৪। হাদীছ ঃ—সাহ্‌ল (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা পূর্ব্বাপর সমস্ত লোককে (হাশর-ময়দান নামীয়) এমন একটি ভূমণ্ডলে একত্রিত করিবেন যাহা ময়দার রুটির ন্যায় উঁচু-নীচুহীন সুসমতল পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হইবে। উহাতে কাহারও কোন নির্দ্দিষ্ট সীমানা-চিহ্ন থাকিবে না।

২৪৭৫। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লালাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিন পূর্ব্বাপর সমস্ত লোককে হাশর-ময়দানে একত্রিত করা হইলে পর (তাহাদের আমলের পরিপ্রেক্ষিতে) তাহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইবে।

(কেয়ামতের পূর্ব্বক্ষণে যখন দুনিয়াতে চতুর্দিকে অশান্তির অগ্নি জ্বলিতে থাকিবে এবং সিরিয়া অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত অশান্তির অগ্নি কম হইবে। তখন যে তৎকালীন লোকগণ নিজ নিজ আবাস ভূমি ত্যাগ করতঃ সিরিয়ার দিকে ছুটিবে তখনও সেই লোকগণ তিন শ্রেণীর হইবে—) এক দল তাহারা প্রথম সুযোগেই অশান্তি হইতে পলায়ন করতঃ শান্তির আশা নিয়া ধীরস্থিরতার সহিত সিরিয়া অঞ্চলে পৌঁছিবে। তারপর (যখন চতুর্দিক হইতে সিরিয়া অঞ্চলে গমনের হিড়িক পড়িয়া যাইবে এবং যান-বাহন দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিবে, এমনকি বিরাট একটি বাগান-বাড়ীর বিনিময়ে একটি উট প্রাপ্তি দুষ্কর হইয়া উঠিবে তখন) দুই জন এক উটে, তিন জন এক উটে, চার জন এক উটে, এমনকি দশ জন পর্য্যন্ত মাত্র একটি উটের সাহায্যে (পালাক্রমে হইলেও সিরিয়ার দিকে ধাবিত হইবে। তৃতীয় শ্রেণীর লোকগণ—তাহারা যান-বাহনের অভাবে বা যে কোন কারণে তখনও নিজ নিজ দেশে বিভিন্ন অঞ্চলে রহিয়া গিয়াছে; আল্লার কুদরতে ঐ সব অঞ্চলকে পরিবেষ্টিত করিয়া অগ্নি প্রজ্জলিত হইয়া উঠিবে। এই) অবশিষ্ট লোকগণকে সেই অগ্নি (সিরিয়ার দিকে) হাঁকাইয়া নিয়া যাইবে। সকাল, বিকাল, দুপুর—সর্ব্বদার জন্যই সেই অগ্নি তাহাদের পেছনে লাগিয়া থাকিবে।

ব্যাখ্যা ঃ—আলোচ্য হাদীছের প্রথম অংশে কেয়ামতের দিনের অবস্থার উল্লেখ রহিয়াছে যে, তথায় সমস্ত মানুষ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইবে—পবিত্র কোরআনে উহার বিবরণ বর্ণিত আছে—

২৭ পারা ছুরা ওয়াক্কেয়া'হ্, আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের বাস্তবতা বয়ান পূর্ব্বক বলেন, وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً "তোমরা (তথা পূর্ব্বাপর সারা বিশ্বের লোকগণ) তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া যাইবে।" অতঃপর আল্লাহ তায়ালা সংক্ষেপে সেই তিন শ্রেণীর বিবরণ দান করিয়াছেন—

فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ - وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ - وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ - أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ

"এক শ্রেণী হইবে যাহারা সাধারণ ভাবে আমল-নামা ডান হাতে পাইবে ; তাহাদের অবস্থা বেশ ভালই হইবে (—এই শ্রেণী হইল সাধারণ মোমেন-মোসলমান নেককারদের।) আর এক শ্রেণী হইবে যাহারা আমল-নামা বাম হাতে পাইবে ; তাহাদের অবস্থা ভয়াবহ হইবে (—এই শ্রেণী হইল আল্লার নাফরমানগণের)। আর এক শ্রেণী হইবে যাঁহারা অতি উচ্চ মর্তবা সম্পন্ন হইবেন, তাঁহারা (ডান হাতে আমল-নামা পাইবেন এবং তৎসঙ্গে) আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভের অধিকারী হইবেন (—এই শ্রেণী হইল নবী ছিদ্দীক, ওলী ও কামেল মোত্তাকী পরহেজগারগণের। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক শ্রেণীর লোকদের অবস্থার বিবরণ দান করিয়াছেন।)

বক্ষমান হাদীছের দ্বিতীয় অংশের তাৎপর্য্য বয়ানের পূর্ব্বে মূল বিষয়টা গোড়া হইতে উপলব্ধি করিতে হইবে।

হাশরের ময়দান বস্তুতঃ এই জগৎ-পৃষ্ঠেই অনুষ্ঠিত হইবে, কিন্তু ইহার পুনরোত্থানের পর। পদ্মা ইত্যাদি ভাঙ্গন সৃষ্টিকারী নদীর তীরে যাহাদের বসতি তাহারা দেখিয়া থাকে, যে সব বস্তি ও গ্রাম নদীর ভাঙ্গনে পতিত হয় কতেক বৎসর পর ঐ সব বস্তি বা গ্রামের স্থানটি চর আকারে পুনঃ উত্থিত হয় এবং তাহা শুধু বালুকাময় ময়দানরূপের হয় ; পূর্ব্বেকার উঁচু-নিচুর কোন চিহ্ন উহাতে থাকে না। কিন্তু সেটেলমেণ্টের রেকর্ড অনুসারে এলাকাটি নির্দ্ধারিত অবশ্যই হইতে পারে।

ঠিক তদ্রূপই এই ভূমণ্ডলের অবস্থা। কেয়ামত তথা ইস্রাফীল ফেরেশতার শিঙ্গার প্রথম ফুঁকের দ্বারা সমুদয় আসমান-জমীন ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইবে। দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পর আল্লাহ তায়ালা ইস্রাফীল (আঃ)কে পুনঃ জীবিত করিবেন এবং দ্বিতীয় বার তিনি শিঙ্গায় ফুঁক দিবেন। তদ্দারা এই জগতের ভূমণ্ডলটিই ঐ বালু চরের ন্যায় পুনঃ উত্থিত হইবে, উহার উপর বর্ত্তমান অবস্থার চিজ বস্তুর কোনরূপ চিহ্নও থাকিবে না। কিন্তু উহার আঞ্চলিক সীমার পূর্ব্ব রেকর্ড বহাল থাকিবে এবং

হাশর-ময়দানের জন্য সম্পূর্ণ ভূমণ্ডলের আবশ্যক হইবে না, বরং একটি অঞ্চলই যথেষ্ট হইবে। সেমতে বিভিন্ন হাদীছের দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, বর্ত্তমান সিরিয়ার অঞ্চলটিই পুনঃ উত্থানে হাশর ময়দান হইবে।

যেহেতু সমস্ত মানুষ পুনঃ উত্থানে সিরিয়া অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হাশর-ময়দানে একত্রিত হইবে, তাই ইহজগতের সর্ব্বশেষ মুহূর্ত্তে তথা মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বক্ষণে আল্লাহ তায়ালা অন্ততঃ তৎকালীন অবশিষ্ট সমস্ত লোকজনকে সেই সিরিয়া অঞ্চলে একত্রিত হইতে বাধ্য করিবেন। যাহার ব্যবস্থা এই হইবে যে, বিশ্বের চতুর্দিকে অশান্তির অগ্নি জ্বলিয়া উঠিবে। শুধু সিরিয়া অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত কিছু কম অশান্তি হইবে, তাই বিশ্বের চতুর্দিক হইতে লোকগণ নিজ নিজ আবাস ভুমি ত্যাগ করতঃ সিরিয়ার দিকে ধাবিত হইবে। ঐ অবস্থায়ও যাহারা সিরিয়ার দিকে না আসিবে তাহাদিগকে হাঁকাইয়া আনিবার জন্যই আল্লাহ তায়ালার কুদরতী আগুনের আবির্ভাব হইবে। সেই আগুন আরব সাগরের এডেনস্থিত সমুদ্র-গর্ভ হইতে বাহির হইয়া চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িবে। এই সকল তথ্য বিভিন্ন হাদীছে বর্ণিত রহিয়াছে।

তৎকালীন অবস্থারই একটি বিষয়ের উল্লেখ আলোচ্য হাদীছে রহিয়াছে।

২৪৭৬। **হাদীছ ঃ**—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ভাষণ দান কালে এই তথ্য প্রকাশ করিলেন—

إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا "كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ"

"সমস্ত মানব হাশর ময়দানে একত্রিত হইবে, এই অবস্থায় যে সকলেই খালি পা, বস্ত্রবিহীন খাতনাবিহীন হইবে। পবিত্র কোরআনেও উহার ইঙ্গিত রহিয়াছে—আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, যেই অবস্থার উপর প্রথম দুনিয়াতে পয়দা করিয়া ছিলাম, পুনরুজ্জিবীতও সেই অবস্থার উপরই করিব।"

হযরত (দঃ) আরও বলিয়াছেন— কেয়ামতের দিন সমস্ত মখলুকের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম হযরত ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামকে কাপড় পড়ান হইবে।

২৪৭৭। **হাদীছ ঃ**— أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا قَالَتْ

عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ

فَقَالَ الْأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يُهِمَّهُمْ ذٰلِكَ

অর্থ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, সমস্ত মানুষ খালি পা, বস্ত্রবিহীন খাত্‌না-বিহীনরূপে হাশর ময়দানে জমায়েত হইবে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, নারী-পুরুষ সকলেই উলঙ্গরূপে একত্রিত হইবে এবং একে অন্যকে উলঙ্গ দেখিব ? হযরত (দঃ) বলিলেন, তখনকার অবস্থা এত ভয়াবহ হইবে যে, সেই বিষয়ের প্রতি কাহারও লক্ষ্য করার আবকাশই থাকিবে না।

২৪৭৮। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে তাবুর ভিতর বসিয়া ছিলাম। হযরত (দঃ) আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বেহেশতবাসীদের মোট সংখ্যার এক চতুর্থাংশ তোমরা হইবে। ইহাতে তোমরা সন্তুষ্ট আছ কি? আমরা আরজ করিলাম হাঁ—আমরা সন্তুষ্ট আছি।

হযরত (দঃ) পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা তৃতীয়াংশ হইবে। ইহাতে অধিক সন্তুষ্ট আছ কি ? আমরা আরজ করিলাম, হাঁ। তখন হযরত (দঃ) শপথ করিয়া বলিলেন, আমি আশা রাখি, তোমরা বেহেশত লাভকারীদের মোট সংখ্যার অর্দ্ধেক হইবে।

এ সম্পর্কে আরও তথ্য তোমরা জানিয়া রাখ যে, মোসলমান ব্যক্তি ছাড়া আর কেহই বেহেশতে যাইতে পারিবে না। আর (দুনিয়ার আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সারা বিশ্বের সর্ব্বমোট জন সংখ্যার মধ্যে অমোসলেমদের মোকাবিলায়) মোসলমানদের পরিমান তদ্রূপ যেরূপ সম্পূর্ণ কাল রঙ্গের একটি ষাঁড়ের গায়ে একটি সাদা লোম বা সম্পূর্ণ লাল রঙ্গের একটি ষাঁড়ের গায়ে একটি কাল লোম।

অর্থাৎ একটি ষাঁড়ের শরীরে সমস্ত লোম কাল এবং শুধু একটি মাত্র লোম সাদা হইলে সে স্থলে যেরূপ অধিক কাল লোমের মোকাবিলায় একটি সাদা লোম হইয়া থাকে মানব সংখ্যার মধ্যেও সেরূপ অধিক সংখ্যার অমোসলেমের মোকাবিলায় এক এক জন মোসলমান।

ব্যাখ্যা ঃ—সর্ব্বমোট জন সংখ্যার মধ্যে সমষ্টিগত দোযখী অমোসলেমদের মোকাবিলায় বেহেশতী মোসলমানের সংখ্যা অতি নগণ্য। তবুও সেই নগণ্য সংখ্যক বেহেশতী মোসলমানদের মধ্যে হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উম্মতই অর্দ্ধেক হইবে, আর হযরত আদম (আঃ) হইতে ঈসা (আঃ) পর্য্যন্ত সমস্ত নবীগণের উম্মৎ হইতে অবশিষ্ট অর্দ্ধেক হইবে—হযরত (দঃ) এই আশা পোষণ করিতেন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাঁহার আশা ও আকাঙ্খাকে অধিক পরিমাণে বাস্তবায়ীত করিবেন বলিয়া জানাইয়া দিয়াছেন। সে মতে অন্য এক হাদীছে হযরত নবী (দঃ) সংবাদ দিয়াছেন যে, তাঁহার উম্মৎ বেহেশত লাভকারীদের মোট সংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ হইবে।

২৪৭৯। ছাদীছঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিন, সর্ব্ব প্রথম আদম (আঃ) কে ডাকা হইবে, তখন আদম (আঃ) তাঁহার বংশধর সমস্ত মানব গোষ্টির মুখামুখী-রূপে আসিয়া দাঁড়াইবেন। লোকদিগকে জ্ঞাত করা হইবে, এই তোমাদের আদি পিতা আদম। সঙ্গে সঙ্গে আদম (আঃ) আল্লাহ তায়ালার দরবারে নিজের পূর্ণ আনুগত্য নিবেদন করিবেন। তখন আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে বলা হইবে, আপনি নিজেই নিজের সন্তানদের মধ্য হইতে জাহান্নামীদিগকে বাছিয়া বাহির করিয়া দিন। আদম (আঃ) জিজ্ঞাসা করিবেন, হে প্রভু-পরওয়ারদেগার ! কি পরিমাণ সংখ্যা বাছনীর মধ্যে আসিবে ? আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, প্রতি শতে নিরানব্বই জন।

এতচ্ছ্রবণে ছাহাবী আরজ করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ। নিরানব্বই জন জাহান্নামের জন্য বাহির করা হইলে বেহেশতের জন্য আর আমাদের অবশিষ্ট কি থাকিবে ? তদুত্তরে হযরত (দঃ) বলিলেন, পূর্ব্বাপর নবীগণের উম্মতের সমষ্টি সংখ্যার মোকাবিলায় ত আমার উম্মতের সংখ্যা নগণ্য—যেমন কাল ষাঁড়ের শরীরে একটি সাদা লোম।

অর্থাৎ জাহান্নামীদের সংখ্যা যতই বেশী হউক না কেন, কিন্তু উহার বেশীর ভাগ পূর্ণ করার জন্য অন্যান্য উম্মতের লোক যথেষ্ট রহিয়াছে ; তাহাদের মধ্যে আল্লাহদ্রোহী জাহান্নামীর সংখ্যা অনেক বেশী ছিল। পক্ষান্তরে বেহেশতীদের মধ্যে এই উম্মতের লোক অধিক সংখ্যায় থাকিবে।

২৪৮০। ছাদীছ ঃ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বর্ণনা করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা আদম (আঃ)কে ডাকিবেন। আদম (আঃ) উপস্থিত হইবেন এবং স্বীয় আনুগত্য নিবেদন করিবেন। আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, দোযখী দলকে বাছিয়া বাহির করুন। আদম (আঃ) জিজ্ঞাসা করিবেন, দোযখী দলের পরিমাণ কি ? আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, প্রতি হাজারে নয় শত নিরানব্বই।

হযরত (দঃ) বলেন, ঐ সময়ই পবিত্র কোরআনের এই বর্ণনার দৃশ্য বাস্তবায়ীত হওয়ার সময়—

وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ
بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ -

"কেয়ামতের দিন এমন ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইবে যদ্দরুণ সমস্ত গর্ভবতীদের গর্ভপাত হইয়া যায় এবং ঐ দিন তুমি সমস্ত লোকদেরকে মাতাল

দেখিতে পাইবে ; প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা মাতাল হইবে না, কিন্তু আল্লার আজাব এত ভীষণ হইবে যাহার ভয়ে তাহারা মাতালরূপী হইয়া যাইবে।"

হযরতের এই বয়ান ছাহাবীদের নিকট অতি কঠিন বোধ হইল ; তাঁহারা বলিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ ! হাজারের মধ্যে বেহেশতী মাত্র একজন হইবে. সেই একজন আর আমাদের কে হইবে ? তদুত্তরে হযরত (দঃ) বলিলেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর, (তোমরা সাধারণ মানব জাতি ভিন্ন "ইয়াজুজ-মাজুজ" নামীয় আর এক শ্রেণীর মানব রহিয়াছে, যাহারা সকলেই অমোসলেম দোযখী। তাহাদের সংখ্যা এত বেশী যে, সেই) ইয়াজুজ-মাজুজের (সঙ্গে তোমাদের জাতীয় অমোস-লেমদেরে যোগ করিয়া মোট) সংখ্যার মোকাবিলায় মোসলামানদের সংখ্যা দেখা হইবে। (অমোসলেমদের সংখ্যার অনুপাতে সমস্ত মোসলমানগণ) হাজারে একজনই দাঁড়াইবে। (সুতরাং সমস্ত মোসলমানই বেহেশতে যাইবে এবং তাহাতে ইয়াজুজ-মাজুজ সহ সকল মানুষের মধ্যে হাজারে একজন বেহেশতী এবং নয় শত নিরানব্বই জন দোযখী হইবে।)

অতঃপর হযরত (দঃ) বলিলেন, আমি আশা করি তোমরা (অর্থাৎ আমার উম্মৎ) মোট বেহেশতীদের এক তৃতীয়াংশ হইবে। মুল হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী বলেন, এতচ্ছ্রবণে আমরা খুশীতে আল্লার প্রশংসা করিলাম এবং তকবীর ধ্বনি দিলাম। অতঃপর হযরত (দঃ) বলিলেন, আমি আশা করি তোমরা বেহেশতবাসীদের মোট সংখ্যার অৰ্দ্ধেক হইবে। অথচ তোমরা লোক সংখ্যার দিক দিয়া পূর্ব্বাপর উম্মৎগণের সমষ্টি সংখ্যার অনুপাতে তোমাদের সংখ্যা এতই নগণ্য—যেন একটি কাল ষাঁড়ের গায়ে একটি সাদা লোম।

অর্থাৎ লোক সংখ্যার দিক দিয়া এই উম্মতের সংখ্যা সমস্ত উম্মৎগণের সমষ্টি সংখ্যার মোকাবিলায় নগণ্য হইলেও বেহেশতের অধিক আসন এই উম্মৎগণই লাভ করিবে, কারণ পূর্ব্ববর্ত্তী উম্মৎগণের মধ্যে নেককারের সংখ্যা কম ছিল।

ব্যাখ্যা :—পবিত্র কোরআন ১৭ পারা ছুরা হজ্জের প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াত—

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ - يَوْمَ

تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ......

"হে লোক সকল ! তোমরা তোমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগারকে ভয় কর ; নিশ্চয় কেয়ামত দিবসে ভীষন ও ভয়াবহ প্রকম্পন হইবে। যেই সময় ঐ প্রকম্পন তোমরা দেখিবে তখন (আরও ভয়াবহ ঘটনা ঘটিবে—যাহাতে মানুষের মধ্যে

এমন আতঙ্ক ও ভীতির সৃষ্টি হইবে যে তখন শিশুকে দুগ্ধ দানকারীনী মাতা এবং গর্ভধারীনী মহিলা তথায় থাকিলে) দুগ্ধ দানকারীনী দুগ্ধ পোষ্যাকে ভুলিয়া যাইবে এবং গর্ভধারীনীর গর্ভপাত হইয়া যাইবে। এবং ঐদিন তুমি সমস্ত লোকদেরকে মাতাল দেখিতে পাইবে, অথচ তাহারা মাতাল নহে, কিন্তু আল্লার আজাব অতি ভীষন; (যাহা দৃষ্টে লোকদের হুঁশ-জ্ঞান লোপ পাইয়া যাইবে।)

অর্থাৎ এই দিনের ভয়াবহ আজাব হইতে মুক্তি চাহিলে তোমাদেরকে আল্লার ভয়-ভক্তি জনিত জীবন যাপন করিতে হইবে। উল্লেখিত দিনের আর একটি ভয়াবহ ঘটনার আলোচনাই বক্ষমান হাদীছে রহিয়াছে।

২৪৮১। **হাদীছ**ঃ—আবহুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঐ দিনের একটি অবস্থার বর্ণনা দান করিয়াছেন যে দিনটির উল্লেখ পবিত্র কোরআনে আছে—

إِنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِينَ

"সমস্ত লোকদিগকে এক ভীষণ দিনের জন্য পুনরুজ্জীবিত করা হইবে—যে দিন মানুষ সারা জাহানের প্রভু-পরওয়ারদেগারের নিকট হিসাব দানের জন্য দণ্ডায়মান হইবে।"

হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, ঐ দিন কোন কোন লোক তাহার অর্দ্ধ কান পর্য্যন্ত ঘর্মে ডুবা অবস্থায় দণ্ডায়মান থাকিবে।

২৪৮২। **হাদীছ**ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিন হাশর-ময়দানে মানুষের ঘাম এই পরিমাণ বাহির হইবে যে, জমিনের ভিতর সত্তর হাত পর্য্যন্ত উহা শোষিত হইয়াও জমিনের উপর যাহা থাকিবে তাহা কোন কোন ব্যক্তির কান পর্য্যন্ত পৌঁছিবে।

২৪৮৩। **হাদীছ**ঃ—আবহুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিন লোকদের মধ্যে নরহত্যার হিসাবই সর্ব্ব প্রথম হইবে।

ব্যাখ্যাঃ—কেয়ামত-দিবসে পরস্পর অন্যায়-অত্যাচার ও জুলুমের বিচার হইবে। এই ক্ষেত্রে দুইটি ধারায় বিচার হইবে—একে অন্যের উপর জুলুম-অত্যাচার করায় আল্লার বিধান লঙ্ঘন তথা নাফরমানী ও গোনাহ হইয়াছে; উহার বিচার হইবে। আর যাহার প্রতি অন্যায় করা হইয়াছে তাহাকে অন্যায়কারী হইতে প্রতিশোধ প্রদান করা হইবে। এই সম্পর্কে দুইটি হাদীছ এস্থলে উল্লেখ আছে; দ্বিতীয় খণ্ডে ১১৭৭ এবং ১১৮৩ নম্বরে উহার অনুবাদ হইয়াছে।

২৪৮৪। হাদীছ :— عن عدى بن حاتم رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا سَيُكَلِّمُهُ

رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ (وَلَا حِجَابٌ يَسْتُرُهُ) فَيَنْظُرُ اَيْمَنَ

مِنْهُ فَلَا يَرٰى اِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ وَيَنْظُرُ اَشْاَمَ مِنْهُ فَلَا يَرٰى اِلَّا مَا

قَدَّمَ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرٰى اِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَاتَّقُوا النَّارَ

وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ وَلَوْ بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ

অর্থ :—আদী ইবনে হাতেম (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে (তাহার আমলের হিসাব-নিকাশ উপলক্ষে) সরাসরি আল্লাহ তায়ালার কথা-বার্ত্তা হইবে। তাহার এবং আল্লাহ তায়ালার মধ্যে দোভাষী বা উকিল থাকিবে না, কোন আড়ালও থাকিবে না। এমতাবস্থায় সে তাহার ডান দিকে তাকাইবে, কিন্তু স্বীয় কৃত আমল ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইবে না, বাম দিকে তাকাইবে সেই দিকেও কৃত আমল ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইবে না। সম্মুখ দিকে তাকাইবে সে দিকে চোখের সামনে দোযখ ভিন্ন আর কিছুই দেখিবে না; অতএব দোযখ হইতে বাঁচিবার চেষ্টা কর এক খণ্ড খেজুর দান করিয়া হউক বা কাহাকেও একটি ভাল কথা বলিয়া হউক।

অর্থাৎ দোযখ হইতে বাঁচিবার একটি প্রধান সম্বল হইল দান-খয়রাত যদিও উহা সামান্য বস্তুর হয়—যেমন এক খণ্ড খেজুর-খুরমা। তাহাও যদি না যুটে তবে মানুষের উপকারে মুখের ভাল কথা ব্যয় করিলেও দান-খয়রাতের ছওয়াব হইবে।

২৪৮৫। হাদীছ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি—তিনি বলিয়াছেন, আমার উম্মৎ হইতে সত্তর হাজার লোকের একটি দল বেহেশতে প্রবেশ করিবে; তাহাদের নূরানী চেহেরা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় ঝক্ ঝক্ করিবে।

বেহেশ্‌ত-দোযখের বয়ান

২৪৮৬। হাদীছ :— عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَارَ اَهْلُ الْجَنَّةِ اِلَى الْجَنَّةِ

وَاَهْلُ النَّارِ اِلَى النَّارِ جِيْءَ بِالْمَوْتِ حَتّٰى يُجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ

ثُمَّ يُذْبَحُ ثُمَّ يُنَادِىْ مُنَادٍ يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ وَيَا اَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتَ

فَيَزْدَادُ اَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا اِلٰى فَرَحِهِمْ وَيَزْدَادُ اَهْلُ النَّارِ حُزْنًا اِلٰى حُزْنِهِمْ

অর্থ— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, বেহেশতীদের বেহেশতে এবং দোযখীদের দোযখে যাওয়ার সর্ব্বশেষ অবস্থায় মৃত্যুকে (একটি জীবের আকৃতিতে) বেহেশত ও দোযখের মধ্যস্থলে দাঁড় করান হইবে। অতঃপর উহাকে জবেহ করিয়া দেওয়া হইবে। তারপর একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করিবে—হে বেহেশতবাসীগণ! তোমরা অমর হইয়াছ ; তোমাদের আর মৃত্যু হইবে না। এবং হে দোযখবাসীগণ! তোমরাও অমর হইয়াছ, তোমাদের আর মৃত্যু হইবে না। তখন বেহেশতবাসীগণের আনন্দ উল্লাস অধিক হইয়া যাইবে এবং দোযখবাসীদের দুঃখ-ভাবনা অধিক হইয়া যাইবে।

২৪৮৭। হাদীছ ঃ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, বেহেশতবাসীগণকে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা আহ্বান করিবেন, হে বেহেশতবাসীগণ! তখন তাহারা তৎক্ষণাৎ আল্লার হুজুরে উপস্থিতি ও আনুগত্য নিবেদন করিবে। আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমরা সন্তুষ্ট হইয়াছ কি ? তাহারা উত্তর করিবে, আমরা কেন সন্তুষ্ট হইব না। আপনি ত আমাদিগকে এত নেয়ামত দান করিয়াছেন যাহা আর কাউকে দান করেন নাই। তখন আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, আমি তোমাদিগকে আরও অধিক উত্তম বস্তু দান করিব। তাহারা জিজ্ঞাসা করিবে, হে পরওয়ারদেগার! আরও অধিক উত্তম বস্তু কি হইবে ? আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, তাহা হইল তোমাদের জন্য আমার এই ঘোষণা যে, সর্ব্বদার জন্য তোমাদের প্রতি আমার সন্তুষ্টি ও রেজামন্দি রহিল—আমি তোমাদের প্রতি কখনও নারাজ ও অসন্তুষ্ট হইব না।

২৪৮৮। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, (কাফেরদিগকে শাস্তি ও আজাব বেশী ভোগ করাইবার জন্য তাহার দেহকে অতিশয় প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হইবে। এমনকি এক একজন) কাফেরের কাঁধদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ব্যবধান দ্রুতগামী অশ্বারোহীর তিন দিনের পথ হইবে।

২৪৮৯। ছাদীছ ঃ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, বেহেশতের মধ্যে (বেড়াইবার উদ্দেশ্যে স্নিগ্ধ ছায়ার জন্য) এত বড় একটি সুপ্রশস্ত বৃক্ষ আছে, যাহার ছায়া তলে অতিশয় দ্রুতগামী উত্তম ঘোড়াকে একশত বৎসর দৌড়াইয়া উহা শেষ করা যাইবে না।

২৪৯০। ছাদীছ ঃ—সাহল (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, বেহেশতের নিম্ন-স্তরের লোকগণ উহার উর্দ্ধতন মহল সমূহেকে ঐরূপ দেখিবে যেরূপ তোমরা আকাশের পূর্ব্ব বা পশ্চিম কিনারায় উদিত নক্ষত্রকে দেখিয়া থাক।

ব্যাখ্যা ঃ— বেহেশতের শ্রেণী বিভক্তিতে উহার মহল সমূহ উর্দ্ধে ও নিম্নে হইবে। কিন্তু নিম্নস্থ মহলবাসীদের মনে কোন প্রকার আক্ষেপ অনুতাপ হইবে না, যেরূপ দুনিয়াতেও দেখা যায়, কেহ এক তালা-বিশিষ্ট বাড়ীকে অধিক পছন্দ করিয়া থাকে, দশ বিশ তালা-বিশিষ্ট উঁচু দালানের প্রতি তাহার কোনই স্পৃহা থাকে না।

২৪৯১। ছাদীছ ঃ—জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, এক শ্রেণীর লোক দোযখ হইতে শাফায়াত বা সুপারিশের দ্বারা বাহির হইয়া আসিবে, (লোহা অনেক সময় আগুনে পুড়িয়া নরম হইয়া যায় তদ্রূপ) তাহাদের শরীর কচি কাক্‌ড়ির ↑ ন্যায় হইয়া যাইবে।

২৪৯২। ছাদীছ ঃ— আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, এক শ্রেণীর লোক দোযখের মধ্যে কিছু কাল আজাব ভোগের পর তাহাদেরে দোযখ হইতে বাহির করিয়া বেহেশতে প্রবেশ করান হইবে, তাহারা বেহেশতীদের মুখে "জাহান্নাম হইতে পরিত্রাণ লাভকারী" নামে আখ্যায়িত হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ—উল্লেখিত হাদীছদ্বয়ে বর্ণিত লোকগণ তাহারা যাহাদের খাঁটী ঈমান ছিল, কিন্তু তাহাদের গোনাহও ছিল এবং সেই গোনাহ মাফ হওয়ার কোন ব্যবস্থা হয় নাই, ফলে তাহারা দোযখে গিয়াছে—এই শ্রেণীর লোকগণ বিভিন্ন শাফায়াৎ বা সুপারিশের দ্বারা দোযখ হইতে বাহির হইয়া বেহেশত লাভ করিতে থাকিবে।

এই শ্রেণীর লোকগণকে জাহান্নামী তথা জাহান্নাম হইতে পরিত্রাণ লাভকারী আখ্যা দেওয়ার উদ্দেশ্য হইল তাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালার দয়া ও করুণার প্রতীক এবং নিদর্শনরূপে প্রকাশ করা।

↑ "কাক্‌ড়ি" শসার ন্যায় এক প্রকার তরকারী, উহা শসা হইতেও অধিক লম্বা ও নরম হয় এবং বাঁকা-কোঁকা হইয়া থাকে।

২৪৯৩। হাদীছ— عن النعمان بن بشير رضى الله تعالى عنه

سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول ان اهون اهل النار عذابا

يوم القيمة رجل على اخمص قدميه جمرتان يغلى منهما دماغه كما

يغلى المرجل بالقمقم

অর্থ—নোমান (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, কেয়ামতের দিন দোযখীদের মধ্যে সর্ব্বাধিক কম আজাব ঐ ব্যক্তির হইবে যাহার দুই পায়ের তলায় দোযখের আগুনের দুইটি অঙ্গার রাখিয়া দেওয়া হইবে; যাহার দরুণ তাহার মাথার ভিতর মগজ পর্য্যন্ত টগ্‌বগ্‌ করিবে যেরূপ মুখে ঢাকনা-বিশিষ্ট ডেকের ভিতর রন্ধণীয় বস্তু টগ্‌বগ্‌ করিয়া থাকে।

২৪৯৪। হাদীছ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে কোন ব্যক্তি বেহেশত লাভ করিবে পূর্ব্বাহ্নে তাহাকে তাহার দোযখের ঐ স্থান দেখাইয়া দেওয়া হইবে যে স্থানে সে বদকার হইলে যাইতে বাধ্য হইত। ইহা দেখিয়া সে অধিক শোকর-গুজারী করিবে। তদ্রূপ যে কোন ব্যক্তি দোযখে যাইবে পূর্ব্বাহ্নে তাহাকে তাহার বেহেশতের ঐ স্থান দেখাইয়া দেওয়া হইবে যে স্থান সে নেক্‌কার হইলে লাভ করিত; ইহা তাহার পক্ষে অত্যধিক অনুতাপ ও দুঃখের কারণ হইবে। (৯৭২পৃঃ)

কেয়ামত দিবসে শাফায়াতের বয়ান

২৪৯৫। হাদীছ :—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিন (হাশর-ময়দানে সমস্ত লোককে একত্রিত করা হইবে হিসাবের জন্য। হিসাবের অপেক্ষায় সেখানে) মোমেনগণও আবদ্ধ থাকিবে, যদ্দরুণ তাহারা বিচলিত হইয়া পড়িবে। তখন তাহারা পরস্পর বলিবে, আমাদের পরওয়ারদেগারের দরবারে সুপারিশ লাভের ব্যবস্থা করিলে ভাল হইত; তিনি যেন আমাদিগকে আমাদের বর্ত্তমান অশান্তির অবস্থা হইতে শান্তি দান করিতেন। এই বলিয়া তাহারা আদম আলাইহেচ্ছালামের নিকট আসিবে এবং বলিবে, হে আদম! আপনি সমগ্র মানব জাতির আদি পিতা। আল্লাহ তায়ালা আপনাকে (মাতা-পিতার মাধ্যম ব্যতিরেকে) সরাসরি স্বীয় কুদরতের

হস্তে পয়দা করিয়াছিলেন, আপনাকে বেহেশতে স্থান দান করিয়াছিলেন, ফেরেশ-তাদিগকে আপনার প্রতি সেজদাবনত করিয়াছিলেন, সমস্ত জিনিষের এলম ও জ্ঞান আপনাকে দান করিয়াছিলেন; আপনি আমাদের জন্য প্রভুর দরবারে সুপারিশ করুন—আল্লাহ তায়ালা যেন আমাদিগকে এই স্থানের অশান্তি হইতে শান্তি দান করেন। আদম (আঃ) বলিলেন, আমি তোমাদের এই কাজের উপযুক্ত নই; সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁহার কৃত অপরাধের উল্লেখ করিবেন—তিনি যে, আল্লার নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাইয়াছিলেন। অবশ্য তিনি পরামর্শ দিবেন, তোমরা নূহ আলাইহে-চ্ছালামের নিকট যাও; তিনিও (এক হিসাবে *) বিশ্ববাসীর পক্ষে প্রথম নবী ছিলন।

লোকগণ নূহ আলাইহেচ্ছালামের নিকট আসিবে এবং তাহাদের আবেদন পেশ করিলে তিনিও বলিবেন, আমি তোমাদের এই কাজের উপযুক্ত নহি। তিনি তাঁহার অপরাধও উল্লেখ করিবেন—তিনি যে আল্লার দরবারে একটি আবেদন করিয়াছিলেন এবং আল্লাহ তায়ালা তাঁহার সেই আবেদন এই বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, তুমি যে বিষয় অজ্ঞ সে বিষয়ে আমার নিকট আবেদন করিও না↑। অবশ্য তিনি পরামর্শ দিবেন যে, তোমরা হযরত ইব্রাহীমের নিকট যাও তিনি "খলীলুল্লাহ" তথা পরম দয়ালু আল্লাহ তায়ালার দোস্ত ছিলেন।

লোকগণ ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের নিকট আসিবে এবং তাহাদের নিবেদন পেশ করিলে তিনিও বলিবেন, আমি তোমাদের কাজের উপযুক্ত নহি; তিনি তাঁহার তিনটি কথার উল্লেখ করিবেন—যেই তিনটি কথাকে তিনি মিথ্যা মনে করেন।⁑ অবশ্য তিনি পরামর্শ দিবেন, তোমরা হযরত মূছার নিকট যাও, তিনি আল্লাহ তায়ালার বিশিষ্ট বন্দা ছিলেন, আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে তওরাৎ কেতাব দান করিয়াছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁহার সঙ্গে সরাসরি কালাম করার তথা কথা বলার নৈকট্য তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন।

লোকগণ মূছা আলাইহেচ্ছালামের নিকট আসিবে তিনিও বলিবেন, আমি তোমাদের কাজের উপযুক্ত নহি; তিনি তাঁহার অপরাধ উল্লেখ করিবেন—তিনি যে, এক কিবতিকে হত্যা করিয়াছিলেন। অবশ্য তিনি পরামর্শ দিবেন, তোমরা হযরত

---

* নূহ আলাইহেচ্ছালামের যমানায় মহাপ্লাবনে সারা বিশ্ব ধ্বংস হইয়া দুনিয়া পুনঃ আবাদ হওয়ার পর মানব জাতির প্রতি সর্ব্বপ্রথম নবী হযরত নূহ আলাইহেচ্ছালামই ছিলেন এবং একমাত্র তাঁহার বংশ হইতে সারা বিশ্বের মানব সমাজ।

↑ সেই আবেদনটি ছিল মহাপ্লাবন কালে তাঁহার পুত্র কেনান সম্পর্কে। বিস্তারিত বিবরণ ৪র্থ খণ্ড হযরত নূহের বয়ান দ্রষ্টব্য।

⁑ কথা তিনটির বিস্তারিত বিবরণ ৪র্থ খণ্ড হযরত ইব্রাহীমের বয়ান দ্রষ্টব্য।

ঈসার নিকট যাও। তিনি আল্লাহ তায়ালার বিশিষ্ট বন্দা ছিলেন, বিশিষ্ট রসুল ছিলেন, তিনি আল্লাহ তায়ালার (বিশেষ কায়দায় প্রেরিত)** রুহ ছিলেন, তিনি (অসাধারণরূপে*** সরাসরি) আল্লার কলেমা (তথা "কুন্" শব্দের আদেশ দ্বারা পয়দা হইয়া) ছিলেন।

লোকগণ ঈসা আলাইহেচ্ছালামের নিকট আসিবে, তিনিও বলিবেন, আমি তোমাদের কাজের উপযুক্ত নহি +। তোমরা মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট যাও। তিনি আল্লাহ তায়ালার এমন প্রিয় বন্দা যে, আল্লাহ তায়ালা পূর্ব্বাহ্নেই তাঁহার আগের-পাছের সব গোনাহ মাফ বলিয়া ঘোষনা দিয়া দিয়াছেন।

হযরত (দঃ) বলেন, লোকগণ তখন আমার নিকট আসিবে। (আমি তাহাদিগকে বলিব, আমি তোমাদের কার্য্য উদ্ধারের চেষ্টা করিব, আমি তোমাদের কার্য্য উদ্ধারের চেষ্টা করিব।) সেমতে আমি আল্লাহ তায়ালার দরবারে উপস্থিতির অনুমতি প্রার্থনা করিব, আমাকে অনুমতি দান করা হইবে। আমি আল্লাহ তায়ালার দর্শন লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে সেজদায় পড়িয়া যাইব। আল্লাহ তায়ালা তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী আমাকে সেজদায় রাখিবেন। অতপর বলিবেন, হে মোহাম্মদ! আপনি সেজদা হইতে উঠুন, আপনার বক্তব্য পেশ করুণ; আপনার সুপারিশ গ্রহণ করা হইবে, আবেদন পেশ করুন; যাহা চাহিবেন তাহাই দেওয়া হইবে।

হযরত (দঃ) বলেন, তখন আমি সেজদা হইতে মাথা উঠাইব এবং আল্লাহ তায়ালার ছানা-ছিফৎ—গুণগান ও প্রশংসা করিব, যাহা আল্লাহ তায়ালা ঐ সময়ই

** পিতার মাধ্যম ব্যাতিরেকে আল্লাহ তায়ালা সরাসরি তাঁহার রুহকে জিব্রিল ফেরেশতার মারফৎ পাঠাইয়াছিলেন, জিব্রিল ফেরেশতা ফুৎকারের দ্বারা সেই রুহকে মরয়্যম বিবির গর্ভে পৌঁছাইয়াছিলেন।

*** মানুষ বরং জীব মাত্রই তাহার দেহ আল্লার কুদরত ও আদেশে পিতা-মাতার বীর্য্যের দ্বারা পয়দা হইয়া থাকে, কিন্তু হযরত ঈসা আলাইহেচ্ছালামের দেহ ঐরূপে পিতা-মাতার বীর্য্যে পয়দা হয় নাই, বরং তাঁহার দেহ মাতৃগর্ভে সরাসরি আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টির আদেশ "কুন্—হইয়া যাও" শব্দের দ্বারা পয়দা হইয়াছিল।

+ হযরত ঈসার (আঃ) নিজের কোন ত্রুটির উল্লেখ এখানে নাই, কিন্তু এক হাদীছে বর্ণিত আছে, হযরত ঈসা (আঃ) এই সময় এতটুকু বলিবেন যে, عبدت من دون الله "এক আল্লার বন্দেগী না করিয়া আমার পূজাও করা হইয়াছিল।" অর্থাৎ খৃষ্টানগণ হযরত ঈসা (আঃ)কে আল্লাহ তায়ালার সমকক্ষ—স্বয়ং আল্লাহ বা আল্লার পুত্র বা তিন খোদার এক খোদা বলিয়া থাকে; এ-সম্পুর্কে তাঁহার কোন অপরাধ নাই, তবুও তিনি এর জন্য লজ্জা বোধ করিবেন, অনুতপ্ত হইবেন।

আমাকে শিক্ষা দিবেন। (তখন হযরত মোহাম্মদ মোস্তাফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সুপারিশে হিসাব আরম্ভ হইবে এবং হাশর ময়দানের উপস্থিত কষ্ট যাতনা সমাপ্তির সূচনা হইবে। এই সুপারিশের দ্বারা দুনিয়ার আদি-অন্তের সমস্ত লোকই লাভবান হইবে এবং সন্তুষ্ট হইবে। তাই তাহারা ঐ সময় মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রসংশা-মুখর হইবে। ইহাই হইল মাকামে-মাহমুদ—তথা সারা বিশ্বের জনগণের প্রশংসা ভাজন হওয়া মর্য্যাদার একটি বিকাশ। এই শাফায়াৎ বা সুপারিশকে শাফায়াতে-কোব্রা বা বড় সুপারিশ বলা হয়, যেহেতু এই সুপারিশ সারা বিশ্বের জনগণের পক্ষে হইবে।

হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সুপারিশ এখানেই সমাপ্ত হইবে না। এর পরে আসিবে শাফায়াতে-ছোগরা তথা স্বীয় উম্মতের পক্ষে সুপারিশের বহর—তাঁহার ঈমানদার গোনাহগার উম্মতগণ যে, দোযখে যাইবে তাহাদিগকে দোযখ হইতে বাহির করিয়া বেহেশতে পৌঁছাইবার জন্য। উহারই বর্ণনা দান করতঃ হযরত (দঃ) বলেন—)।

তারপর আবার আমি শাফায়াৎ করিব (আমার গোনাহগার উম্মতকে দোযখ হইতে বাহির করার জন্য।) তখন আল্লাহ তায়ালা আমার জন্য একটি সীমা নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়া বলিবেন, আপনি যান, (এবং এই শ্রেণীর লোকগণকে দোযখ হইতে বাহির করুণ) তখন আমি আল্লার দরবার হইতে চলিয়া আসিব এবং ঐ শ্রেণীর লোকগণকে দোযখ হহতে বাহির করিয়া বেহেশতে পৌঁছাইব। তারপর আবার আমি আমার প্রভুর দরবারে ফিরিব এবং অনুমতি প্রর্থনা করিব। অনুমতি পাইয়া আমি পৌছিব এবং সেজদায় পড়িয়া যাইব। প্রভু-পরওয়ারদেগার যত সময় ইচ্ছা আমাকে সেজদায় রাখিবেন। অতঃপর বলিবেন, হে মোহাম্মদ! সেজদা হইতে উঠুন এবং আবেদন পেশ করুণ; গ্রহণ করা হইবে, সুপারিশ করুণ মঞ্জুর করা হইবে, যাহা চাহিবেন দেওয়া হইবে। আমি সেজদা হইতে উঠিব এবং আমার প্রভু-পরওয়ারদেগারের ছানা-ছিফৎ ও প্রসংশা করিব যাহা তিনি আমাকে শিক্ষা দিবেন। অতঃপর আমি শাফায়াৎ করিব, তখন আল্লাহ তায়ালা আমার জন্য সীমা নির্দ্ধারিত করিয়া দিবেন। আমি তথা হইতে চলিয়া আসিব এবং ঐ সীমার লোকগিদকে বেহেশতে পৌছাইব। আবার তৃতীয় বার আমি (আমার উম্মতের শাফায়াতের জন্য) আমার প্রভুর দরবারে ফিরিব এবং অনুমতি প্রর্থনা করিব। অনুমতি পাইয়া আমি পৌঁছিব এবং সেজদায় পড়িয়া যাইব। আমার প্রভু-পরওয়ার-দেগার যত সময় ইচ্ছা আমাকে সেজদায় রাখিবেন, অতঃপর বলিবেন, হে মোহাম্মদ! সেজদা হইতে উঠুন, নিবেদন পেশ করুন মঞ্জুর করা হইবে, সুপারিশ করুন

গ্রহণ করা হইবে, যাহা চাহিবেন দেওয়া হইবে। আমি সেজদা হইতে উঠিব এবং প্রভু-পরওয়ারদেগারের ছানা-ছিফৎ ও প্রসংশা করিব যাহা তিনি আমাকে শিক্ষা দিবেন। অতঃপর শাফায়াৎ করিব, তখন আল্লাহ তায়ালা আমার জন্য একটি সীমা নির্দ্ধারিত করিয়া দিবেন, আমি তথা হইতে চলিয়া আসিয়া ঐ সীমার লোকদিগকে বেহেশতে পৌঁছাইব।

এইভাবে ঈমানদার-গোনাহগারগণকে দোযখ হইতে বাহির করা হইতে থাকিবে। অবশেষে দোযখে একমাত্র তাহারাই থাকিয়া যাইবে যাহারা কোরআনের ঘোষনা অনুযায়ী চিরজাহান্নামী সাব্যস্ত হইয়াছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ— বোখারী শরীফ ১১১৮ পৃষ্ঠায় এই হাদীছ খানা বর্ণিত হইয়াছে। তথায় এই সীমা নির্দ্ধারণের বিষয়টির কিছু তফসীল উল্লেখ আছে— হযরত (দঃ) বলেন, সেজদা হইতে উঠিয়া আমি বলিব, হে পরওয়ারদেগার! আমার উম্মত! আমার উম্মত!! আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, আপনি যান এবং যাহার দেলে জবের দানা পরিমান ঈমান আছে, তাহাকে দোযখ হইতে বাহির করুন। দ্বিতীয় বারও সেজদা হইতে উঠিয়া হযরত (দঃ) বলিবেন, আমার উম্মত! আমার উম্মত!! এইবার আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, যাহার দেলে চীনা বা সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান রহিয়াছে তাহাকে দোযখ হইতে বাহির করুন। তৃতীয় বারও সেজদা হইতে উঠিয়া হযরত (দঃ) বলিবেন, আমার উম্মত! আমার উম্মত!! এইবার আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, যাহার দেলে সরিষার দানা অপেক্ষা ছোট আরও অধিক ছোট তার চেয়েও ছোট দানা পরিমাণ ঈমান রহিয়াছে তাহাকে দোযখ হইতে বাহির করুন।

হযরত (দঃ) আরও বলিয়াছেন যে—তারপর আমি চতুর্থ বারও প্রভুর দরবারে ফিরিব এবং সেজদাবনত হইব, আল্লার ছানা-ছিফৎ ও প্রসংশা করিব। আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, হে মোহাম্মদ! সেজদা হইতে উঠুন' নিবেদন পেশ করুন, মঞ্জুর করা হইবে, যাহা চাহিবেন দেওয়া হইবে, শাফায়াৎ করুণ গ্রহণ করা হইবে। এইবার আমি বলিব, (দোযখ হইতে বাহির করার) অনুমতি আমাকে প্রদান করুন প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে যে (কলেমা-তায়্যেবা—) লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু······কে গ্রহণ করিয়াছে। তখন আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, আমার ইজ্জৎ—বড়ায়ী ও মহানত্বের কসম—আমি নিশ্চয় দোযখ হইতে বাহির করিব প্রত্যেক ঐ ব্যক্তিকে যে কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু······গ্রহণ করিয়াছে!

২৪৯৬। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসুলুল্লাহ! কেয়ামতের দিন আপনার শাফায়াতের দ্বারা

সর্ব্বাধিক উপকৃত কোন ব্যক্তি হইবে ? হযরত (দঃ) বলিবেন, আমার এই ধারণাই ছিল যে, তুমি সর্ব্বাগ্রে এই তথ্যের হাদীছ আমাকে জিজ্ঞাসা করিবে, যেহেতু হাদীছের প্রতি আমি তোমাকে অত্যাধিক লালায়িত ও আকৃষ্ট দেখি। অতঃপর হযরত (দঃ) বলিবেন—

أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ

"কেয়ামতের দিন আমার শাফায়াৎ দ্বারা পূর্ণ উপকৃত হইবে একমাত্র ঐ ব্যক্তি যে খাঁটি অন্তরে কলেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু······কে গ্রহণ করিয়াছে।"

অর্থাৎ সায়্যেদুল-আম্বিয়া হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের শাফায়াৎও ঈমান ব্যতিরেকে নাজাতের কাজে আসিবে না।

২৪৯৭। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক নবীকে তাঁহার একটি দোয়া অবশ্যই কবুল ও গ্রহণ করার নিশ্চয়তা দিয়াছেন। এই প্রতিশ্রুত দোয়ার উদ্দেশ্য করিয়া নবী দোয়া করিলে আল্লাহ তায়ালা তাহা অবশ্যই গ্রহণ করিবেন।

সকল নবীগণ তাঁহাদের সেই প্রতিশ্রুত সুযোগের উদ্দেশ্য করিয়া দোয়া করিয়া গিয়াছেন এবং তাহা তাঁহাদের জন্য কবুল হইয়াছে। কিন্তু আমি আমার জন্য প্রতিশ্রুত সুযোগের দোয়াকে কেয়ামত দিবসে আমার উম্মতের জন্য শাফায়াৎ উদ্দেশ্যে জমা রাখিয়া দিয়াছি।

ব্যাখ্যা ঃ—বান্দাদের দোয়া আল্লাহ তায়ালা কবুল করিয়া থাকেন ; নবীগণের দোয়াত সাধারণতঃ কবুল হওয়ার কথাই। কিন্তু ইহা আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছাধীন দয়া পর্য্যায়ের মাত্র—অকাট্যরূপের নির্দ্ধারিতভাবে প্রতিশ্রুত পর্য্যায়ের নহে।

আলোচ্য হাদীছের মর্ম্ম এই যে, নির্দ্ধারিতভাবে প্রতিশ্রুত পর্য্যায়ে অকাট্যরূপে গৃহিত হওয়ার জন্য প্রত্যেক নবীকে যে কোন একটি দোয়ার সুযোগ আল্লাহ তায়ালা প্রদান করিয়াছেন। প্রত্যেক নবী তাঁহার সেই সুযোগটি দুনিয়াতেই বিশেষ প্রয়োজন ক্ষেত্রে ব্যয় করিয়া গিয়াছেন! নবীজী মোস্তফা (দঃ) বলেন, আমি সেই বিশেষ সুযোগকে উদ্দেশ্য করিয়া দুনিয়ার জীবনে কোন দোয়া করিনাই; সুতরাং আমার সেই সুযোগ ব্যায়িত হয় নাই, আমি ইচ্ছা করিয়াই উহাকে জমা রাখিয়া দিয়াছি। পরকালে কেয়ামত দিবসে আমার উম্মতের জন্য শাফায়াৎ বা সুপারিশ উপলক্ষে আমি আমার এই সুযোগ ব্যবহার করিব।

আল্লাহ তায়ালার দর্শন লাভ ও পোল-ছেরাতের বয়ান

২৪৯৮। হাদীছ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা কতিপয় লোক জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রসুলাল্লাহ! কেয়ামতের দিন আমরা আমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগারকে দেখিতে পারিব কি? হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তদুত্তরে পাল্টা প্রশ্ন করিলেন, পূর্ণিমার রাত্রে মেঘ বিহীন আকাশে চাঁদ দেখিতে কোন প্রকার বাধা-বিঘ্নের সৃষ্টি হয় কি? তাহারা বলিল, না ইয়া রসুলাল্লহ! হযরত (দঃ) পুনঃ প্রশ্ন করিলেন, মেঘ বিহীন পরিষ্কার আকাশে সূর্য্য দেখিতে তোমাদের জন্য কোন প্রকার বাধা-বিঘ্নের সৃষ্টি হয় কি? সকলেই উত্তর করিল, না ইয়া রসুলাল্লাহ! তখন হযরত (দঃ) বলিলেন, তোমরা কেয়ামতের দিন ঠিক এইরূপেই বিনা বাধা-বিঘ্নে আল্লাহ তায়ালাকে দেখিতে পাইবে।

কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা সমস্ত লোকদিগকে একত্রিত করিবেন। (তাহাদের হিসাব-নিকাশ হইবে। ভাল-মন্দ সব লোকই একত্রিত থাকিবে) অতঃপর আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, যে লোক যাহার এবাদৎ করিয়াছে তাহাকে তাহার পথ অনুসরণ করিতেই হইবে—তাহার সঙ্গে অবশ্যই তাহাকে যাইতে হইবে। সেমতে যাহারা সূর্য্য-পূজা করিত তাহারা সূর্য্যের পেছনে চলিবে তথা সূর্য্য যে স্থানে পৌঁছিবে সেও সেই স্থানে যাইতে বাধ্য হইবে। যাহারা চাঁদের পূজা করিত তাহারা চাঁদের পেছনে চলিতে বাধ্য হইবে। যাহারা বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করিত তাহারা সেই সেই দেব-দেবীদের পেছনে চলিতে বাধ্য হইবে—তথা উহারা যথায় পৌঁছিবে তাহারাও তথায় পৌঁছিতে বাধ্য হইবে।

(পবিত্র কোরআন ও সুস্পষ্ট হাদীছের দ্বারা প্রমাণিত আছে—যে সব দেব-দেবীর পূজা করা হয় বা পাথর, মাটি, কাষ্ঠ ইত্যাদি দ্বারা তৈরী মূর্ত্তি বা যে কোন বস্তুকে পূজা করা হয় ঐ সব, এমনকি চন্দ্র-সূর্য্যকেও দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে—শাস্তি দানের জন্য নয়, বরং তাহাদের পূজকগণকে এক সঙ্গে দোযখে পৌঁছাইবার উদ্দেশ্য ↑। সেমতে উপরোল্লেখিত ঘোষণা অনুযারী আল্লাহ ভিন্ন অন্য যে কিছুর পূজকগণ সকলেই দোযখে পতিত হইবে।)

তখন শুধুমাত্র এক আল্লার বন্দেগীকারীদের দল অবশিষ্ট থাকিবে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে সেই দলের নামধারী মোনাফেকরাও থাকিবে (যাহারা চিরজাহান্নামী। এতদ্ভিন্ন তাহাদের মধ্যে খাঁটি ঈমানদার-গোনাহগারগণও থাকিবে যাহাদের অনেকে অস্থায়ীরূপে দোযখে যাইবে। সুতরাং ঐ সময় এই দলের পরীক্ষাও হইবে যে—)

↑ আর যাহারা কোন দেব-দেবী বা মুর্ত্তী পূজা করে নাই, কোন পয়গাম্বরকে আল্লার শরীক বানাইয়াছে—যেমন ইহুদীগণ হযরত ওযায়ের (আঃ)কে, নাছারাগণ ঈসা (আঃ)কে আল্লার শরীক বলিয়া থাকে, তাহাদের বর্ণনা পরবর্ত্তী হাদীছে উল্লেখ হইতেছে।

তখন ঐ দলকে আল্লাহ তায়ালা তাঁহার সাক্ষাৎ-দান করিবেন এবং বলিবেন, আমি তোমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার। কিন্তু (সেই সাক্ষাৎ দান তাঁহার এমন গুণাবলীর সহিত হইবে, যাহা ঐ সব গুণাবলী হইতে ভিন্ন যে সব গুণাবলী সম্পর্কে কোরআন-হাদীছের মাধ্যমে মানুষের জ্ঞান রহিয়াছে। ফলে) তাহারা ঐ দর্শনে আল্লাহ তায়ালার প্রতি স্বীকৃতি প্রদান করিবে না। তাহারা বলিবে, আমরা এই স্থানেই থাকিব যাবৎ না আমরা আমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগারের সাক্ষাৎ পাই। আমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগারের সাক্ষাৎ পাইলে আমরা তাঁহাকে চিনিতে পারিব। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে এমন গুণাবলীর সহিত সাক্ষাৎ দান করিবেন যে সব গুণাবলীর সহিত তাহারা পরিচিত; আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, আমি তোমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার! সঙ্গে সঙ্গে তাহারা স্বীকার করিবে, হাঁ—আপনি আমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার! অতঃপর ঐ দল আল্লাহ তায়ালার (আদেশের) অনুসরণে চলিতে থাকিবে। (এখনও ঐ দলের মধ্যে মোনাফেক ও বদকারগণ গা-ঢাকা দিয়া রহিয়াছে, তাই) তখন জাহান্নমের উপর পোল-ছেরাৎ কায়েম করা হইবে।

হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, আমি সর্ব্বপ্রথম পোল-ছেরাৎ অতিক্রম করিব। ঐ সময় (সকল মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত হইবে। কাহারও মুখে কথা ফুটিবে না,। একমাত্র রসূলগণই কথা বলিবেন। রসূলগণের বাক্যও ঐ সময় শুধু এই হইবে— اللهم سلم سلم! হে আল্লাহ! রক্ষা করুণ! রক্ষা করুণ!!

জাহান্নামের মধ্যে অসংখ্য আঁকড়া থাকিবে যাহার বক্র মাথা সা'দান কাঁটার ন্যায় হইবে। তোমরা দেখিয়াছ ত, সা'দান কাঁটা কি সাংঘাতিক রকমের হয়? সকলেই আরজ করিল, হাঁ—ইয়া রসুলুল্লাহ! আমরা সা'দান কাঁটা দেখিয়াছি। হযরত (দঃ) বলিলেন, জাহান্নামের আঁকড়াগুলির বক্র মাথা সেই সা'দান কাঁটার ন্যায় হইবে, অবশ্য জাগতিক সা'দান কাঁটার তুলানায় জাহান্নামের আঁকড়ার বক্র মাথা যে কত গুণ বেশী বড় হইবে তাহা আল্লাহই জানেন। জাহান্নামের উপরিস্থ পোল-ছেরাৎ অতিক্রম করা কালে ঐ আঁকড়া সমূহ (স্বয়ং ক্রিয়ারূপে) বিভিন্ন লোককে তাহাদের আমল অনুপাতে টানিয়া ধরিবে। কেহ বা তাহার বদ-আমলের দরুণ সেই টানে জাহান্নমে পতিত হইবে। কেহ বা হোঁচট্ খাইয়া পড়িবে, কিন্তু রক্ষা পাইয়া যাইবে। এইরূপে সমস্ত লোকদের মধ্যে বিচার-পর্ব্ব শেষ হওয়ার পর যখন আল্লাহ তায়ালা মেহেরবানী করিয়া কোন কোন দোযখীকেও*

---

* ইহারা ঐ সব ঈমানদার লোকগণ যাহারা গোনাহের শাস্তি ভোগের জন্য অস্থায়ীরূপে দোযখে গিয়াছে।

দোযখ হইতে বাহির করার ইচ্ছা করিবেন তখন (বিভিন্ন শাফায়াত ও সুপারিশের ফলে) তিনি ফেরেশতাগণকে (ঐ সব লোক স্তরে স্তরে দোযখ হইতে বাহির করিবার আদেশ করিতে থাকিবেন। এমনকি অবশেষে) আদেশ করিবেন, যে সব লোক আল্লার সহিত কোন কিছুকে শরীক করে নাই—যাহারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌...... (কলেমা-তাইয়েবার ঈমান) গ্রহণ করিয়া ছিল সেই সব লোককে দোযখ হইতে বাহির কর! ফেরেশতাগণ ঈমানদার লোকগণকে দোযখের মধ্যে সেজদার নিশান দ্বারা (সহজে) চিনিতে পারিবেন ; দোযখের অগ্নি মোমেনের সমস্ত শরীরকে ভস্ম করিতে পারিবে, কিন্তু সেজদার অঙ্গ সমূহে কোন ক্রিয়া করিতে পারিবে না ; দোযখের আগুনের জন্য আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারের সেজদার অঙ্গগুলিকে হারাম করিয়া দিয়াছেন।

ঐ সমস্ত লোককে দোযখ হইতে এমন অবস্থায় বাহির করা হইবে যে, তাহারা আগুনে পুড়িয়া কয়লা হইয়া গিয়াছে। তাই তাহাদের উপর মাউল-হায়াৎ—জীবনী শক্তিময় পানি প্রবাহিত করা হইবে ; যেই পানির প্রবাহনে তাহারা অতিশয় সুন্দর জীবন লাভ করিয়া উঠিবে—যেরূপ বাদলা ঘাসের মুল পলিমাটির মধ্যে (সোনালী রং ধারণ করিয়া) অঙ্কুরিত হয়। এই পর্য্যায়ের বিচার-বিবেচনাকেও আল্লাহ তায়ালা সমাপ্তি করিবেন। শুধুমাত্র একটি লোক অবশিষ্ট থাকিবে—সেই লোকটিই হইবে দোযখীদের মধ্যে সর্ব্বশেষ বেহেশতে প্রবেশকারী।

এই লোকটিকে দোযখ হইতে বাহির করিয়া দোযখের কেনারায় বসাইয়া রাখা হইবে—লোকটির মুখ দোযখের দিকে থাকিবে। লোকটি দোয়া করিবে, হে প্রভু-পরওয়ারদেগার! আমার মুখের দিকটা দোযখ হইতে ফিরাইয়া দিন ; দোযখের দুর্গন্ধ আমাকে অতিষ্ঠ করিয়া ফেলে এবং উহার অগ্নি শিখা আমাকে পোড়াইয়া ফেলে। সে আল্লার দরবারে এই দোয়াই করিতে থাকিবে যত সময় দোয়া করা আল্লার ইচ্ছা থাকে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমার এই আকাঙ্খা পূর্ণ করা হইলে এরূপ হওয়ার সম্ভাবনা ত নাই যে, তুমি আরও কিছু চাহিয়া বস ? সে ব্যক্তি বলিবে, তোমার ইজ্জতের কসম—ইহা ভিন্ন আমি আর কিছু চাহিব না। এই বলিয়া সে আল্লার দরবারে বহু রকমের ওয়াদা-অঙ্গীকার প্রদান করিবে যাহা কিছু আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা হইবে। অতঃপর আল্লাহ তাহার মুখের দিক দোযখ হইতে ফিরাইয়া দিবেন। যখন সে বেহেশতমুখী হইবে এবং বেহেশত দেখিতে পাইবে তখন আল্লাহ যত সময় তৌফিক দেন সে চুপ করিয়া থাকিবে। তারপর বলিবে, হে পরওয়ারদেগার! আমাকে বেহেশতের দরওয়াজা পর্য্যন্ত আগে

বাড়াইয়া দিন। আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, তুমি না আমার নিকট ওয়াদা-অঙ্গীকার করিয়াছ যে, কখনও আর অন্য কিছু চাহিবে না—কতই না অঙ্গীকার ভঙ্গকারী তুমি? তখন সে হে প্রভু! হে প্রভু!! বলিয়া দোয়া করিতেই থাকিবে। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, এই সম্ভাবনা নাই ত যে, তোমার এই আকাঙ্খা পূর্ণ করা হইলে তুমি আবার অন্য কিছু চাহিবে? সে বলিবে, না না—তোমার ইজ্জতের কসম, ইহা ভিন্ন আমি আর কিছুই চাহিব না। এই কথার উপর সে যত ইচ্ছা ওয়াদা-অঙ্গিকার প্রদান করিবে। তখন আল্লাহ তায়ালা তাহাকে বেহেশতের দরওয়াজা পর্য্যন্ত আগে বাড়াইয়া দিবেন। যখন সে বেহেশতের দরওয়াজায় দাঁড়াইবে তখন বিশাল বেহেশত তাহার দৃষ্টিগোচরে আসিবে এবং বেহেশতের অগণিত নেয়ামতরাশি ও ভোগ-বিলাশের সামগ্রী সমুহ সে দেখিতে পাইবে।

এই বারও সে যত সময় চুপ থাকা আল্লাহ তাহার অদৃষ্টে রাখিয়াছেন, চুপ থাকিবে। অতঃপর সে নিবেদন করিবে, হে পরওয়ারদেগার! আমাকে বেহেশতে পৌঁছাইয়া দিন। আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, তুমি আমার নিকট কত কত ওয়াদা-অঙ্গীকার করিয়াছ—তুমি আর কিছু চাহিবে না? হে আদম-তনয়! তুমি কঠোর শাস্তির উপযুক্ত। কতই না অঙ্গীকার ভঙ্গকারী তুমি! ঐ ব্যক্তি বলিবে, প্রভু হে! আমি আপনার রহমত হইতে বঞ্চিত থাকিয়া কপাল-পোড়া হইতে চাই না—এই বলিয়া সে দোয়া করিতেই থাকিবে। এমনকি আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া যাইবেন। যখন আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া যাইবেন তখন তাহাকে বলিবেন, যাও—বেহেশতে প্রবেশ কর।

ঐ ব্যক্তি বেহেশতে যাওয়ার পর আল্লাহ তায়ালা তাহাকে বলিবেন, তোমার যত যত আরজু-আকাঙ্খা হইতে পারে সব তুমি প্রকাশ কর। ঐ ব্যক্তি তাহার আরজু-আকাঙ্খা প্রকাশ করিবে এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট তাহা পাইবার দরখাস্ত করিবে। তদুপরি আল্লাহ তায়ালাও তাহাকে অনেক কিছু আরজু-আকাঙ্খা স্মরণ করাইয়া দিবেন—ইহাও চাও, উহাও চাও, এমনকি আর কোন আশা আকাঙ্খা বাকী থাকিবে না। তখন আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, তোমাকে তোমার সমুদয় আশা আকাঙ্খা সামগ্রী দেয়া হইল এবং আরও ঐ পরিমাণ অধিক দেওয়া হইল।

আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) নামক ছাহাবী এই হাদীছের বর্ণনা শ্রবণকালে এস্থলে বলিয়া উঠিলেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি—আমি পুর্ণরূপে স্মরণ রাখিয়াছি, একবার হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—"উহার দশ গুণ অধিক তোমাকে দেওয়া হইল।

আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, এই ব্যক্তি হইবে সর্ব্ব শেষ বেহেশতে প্রবেশকারী।

২৪৯৯। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, দোযখ হইতে বাহির হইয়া বেহেশতে প্রবেশকারীদের সর্ব্বশেষ লোকটির অবস্থা আমি ভালরূপে জ্ঞাত আছি। সে হইবে এমন এক ব্যক্তি যে, হামাগুড়ি খাইয়া দোযখ হইতে বাহির হইবে (—একবার সে একটু চলিতে সক্ষম হইবে আবার হোঁচট্ খাইয়া পড়িবে এবং আগুন তাহাকে লেপ্‌টিয়া ও জড়াইয়া ধরিবে, অবশেষে সে দোযখ অতিক্রম করিয়া আসিতে সক্ষম হইবে। দোযখ অতিক্রম করিয়া আসার পর সে দোযখের প্রতি তাকাইয়া বলিবে, কত বড় মহান মহান তিনি—যিনি আমাকে দোযখ হইতে নাজাত দিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা আমাকে এত বড় নেয়ামত দান করিয়াছেন যে, ঐরূপ দান আগের-পাছের কোন ব্যক্তিকেই করেন নাই।)

আল্লাহ তায়ালা তাহাকে বেহেশতে প্রবেশের অনুমতি দিবেন। সে বেহেশতে আসিলে পর তাহার মনে হইবে, বেহেশত যেন পরিপূর্ণ। সে তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া আরজ করিবে, হে পরওয়ারদেগার! বেহেশত ত পরিপূর্ণ দেখিলাম। আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, তুমি যাও এবং বেহেশতে প্রবেশ কর। এইবারও তাহার ধারণা হইবে বেহেশত যেন পরিপূর্ণ। সে পুনরায় ফিরিয়া আসিবে এবং বলিবে, হে পরওয়ারদেগার! বেহেশত ত পরিপূর্ণ। আল্লাহ বলিবেন, তুমি বেহেশতে প্রবেশ কর, তোমাকে সমগ্র জগৎ পরিমাণ আরও উহার দশ গুণ অধিক পরিমাণ বিশাল ও বিস্তীর্ণ বেহেশত প্রদান করা হইল। সে ব্যক্তি বলিবে, আপনি সকল বাদশার বাদশাহ, আপনি আমার সঙ্গে রহস্য করিতেছেন?

হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী বলেন, এই বয়ানের সময় আমি হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে দেখিয়াছি, তিনি এমন ভাবে হাসিয়া পড়িয়াছেন যে, তাঁহার মুখের ভিতরের দাঁত দেখা গিয়াছে। তখন সকলেই বলাবলি করিল যে, এই হইবে সর্ব্ব নিম্ন বেহেশতী ব্যক্তির মর্য্যাদা!

ব্যাখ্যাঃ—বেহেশতে প্রবেশকারী সর্ব্বশেষ ব্যক্তির অবস্থা পূর্ব্বোল্লেখিত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হাদীছেও বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত হাদীছের বিবরণ একটু বিস্তারিত, তথাপি দোযখের কিনারা হইতে বেহেশতের দরওয়াজা পর্য্যন্ত পৌছার বিবরণটা ঐ হাদীছেও সংক্ষিপ্ত। আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর আলোচ্য হাদীছটি মোসলেম শরীফেও আছে। তথায় এই বিষয়টির বিবরণ এইরূপ রহিয়াছে—

দোযখের কিনারা হইতে অনতি দুরে একটি বৃক্ষ তাহার দৃষ্টিগোচর হইবে। তখন সে বলিবে, হে পরওয়ারদেগার! আমাকে ঐ বৃক্ষটির নিকটবর্ত্তী করিয়া

দিন। আমি উহার ছায়ায় আশ্রয় নিব এবং উহার নিকটস্থ প্রবাহমান পানি পান করিব। আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, তোমাকে এই সুযোগ প্রদান করিলে হয়ত তুমি আরও চাহিবে। সে বলিবে, না—ইয়া পরওয়ারদেগার! সে অঙ্গীকার করিবে যে, অন্য আর কিছু সে চাহিবে না। পরওয়ারদেগারও তাহাকে এই ব্যাপারে ক্ষমার্হ গণ্য করিবেন। যেহেতু সে এমন এক জিনিষ দেখিতেছে যাহা দেখিয়া সে ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারে না। অতএব আল্লাহ তায়ালা তাহাকে ঐ বৃক্ষের নিকটবর্ত্তী পোঁছাইয়া দিবেন।

অতঃপর তথা হইতে অনতি দুরে আর একটি বৃক্ষ তাহার দৃষ্টিগোচর হইবে। উহা আরও অধিক উত্তম। উহা সম্পর্কেও সে পূর্ব্বের ন্যায় আবেদন-নিবেদন করিবে। আল্লাহ তায়ালা তাহাকে বলিবেন, তুমি আমার নিকট অঙ্গীকার করিয়া ছিলে, আর কিছু চাহিবে না। এইবারও সে ওয়াদা-অঙ্গীকার দিবে এবং তাহাকে ঐ বৃক্ষের নিকটে পোঁছাইয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর তৃতীয় আর একটি বৃক্ষ বেহেশতের দরওয়াজার নিকটবর্ত্তী তাহার দৃষ্টিগোচর হইবে, যে বৃক্ষটি প্রথমোক্ত উভয়টি হইতে উত্তম। উহা সম্পর্কেও তাহার সেই আবেদন-নিবেদন পেশ হইবে এবং আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতেও পূর্ব্বের ন্যায় বলা হইবে। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে ঐ তৃতীয় বৃক্ষের নিকটও পোঁছাইবেন। তথায় যাইয়া সে বেহেশতবাসীদের সুমধুর আওয়াজও শুনিতে পাইবে। তখন সে আরজ করিবে, হে পরওয়ারদেগার! আমাকে বেহেশতের মধ্যেই পোঁছাইয়া দিন। তখন আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, হে আদম-তনয়! তোমার হইতে আমার জন্য রেহাই পাইবার উপায় কি? তুমি কি ইহাতে সন্তুষ্ট হইবে যে, আমি সমগ্র দুনিয়ার দ্বিগুণ বিশাল বেহেশত তোমাকে দান করি? তখন ঐ ব্যক্তি বলিবে, হে প্রভু আপনি কি আমার সঙ্গে রহস্য করেন? অথচ আপনি ত সারা জাহানের প্রভু!

হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) এই বয়ানের সময় হাসিয়া পড়িলেন এবং শ্রোতাগণকে বলিলেন, তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা কর, আমি কেন হাসিলাম। শ্রোতাগণ জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কেন হাসিলেন? তিনি বলিলেন, এই বয়ান কালে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামও হাসিয়া ছিলেন এবং ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনি কি কারণে হাসিলেন? হযরত (দঃ) বলিয়া ছিলেন যে—"আপনি সারা জাহানের প্রভু-পরওয়ারদেগার হইয়া আপনি আমার সঙ্গে রহস্য করেন?" এই কথা উপলক্ষে রাব্বুল আলামীনের হাসির পরিপ্রেক্ষিতেই আমি হাসিয়াছি এবং তখন আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, আমি তোমার সঙ্গে রহস্য করি না, বরং আমি যাহা ইচ্ছা করি তাহাই করিতে সক্ষম।

২৫০০। হাদীছঃ— আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! কেয়ামতের দিন আমরা আমাদের প্রভু পরওয়ারদেগারকে দেখিতে পারিব কি? হযরত (দঃ) প্রশ্ন করিলেন, মেঘ বিহীন পরিষ্কার দিনে সূর্য্য দেখিতে তোমাদের কোন বাধা-বিঘ্ন হয় কি? আমরা উত্তর করিলাম, না। হযরত (রাঃ) বলিলেন, তদ্রূপ কেয়ামতের দিন তোমাদের প্রভু পরওয়ারদেগারকে দেখিতেও কোন বাধা-বিঘ্ন থাকিবে না।

অতঃপর হযরত (দঃ) (কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার এক বিশেষ দর্শনের বর্ণনা দান পূর্ব্বক) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে এক ঘোষণাকারী ঘোষণা দিবে, যে দল যাহার পূজা করিত সেই দলকে তাহার সঙ্গে যাইতে হইবে। সেমতে ছলীব বা ক্রুশ পূজকগণ ক্রুশের সঙ্গে যাইতে বাধ্য হইবে। দেব-দেবীর পূজারীগণ দেব-দেবীদের সঙ্গে যাইতে বাধ্য হইবে—এইরূপে প্রত্যেক পূজণীয় বস্তুর সহিত উহার পূজকগণ যাইতে বাধ্য হইবে (এবং ঐ সব পূজণীয় বস্তু যেহেতু দোযখে নিক্ষিপ্ত হইবে তাই উহাদের পূজকগণও দোযখে যাইতে বাধ্য হইবে)। অবশিষ্ট থাকিয়া যাইবে ঈমানের দাবীদার দল—যাহাদের মধ্যে মোনাফেক ও গোনাহগারগণও থাকিবে এবং কিছু সংখ্যক কেতাবধারী কাফের (—ইহুদ-নাছারাদের এক দল লোক যাহাদের পূজণীয় ছিল নবী বা পয়গাম্বর, তাহারা অন্য কোন স্থূল বস্তুর পূজক ছিল না, অথচ নবী ত আর দোযখে যাইবেন না, তাই ঐ লোকদিগকে দোযখে নেওয়ার অন্য ব্যবস্থা করা হইবে যে—) তারপর জাহান্নামকে (হাশর-ময়দানের নিকটে) আনা হইবে। দুর হইতে উহা মরীচিকার ন্যায় দেখা যাইবে। তখন ইহুদীগণকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, তোমরা কাহাকে মাবুদ গণ্য করিয়াছ? তাহারা বলিবে, আল্লার পুত্র ওযায়েরকে (যিনি বস্তুতঃ একজন নবী ছিলেন) মাবুদ গণ্য করিয়া থাকিতাম। তাহাদিগকে বলা হইবে—তোমরা মিথ্যাবাদী; আল্লাহ তায়ালার স্ত্রী-পুত্র নাই। এখন তোমরা কি চাও? (সঙ্গে সঙ্গে ঐ সময় তাহাদের উপর ভয়ানক পিপাসা চাপাইয়া দেওয়া হইবে তাই) তাহারা বলিবে, আমাদিগকে পানি পান করান। (তাহাদের সম্মুখে দোযখ মরীচিকার ন্যায় পানিরূপ দেখা যাইবে;) তাহাদিগকে বলা হইবে, ঐ স্থানে যাইয়া পানি পান কর। তখন তাহারা ঐ স্থানে যাইবে এবং দোযখে পতিত হইবে।

তারপর নাছারাগণকেও জিজ্ঞাসা করা হইবে, তোমরা কাহার বন্দেগী করিয়াছ? তাহারা বলিবে, আমরা আল্লার পুত্র মসীহ্-এর এবাদৎ করিয়াছি। তাহাদিগকে বলা হইবে, তোমরা মিথ্যাবাদী; আল্লাহ তায়ালার স্ত্রী-পুত্র নাই। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবে। তোমরা কি চাও? (তাহাদেরও ঐ অবস্থা এবং) তাহারাও বলিবে, আমরা পানি চাই। তাহাদিগকেও (ঐ দোযখের দিকে দেখাইয়া) বলা

হইবে ঐ পানি পান কর। তাহারাও তথায় যাইয়া দোযখে পতিত হইবে। এখন অবশিষ্ট থাকিয়া যাইবে শুধু এক আল্লার বন্দেগীর দাবীদার দল যাহাদের দলে মোনাফেক ও গোনাহগার লোকগণ গা-ঢাকা দিয়া থাকিবে। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, তোমরা বসিয়া আছ কেন? সব লোক ত চলিয়া গিয়াছে? তাহারা উত্তর করিবে, ঐ লোকগণ হইতে আমরা দুনিয়াতেই ভিন্ন ছিলাম। অথচ দুনিয়াতে ত তাহাদের প্রতি আমাদের প্রয়োজনও ছিল। আজ ত সেই প্রয়োজনও নাই। আমরা এখানে এক ঘোষণাকারীর ঘোষণা শুনিতে পাইয়াছি যে, প্রত্যেক দলকে তাহাদের মা'বুদের সঙ্গে যাইতে হইবে; সুতরাং আমরা আমাদের সৃষ্টি-কর্ত্তা প্রভু-পরওয়ারদেগারের অপেক্ষায় আছি।

হযরত (দঃ) বলেন—তখন ঐ লোকদের আল্লাহ তায়ালার দর্শন লাভ হইবে। প্রথম দর্শনে তাহাদের সম্মুখে আল্লাহ তায়ালার এমন গুণাবলীর বিকাশ হইবে যাহা ঐ গুণাবলী হইতে ভিন্ন যে সব গুণাবলী পূর্ব্ব হইতে তাহারা জ্ঞাত রহিয়াছে। (অতঃপর দ্বিতীয়বার দর্শন লাভ হইবে এই দর্শনে এমন গুণাবলীর বিকাশ হইবে যাহা সম্পর্কে পূর্ব্ব হইতে তাহারা জ্ঞাত। এইবার যখন) ঘোষণা হইবে আমি তোমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা—প্রভু-পরওয়ারদেগার, তখন তাহারা স্বীকৃতি পেশ করিবে, হাঁ—আপনি আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা প্রভু-পরওয়ারদেগার। (এতটুকু ব্যতীত সাধারণ ভাবে) ঐ দিন আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে কথোপকথন নবীগণেরই হইবে।

তারপর তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, তোমাদের জ্ঞানে প্রভু-পরওয়ার-দেগারের কোন বিশেষ গুণের পরিচয় আছে কি? তাহারা বলিবে, হাঁ—আছে; তাহা হইলে "সাক্" +। তখন সেই গুণ ও ছিফতের বিকাশ হইবে যাহার প্রভাবে (সকলেই সেজদার প্রতি আকৃষ্ট হইবে এবং) খাঁটি মোমেনগণ ত অনায়াশে আল্লার দরবারে সেজদাবনত হইয়া পড়িবে। পক্ষান্তরে দুনিয়াতে যাহারা শুধু লোক-দেখানো এবং লোক-শুনানো উদ্দেশ্যে সেজদা করিয়া থাকিত—ঐ দিন তাহাদের প্রত্যেকেই সেজদা হইতে বঞ্চিত থাকিয়া যাইবে; সেজদা করার জন্য প্রস্তুত হইবে, কিন্তু তাহাদের পীঠ ও কোমরের হাড়গুলি জমাট বাঁধিয়া একখানা কাষ্ঠের ন্যায় হইয়া যাইবে।

\+ "সাক্" হইল আল্লাহ তায়ালার একটি ছিফৎ বা বিশেষ গুণ যাহার বিকাশ ইহ-জগতে হয় নাই বলিয়া আমরা উহার কোন ব্যাখ্যা উপলব্ধি করিতে সক্ষম নহি। অবশ্য পবিত্র কোরআন ২৯ পারা ছুরা নূনের মধ্যে উহার এবং উহা সম্পর্কে এই বিবরণ উল্লেখ রহিয়াছে যে—"কেয়ামতের দিন যখন "সাক্" গুণ বা ছিফতের বিকাশ হইবে তখন (উহার প্রতিক্রিয়ায়) সকলেই সেজদার প্রতি আকৃষ্ট হইবে (এবং সেজদাবনত হইবে) কিন্তু যাহারা মোনাফেক

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

তারপর পোল-ছেরাৎকে আনা হইবে এবং দোযখের উপর উহাকে প্রতিষ্ঠিত করা হইবে। আমরা আরজ করিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! পোল-ছেরাতের অবস্থা কি? হযরত (দঃ) বলিলেন, উহা (গোনাহগারদের পক্ষে) ভীষণভাবে পাছাড় খাওয়ার স্থান, আছাড় খাওয়ার স্থান। উহার উভয় পার্শ্বে অসংখ্য লোহার আঁকড়া লট্‌কানো থাকিবে এবং অতি প্রশস্ত প্রশস্ত কাঁটা থাকিবে যে সবের বক্র মাথায় বড়শির ন্যায় উল্টা কাঁটাও থাকিবে যেরূপ নজদ অঞ্চলের সা'দান কাঁটা হইয়া থাকে। (ঐ সব আঁকড়া ও কাঁটাগুলি আল্লার হুকুমে স্বয়ংক্রিয়রূপে বিভিন্ন লোককে বাঁধাইতে থাকিবে।) পক্ষান্তরে সৎ ও কামেল মোমেনগণ ঐ পোল-ছেরাৎ অতিক্রম করিবে—কেহ বা চোখের পলকের ন্যায় দ্রুতগতিতে, কেহ বা বিজলীর ন্যায়, কেহ বা বাতাশের ন্যায় কেহ দ্রুতগামী ঘোড়া বা উটের ন্যায়। সারকথা এই যে, ঐ পোল-ছেরাৎকে এক শ্রেণীর লোক ত সম্পূর্ণ ছহীহ্-সালামত ও অক্ষত আবস্থায় অতিক্রম করিবে (—ইহারা হইলেন নেককার মোমেনগণ)। আর এক শ্রেণীর লোক (উহারা উভয় পার্শ্বের আঁকড়া ও কাঁটা সমুহের দ্বারা) ক্ষত-বিক্ষত হইয়া রেহায়ী পাইবে এবং পার হইয়া যাইবে (—ইহারা হইল অল্প-স্বল্প গোনাহ করিয়াছে এমন মোমেনগণ।) আর এক শ্রেণীর লোককে ত (আঁকড়া ও কাঁটার সাহায্যে) জাহান্নামে ফেলিয়া দেওয়া হইবে (—ইহারা হইল চির জাহান্নামী মোনাফেকগণ এবং অস্থায়ী সাজা ভোগী বদকার মোমেনগণ।) এনমকি পোল-ছেরাৎ অতিক্রমকারীদের সর্ব্ব শেষ ব্যক্তি হিঁচড়ানো অবস্থায় পার হইবে।

অতঃপর নেককার মোমেনগণ যাহারা পরিত্রাণ পাইয়াছে। তাহারা গোনাহগার মোমেন ভাইদের জন্য মহাপরাক্রমশালী আল্লার দরবারে এত জোরদার দাবী পেশ করিবে যে, তোমাদের কেহ নিজের সুস্পষ্ট প্রাপ্যের জন্য আমার নিকট ঐরূপ জোরদার দাবী পেশ করে না। তাহারা বলিবে, হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমাদের ভাইগণ—আমাদের সঙ্গে তাহারা নামায পড়িয়া থাকিত, আমাদের সঙ্গে রোজা রাখিয়া থাকিত, আমাদের সঙ্গেই বিভিন্ন আমল করিয়া থাকিত (তাহারা গোনাহের কারণে দোযখে পতিত হইয়াছে—আমরা তাহাদের নাজাতের জন্য সুপারিশ পেশ করিতেছি।) তখন আল্লাহ তায়ালা ঐ মোমেনগণকে বলিবেন,

---

ছিল তাহারা তখন সেজদা করিতে সক্ষম হইবে না। তাহারা তখন অবনত দৃষ্টি লইয়া অপমাণ ও লাঞ্ছনায় পরিবেষ্টিত থাকিবে। দুনিয়াতে তাহাদিগকে খাঁটিভাবে আল্লার সেজদা করার প্রতি আহ্বান জানান হইত এবং তখন তাহারা সক্ষমও ছিল (তবুও তাহারা সেই আহ্বানকে উপেক্ষা করিয়া ছিল; ফলে ঐ দিন তাহারা সেজদা করিতে সক্ষম হইবে না।)"

তোমরা যাও এবং যাহার দেলে দীনার—স্বর্ণমুদ্রা পরিমাণ ঈমান দেখ তাহাকে দোযখ হইতে বাহির কর। গোনাহের কারণে যে মোমেনগণ দোযখে যাইবে আল্লাহ তায়ালা তাহাদের চেহারা আগুনের জন্য হারাম করিয়া দিবেন। (অতএব ঐ মোমেনদের পরিচয় পাওয়া সম্ভব হইবে।) সুপারিশকারী মোমেনগণ গোনাহগার মোমেনদের নিকট আসিয়া দেখিবে, (গোনাহের পরিমাণ হারে) কাহারও কাহারও উভয় পা দোযখের আগুনে, কাহারও অর্দ্ধ গোছা পর্য্যন্ত আগুনে। তাহারা যাদেরকে উল্লিখিত সীমার অন্তরভুক্ত পাইবে তাহাদিগকে দোযখ হইতে বাহির করিবে। তারপর পুনরায় আল্লার দরবারে ফিরিবে এবং সুপারিশ করিবে। এই-বার আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, যাহাদের দেলে অর্দ্ধ দীনার পরিমাণ ঈমান দেখ তাহাদিগকে বাহির কর। ঐ সীমার ভিতরে যাহাদিগকে পাইবে তাহাদিগকে বাহির করিবে এবং আবার আল্লার দরবারে ফিরিবে। এইবার আল্লাহ তয়ালা বলিবেন, যাহার দেলে অণু পরিমাণ ঈমান দেখ তাহাকে দোযখ হইতে বাহির কর। তাহারা তাহাই করিবে—অণু পরিমাণ ঈমান আছে এরূপ সকলকে দোযখ হইতে বাহির করিয়া আনিবে।

এই ভাবে নবীগণ, ফেরেশতাগণ, এমনকি নেককার মোমেনগণও গোনাহগার মোমেনগণকে দোযখ হইতে বাহির করার জন্য সুপারিশ করিবে এবং বাহির করিবে! অতঃপর মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, সকলেই সুপারিশ করিয়াছে শুধু আমার সুপারিশ (তথা অন্যের সুপারিশ ব্যতিরেকে শুধু আমার দয়া ও রহমতের দ্বারা অণু হইতেও কম পরিমাণের ঈমানদারকে বাহির করা) বাকী রহিয়াছে! এই বলিয়া আল্লাহ তায়ালা তাঁহার সেই দয়া ও রহমত দ্বারা একবার বাহির করিবেন, তাহাতে এক দল লোক বাহির হইবে যাহারা আগুনে পুড়িয়া কয়লা হইয়া গিয়াছে। তাহাদিগকে বেহেশতের দরওয়াজায় প্রবাহিত একটি নহর বা খালের মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া হইবে; ঐ খালের পানি জীবনী-শক্তিবাহী পানি। ফলে তাহারা (অতি সুন্দর রং-রূপের নব-জীবন লাভ করতঃ) ঐ খালের উভয় কিনারা বহিয়া উঠিবে যেরূপ বাদলা ঘাসের মুল পলি মাটির মধ্যে অঙ্কুরিত হইয়া থাকে।

ঐ লোকগণ উক্ত নহর হইতে মতির ন্যায় উজ্জল হইয়া বাহির হইবে। তাহাদের ঘাড়ের উপর সীল মোহর দ্বারা চিহ্নিত করা হইবে। বেহেশতবাসীগণ তাহাদিগকে "ওতাকাউর-রহমান—পরম দয়ালু আল্লাহ তায়ালার মুক্ত দল" আখ্যা দান করিবে। আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে দুনিয়া হইতে আখেরাতের প্রতি প্রেরিত কোন প্রকার নেক আমল ও ভাল কাজ ব্যতিরেকেই (শুধু মাত্র অতি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম পরিমাণ খাঁটি ঈমানের অছিলায়) বেহেশতে পৌঁছাইবেন।

তাহাদের প্রত্যেককে বেহেশতের মধ্যে বলা হইবে, যে পরিমাণ তোমাদের দৃষ্টি ও ধারণায় আসিতে পারে সেই পরিমাণ এবং তৎসঙ্গে আরও তত পরিমাণ অধিক তোমাদিগকে দেওয়া হইল। (১১০৭ পৃঃ)

ব্যাখ্যা ঃ—এই শেষ শ্রেণীর লোকদের ঈমান ছিল, কারণ ঈমান ব্যতিরেকে কাহারও নাজাত হইতেই পারে না। কিন্তু তাহাদের আভ্যন্তরীণ ঈমান ভিন্ন সারা জীবনে কোন প্রকার একটি নেক আমলও তাহারা করে নাই, ফলে তাহাদের ঈমানের আলো ও নিশান এত ক্ষীণ যে, নেককার মোমেনগণ নবীগণ এমনকি ফেরেশতাগণ পর্য্যন্ত উহার খোঁজ পান নাই। একমাত্র সর্ববজ্ঞ আলেমুল-গায়েব আল্লাহ তায়ালাই উহা জ্ঞাত ছিলেন; আল্লাহ তায়ালা ত সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম জিনিষও জ্ঞাত থাকেন। পবিত্র কোরআনের ঘোষণা ঃ—

وَلَا حَبَّةٍ فِىْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ

অর্থাৎ ঃ—কোন একটি বীজ (বট ইত্যাদির গোটার ভিতর বীজগুলি কত সূক্ষ্ম হয় উহার একটি বীজ) মাটির ভিতরে অন্ধকারে থাকিলে তাহাও আল্লাহ তায়ালা জ্ঞাত থাকেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—উল্লেখিত সুদীর্ঘ হাদীছদ্বয়ে হযরত (দঃ) কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার এক বিশেষ দর্শনের বিবরণ দান করিয়াছেন। অন্যান্য হাদীছে আল্লাহ তায়ালার আরও বিভিন্ন দর্শনের বিবরণ রহিয়াছে।

মোসলেম শরীফের এক হাদীছে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, বেহেশতী লোকগণ বেহেশতে পৌঁছিবার পর আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমাদের অতিরিক্ত আর কিছুর খাহেস আছে কি? তাহারা বলিবে, আপনি আমাদিগকে উজ্জ্বল ও নূরানী চেহারা দান করিয়াছেন, বেহেশতে স্থান দিয়াছেন, দোযখ হইতে পরিত্রাণ দান করিয়াছেন। (আমাদের আর কি খাহেস থাকিতে পারে?)

হযরত (দঃ) বলেন, মানব চোখে আল্লাহ তায়ালাকে দেখার যে অসম্ভাব্য রহিয়াছে ঐ মুহূর্ত্তে আল্লাহ তায়ালা তাহা দুর করিয়া দিবেন এবং তাহারা আল্লাহ তায়ালাকে খোলা চোখে দেখিতে সক্ষম হইবে। বেহেশতবাসীগণ আল্লাহ তায়ালার সেই দর্শনকে সর্ববাধিক ভালবাসার নেয়ামত গণ্য করিবে।

অতঃপর হযরত (দঃ) কোরআন শরীফের এই আয়াতখানা তেলাওয়াত করিলেন— لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ "যাহারা ছুনিয়াতে ঈমান

আনিয়াছে ও নেক আমল করিয়াছে আখেরাতে তাহাদের জন্য অতি সুন্দর বেহেশত রহিয়াছে এবং তৎসঙ্গে আরও একটি অতিরিক্ত জিনিষ তাহারা লাভ করিবে।"

প্রকাশ থাকে যে, সেই অতিরিক্ত জিনিষটি হইল বেহেশতের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার দিদার বা দর্শন লাভ।

তিরমিজী শরীফে একখানা হাদীছ আছে—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, বেহেশতীগণ বেহেশতে পৌঁছার পর নিজ নিজ আমল অনুপাতে শ্রেণী লাভ করিবে। অতঃপর এক সপ্তাহ পরিমাণের সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালার সহিত সাক্ষাতের সুযোগ দেওয়া হইবে। তখন তাহারা আল্লাহ তায়ালার সাক্ষাৎ লাভ করিবে—তাহাদের সম্মুখে আল্লাহ তায়ালার আরশ বিকশিত হইবে এবং আল্লাহ তায়ালার দর্শন তাহাদের লাভ হইবে—(এই অনুষ্ঠান) বেহেশতে একটি বিশেষ বাগানে অনুষ্ঠিত হইবে। সেই অনুষ্ঠানে বেহেশতবাসীদের জন্য তাহাদের শ্রেণী অনুপাতে বিভিন্ন মূল্যমানের আসন নির্দ্ধারিত করা হইবে।

আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমরা কি আমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগারের দর্শন লাভ করিতে পারিব? হযরত (দঃ) বলিলেন, হাঁ—তোমরা কি সূর্য্য বা পূর্ণিমার চাঁদ দেখিতে কোন প্রকার সন্দেহের সম্মুখীন হইয়া থাক? আমরা বলিলাম, না। হযরত (দঃ) বলিলেন, তদ্রূপ সন্দেহাতীত ভাবেই তোমরা তোমাদের প্রভুর দর্শন লাভ করিবে। এতদ্ভিন্ন ঐ অনুষ্ঠানের প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে আল্লাহ তায়ালা সামনাসামনি কথাবার্ত্তা বলিবেন। এমনকি এক ব্যক্তিকে (রহস্যালাপরূপে) জিজ্ঞাসা করিবেন, হে অমুকের পুত্র অমুক! ঐ দিন স্মরণ আছে কি—যে দিন তুমি এই এই বলিয়াছিলে? এই বলিয়া আল্লাহ তায়ালা সেই লোকের দুনিয়ায় থাকাকালীন কতিপয় অসঙ্গত বিষয়ের উল্লেখ কবিবেন। ঐ ব্যক্তি বলিবে, হে পরওরারদেগার! আপনি ত আমাকে মাফ করিয়া দিয়াছেন! আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, হাঁ—আমার ক্ষমার ফলেই ত তুমি এই মর্য্যাদা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছ। অতঃপর তাহাদের উপর এক খণ্ড মেঘমালা আসিয়া এমন খোশবু দ্বারা গোলাবপাশী করিবে যাহার তুলনা হয় না।

ঐ অনুষ্ঠান শেষে তথা হইতে সকলেই একটি মেলায় আসিবে। তথায় বেহেশতবাসীদের পরস্পর মেলামেশা হইবে এবং নানাবিধ নেয়ামত সামগ্রী তথা হইতে তাহাদের সঙ্গে বহন করিয়া নিয়া আসা হইবে। বেহেশতের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলে তাহাদের সহধর্ম্মীণীগণ তাহাদিগকে স্বাগতম জানাইয়া বলিবে—আপনারা ত পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী রূপস হইয়া আসিয়াছেন! তাঁহারা বলিবেন, আমরা

আজ আমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগারের মিলন লাভ করিয়াছি উহারই বদৌলতে আমাদের এই পরিবর্ত্তন।

তিরমিজী শরীফে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে একখানা হাদীছ বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার নিকট উচ্চ মর্য্যাদাধিকারী ব্যক্তিগণ প্রতি সকাল-বিকাল দুই বার আল্লাহ তায়ালার দর্শন লাভের সুযোগ পাইয়া থাকিবে। (কম মর্ত্তবার লোকগণ সেই সুযোগ নিজ নিজ আমল অনুপাতে লাভ করিয়া থাকিবে।)

আবু দাউদ শরীফের এক হাদীছে বর্ণিত আছে, আবু রযীন (রাঃ) বলিয়াছেন, একদা আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—ইয়া রসুলাল্লাহ! আখেরাতে আমাদের প্রত্যেকেই কি স্বীয় প্রভু-পরওয়ারদেগারকে নিজ নিজ স্থানে থাকিয়া দেখিতে সক্ষম হইবে? হযরত (দঃ) বলিলেন, হাঁ। আমি আরজ করিলাম, তাহা কিভাবে হইবে—এরূপ কোন নমুনা আছে কি? হযরত (দঃ) বলিলেন, হে আবু রযীন! পূর্ণিমার চাঁদ তোমাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ স্থানে থাকিয়া দেখিতে সক্ষম হও না কি? আমি আরজ করিলাম, হাঁ। হযরত (দঃ) বলিলেন, উহা ত আল্লাহ তায়ালার একটি সৃষ্ট বস্তু, আর আল্লাহ ত অতি মহান ও অসীম ক্ষমতার অধিকারী।

ইবনে মাজাহ শরীফের একখানা হাদীছ—জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, বেহেশতবাসীগণ অসংখ্য নেয়ামত ও ভোগ-বিলাসের মধ্যে জীবন-যাপন প্রতিষ্ঠা করার পর আকস্মিকরূপে এক দিন তাহাদের উপর একটি নূর বা আলোর বিকাশ হইবে। তাঁহারা উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া প্রভু-পরওয়ারদেগারকে দেখিতে পাইবেন এবং আল্লাহ তায়ালা তাঁহাদিগকে এইরূপে সালাম করিবেন—السلام عليكم يا اهل الجنة "হে জান্নাতবাসীগণ তোমাদের প্রতি সালাম।"

পবিত্র কোরআনেও এই বিষয়ের ইঙ্গিত রহিয়াছে—سلام قولا من رب رحيم "দয়াল প্রভুর তরফ হইতে (বেহেশতবাসীদের) মৌখিক সালাম লাভ হইবে।"

ঐ সময় আল্লাহ তায়ালা তাঁহাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিপাত করিবেন। তাঁহারাও আল্লাহ তায়ালার দর্শন লাভ করিবেন এবং যাবৎ এই দর্শনের সুযোগ তাঁহাদের থাকিবে তাবৎ তাঁহারা কোন নেয়ামতের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করিবেন না।

২৫০১। হাদীছঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, দয়া ও মমতা আল্লাহ তায়ালা (সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর উহাকে) এক শত ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তন্মধ্য হইতে নিরানব্বই ভাগ তিনি নিজে ব্যবহার করার জন্য রাখিয়া দিয়াছেন। শুধুমাত্র এক ভাগ সৃষ্টি জগতে অবতীর্ণ করিয়াছেন। (এবং সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে ঐ এক ভাগকে

বণ্টন করিয়া দিয়াছেন।) উহারই ক্রিয়ায় সৃষ্টিজগত পরস্পর দয়া ও মমতার ব্যবহার করিয়া থাকে। এমনকি একটি ঘোড়া (ঐ দয়া ও মমতার এক অংশ হইতে যে বিন্দু লাভ করে উহারই ক্রিয়া এত বড় যে, ঘোড়াটির পায়ের নীচে উহার বাচ্চা পতিত হইলে দয়া ও মমতা বশে শত কষ্ট করিয়াও সে তাহার পা উঠাইয়া রাখে এই আশঙ্কায় যে, বাচ্চাটি আঘাত পায় নাকি !

হাওজে-কাওছারের বয়ান

২৫০২। হাদীছ :—আছ্‌মা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, (কেয়ামতের দিন) আমি তোমাদের জন্য সুব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে হাওজে-কাওছারের কিনারায় যাইয়া অবস্থান করিব। আমি অপেক্ষায় থাকিব আমার নিকট পানি অন্বেষণকারীদের। এমতাবস্থায় এক দল লোকের গতি ফিরাইয়া দেওয়া হইবে—আমার নিকটে তাহাদিগকে পৌঁছিতে দেওয়া হইবে না। তখন আমি বলিব, তাহারা আমার উম্মৎ (তাহাদিগকে আসিতে দেওয়া হউক ;) তখন আল্লাহ তায়ালায় তরফ হইতে বলা হইবে, আপনার ত জানা নাই—তাহারা আপনার দিকে মুখ করতঃ পিছপায়ে পশ্চাদের দিকে চলিয়াছে।

অর্থাৎ বাহ্যিকরূপে আপনার দিকে মুখকারী তথা আপনার আনুগত্য দেখাইত, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা আপনার অনুসারী ছিল না, বরং আপনার দিকের বিপরীত দিকে তাহারা চলিয়াছে। সুতরাং তাহারা আপনার নিকট আসিতে পারে না।

এই অবস্থা মানুষের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। তাই এই হাদীছের রাবী বিশিষ্ট তাবেয়ী ইবনে-আবী-মোলায়কা (রঃ) সর্ব্বদা এই দোয়া করিয়া থাকিতেন—

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ اَنْ نَرْجِعَ عَلٰى اَعْقَابِنَا اَوْ نُفْتَنَ

"হে আল্লাহ ! আমরা তোমার আশ্রয় চাই, পশ্চাদের দিকে চলা হইতে এবং ভ্রষ্টতায় পতিত হওয়া হইতে।"

২৫০৩। হাদীছ :—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি তোমাদের জন্য সুব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে পূর্ব্বাহ্নেই হাওজে-কাওছারের কিনারায় পৌঁছিব। তোমাদের তথা আমার উম্মতের আকৃতির এক দল লোক আমার দৃষ্টিগোচর হইবে—এমনকি আমি পানির পেয়ালা তাহাদিকে দেওয়ার প্রস্তুতি নিব। এমতাবস্থায় আমার নিকট পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তাহাদের গতি (দোযখের দিকে) ফিরাইয়া দেওয়া

হইবে। তখন আমি বলিব, হে পরওয়ারদেগার! তাহারা আমার দল। আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, আপনি জানেন না—তাহারা আপনার (দুনিয়া ত্যাগের) পরে আপনার প্রদত্ত সুন্নত-তরীকার বিপরীত কত রকম পন্থা আবিষ্কার করিয়া ছিল।

২৫০৪। হাদীছ ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, (আখেরাতে) তোমাদের সম্মুখে এমন একটি হাওজ আসিবে যাহা 'জারবা' ও 'আজরুহ্' অঞ্চলদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ব্যবধানের সম পরিমাণ প্রশস্ত।

২৫০৫। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার হাওজের প্রশস্ততা (সিরিয়ার) আয়লা অঞ্চল হইতে ইয়ামানের সানা শহর পর্য্যন্ত ব্যবধানের পরিমাণ। উহার মধ্যে পানি পান করার কাপ বা পেয়ালা আকাশের নক্ষত্র পরিমাণ সংখ্যায় রহিয়াছে।

২৫০৬। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার হাওজ এক মাস চলার পথ পরিমাণ প্রশস্ত, উহার পানির রং দুধ অপেক্ষা অধিক শুভ্র এবং কস্তুরী অপেক্ষা অধিক সুবাসিত, উহার কাপ বা পেয়ালার সংখ্যা আকাশের নক্ষত্র পরিমাণ। যে ব্যক্তি এক বার উহার পানি পান করিবে চিরকাল তাহার পিপাসা লাগিবে না।

২৫০৭। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, (মে'রাজ উপলক্ষে) আমি যখন বেহেশত পরিভ্রমন করিতে ছিলাম তখন আমি একটি নহর দেখিতে পাইলাম—যাহার উভয় কিনারায় গম্বুজ আকারে খোদাই করা এক মতির তৈরী শান্তিশালাসমূহ রহিয়াছে। আমি জিব্রাইল (আঃ)কে উহা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম; তিনি বলিলেন, ইহাই ত হাওজে-কাওছার যাহা আপনার প্রভু আপনাকেই খাছভাবে দান করিয়াছেন। আমি দেখিলাম, উহার কাঁদা হইল অতিশয় সুগন্ধিময় কস্তুরী।

২৫০৮। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, এক দল লোক যাহারা আমারই উম্মতের আকৃতির হইবে হাওজে-কাওছারের কিনারায় আমার নিকটবর্ত্তী আসিবে। এমনকি আমি তাহাদিগকে আমার উম্মতরূপে চিনিতে পারিব, এমতাবস্থায় আমার সন্নিকটে পৌঁছিবার পুর্ব্বেই তাহাদের গতি জাহান্নামের দিকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। তখন আমি বলিব, ইহারা ত আমার উম্মৎ! আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, আপনি জানেন না, আপনার দুনিয়া ত্যাগের পরে ইহারা (আপনার তরীকা বা আদর্শ ছাড়িয়া অন্য) কত রকম তরীকা ও অনুকরণীয় গড়াইয়া ছিল।

২৫০৯। হাদীছ ঃ—সাহ্‌ল (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি তোমাদের জন্য সুব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে পূর্ব্বাহ্ণেই হাওজে-কাওছারের কিনারায় পৌঁছিব। আমার সন্নিকটে পৌঁছিতে যে সক্ষম হইবে সে-ই উহার পানীয় পান করিবে। একবার উহার পানি যে পান করিবে চিরকাল তাহার পিপাসা লাগিবে না। এক দল লোক আমার নিকটে আসিবে যাহাদিগকে আমি (আমার উম্মৎরূপে) চিনিতে পারিব, তাহারাও আমাকে চিনিতে পারিবে। সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদিকে আমার হইতে দুরে হটাইয়া দেওয়া হইবে। আমি বলিব, ইহারা ত আমার উম্মৎ! উত্তরে বলা হইবে, আপনি জানেন না, আপনার দুনিয়া ত্যাগের পরে ইহারা কি সব পন্থা গাড়াইয়া ছিল! আমি বলিব, দুরে হঠাও! হাঁকাইয়া নিয়া যাও ঐ সব লোককে যাহারা আমার পরে আমার তরীকা ও আদর্শকে বিকৃত করিয়াছে।

২৫১০। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বর্ণনা করিয়াছেন, আমার হাওজে-কাওছারের কিনারায় অবস্থান কালে এক দল লোক আমার দিকে অগ্রসর হইবে; এমনকি আমি তাহাদিগকে আমার উম্মৎরূপে গণ্য করিব। তখন এক জন মানুষ (আকৃতি ফেরেশতা) যাইয়া তাহাদিগকে বলিবে, ঐ দিকে চল। আমি জিজ্ঞাসা করিব তাহারা কোন দিকে যাইবে? সে বলিবে খোদার কসম—দোযখের দিকে তাহাদের যাইতে হইবে। আমি বলিব, তাহাদের এই অবস্থা কেন? সে বলিবে, আপনার পরে তাহারা আপনার দিকেই মুখ রাখিয়া পিছপায়ে পশ্চাদে চলিয়াছে*।

* অর্থাৎ বাহ্যিকরূপে আপনার উম্মতে রহিয়াছে; কার্য্যতঃ আপনার বিরুদ্ধে চলিয়াছে।

আবার এক দল লোকের সঙ্গে ঐরূপ করা হইবে এবং তাহাদের সম্পর্কে ঐরূপই বলা হইবে। ঐ শ্রেণীর লোকদেরকে রেহায়ী পাইতে খুব কমই দেখিব।

তক্‌দীরের বয়ান

তক্‌দীরের মূল তাৎপর্য্য হইল, আল্লাহ তায়ালার এল্‌ম ও জ্ঞান, অর্থাৎ মানুষ তাহার প্রাপ্ত স্বায়ত্ব শাসিত স্বাধীন ক্ষমতা ও ইচ্ছার দ্বারা পরবর্ত্তীকালে যাহা করিবে বা তাহার উপর বিভিন্ন কারণে অথবা বাহ্যিক কারণ ব্যতিরেকে যাহা কিছুর আবির্ভাব হইবে অনাদি কাল হইতে আল্লাহ তায়ালা তাহা জ্ঞাত আছেন। এমনকি লৌহে-মাহ্‌ফুজ সৃষ্টি করিয়া আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক ব্যক্তির নামে নামে ঐসব তথ্য লিখিয়াও রাখিয়াছেন, কিন্তু মানুষের স্বায়ত্ব শাসন-ক্ষমতা ও ইচ্ছাকে খর্ব্ব করেন নাই; ঐ সব কার্য্যাবলী যখন বাস্তবায়ীত হইবে তখন তাহার সেই ক্ষমতা ও ইচ্ছার মাধ্যমেই হইবে।

বুঝিবার জন্য সামান্য একটি নমুনা—রেলওয়ে টাইম টেব্‌ল। এক বৎসর বা ছয় মাস পূর্ব্ব হইতেই প্রত্যেক গাড়ীর প্রত্যেক ষ্টেশনে নির্দ্ধারিত সময়ে গমনাগমন বোর্ড কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত, লিখিত ও ছাপান হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে ইঞ্জিন চালকের স্বাধীন ক্ষমতা ও ইচ্ছা খর্ব্ব হয় না, বরং তাহার ইচ্ছায়ই গাড়ী পরিচালিত হইয়া প্রতি ষ্টেশনে পৌছিতে থাকে। অবশ্য মানুষের জ্ঞান অতি সামান্য ও সংকীর্ণ, তাই সেই জ্ঞানে উৎপাদিত টাইম টেবেলে ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। পক্ষান্তরে আল্লাহ তায়ালার এল্‌ম ও জ্ঞান ত ঐরূপ নহে, তাই সেই জ্ঞানে উৎপাদিত লৌহে-মাহ্‌ফুজের লেখার ব্যতিক্রম ঘটে না; ইহাও আল্লাহ তায়ালার এল্‌ম ও জ্ঞানের কামাল—পরিপূর্ণতা। ইহাতে মানুষের স্বায়ত্ব শাসন-ক্ষমতা ও ইচ্ছা খর্ব্ব হয় না। বিশেষতঃ সে যখন কার্য্য করার পূর্ব্বে উহা সম্পর্কে আদৌ কোন খোঁজ রাখে না। সুতরাং উহার দ্বারা তাহার ইচ্ছা খর্ব্ব হওয়ার প্রশ্নই আসে না। এই সম্পর্কে অধিক বিবরণ প্রথম খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে।

২৫১১। হাদীছ :—এমরান ইবনে হোছাইন (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল—ইয়া রসুলাল্লাহ! বেহেশতী ও দোযখী কি নির্দ্ধারিত রহিয়াছে? হযরত (দঃ) বলিলেন, হাঁ। ঐ ব্যক্তি বলিল, তবে মানুষ আমল কেন করিবে? হযরত (দঃ) বলিলেন, প্রত্যেকে উহার উপযোগী আমলই করিয়া থাকে যাহা তাহার (কর্ম্মফলরূপে) সৃষ্টির প্রথম হইতেই আল্লার জানা রহিয়াছে।

অর্থাৎ—কে বেহেশতের আমল করিয়া বেহেশতে যাইবে, কে দোযখের আমল করিয়া দোযখে যাইবে তাহা আল্লাহ তায়ালার নিকট তাঁহার এল্‌ম ও অগ্রিম জ্ঞানে জানা রহিয়াছে বটে, কিন্তু উহার বিবরণ কাহারও জানা নাই। তাই প্রত্যেকে নিজ নিজ ইচ্ছায়ই আমল করিয়া থাকে এবং তাহার আমল উক্ত অবগতির পরিচয় বহন করে।

২৫১২। হাদীছ :—হোজায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ভাষণ দান করিলেন—কেয়ামত পর্য্যন্ত দুনিয়াতে যত উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা ঘটিবে হযরত (দঃ) সেই সব ঘটনা উক্ত ভাষণে বর্ণনা করিয়াছেন। যে স্মরণ রাখিয়াছে স্মরণ রাখিয়াছে এবং যে ভুলিয়া গিয়াছে ভুলিয়া গিয়াছে।

অনেক সময় কোন ঘটনা আমার চোখের সামনে প্রকাশ পায় যাহা হযরতের সেই ভাষণে শুনিয়াছিলাম, কিন্তু ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এখন ঘটনা দেখার পর তাহা আমার স্মরণে আসিয়া যায়। যেরূপ কাহারও পরিচিত একজন লোক তাহার হইতে দুরে ছিল বলিয়া সে তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছিল। এখন তাহাকে দেখিয়া তাহার পরিচয় স্মরণ হইয়া যায়।

২৫১৩। হাদীছঃ— আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা আমরা (মদীনা শরীফের কবরস্থান—জান্নাতুল-) বাকীর মধ্যে একটি জানাজার সহিত ছিলাম। হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তথায় তশরীফ আনিলেন এবং বসিয়া পড়িলেন। আমরাও তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে বসিয়া পড়িলাম। হযরতের হস্তে একখানা ছোট লাঠি ছিল। তিনি মাথা নত করিলেন এবং (কোন বিষয়ে চিন্তামগ্ন ব্যক্তির ন্যায়) ঐ লাঠি দ্বারা মাটি খোঁচিতে লাগিলেন। অতঃপর বলিলেন, যত মানুষ পয়দা হয় প্রত্যেকের জন্য লিখিয়া রাখা হয় যে, তাহার স্থান বেহেশতে বা দোযখে এবং ইহাও লিখিয়া রাখা হয় যে, সে বদকার হইবে বা নেককার হইবে। এক ব্যক্তি বলিল, ইয়া রসুলাল্লাহ! তবে আমরা (চেষ্টা করিয়া নেক) আমল করা ছাড়িয়া দিয়া সেই লেখার উপরই ভরসা করিয়া থাকি না কেন? আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি নেককারের দল ভুক্ত বলিয়া সাব্যস্ত থাকিবে সে নেককারদের আমলের প্রতিই (বাধ্যগতরূপে) ধাবিত হইবে। (চেষ্টা করার আবশ্যক কি?) আর যে ব্যক্তি বদকারের দলভুক্ত বলিয়া সাব্যস্ত থাকিবে সে বদকারের আমলের প্রতিই (বাধ্যগতরূপে) ধাবিত হইবে।

তদুত্তরে হযরত (দঃ) বলিলেন—لا اعملوا فكل ميسر (চেষ্টা ছাড়িয়া হাত-পা গুটাইয়া) সেই লেখার উপর ভরসা করিয়া বসিয়া থাকিও না। নেক আমলের চেষ্টা করিয়া যাইতেই হইবে। (ইহাই আল্লাহ তায়ালার আদেশ ও বিধান,) অবশ্য প্রত্যেকের সাধ্যে ঐ লেখাই জোটিয়া আসিবে—যে ব্যক্তি নেককারদের দলভুক্ত সাব্যস্ত হইয়াছে, তাহার সাধ্যে নেককারের আমলই জোটিবে, আর যে ব্যক্তি বদকারদের দলভুক্ত সাব্যস্ত হইয়াছে তাহার সাধ্যে বদকারদের আমলই জোটিবে।

এই তথ্যের সমর্থনে যহরত (দঃ) পবিত্র কোরআনের এই আয়াতটি তেলাওয়াত করিলেন—...... فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى "(আল্লার এল্‌মে ও লৌহে-মাহ্‌ফুজের লেখায়) যাহার এই আমল সাব্যস্ত হইয়া আছে যে, সে নিজের ক্ষমতা ও ইচ্ছা ব্যয় করিয়া দান-খয়রাত করিবে পরহেজগারী অবলম্বন করিবে, কলেমা তায়্যেবার প্রতি ঈমান আনিবে আমি তাহার জন্য জোটাইয়া ও জোগার করিয়া দিব ঐ সব মঙ্গল ও কল্যাণের আমল এবং সুগম করিয়া দিব তাহার জন্য মুক্তির পথ। পক্ষান্তরে যাহার এই আমল সাব্যস্ত হইয়া আছে যে, সে (নিজের স্বায়ত্ত্ব শাসিত শক্তি ও ইচ্ছা ব্যয় করিয়া) কৃপণতা করিবে, আল্লার বিধানকে উপেক্ষা করিবে কলেমা তায়্যেবাকে অস্বীকার করিবে তাহার জন্য আমি জোটাইয়া ও যোগাড় করিয়া দিব ঐ দুঃখ-কষ্টের আমল এবং তাহার জন্য খুলিয়া দিব ধ্বংসের পথ।

তকদীরে যাহা আছে মান্নত দ্বারা তাহাই পূর্ণ হয়

২৫১৪। হাদীছ :— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَاْتِىْ اِبْنَ اٰدَمَ النَّذْرُ بِشَىْءٍ لَمْ يَكُنْ قُدِّرَ لَهُ وَلٰكِنْ يُلْقِيْهِ النَّذْرُ اِلَى الْقَدْرِ قَدْ قُدِّرَ لَهُ فَيَسْتَخْرِجُ اللّٰهُ بِهِ مِنَ الْبَخِيْلِ فَيُؤْتِىْ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُؤْتِىْ مِنْ قَبْلُ

অর্থ :— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মান্নত মানুষকে এমন কোন জিনিষ আনিয়া দিতে পারে না যাহা তাহার জন্য (আল্লার তরফ হইতে) নির্দ্ধারিত ছিল না। হাঁ—মান্নত মানুষকে ঐ জিনিষের প্রতিই পৌঁছায় যাহা তাহার জন্য নির্দ্ধারিত করা ছিল। ফলতঃ মান্নতের দ্বারা আল্লাহ তায়ালা কৃপণের মাল বাহির করিয়া থাকেন—কৃপণ মান্নত সূত্রে মাল খরচ করিয়া থাকে যাহা সে মান্নত ব্যতিত খরচ করিত না।

● প্রকাশ থাকে যে, অতি ফজিলতের একটি বাক্য আছে যাহার ছওয়াবে বেহেশতে অসংখ্য নেয়ামতের ভাণ্ডার লাভ হইবে (তৃতীয় খণ্ডে ১৪৯৭নং হাদীছ দ্রঃ।)

বাক্যটি এই— لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

এই মহান বাক্যের মর্ম্মও তকদীর নামীয় তথ্যই। কারণ, উহার অর্থ— "কোন কিছু হইতে বাঁচিবার উপায় এবং কোন কিছু লাভের বা করিবার শক্তি নাই আল্লার নির্দ্ধারণ এবং সাহায্য ব্যতিরেকে"।

হযরত আদম ও মূছার একটি বিতর্ক

২৫১৫। **হাদীছ :**—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—তিনি বলিয়াছেন, আমি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মুখে এই বর্ণনা শুনিয়াছি যে, একদা আদম (আঃ) ও মূছা (আঃ) বিতর্কে লিপ্ত হইলেন। মূছা (আঃ) আদম আলাইহেচ্ছালামের উপর কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, হে আদম (আঃ)! আপনি আমাদের আদি পিতা (আপনাকে আল্লাহ তায়ালা নিজ বিশেষ কুদরত বলে মাতা-পিতার মাধ্যম ব্যতিরেকে সরাসরি পয়দা করিয়া বেহেশতে রাখিয়া

দিয়া ছিলেন + আপনি নিজ ত্রুটির দরুণ তথা হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছেন। এই ভাবে) আপনি আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছেন এবং বেহেশত হইতে আমাদিগকে বাহির করিয়াছেন।

আদম (আঃ) বলিলেন, হে মূছা! আল্লাহ তায়ালা আপনাকে বিশেষভাবে মর্য্যাদাবান করিয়াছেন—তিনি আপনার সঙ্গে সরাসরি কালাম করিয়াছেন এবং তাঁহার বিশেষ কুদরত বলে লিখিত আকারে তৌরাত কেতাব আপনাকে দান করিয়াছেন। সেই কেতাব লৌহ-মাহ্‌ফুজের মধ্যে আমার সৃষ্টির চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেই লিখিত হইয়া ছিল। আপনি কি সেই তৌরাতে এই বিবরণটি পাইয়াছেন, "আদম তাহার প্রভু-পরওয়ারদেগারের আদেশের বরখেলাফ কাজ করিয়া ফেলিল, ফলে সে ভ্রম ও ভুল করার দোষে দোষী গণ্য হইল*"? মূছা (আঃ) বলিলেন, হাঁ—এই বিবরণ পাইয়াছি। আদম (আঃ) বলিলেন,) আপনি আমার উপর এমন একটি কাজের জন্য দোষারোপ করিতেছেন, যাহা আল্লাহ তায়ালা (লৌহে-মাহ্‌ফুজে) আমার জন্য লিখিয়া রাখিয়াছেন—আমার সৃষ্টির চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে? এই পয়েণ্টে আদম (আঃ) জয়ী হইলেন মূছা আলাইহেচ্ছালামের উপর।

ব্যাখ্যা ঃ—এই বিতর্ক আলমে-বরযখ তথা আখেরাত-জগতের প্রথম স্তর বা বিভাগে অনুষ্ঠিত হইয়া ছিল। মোসলেম শরীফের হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে, এই বিতর্ক আল্লার দরবারে অনুষ্ঠিত হইয়া ছিল। মূল তরজমা বন্ধনীর মধ্যবর্ত্তী বিষয় বস্তুগুলিও মোসলেম শরীফ হইতে গৃহিত।

এই ঘটনার একটি বিষয় শুদ্ধ ও সূক্ষ্মরূপে বুঝিয়া নেওয়া আবশ্যক। এই ঘটনায় হযরত আদম (আঃ) স্বীয় অপরাধ খণ্ডনের জন্য আল্লার অগ্রিম লেখা তথা তক্‌দীরকে পেশ করিয়াছেন। অথচ ইহা ইসলামের বিধান পরিপন্থী—

+ যদি আদম (আঃ) বেহেশত হইতে বহিষ্কৃত হইয়া দুনিয়াতে না আসিতেন, বেহেশতেই থাকিতেন তবে আদমজাত মানব সমাজও তথায় থাকিত।

* এই বিবরণটি পবিত্র কোরআনেও রহিয়াছে; তৎসঙ্গে আরও একটি বিষয়ের উল্লেখ রহিয়াছে। কোরআনের আয়াত—

وعصى آدم ربه فغوى - ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى

"আদম তাহার প্রভুর আদেশের বরখেলাফ কাজ করিয়া ফেলিলেন। ফলে তিনি ভ্রম ও ভুল করার দোষে দোষী গণ্য হইলেন। অতঃপর (তিনি তওবা করায়) তাঁহার প্রভু তাঁহাকে বিশেষ মর্য্যাদা দান করতঃ গ্রহণ করিয়া নিলেন। তাঁহার তওবা কবুল করিয়া নিলেন এবং তাঁহাকে চির সৎ পথের পথিক বানাইয়া দিলেন। (১৬ পারা ১৬ রুকু)

এইরূপ অজুহাতে কাহারও অপরাধ খণ্ডিত হইতে পারে না। সুতরাং অপরাধ খণ্ডনে হযরত আদমের উক্ত পন্থা অবৈধ বলিয়া ধারণা হইতে পারে।

এই অভিযোগের উত্তর বুঝিবার জন্য তক্‌দীর সম্পর্কীয় মছআলাহ জ্ঞাত হওয়াই যথেষ্ট। তাহা এই যে—রোগ-শোক আপদ-বিপদ ইত্যাদি হইতে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা-তদবীর ও ব্যবস্থা অবলম্বন করা শরীয়তেরই আদেশ ও বিধান। ঐ অবস্থায় তক্‌দীরের বুলি আওড়াইয়া আত্মরক্ষার ব্যবস্থাবলম্বন করা হইতে এবং চেষ্টা-তদবীর হইতে হাত-পা গুটাইয়া থাকাকে সাধারণভাবে শরীয়ত ও ইসলাম মোটেই অনুমোদন করে না। কেহ এরূপ করিলে শরীয়তের দৃষ্টিতে সে তিরস্কার ও ভৎর্সনার পাত্র। কিন্তু সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা-তদবীর করার পরও বিপদ প্রতিরুদ্ধ হইল না, বিপদ আসিলই ঐ সময় যদি কেহ এই বিপদগ্রস্ত হওয়ার দরুণ তিরস্কার ও ভৎর্তনা করে তবে তাহার উত্তরে এবং সাধারণ ভাবেও ঐ অবস্থায় ধৈর্য্য লাভের জন্য তক্‌দীরকে তুলিয়া ধরা অনুমোদিত নহে, বরং কর্ত্তব্যই বটে। বিপদগ্রস্ত হইলে "ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন" পড়ার তাৎপর্য্য ইহাই যে, আমাদের সকলের মালিক আল্লাহ তায়ালা, অতএব আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য যখন যে অবস্থার সৃষ্টি করিবেন উহা এড়াইবার উপায় নাই।

তদ্রূপ—গোনাহ ও অপরাধ করিয়া গোনাহ মাফ হওয়ার যে ব্যবস্থা শরীয়তে রহিয়াছে তথা খাঁটিভাবে তওবা করা, আল্লার দরবারে কান্না-কাটা করা—এই ব্যবস্থা অবলম্বন না করিয়া তক্‌দীরকে তুলিয়া ধরা এবং তদ্দরুণ নিজকে নিরপরাধ গণ্য করা বা ক্ষমার্হ গণ্য করা—এই সবকে শরীয়ত মোটেও অনুমোদন করে না, বরং উহা আর একটি বড় গোনাহ গণ্য হইয়া থাকে। কিন্তু কেহ গোনাহ করিয়াছে অতঃপর সে যথারীতি তওবা করিয়াছে, আল্লার দরবারে যথাসাধ্য কান্না-কাটা করিয়াছে, এমতাবস্থায়ও যদি কেহ ঐ গোনাহকে উল্লেখ করিয়া তাহার প্রতি কটাক্ষ করে তবে তাহা খণ্ডন করার জন্য সে তক্‌দীরকে তুলিয়া ধরিতে পারে।

আদম আলাইহেচ্ছালামের ব্যাপারটা তদ্রূপই। তিনি অপরাধ করিয়া এমন তওবা করিয়া ছিলেন, যাহার তুলনা হয় না। দীর্ঘ তিন শত বৎসর কাল আল্লার দরবারে কাঁদিয়া ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁহার তওবা কবুল করিয়া তাঁহার মর্ত্তাবা বাড়াইয়া দিয়াছেন বলিয়া ঘোষনাও দিয়া ছিলেন। এমতাবস্থায় তাঁহার উপর কটাক্ষ করিলে পর তাহা খণ্ডনের জন্য তক্‌দীরকে তুলিয়া ধরা মছআলাহ অনুযায়ীই হইয়াছে ইহা দোষনীয় নহে।

এস্থলে বিশেষরূপে লক্ষ্য করার এবং শিক্ষা গ্রহণ করার বিষয় এই যে—

অপরাধ হওয়ার পর যখন আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে হযরত আদমের প্রতি কৈফিয়ৎ তলব করা হইয়াছিল এবং প্রশ্ন করা হইয়াছিল—

وَنَادٰهُمَا رَبُّهُمَا اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ لَّكُمَا

اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

"আদম ও হাওয়ার প্রভু-পরওয়ারদেগার তাহাদেরকে ডাকিয়া বলিলেন, আমি কি তোমাদেরকে ঐ বৃক্ষ হইতে নিষেধ করিয়া ছিলাম না? এবং বলিয়া ছিলাম না যে, শয়তান তোমাদের ঘোর শত্রু?" তখন আদম (আঃ) নিজকে নিরপরাধ প্রমাণ করার জন্য তক্‌দীরকে তুলিয়া ধরেন নাই, বরং সঙ্গে সঙ্গে অপরাধ স্বীকার করতঃ আল্লাহ তায়ালার দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া কান্না-কাটা আরম্ভ করিয়াছিলেন—তাঁহারা উভয়ে এ বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন :—

رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

"হে আমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার! আমরা অপরাধ করিয়া নিজেই নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করিয়াছি, তুমি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না কর, দয়া না কর তবে আমরা নিশ্চয়ই ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংস হইয়া যাইব।"

● "আল্লার দানে কেহ বাধার সৃষ্টি করিতে পারে না"। রসুলুল্লাহ (দঃ) প্রতি নামাযের পর একটি বিশেষ জিক্‌র বা দোয়া পড়িতেন—উহাতে এই সত্যের উল্লেখ রহিয়াছে। হাদীছটি প্রথম খণ্ডে ৪৮৩ নম্বরে অনুদিত হইয়াছে।

● তক্‌দীর অপরিবর্ত্তনীয়, তবুও দুর্ভাগ্য এবং অদৃষ্টে লেখা অনিষ্টকর বস্তু হইতে আল্লার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিবে। নবী (দঃ) স্বয়ং এই আদর্শ শিক্ষা দিয়াছেন। ষষ্ঠ খণ্ডে ২৪০৩ নং হাদীছের দোয়া দ্রষ্টব্য। উক্ত হাদীছে বর্ণিত আছে, নবী (দঃ) ঐ দোয়া করিয়া থাকিতেন এবং ৯৭৯ পৃষ্ঠায় উক্ত হাদীছেই উল্লেখ আছে, নবী (দঃ) উম্মতকেও ঐ দোয়া করার আদেশ করিয়াছেন। পবিত্র কোরআনে ছুরা ফালাকের মধ্যে অনেক রকম অনিষ্ট হইতে আল্লাহ তায়ালার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

● মানুষ তাহার ইচ্ছাকে প্রয়োগ করায়ও স্বায়ত্ত (Self Saffient) নহে—যে কোন মুহূর্ত্তে আল্লাহ তায়ালার কুদরত তাহার ইচ্ছা প্রয়োগে অন্তরায় হইতে পারে। আল্লাহ মানুষের ইচ্ছাকে পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে পারেন। সম্মুখে ২৫১৯নং হাদীছে নবী (দঃ) কর্ত্তৃক আল্লাহ তায়ালার একটি বিশেষ গুণ বর্ণিত আছে—"যিনি অন্তরের (ইচ্ছা ও গতির পরিবর্ত্তন সাধনকারী"। পবিত্র কোরআনে পারা ছুরার আয়াতেও উল্লেখ আছে যে, "আল্লাহ তায়ালা মানুষ এবং তাহার মনের মধ্যে অন্তরায় হইয়া থাকেন।"

● আমরা একমাত্র উহারই সম্মুখীন হইব যাহা আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য লিখিয়া দিয়াছেন। ষষ্ঠ খণ্ডের ২২২১ নং হাদীছে এই সত্যের প্রতি অটল বিশ্বাস রাখিয়া চলার ফজিলত বর্ণিত হইয়াছে। পবিত্র কোরআন ১০ পারা ছুরা তওবার ৫১ নং আয়াতে এই সত্যের সুস্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে।

কসম ও মান্নতের বয়ান

আল্লার নামের কিম্বা আল্লার কোন ছেফত বা গুণের শপথকেই শরীয়তের বিধানে কসম গণ্য করা হয়। কসমের গুরুত্ব অনেক বেশী; পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে উহার আলোচনা করা হইয়াছে—

(১) إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا... وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"নিশ্চর যাহারা আল্লার নামে (মিথ্যা) কসমের দ্বারা নগণ্য লাভ (তথা দুনিয়ার ধন-সম্পদ) হাসিল করে তাহারা আখেরাতে আল্লার নেয়ামতের কোন অংশই পাইবে না। কেয়ামতের দিন (তাহারা আল্লাহ তায়ালার ক্রোধ কবলিত থাকিবে—) আল্লাহ তাহাদের সঙ্গে কোন কথা বলিবেন না, তাহাদের প্রতি (দয়ার) দৃষ্টি করিবেন না এবং (স্বীয় মাগফেরাতের দ্বারা গোনাহ হইতে) তাহাদিগকে পাক-পবিত্রও করিবেন না। তাহাদের জন্য ভীষণ কষ্টদায়ক আজাব রহিয়াছে। (৩ পারা ১৬ রুকু)

(২) وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا

"আল্লার নামে (মিথ্যা) কসম করিয়া নগণ্য বিনীময় (তথা দুনিয়ার লাভ) হাসিল করিও না।"

২৫১৬। হাদীছ: আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, আবুবকর (রাঃ) কোন প্রকার কসমকেই ভঙ্গ করিতেন না। কিন্তু যখন পবিত্র কোরআনে কসম ভঙ্গের কাফ্‌ফারা দানের বিধান নাযেল হইল, তখন তিনি বলিলেন—এখন হইতে কোন কসম খাওয়ার পর উহা ভঙ্গ করার দিকে সুফল দেখিলে আমি কসম ভঙ্গ করতঃ সেই সুফলের কাজ করিয়া নিব এবং কসম ভঙ্গের কাফ্‌ফারা দিয়া দিব।

২৫১৭। হাদীছ:—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি, কাহারও নিজের পরিবারবর্গের (হক নষ্ট ও ক্ষতি সাধিত হয় এমন) কোন কসমকে আঁকড়াইয়া থাকা অধিক গোনাহ এই তুলনায় যে, সে উহা ভঙ্গ করিয়া আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নির্দ্ধারিত কাফ্‌ফারা দিয়া দেয়।

২৫১৮। হাদীছ ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি স্বীয় পরিজনের (হক্ নষ্ট ও ক্ষতি সাধিত হয়—এমন) কোন কসমের উপর জমিয়া থাকে সে অতি বড় গোনাহগার—যে গোনাহের ব্যাপারে কাফ্ফারাও কোন ফলদায়ক হয় না।

২৫১৯। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (কোন কিছু অস্বীকৃতির ক্ষেত্রে) সাধারণতঃ এইরূপ কসম করিতেন "কিছুতেই নহে ; কসম ঐ খোদার, যিনি অন্তরসমুহের (ইচ্ছা ও গতির) পরিবর্ত্তন সাধনকারী।"

২৫২০। হাদীছ ঃ—আশেয়া (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, হে মোহাম্মদের উম্মত! খোদার কসম—তোমাদের সম্মুখ জীবনের কঠিন সমস্যাবলী সম্পর্কে) আমি যাহা জানি যদি তোমারা তাহা জান্তে এবং লক্ষ্য কর্তে তবে হাসিতে কম কাঁদিতে বেশী।

২৫২১। হাদীছ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে হেশাম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম, হযরত (দঃ) ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হাত ধরিয়া ছিলেন। ওমর (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! নিশ্চয় আপনি আমার নিকট সব কিছু হইতে অধিক প্রিয় শুধু মাত্র আমার নিজের জীবন ব্যতিরেকে।

হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, ইহা যথেষ্ট নহে—শপথ করিয়া বলিতেছি ঐ আল্লার যাঁহার হাতে রহিয়াছে আমার প্রাণ—যাবৎ না তোমার জান-জীবন অপেক্ষা আমি তোমার নিকট অধিক প্রিয় হই যথেষ্ট হইবে না। অতঃপর ওমর (রাঃ) বলিলেন, হাঁ—খোদার কসম! এখন আপনি আমার নিকট আমার জান-জীবন অপেক্ষা অধিক প্রিয়। হযরত (দঃ) বলিলেন, হে ওমর! এখন ঠিক হইয়াছে।

২৫২২। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একটি কাফেলার মধ্যে চলা কালে ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট পৌঁছিলেন। ওমর (রাঃ) স্বীয় পিতার নামে কসম খাইতে ছিলেন। হযরত (দঃ) বলিলেন, সতর্ক হও—নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদিগকে নিষেধ করিয়াছেন যে, তোমরা বাপ-দাদার নামে শপথ কর। যাহাকে শপথ করিতে হয়, সে যেন অবশ্যই আল্লাহর নামে শপথ করে, নতুবা চুপ থাকে।

২৫২৩। হাদীছ ঃ— ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য নিষেধ করিয়াছেন, বাপ-দাদার নামে কসম খাওয়া।

ওমর (রাঃ) বলেন, খোদার কসম—যেই দিন হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এই কথা শুনিয়াছি, ঐ দিন হইতে আর আমি সেইরূপ কসম খাই নাই—নিজের বক্তব্যেও নয় কাহারও কথা নকল করিতেও নয়।

২৫২৪। ছাদীছ ঃ– আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তি (ভুল বশতঃ অন্ধকার যুগের ন্যায় কোন দেব-দেবীর নামে কসম খাইলে—যাহা ইচ্ছাকৃত হইলে কুফর ও শেরেক গণ্য হইত, যেমন) লাত্ বা ওজ্জার নামে কসম খাইলে সে অবশ্যই সঙ্গে সঙ্গে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্......ঈমানের কলেমা দোহরাইয়া লইবে।

২৫২৫। ছাদীছ ঃ—ছাবেত ইবনে জাহ্হাক (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ের উপর দ্বীন-ইসলাম হইতে খারিজ হইয়া কাফেরী দ্বীন ভুক্ত হইয়া যাইবে বলিয়া উক্তি করিলে সে তাহার উক্তি অনুরূপই গণ্য হইবে।

হযরত (দঃ) আরও বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তি আত্মহত্যা করিলে, যেই পন্থায় সে আত্মহত্যা করিয়াছে সেই পন্থায় তাহাকে দোযখের মধ্যে আজাব দেওয়া হইবে। কোন মোমেনের প্রতি লা'নৎ করিলে, তাহাকে হত্যা করার সমান গোনাহ হইবে। তদ্রূপ কোন মোমেনকে কাফের বলিলে তাহাকে হত্যা করার সমান গোনাহ হইবে।

মছআলাহ ঃ—কোন ব্যক্তি যদি এরূপ বলে যে, "আমি যদি এইরূপ করিয়া থাকি বা এখন যদি এইরূপ হইয়া থাকে তবে আমি ইহুদী বা নাছরাণী বা হিন্দু বা কাফের" এবং এই কথা সে নিজকে মিথ্যাবাদী জানিয়াও বলিয়াছে তবে তাহার উপর বাহ্যিক কাফ্ফারার বিধান নাই বটে, কিন্তু সে মস্ত বড় গোনাহগার হইবে, এমনকি কোন কোন ইমামের মতে সে বাস্তবিকই কাফের হইয়া যাইবে। আর যদি সে কাফের হওয়ার উপর রাজি হইয়া ঐরূপ বলিয়া থাকে তবে সে অবশ্যই কাফের হইয়া যাইবে। আর যদি সে ভুল বশতঃ নিজকে সত্যবাদী জানিয়া ঐরূপ বলিয়া থাকে, তবেও সে গোনাহ হইতে পূর্ণ রেহায়ী পাইবে না, কেননা এইরূপ কথার দ্বারা কাফের হওয়াকে হাল্কা গণ্য করা বুঝায়।

আর যদি এরূপ বলে যে, "আমি যদি এরূপ করি তবে আমি কাফের" এবং অতঃপর যদি সে ঐ কাজ করে তবে তাহাকে কসমের কাফ্ফারা আদায় করিতে হইবে। তদুপরি সে গোনাহগারও হইবে, এমনকি যদি কাফের হওয়ার উপর রাজি হইয়াই ঐ কাজ করিয়া থাকে তবে সে কাফেরই হইয়া যাইবে।

ইমাম বোখারী (রঃ) এস্থলে আরও একটি জরুরী মছ্আলাহ বর্ণনা করিয়াছেন—"যদি আল্লাহ চান্ এবং তুমি চাও বা আমি চাই তবে এরূপ হইবে" বা "যাহা আল্লাহ চাহিবেন এবং আপনি চাহিবেন তাহা হইবে"—এইরূপ আল্লাহ তায়ালার সমানে অন্যের নাম জড়িত করিয়া বলা জায়েয নহে। হাঁ—এইরূপ বলা জায়েয আছে, "আমি আল্লার উপর ভরসা করি তারপর আপনার অছিলার আশা রাখি।"

২৫২৬। **ছাদীছ ঃ**— বরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদিগকে কসমকারীর কসম পুরণে সাহার্য্য করিতে আদেশ করিয়াছেন।

২৫২৭। **ছাদীছ ঃ**—কোরআন শরীফে আছে—

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْ اَيْمَانِكُمْ

"লগ্ও" কসমের জন্য আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর কোন শাস্তি আরোপ করিবেন না।

এই "লগ্ও কসম" সম্পর্কে আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, ইহা হইল ঐ কসম যাহা মানুষ সাধারণ কথা-বার্ত্তার মধ্যে (বস্তুতঃ কসমের উদ্দেশ্যে নয়, বরং শুধু নিজের উক্তির দৃঢ়তা প্রকাশ করার জন্য) ব্যবহার করিয়া থাকে। যেমন—কসম খোদার এরূপ নহে বা কসম খোদার এইরূপই।

ব্যাখ্যা ঃ—কসমের উদ্দেশ্যে নয়, বরং শুধু দৃঢ়তা প্রকাশের জন্য অতীত বা বর্ত্তমান কালের বিষয় সম্পর্কে কসম হইলে তাহাকে "লগ্ও" বলা হইবে। কিন্তু ভবিষ্যৎ কালের জন্য কসম ব্যবহার করা হইলে যে কোন উদ্দেশ্যেই হউক না কেন (হানফী মজহাব মতে) নিয়মতান্ত্রিক কসমই সাব্যস্ত হইবে এবং উহা ভঙ্গ করিলে অবশ্যই কাফ্ফারা দিতে হইবে।

মছআলাহ ঃ—ইমাম বোখারী (রঃ) প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন, ভুল বশতঃ কসম ভঙ্গ হইয়া গেলে, তাহাতে কাফ্ফারা দিতে হইবে না। হানফী মজহাব মতে ভুল বশতঃ কসম ভঙ্গ হইলেও কাফ্ফারা অবশ্যই দিতে হইবে।

মছআলাহ ঃ— কোন বস্তু সম্পর্কে কসম করিয়াছে, অথচ সেই বস্তু এখন তাহার নাই। হানফী মজহাব মতে তাহার কসম সাব্যস্ত হইয়া যাইবে এবং পরবর্ত্তী কালে ঐ বস্তু লাভ করিয়া সে কসম ভঙ্গ করিলে কাফ্ফারা দিতে হইবে। যেমন—এক ব্যক্তি কসম খাইয়াছে, সে উট দান করিবে না। ঐ সময় সে কোন উটের মালিকও নয়। পরবর্ত্তী কালে সে কোন উটের মালিক হইয়া সেই উট দান করিলে কাফ্ফারা দিতে হইবে।

মছআলাহ ঃ— কোন গোনাহের কাজ করার উপর কসম খাইলে সেই কসমও সাব্যস্ত হইবে। কিন্তু ঐ গোনাহের কাজ করিবে না, বরং কসম ভঙ্গ করিয়া কাফ্ফারা দিবে।

মছআলাহ ঃ—রাগ বশতঃ কসম খাইয়া বসিলেও কসম সাব্যস্ত হইবে এবং উহা ভঙ্গ করিলে কাফ্ফারা দিতে হইবে।

২৫২৮। ছাদীছ ঃ—ওরওয়া ইবনে যোবায়ের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ও আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পরে সর্ব্বাধিক প্রিয়পাত্র ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ)। এবং আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়েরও আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার প্রতি অত্যধিক বদান্য ও উদার ছিলেন। এদিকে আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার অভ্যাস ছিল, তিনি কিছু জমা রাখিতেন না। আল্লার দান যাহা কিছু লাভ হইত (উহার অবশিষ্ট) সবই দান-খয়রাত করিয়া দিতেন। তাহা দৃষ্টে আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) এক দিন বলিলেন, তাঁহার হাত বন্ধ করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা উত্তম হইবে। এই কথা আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার ভীষণ ক্রোধের কারণ হইল— তিনি বলিলেন, আমার হাত বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে ? আমি আল্লার নামে মান্নত (তথা কসম) করিলাম, ইবনে যোবায়েরের সঙ্গে কখনও কথা বলিব না +।

এই ব্যবস্থায় আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) বিচলিত হইয়া উঠিলেন। এমনকি তিনি কোরায়েশ বংশীয় অনেক লোকদের দ্বারা এবং বিশেষরূপে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মামা বংশের লোকদের দ্বারা সুপারিশ করাইলেন। কিন্তু আয়েশা (রাঃ) সব কিছু প্রত্যাখ্যান করিতেন এবং বলিতেন, এই ব্যাপারে আমি কাহারও সুপারিশ গ্রহণ করিব না। আমি আমার মান্নত (তথা) কসম ভঙ্গ করিব না। দীর্ঘ দিন এই অবস্থা চলার পর বিশিষ্ট ছাহাবী

+ আয়েশা (রাঃ) আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়েরের মুরব্বি ছিলেন এবং দান-খয়রাতের প্রতি আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) সেই কাজে বাধা দান করিয়া তাঁহার প্রাণে আঘাত দিয়াছিলেন এবং যেই কথা তিনি বলিয়া ছিলেন আয়েশা (রাঃ) তাঁহার সেই কথাকে বে-আদবী গণ্য করিয়া ছিলেন। তাই মুরব্বি হিসাবে এছলাহ ও সংশোধন উদ্দেশ্যে আয়েশা (রাঃ) এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া ছিলেন। নতুবা সাধারণ ভাবে কোন মোসলমানের সহিত তিন দিনের অধিক রাগতঃ কথা-বার্ত্তা বন্ধ রাখা জায়েজ নহে।

মেছ্ওয়ার ইবনে মাখ্‌রামা (রাঃ) এবং আবদুর রহমান (রাঃ) (তাঁহারা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মামা বংশ বনু জোহ্‌রার লোক ছিলেন। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আত্মীয়তার দরুণ আয়েশা (রাঃ) ঐ বংশের প্রতি বিশেষ সহানুভুতিশীলা ছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) তাঁহাদের উভয়কে বলিলেন, খোদার কসম দিয়া আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করি, আপনারা আমাকে আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট পৌঁছাইবার ব্যবস্থা করিবেন। একদা ঐ ছাহাবীদ্বয় আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ)কে তাঁহাদের চাদরের আড়ালে লুকাইয়া নিয়া আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। ঐ ছাহাবীদ্বয় দরওয়াজার বাহির হইতে সালাম করিলেন এবং প্রবেশের অনুমতি চাহিলেন। আয়েশা (রাঃ) অনুমতি প্রদান করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, আমরা সকলেই প্রবেশ করিব ? আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, হাঁ— সকলেই প্রবেশ করুন ; তিনি জানিতেন না যে, তাঁহাদের সঙ্গে আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) রহিয়াছেন।

পুর্ব্বেই ঐ ছাহাবীদ্বয় আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ)কে বলিয়া দিয়া ছিলেন। আমরা আপনাকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিব। আপনি সঙ্গে সঙ্গে পর্দ্দার ভিতর চলিয়া যাইবেন ×। সেমতে সকলে গৃহে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) পর্দ্দার ভিতরে চলিয়া গেলেন এবং আয়েশা (রাঃ)কে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন ও অণুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পর্দ্দার বাহির হইতে ঐ ছাহাবীদ্বয়ও আয়েশা (রাঃ)কে অনুরোধ করিতে ছিলেন—আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়েরের সঙ্গে কথা বলার জন্য, তাঁহার নিবেদন গ্রহণ করার জন্য। এবং হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যে, মোসলমানের পরস্পর বিচ্ছেদ সৃষ্টি করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, কোন মোসলমানের পক্ষে জায়েয নাই অপর মোসলমান ভাই হইতে তিন দিনের বেশী বিচ্ছেদ অবলম্বন করিয়া থাকা—ইহাও স্মরণ করাইয়া দিতে ছিলেন।

সকলেই যখন আয়েশা (রাঃ)কে ঐ সব কথা স্মরণ করাইয়া প্রবল অনুরোধ জানাইতে ছিলেন তখন তিনি কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহাদিগকে স্মরণ করাইতে ছিলেন, আমি মান্নত (তথা কসম) করিয়াছি—যাহা অতিশয় কঠোর বস্তু। কিন্তু ঐ ছাহাবীদ্বয় নাছোড়্-বন্দা হইয়া লাগিয়া রহিলেন। অবশেষে আয়েশা (রাঃ) আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়েরের সঙ্গে কথা বলিলেন এবং তাঁহার কসম ভঙ্গের দরুণ

× আয়েশা (রাঃ) আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর আপন খালা হইতেন।

কাফ্‌ফারা স্বরূপ (একটি ক্রীতদাসের স্থলে) চল্লিশটি ক্রীতদাস আজাদ ও মুক্ত করিলেন। তা সত্ত্বেও আয়েশা (রাঃ) যখনই তাঁহার কসম ভঙ্গের কথা স্মরণ করিতেন এমন ভাবে কাঁদিতেন যে, অশ্রুতে তাঁহার ওড়্না ভিজিয়া যাইত। (মূল কেতাবের ৪৯৭ ও ৮৯৭ পৃষ্ঠায়)

২৫২৯। হাদীছঃ— যাহ্‌দাম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা আবু মূছা আশয়ারী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট ছিলাম। তাঁহার খানা বা আহার্য্য উপস্থিত করা হইল—উহার মধ্যে মোরগের গোশ্‌ত শামিল ছিল। তাঁহার নিকট একজন শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তি ছিল। তিনি তাহাকে খানায় শরীক হওয়ার আহ্বান করিলেন। ঐ ব্যক্তি বলিল, একদা আমি মোরগকে এক বস্তু খাইতে দেখিয়াছি যাহাতে উহার প্রতি আমার ঘৃণা জন্মিয়া গিয়াছে। ফলে আমি কসম করিয়াছি—মোরগের গোশ্‌ত খাইব না। আবু মূছা (রাঃ) বলিলেন, তুমি উঠিয়া আস, আমি তোমাকে এই শ্রেণীর কসমের একটি হাদীছ শুনাইব—

একদা আমি আমাদের গোত্রের আরও কতিপয় লোকের সহিত হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইলাম। আমরা তাঁহার নিকট জেহাদে যাওয়ার যান-বাহন চাহিলাম। ঐ সময় হযরত (দঃ) কোন ব্যাপারে ক্রোধান্বিত ছিলেন ; সেই প্রতিক্রিয়ায় হযরত (দঃ) শপথ করিয়া বলিয়া ফেলিলেন, আমি যান-বাহন দিব না ; আমার নিকট সেই ব্যবস্থাও নাই।

অনতিবিলম্বেই হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট গণিমতরূপে হাছিলকৃত কতিপয় উট উপস্থিত করা হইল। হযরত (দঃ) আমাদিগকে স্মরণ করিলেন এবং দশটি উট আমাদিগকে প্রদাণ করার আদেশ দিলেন—উটগুলি বেশ মোটা তাজা উঁচু উঁচু ছিল। আমরা ঐ উটগুলি নিয়া কত দুর আসার পর ভাবিলাম, আমরা কি কাজ করিলাম ! হযরত (দঃ) কসম করিয়া ছিলেন, আমাদিগকে যান-বাহন দিবেন না, ঐ সময় তাঁহার নিকট যান-বাহন দেওয়ার ব্যবস্থাও ছিল না। তারপর এখন তিনি আমাদিগকে যান-বাহন দিলেন ; আমারাও তাঁহার কসম ভুলিয়া যাওয়ার সুযোগ গ্রহণ করিয়া নিলাম। ইহাতে কখনও আমাদের মঙ্গল হইবে না। সেমতে আমরা হযরতের নিকট ফিরিয়া আসিলাম এবং আরজ করিলাম, আমরা যখন আসিয়া ছিলাম এবং যান বাহন চাহিয়া ছিলাম, আপনি আমাদিগকে যান-বাহন দিবেন না বলিয়া কসম করিয়া ছিলেন এবং আপনার নিকট সেই ব্যবস্থা ছিলও না। মনে হয়—আপনার কসম আপনি ভুলিয়া গিয়াছেন।

হযরত (দঃ) বলিলেন, প্রথমতঃ প্রকৃত প্রস্তাবে তোমাদিগকে যান-বাহন আমি দেই নাই, বরং আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে যান-বাহন দিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ আমি কোন বিষয়ে কসম করিয়া যদি বুঝিতে পারি, উহার বিপরীতটা উত্তম সেস্থলে আমি কসম ভঙ্গ করতঃ উত্তম কাজটা করিয়া নেই এবং কসমের কাফ্ফারা দিয়া দেই।

মছআলাহ ঃ— কোন ব্যক্তি যদি কসম করে, আজ আমি কথা বলিব না। অতঃপর সে নামায পড়ে বা কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করে বা তছবীহ্ পড়ে—জিক্‌র-আজকার করে তাহাতে কসম ভঙ্গ হইবে না। অবশ্য যদি সে তাহার নিয়্যতে ঐ সবকেও কথা বলার মধ্যে শামিল গণ্য করিয়া থাকে তবে কসম ভঙ্গ হইবে এবং কাফ্ফারা দিতে হইবে।

মছআলাহ ঃ—কোন কাজ এক মাস না করার কসম খাইয়াছে। যদি মাস উনত্রিশ দিনের হয় তবে সেস্থলে কসম উনত্রিশ দিনের জন্যই গণ্য হইবে। কিন্তু এরূপ গণ্য হওয়ার শর্ত হইল এই যে, কসম মাসের প্রথম হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। পক্ষান্তরে যদি কসম মাসের প্রথম হইতে না হইয়া থাকে তবে এক মাস পূর্ণ ত্রিশ দিনেই গণ্য করিতে হইবে।

মছআলাহ ঃ— ছালন্-তরকারী বা ব্যঞ্জন খাইবে না কসম করিলে সেস্থলে স্থানীয় সর্ব্বসাধারণের ভাষায় যে সব জিনিষকে বুঝায় তাহাই সাব্যস্ত হইবে।

মছআলাহ ঃ— কোন বিষয়ে কসম করিতে উক্ত বিষয়কে যে শব্দের দ্বারা আবৃত্ত করিয়াছে, সর্ব্ব সাধারণের ভাষা সূত্রে ঐ শব্দের যে অর্থ হয় সেই অর্থের ব্যতিক্রম কোন অর্থ কসমকারী উদ্দেশ্য করিলে, তাহার সেই উদ্দেশ্য ও দাবী গ্রহণীয় হইবে। কিন্তু সেই অর্থ অবশ্যই উক্ত শব্দের আওতাভুক্ত হইতে হইবে। এতদ্ভিন্ন যদি ঐ কসমের সঙ্গে অন্য লোকের কোন হক সম্পৃক্ত থাকে, তবে সেস্থলে সাধারণ ভাষার অর্থের ব্যতিক্রম নিয়্যত গ্রহণীয় হইবে না। তদ্রূপ যদি কোন ব্যক্তি কসমকারীকে কসম খাওয়াইয়া থাকে সেস্থলেও কসমকারীর নিয়্যত মূল্যহীন হইবে। কসম দাতা যে অর্থ বুঝিবে সেস্থলে তাহাই ধর্ত্তব্য হইবে।

মছআলাহ ঃ—কেহ যদি কোন হালাল জিনিষকে নিজের জন্য হারাম বলিয়া উক্তি করে, যেমন—যদি কেহ বলে, মাছ আমার জন্য হারাম; আমি মাছ খাইলে হারাম খাইব বা যদি আমি অমুক কাজ করি তবে আমার জন্য ভাত খাওয়া হারাম ইত্যাদি। এমতাবস্থায় ঐ জিনিষ তাহার জন্য হারাম হইবে না, কিন্তু তাহার ঐ উক্তি কসম গণ্য হইবে যাহা ভঙ্গ করিলে কাফ্ফারা দিতে হইবে।

যদি এমন কোন হালাল বিষয় সম্পর্কে ঐরূপ উক্তি করিয়া থাকে, যাহা না করা শরীয়ত অনুযায়ী অবৈধ। যেমন মাতা-পিত, বরং কোন মোসলমান ভাই সম্পর্কেও যদি বলে যে, তাহার সঙ্গে কথা বলা আমার জন্য হারাম—এইরূপ উক্তি কসম গণ্য হইবে, কিন্তু সেই উক্তি ভঙ্গ করা কর্ত্তব্য—তাহা ভঙ্গ করতঃ কাফ্ফারা আদায় করিবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ— ঐরূপ উক্তি যদি কোন নাজায়েয বস্তু সম্পর্কে করে, যেমন কোন মদ-খোর ব্যক্তি বলিল, মদ পান করা আমার জন্য হারাম এবং এই উক্তির দ্বারা তাহার উদ্দেশ্য হইল মদ পরিত্যাগ করার সঙ্কল্পকে দৃঢ়রূপে প্রকাশ করা কিম্বা যদি এইরূপ বলে যে, আমি অমুক কাজ করিলে আমার জন্য মদ্য পান করা হারাম হইবে এবং এই উক্তি দ্বারা ঐ কাজ না করার সঙ্কল্পকে দৃঢ় করার উদ্দেশ্য হয়। কিম্বা যদি কেহ এইরূপ বলে যে, অমুক ব্যক্তির ঘরে তামাক খাওয়া আমার জন্য হারাম এবং এই উক্তির দ্বারা ঐ ব্যক্তির ঘরে তামাক না খাওয়ার সঙ্কল্পকে দৃঢ় করা উদ্দেশ্য হয়—এই শ্রেণীর উক্তিও কসম গণ্য হইবে যাহা ভঙ্গ করিলে কাফ্ফারা আদায় করিতে হইবে। হাঁ—ঐরূপ বস্তুকে নিজের জন্য হারাম উক্তি করিয়া শুধু শরীয়তের মছআলাহ ব্যক্ত করা উদ্দেশ্য হইলে, সে ক্ষেত্রে এই উক্তি কসম গণ্য হইবে না।

কেহ যদি যে কোন রূপে স্বীয় স্ত্রীকে হারাম বলিয়া উক্তি করে তবে তাহা কসম গণ্য হইবে না, বরং স্ত্রীর প্রতি বাইন তালাক হইয়া যাইবে।

(ফতোয়া শামী ২—৭৬১, ৭৭২)

মছআলাহ ঃ— কেহ যদি স্বীয় সমুদয় মাল ছদকারূপে বা আল্লার নামে মান্নতরূপে দিয়া দেওয়ার উক্তি করে, তবে সেস্থলে হানফী মজহাব অনুযায়ী ফত্ওয়া নিম্নরূপ—

মাল দুই প্রকার—(১) যে শ্রেণীর মালে যাকাৎ ফরজ হইতে পারে, যেমন নগদ টাকা, সোনা-চান্দি বা ব্যবসা-বাণিজ্যের মালামাল। (২) যে শ্রেণীর মালে যাকাৎ ফরজ হয় না, যেমন বাড়ী-ঘর, ব্যবহার্য্য মাল-ছামান ও ক্ষেত-ক্ষামার। উল্লেখিত উক্তির দরুণ দ্বিতীয় শ্রেণীর মাল দান-খয়রাত করার আবশ্যক হইবে না। কিন্তু প্রথম শ্রেণীর মাল যাহা কিছু উপস্থিত তাহার মালিকানায় থাকিবে সবই দান-খয়রাত করিয়া দিতে হইবে। অবশ্য যদি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাল হইতে বা অন্য কোন অছিলায় এমন সম্বল তাহার না থাকে যদ্দ্বারা তাহার পরিবার পুনঃ রোজগার করা পর্য্যন্ত জীবন ধারণ করিতে পারে তবে সেই পরিমাণ প্রথম শ্রেণীর মাল হইতেও নিজ খরচের জন্য রাখিতে পারিবে। কিন্তু রোজগার করিয়া যখন সামর্থবান হইবে তখন ঐ পরিমাণ মাল দান-খয়রাত করিতে হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ— কাহারও নিকট যদি কোন ব্যক্তি তাহার সমুদয় মাল ছদকাহ্ করা সম্পর্কে পরামর্শ বা সম্মতি চায় তবে সেস্থলে তাহাকে তাহার মালের তৃতীয়াংশ ছদকাহ্ করার পরামর্শ দিবে। যেমন ছাহাবী কায়া'ব ইবনে মালেক (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট ঐরূপ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে, হযরত (দঃ) তাহাকে বলিয়া ছিলেন, امسك عليك بعض مالك فانه خير لك "কতেক মাল তোমার নিজের জন্য রাখিয়া দাও—ইহা তোমার পক্ষে শ্রেয়।"

আবু দাউদ শরীফের হাদীছে আছে—কায়া'ব ইবনে মালেক (রাঃ) তাঁহার সমুদয় মাল ছদকাহ্ করার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে, হযরত (দঃ) তাহাকে নিষেধ করিলেন। তারপর তিনি অর্দ্ধেক মালের কথা বলিলেন, হযরত (দঃ) তাহাও নিষেধ করিলেন। অতঃপর তিনি তৃতীয়াংশের কথা বলিলে হযরত (দঃ) তাহাতে সম্মতি দান করিলেন।

আর এক রেওয়ায়েতে আছে, হযরত (দঃ) তাহাকে বলিয়াছেন, তোমার মালের তৃতীয়াংশ ছদকাহ্ করাই তোমার জন্য যথেষ্ট। (ফতহুলবারী ১১—৪৮৫)

মান্নত ব্যতিরেকেই আল্লার রাস্তায় খরচ করা উত্তম, অবশ্য মান্নত করিলে তাহা পূর্ণ করিবে

২৫৩০। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মান্নত মানিতে নিষেধ করিয়াছেন। এবং বলিয়াছেন, মান্নত তক্‌দীর তথা আল্লার নির্দ্ধারণকে পরিবর্ত্তন করিতে পারে না, অবশ্য উহা দ্বারা বখীল বা কৃপণের মাল বাহির হয়।

নাজায়েয কাজের মান্নত

২৫৩১। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এমন কাজের মান্নত করিবে যাহার মধ্যে আল্লাহ তায়ালার ফরমাবরদারী রহিয়াছে সে ব্যক্তি অবশ্যই সেই ফরমাবরদারীর কাজ সম্পন্ন করতঃ মান্নত পূর্ণ করিবে। আর যে ব্যক্তি আল্লার নাফরমানির কাজের মান্নত করিবে সে (হাজার মান্নতের দরুণও) আল্লার নাফরমানির কাজে কখনও লিপ্ত হইবে না।

মছআলাহ ঃ—নাজায়েয কাজের মান্নত করা হইলে, সে ক্ষেত্রে হানফী মজহাব মতে হুকুম নিম্নরূপ—

নাজায়েয কাজ দুই প্রকার—(১) মূল কাজ নাজায়েয নহে, বরং কোন আনুষাঙ্গিকের কারণে নাজায়েয হইয়াছে—সেস্থলে মান্নত শুদ্ধ গণ্য হইবে এবং মান্নত পুরা করিতে নাজায়েযের কারণ বাদ দিয়া মূল কাজ আদায় করিবে। যেমন—যদি

মান্নত করা হয়, ঈদের দিন রোযা রাখিবে। ঈদের দিন রোযা রাখা জায়েয নহে। কিন্তু মূল জিনিষ তথা রোযা নাজায়েয নহে; ঈদের দিন বিজড়িত হওয়ায় নাজায়েয হইয়াছে। সুতরাং এই মান্নত শুদ্ধ হইবে এবং ঈদের দিন ছাড়িয়া অন্য কোন এক দিন রোযা আদায় করিবে। আদায় না করিলে কাফ্ফারা দিতে হইবে।

(২) মূল কাজই নাজায়েয, যেমন মদ পান করা, কাহাকেও খুন করা। এইরূপ কাজের মান্নত করা হইলে সেই মান্নত শুদ্ধ হইবে না।

মান্নত আদায় করার পূর্ব্বে মৃত্যু হইলে

২৫৩২। হাদীছ ঃ— সায়াদ ইবনে ওবাদাহ্ (রাঃ) একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট এই মর্ম্মে মছআলাহ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাহার মাতার জিম্মায় একটি মান্নত ছিল। তিনি তাহা আদায় করার পূর্ব্বেই ইন্তেকাল করিয়াছেন। হযরত (দঃ) সায়াদ (রাঃ)কে তাঁহার মাতার পক্ষে উহা আদায় করার ফৎওয়া প্রদান করিলেন। সেমতে এই নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে যে, মৃতের জিম্মায় কোন হক্ থাকিলে, তাহা আদায় করার জন্য উত্তরাধিকারীগণ প্রচেষ্টা চালাইবে।

মছআলাহ ঃ কোন ব্যক্তি মান্নত আদায় করার পূর্ব্বে মরিয়া গেলে সেস্থলে দেখিতে হইবে, মান্নত কি প্রকারের ছিল। যদি ধন-সম্পত্তির দ্বারা আদায় করা শ্রেণীর ওয়াজেব মান্নত হয় তবে মৃত্যুর পূর্ব্বে উহা আদায়ের অছিয়ত করিয়া যাওয়া ওয়াজেব এবং সে ক্ষেত্রে মালের তৃতীয়াংশ হইতে তাহা আদায় করা উত্তরাধিকার-গণের উপর ওয়াজেব হইবে। অছিয়ত না করিলে আদায় করা ওয়াজেব হইবে না বটে, কিন্তু বালেগ ওয়ারেসগণের পক্ষে তাহা আদায় করা কর্ত্তব্য। আর যদি মান্নত শারীরিক এবাদৎ শ্রেণীর হয় এবং শরীয়তে উহার বদল নির্দ্ধারিত থাকে যেমন নামায, রোযা—প্রতি নামায ও প্রতি রোযার ফিদ্ইয়া নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। ইহা আদায়ের অছিয়ত করাও ওয়াজেব এবং উত্তরাধিকারীগণ তাহা আদায় করিবে। আর যদি বদল না থাকে তবে তাহা আদায়ের কোন পন্থা নাই।

মছআলাহ ঃ— অন্যের মালিকানাভুক্ত কোন বস্তু সম্পর্কে সরাসরি মান্নত করিলে—যেমন, ঐ গরুটি ছদকাহ্ করিব মান্নত করিলাম, অথচ ঐ গরুর মালিক অন্য ব্যক্তি, তবে সেই মান্নত শুদ্ধ হইবে না। অবশ্য মালিক হওয়ার উপর বা মালিকানার কোন সূত্রের উপর শর্ত্ত রাখিয়া মান্নত করা হইলে—যেমন, ঐ গরুটির মালিক আমি হইতে পারিলে বা ঐ গরুটি আমি খরিদ করিলে উহা ছদকাহ্ করিব মান্নত করিলাম। এই মান্নত শুদ্ধ হইবে এবং তাহার শর্ত্ত পূর্ণ হইলে মান্নত আদায় করিতে হইবে।

মছআলাহ ঃ—কোন ব্যক্তি কাফের থাকাবস্থায় মান্নত করিয়া ছিল, মোসলমান হওয়ার পর সেই মান্নত আদায় করা তাহার উপর ওয়াজেব হইবে না ; হাঁ—আদায় করা উত্তম। তদ্রূপ পাগল থাকা বা নাবালেগ থাকা অবস্থায় মান্নত করিয়া ছিল ; ভাল হওয়ার পর বা বালেগ হওয়ার পর সেই মান্নত আদায় করা ওয়াজেব হইবে না। (বদায়ে' ৫—৮১)

২৫৩৩। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (জুমার নামাযের) খোৎবা দান কালে এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলেন, সে দাঁড়াইয়া আছে, বসে না। হযরত (দঃ) তাহার দাঁড়াইয়া থাকা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। লোকগণ বলিল, এই ব্যক্তি আবু ইস্রায়ীল নামীয়। সে মান্নত করিয়াছে—"দাঁড়াইয়া থাকিবে বসিবে না, রৌদ্রে থাকিবে ছায়া গ্রহণ করিবে না—কথা বলিবে না, সর্ব্বদা রোযা রাখিবে।"

হযরত নবী (দঃ) লোকদিগকে বলিলেন, তাহাকে বলিয়া দাও, সে যেন কথা বলে, ছায়া গ্রহণ করে এবং বসে, আর রোযার মান্নত যেন পূর্ণ করে।

মছআলাহ ঃ—যে সব কাজ কোন প্রকার এবাদৎ শ্রেণীর নহে ঐরূপ কাজের মান্নত শুদ্ধ হয় না, যেমন—কথা না বলা, ছায়া গ্রহণ না করা, দাঁড়াইয়া থাকা।

মছআলাহ ঃ—কোন ব্যক্তি সর্ব্বদা রোযা রাখার মান্নত করিলে, তাহাকে যথা সাধ্য সেই মান্নত অবশ্যই পূর্ণ করিতে হইবে। শুধু রমজানের ঈদ ও কোরবানীর ঈদ এবং উহার পরবর্ত্তী তিন দিন—এই পাঁচ দিন আর মহিলাগণ হায়েজ-নেফাছের সময় রোযা রাখিবে না। অবশ্য যদি অক্ষম হইয়া পড়ে তবে প্রত্যেক দিনের রোযার জন্য ফিদ্ য়িয়া আদায় করিতে হইবে।

২৫৩৪। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট মছআলাহ জিজ্ঞাসা করা হইল, এক ব্যক্তি প্রতি দিন রোযা রাখার মান্নত করিয়াছে—সে ব্যক্তি ঈদের দিন কি করিবে ? তিনি বলিলেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আদর্শই সর্ব্বত্র অনুসরণীয়। হযরত (দঃ) ঈদের দিনে রোযা রাখিতেন না এবং রোযা রাখার অনুমতিও দিতেন না।

২৫৩৫। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, আমি মান্নত করিয়াছি, যত দিন বাঁচিয়া থাকি প্রত্যেক মঙ্গল ও বুধবার রোযা রাখিব। এই বৎসর কোরবানীর ঈদ ঐ দিনে পড়িয়াছে—এখন কি করিতে হইবে ? তিনি বলিলেন, আল্লার আদেশ মান্নত পূর্ণ করা আর শরীয়তের নিষেধ ঈদের দিন রোযা রাখা।

ঐ ব্যক্তি স্পষ্টরূপে তাহার করণীয় নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া পুনঃ প্রশ্ন করিলে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ঐ উত্তরই দিলেন, অতিরিক্ত আর কিছু বলিলেন না।

ব্যাখ্যা ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের উদ্দেশ্য ইহাই ছিল যে, তাহার মান্নত তাহার জিম্মায় থাকিবে ঐ দিন রোযা না রাখিয়া রোযা শুদ্ধের কোন দিনে উহার কাজা করিবে।

মিথ্যা কসম করিবে না এবং দুনিয়ার স্বার্থে কসম ভঙ্গ করিবে না

মিথ্যা কসম করার পরিণতি সম্পর্কে দ্বিতীয় খণ্ডে ১১৭০ নং হাদীছ বিশেষ লক্ষ্যণীয়। বিশেষভাবে মিথ্যা কসমের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে উক্ত হাদীছে পবিত্র কোরআন ৩ পাঃ ১৬ রুকুর ৭৭নং আয়াতখানার আলোচনাও রহিয়াছে।

এতদ্ভিন্ন (১৪ পাঃ ১৯ রুকুতে) এই সম্পর্কে বিবরণ রহিয়াছে। যথা—

وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ـ

"তোমরা (আল্লার নাম বিজড়িত করিয়া) কসমকে দৃঢ় করার পর উহা ভঙ্গ করিও না; অথচ (আল্লার নামকে মধ্যস্ত করিয়া) তোমরা আল্লাহকে তোমাদের (কথার) উপর সাক্ষী বানাইয়াছ।" وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيلًا

"আল্লার নামে অঙ্গীকার করিয়া উহার বিনিময়ে (তথা উহাকে ভঙ্গ করিয়া) হীন উদ্দেশ্য হাসিল করিও না।"

কসমের কাফ্‌ফারার বয়ান

আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে বলিয়াছেন :—

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ـ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ـ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ـ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ـ

"(ভবিষ্যৎকাল সম্পর্কীয় কসম ভঙ্গ করা হইলে) উহার কাফ্‌ফারা হইল, দশ মিছকীনকে খানা দান করা—স্বীয় পরিবারের মধ্যে প্রচলিত খানার মধ্যম

শ্রেণীর খানা। কিম্বা, দশ মিছকীনকে কাপড় দান করা, কিম্বা একটি ক্রীতদাস আজাদ করা। যে ব্যক্তি ঐ তিনিটির কোন একটিরও সমর্থ না রাখিবে, সে তিন দিন রোযা রাখিবে। কসম করিয়া ভঙ্গ করিলে, এই কাফ্ফারা তোমাদিগকে আদায় করিতে হইবে। তোমরা কসমের প্রতি লক্ষ্য রাখিও। (৭ পাঃ ১ রুঃ)

দশ মিছকীনকে নিজ ঘরে খাওয়াইতে হইলে, দুই ওয়াক্ত অন্ততঃ মধ্যম শ্রেণীর খানা পেট পুরিয়া খাওয়াইতে হইবে। আর দশ মিছকীনের প্রত্যেককে দুই ওয়াক্ত খাওয়াইবার পরীবর্ত্তে প্রত্যেককে ছদকায়ে-ফেৎর পরিমাণ পয়সা বা বস্তু দান করিলেও চলিবে।

মছআলাহ :— কসমের সঙ্গে "ইন্শা আল্লাহ" বলা হইলে সেই কসম ফসকিয়া যাইবে—উহার জন্য কাফ্ফারা দেওয়া আবশ্যক থাকিবে না। কিন্তু যদি কসম ফসকানোর জন্য "ইন্শা আল্লাহ" বলা না হয়, বরং শুধু আল্লার নামে বরকত হাছিল করা বা কথাকে অধিক দৃঢ় করা উদ্দেশ্য হয়, তবে সেস্থলে "ইন্শা-আল্লার" সঙ্গেও কসম বহাল থাকিবে।

মছআলাহ :— কসমের কাফ্ফারা হানফী মজহাব মতে কসম ভঙ্গের পরে আদায় হইতে হইবে। কসম ভঙ্গের পূর্ব্বে আদায় করা হইয়া থাকিলে উহা কাফ্ফারা গণ্য হইবে না।

কসমের গুরুত্ব

২৫৩৬। ছাদীছ :— ওরওয়া ইবনে যোবায়ের (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট নবী (দঃ) এবং আবু বকরের পরে আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) সর্ব্বাধিক প্রিয় ছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ)ও তাঁহার প্রতি সর্ব্বাধিক উপকারী জন ছিলেন। আয়েশা (রাঃ) এতই দানশীলা ছিলেন যে, তাঁহার নিকট অতিরিক্ত কোন বস্তু জমা থাকিতে পারিত না। তাঁহার নিকট যাহা কিছু আসিত তিনি তাহা দান করিয়া ফেলিতেন। আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) আয়েশা (রাঃ)কে কোন কিছু প্রদান করিলেন; উহা সম্পর্কে (আয়েশা (রাঃ) তাঁহার স্বভাব-কর্ম্ম করিলে) আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) বলিলেন, তাঁহার হস্ত বন্ধ করা দরকার। তিনি এই স্বভাব হইতে বিরত না থাকিলে আমি তাঁহার দান অপ্রোযোজ্য বলিয়া ঘোষনা করিব।

আয়েশা (রাঃ) ঐ কথার সংবাদ পাইয়া ভীষণ রাগ হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের কি নিজে এই কথা বলিয়াছে? লোকেরা বলিল, হাঁ। তখন আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, আল্লার নামে আমার কসম—ইবনে যোবায়েরের সঙ্গে কখনও কথা বলিব না। এই কসমের কারণে যখন বহু দিন

উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ থাকিল তখন আবদুল্লাহ (রাঃ) অনেক রকমের সুপারিশ ধরিলেন। আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, আমি এই ব্যাপারে কখনও সুপারিশ গ্রহণ করিব না এবং আমার কসম ভঙ্গ করিব না।

এই অবস্থায় দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হইলে আবদুল্লাহ (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মাতুল বনু-যোহরা বংশীয় লোকদের শরণাপন্ন হইলেন। কারণ, আয়েশা (রাঃ) নবীজীর আত্মীয়তার খাতিরে তাঁহাদের প্রতি অতি সদয় ও কোমল ছিলেন। সেমতে তিনি ঐ বংশীয় মেছওয়ার (রাঃ) এবং আবদুর রহমান (রাঃ) ছাহাবীদ্বয়ের নিকট গেলেন এবং বলিলেন, যে ভাবেই হউক আপনারা আমাকে আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকটে যাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিন। তিনি আমার বিচ্ছেদের উপর কসম করিয়া থাকিবেন ইহা জায়েয হইবে না। তাঁহারা উভয়ে আবদুল্লাহ (রাঃ)কে চাদরের আড়ালে করিয়া আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন এবং সালাম করিয়া প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনায় বলিলেন, আমরা প্রবেশ করিতে পারি কি? আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, আসুন। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরা সকলেই আসিব কি? আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, সকলেই আসুন; তিনি জানিতেন না যে, আবদুল্লাহ (রাঃ) তাঁহাদের সঙ্গে আছেন। (এতদিন আবদুল্লাহ তাঁহার নিকটে যাওয়ার অনুমতিই লাভ করিতে পারেন নাই। এবং সম্পর্কে আপন খালা হইলেও অনুমতি ব্যতিরেকে নিকটে যাওয়া বেয়াদবী।) গৃহে প্রবেশের অনুমতি পাইয়া তাঁহারা সকলে প্রবেশ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ আবদুল্লাহ (রাঃ) পর্দ্দার ভিতরে চলিয়া গিয়া (আপন খালা—) আয়েশা (রাঃ)কে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন আর ক্ষমা চাহিতে লাগিলেন। মেছওয়ার (রাঃ) এবং আবদুর রহমান (রাঃ)ও ক্ষমা প্রার্থনা গ্রহণ করার ও তাঁহার সঙ্গে কথা বলার আবেদন জানাইতে লাগিলেন। তাঁহারা ইহাও বলিতে ছিলেন—আপনি ত জানেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বিচ্ছেদ অবলম্বন করা হইতে নিষেধ করিয়াছেন। এবং এক মোসলমান অপর মোসলমান হইতে তিন দিনের অতিরিক্ত সালাম-কালাম বন্ধ রাখিবে তাহা জায়েয নহে। তাঁহারা উভয়ে এই ভাবে আয়েশা (রাঃ)কে উপদেশ ও গোনাহের কথা শুনাইতে ছিলেন, আর তিনি তাঁহাদেরকে তাঁহার কসম স্মরণ করাইতে ছিলেন এবং কাঁদিতে ছিলেন। আর বলিতেছিলেন, আমি ত কসম করিয়াছি—কসম ত অতি বড় জিনিস। তাঁহারা উভয়ে নাছোড়-বন্দারূপে তাঁহাকে অনুরোধ করিতেই লাগিলেন; অবশেষে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়েরের সঙ্গে কথা বলিলেন। তাঁহার কসম ভঙ্গের কাফ্ফারার জন্য (একটি গোলাম আজাদ করিলেই হইত,

কিন্ত) আবদুল্লাহ (রাঃ) দশটি গোলাম বা ক্রিতদাস তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। আয়েশা (রাঃ) ঐ দশটি গোলাম ত আজাদ করিলেনই, তদুপরি নিজের পক্ষ হইতে আরও গোলাম আজাদ করিয়া চল্লিশ সংখ্যা পূর্ণ করিলেন। এইভাবে একটি কসম ভঙ্গের কাফ্ফারা চল্লিশ গুণ আদায় করার পরও এই কসম ভঙ্গের কথা মনে পড়িলেই আয়েশা (রাঃ) এত কাঁদিতেন যে, তাঁহার ওড়না ভিজিয়া যাইত। তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিতেন, কসম করার সময় কোন কার্য্যের উল্লেখ করিলে ভাল হইত যে—এখন কসম ভঙ্গ না করিয়া উক্ত কার্য্য সম্পাদনে কসম হইতে মুক্ত হইতে পারিতাম। (৮৯৭ এবং ৪৯৭ পৃঃ)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ— যে সব হাদীছের উল্লেখ পরস্পর বিচ্ছেদের বিরুদ্ধে রহিয়াছে এই সব হাদীছ বিদ্যমান থাকা সত্তেও আয়েশা (রাঃ) বিচ্ছেদ অবলম্বন করিয়াছিলেন। কারণ, উক্ত হাদীছ সমুহের উদ্দেশ্য হইল—জাগতি কারণে পস্পপর রেষারেষির দরুন ঐরূপ বিচ্ছেদ অবলম্বন করা হারাম। কিন্তু দ্বীনের কোন বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশে বিচ্ছেদ অবলম্বন করায় দোষ নাই। আরেশা (রাঃ) এই ক্ষেত্রে তাহাই ভাবিয়া ছিলেন যে, দান-খয়রাত করায় তাঁহাকে বাধা দানের কথা বলা হইয়াছে, তাই তিনি ক্ষুব্ধ হইয়া বিচ্ছেদ ঘোষনা করিয়া ছিলেন।

এই সম্পর্কে মছআলার বিবরণ ষষ্ঠ খণ্ড ২৩২৭ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য।

ওয়ারিসী তথা উত্তরাধিকার স্বত্বের বয়ান

মিরাসের ভাগ বন্টন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে সুদীর্ঘ আয়াতে বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন ঃ—

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ .... وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

অর্থ ঃ—আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে নির্দ্দেশ দিতেছেন, তোমাদের সন্তানদের মিরাস সম্পর্কে—(পুত্র ও মেয়ে উভয় প্রকার সন্তান থাকিলে) এক এক পুত্রের অংশ দুই মেয়ের অংশের সম পরিমাণ হইবে। আর যদি সন্তান শুধু মেয়েই থাকে (সংখ্যায় দুই বা) দুই এর অধিক হইলেও তাহারা সকলে দুই তৃতীয়াংশ পাইবে—পিতার পরিত্যক্ত মাল-সম্পত্তি হইতে। আর যদি মেয়ে সন্তান শুধু মাত্র একজন থাকে তবে সে অর্দ্ধেক পাইবে↑।

↑ পবিত্র কোরআনের এই আয়াতে বিশেষ বিশেষ ওয়ারিসদের অংশ নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। অবশিষ্ট সম্পত্তি সম্পর্কে শরীয়তে নির্দ্ধারিত মিরাসের অন্যান্য বিধান বলবৎ করা হইবে।

মৃত ব্যক্তির মাতা-পিতা তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হইতে প্রত্যেকে ষষ্ঠাংশ পাইবে—যদি মৃত ব্যক্তির কোন সন্তান থাকে। আর যদি তাহার কোন সন্তান না থাকে (একাধিক ভ্রাতা-ভগ্নিও না থাকে*) শুধু মাতা-পিতাই তাহার ওয়ারিস হয়, তবে মাতা এক তৃতীয়াংশ পাইবে (অবশিষ্ট পিতার জন্য হইবে।) পক্ষান্তরে যদি মৃত ব্যক্তির (মাতা-পিতার সহিত তাহার) একাধিক ভ্রাতা-ভগ্নিও থাকে তবে (ভ্রাতা-ভগ্নিগণ মিরাস পাইবে না বটে, কিন্তু তাহাদের দরুণ মাতার অংশ কম হইয়া যাইবে—) মাতা ষষ্ঠাংশ পাইবে এবং অবশিষ্ট পিতা পাইবে। এই বণ্টন মৃত ব্যক্তির স্বীয় কৃত অছিয়ত বা তাহার ঋণ পরিশোধ করার পর হইবে।

তোমাদের পিতা-মাতা ও ছেলে-মেয়েদের মধ্যে উপকারের ক্ষেত্রে কে নিকটতম তাহা তোমরা সঠিকরূপে জানিতে পার না। (অথচ তোমাদের উপর মিরাস বণ্টন ছাড়িয়া দিলে তোমরা উহার উপরই ভিত্তি করিবে।) সুতরাং স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে অংশ-নির্দ্ধারণ সম্পন্ন করা হইয়াছে; নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সর্ব্বজ্ঞানী ও সর্ব্বদর্শী।

আর তোমাদের স্ত্রীগণের পরিত্যাক্ত সম্পত্তি হইতে তোমরা অর্দ্ধেক পাইবে যদি তাহাদের কোন সন্তান না থাকে; তাহাদের কোন সন্তান থাকিলে তোমরা চতুর্থাংশ পাইবে, তাহাদের কৃত অছিয়ত বা ঋণ পরিশোধের পর।

আর স্ত্রীগণ তোমাদের পরিত্যাক্ত সম্পত্তি হইতে চতুর্থাংশ পাইবে যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে। যদি সন্তান থাকে তবে স্ত্রী অষ্টমাংশ পাইবে—তোমাদের কৃত অছিয়ত বা ঋণ পরিশোধের পর।

আর যদি মৃত ব্যক্তি এমন কোন পুরুষ বা নারী হয় যাহার পিতা, দাদা এবং কোন সন্তান বা পুত্রের সন্তান নাই—আছে এক মা-শরীক ভ্রাতা বা ভগ্নি, তবে সেই ভ্রাতা বা ভগ্নি ষষ্ঠাংশ পাইবে। আর ঐ শ্রেণীর ভাই-বোন একাধিক হইলে এক তৃতীয়াংশ তাহাদের মধ্যে সমভাবে বণ্টিত হইবে↑; ক্ষতিকারক নিয়ম বিরোধী নয় এরূপ অছিয়ত বা ঋণ পরিশোধ করার পর। আল্লাহ তায়ালা সব কিছু জ্ঞাত থাকেন, তিনি ধৈর্যশীল। (পারা ৪ রুকু ১৩)

আর যদি ঐরূপ মৃত ব্যক্তি পুরুষ হয় এবং তাহার সহোদরা বা বৈমাত্র ভগ্নি একজন থাকে তবে সেই ভগ্নি অর্দ্ধেক পাইবে। যদি ঐ শ্রেণীর ভগ্নি দুই বা ততধিক থাকে তবে তাহারা সকলে দুই তৃতীয়াংশ পাইবে +।

---

* শুধু একজন ভ্রাতা বা ভগ্নি থাকিলে সেস্থলে মাতার অংশ পূর্ণ তৃতীয়াংশই থাকিবে।

↑ এস্থলে নারীপুরুষের ভেদাভেদ হইবে না এবং দুই বা ততধিক যতই হউক এক তৃতীয়াংশ সকলের মধ্যে সমান ভাবে বণ্টিত হইবে। (অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

ঐরূপ মৃত ব্যক্তি যদি নারী হয় এবং তাহার (ভগ্নি না থাকে, বরং) সহোদর বা বৈমাত্র ভাই থাকে, তবে সেই ভাই মৃত ভগ্নির সমুদয় সম্পত্তির মালিক হইবে (—এক ভাই থাকিলে একাই সব পাইবে একাধিক ভাই থাকিলে তাহারা সমুদয় সম্পত্তি সমান ভাবে বণ্টন করিয়া দিবে, অবশ্য একাধিক ভ্রাতার মধ্যে যদি সহোদর ও বৈমাত্র উভয় প্রকার ভ্রাতা থাকে, তবে শুধু মাত্র এক বা একাধিক সহোদর ভ্রাতাই মিরাস পাইবে বৈমাত্র ভাই পাইবে না * ।

যদি ঐরূপ মৃত নারী বা পুরুষের ঐ শ্রেণীর ভাই-বোন মিশ্রিত থাকে (—দুই বা ততধিক) তবে তাহারা সমুদয় সম্পত্তি বণ্টন করিয়া নিবে—ভ্রাতা ভগ্নির দ্বিগুণ পাইবে। (এস্থলেও এক বা একাধিক সহোদর ভ্রাতা থাকিলে বৈমাত্র ভাই-বোন বঞ্চিত হইবে। আর যদি ভাই বোনদের মধ্যে সহোদরা বোন থাকে সহোদর ভাই না থাকে তবে সে স্থলে বিভিন্ন তফসিল রহিয়াছে।) (পারা ৬ রুকূ ৪)

২৫৩৭। হাদীছ ঃ— যাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রোগ শয্যায় পতিত হইলে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আবু বকর (রাঃ)কে সঙ্গে নিয়া আমাকে দেখিবার জন্য পায়ে হাটিয়া আসিলেন। তাঁহারা যখন আমার নিকট পৌঁছিলেন তখন আমি বেহুঁশ ছিলাম। তাই হযরত (দঃ) অজু করিয়া অজুর পানি আমার উপর ছিটাইয়া দিলেন। তাহাতে আমার চেতনা ফিরিয়া আসিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রসুলুল্লাহ ! আমার ধন-সম্পত্তি সম্পর্কে আমি কি ফয়ছালা করিব ? হযরত (দঃ) কোন উত্তর দিলেন না, অতঃপর মিরাসের আয়াত নাযিল হইল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ— মিরাস বণ্টন সম্পর্কে প্রশ্ন করা সত্ত্বেও হযরত (দঃ) ওহীর অপেক্ষা করিয়াছেন এবং মিরাস বণ্টনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বয়ান করিয়া দিয়াছেন। সেই বয়ানের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা ইহাও প্রকাশ করিয়াছেন, তোমাদের সঙ্কীর্ণ জ্ঞানে তোমরা সর্ব্বদিক লক্ষ্য রাখিতে অক্ষম এবং ভবিষ্যতের অবস্থাও মোটেই জানিতে পার না। পক্ষান্তরে সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালা সর্ব্বজ্ঞানী ও সর্ব্বদর্শী। তাঁহার ভূত-

---

+ ঐরূপ মৃত পুরুষের যদি ভগ্নি না থাকে, বরং সহোদর বা বৈমাত্র ভাই একজন থাকে তবে সে একাই সমুদয় সম্পত্তি পাইবে। আর যদি একাধিক ভাই থাকে তবে ভাইগণ সমুদয় সম্পত্তি সমান ভাবে বণ্টন করিয়া নিবে, অবশ্য সহোদর ভাই থাকিলে বৈমাত্র ভাই বঞ্চিত হইবে।

* ঐরূপ মৃত নারীর যদি ভাই না থাকে সহোদরা বা বৈমাত্র বোন একজন থাকে তবে সে অর্দ্ধেক পাইবে, আর যদি দুই বা ততধিক ঐ শ্রেণীর বোন থাকে তবে বোনগণ দুই তৃতীয়াংশ বণ্টন করিয়া নিবে।

ভবিষ্যতের ব্যাপক জ্ঞান দর্শনের দ্বারা স্বয়ং মিরাস বণ্টনের অধ্যায়গুলি নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন মানবের জন্য উহাই মঙ্গলময়।

মিরাস বণ্টন সম্পর্কে আল্লাহ ও আল্লার রসুলের এই ভুমিকায় ইহাই প্রতিয়মান হয় যে, ইসলামের মধ্যে বিভিন্ন এবাদৎ-বন্দেগীর অধ্যায়গুলি যেরূপ বাধ্যতামুলক এবং আইন পর্য্যায়ের—যেমন, বার মাসে এক মাস রোযা ফরজ তাহাও রমজান মাসে নির্দ্ধারিত এবং জাকাতের নেছাব দুই শত দেরহাম, জাকাতের পরিমাণ চল্লিশ ভাগের এক ভাগ এবং নামাযের মধ্যে ফজর দুই রাকাত, জোহর চার রাকাত, আছর চার রাকাত, মাগরিব তিন রাকাত, এশা চার রাকাত এবং প্রত্যেক রাকাত নামাযে এক রুকু দুই সেজদা ইত্যাদি। শরীয়তের এই সব অধ্যায়গুলি যেরূপে বাধ্যতা মূলক তদ্রূপ মিরাস বণ্টনের অধ্যায়গুলিও জাকাত ইত্যাদির ন্যায় এবাদৎ পর্য্যায়ের বাধ্যতা মূলক, এস্থলে মানবীয় জ্ঞান-দর্শন ও মছ্‌লেহাত বা কল্যাণ কামনার প্রবনতায় কোন প্রকার (এম্যানমেণ্ট) সংশোধন, পরিবর্ত্তন বা উন্নয়নের অবকাশ নাই। বস্তুতঃ সর্ব্বজ্ঞানী সর্ব্বদর্শী রহমানুর-রহীম সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালার মছলেহত-বীনী ও কল্যাণ কামনার উর্দ্ধে মানবীয় সঙ্কীর্ণ জ্ঞান-দর্শনের কল্যান কামনা যাইতেও পারে না। আমরা হয়ত দুই চার দিকের দৃষ্টি প্রসূত এবং উপস্থিত বা নিকটতম অস্থায়ী ঘটনাবলীর প্রভাব প্রসূত ভাবাবেগের প্রবণতায় কোন ব্যবস্থাকে কল্যাণকর ভাবিতে পারি। কিন্তু সর্ব্বদিকের দৃষ্টি ও ভূত-ভবিষ্যতের সর্ব্বস্থলে সর্ব্বক্ষেত্রে প্রকৃত প্রস্তাবে উহা কল্যাণকর হইবে তাহার নিশ্চয়তা ত দুরের কথা উহার সম্ভাবনাও নাই! কারণ মানবীয় সঙ্কীর্ণ জ্ঞান দর্শনের দ্বারা তাহা সম্ভব হইতে পারে না।

এই বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করার উদ্দেশ্যেই ইমাম বোখারী (রঃ) উল্লেখিত আয়াত ও হাদীছ বর্ণনা করার পর ফরায়েজের তথা মিরাস বণ্টনের নির্দ্ধারিত বিধানকে শিক্ষা করার গুরুত্ব বয়ানের একটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করিয়াছেন। সেই পরিচ্ছেদে বিশিষ্ট ছাহাবী ওক্‌বা ইবনে আমের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর এই বিশেষ একটি সতর্কবাণীও বর্ণনা করিয়াছেন—

تعلموا قبل الظانين অর্থাৎ মানবীয় জ্ঞান-দর্শন প্রসূত বিষয় অকাট্য হয় না—উহা শুধু মাত্র ধারণা ও অনুমান শ্রেণীর হয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ প্রদত্ত বিধান যাহা কোরআন ও রসুল মারফৎ পাওয়া যায় উহা হয় অকাট্য। এক যুগে এরূপ লোকদের আবির্ভাব হইবে, যাহারা স্বীয় সংকীর্ণ জ্ঞান-দর্শন প্রসূত তথা ধারণা ও অনুমানের মাপ-কাঠিতে কথা বলিবে এবং তাহাই লোকদের উপর চাপাইবার চেষ্টা করিবে। খাঁটি ঈমানদারদের কর্ত্তব্য ঐ শ্রেণীর লোকদের

মতবাদ প্রতিরোধ করার জন্য পূর্ব্বাহ্নেই আল্লাহ-প্রদত্ত বিধানসমূহ মজবুত রূপে শিক্ষা করিয়া রাখা।

ফরায়েজ তথা মিরাস বণ্টনের বিধান শিক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা হাদীছ শরীফেও বিশেষরূপে উল্লেখ রহিয়াছে। আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা ফরায়েজ শিক্ষা কর; উহা দীন শিক্ষার অর্দ্ধাংশ এবং ঐ শিক্ষাটিই আমার উম্মত হইতে সর্ব্বাগ্রে ছিন্ন হইবে। ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, ফরায়েজ শিক্ষা কর; উহা দীন-ইসলামের একটি বিশেষ অঙ্গ। (ফতহুলবারী)

সন্তানের মিরাস মাতা-পিতা হইতে

যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) বলিয়াছেন, কোন মৃত পুরুষ বা মহিলার সন্তান শুধু একটি মেয়ে আছে—সেই মেয়ে পিতা বা মাতার সম্পত্তির অর্দ্ধেক পাইবে। আর যদি দুই বা ততধিক শুধু মেয়ে থাকে তবে তাহারা সকলে দুই তৃতীয়াংশ পাইবে। যদি ঐ মেয়েদের সহিত একটিও ছেলে থাকে তবে "জবীল-ফুরুজ"—কোরআনে নির্দ্ধারিত অংশের অংশিদার কেহ থাকিলে তাহার নির্দ্ধারিত অংশ প্রদানের পর অবশিষ্ট সব মেয়ের এক গুণ, ছেলের দ্বিগুণ—এই হিসাবে বণ্টন করিতে হইবে।

মেয়েদের মিরাস

কোরআন এবং হাদীছ অনুসারে মেয়েরাও ছেলেদের ন্যায় মাতা-পিতার মিরাসের অধিকারিনী হইবে। অবশ্য তাহাদের প্রাপ্য ছেলেদের অপেক্ষা কম হইবে।

২৫৩৮। হাদীছঃ— আছওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আমলেই ছাহাবী মোয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) ইয়ামান দেশের শাসনকর্ত্তা ও শিক্ষক হইয়া আসিলেন। আমরা তাঁহার নিকট একটি মছআলাহ জিজ্ঞাসা করিলাম—এক ব্যক্তি তাহার এক মেয়ে এবং এক ভগ্নি রাখিয়া মারা গিয়াছে। সেই ক্ষেত্রে তিনি মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির অর্দ্ধেক তাহার মেয়েকে দিলেন; অপর অর্দ্ধেক ভগ্নিকে দিলেন।

পুত্রের সহিত নাতির মিরাস

ইমাম বোখারী (রঃ) উল্লেখ করিয়াছেন, নাতি মিরাস পাইবে যদি মৃত ব্যক্তির একজনও পুত্র সন্তান না থাকে। এই প্রসঙ্গে ইমাম বোখারী (রঃ) বিশিষ্ট ছাহাবী যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন—

ولد الابناء بمنزلة الولد اذا لم يكن دونهم ولد........

ولا يرث ولد الابن مع الابن.

"সন্তানের সন্তান মৃত ব্যক্তির সন্তানের ন্যায় গণ্য হইবে—পুত্র পুত্রের ন্যায় মেয়ে মেয়ের ন্যায়—যদি তাহাদের সঙ্গে কোন পুত্র বিদ্যমান না থাকে। মৃত ব্যক্তির কোন পুত্র বিদ্যমান থাকিলে তাহার পুত্রের (বা মেয়ের) সন্তানগণ ওয়ারেস হইবে না।"

২৫৩৯। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যাহাদের জন্য শরীয়তে অংশ নির্দ্ধারিত রহিয়াছে তাহাদিগকে সেই নির্দ্ধারিত অংশ দিতে হইবে। অতঃপর অবশিষ্ট যাহা কিছু থাকিবে তাহা মৃত ব্যক্তির অধিক নিকটবর্ত্তী (এক বা একাধিক) পুরুষ পাইবে।

ব্যাখ্যাঃ— আলোচ্য হাদীছের বিস্তারিত বিবরণ অতিশয় সুপ্রশস্ত যাহা ফরায়েজ সম্পর্কে অভিজ্ঞ আলেমের নিকট হইতে জানা যাইবে। নিজে নিজে ইহার দ্বারা কোন মছআলাহ ফয়ছালা করা যাইবে না।

আলোচ্য হাদীছের তথ্যটির একটি সরল দৃষ্টান্ত—যেরূপ, কোন মৃত ব্যক্তির স্ত্রী, ছেলে ও নাতি রহিয়াছে। স্ত্রীর জন্য ছেলে থাকাবস্থায় অষ্টমাংশ নির্দ্ধারিত রহিয়াছে তাহা তাহাকে দেওয়ার পর অবশিষ্ট সব ছেলে পাইবে, নাতি কিছুই পাইবে না। কারণ, নাতি অপেক্ষা ছেলে অধিক নিকটবর্ত্তী।

অধিক নিকটবর্ত্তী ব্যক্তি যদি পুরুষ না হইয়া নারী হয়, তবে উহার মছআলাহ বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন রূপ।

মছআলাহঃ—পুত্র সন্তান বিদ্যমান থাকিলে নাতি মিরাস পায় না, কিন্তু যদি পুত্র সন্তান না থাকে, বরং শুধু মেয়ে থাকে তবে তাহার সঙ্গে পুত্রের পুত্র নাতি এমনকি নাতির পুত্রও মিরাস পাইবে। যেমন মৃত ব্যক্তির পিতা, মাতা, স্ত্রী, এক মেয়ে, এক পুত্রের পুত্র থাকিলে পিতা ষষ্ঠাংশ, মাতা ষষ্ঠাংশ, স্ত্রী অষ্টমাংশ, মেয়ে অর্দ্ধাংশ পাইবে এবং অবশিষ্ট নাতি পাইবে। নাতির সঙ্গে পুত্রের মেয়ে নাতিন থাকিলে সেই নাতিনও অংশ পাইবে এবং নাতি ও নাতিন পরস্পরের মধ্যে নরের জন্য নারীর দ্বিগুণ নিয়মে ভাগ হইবে। মৃত ব্যক্তির দুই বা ততধিক মেয়ে ও পুত্রের পুত্র নাতি থাকিলে সে ক্ষেত্রে মেয়েগণ সমভাবে দুই তৃতীয়াংশ পাইবে, এবং অবশিষ্ট নাতি পাইবে।

মেয়ের সঙ্গে পুত্রের মেয়ে নাতিনও মিরাস পায় যদি মেয়ে একজন থাকে। উপরোল্লেখিত অবস্থায় এক মেয়ের সঙ্গে পুত্রের মেয়ে নাতিন থাকিলে সে ষষ্ঠাংশ পাইবে।

২৫৪০। হাদীছঃ— একদা কোন এক ব্যক্তি ছাহাবী আবু মূছা আশয়ারী (রাঃ)কে এই মছআলাহটি জিজ্ঞাসা করিল যে, কোন এক মৃত ব্যক্তির এক মেয়ে, এক

নাতিন—ছেলের মেয়ে এবং এক ভগ্নি রহিয়াছে। আবু মূছা (রাঃ) বলিলেন, মেয়ে অর্দ্ধেক এবং ভগ্নি অর্দ্ধেক পাইবে (অর্থাৎ নাতিন কিছুই পাইবে না)। তিনি জিজ্ঞাসাকারীকে ইহাও বলিলেন যে, মছআলাহটি আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা কর, আশা করি তিনিও আমার মতামত সমর্থন করিবেন।

সেমতে আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল এবং তাঁহাকে আবু মূছা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মন্তব্যও জ্ঞাত করা হইল। আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলিলেন, আমিও যদি তাঁহার ঐ মত্ পোষণ করি, তবে তাহা আমার পক্ষে ভ্রান্তি পরিগণিত হইবে। উক্ত অবস্থার জন্য হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যে নির্দ্দেশ রহিয়াছে, আমি সেই নির্দ্দেশ ব্যক্ত করিতেছি। হযরত নবী (দঃ) ঐরূপ অবস্থায় মেয়ের জন্য অর্দ্ধাংশ, নাতিনের জন্য ষষ্ঠাংশ এবং অবশিষ্ট ভগ্নির জন্য নির্দ্ধারিত করিয়া ছিলেন। সন্তান-সন্ততির মধ্যে একাধিক মেয়ের জন্য যে, দুই তৃতীয়াংশ পবিত্র কোরআনের নির্দ্ধারণ রহিয়াছে তাহা পূর্ণ করার জন্য মেয়েকে অর্দ্ধাংশ দেওয়ার পর ষষ্ঠাংশ নাতিনকে দেওয়া হইবে।

আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর এই মতামত ও বয়ান আবু মূছা (রাঃ)কে জ্ঞাত করা হইলে, তিনি তাঁহার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপনার্থে বলিলেন, এত বড় বিজ্ঞ আলেম তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকাবস্থায় আর কোন মছআলাহ আমার নিকট জিজ্ঞাসা করিও না।

ব্যাখ্যা ঃ—ঐরূপ অবস্থায় যদি দুই মেয়ে থাকে তবে নাতিন কিছুই পাইবে না। যেহেতু দুই মেয়ে পূর্ণ দুই তৃতীয়াংশ পাইয়া যাইবে। অবশ্য যদি নাতিনের সহিত এই অবস্থায় নাতিও থাকে, তবে ভগ্নি বঞ্চিত হইয়া যাইবে এবং দুই মেয়ে দুই তৃতীয়াংশ নেওয়ার পর অবশিষ্ট এক তৃতীয়াংশ নাতি ও নাতিনের মধ্যে নরের জন্য নারীর দ্বিগুণ হারে বন্টিত হইয়া যাইবে।

নাতি-নাতিন সম্পর্কে অংশ প্রাপ্তির উল্লেখিত বিবরণ একমাত্র পুত্রের সন্তান-সন্ততির পক্ষেই প্রযোজ্য। মেয়ের সন্তান-সন্ততিগণ সাধারণরূপে অংশীদার হয় না। যে ক্ষেত্রে অংশীদার হইতে পারে তাহার বিস্তারিত বিবরণ ফরায়েজের বিধান হইতে উদ্ধার করিতে হইবে।

দাদার মিরাস

পিতা জীবিত থাকিলে দাদা মিরাস পাইবে না। পিতা জীবিত নাই, দাদা জীবিত আছে—এই অবস্থায় দাদা পিতার স্থলে গণ্য হইয়া মিরাসের অধিকারী হইবে। আবু বকর (রাঃ), ইবনে আব্বাস (রাঃ), আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) প্রমুখ হইতে এই মছআলাহ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু হানিফা (রঃ)ও ইহাই বলিয়াছেন।

স্বামী-স্ত্রীর মিরাস

২৫৪১। ছাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে সাধারণ ভাবে ছেলেই সমস্ত মিরাসের অধিকারী হইত। পিতা-মাতার জন্য অছিয়ত করা জরুরী ছিল, যে পরিমাণ অছিয়ত করা হইত তাহারা সেই পরিমাণ পাইত; অবশিষ্ট শুধু মাত্র ছেলে পাইয়া থাকিত। পরবর্ত্তী যুগে আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং নিজ ক্ষমতা ও ইচ্ছা অনুসারে ঐ নিয়ম রহিত করিয়া ভিন্ন নিয়ম প্রবর্ত্তন পূর্ব্বক কোরআনের আয়াত নাযেল করিয়াছেন এবং সেই আয়াতে মেয়েকেও মিরাসের অধিকারিণী বানাইয়াছেন, অবশ্য ছেলে মেয়ের দ্বিগুণ পাইবে। আর মাতা-পিতার প্রত্যেকের জন্য (ছেলে থাকিলে) ষষ্ঠাংশ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। আর স্ত্রীর জন্য (মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকিলে) অষ্টমাংশ এবং (সন্তান না থাকিলে) চতুর্থাংশ, আর স্বামীর জন্য (সন্তান না থাকিলে) অর্দ্ধাংশ এবং (সন্তান থাকিলে) চতুর্থাংশ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন।

বংশ ও ঔরস্য সম্পর্ক একমাত্র বৈধ সম্পর্ক-ক্ষেত্রেই সাব্যস্ত হইতে পারে, ব্যভিচার দ্বারা ঐ সম্পর্ক স্থাপিত হয় না

২৫৪২। ছাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, সায়াদ ইবনে আবী অক্কাস (রাঃ) ছাহাবীর (কাফের) ভ্রাতা ওৎবা মৃত্যু-মুখে স্বীয় ভ্রাতা বিশিষ্ট ছাহাবী সায়াদ (রাঃ)কে অছিয়ৎ করিয়া গিয়াছিল যে, মক্কার যাম্‌আ নামক (কাফের) ব্যক্তির ক্রীতদাসীর গর্ভজাত সন্তানটি (ব্যভিচার সঙ্গমের মাধ্যমে) আমার বীর্য্যে জন্ম। (সুতরাং সে আমার গোলাম; অন্ধকার যুগে ব্যভিচার দ্বারাও ঔরস্য সাব্যস্ত হইত। আমি ত মরিয়া যাইতেছি; মক্কায় ত তোমার জাতি মোসলমানদের বিজয় হইবে, তখন আমার ভ্রাতা হিসাবে) তুমি ঐ গোলামটিকে হস্তগত করিয়া নিও।

সেমতে মক্কা মোসলমানদের জয় হইলে পর সায়াদ (রাঃ) ঐ গোলামকে হস্তগত করিয়া লাইলেন এবং দাবী করিলেন, ইহা আমার ভ্রাতার সন্তান; (ক্রীতদাসীর গর্ভজাত হওয়ায় গোলাম হইয়াছে।) ভ্রাতা আমাকে তাহার সত্ব দান করিয়া গিয়াছেন। (উক্ত ক্রীতদাসীর মালিক) যামআর পুত্র "আব্দ" ঐ দাবীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া দাবী করিল, সে ত আমার ভ্রাতা; আমার পিতার ঔরসে তথা তাহার দাসীর গর্ভে জন্ম লাভ করিয়াছে।

বিরোধমান উভয়ে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইল। নবী (দঃ) বলিলেন, হে আব্দ! সে তোমার ভ্রাতাই সাব্যস্ত। সন্তান বৈধ

সম্পর্কীয় ঔরসেরই গণ্য হয়, ব্যভিচার দ্বারা তাহা হয় না—ব্যভিচারীর ভাগ্যে ত প্রস্তরাঘাত।

(উক্ত বিধান মতে বিরোধস্থল ছেলেটি যম্আর পুত্র সাব্যস্ত হইল। নবী পত্নি ছওদা (রাঃ) যম্আর দুহিতা ছিলেন; সে মতে ঐ বিধানানুসারে ছওদা (রাঃ) ঐ ছেলের ভগ্নি হইলেন। কিন্তু) নবী (দঃ) ছওদা (রাঃ)কে ঐ ছেলের সহিত পর্দ্দা করার আদেশ করিলেন; যেহেতু তাহার আকৃতি ব্যভিচারী ওৎবার সহিত সামঞ্জস্যময় ছিল। ছওদা (রাঃ) মৃত্যু পর্য্যন্ত কখনও ঐ ব্যক্তিকে দেখা দেন নাই।

ব্যাখ্যা ঃ—বৈধ সম্পর্কের ক্ষেত্রে সন্তানের বংশ উক্ত সম্পর্কধারী স্বামী হইতেই সাব্যস্ত হইবে যদি কোন অকাট্য বাধা না থাকে। যথা—বিবাহ সম্পাদনের পর ছয় মাসের কম সময়ে সন্তান জন্মিয়াছে; সেই সন্তান উক্ত বৈবাহিক সম্পর্কের জন্ম সাব্যস্ত হইবে না এবং ঐ স্বামীর বংশের সাব্যস্ত হইবে না। এই বাধা না থাকিলে ঐ স্বামীর ঔরস্য সাব্যস্ত হইবে যদিও স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের মিলন প্রকাশ্যে প্রমাণিত না হয়। এমনকি স্বাভাবিক ভাবে মিলনের সম্ভাব্যতা পরিদৃষ্ট না হইলেও সেই ক্ষেত্রে বংশ ও ঔরস্য স্বামীর সহিত সম্পৃক্ত হইবে। যথা প্রাপ্তবয়স্ক স্বামী-স্ত্রীর বিবাহ সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গে স্বামী দুরদেশে চলিয়া গিয়াছে—উভয়ের মিলন দেখা যায় নাই; ছয় মাস বা ততধিক সময় পর সন্তান জন্মিয়াছে। এই সন্তানের বংশ ও ঔরস্য ঐ স্বামী হইতেই পরিগণিত হইবে যদি না স্বামী অস্বীকার করে। স্বামী অস্বীকার করিলেও স্ত্রী যদি ঐ স্বামীর ঔরস্য হওয়ার দাবী করে তবে স্বামীর অস্বীকারেও তাহার ঔরস্য বাতিল গণ্য হইবে না—যাবৎ না "লেয়ান" করে। লেয়ানের বিবরণ ষষ্ঠ খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে।

আকৃতির দ্বারা ঔরস্য প্রমাণ করা

হানফী মজহাব মতে পিতা সন্তানের ঔরস্য অস্বীকার করিলে শুধু আকৃতির দ্বারা ঔরস্য প্রমাণিত হইবে না। তদ্রূপ আকৃতির গরমিলের দরুণ সন্তানের ঔরস্য অস্বীকার করা কিম্বা উহার দরুণ কোন প্রকার কটাক্ষ করা একেবারে হারাম।

২৫৪৩। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমার গৃহে আসিলেন—তাঁহার মুখমণ্ডলে আনন্দের আভা ছিল। তিনি বলিলেন, হে আয়েশা! তুমি জান কি! মোযাজ্জায মোদ্‌লাজী আসিয়া ছিল এবং উছামা ও যায়েদকে দেখিয়াছিল। তাহারা উভয়ে মাথা পর্য্যন্ত চাদরে আবৃত অবস্থায় শুইয়া ছিল—শুধু তাহাদের পদদ্বয় উন্মুক্ত ছিল। মোযাজ্জায বলিয়াছে, এই পদযুগল একটি অপরটির অংশবিশেষ।

ব্যাখ্যা ঃ—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পালক পুত্র ছিলেন যায়েদ (রাঃ), আর তাঁহার পুত্র ছিলেন, উছামা (রাঃ)। উভয়ই নবীজীর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহাদের আকৃতিতে গরমিল ছিল—যায়েদ(রাঃ) গৌর বর্ণের ছিলেন, আর উছামা(রাঃ) ছিলেন কৃষ্ণ বর্ণের। মোনাফেক-কাফেররা নবীজীর মনে ব্যথা দেওয়ার জন্য উক্ত গরমিল দেখাইয়া যায়েদ (রাঃ) ও উছামার মধ্যে পিতা-পুত্রের সম্পর্কে কটাক্ষ করিত।

আরবে এক শ্রেণীর লোক হইত যাহারা পিতা-পুত্র শেনাক্ত করায় বিজ্ঞ পরিগণিত হইত। এবং ঐ ব্যক্তিদের সিদ্ধান্ত ও সাব্যস্তকে অতিশয় মূল্য দেওয়া হইত। মোযাজ্জায মোদলাজী ঐ শ্রেণীর অন্যতম ব্যক্তিরূপে প্রসিদ্ধ ছিল। সুতরাং তাহার সাব্যস্ত ও সিদ্ধান্তে কাফের-মোনাফেকদের মুখ বন্ধ হইয়া যাইবে। তাই নবীজী (দঃ) এই ক্ষেত্রে সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হইয়াছেন। যায়েদ ও উছামার প্রকৃত সম্পর্ক ত সপ্রমাণিত ছিলই।

বন্দী ব্যক্তি ওয়ারেস হইলে

শত্রুর হাতে কোন মোসলমান যদি বন্দী হইয়া পড়ে, যাহার খোঁজ ও ঠিকানা জানা আছে, তাহার মুক্তির কোন ব্যবস্থা ও আশা না থাকিলেও মিরাসের মধ্যে তাহার প্রাপ্য অংশ জমা রাখিয়া দিতে হইবে। তাহাকে বাদ দিয়া অন্যান্য ওরায়েসগণ সমুদয় মিরাস বন্টন করিয়া নিতে পারিবে না। অবশ্য যদি তাহার খোঁজ ও ঠিকানা জানা না থাকে, তবে সে নিখোঁজ গণ্য হইবে, যাহার জন্য শরীয়তে বিস্তারিত বিধান রহিয়াছে।

ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (রঃ) এই ফরমান জারী করিয়া ছিলেন যে, বন্দী ব্যক্তি কোন অছিয়ত করিলে বা তাহার গোলাম ক্রীতদাসকে মুক্তি দান করিলে এবং তাহার ধন-সম্পদের মধ্যে সে কোন প্রকার কার্য্য প্রয়োগ করিলে তাহা প্রযোজ্য হইবে, যাবৎ সে ইসলাম ধর্ম্ম বদলাইয়া না ফেলে। (আর যদি খোদানাখাস্তা সে শত্রুর হাতে বন্দী হইয়া ইসলাম ত্যাগ করতঃ মোরতাদ্ হইয়া যায় তবে সে মৃতের ন্যায় গণ্য হইবে এবং তাহার সমুদয় ধন-সম্পত্তি ওয়ারেসগণের মধ্যে বন্টিত হইয়া যাইবে ; ঐ ধন-সম্পত্তির উপর তাহার কোন কার্য্যই প্রযোজ্য হইবে না।

মোসলেম ও অমোসলেমের মধ্যে মিরাস প্রবর্ত্তিত হইবে না

২৫৪৪। **হাদীছ ঃ**— عن اسامة بن زيد رضى الله تعالى عنهما

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ

وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

অর্থ ঃ—উছামা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মোসলমান কাফেরের ওয়ারেস হইতে পারিবে না এবং কাফের মোসলমানের ওয়ারেস হইতে পারিবে না।

ব্যাখ্যা ঃ—অধিকাংশ ছাহাবা তাবেয়ীন ও ইমামগণের অভিমত এই হাদীছ মোতাবেকই প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য ছাহাবীদের মধ্য হইতে বিশিষ্ট ছাহাবী মোয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ), মোয়াবিয়া (রাঃ) এবং তাবেয়ীগণের মধ্য হইতে হাসান বছরী (রঃ), আলী রাজিয়াল্লাহ তায়ালা আনহুর ছেলে মোহাম্মদ (রঃ), হোসাইন রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ছেলে ইমান জয়নাল আবেদীনের পুত্র ইমাম বাকের প্রমুখগণ ভিন্ন দলীল সূত্রে এই অভিমত পোষণ করিতেন যে, কাফের মোসলমানের ওয়ারেস হইবে না, কিন্তু মোসলমান কাফেরের ওয়ারেস হইয়া সম্পত্তির অধিকারী হইবে।

'হুদূদ' তথা শরীয়ত কর্তৃক নির্দ্ধারিত বিভিন্ন শাস্তির বয়ান

জেনা বা ব্যভিচার, মদ্য পান, চুরি, ডাকাতি এবং কোন মোসলমানের উপর জেনার অপ্রমাণিত তোহমত লাগান—এই সব অপরাধের জাগতিক শাস্তি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা নির্দ্ধারিত করিয়া পবিত্র কোরআনে ঘোষণা দিয়া দিয়াছেন। এই শ্রেণীর শাস্তিকেই "হদ্দ" বহু বচনে "হুদুদ" বলা হয়। এই সব শাস্তি ইহজগতে আইনগত ভাবে বলবৎ হইবে। ইহা ভিন্ন উক্ত অপরাধসমূহের পরকালীন শাস্তিও রহিয়াছে যাহা খণ্ডনের একমাত্র পথ হইল খাটী তওবা।

কতিপয় গোনাহ সম্পর্কে সতর্কবাণী

২৫৪৫। **হাদীছ ঃ**— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزنى الزانى حين

يزنى وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق

السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس اليه

فيها ابصارهم وهو مؤمن

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ব্যভিচারী জেনাকারী যখন ব্যভিচার ও জেনায় লিপ্ত হয় সে তখন পূর্ণ মোমেন থাকিয়া বা ঈমানের প্রতি স্বীয় লক্ষ্য উপস্থিত রাখিয়া ব্যভিচার ও জেনায় লিপ্ত হইতে পারে না। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ব্যভিচার ও জেনায় লিপ্ত হয়, সে পূর্ণ মোমেন থাকে না বা ঈমানের প্রতি তাহার লক্ষ্য তখন উপস্থিত থাকে না। এবং যখন কেহ মদ্য পান করে সে তখন পূর্ণ মোমেন থাকিয়া বা ঈমানের প্রতি লক্ষ্য বিদ্যমান রাখিয়া মদ্য পান করিতে পারে না। অর্থাৎ মদ্য পানকারী যখন মদ্য পান করে তখন সে পূর্ণ মোমেন থাকে না বা ঈমানের প্রতি তাহার লক্ষ্য তখন বিদ্যমান থাকে না। এবং চোর যখন চুরি করে সে তখন পূর্ণ মোমেন থাকিয়া বা ঈমানের প্রতি তাহার লক্ষ্য তখন বিদ্যমান রাখিয়া চুরি করিতে পারে না। অর্থাৎ চোর যখন চুরি করে তখন সে পূর্ণ মোমেন থাকে না বা ঈমানের প্রতি তাহার লক্ষ্য তখন বিদ্যমান থাকে না। এবং কোন ব্যক্তি পূর্ণ মোমেন থাকিয়া বা ঈমানের প্রতি স্বীয় লক্ষ্য বিদ্যমান রাখিয়া সর্ব্ব সমক্ষে প্রকাশ্য দিবা লোকে ডাকাতি করার ন্যায় মহা পাপে লিপ্ত হইতে পারে না। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যখন ঐরূপ জঘন্য পাপে লিপ্ত হয় তখন সে পূর্ণ মোমেন থাকে না বা ঈমানের প্রতি তাহার লক্ষ্য তখন বিদ্যমান থাকে না।

ব্যাখ্যা ঃ—"পূর্ণ মোমেন থাকে না বা ঈমানের প্রতি লক্ষ্য বিদ্যমান থাকে না" এই বলিয়া আলোচ্য হাদীছের দুই প্রকার অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। হাদীছটির ভাষায় উভয় অর্থেরই অবকাশ রহিয়াছে এবং আদর্শ ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়া উভয় অর্থই উচ্চ মানের। প্রথম অর্থ অনুযায়ী হাদীছের মূল উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য্য হইল—লোকদিগকে সতর্ক করা যে, এই সব গোনাহ ও পাপের দ্বারা ঈমানের পূর্ণতা নষ্ট হইয়া যায়। দ্বিতীয় অর্থ অনুযায়ী উদ্দেশ্য হইল—এই শ্রেণীর মহা পাপসমূহ হইতেও বাঁচিবার একটি অমোঘ ব্যবস্থা শিক্ষা দেওয়া যে, যখনই ঐরূপ কোন পাপের আকর্ষণ তোমাকে মোহমান করিয়া তোলে তখনই তুমি স্বীয় ঈমানকে বিবেকের সামনে উপস্থিত কর, ঈমানের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ কর—আল্লার প্রতি ঈমান, আল্লার আদেশ-নিষেধের প্রতি ঈমান, এই সব গোনাহের আজাবের প্রতি ঈমানকে উপস্থিত করিয়া ধ্যানকে উহার উপর নিবদ্ধ কর। এরূপ করিলে তুমি পাপ হইতে বিরত থাকিবে, সে দিকে অগ্রসর হইবে না, তুমি নিজেই নিজেকে সংযত রাখিতে সমর্থ হইবে।

২৫৪৬। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ব্যভিচারী ব্যভিচার করাকালে মোমেন থাকাবস্থায় ব্যভিচারে লিপ্ত হয় না। চোর চুরি করাকালে মোমেন

থাকাবস্থায় চুরিতে লিপ্ত হয় না। এবং মদখোর মদ্য পানকালে মোমেন থাকাবস্থায় মদ্য পান করে না, তদ্রূপ মোমেন থাকাবস্থায় হত্যা কার্য্য করে না। (১০০৬ পৃঃ)

ব্যাখ্যা ঃ—উক্ত বাক্যদ্বয়ের দুইটি অর্থ উপরে বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ইমাম বোখারী (রঃ) আর একটি তৃতীয় অর্থও ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, জেনাকারী ব্যাভিচারী যখন জেনায় লিপ্ত হয়, তখন সে তাহার ভিতর ঈমানের নূর ধারণকারী থাকিয়া জেনায় লিপ্ত হইতে পারে না ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ জেনাকারী যখন জেনায় লিপ্ত হয়, চোর যখন চুরি করে, শরাবখোর যখন শরাব পান করে, ডাকাত যখন ডাকাতি করে, তাহাদের অভ্যন্তরে তখন ঈমানের নূর বিদ্যমান থাকে না। তাহাদের ভিতর হইতে ঈমানের নূর বাহির হইয়া যায়। ইবনে আব্বাস (রাঃ) স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন—ينزع منه نور الايمان "ঐ শ্রেণীর গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তির ভিতর হইতে ঈমানের নূর বাহির করিয়া নিয়া যাওয়া হয়।"

ঈমানের নূর বাহির হইয়া যাওয়া যে, কোন প্রকার রূপক বা উপঅর্থে নহে, বরং বাস্তবেই তাহা হয়—দৃঢ়তার সহিত উহা বুঝাইবার জন্য একটি বাহ্যিক দৃষ্টান্তও ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন। বোখারী শরীফ ১০০৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে—

قال عكرمة قلت لابن عباس كيف ينزع الايمان منه قال هكذا وشبك بين اصابعه ثم اخرجها فان تاب عاد اليه هكذا وشبك بين اصابعه

অর্থাৎ—আলোচ্য হাদীছখানা ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতেও বর্ণিত আছে। তাঁহারই বিশিষ্ট খাদেম ও শাগের্দ একরেমা (রঃ) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, উল্লেখিত গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তির ঈমান কিরূপে তাহার হইতে বাহির করিয়া নেওয়া হয়—কিরূপে উহা বাহির হয়? তদুত্তরে ইবনে আব্বাস (রাঃ) দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইবার উদ্দেশ্যে স্বীয় এক হাতের আঙ্গুল সমূহ অপর হাতের আঙ্গুল সমূহের ফাঁকের ভিতর প্রবেশ করাইয়া অতঃপর উহা টানিয়া বাহির করতঃ বুঝাইলেন যে, এই আঙ্গুলগুলি যে ভাবে অপর হাতের আঙ্গুল সমূহ হইতে বাহির হইল, ঠিক এইরূপেই উক্ত গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তির অভ্যন্তর হইতে ঈমান (তথা ঈমানের নূর) বাহির হইয়া আসে—এস্থলে কোন প্রকার রূপক বা উপঅর্থ উদ্দেশ্য নহে। অবশ্য যদি ঐ ব্যক্তি কৃত গোনাহ হইতে খাঁটী তওবা করে তবে ঈমান (তথা ঈমানের নূর) পুনঃ তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবে। এই বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গেও ইবনে আব্বাস (রাঃ) পুনরায় এক হাতের আঙ্গুল অপর হাতের আঙ্গুলের ফাঁকে প্রবেশ করিয়া ঈমানের নূর পুনঃ তাহার অভ্যন্তরে ফেরিবার দৃষ্টান্ত দেখাইলেন।

এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী আলোচ্য হাদীছের তাৎপর্য্য এই যে, উল্লেখিত গোনাহ সমূহের দরুণ মূল ঈমান বিলুপ্ত ও একেবারে ধ্বংস হইয়া যায় না বটে, কিন্তু ইমানের নূর ও উহার জ্যোতি ছিন্ন হইয়া যায়। ঈমানের নূর একটি অমূল্য রত্ন; এই নূর ইহজগতে মোমেনের থাকে যদ্দ্বারা সে আখেরাতের উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য পায়। পরজগতে সেই নূর প্রকাশ্যরূপে মোমেনের সাথী হইবে—যখন ময়দান হাশর হইতে পোল-ছেরাত অতিক্রম কালে ভীষণ অন্ধকার নামিয়া আসিবে। যাহার উল্লেখ পবিত্র কোরআনেও রহিয়াছে—

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ ......

هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

"একটি স্মরণীয় দিন—যে দিন প্রত্যেকে দেখিতে পাইবে, মোমেন পুরুষ ও মোমেন মহিলাগণের নূর তাহাদের সম্মুখে এবং তাহাদের ডানে (-বামে) ধাবমান রহিয়াছে। তাহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া বলা হইবে, আজ তোমাদের জন্য বেহেশতের সুসংবাদ—যাহার বাগ-বাগিচা ও মহলের অভ্যন্তরে প্রবাহমান নহরসমূহ বিরাজমান রহিয়াছে। তথায় তোমরা চিরকাল থাকিবে—ইহা অতি বড় সাফল্য। যে দিন মোনাফেক নর-নারীগণ মোমেনগণকে বলিবে, আমাদের জন্য অপেক্ষা করুন! আমরা যেন আপনাদের নূরের আলো লাভ করিতে পারি। তাহাদিগকে বলা হইবে পেছনের দিকে ফিরিয়া যাইয়া আলোর সন্ধান কর। এই সময় অনতি বিলম্বে (মোমেন ও মোনাফেক) উভয় দলের মধ্যে একটি প্রাচীরের আড়াল আসিয়া যাইবে। যাহার অভ্যন্তর দিকে রহিয়াছে রহমত-ভাণ্ডার তথা বেহেশত এবং বহির্ভাগে রহিয়াছে আজাব-কেন্দ্র তথা দোযখ। তখন মোনাফেক দল চিৎকার করিয়া মোমেনগণকে বলিবে, আমরা কি তোমাদের সাথী ছিলাম না? (অর্থাৎ দুনিয়াতে ত আমরা তোমাদেরই সাথী ছিলাম। আজ আমাদিগকে ফেলিয়া যাইতেছ কেন?) মোমেনগণ তদুত্তরে বলিবেন, প্রকাশ্যে ত তোমরা আমাদের সাথী ছিলে বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তোমরা নিজকে গোমরাহী ও ভ্রষ্টতার মধ্যে রাখিয়া ছিলে। সত্যের বাহকগণ বিলুপ্ত হউক সেই অপেক্ষায় ছিলে। দ্বীনের প্রতি সন্দিহান ছিলে এবং নানা প্রকার কাল্পনিক আশা আকাঙ্খা তোমাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া রাখিয়া ছিল। আল্লার হুকুম তথা মৃত্যু তোমাদের উপর আসিয়া পড়া পর্য্যন্ত তোমরা এ সবের মধ্যেই বিভোর ছিলে এবং ধোকাবাজ শয়তান তোমাদিগকে আল্লাহ সম্পর্কেও ধোকায় ফেলিয়া রাখিয়া ছিল (যে, আল্লাহ

তায়ালা তোহাদিগকে হিসাব-নিকাশের সম্মুখীন করিবেন না, হিসাব হইলেও তথায় তোমাদের রীতি-নীতিই গ্রহণীয় হইবে—ইত্যাদি। যেহেতু তোমরা বাস্তবে এই সব অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিলে) অতএব আজ তোমাদের ন্যায় শুধু বাহ্যিক মোমেন মোসলমান নামধারীদের বাঁচিবার উপায় নাই। এমনকি প্রাণ বিনিময় দেওয়া সম্ভব হইলে তাহাও তোমাদের হইতে গ্রহণ করা হইবে না। যেরূপ প্রকাশ্য কাফেরদের হইতেও গ্রহণ করা হইবে না। তোমাদের ঠিকানা দোযখই হইবে। উহাই তোমাদের চিরসাথী—কতই না জঘন্য বাসস্থান উহা।

(২৭ পারা ছুরা হাদীদ)

ঈমানের এই নুর ও জ্যোতি উল্লেখিত গোনাহ সমূহের দরুণ ছিন্ন হইয়া যায়। ফলে সেই ঈমানের অবস্থা তদ্রূপই হইয়া যায় যেরূপ আভা, দীপ্তি, জ্যোতি ও উজ্জলতা বিহীন মুক্তা ও মতি যাহাকে কানা মুক্তা বলা হয়। ইহা মূলতঃ মুক্তাই বটে, কিন্তু উহার মুল্যমান হইল প্রতি তোলা ১০, ২০ বা ৩০ টাকা। পক্ষান্তরে যে মুক্তার আভা দীপ্তি ও জ্যোতি রহিয়াছে শ্রেণী বিভেদে উহার মূল্যমান প্রতিটি দাতা ১০০, ৫০০, ১০০০, এমনকি লক্ষ্য টাকা পর্য্যন্ত দাঁড়ায়। নূরওয়ালা ঈমান ও নুরহীন ঈমান উভয়ের মূল্যমানের পার্থক্য আল্লাহ তায়ালার নিকট এবং আখেরাতের বাজারে আরও অধিক হইবে।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) ইহাও বলিয়া দিয়াছেন যে, ঐ গোনাহ সমূহের দ্বারা ঈমানের নূর ছিন্ন হয় বটে, কিন্তু ঐ সব গোনাহ হইতে খাঁটি তওবা করিলে ঈমানের নুর পুনঃ ফিরিয়া আসে। এই তথ্য ১০০৬ পৃষ্ঠায় আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে স্বয়ং হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে এইরূপে উল্লেখ আছে যে— والتوبة معروضة بعد অর্থাৎ ঐ শ্রেণীর গোনাহের দরুণ ঈমানের নুর বা ঈমানের পূর্ণতা ছিন্ন হওয়ার পরও তওবার সুযোগ বিদ্যমান থাকিবে।

মদ্য পানের শাস্তি

২৫৪৭। হাদীছঃ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মদ্য পানের শাস্তি দানে খেজুর-ডালের লাঠি এবং জুতা দ্বারা প্রহার করিয়াছেন। খলিফা আবু বকর (রাঃ)ও মদ্য পানে ৮০ বেত্রাঘাতের শাস্তি দিয়াছেন।

২৫৪৮। হাদীছঃ— ওক্‌বা ইবনে হারেছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নোয়ায়মান নামক ব্যক্তি বা তাহার পুত্রকে মদ্য পানের অপরাধীরূপে হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট হাজির করা হইল। তখন হযরত (দঃ) গৃহে উপস্থিত লোকদিগকে আদেশ করিলেন, তাহাকে প্রহার করিবার। হাদীছ

বর্ণনাকারী ছাহাবী বলেন, সেমতে লোকগণ তাহাকে প্রহার করিল—তাহাকে জুতা দ্বারা খেজুরে-ডালের লাঠি দ্বারা প্রহার করা হইল। প্রহারকারীদের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম।

২৫৪৯। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হইল—সে মদ্য পান করিয়া ছিল। হযরত (দঃ) তাহাকে প্রহার করার আদেশ দিলেন। আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, সেমতে আমাদের কেহ তাহাকে হাত দ্বারা, কেহ জুতা দ্বারা, কেহ (দড়িরূপে পাকান মোটা) কাপড় দ্বারা প্রহার করিল। অবশেষে একজন লোক ঐ ব্যক্তিকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, "আল্লাহ তোকে লাঞ্ছিত করুক" ; তখন হযরত নবী (দঃ) বলিলেন, তোমরা এরূপ কথা বলিও না—শয়তানকে সাহায্য করিও না।

অর্থাৎ শয়তান চায় মোসলমানকে দুনিয়া-আখেরাতে লাঞ্ছিত করিতে। তোমার বদ্‌দোয়াও তদ্রূপই যে, আল্লার তরফ হইতেও সেই ব্যবস্থাই হউক। অতএব তোমার এই বদ্‌দোয়া বস্তুতঃ শয়তানের সাহায্য করা হইল।

২৫৫০। হাদীছ ঃ—সায়েব ইবনে এযীদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যুগে এবং আবু বকর ছিদ্দীক রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেলাফৎকালে এবং ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেলাফতের প্রথম যুগে এই নিয়ম ছিল যে, মদ্য পানকারী উপস্থিত করা হইত অতঃপর (শাস্তিদানের আদেশ মোতাবেক) আমরা তাহাকে হাত দ্বারা, জুতা দ্বারা, (দড়িরূপে পাকান মোটা) চাদর দ্বারা প্রহার করিয়া থাকিতাম। ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেলাফৎকালের শেষ দিকে তিনি উক্ত অপরাধের শাস্তি চল্লিশটি বেত্রাঘাত নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন। অতঃপর যখন লোকদের নৈতিকতার আরও অবনতি ঘটিল, তখন তিনি আশি বেত্রাঘাত আইন করিয়া দিলেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ— মদ্যপানের অপরাধে শাস্তি বিধান স্বয়ং হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কর্তৃক প্রবর্ত্তিত ছিল। এমনকি মদ হারাম বিঘোষিত হওয়ার পর প্রথম দিকে এই অপরাধের শাস্তি বিধানে এত দুর কঠোরতা ছিল যে, এক ব্যক্তিকে ঐ অপরাধের দরুণ তিন বার পর্য্যন্ত সাধারণ শাস্তি প্রদান করা হইবে। সেই ব্যক্তি চতুর্থ বার ঐ অপরাধ করিলে তাহাকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হইবে। তিরমিজী শরীফে একখানা হাদীছ আছে—

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوْهُ

فَاِنْ عَادَ فِى الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوْهُ

"হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মদ্য পান করে, তাহাকে বেত্রদণ্ড প্রদান কর। অতঃপর যদি সে চতুর্থবার ঐ অপরাধ করে তবে তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত কর।"

নেছায়ী শরীফেও ঐরূপ দুই খানা হাদীছ রহিয়াছে—

(১) হাদীছ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এবং আরও কতিপয় ছাহাবী বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তি মদ্য পান করিলে তাহাকে বেত্রদণ্ড প্রদান কর, দ্বিতীয় বার পান করিলে দ্বিতীয় বার বেত্রদণ্ড প্রদান কর, তৃতীয় বার পান করিলে তৃতীয় বার বেত্রদণ্ড প্রদান কর, চতুর্থ বার পান করিলে তাহাকে কতল কর—প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত কর।

(২) হাদীছ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তি নেশা পান করিলে তাহাকে বেত্রদণ্ড প্রদান কর, দ্বিতীয় বার নেশা পান করিলে তাহাকে বেত্র-দণ্ড প্রদান কর, তৃতীয় বার পান করিলে তৃতীয় বার বেত্রদণ্ড প্রদান কর। চতুর্থ বার সম্পর্কে হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, 'فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ—তাহার গর্দান দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেল।"

এই বিশেষ কঠোরতা তথা প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা হযরতের সময়কালেই রহিত হইয়া গিয়া ছিল। কিন্তু বিভিন্ন প্রকারের প্রহার করার বিধান হযরতের সময় কালেও প্রবর্ত্তিত ছিল। হযরতের আমলে বেত্রাঘাতের দণ্ড প্রদানও হইয়া ছিল। যাহা মোসলেম শরীফের এক হাদীছে উল্লেখ আছে। ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেলাফৎ-কালে যখন ইসলাম দুরদুরন্ত পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া যায় এবং ইসলামে দীক্ষিত লোকদের সংখ্যা বাড়িয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অপরাধ বিশেষতঃ মদ্য পানের অপরাধ-সংখ্যাও বাড়িয়া যায়। এদিকে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতে এই অপরাধের শাস্তির মাত্রা নির্দ্ধারণ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট বিধান প্রবর্ত্তিত ছিল না, তাই তখন বিশেষ বিশেষ লোকদের তরফ হইতে মদ্য পানের শাস্তির মাত্রা ও পরিমাণ সম্পর্কে বিবেচনার জন্য খলীফাতুল-মোসলেমীনকে অনুরোধ জ্ঞাপন করা হয়। সেমতে খলীফা ওমর (রাঃ) বিশিষ্ট ছাহাবীবর্গের সহিত পরামর্শ করেন।

ছাহাবীগণ হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আমলে মদ্য পানের অপরাধে প্রদত্ত শাস্তির ঘটনাবলীর মধ্যে হযরতের কার্য্যক্রম হইতে নিম্ন লিখিত দুইটি বিষয় উদ্ধার করিতে সক্ষম হইলেন—

(১) আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মগ্ত পানের অপরাধে দুই জুতা দ্বারা চল্লিশটি প্রহার করিয়াছেন।

(২) আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা মগ্ত পানের এক অপরাধীকে হযরত রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত করা হইল, হযরত (দঃ) তাহাকে প্রহার করার আদেশ দিলেন, সেমতে দুইটি খেজুর-ডাল দ্বারা তাহাকে চল্লিশ বার আঘাত করা হইল। (তাহাবী শরীফ)

উক্ত উভয় ঘটনায় দুই চল্লিশ যোগে আশিটি আঘাতের সুত্র পাওয়া যায়; এই শ্রেণীর বিভিন্ন সুত্র ধরিয়া ছাহাবীগণ সকলে এক মত হইলেন যে, মগ্ত পানের শাস্তি আশি বেত্রাঘাত। ছাহাবীগণের এইরূপ সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্তকেই "اجماع صحابة—এজ্‌মায়ে ছাহাবাহ্‌" বলা হয়। ইসলামী শরীয়তে কোরআন ও ছুন্নার পরই এজ্‌মার স্থান এবং ছাহাবীদের এজ্‌মা সর্ব্বোচ্চ। ছাহাবী-গণের সেই এজ্‌মার ভিত্তিতেই খলীফা ওমর (রাঃ) মগ্ত পানের শাস্তি আশি বেত্রাঘাতের বিধান বলবৎ করিয়া ছিলেন। শরীয়তে অনেক মছআলাহই ছাহাবীদের এজ্‌মা দ্বারা অলঙ্ঘণীয়রূপে প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে, ইহাও তদ্রূপ অলঙ্ঘণীয়।

২৫৫১। হাদীছ ঃ—ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সময়কালে একদা এক ব্যক্তিকে হযরতের নিকট উপস্থিত করা হইল—লোকটির নাম ছিল আবদুল্লাহ এবং তাহার ডাক-নাম ছিল "হেমার" যাহার অর্থ "গাধা"। সে হযরত রস্থলুল্লাহ (দঃ)কে পর্য্যন্ত হাসাইয়া থাকিত। এক বার মদ্য পানের অপরাধে হযরত (দঃ) তাহাকে বেত্রাঘাত করিয়া ছিলেন। দ্বিতীয় বার মদ্য পানের অপরাধে তাহাকে উপস্থিত করা হইল, হযরত (দঃ) তাহাকে বেত্রাঘাতের আদেশ করিলেন; তাহাকে বেত্রাঘাত করা হইল। তখন উপস্থিত লোকদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি বলিল, তাহার উপর আল্লার লা'নৎ, কত বার তাহাকে অপরাধীরূপে উপস্থিত করা হইল!

ঐ সময় হযরত নবী (দঃ) বলিলেন, তোমরা কেহ তাহাকে লা'নৎ করিও না; খোদার কসম—আমার জানা মতে সে আল্লাহ এবং আল্লার রস্থলের প্রতি মহব্বৎ রাখে।

২৫৫২। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, চোরের প্রতি আল্লার লা'নৎ। (প্রথমতঃ) ডিম বা দড়ি (ইত্যাদি ছোট ছোট বস্তু) চুরি করে (এবং ধীরে ধীরে বড় বড় জিনিষও চুরি করে) ফলে তাহার হাত কাটা যায়।

ব্যাখ্যা ঃ—ইমাম বোখারী (রঃ) এস্থানে দেখাইয়াছেন যে, যত বড় অপরাধীই হউক ব্যক্তি বিশেষকে লা'নৎ করা চাই না। হাঁ— ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া নয়, বরং শুধু অপরাধীর শ্রেণী উল্লেখ করিয়া লা'নৎ করিলে তাহাতে দোষ নাই।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—ইমাম বোখারী (রঃ) এস্থলে কতিপয় জরুরী বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন—

(১) শরীয়ত নির্দ্ধারিত শাস্তিসমূহ শুধু শাস্তিই নহে ; উহা দ্বারা গোনাহ মাফ হইয়া থাকে।

(২) মোসলমান সর্ব্বাঙ্গে নিরাপদে থাকিবে। কেহ তাহার উপর কোন আঘাত করিতে পারিবে না। কিন্তু শরীয়তের শাস্তি মূলক বিধান তাহার উপর অবশ্যই প্রয়োগ করা হইবে এবং অপরের প্রাপ্য হক্ তাহার হইতে অবশ্যই আদায় করা হইবে।

(৩) হদ্দ্ তথা শরীয়তের শাস্তিমুলক বিধান অবশ্যই জারী ও প্রয়োগ করিতে হইবে এবং আল্লার বিধান লঙ্ঘনকারীকে অবশ্যই শায়েস্তা করিতে হইবে।

(৪) শরীয়তের শাস্তিমূলক বিধান প্রয়োগে বড়-ছোট, ইতর-ভদ্র উচ্চ-নীচ ইত্যাদি কোন প্রকার শ্রেণী-বিভেদের পার্থক্য করা চলিবে না।

(৫) শরীয়তের শাস্তি প্রয়োগ রহিতের জন্য শাসনকর্ত্তাদের নিকট সুপারিশ করাও অতি দোষনীয়।

এই সব বিষয়ের প্রত্যেকটি সম্পর্কেই ইমাম বোখারী (রঃ) হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু সেই সব হাদীছের তরজমা যথা স্থানে করা হইয়াছে।

চোরের শাস্তি

চোরের হাত কাটা সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের সুস্পষ্ট আয়াত—

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ

اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

"কোন পুরুষ বা নারী চুরি করিলে তাহার হাত কাটিয়া ফেল, ইহা তাহার কৃত কর্ম্মের শাস্তি (অর্থাৎ এই শাস্তি অপহৃত মালের বিনিময়ে নহে, বরং অপহরণ কর্ম্মের শাস্তি) এবং ইহা আদর্শ শাস্তি যাহা এই অপরাধ দমনের জন্য মহান আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে নির্দ্ধারিত। আল্লাহ সর্ব্ব ক্ষমতার অধিকারী হেকমতওয়ালা।" (১০ রুকু—ছুরা মায়েদাহ)

২৫৫৩। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, সিকি-দীনার বা তদূর্দ্ধ পরিমাণ মাল চুরি করিলেও তাহাতে হাত কাটা হইবে।

২৫৫৪। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সময়কালে একটি ঢালের মূল্যমানের বস্তু চুরি করিলে হাত কাটা হইত (উহার কমে নহে)।

২৫৫৫। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একটি ঢাল চুরি করার অপরাধে চোরের হাত কাটিয়া ছিলেন। ঢালটির মূল্য ছিল তিন দেরহাম।

ব্যাখ্যা ঃ—কম পক্ষে কি পরিমাণ মূল্য-মানের বস্তু চুরি করিলে হাত কাটা হইবে সে সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীছ বর্ণিত রহিয়াছে। সর্ব্বোচ্চ দশ দেরহাম (দুই তোলা রৌপ্য-মূল্য অপেক্ষা একটু বেশী) এবং সর্ব্ব নিম্ন তিন দেরহাম (তিন চতুর্থাংশ তোলা রৌপ্য-মূল্য অপেক্ষা একটু বেশী) উভয় মূল্যমান সম্পর্কেই হাদীছ বর্ণিত রহিয়াছে। ইসলামে প্রথম ও পরবর্ত্তী যুগের ব্যবধানে স্বয়ং শরীয়ত নির্দ্ধারণকারী রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্ত্তৃক এই পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া ছিল। কিন্তু কোনটি আগে ও কোনটি পরে তাহা নির্ণয় করা সম্ভব হয় নাই। তাই এস্থলে ইমামগণের মতভেদ হইয়াছে। হানফী মজহাব মতে সর্ব্ব নিম্ন মূল্যমান হইল দশ দেরহাম।

মানুষের শান্তি ও নিরাপত্তা বরং স্বাভাবিক জীবন-যাপন বিনষ্টকারী চুরি কার্য্যের ন্যায় বর্ব্বরোচিত জুলুম অন্যায় ও অপরাধ দমনে শরীয়ত হাত কাটার ন্যায় কঠোর শাস্তি নির্দ্ধারিত করিয়াছে। শাস্তি যেহেতু কঠিন তাই উহা প্রয়োগ করিতে দলীল প্রমাণও সর্ব্ব দিক হইতে সম্পূর্ণরূপে সন্দেহ মুক্ত হইতে হইবে। সেমতে শরীয়ত-বিশেষজ্ঞগণ বিধান রাখিয়াছেন যে, الحدود والقصاص تندرئ بالشبهات অর্থাৎ "হদ্দ" তথা শরীয়ত নির্দ্ধারিত অলঙ্ঘণীয় শাস্তি এবং "কেছাছ" তথা প্রাণের বিনিময়ে প্রাণদণ্ড বা অঙ্গহানীর বিনিময়ে অঙ্গহানী—এই শ্রেণীর শাস্তিসমূহ ঐ সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যে সব ক্ষেত্রে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ দেখা যায়।"

দশ দেরহাম মূল্যমানের বস্তু চুরির দরুণ হাত কাটা সম্পর্কে কোন হাদীছ দৃষ্টেই সন্দেহের অবকাশ নাই। কারণ, তিন দেরহাম সম্পর্কীয় হাদীছ মোতাবেকও দশ দেরহাম স্থলে হাত কাটা অবশ্যই প্রমাণিত হইবে, কিন্তু তিন দেরহাম মূল্য-মানের বস্তু চুরির দরুণ হাত কাটার ব্যাপারে দশ দেরহাম সম্পর্কীয় হাদীছ দৃষ্টে

সন্দেহের সম্মুখীন হইতে হয়। কারণ যদি ইহা শরীয়তের সর্ব্বশেষ সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে তবে তিন দেরহাম স্থলে হাত কাটা যাইতে পারে না, সুতরাং ইমাম আবু হানিফা (রঃ) মছআলাহ এরূপ বলিয়াছেন যে, দশ দেরহাম মূল্য-মানের বস্তু চুরি স্থলে হদ্দ্ তথা শরীয়ত নির্দ্ধারিত হাত কাটার শাস্তি প্রদান করা হইবে, আর তদপেক্ষা কম মূল্যমানের বস্তু চুরি স্থলে অন্য কোন প্রকার শাসনতান্ত্রিক শাস্তি প্রদান করা হইবে।

● চোরের জন্য হাত কর্ত্তন ইহজগতের শাস্তি; পরকালের আজাব হইতে মুক্তি ও নাজাৎ পাইতে হইলে তওবা করিতে হইবে।

ডাকাতি, লুণ্ঠন ও ছিনতাই-এর শাস্তি

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলিয়াছেন—

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ

فَسَادًا........وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ -

"যাহারা আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের (দেওয়া মানবীয় জান-মালের পিরাপত্তার বিধানের) বিরুদ্ধে অভিযানে লিপ্ত হয় এবং ডাকাতি ও রাহাজানি করিয়া ভূ-পৃষ্ঠে ফছাদ ও অশান্তি সৃষ্টি করে, তাহাদের সমোচিত শাস্তি ইহাই যে, তাহাদিগকে কতল করা হইবে (যদি তাহারা মাল লুণ্ঠনের সুযোগ না পাইয়া মানুষ খুন করিয়া থাকে।) বা শূলদণ্ড দেওয়া হইবে (যদি খুন ও লুণ্ঠন উভয়ই করিয়া থাকে।) বা এক দিকের হাত এবং অপর দিকের পা কাটিয়া দেওয়া হইবে (যদি খুন না করিয়া শুধু লুণ্ঠন করিয়া থাকে।) বা দেশ হইতে নির্বাসিত করা হইবে (যদি খুন বা লুণ্ঠন কোন কিছু করার পূর্ব্বেই ধরা পড়িয়া যায়।) এই শাস্তি তাহাদের জন্য শুধু দুনিয়ার লাঞ্ছনা, এতদ্ভিন্ন তাহাদের জন্য আখেরাতের ভীষণ আজাবও রহিয়াছে। (ছুরা মায়েদাহ্, ৯ রুকু)

● ডাকাতের শাস্তি যাহা উল্লেখ হইয়াছে উহার সহিত শাসনতান্ত্রিক উপ-কারিতার উদ্দেশ্যে অন্যান্য কঠোরতাও অবলম্বন করা যায়। রসুলুল্লাহ (দঃ) এইরূপ অপরাধী একটি বিশেষ দলকে ডাকাতির শাস্তি দান কালে তাহাদের অপরাধের বিভিন্ন দিক দৃষ্টে নানারকম কঠোরতা প্রয়োগ করিয়া ছিলেন। তৃতীয় খণ্ডের ১৫০৬ নং হাদীছের ঘটনা দ্রষ্টব্য।

জেনা ও ব্যাভিচার মহাপাপ

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"ব্যাভিচারের কাছেও যাইও না ; উহা বড়ই নির্লজ্জ কাজ এবং অতি জঘন্য পন্থা।"

বিবাহিত ব্যক্তি জেনা করিলে তাহার শাস্তি "রজম"— প্রস্তরাঘাতে প্রাণে বধ করা

২৫৫৬। হাদীছ ঃ—আলী (রাঃ) একজন নারীকে জুমার দিন জেনার অপরাধে "রজম" তথা প্রস্তরাঘাতে প্রাণদণ্ড দান করতঃ ঘোষণা করিয়া ছিলেন—আমি হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের তরিকা ও আদর্শ অনুযায়ী এই নারীকে প্রস্তরাঘাতে প্রাণদণ্ড দিলাম।

২৫৫৭। হাদীছ ঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তি হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া স্বীকারোক্তি করিল, সে জেনা করিয়াছে এবং এই স্বীকারোক্তি সে চার বার করিল। হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহাকে রজম করার আদেশ করিলেন। সেমতে তাহাকে প্রস্তরাঘাতে মারিয়া ফেলা হইল। লোকটি বিবাহিত ছিল। (১০০৭ পৃঃ)

২৫৫৮। হাদীছ ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা এক ব্যক্তি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইছে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইল, হযরত (দঃ) তখন মসজিদে ছিলেন। ঐ ব্যক্তি চিৎকার করিয়া বলিল, ইয়া রসুলুল্লাহ ! আমি জেনা করিয়া ফেলিয়াছি। হযরত (দঃ) তাহার দিক হইতে চেহারা ফিরাইয়া নিলেন। ঐ ব্যক্তি পুনঃ হযরতের বরাবর দিকে আসিয়া বলিল, আমি জেনা করিয়া ফেলিয়াছি। এইবারও হযরত (দঃ) ঐরূপই করিলেন, এমনকি ঐ ব্যক্তি হযরতেব সম্মুখে চার বার স্বীকারোক্তি করিল।

তাহার স্বীকারোক্তি যখন চার বার পুর্ণ হইয়া গেল, তখন হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, পাগলামী ও উম্মাদনার কোন রোগ তোমার মধ্যে আছে কি ? সে বলিল, না। তুমি কি বিবাহিত ? সে বলিল, হাঁ। তখন হযরত নবী (দঃ) উপস্থিত লোকজনকে আদেশ করিলেন, তাহাকে নিয়া যাও এবং "রজম" কর।

ছাহাবী জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাকে রজম করার মধ্যে আমিও শামিল ছিলাম। আমরা তাহাকে ঈদগাহের ময়দানে রজম করিয়া ছিলাম। যখন তাহার উপর প্রস্তরের আঘাত আরম্ভ হইল তখন সে দৌড়িতে লাগিল, আমরাও দৌড়াইয়া নিকটবর্ত্তী একটি প্রস্তরময় ময়দানে তাহাকে কাবু করিয়া ফেলিলাম এবং প্রস্তরের আঘাতে সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

হযরত নবী (দঃ) তাহার সম্পর্কে ভাল মন্তব্য করিলেন এবং তাহার জানাযাও তিনি পড়িলেন। (১০০৮পৃঃ)

২৫৫৯। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মায়েজ ইবনে মালেক (রাঃ) যখন হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট (জেনার স্বীকারোক্তি নিয়া) উপস্থিত হইল তখন হযরত (দঃ) (তাহার স্বীকারোক্তির যথার্থতা যাঁচাইয়ের উদ্দেশ্যে) তাহাকে বলিলেন, তুমি হয়ত শুধু চুম্বন করিয়াছ বা আলিঙ্গন করিয়াছ কিম্বা কাম ভাবের সহিত দৃষ্টি করিয়াছ? মায়েজ (রাঃ) ঐ শ্রেণীর প্রত্যেকটি বিষয়েই না ইয়া রসুলাল্লাহ! বলিয়া উক্তি করিল। হযরত (দঃ) তাহাকে স্পষ্ট শব্দে জেনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। মায়েজ (রাঃ) তাহা স্বীকার করিল। এইরূপ সুস্পষ্ট স্বীকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে হযরত (দঃ) তাহাকে রজম করার আদেশ প্রদান করিয়া ছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ—উল্লেখিত তিনটি হাদীছে বর্ণিত ঘটনা একটিই এবং এক ব্যক্তিরই—তাহারই নাম মায়েজ (রাঃ)। তিনি একজন ছাহাবী ছিলেন, তিনি হাজ্জাল নামক ছাহাবীর গৃহে আশ্রিত ছিলেন। উক্ত গৃহ-স্বামীর এক দাসীর উপর পাশবিক কার্য্যে একদা মায়েজ (রাঃ) লিপ্ত হইয়া পড়িয়া ছিলেন।

পাঠক পাঠিকা! জেনা একটি জঘন্য গোনাহ ও মহা পাপ, তাহা ছাহাবী মায়েজ (রাঃ) দ্বারা সংঘটিত হইয়া ছিল। তদ্রূপ অপর একজন গামেদ গোত্রীয় নারী ছাহাবীর দ্বারাও এই পাপ অনুষ্ঠিত হইয়া ছিল। তাঁহাদের দ্বারা এই পাপ কার্য্য হইয়া ছিল বটে, কিন্তু তাঁহারা এই পাপের প্রায়শ্চিত্তে যাহা করিয়া ছিলেন, উহার নজির ইতিহাসে বিরল এবং তাঁহাদের সেই প্রায়শ্চিত্ত এক মহান আদর্শরূপে হাদীছের কেতাব সমূহে কেয়ামত পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিবে। এতদ্ভিন্ন হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছোহবৎ বা সাহচর্য্য যে, মানব-অন্তরে খোদাভক্তি ও খোদাভীরুতা সৃষ্টি করার কিরূপ মহাশক্তিমান পরশপাথর ছিল তাহারও নমুনা উক্ত ছাহাবীদ্বয়ের প্রায়শ্চিত্তের ঘটণায় প্রকাশ পায়। ঘটনার বিবরণ ইমাম মালেকের মোয়াত্তা কেতাব এবং ছেহাহ্ ছেত্তার হাদীছ সমূহে এইরূপ বর্ণিত আছে—

মায়েজ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ঘটনা ঃ

মায়েজ (রাঃ) জেনা করিয়া ছিলেন, উহার কোন সাক্ষী ছিল না, কিন্তু এই পাপের ভয় তাঁহার অন্তরে এক অসহনীয় অগ্নিরূপ ধারণ করিল। তিনি আবু বকর রাজিয়াল্লাহ তায়ালা আনহুর নিকট আসিয়া বলিলেন, এই হতভাগা জেনা করিয়াছে। আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমি ব্যতিত অন্য কাহারও নিকট তুমি ইহা প্রকাশ করিয়াছ কি ? মায়েজ (রাঃ) বলিলেন, না। আবু বকর (রাঃ) বলিলেন তবে তুমি আল্লাহ তায়ালার নিকট তওবা কর এবং আল্লাহ তায়ালা ইহা গোপন থাকার যে সুযোগ তোমাকে দান করিয়াছেন তুমি সেই সুযোগ গ্রহণ করিয়া ইহা গোপনই রাখ ; নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা বন্দার তওবা কবুল করিয়া থাকেন।

এই কথায় মায়েজের অন্তরে শান্তি আসিল না ; তিনি ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট আসিলেন। তিনিও তাঁহাকে ঐরূপই বলিলেন, যেরূপ আবু বকর (রাঃ) বলিয়া ছিলেন ; এইবারও মায়েজের অন্তরে শান্তি আসিল না। অবশেষে তিনি পাগলপারা হইয়া তাঁহার গৃহ-স্বামীর পরামর্শে স্বয়ং হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, এই হতভাগা জেনা করিয়াছে ; يا رسول الله طهرني হে আল্লার রসুল আমাকে পাক পবিত্র করুন। يا رسول الله اني زنيت فاقم علي كتاب الله ইয়া রসুলাল্লাহ ! আমি জেনা করিয়াছি ; আমার উপর আল্লার কোরআনের হুকুম জারি করুন। يا رسول الله اني قد ظلمت نفسي وزنيت واني اريد ان تطهرني "ইয়া রসুলাল্লাহ ! আমি আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছি—আমি জেনা করিয়াছি। আমার আকাঙ্খা আপনি আমাকে পাক-পবিত্র করিবেন। এমনকি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসল্লামের হাতে হাত রাখিয়া বলিলেন, اقتلني بالحجارة —পাথর মারিয়া আমাকে প্রাণে বধ করিয়া ফেলুন।

হযরত (দঃ) তাঁহাকে বলিলেন, ويحك ارجع فاستغفر الله وتب اليه "ধিক্ তোমার প্রতি—চলিয়া যাও এবং আল্লার নিকট তওবা-এস্তেগফার কর। এই বলিয়া হযরত (দঃ) তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া নিলেন এবং তাঁহাকে তাড়াইয়া দিলেন। তারপর পূনরায় হযরতের নিকট আসিয়া ঐরূপই বলিলেন। এইবারও হযরত (দঃ) তাঁহাকে ঐরূপে তাড়াইয়া দিলেন। কিন্তু মায়েজ (রাঃ) তৃতীয় বার আবার হযরতের দরবারে আসিয়া ঐরূপ বলিলেন। এই বারও হযরত (দঃ) তাহাকে হাঁকাইয়া দিলেন। এমনকি কেহ তাঁহাকে এই বার সতর্কও করিয়া দিল যে, তুমি চতুর্থ বার স্বীকারোক্তি করিলে তোমাকে প্রস্তরাঘাতে প্রাণে বধ করিবেন। কিন্তু কোন ভয়-ভীতিই মায়েজ (রাঃ)কে নিবৃত্ত ও ক্ষান্ত করিতে পারিল না, তিনি চতুর্থ দিন আবার হযরতের দরবারে আসিয়া ঐরূপই বলিলেন।

এইবার হযরত (দঃ) তাহার দিকে লক্ষ্য দিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, فيما اطهرك—কি ব্যাপারে তোমাকে পাক করিব ? মায়েজ (রাঃ) স্পষ্ট ভাষায় বলিলেন, من الزنا "জেনার পাপ হইতে আমাকে পাক করিবেন। হযরত (দঃ) তাঁহাকে এই কথাও জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি উন্মাদ ? তিনি বলিলেন, না। হযরত (দঃ) যাঁচাই করিলেন, তিনি কোন নেশা পান করিয়াছেন কিনা, এমনকি এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া তাঁহার মুখ শোঁখিয়া দেখিল, তাহাতে কোন নেশা-বস্তুর দুর্গন্ধ পাওয়া গেল না। হযরত (দঃ) তাঁহার বাড়ীর লোকদের নিকট যাঁচাই করিলেন তিনি উন্মাদ কি না। সকলেই স্বাক্ষ দিল সে সম্পূর্ণ সুস্থ। হযরত (দঃ) ইহাও জ্ঞাত হইলেন যে, তিনি বিবাহিত। অতঃপর হযরত (দঃ) তাঁহার প্রতি "রজম" তথা প্রকাশ্যে প্রস্তরাঘাতে প্রাণে বধ করার আদেশ প্রদান করিলেন।

সেমতে তাঁহাকে ঈদগাহের খোলা ময়দানে নিয়া যাওয়া হইল এবং তাঁহার উপর প্রস্তর নিক্ষেপ আরম্ভ করা হইল। সর্ব্বপ্রথম আবু বকর (রাঃ) প্রস্তর নিক্ষেপ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিক হইতে প্রস্তর বর্ষিতে লাগিল। প্রস্তর নিক্ষেপকারীদের মধ্যে ওমর (রাঃ), জাবের (রাঃ) প্রমুখ বিশিষ্ট ছাহাবীগণ সকলেই উপস্থিত ছিলেন। প্রস্তরের আঘাতে মায়েজ (রাঃ) স্বাভাবিকরূপে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তিনি তাঁহার স্বীকৃতি প্রত্যাহার করার কোন উক্তি মুখে উচ্চারণ করেন নাই। অথচ তিনি তাঁহার স্বীকৃতি প্রত্যাহার করিলে শরীয়তের বিধান মতে তাঁহার প্রাণ-বধ কার্য্য স্থগিত হওয়া স্থিরকৃত ছিল এবং প্রস্তর বর্ষণে বিরত থাকিতে সকলেই বাধ্য হইত। মায়েজ (রাঃ) স্বীয় জানের প্রতি মোটেই ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল জেনার পাপ হইতে পবিত্রতা লাভ করা। সেই লক্ষ্য অর্জ্জনে তিনি তাঁহার প্রাণ বিসর্জনে কুণ্ঠা বোধ করিলেন না। ছুটাছুটির মধ্যেই একটি পাথর তাঁহার কর্ণমুলে আঘাত করিলে তিনি মাটিতে পড়িয়া গেলেন এবং নিকটবর্ত্তী একটি বৃক্ষের গোড়ায় ডান কাতে স্বীয় বাহুর উপর শুইয়া পড়িলেন। চতুর্দ্দিক হইতে প্রস্তর বর্ষিতে ছিল। হঠাৎ একটি উটের মাথার বিরাটকায় হাড় তাঁহাকে ভীষণভাবে আঘাত করিল, তাহাতেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। "রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ও আরজাহু—হে আল্লাহ! তুমি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হও এবং তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট কর।"

মায়েজ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর আত্মবিসর্জ্জনের পর তাঁহার সম্পর্কে লোকদের মুখে উভয় রকম মন্তব্যই আলোচিত হইল। এক দল বলিল, মহা পাপে পাপী হইয়া মারা গিয়াছে, অপর দল বলিল, মায়েজের তওবা অপেক্ষা উত্তম

তওবা আর হইতে পারে না। ঘটনার তিন দিন পর হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

استغفروا لماعز بن مالك . لقد تاب توبة لو قسمت على امة لوسعتهم

"তোমরা সকলে মায়েজের জন্য ক্ষমার দোয়া কর; সে এমন তওবা করিয়াছে যে, তাহার তওবা সমাজের সকল লোকদের উপর বণ্টণ করিয়া দিলে সকলের গোনাহ মাফের জন্য উহা যথেষ্ট হইবে।" হযরতের আদেশ মতে ছাহাবীগণ সমবেতভাবে তাঁহার জন্য মাগফেরাতের দোয়া করিলেন।

হযরত (দঃ) তাঁহার সম্পর্কে আরও বলিয়াছেন—قد غفرله وادخل الجنة "তাহার সমস্ত গোনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তাহাকে বেহেশতে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে।" فقد رأيته ينخضخض فى انهار الجنة "আমি তাহাকে বেহেশতের নহর সমূহে আনন্দে অবগাহণ করিতে দেখিয়াছি" لا تشتمه . لهو عند الله اطيب من ريح المسك "তাহাকে মন্দ বলিও না; সে আল্লাহ তায়ালার নিকট মেশ্‌ক বা কস্তুরীর সুগন্ধি অপেক্ষা অধিক প্রিয়।" لقد رأيته بين انهار الجنة ينغمس "আমি তাহাকে বেহেশতের নহরে আনন্দে ডুবাইতে দেখিয়াছি।"

গামেদ গোত্রীয় নারীর ঘটনা ঃ

নবম হিজরী সনের ঘটনা—এই নারীটিও মায়েজ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ন্যায় হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দরবারে পাগলপারা হইয়া উপস্থিত হইল এবং يا رسول الله انى قد زنيت فطهرنى ইয়া রসুলাল্লাহ; আমি জেনা করিয়াছি; আপনি আমাকে পাক পবিত্র করুন।" হযরত (দঃ) তাঁহার প্রতি তিরস্কার করিয়া বলিলেন, চলিয়া যাও এবং আল্লার নিকট তওবা-এস্তেগফার কর। তদুত্তরে মহিলাটি বলিল, মনে হয় আপনি আমাকে এড়াইতে চান যেরূপ মায়েজকেও প্রথমে এড়াইতে চাহিয়া ছিলেন। কিন্তু আমার ব্যাপার অতি জটিল; জেনার দ্বারা আমি গর্ভবতী হইয়াছি। তাহাকেও হযরত (দঃ) তিন বার ফিরাইয়া দেওয়ার পর যখন সে চতুর্থ বারও স্বীকারোক্তি করিল, তখন হযরত (দঃ) তাঁহাকে বলিলেন, গর্ভ অবস্থায় তোমার কিছু করা যাইবে না। তুমি চলিয়া যাও এবং ক্ষান্ত থাক যাবৎ না সন্তান প্রসব কর। দীর্ঘ দিন পর তাঁহার একটি ছেলে সন্তান প্রসব হইল। তিনি সন্তানটিকে নেকড়ায় জড়াইয়া হযরতের দরবারে উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, এই দেখুন—আমি সন্তান প্রসব করিয়া সারিয়াছি। হযরত (দঃ) বলিলেন, এখনও তুমি চলিয়া যাও এবং সন্তানকে দুগ্ধ পান করাও। দুগ্ধ পানের সময় কাল অতিক্রম হইলে পর শিশুর হাতে এক টুক্‌রা রুটি খাইতে

দিয়া তাহাকে নিয়া মহিলাটি হযরতের দরবারে উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, এই দেখুন! দুগ্ধ পান করাইয়া সারিয়াছি—শিশুটি এখন খাদ্য গ্রহণ করিতে সক্ষম। হযরত (দঃ) বলিলেন, এখন চলিয়া যাও এবং শিশুটিকে কাহারও আশ্রয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা কর। অতঃপর শিশুটিকে একজন মোসলমানের লালন-পালনে প্রদান করা হইল।

এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যেও মহিলাটি তাঁহার স্বীকারোক্তির পুনঃ বিবেচনা করার প্রতি মোটেই কোন লক্ষ্য করিলেন না। অথচ তিনি যদি এই দীর্ঘ কালের মধ্যে একবারও স্বীকৃতি প্রত্যাহার করিতেন, তবে তাহার উপর রজম তথা প্রাণে বধ করার আদেশ বলবৎ হইত না। কিন্তু তিনি তাঁহার স্বীকৃতির উপর অটল রহিলেন। সেমতে হযরত (দঃ) তাঁহার প্রতি রজম তথা প্রকাশ্যে প্রস্তরাঘাতে প্রাণে বধ করার আদেশ প্রদান করিলেন। তাঁহার জন্য বুক পর্য্যন্ত একটি গর্ত্ত করা হইল এবং তাঁহার শরীর কাপড়ে আবৃত করিয়া কাপড় গাঁথিয়া ঐ গর্ত্তে তাঁহার বুক পর্য্যন্ত পুতিয়া দেওয়া হইল। তখনও সময় ছিল যে, তিনি তাঁহার স্বীকৃতি প্রত্যাহার করেন। কিন্তু ঐ অবস্থায়ও তিনি তাহা করেন নাই। অবশেষে হযরত (দঃ) তাঁহার প্রতি প্রস্তর বর্ষণের নির্দ্দেশ দিলেন। উপস্থিত লোকজন তাহার প্রতি প্রস্তর বর্ষণ করিল, তিনি নির্ব্বাকে প্রস্তর আঘাতে মৃত্যু বরণ করিলেন।

তাহার প্রতি প্রস্তর বর্ষণকালে ছাহাবী খালেদ (রাঃ) তাঁহার মাথায় একটি পাথর মারিলে রক্তের ছিঁটা খালেদের গায়ে পড়িল এবং খালেদ (রাঃ) তাঁহাকে মন্দ বলিয়া উঠিলেন। হযরত (দঃ) খালেদের মন্দ বলা শুনিতে পাইয়া বলিলেন, মুখ সংযত রাখ! যাঁহার হাতে আমার জান তাঁহার কসম—মহিলাটি এমন তওবা করিয়াছে যে, যে কোন মহাপাপী ঐরূপ তওবা করিলে তাহার মাগ্‌ফেরাত হইয়া যাইবে।

মহিলাটির লাশ নিয়া আসা হইল এবং হযরত (দঃ) তাঁহার জানাযার নামায পড়াইলেন। ওমর (রাঃ) বলিলেন, হে আল্লার নবী! আপনি তাহার জানাযার নামায পড়িলেন, অথচ সে জেনা করিয়া ছিল? তদুত্তরে হযরত (দঃ) বলিলেন—

لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من اهل المدينة لو سعتهم
وهل وجدت توبة افضل من ان جادت بنفسها لله تعالى

"মহিলাটি যে তওবা করিয়াছে উহা যদি মদীনাবাসীদের উপর বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়, তাহাদের পাপীর সংখ্যা সত্তর হইলেও সকলের পাপ মোচনে উহা যথেষ্ট হইবে। এরচেয়ে অধিক তওবা আর কি হইতে পারে যে, সে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার মানসে নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া দিয়াছে।"

পাঠক পাঠিকা! উল্লেখিত ঘটনাদ্বয়ের মধ্যে একটি বিষয় বিশেষ লক্ষ্যণীয়। অনেক সময়ই মানুষ ভাবাবেগে প্রভাবান্বিত হয়, কিন্তু বিপদের সম্মুখে বা দীর্ঘ ব্যবধানে সেই ভাবাবেগ মুছিয়া যায়। মায়েজ (রাঃ) খোলা মাটে প্রস্তর-বাণে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন। পাপের ভয়ে তাঁহার অন্তরে অনুতাপের যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া ছিল সেই অগ্নি শিখা হাজার হাজার প্রস্তর বর্ষণেও মোটেই নির্ব্বাপিত হয় নাই, তাই স্বীকৃতি প্রত্যাহারের বিবেচনা তাহার অন্তরে স্থান পায় নাই।

গামেদ গোত্রীয় মহিলাটির ঘটনা ত আরও আশ্চার্য্যজনক; তাঁহার জেনার ঘটনা ও উহার স্বীকৃতির পর দীর্ঘ প্রায় চার বৎসর কাল অতিবাহিত হইল। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যেও তাঁহার অনুতাপের অগ্নি প্রশমিত হয় নাই। এমনকি অবশেষে তাঁহার শরীরে কাপড় গাঁথিয়া দেওয়া হইল, তাঁহার জন্য গর্ত্ত করা হইল, সেই গর্ত্তে তাঁহার বুক পর্য্যন্ত পোতা হইল—এই সব দৃশ্যও তাঁহার মনকে তাঁহার দীর্ঘকালের মনোবাঞ্ছা ও লক্ষ্যবস্তু হইতে তিল পরিমাণ বিচ্যুত করিতে পারে নাই। তাই স্বীকৃতি প্রত্যাহার করিয়া প্রাণ বাঁচাইবার শত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সে দিকে তিনি মোটেই ভ্রূক্ষেপ করেন নাই।

খোদার ভয়, পাপের ভয়, পাপের দরুণ অনুতাপ-অনুশোচনা এবং পাপ করিয়া উহার প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা খোদাকে রাজি করার দৃঢ় পণ কিরূপ হওয়া আবশ্যক তাহার শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য উক্ত ঘটনাদ্বয় অপেক্ষা উত্তম উদাহরণ আর কি হইতে পারে? ছাহাবীগণ যে সত্যের মাপকাঠি—সর্ব্বক্ষেত্রেই তাঁহারা আদর্শ ও সত্যের দিশারী উল্লেখিত ঘটনাদ্বয় তাহারই দৃষ্টান্ত। তাঁহাদের হইতে আদর্শ গ্রহণে শুধু তাঁহাদের পাপ দেখিলে চলিবে না। বরং পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাঁহারা কিরূপে করিয়াছেন—এই ক্ষেত্রে উহারই আদর্শ ও শিক্ষা গ্রহণ উদ্দেশ্য। এবং সেই উদ্দেশ্যে তাঁহারা এই সব পাপের ক্ষেত্রেও তাঁহারা নিশ্চয় সত্যের মাপকাঠি এবং অতি উত্তম আদর্শ।

মছআলাহ ঃ—জেনা সাক্ষী সূত্রে প্রমাণিত হওয়ার জন্য সাক্ষীর সাধারণ সংখ্যার নিয়মের ব্যতিক্রমে চার জন পুরুষ প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী আবশ্যক। তদ্রূপ স্বীকৃতি সূত্রে জেনা সাব্যস্তের জন্যও স্বীকারকারী চার বৈঠকে চার বার স্পষ্ট ভাষায় স্বীকারোক্তি করিবে—তবেই তাহা "হদ্দ্" তথা নির্দ্ধারিত শাস্তির জন্য গ্রহণীও হইবে।

মছআলাহ ঃ—শাসনকর্ত্তা বিচারক, জেনার স্বীকৃতি তিন বার (পর্য্যন্ত এড়াইবার চেষ্টা করিবে। এমনকি স্বীকারকারীকে "তাল্‌কীন" তথা তাহার স্বীকৃতিকে অন্য দিকে অন্য অর্থে নিবার জন্য প্ররোচিত করিবে।

মছআলাহ ঃ—চার বার স্বীকার করার পর শাস্তি আরম্ভের পূর্ব্বে বা শাস্তি ভোগের মধ্যে যদি একবারও স্বীকৃতি প্রত্যাহারের কথা বলে, তবে হদ্দ্ তথা

নির্দ্ধারিত শাস্তি মওকুফ হইয়া যাইবে। এমনকি যদি মুখে প্রত্যাহার না করিয়া শাস্তি হইতে পলায়ন করিতে চায় এবং সেই পলায়ন শুধু শাস্তির আঘাত জনিত স্বাভাবিক ছুটাছুটি না হয় বরং স্বীকৃতি এড়াইবার পলায়ন হয়, তবে তাহাকে পলায়ন করার সুযোগ নিশ্চয় দিতে হইবে। অবশ্য সাক্ষী সূত্রে প্রমাণিত জেনার শাস্তি হইতে কোন প্রকার পলায়নের সুযোগই দেওয়া হইবে না।

মছআলাহ :—হদ্দ্ প্রকাশ্যে খোলা ময়দানে সর্ব্ব সমক্ষে জারি করিতে হইবে। পুরুষকে রজম করার ক্ষেত্রে তাহাকে আবদ্ধ করার কোন ব্যবস্থা করিবে না। মহিলাকে রজম করার বেলায় তাহার গায়ে কাপড় জড়াইয়া গাঁথিয়া দিবে যেন বেপর্দ্দা না হইয়া পড়ে, এমনকি বুক পর্য্যন্ত মাটি গর্ত্তে পুতিয়া নেওয়া উত্তম।

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আমলে আরও দুইটি ঘটনায় রজম হইয়াছিল। একটি ঘটনার হাদীছ এস্থানেও ইমাম বোখারী (রঃ) উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু উহার তরজমা দ্বিতীয় খণ্ডে ১১২৬ নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে।

এক ব্যক্তির পুত্র কাহারও গৃহভৃত্য ছিল, সে গৃহস্বামীর স্ত্রীর সহিত জেনা করে। গ্রামের লোকজন তাহার উপর এক প্রকার কাফ্ফারা ধার্য্য করিয়া ঘটনার মীমাংসা করিয়া দেয়। অবশেষে সেই ঘটনা হযরতের দরবারে উপস্থিত হইলে, হযরত (দঃ) সেই কাফ্ফারার মীমাংসা নাকচ করিয়া কাফ্ফারার বস্তু ভৃত্যের পিতাকে ফেরৎ দেন এবং ঘোষণা করেন যে, আমি আল্লার কোরআন মোতাবেক এই ঘটনার ফয়ছালা করিব। অতঃপর হযরত (দঃ) ভৃত্যকে একশত বেত্র দণ্ড এবং এক বৎসর নির্ব্বাসনের শাস্তি প্রদান করেন, যেহেতু সে অবিবাহিত ছিল। আর গৃহস্বামীর স্ত্রীর নিকট তদন্তের জন্য লোক পাঠান হইলে, সে জেনার ঘটনা স্বীকার করিয়া নেয়। তাহার স্বীকৃতির উপর হযরত নবী (দঃ) তাহাকে রজম করার আদেশ প্রদান করেন। সেমতে তাহাকে রজম করা হয়।

আর একটি ঘটনা নিম্নে বর্ণিত হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে—

২৫৬০। হাদীছ :—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দরবারে এক দল ইহুদী তাহাদের একটি পুরুষ ও একটি নারীকে নিয়া উপস্থিত হইল; উক্ত পুরুষ ও নারীটি জেনা করিয়াছে। নবী (দঃ) তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা জেনাকারীদের প্রতি কিরূপ করিয়া থাক? তাহারা বলিল, আমাদের আলেমগণ মুখে কালি মাখাইয়া উভয়কে বিপরীত মুখীরূপে গাধার পিটে ছওয়ার করিয়া ঘুরাইবার শাস্তি আবিস্কার করিয়াছেন, সেমতে আমরা তাহাদের মুখে কালি মাখিয়া দেই এবং মারপিট করি। হযরত (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের কেতাব তৌরাতে রজমের বিধান পাও নাই কি? তাহারা বলিল, ঐরূপ কোন বিধান তৌরাতে আমরা পাই নাই।

ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) (যিনি পূর্ব্বে বিশিষ্ট ইহুদী আলেম ছিলেন, তিনি) বলিলেন, তোমরা মিথ্যাবাদী ; তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে তৌরাত নিয়া আস এবং উহা পড়িয়া দেখ। ইয়া রসুলাল্লাহ! তাহাদিগকে তৌরাত নিয়া আসিতে বলুন। সেমতে তৌরাত উপস্থিত করা হইল, কিন্তু তাহাদের একজন শিক্ষক তৌরাত শিক্ষা দিয়া থাকিত সে রজমের আদেশ সম্বলিত সুস্পষ্ট আয়াতখানাকে হাতের নীচে লুকাইয়া রাখিয়া শুধু উহার উপর-নীচের বিষয়গুলি পাঠ করিতে লাগিল—রজমের আয়াত পাঠ করিল না।

আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) ঐ পাঠককে বলিলেন, তোমার হাত উঠাও—এই বলিয়া তিনি তাহার হাত টানিয়া নিলেন এবং তাহার হাতের নীচে যে, রজমের আদেশ আয়াত ছিল তাহা দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কি ? তখন তাহারা স্বীকার করিল, হাঁ—ইহা রজমের আদেশ সম্বলিত আয়াত। সেমতে হযরত (দঃ) সেই জেনাকার পুরুষ ও নারীকে রজম করার আদেশ প্রদান করিলেন। মসজিদের নিকটবর্ত্তী স্থানেই তাহাদের উভয়কে একত্রে রজম করা হইল। ঘটনা বর্ণনাকারী ছাহাবী বলেন, রজম করার সময় আমি দেখিয়াছি, পুরুষটি নারীটিকে স্বীয় দেহ দ্বারা ঢাকিয়া প্রস্তরাঘাত হইতে রক্ষা করার চেষ্টা করিতে ছিল। (১০০৭ পৃঃ)

২৫৬১। হাদীছঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, বৈধ সম্পর্কের ক্ষেত্রেই বংশ ও ঔরস্য সাব্যস্ত হইতে পারে ; ব্যভিচারের দ্বারা তাহা হইবে না। ব্যভিচারীর ভাগ্যে ত প্রস্তরাঘাত রহিয়াছে।

২৫৬২। হাদীছঃ—ছোলায়মান শায়বানী (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কি রজম জারী করিয়াছেন ? তিনি বলিলেন, হাঁ। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হযরত কর্ত্তৃক রজম জারী করা ছুরা-নূর নাযেল হওয়ার পূর্ব্বে না পরে ? সে সম্পর্কে তিনি বলিলেন, এই বিষয়টি আমি তলাইয়া দেখি নাই। (১০০৬ পৃঃ)

ব্যাখ্যাঃ— এস্থলে ছুরা-নূর সম্পর্কীয় প্রশ্নটি তাৎপর্য্যপূর্ণ। কেননা ছুরা-নূরের মধ্যে জেনার শাস্তি একশত বেত্রদণ্ড উল্লেখ রহিয়াছে। তাই প্রশ্নকারী জানিতে চাহিয়াছেন যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্ত্তৃক রজম জারী করা ছুরা-নূর নাজেল হওয়ার পরে কি না। নতুবা বলা যাইতে পারে যে, রজমের আদেশ ছুরা নূরের আয়াত দ্বারা মনছুখ ও রহিত হইয়া গিয়াছে।

ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাঃ) উক্ত বিষয়টির প্রতি পূর্ব্বে কখনও লক্ষ্য করেন নাই। তাই তিনি সরলতার সহিত বলিয়া দিয়াছেন, আমি উহা

তলাইয়া দেখি নাই। নতুবা প্রশ্নটির উত্তর অতি সুস্পষ্ট যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্ত্তৃক রজম জারী করা ছুরা-নূর নাযেল হওয়ার পরেই ছিল—তাহাতে দ্বিধা বোধের কোন অবকাশই নাই। কারণ ইহা অবধারিত যে ছুরা-নূর ষষ্ঠ হিজরী সন বা তাহারও পূর্ব্বে নাযেল হইয়া ছিল; এদিকে ২৫৫৮নং হাদীছ দৃষ্টে দেখা যায়, মায়েজের ঘটনা আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহুর উপস্থিতিতে ঘটিয়া ছিল। আবু হোরায়রা (রাঃ) সপ্তম হিজরী সনে মদীনায় আসিয়া ছিলেন। এতদ্ভিন্ন গামেদ গোত্রিয় নারীর প্রতি হযরত (দঃ) রজমের আদেশ প্রদান করিয়া ছিলেন যাহা নবম হিজরীর ঘটনা।
(আওয়াজুল-মছালেক ৬—১৩)

ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেলাফত কালেও একজন মহিলা জেনার স্বীকারোক্তি করিয়া ছিল। সে তাহার স্বীকৃতির উপর অটল থাকিলে, খলীফা ওমর (রাঃ) তাহাকে রজম করার আদেশ দিয়া ছিলেন এবং রজম করা হইয়াছিল।

ছুরা-নূরে একশত বেত্রদণ্ডের আয়াত যখন নাযেল হইয়া ছিল, তখনও হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) উহার ঘোষণা দানের সময় এক শত বেত্রদণ্ড অবিবাহিতের জন্য এবং বিবাহিতের জন্য রজম উভয়ের ঘোষণা প্রদান করিয়া ছিলেন। যাহার বিবরণ এই যে, ছুরা-নূরে জেনার হদ্দ্ তথা নির্দ্ধারিত শাস্তির বিধান নাযেল হওয়ার পূর্ব্বে ছুরা-নেছার মধ্যে মোসলমানদের স্ত্রীগণের বিভিন্নমুখী মছআলাহ বর্ণনার মধ্যে কাহারও স্ত্রী জেনা করিলে কি করিতে হইবে সে সম্পর্কে একটি আয়াত নাযেল হয়—

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

"তোমাদের স্ত্রীগণের মধ্যে যাহারা ব্যাভিচারে লিপ্ত হইবে, তাহাদের ব্যাভিচার চার জন পুরুষ সাক্ষীর দ্বারা প্রমাণিত কর। সাক্ষীগণ সাক্ষ্য প্রদান করিলে পর ঐ নারীদেরকে গৃহে অন্তরীণ করিয়া দাও—তাহারা অন্তরীণাবস্থায়ই কাল কাটাইবে যাবৎ না তাহাদের মৃত্যু আসিয়া যায় বা আল্লাহ তায়ালা তাহাদের জন্য অন্য কোন বিধান করিয়া দেন।"

মোসলেম শরীফে একখানা হাদীছ বর্ণিত আছে যে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উপর যখন ওহী নাযেল হইত, তখন তাঁহার উপর শ্রান্তি

ভাব পরিলক্ষিত হইত এবং চেহারা মোবারক ক্লান্তরূপ ধারণ করিত। একদা তাঁহার উপর ওহী নাযেল হইল এবং ঐ অবস্থার আবির্ভাব হইল। অতঃপর যখন ঐ অবস্থা দুরীভুত হইয়া গেল তখন তিনি বলিতে লাগিলেন—

خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ

مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

"আমার নিকট হইতে শিখিয়া নেও, আমার নিকট হইতে শিখিয়া নেও—আল্লাহ তায়ালা ব্যাভিচারিনী নারীদের জন্য বিধান করিয়া দিয়াছেন। অবিবাহিত লোকের জন্য একশত বেত্রদণ্ড এবং এক বৎসরের নির্ব্বাসন, আর বিবাহিত লোকের জন্য একশত বেত্রদণ্ড এবং রজম।"

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উক্ত ঘোষণাকে ছুরা-নূরের আয়াত নাযেল হওয়া উপলক্ষেই সাব্যস্ত করিয়াছেন।
(তফছীর ইবনে কাছীর ১—৪৬২)

সুতরাং ছুরা-নূরের মধ্যে যদিও শুধু বেত্রদণ্ডের উল্লেখ দেখা যায়, কিন্তু উহার সঙ্গে সঙ্গেই বিবাহিতের জন্য রজমের বিধান হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হওয়াও অতি সুস্পষ্ট। এই সূত্রেই সমস্ত ছাহাবীগণ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল মোসলমানের এজমা ও এক মতের সিদ্ধান্ত এইযে, ছুরা-নূরে উল্লেখিত একশত বেত্রদণ্ড শুধু কেবল অবিবাহিতের জন্য, আর বিবাহিতের জন্য রজম।

এতদ্ভিন্ন খলীফাতুল-মোছলেমীন ওমর রাজিয়াল্লাহ তায়ালা আনহু একটি বিশেষ ঘোষণার মাধ্যমে সর্ব্ব সমক্ষে অতিশয় দৃঢ়তার সহিত উক্তি করিয়াছিলেন যে, ছুরা-নূরের বর্ত্তমান বেত্রদণ্ড বিধানের আয়াতের সঙ্গে রজম-বিধানের আয়াতও ছিল যাহা আমরা তেলাওয়াত করিয়া থাকিতাম। পরবর্ত্তীকালে হযরতের মাধ্যমেই আল্লাহ তায়ালা কর্ত্তৃক উহার তেলাওয়াত বা পঠন রহিত হইয়াছে। কিন্তু উহার হুকুম বলবৎ রহিয়াছে বিধায় রসুলের মাধ্যমে তাহা জারী রাখা হইয়াছে। নিম্ন বর্ণিত হাদীছদ্বয়ে এই তথ্যটিই বয়ান করা হইয়াছে।

২৫৬৩। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা খলীফাতুল মোসলেমীন ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমার ভয় হয় জমানা বা কালের বিবর্ত্তনে এমন লোকের আবির্ভাব হইবে, যাহারা বলিবে—কোরআন শরীফে রজমের বিধান আমরা পাই না। ফলে তাহারা আল্লাহ কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত একটি ফরজ বিধান যাহা আল্লাহ তায়ালা (কোরআন শরীফে) নাযেল করিয়া ছিলেন, তাহা তরক করিয়া গোমরাহ হইয়া যাইবে।

খবরদার—হুশিয়ার ! তোমরা স্মরণ রাখিও, নিশ্চয় রজমের বিধান ইসলামের মধ্যে একটি সত্য বাস্তব ও স্থায়ী বিধান—ঐ ব্যক্তির পক্ষে যে বিবাহিত হইয়া জেনা করে এবং তাহা সঠিক প্রমাণের দ্বারা বা গর্ভ (ইত্যাদির দরুণ স্বীকৃতির) দ্বারা প্রমাণিত হয়। (১০০৮ পৃঃ)

২৫৬৪। হাদীছঃ— আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খলীফাতুল মোছলেমীন ওমর (রাঃ) তাঁহার জীবনের সর্ব্ব শেষ যে হজ্জ করিয়াছিলেন, সেই হজ্জের সময় আমিও তাঁহার সহগামীদের একজন ছিলাম। জিলহজ্জ মাসের শেষের দিকে আমরা মদীনায় ফিরিয়া আসিলাম। অতঃপর প্রথম জুমার দিন আমি জুমার আউয়াল ওয়াক্তেই মসজিদে উপস্থিত হইলাম। আজ ওমর (রাঃ) এমন এক ভাষণ দান করিলেন যাহা তিনি খলীফা হওয়া অবধি আর কখনও দেন নাই। (হজ্জ সমাপন কালে মিনার মধ্যে স্বয়ং ওমর (রাঃ) মদীনায় পৌঁছিয়া এইরূপ ভাষণ দানের কথা ঘোষণা করিয়া ছিলেন।)

ওমর (রাঃ) মসজিদে আসিয়া মিম্বারে উপবেশন করিলেন। মোয়াজ্জেনের আজান শেষ হইলে পর ওমর (রাঃ) দাঁড়াইলেন। এবং আল্লার ছানা-ছিফত করতঃ বলিলেন, আমি তোমাদের জন্য একটি ভাষণ দিব। যাহার তৌফিক আল্লাহ তায়ালা আমাকে দান কারিয়াছেন। আমি জানি না—হইতে পারে ইহা আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত-সন্নিকটবর্ত্তী ভাষণ। যে ব্যক্তিই ইহা সঠিকরূপে উপলব্ধি ও সংরক্ষণ করিতে পারিবে সে-ই যেন ইহাকে তাহার সাধ্যানুযায়ী অন্যের নিকট পৌঁছাইতে সচেষ্ট হয়। পক্ষান্তরে যাহার আশঙ্কা হয় যে, সে ইহাকে ভালরূপে উপলব্ধি করিতে পারে নাই তাহার জন্য আমি অনুমতি দেই না—সে মিছামিছি কোন কথা আমার পক্ষ হইতে বয়ান করে। (এই বলিয়া ওমর (রাঃ) এক সুদীর্ঘ ভাষণ দিলেন—

إِنَّ اللّٰهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَاَنْزَلَ عَلَيْهِ
الْكِتَابَ فَكَانَ فِيمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اٰيَةُ الرَّجْمِ فَقَرَأْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا
وَوَعَيْنَاهَا رَجَمَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَاَخْشٰى
اِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ اَنْ يَّقُولَ قَائِلٌ وَاللّٰهِ مَا نَجِدُ اٰيَةَ الرَّجْمِ
فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ اَنْزَلَهَا اللّٰهُ وَالرَّجْمُ فِىْ كِتَابِ
اللّٰهِ حَقٌّ عَلٰى مَنْ زَنٰى اِذَا اُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ......

"আল্লাহ তায়ালা মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে সত্য ও খাঁটি দ্বীনের বাহক করিয়া পাঠাইয়া ছিলেন। তাঁহার উপর কোরআন নাযেল করিয়া ছিলেন। আল্লাহ যে কোরআন নাযেল করিয়া ছিলেন, উহারই মধ্যে রজমের বিধান সম্বলিত আয়াতও ছিল—আমরা উহা তেলাওয়াত করিয়াছি, উহার মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়াছি, উহা কণ্ঠস্থ করিয়াছি। রসুলুল্লাহ (দঃ) রজম জারী করিয়াছেন, তাঁহার পরে আমরাও রজম জারী করিয়াছি।

আমার আশঙ্কা হয় যমানার দীর্ঘ ব্যবধানে, এমন এমন লোকের আবির্ভাব হইবে যাহারা বলিবে, কোরআনের মধ্যে আমরা রজমের আয়াত পাই না। ফলে তাহারা আল্লার নাযেল কৃত একটি ফরজ তরক করিয়া গোমরাহ ও ভ্রষ্ট হইবে। অথচ রজম আল্লার কোরআনেরই বর্ণিত ও চলমান জিনিষ ঐ ব্যক্তির জন্য যে বিবাহিত হইয়া জেনা করে, চাই পুরুষ হউক বা নারী হউক—যখন উহা সঠিক সাক্ষে প্রমাণিত হয় বা গর্ভ ইত্যাদির দরূণ স্বীকারোক্তি করে।"

অতঃপর ওমর (রাঃ) আরও একটি বিষয়ের আয়াত পাঠ করিয়া শুনাইলেন, যাহা পবিত্র কোরআনে নাযেল হইয়া ছিল এবং উহার মর্ম্ম-বিধান বলবৎ রহিয়াছে। কিন্তু ঐ আয়াতের তেলাওয়াত বা পঠন রহিত হইয়া গিয়াছে। তারপর খলীফা নির্ব্বাচন সম্পর্কীয় বিষয়ে কতিপয় সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া ভাষণ শেষ করিলেন। (১০০৯ পৃঃ)

জিলহজ্জ মাসের শেষ ভাগে মদীনায় আসিয়া ওমর (রাঃ) এই ভাষণ দিলেন এবং ঐ মাস শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই তাঁহার শহীদ হওয়ার ঘটনা ঘটিয়া গেল।

ব্যাখ্যা ঃ—উল্লেখিত হাদীছদ্বয়ে রজমের বিধান সম্পর্কে যে আয়াতটির ইঙ্গিত রহিয়াছে, ইমাম মালেকের "মোয়াত্তা" কেতাবে আয়াতটি পূর্ণাঙ্গে বর্ণিত আছে। ঐ কেতাবের বিবরণ এই—

খলীফা ওমর (রাঃ) হজ্জ সমাপনান্তে মিনা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে আব্‌তাহ্‌ বা মোহাচ্ছাব ময়দানে অবস্থানরতঃ সময় উর্দ্ধমুখী শয়ন অবস্থায় উভয় হাত আকাশের দিকে উত্তোলন করতঃ কাতর ও করুণ স্বঃরে বলিলেন—

اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني
اليك غير مضيع ولا مفرط

"আয় আল্লাহ ! আমি বয়োবৃদ্ধি হইয়া গিয়াছি ; আমার শক্তি সামর্থ ক্ষীণ হইয়াছে, আমার পরিচালনাধীন লোক সংখ্যা সুদুর বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে ! এমতাবস্থায় আমাকে ত্রুটি বিচ্যুতির পূর্ব্বে তোমার নিকট উঠাইয়া নেওয়ার আরজ করিতেছি।"

সেই হজ্জ হইতে মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ওমর (রাঃ) লোকদের মধ্যে এক ভাষণ দান করিলেন। তিনি বলিলেন—হে সুধীগণ! শরীয়তের আদর্শগুলি এবং ফরজগুলি তোমাদের সম্মুখে স্পষ্টরূপে বর্ণিত রহিয়াছে। তোমাদিগকে স্বচ্ছ পথের উপর দাঁড় করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু যদি তোমরাই পথচ্যুত হইয়া পড়—জন সাধারাণকে সেই পথ হইতে বিচ্যুত করিয়া এদিক-ওদিক বিভ্রান্ত করিয়া নিয়া চল।

অতঃপর তিনি বলিলেন, খবরদার হুশিয়ার! রজমের আয়াত সম্পর্কে বিভ্রান্তি হইতে তোমরা সতর্ক থাকিও। কোন ব্যক্তি যেন এরূপ না বলে যে, আমরা ত আল্লার কোরআনে জেনার দুই প্রকার শাস্তি উল্লেখ পাই না— (শুধু বেত্র-দণ্ডই উল্লেখ পাই—রজম উল্লেখ পাই না।) নিশ্চয় রসুলুল্লাহ (দঃ) রজম জারী করিয়াছেন এবং আমরাও তাঁহার পরে রজম জারি করিরাছি। আমার জানের মালিক খোদার কসম—যদি লোকদের এই অপবাদের আশঙ্কা না হইত যে, ওমর কোরআন শরীফ লেখার মধ্যে অতিরিক্ত লিখিয়াছে + তবে আমি নিশ্চয় রজমের এই আয়াত লিখিয়া দিতাম—

اَلشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ اِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا اَلْبَتَّةَ

ইমাম মালেক (রঃ) সঙ্গে সঙ্গে উল্লেখ করিয়া দিয়াছেন, اَلشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ অর্থ বিবাহিত পুরুষ এবং বিবাহিতা নারী। অর্থাৎ "বিবাহিত পুরুষ এবং বিবাহিতা নারী জেনা করিলে তাহাদিগকে অবশ্যই রজম কর।"

জেল্‌হজ্জ মাসে ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর উক্ত দোয়া ও ভাষণ এবং সেই জেল্‌হজ্জ মাস শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই তাঁহার শাহাদতের ঘটনা ঘটিয়া গেল।

+ আলোচ্য আয়াতটির তেলাওয়াত বা পঠন রহিত হইয়া যাওয়ায় উহা সাধারণ-ভাবে কোরআন শরীফের মধ্যে লিপিবদ্ধ হইতে পারে না, উহা নামাযের মধ্যে পাঠ করা জায়েয হইবে না ইত্যাদি। কিন্তু কালক্রমে উহা লোকদের লক্ষ্য হইতে ছিন্ন হইয়া যাইবে, তাই ওমর (রাঃ) ভিন্নরূপে হইলেও কোরআনের সঙ্গে উহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখার পক্ষপাতি ছিলেন। কিন্তু হয়ত অজ্ঞ লোকগণ ইহাকে একটি অপবাদের ভিত্তি বানাইবে, অথচ ইহা কোন অবশ্য করণীয় কাজ নহে, তাই তিনি ঐরূপে লিপিবদ্ধ করা হইতে বিরত রহিয়া ছিলেন।

অবিবাহিত লোক জেনা করিলে তাহার শাস্তি এক শত বেত্রদণ্ড

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলিয়াছেন—

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ - وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ - وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ -

„জেনাকারীণী নারী এবং জেনাকার পুরুষ তাহাদের প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত কর। আল্লার দ্বীনের এই বিধান প্রয়োগ করিতে তোমাদের অন্তরে তাহাদের প্রতি কোনরূপ মায়া-মমতা আসা চাই না যদি তোমরা আল্লার প্রতি এবং পরকালের প্রতি ঈমান আনিয়া থাক। আর তাহাদের এই শাস্তি মোসলমানদের এক বিরাট জন-সমাবেশ সমক্ষে হওয়া চাই (১৮ পারা ছুরা নূর)।" পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, এই শাস্তি অবিবাহিতদের জন্য।

২৫৬৫। হাদীছ ঃ—যায়েদ ইবনে খালেদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নিজ কানে হযরতের মুখে শুনিয়াছি—তিনি অবিবাহিত জেনাকারীর প্রতি এক শত বেত্রদণ্ড এবং এক বৎসর নির্ব্বাসনের আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

২৫৬৬। হাদীছ ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম অবিবাহিত জেনাকারীর জন্য নির্দ্ধারিত বেত্রদণ্ডের সঙ্গে এক বৎসর নির্ব্বাসনের ফয়সলা করিয়াছেন।

ক্রীতদাসী জেনা করিলে

২৫৬৭। হাদীছ ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন ক্রীতদাসী যদি জেনা করে এবং তাহা প্রমাণিত হয় তবে তাহাকে বেত্রদণ্ড প্রদান কর অতঃপর তাহাকে আর লাঞ্ছিত করিও না। দ্বিতীয় বার আবার জেনা করিলে আবার তাহাকে বেত্রদণ্ড প্রদান কর, লাঞ্ছনা করিও না। তৃতীয় বার জেনা করিলে আবার তাহাকে বেত্রদণ্ড প্রদান কর এবং তাহাকে মেষ লোমের রজ্জু তথা সামান্য বস্তুর বিনিময়ে হইলেও বিক্রি করিয়া ফেল; (যাহাতে সে তাহার বন্ধুদের হইতে ছিন্ন হইয়া যায়।)

ব্যাখ্যা ঃ— ক্রীতদাস-দাসীর জন্য জেনার শাস্তি শুধু এক প্রকারই তথা বেত্রদণ্ড এবং তাহাও অর্দ্ধেক তথা পঞ্চাশ বেত্রাঘাত; ইহা কোরআনেরই নির্দ্দেশ— ছুরা-নেছা পঞ্চম পারা দ্রষ্টব্য।

কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর সহিত কাহাকেও লিপ্ত পাইয়া তাহাকে খুন করিয়া ফেলিলে

২৫৬৮। হাদীছ ঃ—মুগিরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা সায়াদ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ) উক্তি করিলেন, আমি আমার স্ত্রীর সহিত কোন পুরুষকে দেখিতে পাইলে সেই ব্যক্তিকে তৎক্ষণাৎ তরবারীর ধারাল দিক দিয়া কোপ মারিব। তাহার এই উক্তি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের গোচরে পৌছিলে হযরত (দঃ) বলিলেন, তোমরা হয় ত সায়াদের গায়রত—আত্মাভিমান জনিত ঘৃণা দেখিয়া আশ্চার্য্যন্বিত হইবা, কিন্তু আমার গায়রত (তথা খারাব নির্লজ্জ কাজের প্রতি ঘৃণা) আরও বেশী। এবং ঐরূপ কাজের প্রতি আল্লাহ তায়ালার গায়রত ও ঘৃণা আমার অপেক্ষা অনেক বেশী; তজ্জন্যই আল্লাহ তায়ালা গোপন ও প্রকাশ্য সকল প্রকার ফাহেসা—নির্লজ্জ কাজ-কর্ম্মকে হারাম করিয়া দিয়াছেন।

হযরত (দঃ) আরও বলিলেন, ওজর-আপত্তির অবকাশ খণ্ডন সর্ব্বাপেক্ষা আল্লাহ তায়ালার নিকটই অধিক প্রিয়; তজ্জন্যই আল্লাহ তায়ালা সতর্ককারী ও সুসংবাদ-দানকারী রসুলগণকে পাঠাইয়াছেন। প্রসংশাও সর্ব্বাপেক্ষা আল্লাহ তায়ালার নিকটই অধিক প্রিয়, তাই উহার জন্য আল্লাহ তায়ালা বেহেশতের ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা ঃ— আলোচ্য হাদীছে বিভিন্ন বিষয় বর্ণিত হইয়াছে; ভুমিকায় ছাহাবী সায়াদের যে উক্তি উল্লেখ হইয়াছে যে তিনি স্বীয় স্ত্রীর সহিত প্রাপ্ত লিপ্ত ব্যক্তিকে কোন প্রকার মামলা-মোকাদ্দমা ব্যতিরেকেই স্বয়ং তরবারীর আঘাতে খুন করিয়া ফেলিবেন—এই উক্তি হযরতের গোচরিভুত হইলে পর হযরত (দঃ) উহার প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন নাই, বরং সমর্থনের ইঙ্গিতই পাওয়া যায়, এতদুদ্দেশ্যেই ইমাম বোখারী (রঃ) আলোচ্য পরিচ্ছেদে এই হাদীছ খানা উল্লেখ করিয়াছেন।

ইমাম বোখারী (রঃ) আলোচ্য মছআলার মিমাংসা দিতে বিরত রহিয়াছেন, কারণ মূল মছআলার মধ্যে বিভিন্ন ইমামগণের মতবিরোধ রহিয়াছে। অধিকন্তু এ-সম্পর্কে বিভিন্ন খুটিনাটি বিষয়েও ফেকাহ শাস্ত্রবিদগণের বিভিন্ন মতামত রহিয়াছে।

অধিকাংশ ইমামগণের মোটামুটি অভিমত এই যে, কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর সহিত কোন পুরুষকে জেনা বা উহার ঘনিষ্ট কার্য্য-কলাপে লিপ্ত দেখিতে পাইলে সে ঐ পুরুষকে খুন করিয়া ফেলিতে পারে এবং স্ত্রীকে ঐ কার্য্যে সম্মত পাইলে তাহাকেও খুন করিতে পারে—এইরূপ খুন করা জায়েয; তজ্জন্য তাহার কোন

গোনাহ হইবে না। কিন্তু প্রশাসনিক আইনের বিচার হইতে মুক্তি পাওয়ার ব্যবস্থা তাহাকেই করিতে হইবে। শাসন পরিচালনকারীদের নিকট ধরা পড়িলে সাক্ষী প্রমাণ দ্বারা তাহাকে সাব্যস্ত করিতে হইবে যে বাস্তবিকই সে তাহাদিগকে ঐরূপ লিপ্ততার অবস্থায় খুন করিয়াছে। যদিও প্রকৃত প্রস্তাবে তাহার দাবী সত্য হয়, কিন্তু সাক্ষী প্রমাণও পেশ করিতে না পারিলে তাহার গোনাহ হইবে না বটে, কিন্তু অপরাধি প্রমাণিত হয় নাই এরূপ ব্যাক্তিকে খুন করার আইনগত ধারা মতে উহার শাস্তি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবে। অবশ্য খুন কৃত ব্যক্তি যদি এমন শ্রেণীর লোক হয় যে ফাহেসা কাজে পরিচিত বা খুনকারী ব্যক্তির দাবীর যথার্ততার আকার-ইঙ্গিত পাওয়া যায় তবে খুনের এক নম্বর শাস্তি প্রাণদণ্ডের পরিবর্তে দুই নম্বর শাস্তি দিয়্যাত তথা নির্দ্ধারিত আর্থিক প্রাণ-বিনিময় আদায়ে বাধ্য করা হইবে।

প্রকাশ থাকে যে, জেনা বা উহার ঘনিষ্ঠ কার্য্য কলাপে লিপ্ত রহিয়াছে—একমাত্র ঠিক ঐ অবস্থায় থাকা পর্য্যন্তই তাহাকে খুন করার অনুমতি রহিয়াছে। পক্ষান্তরে অপরাধী অপরাধ করিয়া সরিয়া পড়িলে অতঃপর তাহাকে খুন করা জায়েয হইবে না। তাহার বিরুদ্ধে একমাত্র আইনগত ব্যবস্থা অবলম্বনের পথই গ্রহণ করিতে পারে—যাহার জন্য সাক্ষী প্রমানের প্রয়োজন রহিয়াছে, অবশ্য স্ত্রীর বিরুদ্ধে সাক্ষী না থাকিলেও লেয়ানের ব্যবস্থা আছে।

সাধারণ শাস্তি বা দণ্ডাদেশ

২৫৬৯। হাদীছ :—আবু বোরদাহ্ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়া থাকিতেন—আল্লাহ তায়ালার কোন হদ্দ্ তথা শরীয়ত কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত শাস্তির কোন ধারা ব্যাতিরেকে সাধারণ ক্ষেত্রে দশ সংখ্যার অধিক বেত্রাঘাত করিবে না।

ব্যাখ্যা :—উল্লেখিত নিষেধাজ্ঞা নির্দ্ধারিত বিধান নহে, বরং ইহা শুধু সাধারণ ক্ষেত্রসমুহে ক্রোধের উচ্ছাস সংযত রাখার ব্যবস্থারূপে বলা হইয়াছে। শরীয়ত-নির্দ্ধারিত শাস্তির ক্ষেত্র ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে শয়রীয়তী বিচারের বিজ্ঞ বিচারক অপরাধ ও অপরাধীর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যে শাস্তি সমুচিত গণ্য করিবেন সেই শাস্তিই তিনি দিতে পারিবেন।

এক হাদীছে আছে—এক মোসলমান অপর মোসলমানকে "ইহুদী" বলিয়া গালি দিলে উহার বিচারে গালিদাতাকে বিশ বেত্রদণ্ড দিবে। এবং কোন ব্যক্তি তাহার মহরম আত্মীয়ার সহিত জেনা করিলে তাহাকে প্রাণদণ্ড দিবে। (মেশকাত শঃ ৩১৭)

আরও এক হাদীছে আছে, এক ব্যক্তি তাহার সৎমাকে বিবাহ করিয়া ছিল। নবী (দঃ) তাহার ধন-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার এবং তাহার মুণ্ড কাটিয়া নিয়া আসিবার জন্য একজন ছাহাবীকে পতাকা হাতে দিয়া পাঠাইয়া ছিলেন। (ঐ ২৭৪)

● কোন ব্যক্তি শরীয়ত নির্দ্ধারিত শাস্তির অপরাধ করে বলিয়া তাহার অবস্থা দৃষ্টে ধারণা হয়। কিন্তু নিয়মিত সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না; সেইরূপ ক্ষেত্রে নির্দ্ধারিত শাস্তিত প্রয়োগ করা যাইবে না। অবশ্য অনির্দ্ধারিত সমুচিত শাস্তি প্রদান করা হইবে।

"হদ্দে-কজফ" তথা কাহারও প্রতি জেনার তোহমত লাগাইয়াছে তদ্দরুণ শাস্তি

শাস্তির এই বিধানটিও পবিত্র কোরআনে বর্ণিত রহিয়াছে—

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ

ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ـ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ـ

"যাহারা জেনার তোহমত লাগায় সতী নারীদের প্রতি, অতঃপর চার জন সাক্ষী উপস্থিত করিতে সক্ষম না হয় তাহাদিগকে আশি ঘা বেত্রদণ্ড প্রদান কর এবং কখনও আর কোন ক্ষেত্রে তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিও না; এই লোকগণ ফাছেক পরিগণিত।" (১৮ পারা ছুরা নূর)

অপর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ لُعِنُوْا فِى الدُّنْيَا

وَالْاٰخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ........

"নিশ্চয় যাহারা সাদাসিধা ঈমানদার সতী নারীদের উপর জেনার তোহমত লাগায় তাহাদের প্রতি আল্লার অভিসাপ ছুনিয়াতেও এবং আখেরাতেও। আর তাহাদের জন্য নির্দ্ধারিত রহিয়াছে ভয়ানক আজাব যাহা ঐ দিন বলবৎ হইবে যে দিন তাহাদের বিরুদ্ধে তাহাদের জবান, তাহাদের হাত-পা তাহাদের কৃত কর্ম্মের সাক্ষ্য প্রদান করিবে। ঐ দিন তাহাদিগকে তাহাদের ভোগণীয় প্রতিফল আল্লাহ তায়ালা পুরাপুরিরূপে প্রদান করিবেন।"

ব্যাখ্যা :—আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে নারীদের উল্লেখ রহিরাছে, বস্তুতঃ কোন পুরুষের প্রতি জেনার তোহমত লাগাইলে উহার বিধানও ইহাই। কিন্তু এই

আয়াতসমূহ এবং এই বিধানটি নাযেল হওয়ার যে উপলক্ষ্য ছিল তাহা ছিল আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার ঘটনা—যাহার বিস্তারিত বিবরণ বিবি আয়েশার আলোচনায় বর্ণিত হইয়াছে। সেই সূত্রেই সমুদয় বিবরণে প্রকাশ্যে নারীদের উল্লেখ রহিয়াছে, কিন্তু বিধান নারী-পুরুষ সকলের পক্ষেই সমান।

আয়াতের মধ্যে সতী নারী বলিতে ঐ শ্রেণীর নারী উদ্দেশ্য যাহার সম্পর্কে শরীয়তের বিধান মোতাবেক সাক্ষী প্রমাণ দ্বারা জেনা প্রমাণিত হয় নাই এবং জেনার সুস্পষ্ট নিদর্শন—পিতাহীন সন্তান বহনকারীণীও সে নহে। এই শ্রেণীর যে কোন নারীকে তোহমত লাগাইলে তথায় আলোচ্য বিধান কার্য্যকরী হইবে।

প্রাণে বধ করা বা অঙ্গহানী করার শাস্তি

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا......

"যে ব্যক্তি কোন মোমেনকে ইচ্ছাকৃত খুন করিবে তাহার প্রতিফল হইবে জাহান্নাম; সেই জাহান্নামে তাহাকে বহুকাল থাকিতে হইবে। আর তাহার উপর আল্লার গজব ও অভিশাপ। এবং আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য ভীষণ আজাব প্রস্তুত রাখিয়াছেন।"

২৫৭০। হাদীছ ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, প্রত্যেক মোমেন মোসলমান ব্যক্তি দ্বীন ইসলামের প্রদত্ত্ব নিরাপত্তা পূর্ণ মাত্রায় ভোগ করিয়া যাইবে যাবৎ না সে কোন অন্যায় খুন করে।

২৫৭১। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, যে সব অপরাধে জড়িত হইলে পর রেহায়ী পাইবার কোন উপায় থাকে না অন্যায়রূপে খুন করা উহার অন্যতম একটি।

২৫৭২। হাদীছ — عن عبد الله رضى الله تعالى عنه

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِى الدِّمَاءِ

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিন লোকদের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম অন্যায় খুনের বিচার করা হইবে।

২৫৭৩। হাদীছ ঃ—মেক্দাদ (রাঃ) যিনি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে বদরের জেহাদে উপস্থিত ছিলেন—তিনি একদা জিজ্ঞাসা করিলেন,

ইয়া রসুলাল্লাহ! কোন কাফেরের সঙ্গে আমার লড়াই বাঁধিল; আমরা উভয়ে তরবারীর লড়াই আরম্ভ করিলাম। ঐ কাফের ব্যক্তি তাহার তরবারীর আঘাতে আমার একটি বাহু কাটিয়া ফেলিল, অতঃপর সে আমার হইতে বাঁচিবার জন্য একটি বৃক্ষের আশ্রয় নিয়া বলিয়া উঠিল, আমি আল্লার দ্বীন ইসলাম গ্রহণ করিলাম। তাহার এই উক্তির পর আমি তাহাকে তরবারীর আঘাত করিতে পারি কি? হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, না—এখন তুমি তাহাকে কতল করিতে পার না।

ছাহাবী পুনরায় বলিল, ইয়া রসুলাল্লাহ! সে আমার একটি বাহু কাটিয়া ফেলিয়াছে; তারপর ঐ উক্তি করিয়াছে—এমতাবস্থায়ও কি আমি তাহাকে কতল করিতে পারি না? হযরত (দঃ) বলিলেন, না—তাহাকে কতল করিতে পার না। যদি তুমি তাহাকে খুন কর তবে সে ঐ উক্তি করার পূর্ব্বে যেরূপ প্রাণদণ্ডের অপরাধী ছিল (বিদ্রোহী কাফের হওয়ার কারণে;) তদ্রূপ তুমি এখন প্রাণদণ্ডের অপরাধী হইয়া যাইবা (নাজায়েজ খুনের কারণে)।

২৫৭৪। হাদীছ ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, অন্যায় হত্যার যত ঘটনা ঘটিবে প্রত্যেক ঘটনার জন্য হযরত আদম আলাইহেচ্ছালামের পুত্র হাবীলের উপর গোনাহের এক বোঝা পতিত হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ—ভাল বা মন্দ কাজের বুনিয়াদ ও ভিত্তি যাহার দ্বারা স্থাপিত হইবে যত দিন ঐ কাজের ছেল্‌ছেলা জারি থাকিবে উহার ছওয়াব বা গোনাহের এক অংশ সেই ভিত্তি স্থাপনকারীর পক্ষেও বর্ত্তিবে, ইহা স্পষ্ট হাদীছ দ্বারা প্রমাণীত। অন্যায় ভাবে হত্যা করা ইহজগতে সর্ব্বপ্রথম কাবীল দ্বারা সংঘাটিত হইয়াছিল—সে তাহার অবৈধ স্বার্থোদ্ধারের জন্য স্বীয় ভ্রাতা হাবীলকে হত্যা করিয়া ছিল যাহার ঘটনা পবিত্র কোরআনে বর্ণিত রহিয়াছে। (৬ পারা ৮ রুকু)

সুতরাং কেয়ামত পর্য্যন্ত অন্যায় হত্যার যে ছেল্‌ছেলা জারি থাকিবে উহার প্রত্যেকটির গোনাহের এক বোঝা কাবীলের উপর বর্ত্তিবে।

২৫৭৫। হাদীছ ঃ— عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে মোসলমান অপর মোসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে সে মোসলমান জমাতে শামিল নহে।

ইচ্ছাকৃত অন্যায় হত্যার শাস্তি প্রাণদণ্ড

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলিয়াছেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ...

"হে মোমেনগণ ! তোমাদের উপর ফরজরূপে প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে নর-হত্যার ব্যাপারে "কেছাছ" তথা খুনের বদলে খুন করার বিধান। সেমতে (ছোট-বড়, ইতর-ভদ্র ইত্যাদি ব্যাপারে কোন প্রকার পার্থক্য না করিয়া) আজাদ মুক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করা হইলে (সর্ব্বাবস্থায়) হত্যাকারী আজাদ মুক্ত ব্যক্তিকেই হত্যা করা হইবে এবং ক্রীতদাসকে হত্যা করা হইলে (সর্ব্বাবস্থায়) হত্যাকারী ক্রীতদাসকেই হত্যা করা হইবে, কোন নারীকে হত্যা করা হইলে (সর্ব্বাবস্থায়) হত্যাকারিণী নারীকেই হত্যা করা হইবে।"

ব্যাখ্যা :—অন্ধকার যুগে খুনের বদলে খুন করা হইত, কিন্তু তাহাদের মধ্যে ইতর-ভদ্রের পার্থক্য করা হইত। উচ্চ বংশের কোন আজাদ মুক্ত ব্যক্তি নিচ বংশের কোন আজাদ মুক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করিলে সেস্থলে হত্যাকারী উচ্চ বংশীয় আজাদ মুক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করা হইত না, বরং তাহার পক্ষ্য হইতে প্রদত্ব একজন ক্রীতদাসকে হত্যা করা হইত। আবার নিচ বংশের কোন ক্রীতদাস উচ্চ বংশের ক্রীতদাসকে হত্যা করিলে সেস্থলে হত্যাকারী ক্রীতদাসের গোত্র হইতে একজন আজাদ মুক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করা হইত। নিচ বংশের কোন নারী উচ্চ বংশের নারীকে হত্যা করিলে উচ্চ বংশের নারীর প্রতিশোধে নিচ বংশের একজন পুরুষকে হত্যা করা হইত। এইরূপ ব্যবধানের দ্বারা তাহারা গোত্রীয় উচ্চ-নিচতার বৈষম্য প্রকাশ করিয়া থাকিত। কিন্তু অপরাধের বিচার ও ইনসাফে বৈষম্যের ভেদাভেদ ন্যায়ের পরিপন্থি ; সুতরাং উক্ত নীতির উচ্ছেদ করতঃ ইসলামের বিধান আল্লার তরফ হইতে অবতীর্ণ হইল যে, হত্যাকৃত ব্যক্তি নিচ বংশের হইলেও হত্যাকারী উচ্চ বংশীয় আজাদ মুক্ত ব্যক্তিকেই হত্যা করা হইবে, আর হত্যাকৃত ব্যক্তি উচ্চ বংশীয় ক্রীতদাস বা নারী হইলেও সেস্থলে হত্যাকারী ক্রীতদাস ও নারীকেই হত্যা করা হইবে ; উচ্চ-নিচতার ভেদাভেদে কোন প্রকার ব্যতিক্রম করা চলিবে না।

মছআলাহ :—হত্যা বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। ধারাল অস্ত্র বা তদ্রূপ অন্য কিছু (যেমন, ধারাল বা চোখা বাঁশ ইত্যাদি যে কোন বস্তু, আগ্নেয়াস্ত্র কিম্বা আগুণ) দ্বারা ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য ও ইচ্ছা করিয়া আঘাত করিয়াছে এবং সেই আঘাতে তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে এরূপ হত্যার ক্ষেত্রে "কেছাছ" তথা খুনের বদলে খুনের বিধান প্রবর্ত্তিত হইবে। উল্লেখিত অস্ত্র ও বস্তু ভিন্ন অন্য কোন বস্তু যাহার আঘাতে সাধারণতঃ মৃত্যু ঘটিয়া থাকে যেমন বড় লাটি, বড় পাথর ইত্যাদি দ্বারা

হত্যা করিলে বা অন্য কোন মারণ উপায়ে হত্যা করিলে—যেমন, পানিতে ডুবাইয়া, গলা টিপিয়া, দীর্ঘ দিন পানাহার বন্ধ রাখিয়া বা উর্দ্ধ হইতে ফেলিয়া দিয়া—যে অবস্থায় সাধারণতঃ মানুষ বাঁচেনা ঐরূপ যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করতঃ হত্যা করিলে সেস্থলে শুধু মাত্র ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ব্যতিত সকল ইমামগণ, এমনকি ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাইহের প্রধান দুই শাগের্দ ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) এবং ইমাম মোহাম্মদ (রঃ)ও কেছাছ প্রয়োগের আদেশ করিয়াছেন। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এস্থলে কাফ্ফারা ও কঠোর দিয়তের বিধান প্রয়োগ করিয়াছেন। বিস্তারিত বিবরণ ফেকাহ শাস্ত্রে রহিয়াছে।

ছোট লাঠি, ছোট পাথর ইত্যাদি যাহার আঘাতে সাধারণতঃ মৃত্যু ঘটেনা ঐরূপ বস্তুর দ্বারা ইচ্ছাকৃত আঘাত করায় মৃত্যু ঘটিলেও হানাফী মজহাব ও শাফী মজহাব মতে তথায় কেছাছ প্রবর্ত্তিত হইবে না। কাফ্ফারা ও দিয়ত দিতে হইবে, অবশ্য যদি ঐরূপ আঘাত এত অধিক হয় যাহাতে সাধারণতঃ মৃত্যু ঘটিতে পারে তবে শাফী মজহাব মতে কেছাছ হইবে। ইমাম মালেকের মতে ছোট-বড় লাঠি বা পাথর ইত্যাদির আঘাত বা যে কোন উপায়ে ইচ্ছাকৃত হত্যা সংঘটিত হইলেই সেস্থলে কেছাছ প্রবর্ত্তিত হইবে।

প্রকাশ থাকে যে, কেছাছ প্রয়োগের ব্যাপারে ইমামগণ বিভিন্ন মারণ উপায়ের যে তারতম্য করিয়াছেন তাহা শুধু ইহজগতে শাসনতান্ত্রিক পর্য্যায়ের। পরকালীন গোনাহের ক্ষেত্রে সকল ইমামগণ একমত যে, যদি হত্যার ইচ্ছায় আঘাত না করিয়া থাকে, বরং শুধু প্রহারের ইচ্ছায় আঘাত করিয়া ছিল এবং এরূপ বস্তুর দ্বারা এই পর্য্যায়ের আঘাত করিয়া ছিল যাহাতে সাধারণতঃ মৃত্যু ঘটেনা তবে ত শুধু প্রহার করার গোনাহ হইবে, হত্যা করার গোনাহ হইবে না। পক্ষান্তরে যদি হত্যা করার ইচ্ছায়ই আঘাত করিয়া ছিল এবং তাহাতে হত্যা সংঘটিত হইয়াছে তবে ছোট লাঠি ছোট পাথর ইত্যাদি যে কোন বস্তুর আঘাতে বা যে কোন উপায়ে হউক, এমনকি বিধানগত দৃষ্টিতে তথায় কেছাছ প্রবর্ত্তিত না হইলেও আল্লাহ তায়ালার নিকট ইচ্ছাকৃত হত্যার গোনাহ অবশ্যই হইবে।

(ফত্ওয়া শামী ৫—৪৬৮)

ইচ্ছাকৃত হত্যার গোনাহ আল্লাহ পবিত্র কোরআনে এইরূপ ঘোষনা করিয়াছেন—

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا ـ

"যে ব্যক্তি কোন মোসলমানকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করিবে তাহার প্রতিফল হইবে জাহান্নাম—সে ব্যক্তি জাহান্নামে এত দীর্ঘকাল থাকিবে যে তাহা যেন চিরকাল এবং তাহার উপর আল্লার গজব ও অভিসাপ। তাহার জন্য আল্লাহ তায়ালা অতি বড় আজাব প্রস্তুত রাখিয়াছেন।" (৪ পাঃ ১০ রুঃ)

মছআলাহ ঃ— আজাদ ব্যক্তিকে ক্রীতদাস হত্যা করিলে বা ক্রীতদাসকে আজাদ ব্যক্তি হত্যা করিলে বা নারীকে পুরুষ হত্যা করিলে, পুরুষকে নারী হত্যা করিলে, পুরুষকে পুরুষ হত্যা করিলে—এ সব ক্ষেত্রেও অবশ্যই কেছাছের বিধান প্রযোয্য হইবে।

মছআলাহ ঃ— মৃতের ওলীগণ হত্যাকারীকে ক্ষমা করিয়া দিলে বা অর্থ বিনিময়ের উপর মীমাংসা করিয়া নিলে কেছাছ রহিত হইয়া যাইবে। এমনকি কতিপয় ওলীগণের একজনও যদি ক্ষমা করিয়া দেয় বা অর্থ বিনিময় গ্রহণ করে তবুও কেছাছ রহিত হইয়া যাইবে এবং অপর ওলীগণ নির্দ্ধারিত অর্থ দণ্ডের অংশ পাইবে।

২৫৭৬। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন মোসলমান ব্যক্তি যে "লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু-মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ" স্বীকারোক্তি করে ঐরূপ ব্যক্তির প্রাণ নাশ কোন ক্রমেই বৈধ ও হালাল হইতে পারে না তিনটি কারণের কোন একটি ব্যতিরেকে। (১) খুনের বদলা খুন (২) বিবাহিত হইয়া জেনা করা (৩) দ্বীন ইসলাম পরিত্যাগ করতঃ মোসলমান সম্প্রদায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়া।

২৫৭৭। হাদীছ ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বনী-ইস্রাঈলদের শরীয়তে কেছাছ গ্রহণ বাধ্যতামুলক ছিল। এই উম্মতের জন্য আল্লাহ তায়ালা অন্য সুযোগও দিয়াছেন যে, হত্যাকৃত ব্যক্তির ওলী কেছাছ ক্ষমা করতঃ অর্থ বিনিময় গ্রহণ করিতে পারে—فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ আয়াতে এই সুযোগকেই বর্ণনা করা হইয়াছে। সেই অর্থ বিনিময় উসুল করিতে ভদ্রোচিত উপায় অবলম্বন করা চাই এবং উহা আদায় করিতেও ভাল পন্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

২৫৭৮। হাদীছ ঃ— عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه *

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللّٰهِ ثَلٰثَةٌ مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهْرِيقَ دَمَهُ

অর্থ— আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তিন শ্রেণীর মানুষ আল্লাহ তায়ালার নিকট অতিশয় ঘৃনিত—(১) পবিত্র মক্কা নগরীর হরম শরীফে নাফরমানীকারী। (২) অন্ধকার যুগের কোন প্রথা মোসলমানদের মধ্যে চালু করার প্রচেষ্টাকারী। (৩) অন্যায় ভাবে কাহাকেও হত্যা করার সুযোগ সন্ধানী।

২৫৭৯। হাদীছ :— عن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنه

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الاشراك بالله وعقوق

الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس

অর্থ— আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কবীরা তথা বড় গোনাহ সমূহের মধ্যে অন্যতম এইগুলি। (১) আল্লার শরীক সাব্যস্ত করা (২) মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া (৩) মানুষ হত্যা করা (৪) কসম করিয়া মিথ্যা কথা বলা।

মছআলাহ :— হত্যা-অপরাধ সাক্ষ্যের মাধ্যমে প্রমাণিত হইতে হইলে দুই সাক্ষী যথেষ্ট এবং স্বীকৃতির মাধ্যমে প্রমাণিত হইতে হইলে শুধু এক বার স্বীকারোক্তি যথেষ্ট হইবে।

মছআলাহ :— পুরুষ কর্ত্তৃক নারীকে হত্যা করা হইলে কেছাছ সূত্রে পুরুষকে প্রাণদণ্ড দান করা হইবে। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্ত্তৃক ঐরূপ এক ঘটনায় পুরুষকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হইয়াছিল।

মছআলাহ :—যদিও অপরাধ পূর্ণরূপে প্রমাণিত থাকে তবুও আইনগত বিচার ব্যতিরেকে নিজেই কেছাছ প্রয়োগ করা যাইবে না।

ইচ্ছা বিহীন হত্যার শাস্তি

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলিয়াছেন—

وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ـ ومن قتل مؤمنا خطأ...

"কোন মোসলমানের এই কাজ হইতে পারে না যে, সে কোন মোসলমানকে হত্যা করে—একমাত্র অনিচ্ছাকৃত হত্যা ব্যতিরেকে। যে ব্যক্তি ইচ্ছা বিহীনরূপে কোন মোসলমানকে হত্যা করিবে তাহার শাস্তি এই যে, সে (কাফ্‌ফারা আদায় করিবে তথা) একটি ঈমানদার ক্রীতদাস বা দাসী আজাদ করিবে এবং হত্যাকৃত ব্যক্তির ওয়ারেছগণকে দিয়ত প্রদান করিবে; অবশ্য যদি তাহারা তাহা মাফ করিয়া

দেয়। কিন্তু যদি হত্যাকৃত ব্যক্তি মোমেন হইয়া কাফের শত্রু-দেশের অধিবাসী হয় তবে শুধু (কাফ্‌ফারা তথা) মোমেন ক্রীতদাস বা দাসী আজাদ করিতে হইবে। আর যদি ঐরূপ হত্যাকৃত ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্রের অমোসলেম অনুগত নাগরিক কিম্বা মিত্র বা নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত শ্রেণীর হয় তবে তাহার উত্তরাধিকারীগণকে দিয়ত আদায় করিবে এবং (কাফ্‌ফারা তথা) একটি ঈমানদার ক্রীতদাস বা দাসী আজাদ করিবে। যদি (কাফ্‌ফারা প্রদানের জন্য) ক্রীতদাস-দাসী সংগ্রহ করা না যায় তবে (হত্যাকারী দিয়ত আদায় করার সাথে কাফ্‌ফারার জন্য ক্রীতদাস-দাসী আজাদ করার পরিবর্ত্তে) ধারাবাহিকরূপে দুই মাস রোজা রাখিবে; আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে তওবা স্বরূপ এই (কাফ্‌ফারার) বিধান দেওয়া হইয়াছে। আল্লাহ তায়ালা সর্ব্বজ্ঞ ও হেকমতওয়ালা। (৪ পাঃ ১০ রুঃ)

ভিড়ের চাপে বা অজ্ঞাত ঘাতক কর্ত্তৃক কোন লোক নিহত হইলে

যে কোন পরিস্থিতিতে এক বা একাধিক নির্দ্দিষ্ট লোকের দ্বারা কাহারও প্রাণ নাশ হইলে সেস্থলে উহার সমুদয় জিম্মাদারী ও প্রতিকার ঐ লোকের উপরই প্রবর্ত্তিত হইবে এবং বিভিন্ন ধারা ও উপধারার দৃষ্টিতে উহার বিচার বিবেচনা করা হইবে। আর যদি হত্যাকারীর নির্দ্ধারণ বা সন্ধান পাওয়া না যায় তবে সে স্থলেও ইসলামী রাষ্ট্রে নিরাপত্তার অধিকারী একজন লোকের প্রাণ-বিনাশ বিফল ও প্রতিক্রিয়াহীন যাইতে দেওয়া হয় না এবং উহা সম্পর্কে বিভিন্ন ধারা উপধারা রহিয়াছে। ঐরূপ একটি বিষয়ই ইমাম বোখারী (রঃ) আলোচ্য পরিচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছেন।

কোন একটি লোক ভিড়ের চাপে নিহত হইয়াছে, কিন্তু কাহার চাপে নিহত হইল সঠিকরূপে ঐরূপ ব্যক্তিদের নির্দ্ধারণ সম্ভব হয় নাই কিম্বা একটি লোক ঘাতকের দ্বারা নিহত হইয়াছে, কিন্তু ঘাতককে নির্দ্ধারিত করা সম্ভব হয় নাই। এরূপ ক্ষেত্রে দেখিতে হইবে, সেই হত্যা কিরূপ স্থান বা এলাকায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে। যদি কোন গ্রাম, বস্তি ও মহল্লার, বিশেষ পথে, ঘাটে, মাঠে, মসজিদে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে তবে ঐ বস্তি, গ্রাম ও মহল্লাবাসীগণকে 'দিয়ত" তথা এই হত্যার বিনিময় আদায়ে বাধ্য করা হইবে। তদ্রূপ যদি ব্যক্তিগত মালিকানা সত্ত্বের হাট-বাজারে অনুষ্ঠিত হয় তবে তাহার দিয়ত মালিকদের হইতে আদায় করা হইবে। আর ঐরূপ মালিকানা সত্ত্ব বিহীন হাট-বাজার বা বড় সড়ক ও রাস্তা যাহাতে বিভিন্ন গ্রাম ও মহল্লার লোক সমভাবে চলাচল করিয়া থাকে বা আ'ম জামে

মসজিদ যেখানে বিভিন্ন এলাকার লোক নামাযে আসিয়া থাকে এবং তাহা কোন আবাসিক এলাকা ও মহল্লা সংলগ্নও নহে—এইরূপ স্থানে যদি ঐরূপ হত্যা অনুষ্ঠিত হয় তবে উহার দিয়ত বাইতুল-মাল তথা সরকারী ধন-ভাণ্ডার হইতে আদায় করা হইবে। (ফত্ওয়া শামী ৫—৫৫৬)

এইরূপ অজ্ঞাত হত্যা ক্ষেত্রে লাশ প্রাপ্তির স্থান ও এলাকার বিভিন্নতা দৃষ্টে মছআলার বহু রকম শাখা প্রশাখা রহিয়াছে—যাহা ফেকার কেতাব সমূহে বিস্তারিতরূপে বর্ণিত আছে।

অঙ্গহানীর বিভিন্ন মছআলাহ

মছআলাহ ঃ—এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে কামড় দিয়াছে, আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তি কামড় ছাড়াইবার চেষ্টা করিয়াছে তাহাতে কামড় দাতার দাঁত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে সেস্থলে দাঁত ভাঙ্গার বিনিময় দিতে হইবে না।

মছআলাহ ঃ— দাঁতের অনিষ্ট সাধনের শাস্তি সম্পর্কীয় মছআলার শাখা প্রশাখাও অনেক বেশী। এ সম্পর্কে মুল ধারা পবিত্র কোরআনেই বিঘোষিত রহিয়াছে—والسن بالسن "দাঁতের বিনিময়ে দাঁত" অর্থাৎ এক ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত আঘাতে অপর ব্যক্তির দাঁত উচ্ছিন্ন করিয়াছে এস্থলে কেছাছ গ্রহণ করা হইবে তথা আঘাতকারীর ঐ শ্রেণীর দাঁত উচ্ছিন্ন করা হইবে।

অবশ্য ফেকাহ শাস্ত্রবীদগণের এতটুকু মতভেদ বর্ণিত আছে যে, কাহারও মতে উক্ত আঘাতকারীর দাঁতকে সমুলে উচ্ছিন্ন করা হইবে এবং কাহারও মতে উক্ত ব্যবস্থা আশঙ্কাজনিত হওয়ায় রেতি দ্বারা ঘষিয়া তাহার দাঁত মাংস পর্য্যন্ত নিঃশেষ করিয়া দেওয়া হইবে। আর যদি আঘাতের দরুণ দাঁত উচ্ছিন্ন না হইয়া ভাঙ্গিয়া গিয়া থাকে তবে সকলেই একমত যে, মুল দাঁতের ভাঙ্গা অংশের পরিমাণে আঘাতকারীর দাঁত ঘষিয়া দেওয়া হইবে। ইহাও উল্লেখ আছে যে, যদি কম বয়সের ব্যক্তির দাঁত উচ্ছিন্ন করা হইয়া থাকে তবে পুনঃ দাঁত গজাইবার অপেক্ষা করা হইবে। যদি তাহার দাঁত পুনঃ গজাইয়া উঠে তবে আঘাতকারী হইতে কেছাছ গ্রহণ করা হইবে না, শুধু বিচারকের বিবেচনা পরিমাণ আঘাতের বিনিময় ও চিকিৎসার ব্যয় আদায় করিতে হইবে।

আর যদি ইচ্ছা বিহীন আঘাতে দাঁত উচ্ছিন্ন হইয়া যায় কিম্বা ইচ্ছাকৃত আঘাতেই দাঁত উচ্ছিন্ন না হইয়া কার্য্য অনপোযুগী হইয়া রহিয়াছে বা ঐ দাঁত ভাঙ্গিয়া কিম্বা কাল হইয়া মুখের শ্রী নষ্ট হইয়া গিয়াছে তবে সে ক্ষেত্রে কেছাছ হইবে না, দিয়ত আদায় করিতে হইবে। দিয়ত তথা ক্ষতিপুরণ প্রতি দাঁতের জন্য পাঁচটি উট বা ১৩২। তোলা তথা /॥৵১ এক সের দশ ছটাক সোয়া তোলা রৌপ্য

কিম্বা উহার মূল্য বা ১৮৮ তোলা স্বর্ণ কিম্বা উহার মূল্য। দিয়তের পরিমাণে ছোট বড় দাঁতের কোন তারতম্য নাই; অবশ্য নারীদের দাঁতের দিয়ত উক্ত পরিমাণের অর্দ্ধ হইবে।

আর ইচ্ছা বিহীন আঘাতে যদি দাঁত কিছু অংশ ভাঙ্গা যায় যাহাতে উহা কার্য্য অনপোযুগী হয় নাই এবং মুখের শ্রীও নষ্ট হয় নাই তবে উহার ক্ষতিপূরণ বিচারকের বিবেচনা অনুযায়ী হইবে।

মছআলাহ ঃ—আঙ্গুল কর্ত্তন বা বিনষ্ট করার শাস্তিরও বিভিন্ন ধারা উপধারা রহিয়াছে। কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত আঘাত করিয়া অপর ব্যক্তির আঙ্গুল সম্পূর্ণ বা আংশিক কাটিয়া ফেলিয়াছে—যদি আঙ্গুলের কোন জোড়স্থলে কাটিয়া থাকে তবে আঘাতকারী হইতে কেছাছ গ্রহণ করা হইবে তথা তাহার ঐ আঙ্গুল ঐ জোড় হইতে কাটিয়া ফেলিতে হইবে। আর যদি ইচ্ছা বিহীন আঘাতে আঙ্গুল কাটিয়া যায় কিম্বা যে কোন প্রকার—ইচ্ছাকৃত বা ইচ্ছা বিহীন আঘাতে যদি আঙ্গুল ছিন্ন না হইয়া পঙ্গু তথা কার্য্য অনপোযোগী হইয়া যায় তবে প্রতিটি আঙ্গুলের দিয়ত তথা ক্ষতিপুরণ দশটি উট বা ২৬২॥ তোলা তথা /৩।২॥ তিন সের এক পোয়া আড়াই তোলা রৌপ্য কিম্বা উহার মূল্য বা ৩৭॥ তোলা স্বর্ণ কিম্বা উহার মূল্য আদায় করিতে হইবে। নারীদের আঙ্গুলের দিয়ত উহার অর্দ্ধ, অবশ্য হাতের আঙ্গুল ও পায়ের আঙ্গুল এবং বড় আঙ্গুল ও ছোট আঙ্গুলের কোন তারতম্য নাই—সকলের দিয়তই সমান।

২৫৮০। হাদীছ ঃ— عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء يعنى الخنصر والابهام

অর্থ— ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কনিষ্ঠাঙ্গুলি ও বৃদ্ধাঙ্গুলির প্রতি ইশারা করিয়া বলিয়াছেন, উভয়টি সমান।

অর্থাৎ উভয়টি পরস্পর এবং অন্যান্য আঙ্গুলের ন্যায় দিয়তের পরিমাণে সমান সমান বিবেচিত হইবে; যদিও আঙ্গুলের মধ্যে ছোট-বড়, মোটা-চিকন রহিয়াছে।

মছআলাহ ঃ—পূর্ণ আঙ্গুলের দিয়ত ক্ষেত্রে ছোট-বড় প্রত্যেকটি আঙ্গুলই সমান বিবেচিত হইবে, কিন্তু যদি কোন আঙ্গুলের একটি গিরা কাটে তবে দুই গিরার আঙ্গুল হইলে—যেমন বৃদ্ধাঙ্গুল, প্রতি গিরায় পূর্ণ আঙ্গুলের দিয়তের অর্দ্ধাংশ এবং তিন গিরার আঙ্গুল হইলে প্রতি গিরায় দিয়তের তৃতীয়াংশ দিতে হইবে।

কতিপয় লোক কর্তৃক এক জন নিহত বা আহত হইলে

২৫৮১। হাদীছ ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একটি বালক কতিপয় ব্যক্তি কর্তৃক গোপনে নিহত হইয়াছিল। তদুপলক্ষে ওমর (রাঃ) বলিয়াছিলেন, সানা শহরবাসী সকলে যদি এই হত্যায় শামিল হইত তবে আমি তাহাদের সকলকেই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতাম।

ব্যাখ্যা ঃ— মুল ঘটনার প্রতি ইমাম বোখারী (রঃ)ও সংক্ষেপে ইঙ্গিত করিয়াছেন। বিস্তারিত বিবরণ এই যে, ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেলাফৎ কালে ইয়ামানস্থিত সানা শহরের এক ব্যক্তি তাহার একটি ছেলেকে তাহার স্ত্রীর নিকট রাখিয়া বিদেশে চলিয়া যায় ; ছেলেটি তাহার অপর স্ত্রীর পক্ষ হইতে ছিল। সে বিদেশে চলিয়া গেলে তাহার স্ত্রী অপর এক ব্যক্তির সহিত অবৈধ সম্পর্ক গড়িয়া তোলে এবং তাহারা উভয়ে ঐ বালক ছেলেকে নিজেদের জন্য বিপদের কারণ ভাবিয়া তাহাকে হত্যার পরিকল্পনা করে। তাহারা উভয়ে এবং অপর এক ব্যক্তি ও গৃহভৃত্ত—এই চার জন একত্রে গোপনে বালকটিকে মারাত্মকরূপে আঘাত করিয়া হত্যা করে এবং থলিয়ায় ভর্ত্তি করিয়া লুকাইবার চেষ্টা করে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ঘটনা প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং আসামীগণ ধৃত হয়। এই ভাবে একটি হত্যায় চার জন আসামী হত্যাকারী বলিয়া প্রমাণিত হয়। সেই উপলক্ষে খলীফা ওমর (রাঃ) বলিয়াছিলেন, সানা শহরবাসী সকলে যদি এই হত্যাকাণ্ডে শামিল হইত তবে আমি তাহাদের সকলকেই প্রাণদণ্ড দিতাম।

মছআলাহ ঃ— কতিপয় ব্যক্তি এক ব্যক্তিকে একত্রে আঘাত করিয়া হত্যা করিয়াছে, প্রত্যেকের মারনাস্ত্র কেছাছ প্রয়োগ শ্রেণীর এবং প্রত্যেকের আঘাত এরূপ যে সাধারণতঃ উহা হত্যার জন্য যথেষ্ট—এই ক্ষেত্রে আঘাতকারী প্রত্যেককেই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে।

মছআলাহ ঃ—কতিপয় ব্যক্তি একত্রে এক ব্যক্তিকে আঘাত করিয়াছে ; প্রত্যেকের আঘাত ভিন্ন ভিন্ন এই পর্য্যায়ের নহে যাহাতে সাধারণতঃ মৃত্যু ঘটিতে পারে, কিন্তু সমষ্টিগত ভাবে আঘাতগুলি হত্যায় পরিণত হইয়াছে—এই ক্ষেত্রে দিয়ত তথা নির্দ্ধারিত প্রাণ-বিনিময় দিতে হইবে।

মছআলাহ ঃ—যদি কাহারও আঘাত হত্যাজনক এবং অপর ব্যক্তিদের আঘাত সাধারণ ছিল তবে শুধু হত্যাজনক আঘাতকারীকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হইবে। অন্যান্যদের শাস্তি হইবে, কিন্তু প্রাণদণ্ড নহে।

মছআলাহ ঃ—এক ব্যক্তির কোন একটি অঙ্গ কর্ত্তনে যদি কতিপয় ব্যক্তি একত্রে শামিল হয় সে ক্ষেত্রে অঙ্গ কর্ত্তনের কেছাছ প্রযোয্য নহে, যদিও তাহারা ইচ্ছাকৃত

ঐ কাজ করিয়া থাকে। বরং উক্ত অঙ্গের দিয়ত তথা নির্দ্ধারিত অর্থ বিনিময় তাহাদের হইতে সম ভাবে বন্টন করিয়া আদায় করা হইবে। হানফী মজহাব মতে মুল মছআলাহ ইহাই, অবশ্য শাফী মজহাব মতে ইচ্ছাকৃত ঐরূপ করার ক্ষেত্রে অপরাধীগণ প্রত্যেকেরই অঙ্গহানী ঘটাইয়া কেছাছ গ্রহণ করা হইবে।

(ফত্ওয়া শামী ৫—৪৮০)

উক্ত মছআলাহ অন্তর্ভুক্ত এই বিষয়টিও যে, এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগে দুই জন সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়াছে, সে মতে শরীয়তের বিধান অনুসারে কাজীর বিচারে তাহার হাত কাটা হইয়াছে। অতঃপর সাক্ষীদ্বয়ের সাক্ষ্যের অবাস্তবতা সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছে এবং ঐ ব্যক্তি চুরির অপরাধ-মুক্ত সাব্যস্ত হইয়াছে; ফলে সাক্ষীদ্বয় ঐ ব্যক্তির হাত কর্ত্তনকারী সাব্যস্ত হইয়াছে, সুতরাং তাহাদের উভয়কে হাত কর্ত্তনের ক্ষতিপুরণ দানে দিয়ত আদায় করিতে হইবে। হাতের দিয়ত পঞ্চাশটি উট বা ১৩১২।। তোলা তথা ।৬।৵২।। ষোল সের এক পোয়া দুই ছটাক আড়াই তোলা রৌপ্য কিম্বা উহার মূল্য বা ১৮৭।। তোলা তথা ৵২।৵২।। দুই সের এক ছটাক আড়াই তোলা স্বর্ণ কিম্বা উহার মুল্য। ইহা পুরুষের হাতের দিয়ত; মহিলার হাতের দিয়ত ইহার অর্দ্ধ।

সাক্ষীদ্বয় ভুল বশতঃ সাক্ষ্য দিয়া থাকিলে এই দিয়ত তথা অর্থ বিনিময়ের ক্ষতিপুরণ পরিশোধ করিবে। আর যদি ইচ্ছাকৃত মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া থাকে তবুও এই অর্থ বিনিময়ের ক্ষতিপুরণই জাগতিক বিচারে তাহাদের উপর বর্ত্তিবে এবং মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা এবং ইচ্ছাকৃত এক ব্যক্তির এত বড় ক্ষতি সাধন করার গোনাহও তাহাদের উপর চাপিয়া থাকিবে। এমনকি ইচ্ছাকৃত ঐরূপ করার ক্ষেত্রে তাহাদের অপরাধের পরিমাণ ও জঘন্যতা দৃষ্টে শাসনকর্ত্তা বা বিচারপতি আবশ্যক বোধে সাক্ষীদ্বয়ের হাত কাটিয়া দিতে পারেন, কিন্তু তাহা মুল বিধানের শাস্তিরূপে নয়, বরং পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য শাসনতান্ত্রিক পর্য্যায়ের অতিরিক্ত শাস্তিরূপে হইতে পারিবে; যাহার জন্য সেইরূপ বিশেষ পরিস্থিতির আবশ্যক হইবে; সর্ব্ব ক্ষেত্রে উহা প্রযোয্য হইবে না।

বোখারী (রঃ) খলীফা আলী (রাঃ) হইতে যে একটি ঘটনার উদ্ধৃতি দিয়াছেন হানফী মজহাব মতে উহার তাৎপর্য্য ইহাই (বদায়ে উছ্ছানায়ে ৬—২৯৯)।

ঘটনাটি এই—

খলীফা আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট এক ব্যক্তির উপর চুরির অভিযোগে দুই জন সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদান করিল। সেমতে আলী (রাঃ) অভিযুক্ত ব্যক্তির হাত কাটার আদেশ প্রদান করিলেন। তাহার হাত কাটিয়া দেওয়া হইল।

তারপর ঐ সাক্ষীদ্বয় আর এক ব্যক্তিকে হাজির করিয়া বলিল, হে আমীরুল-মোমেনীন! প্রথম ব্যক্তি সম্পর্কে আমরা ভুল করিয়াছিলাম—প্রকৃত প্রস্তাবে চোর এই ব্যক্তি। আলী (রাঃ) সে ক্ষেত্রে বলিয়াছিলেন, তোমাদের সাক্ষ্য আমি আর গ্রহণ করিব না এবং তোমাদের উপর আমি প্রথম ব্যক্তির জন্য হাত কর্ত্তনের দিয়ত বলবৎ করিলাম। যদি আমার নিকট প্রমাণীত হইত যে, তোমরা প্রথম বার ইচ্ছাকৃত মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া ছিলে, তবে আমি এখন তোমাদের প্রত্যেকের হাত কাটিয়া দিতাম।

মছআলাহ ঃ—চড়-চাপড় বা চপেটাঘাত, খামচি বা নখের আঁচর এবং ছড়ি, লাঠি, বেত বা চাবুকের আঘাত ইত্যাদি ক্ষেত্রে কেছাছ তথা সমপরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ বা দিয়ত তথা নির্দ্ধারিত অর্থ বিনিময় আদায়ের ব্যবস্থা নাই। এই সব ক্ষেত্রে আছে তা'যীর তথা শাসনতান্ত্রিক শাস্তি; যাহা নিয়মতান্ত্রিক বিচারপতি ক্ষেত্র, পাত্র, ঘটনা ও পরিস্থিতি ইত্যাদি সমুদয় দিক লক্ষ্য রাখিয়া প্রয়োগ করিবেন।

অবশ্য যদি কেহ ঐরূপ ক্ষেত্রে নিজেই নিজকে আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট সমর্পণ করিয়া দেয়—সম পরিমাণ আঘাতের দ্বারা প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বা কাজী তথা নিয়মতান্ত্রিক বিচারপতি ক্ষেত্রবিশেষে স্বীয় বিবেচনায় যথাসম্ভব সমপর্য্যায়ের আঘাত মারার আদেশ প্রদান করেন তবে তাহা সতন্ত্র কথা। এই শ্রেণীর বিচার বা প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগদানকে শুধু আভিধানিক অর্থে কেছাছ বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু উহা বিধানগত কেছাছ নহে।

এস্থলে ইমাম বোখারী (রঃ) যে কতিপয় ঘটনার উদ্ধৃতি দিয়াছেন ঐসব ঘটনায় কেছাছ শব্দের ব্যবহার উল্লেখিত শ্রেণীর শুধু আভিধানিক অর্থ পর্য্যায়েরই বটে। উক্ত ঘটনাবলীর বিস্তারিত বিবরণ এই—

খলীফা আবু বকর (রাঃ) একদা এক ব্যক্তির বিরক্তিকর আচরণে ক্ষুব্ধ হইয়া তাহাকে একটি চড় মারিলেন, পরে তিনি নিজেই তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, তুমি আমার হইতে চড়ের কেছাছ বা প্রতিশোধ আদায় কর, ঐ ব্যক্তি অভিভূত হইয়া মাফ করিয়া দিল।

খলীফা ওমর (রাঃ) এক বার মক্কা হইতে মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তনের পথে একদা একটি বৃক্ষের আড়ালে প্রস্রাব করিতে বসিলেন, ঠিক ঐ অবস্থায় এক ব্যক্তি তাহাকে চিৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল। তাহার এই আচরণে ক্ষুব্ধ হইয়া খলীফা ওমর (রাঃ) তাহাকে চাবুক দ্বারা আঘাত করিলেন। ঐ ব্যক্তি বলিল, আমাকে জবানবন্দির সুযোগ না দিয়াই শাস্তি প্রদান করিলেন? তৎক্ষণাৎ খলীফা ওমর (রাঃ) ঐ চাবুকটি ঐ ব্যক্তির হাতে তুলিয়া দিয়া বলিলেন, তুমি আমার

হইতে প্রতিশোধ নিয়া নেও। ঐ ব্যক্তি তাহা করিতে অস্বীকার করিল, ওমর (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, প্রতিশোধ গ্রহণ অবশ্যই তোমাকে করিতে হইবে। তখন ঐ ব্যক্তি বলিল, আমি ক্ষমা করিয়া দিয়াছি।

খলীফা আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট একদা এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার কানে কানে কিছু বলিল (কোন অপরাধের স্বীকারুক্তি করিল।) খলীফা আলী (রাঃ) দণ্ড প্রয়োগে নিযুক্ত কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া বলিলেন, এই ব্যক্তিকে বাহিরে নিয়া বেত্রদণ্ড প্রদান কর। অতঃপর দণ্ড প্রাপ্ত ব্যক্তি আসিয়া অভিযোগ করিল, দণ্ড প্রয়োগকারী নির্দ্ধারিত সংখ্যার অধিক তিনটি আঘাত করিয়াছে। দণ্ড প্রয়োগকারীও তাহা স্বীকার করিল। খলীফা আলী (রাঃ) তাহাকে আদেশ করিলেন, এই বেত্র দ্বারা তুমিও তাহাকে তিনটি আঘাত কর। অধিকন্তু দণ্ড প্রয়োগকারী কর্ম্মচারীকে খলীফা আলী (রাঃ) শাসাইয়া দিলেন যে, শাস্তি প্রায়োগকালে নির্দ্ধারিত পরিমাণ অতিক্রম করিবে না।

কাজী শোরায়হ্ রহমতুল্লাহে আলাইহের নিকট একদা এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, আমাকে আপনার চাপরাসী হইতে প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ করিয়া দিন। তিনি তৎক্ষণাৎ চাপরাসীকে ডাকিয়া ঘটনা জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিল, লোক জন আপনার উপর ভিড় জমাইতে ছিল তখন আমি এই ব্যক্তিকে চাবুক দ্বারা একটি আঘাত করিয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে শোরায়হ্ (রঃ) বিচার করিলেন—ঐ ব্যক্তিকে বলিলেন, তুমিও তাহাকে চাবুক দ্বারা একটি আঘাত কর।

কাজী শোরায়হ্ (রঃ) কোন এক ঘটনায় শুধু খামচি বা নখের আঁচরের প্রতিশোধ গ্রহণেরও আদেশ প্রদান করিয়া ছিলেন।

"কাসামাহ" তথা অজ্ঞাত হত্যার কেছাছ হইতে মুক্তির জন্য কসমের ব্যবস্থা

কোন গ্রাম, মহল্লা বা বাড়ী অথবা কোন প্রতিষ্ঠান এলাকায় কাহারও হত্যাকৃত মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু হত্যাকারীর কোনই সন্ধান পাওয়া যায় নাই। এবং হত্যাকৃত ব্যক্তির ওয়ারিসদের পক্ষ হইতে নির্দ্দিষ্ট কাহারও প্রতি অভিযোগ পেশ করাও সম্ভব হয় নাই। এমতাবস্থায় যেহেতু ইসলামী রাষ্ট্রের কোন নাগরিকের হত্যাকাণ্ড প্রতিক্রিয়াহীন যাইতে পারে না। তাই ঐ এলাকা, বাড়ী বা প্রতিষ্ঠানের লোকজনদের উপর ঐ হত্যার দিয়ত তথা নির্দ্ধারিত অর্থ বিনিময় দাইকারীরূপে ধার্য করা হইবে। কারণ, এইরূপ দুষ্কৃতি হইতে নিজ নিজ এলাকাকে হেফাজত করা এলাকাবাসীদের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য; তাহারা এই কর্ত্তব্য পালনে ত্রুটির অপরাধে অপরাধী হইয়াছে। ইহা শরীয়তের মুল বিধান, অবশ্য এই মছআলার বিস্তারিত

বিবরণ ও শাখা প্রশাখা অনেক কিছুই রহিয়াছে যাহা ফেকাহ্ শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। একজন পুরুষের দিয়তের পরিমাণ এক শত উট বা ২৬২৫ তোলা তথা ৩২৸/ বত্রিশ সের তিন পোয়া এক ছটাক রৌপ্য অথবা উহার মূল্য কিম্বা /৪৷৷৴ সাড়ে চার সের তিন ছটাক স্বর্ণ অথবা উহার মূল্য। মহিলার দিয়ত উক্ত পরিমাণের অর্দ্ধ।

এই বিরাট অঙ্কের দিয়ত ধার্য্যের পূর্ব্বে এলাকাবাসীগণকে এই প্রমাণও দিতে হইবে যে, তাহাদের মধ্যে কেহ এই হত্যায় জড়িত নহে। কেননা, যদি তাহারা হত্যা করিয়া থাকে এবং সেই হত্যা ইচ্ছাকৃত ছিল তবে সে ক্ষেত্রে কেছাছ তথা প্রাণের বিনিময়ে প্রাণদণ্ড; অর্থ বিনিময়ের কোন প্রশ্নই আসে না। সুতরাং অর্থ বিনিময়ের পূর্ব্বে তাহাদের হত্যাকারী না হওয়ার প্রমাণ দিতে হইবে। সেই প্রমাণের জন্য শরীয়ত এই ব্যবস্থা করিয়াছে যে, হত্যাকৃত ব্যক্তির ওয়ারিসগণ নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী ঐ এলাকাবাসীদের হইতে পঞ্চাশ ব্যক্তিকে নির্দ্দিষ্ট করিবে। তাহারা কাজির দরবারে প্রত্যেকে এইরূপে শপথ করিবে—

والله ما قتلته ولا علمت له قاتلا

"খোদার কসম—আমি তাহাকে হত্যা করি নাই এবং তাহার হত্যার সঙ্গে জড়িত কোন লোকের খোঁজও আমি জানি না।" এইরূপে পঞ্চাশ জনকে পঞ্চাশটি কসম খাইতে হইবে, এমনকি যদি ঘটনা কোন গৃহে হইয়া থাকে এবং গৃহ স্বামীদের সংখ্যা পঞ্চাশে না পৌঁছে, তবে ঐ কম সংখ্যক লোককেই পুনঃ পুনঃ কসম দিয়া কসমের সংখ্যা পঞ্চাশ পূর্ণ করিতে হইবে। সেমতে যদি শুধু গৃহ-স্বামী একাই ঐরূপ কসমের পাত্র হয় তবে তাহাকেই পঞ্চাশ বার কসম খাইতে হইবে। এইরূপে কসম খাইলে এলাকাবাসীগণ হত্যার দায় হইতে মুক্ত হইবে, কিন্তু নিজ এলাকাকে এরূপ দুষ্কৃতি হইতে হেফাজত না করার অপরাধে তাহাদের উপর পাইকারীরূপে দিয়ত ধার্য্য করা হইবে। এই ব্যবস্থাকেই "কাসামাহ্" বলা হয়।

২৫৮২। হাদীছ ঃ—সাহ্‌ল (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেম, তাঁহার গোষ্টির কতিপয় ব্যক্তি খায়বর দেশে গিয়াছিল। তাহারা তথায় পৌঁছিয়া বিভক্ত হইয়া পড়ে। অতঃপর তাহারা তাহাদের এক জনকে কোন এক স্থানে নিহত অবস্থায় দেখিতে পায়। তখন তদস্থানীয় ইহুদী অধিবাসীগণকে তাহারা বলিল, তোমরাই আমাদের লোককে হত্যা করিয়াছ। তাহারা বলিল, আমারা হত্যা করি নাই এবং হত্যাকারীর খোঁজও আমরা জানি না।

নিহত ব্যক্তির সঙ্গিগণ হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমরা খায়বর গিয়াছিলাম, তথায় আমাদের এক জনকে নিহত অবস্থায় পাই। (যে ব্যক্তি অভিযোগ পেশ করিতেছিল

সে ছিল আগন্তুকদের মধ্যে কনিষ্ঠ, তাই) হযরত (দঃ) বলিলেন, মুরব্বিদেরকে কথা বলিতে দাও। (অতঃপর মুরব্বি শ্রেণীর দুই ব্যক্তি ঘটনা ব্যক্ত করিলে পর হযরত (দঃ) খায়বরবাসী ইহুদীদের প্রতি এই মর্ম্মে এক লিপি প্রেরণ করিলেন— اما ان يدوا صاحبكم واما ان يؤذنوا بحرب "খায়বরবাসী ইহুদীগণ তাহাদের আওতায় নিহত ব্যক্তির দিয়ত প্রদান করিবে, অন্যথায় তাহাদের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের ঘোষনা করা হইবে।)"

হযরত (দঃ) অভিযোগ দায়েরকারীগণকে বলিলেন, তোমরা হত্যাকারী সম্পর্কে সাক্ষী পেশ করার চেষ্টা কর। তাহারা বলিল, আমাদের কোন সাক্ষী নাই। হযরত (দঃ) বলিলেন, তাহা হইলে খায়বরবাসী ইহুদীগণ তাহাদের উক্তির উপর কসম খাইবে। অভিযোগকারীরা বলিল, আমরা ইহুদী সম্প্রদায়ের কসমের উপর সন্তুষ্ট হইতে পারি না। সেমতে (খায়বরবাসীদের হইতে কাসামার নিয়ম অনুযায়ী কসম ত লওয়া হইল না, কিন্তু) রসুলুল্লাহ (দঃ) হত্যার ঘটনা প্রতিক্রিয়াহীন যাওয়াকে অবৈধ ও অসঙ্গত গণ্য করতঃ (খায়বরবাসীদের উপর দিয়ত ধার্য্য করিলেন। অবশ্য তাহাদের প্রতি উদারতা বশে নিজের তরফ হইতে) ছদকা তথা বায়তুল-মালের (পঞ্চাশটি উট ক্রয় করিয়া সাহায্য স্বরূপ তাহাদিগকে প্রদান করতঃ সর্ব্ব মোট) এক শত উট দ্বারা দিয়ত আদায়ের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ— তরজমার ভিতর বন্ধনীর মধ্যে কতিপয় বিষয় সংযোগ করা হইয়াছে—(১) "খায়বরবাসীদের উপর দিয়ত ধার্য্য করার কঠোর আদেশ সম্বলিত লিপির মর্ম্ম" এই বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে বোখারী শরীফ ১০৬৭ পৃষ্ঠার রেওয়ায়েতে উল্লেখ রহিয়াছে। ইহা দ্বারা প্রমাণীত হয় যে, মুল দিয়ত হযরত (দঃ) হত্যাকাণ্ডের স্থান খায়বরবাসীদের উপরই প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন।

(২) "খায়বরবাসীদের হইতে কাসামার নিয়ম অনুযায়ী কসম লওয়ার প্রস্তাব হযরত (দঃ) করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সেই কসম লওয়া হয় নাই।" ইহার কারণ অতি সুস্পষ্ট। ফেকার কেতাবে বিধান রহিয়াছে, কাসামার নিয়ম অনুসারে বিবাদী পক্ষের উপর কসম প্রয়োগ করার জন্য বাদী পক্ষের তরফ হইতে বিবাদী পক্ষের উপর কসমের দাবী করিতে হইবে এবং কসম চাহিতে হইবে, নতুবা কসম প্রয়োগ করা হইবে না। আলোচ্য ঘটনায় বাদী পক্ষ বিবাদী পক্ষের কসম মোটেই দাবী করে নাই, বরং তাহাদের কসমের প্রস্তাবও গ্রহণ করে নাই।

(৩) "দিয়ত আদায়ে রসুলুল্লাহ (দঃ) যে সাহায্য করিয়া ছিলেন তাহা তিনি ছদকা তথা বাইতুল-মাল হইতে নিজের অর্থে ক্রয় করিয়া নিয়াছিলেন।" ইমাম নববী প্রমুখ মোহাদ্দেছগণ ১০৬৭ পৃষ্ঠার রেওয়ায়েতের ন্যায় অনেক রেওয়ায়েতের

একটি বাক্য فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده—"হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) দিয়তের সাহায্য নিজ তরফ হইতে প্রদান করিলেন" এর পরি-প্রেক্ষিতে উপরুক্ত তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন।

(৪) "হযরতের সাহায্য মুল দিয়তের অর্দ্ধাংশ পঞ্চাশটি উট ছিল মাত্র, বাকি অর্দ্ধাংশ দ্বারা দিয়তের পরিমাণ একশত উট পূর্ণ করা বিবাদী পক্ষ খায়বরবাসীদের উপরই প্রবর্ত্তিত ছিল।" এই তথ্যটি নেছায়ী শরীফের এক হাদীছে স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। (২—২০৬)—

فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ديته عليهم واعانهم بنصفها

"হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) উক্ত হত্যার দিয়ত খায়বরবাসীদের উপর পাইকারী ভাবে বণ্টন করিয়া দিলেন এবং স্বয়ং হযরত (দঃ) দিয়তের অর্দ্ধাংশ দ্বারা তাহাদের সাহায্য করিলেন।"

হত্যার ব্যাপারে মিথ্যা কসমের পরিণতি

একটি বিশেষ ঘটনা—আরবের হোজায়েল গোত্র তাহাদের একজন অবাঞ্ছিত লোককে নিদাবী ঘোষিত করিয়াছিল। (অন্ধকার যুগে কোন গোত্রের এক জনের অপরাধের প্রতিশোধ অন্যদেরকেও ভোগ করিতে হইত, তাই নিজ গোত্রের অবাঞ্ছিত ব্যক্তির প্রতি সকলেরই সতর্ক দৃষ্টি থাকিত। এমনকি কোন ব্যক্তিকে আয়ত্তের বাহিরে মনে করিলে গোত্রের লোকগণ তাহার সম্পর্কে নিদাবীর ঘোষনা জারি করিয়া দিত। ঐরূপ ব্যক্তি কোন অপরাধ করিলে গোত্রের অপর লোকগণ উহার জন্য দায়ী হইত না, আবার তাহাকে কেহ হত্যা করিয়া ফেলিলে তাহার জন্য গোত্রীয় লোকগণ কোন দাবীও করিতে পারিত না—অন্ধকার যুগে এই প্রথা ছিল।)

হোজায়েল গোত্র কর্তৃক নিদাবী ঘোষিত ব্যক্তি একদা রাত্রি বেলা বত্‌হা নামক স্থানে কোন একটি ইয়ামানী পরিবারের গৃহে প্রবেশ করিলে গৃহের একজন লোক টের পাইয়া তাহার প্রতি তরবারীর আঘাত করিল; সেই আঘাতে ঐ ব্যক্তি নিহত হইল। তখন হোজায়েল গোত্রের লোক জন আসিয়া হত্যাকারী ইয়ামানীকে ধরিয়া ফেলিল, ঘটনাটি হজ্জের মৌসুমে মক্কায় ঘটিয়া ছিল। অন্ধকার যুগেও ওমর (রাঃ) মক্কার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি গণ্য হইতেন; ঘটনার বিচারের জন্য উপস্থিত তাঁহার নিকটই ইয়ামানী ব্যক্তিকে নিয়া আসা হইল এবং হোজায়েল গোত্রীয় লোকদের পক্ষ হইতে প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে দাবী করা হইল যে, এই ব্যক্তি আমাদের একজন লোককে হত্যা করিয়াছে। হত্যাকারী ব্যক্তি প্রতিশোধ খণ্ডনের জন্য দাবী করিল, ইহারা ঐ ব্যক্তিকে নিদাবীরূপে ঘোষিত করিয়া ছিল,

সুতরাং ইহারা তাহার হত্যার প্রতিশোধের দাবী করিতে পারে না। হোজায়েল গোত্রীয় লোকগণ মিথ্যারূপে ঐ কথা অস্বীকার করিয়া বলিল, আমরা উহাকে নিদাবীরূপে ঘোষনা করি নাই।

এখন হত্যার বিচার ন্যাস্ত হইল এই কথার উপর যে, ঐ ব্যক্তিকে নিদাবী ঘোষনা করা হইয়া ছিল কি না। বাদী পক্ষ নিদাবী ঘোষনা করা অস্বীকার করিতে ছিল, তাই তাহাদিগকে কাসামার নিয়ম অনুযায়ী বলা হইল, তোমাদের পঞ্চাশ জন এই বিষয়ের উপর কসম খাইবে যে, ঐ ব্যক্তিকে নিদাবী ঘোষনা করা হইয়া ছিল না। তখন তাহাদের উপস্থিত উনপঞ্চাশজন লোক ছিল তাহারা ঐ বিষয় কসম খাইল। তাহাদের অপর একজন লোক সিরিয়া হইতে তথায় আসিয়া ছিল, পঞ্চাশ পূর্ণ করার জন্য তাহাকে কসম খাইতে বলা হইল। সে মিথ্যা কসম খাইতে ভয় করিয়া এক হাজার দেরহাম—রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে তাহার স্থলে অপর ব্যক্তিকে কসমের জন্য দিয়া দিল। এইরূপে পঞ্চাশ জনের কসম দ্বারা নিদাবীর ঘোষনা বাতিল সাব্যস্ত হইলে হত্যাকারী খুনের বদলে শাস্তি প্রাপ্ত হইল এবং প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী ভ্রাতার হাতে অপরাধীকে অর্পন করা হইল। ভ্রাতা অপরাধী সহ মিথ্যা কসমে জড়িত লোকদের সঙ্গে পথ চলিতে ছিল। নখ্‌লা নামক স্থানে পৌঁছিলে বৃষ্টি বর্ষন আরম্ভ হইল; তাহারা সকলে একটি পাহাড়ের গর্তে আশ্রয় নিলে হঠাৎ গর্তটি ধ্বসিয়া পড়িল এবং মিথ্যা কসমকারী পঞ্চাশজন সকলেই চাপা পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। নিহত ব্যক্তির ভ্রাতা এবং তাহার হস্তে ধৃত আসামী এই দুই জনের উপর চাপা পড়িল না, তাহারা তথা হইতে বাহির হইয়া আসিতে সক্ষম হইল। কিন্তু একটি পাথর তাহাদের পেছনে ধাওয়া করিল এবং (মিথ্যা দাবীতে জড়িত) নিহত ব্যক্তির ভ্রাতার পায়ে আঘাত করিয়া তাহার পা ভাঙ্গিয়া ফেলিল এবং দীর্ঘ এক বৎসর সেই আঘাতে ভুগিয়া সেও মৃত্যুমুখে পতিত হইল। (১০১৯ পৃঃ)

গৃহভ্যন্তরে উঁকি মারার দরুণ চক্ষু কানা করিয়া দিলে?

২৫৮৩। হাদীছঃ- আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে, তিনি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছেন, যদি কেহ তোমার অনুমতি ব্যতিরেকে উঁকি মারিয়া তোমার ঘরের অভ্যন্তর দেখে এবং তখন তুমি ঢিল ছোড়িয়া তাহার চক্ষু কানা করিয়া ফেল তবে তাহাতে তোমার গোনাহ হইবে না।

ব্যাখ্যাঃ—উক্ত অপরাধে লিপ্তাবস্থায় ঢিল ছোড়িয়াছে এবং তাহাতে চক্ষু কানা হইয়াছে, ইহাতে গোনাহ হইবে না। শাফী মজহাব মতে জাগতিক বিচারেও তাহার কোন দণ্ড হইবে না। হানফী মজহাব মতে এই মছআলার বিবরণ নিম্নরূপ—

কাফের-হরবী তথা ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত নাগরিক নয় এরূপ কাফের ব্যতিত অন্য সকল মানুষের জান-মাল অঙ্গপ্রতঙ্গ, এমনকি শরীরের চামড়াটুকুর পর্য্যন্ত নিরাপত্তার বিধান ইসলামী শরীয়তে অতিশয় কঠোরতার সহিত পালন করা হইয়াছে। এ সম্পর্কে অনেক সুস্পষ্ট হাদীছ বর্ণিত রহিয়াছে, তাই ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এই ক্ষেত্রে চক্ষুর ন্যায় একটি অঙ্গহানীর ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতামুলক পথ অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি বলেন, ঐ ব্যক্তি উক্ত অপরাধে লিপ্তাবস্থায়ই তাহাকে চক্ষু ছেদনকারী ঢিল মারা হইয়াছিল ইহা প্রমাণ করার সঙ্গে সঙ্গে সুস্পষ্টরূপে এই প্রমাণও দিতে হইবে যে, ঐরূপ ঢিল মারা ব্যতিরেকে ঐ ব্যক্তিকে উক্ত অপরাধ হইতে নিবৃত্ত করার আর কো'ন উপায় ছিল না। বিচারকের নিকট এই বিষয়টি প্রমাণিত হইলেই এ ক্ষত্রে দণ্ড মৌকুফ হইবে, (আলোচ্য হাদীছের মর্ম্ম ইহাই।) অন্যথায় নিরাপত্তা বিধানের হাদীহসমূহ দৃষ্টে চক্ষুহানীর দণ্ড প্রয়োগ করা হইবে। (ফত্ওয়া শামী ৫—৪৮৪)

গর্ভ পাতনের শাস্তি

অর্থাৎ গর্ভবতীকে আঘাত করিয়াছে বা এমন কোন ব্যবস্থা করিয়াছে যাহাতে গর্ভপাত হইয়া গিয়াছে। এমতাবস্থায় যদি সন্তান জীবিত ভুমিষ্ঠ হইয়া মারা যায় তবে একজন সবল সুস্থ মানুষকে হত্যা করার দিয়তের পরিমাণ দিয়ত আদায় করিতে হইবে এবং নর-হত্যার দরুন শরীয়তে যে কাফ্ফারা নির্দ্ধারিত আছে তাহাও আদায় করিতে হইবে এবং কোরআনে বিঘোষিত নর-হত্যার গোনাহও হইবে। আর যদি সন্তান মৃতই গর্ভচ্যুত হয় তবে সেস্থলে সন্তান পুরুষ হউক বা নারী উভয়ের জন্যই এক "গোর্‌রা" তথা একটি ক্রীতদাস বা একটি ক্রীতদাসী দিতে হইবে, কিম্বা পুরুষের দিয়ত পরিমাণের বিশ ভাগের এক ভাগ স্বর্ণ, চান্দি বা উহার মূল্য আদায় করিতে হইবে এবং গোনাহও হইবে। এমনকি যদি গর্ভবতী মাতা স্বয়ং কোন প্রকার আঘাত করিয়া বা ঔষধ ব্যবহার করিয়া কিম্বা অন্য কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া গর্ভপাত ঘটায় অথবা সন্তানের পিতা ঐরূপ কর্ম্ম করে তবে সেস্থলেও অনুরূপ শাস্তি প্রয়োগ করা হইবে এবং ঐরূপ গোনাহগার হইবে।

যে গর্ভ বা ভ্রূণ মানব দেহের পূর্ণ আকৃতি ধারণ করে নাই, শুধু কেবল মাথা গঠিত হইয়াছে উহার হুকুম-আহকামও পূর্ণ দেহের ন্যায়ই। অবশ্য যদি দেহের কোন অংশই আকার ধারণ না করিয়া থাকে, শুধু কেবল রক্তপিণ্ড বা মাংসপিণ্ড হয় তবে উহার ক্ষতিপুরণ বিচারকের বিবেচনার উপর ন্যস্ত হইবে।

(ফত্ওয়া শামী ৫—৫১৯)

২৫৮৪। ছাদীছ ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা হোজায়েল গোত্রীয় দুই জন মহিলা (ঝগড়ায় লিপ্ত হইয়া) একজন অপর জনকে ভীষণ আঘাত করিল; যাহাতে আঘাতপ্রাপ্তা মহিলার গর্ভপাত হইয়া গেল। সে ক্ষেত্রে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একটি "গোর্‌রা" তথা একটি ক্রীতদাস বা একটি ক্রীতদাসী প্রদানের ফয়ছালা করিয়া ছিলেন।

২৫৮৫। ছাদীছ ঃ— একদা খলীফা ওমর (রাঃ) কোন মহিলার গর্ভপাত ঘটানের শাস্তি সম্পর্কে ছাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শ করিলেন। তখন মুগিরা (রাঃ) বলিলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম গোর্‌রা তথা একটি ক্রীতদাস বা একটি ক্রীতদাসী প্রদানের ফায়সালা করিয়া ছিলেন।

ছাহাবী মোহাম্মদ ইবনে মাছলামাহ (রাঃ) বলিলেন, আমি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ঐরূপ একটি ফয়সালা ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলাম।

ছোট বালকদের দ্বারা খেদমত করানো

অপরের বালক ছেলেদের দ্বারা তাহাদের অভিভাবকের অনুমতি না লইয়াও এমন ব্যক্তি কাজ লইতে পারে যাহার সঙ্গে ঐরূপ কাজ লওয়ার অনুমতির সম্পর্ক স্বাভাবিক রূপেই থাকে। যথা—ঐ বালকদের শিক্ষক বা অভিভাবকদের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিবর্গ। এইরূপ ক্ষেত্রেও সতর্ক থাকিবে—যেই শ্রেণীর বালকদের সম্পর্কে দ্বিধা থাকিবে অভিভাবকের অসন্তোষের তাহাদের দ্বারা কাজ করাইবে না।

নবী-পত্নি উম্মে সালামা (রাঃ) একদা মক্তবের শিক্ষকগণের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন—তাঁহার উন পেঁজিবার উদ্দেশ্যে বালকদেরকে পাঠাইবার জন্য। তিনি শিক্ষকগণকে সতর্ক করিয়া দিলেন, অভিজাত শ্রেণীর বালকদেরকে পাঠাইবে না; (দাস শ্রেণীর বালকদেরে পাঠাইবে)।

অভিজাত শ্রেণীর বালকদের সম্পর্কে দ্বিধা থাকে যে, এই বালকদের দ্বারা কাজ করাইতে তাহাদের অভিভাবকের সন্তুষ্টি না-ও থাকিতে পারে। তাই উম্মে-সালামা (রাঃ) সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন। অবশ্য এইরূপ ক্ষেত্রে অভিভাবকের সুস্পষ্ট অনুমতি থাকিলে দ্বিধার প্রয়োজন নাই। নিম্নে বর্ণিত হাদীছে তাহারই ইঙ্গিত রহিয়াছে।

২৫৮৬। ছাদীছ ঃ— আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়ছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যখন হিজরত করিয়া মদিনায় পৌঁছিলেন তখন আমার অভিভাবক—(মাতার স্বামী) আবু তাল্‌হা (রাঃ) আমার হাতে ধরিয়া নিজের সঙ্গে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত করিলেন। এবং বলিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! "আনাছ" অতি হুশিয়ার ছেলে—সে আপনার সেবা করিবে।

সেমতে আমি বাড়ীতে ও ভ্রমনে সর্ব্বদা নবীজীর খেদমত ও সেবা করিয়াছি। (নবী (দঃ) এতই মধুর স্বভাব ও সহানুভূতিশীল ছিলেন যে,) দীর্ঘ দশ বৎসর সর্ব্বদার সেবাকালে কোন দিন তিনি কোন কাজের উপর আমাকে ধমক দিয়া বলেন নাই যে, এই কাজ এইরূপ কেন করিলে? বা কোন কাজ না করার উপর তিনি বলেন নাই যে, ইহা এইরূপে কেন কর নাই?

পশুর দ্বারা কোন ক্ষতি সাধিত হইলে

২৫৮৭। হাদীছঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, বোবা জাত পশুর অপরাধের ক্ষতিপুরণ নাই। খনি খুদাই করাকালে কেহ আহত বা নিহত হইলে উহারও কোন ক্ষতিপুরণ নাই। কূপ খুদাই করাকালে কেহ আহত বা নিহত হইলে উহার কোন ক্ষতিপুরণ নাই। অবশ্য ঐরূপ খুদাই করিয়া ভূগর্ভে খনিজ দ্রব্য পাওয়া গেলে উহার এক পঞ্চামাংশ বাইতুল-মালকে দিতে হইবে।

ব্যাখ্যাঃ—বোবা জাত পশুর দ্বারা সংঘটিত ক্ষয়-ক্ষতির ক্ষতিপুরণ সম্পর্কে মোটামুটি মছআলাহ এই যে, যে সব ক্ষেত্রে অপরাধ নিছক পশুরই হয় একমাত্র সে ক্ষেত্রেই ক্ষতিপুরণ না আসিবার বিধান প্রযোয্য হইবে। যেমন—(১) কোন পশু উহার সঙ্গে আরোহী নাই, পরিচালক নাই, উহাকে কেহ কোন প্রকার উস্কানী দেয় নাই—সে নিজ গতিতে স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিকরূপে চলিয়া কাহারও কোন ক্ষতি সাধন করিয়াছে। (২) কোন পশু উহার উপর আরোহী রহিয়াছে বা উহার সঙ্গে পরিচালক রহিয়াছে, কিন্তু তাহাদের চালনায় ক্ষতি সাধিত হয় নাই, বরং পশু স্বীয় অতিরিক্ত ক্রিয়ার আঘাতে ক্ষতি সাধন করিয়াছে এবং সেই ক্রিয়া আরোহী বা পরিচালকের আয়ত্তের বাহিরে। যেমন, পথ চলা কালে পশু পেছনের পা দ্বারা লাথি মারিয়া বা লেজ দ্বারা ক্ষতি সাধন করিয়াছে। (৩) আরোহী বা পরিচালক পূর্ণরূপে পশুকে শান্ত ও স্বাভাবিক গতিতে পরিচালিত করিতে ছিল, এমতাবস্থায় পশুটি উশৃঙ্খল হইয়া চালকের প্রতিরোধ ভেদ করতঃ কাহারও কোন ক্ষতি সাধন করিয়াছে। (৪) কোন ব্যক্তি কেরায়ারূপে তাহার পশুর উপর সোয়ারী বহন করিয়া নেয়, চালকের কোন অপরাধ ও ত্রুটি ব্যতিরেকে পশুর উপর হইতে আরোহী পতিত হইয়া নিহত হইয়াছে—এইসব ক্ষেত্রে ক্ষতিপুরণ বর্ত্তিবেনা।

অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতিপুরণ দানের বিধানও রহিয়াছে। যথা—(১) কাহারও পরিচালনার মাধ্যমে ক্ষতি সাধিত হইয়াছে, যেমন সর্ব্ব সাধারণের পথে আরোহী বা পরিচালক পশুকে চালাইয়া নিয়াছে সেই চলনে সম্মুখ বা পেছনের পায়ে পিষ্ট হইয়া, কিম্বা পশুর মাথার আঘাতে, কিম্বা তাহার কামড়ে, কিম্বা তাহার ধাক্কায়

কোন ক্ষতি সাধিত হইয়াছে; এরূপ ক্ষেত্রে আরোহী বা পরিচালককে ক্ষতিপুরণ আদায় করিতে হইবে। (২) পশুকে কেহ হাঁকাইয়াছে, সেই পশুর গতিতে হাঁকানোর প্রতিক্রিয়া থাকা কালীন কোন ক্ষতি সাধিত হইলে যে ব্যক্তি হাঁকাইয়া ছিল তাহাকে ক্ষতিপুরণ আদায় করিতে হইবে। (৩) পশু পেছনের পা দ্বারা লাথি মারিয়া ক্ষতি করিয়াছে, কিন্তু সেই লাথি মারা আরোহী বা পরিচালকের ক্রিয়াজনিত ছিল—যেমন, তাহার লাগাম টানিবার বা ফিরাইবার কারণে উত্তেজিত হইয়া লাথি মারিয়াছে, কিম্বা সেস্থলে আরোহী বা পরিচালকের কোন ত্রুটি হইয়াছে, যেমন—আরোহী বা পরিচালক পশুকে পথে এমন স্থানে দাঁড় করাইয়াছে যে স্থানে পশু দাঁড় করাইবার জন্য নির্দ্ধারিত নহে এবং সেই অবস্থায় লাথি দ্বারা ক্ষতি করিয়াছে, এই সব ক্ষেত্রেও আরোহী বা পরিচালককে ক্ষতিপুরণ আদায় করিতে হইবে। (৪) পশুকে কেহ উস্কানী দিয়াছে তাহাতে পশু লাথি মারিয়া বা উশৃঙ্খল হইয়া কোন ক্ষতি সাধন করিয়াছে, তখন উস্কানীদাতাকে ক্ষতিপুরণ আদায় করিতে হইবে, অবশ্য উস্কানীদাতার ক্ষতি করিলে উহার ক্ষতিপুরণ আসিবে না। (৫) পশুর উপর কোন আরোহী বা মাল ছিল—অতি বেগে পরিচালনার দরুন বা অন্য কোন পরিচালন-ত্রুটিতে সোয়ারী পড়িয়া গিয়া নিহত হইয়াছে বা কোন ক্ষতি সাধিত হইয়াছে সে ক্ষেত্রে পরিচালককে ক্ষতিপুরণ আদায় করিতে হইবে। (৬) কাহারও কুকুর দংশন করে, পশু গুঁতা মারে—যে কোন এক ব্যক্তি কর্ত্তৃকও মালিককে জ্ঞাত করার পরেও যদি মালিক তাহার কুকুর বা পশুকে নিয়নত্রিত না করে তবে তাহাকেও ক্ষতিপুরণ আদায় করিতে হইবে।

বোবাজাত পশুর দ্বারা ক্ষয়-ক্ষতির ক্ষতিপুরণ সম্পর্কে উভয় ধরণের বহুবিধ ক্ষেত্র ও স্থান রহিয়াছে যাহার বিস্তারিত বিবরণ ফেকাহশাস্ত্র হইতে উদ্ধার করা যাইতে পারে।

ইসলামী রাষ্ট্রের অমোসলেম নাগরিককে হত্যা করিলে

২৫৮৮। হাদীছ ঃ— عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدَةً لَمْ يَرِحْ

رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَاِنَّ رِيْحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ اَرْبَعِيْنَ عَامًا

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্রের অমোসলেম নাগরিককে হত্যা করিবে সে বেহেশতের খুশবু হইতেও বঞ্চিত থাকিবে। অথচ বেহেশতের খুশবু এরূপ জিনিষ যাহা সুদূর চল্লিশ বৎসরের পথ হইতেও অনুভব হইয়া থাকে।

মছ্আলাহ ঃ— অনুগত অমোসলেম নাগরিককেও হত্যা করা মহাপাপ যদিও সে কাফের। এমনকি ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহে আলাইহের মজহাব মতে জাগতিক শাস্তির বিধানেও সে একজন মোসলমানের সমান গণ্য হইবে। এবং কোন মোসলমান ব্যক্তি তাহাকে কেছাছের উপযোগীরূপে হত্যা করিলে বিচারে সেই মোসলমানকে প্রাণদণ্ড প্রদান করা হইবে। অবশ্য যদি ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক বা নিরাপত্তার ভিসা বহনকারী না হয়, বরং বিদ্রোহী দেশের কাফের হয় তবে তাহাকে হত্যা করিলে সে ক্ষেত্রে হত্যাকারী মোসলমানকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হইবে না। যে হাদীছে কাফেরকে হত্যা করায় মোসলমানকে প্রাণদণ্ড না দেওয়ার উল্লেখ রহিয়াছে উহার তাৎপর্য্য এই দ্বিতীয় শ্রেণীই।

অমোসলেমকে হত্যা করার দণ্ডে মোসলমানকে প্রাণদণ্ড দান

২৫৮৯। হাদীছ ঃ— আবু জোহায়ফা (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আলী (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম—কোরআন ভিন্ন ওহীর অন্য বিশেষ কোন কিছু আপনার নিকট আছে কি ? তিনি শপথ করিয়া উহা অস্বীকার করতঃ বলিলেন, যেই মহান আল্লাহ দুনিয়ার সমস্ত উদ্ভিদ ও প্রাণী সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার কসম করিয়া বলিতেছি—কোরআন ভিন্ন অন্য কোন বিশেষ এলম আমার নিকট নাই। কোরআনেরই জ্ঞান যাহা আল্লাহ মানুষকে দিয়া থাকেন তাহা আছে, আর আছে এই একখানা লিপির বিষয়বস্তু। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, উক্ত লিপিতে কি আছে ? তিনি বলিলেন, উহাতে আছে—বিশেষ শ্রেণীর হত্যা বা অঙ্গহানীর বিনিময়-পণের বিধান এবং মোসলমান বন্দীকে কাফেরদের হস্ত হইতে (ধন-বল ব্যয় করিয়া) মুক্ত করিয়া আনার ফজিলত। আর এই কথা যে, কোন মোসলমানকে অমোসলেম-হত্যার দরুণ প্রাণদণ্ড দেওয়া যাইবে না।

ব্যাখ্যা ঃ— অমোসলেম হত্যার দায়ে মোসলমানকে প্রাণদণ্ড না দেওয়ার যে কথা এস্থানে উল্লেখ হইল ইমাম আবু হানীফা (রঃ) ভিন্ন অন্য ইমামগণের মত ইহাই। যে—দেশী-বিদেশী, অনুগত-অননুগত যে কোন শ্রেণীর অমোসলেমকেই কোন মোসলমান ব্যক্তি হত্যা করিলে সেই ক্ষেত্রে মোসলমান ব্যক্তিকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হইবে না। অবশ্য কোন জিম্মী তথা—দেশীয় অনুগত অমোসলেম নাগরিককে হত্যা করা হইলে সেই ক্ষেত্রে হত্যার বিনিময়-পণ অবশ্যই আদায় করিতে হইবে।

ইমাম আবু হানীফা (রঃ) উল্লেখিত হাদীছের বিষয়বস্তুকে জিম্মী তথা দেশীয় অনুগত নাগরিক ভিন্ন অন্য অমোসলেমদের ক্ষেত্রের জন্য সাব্যস্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে জিম্মী অমোসলেম হত্যাকারী মোসলমানকে মোসলমান হত্যাকারীর

ন্যায়ই প্রণদণ্ড দেওয়া হইবে। কারণ দেশের অনুগত নাগরিক অমোসলেম হইলেও সে তাহার জান-মাল, আবরু-ইজ্জতের নিরাপত্তা মোসলমান নাগরিকদের সমানই লাভ করিবে।

"মোরতাদ" তথা ইসলাম-ত্যাগী কাফের সম্পর্কেঃ

দ্বীন-ইসলাম পরিত্যাগকারীকে "মোরতাদ্" বলা হয়—চাই সরাসরি পরিত্যাগ করা হউক বা এমন কোন আকিদা ও বিশ্বাস অবলম্বন করা হউক বা এমন কোন কার্য্য করা হউক কিম্বা এমন কোন উক্তি করা হউক যদ্দ্বারা দ্বীন-ইসলামের স্বীকৃতি ভঙ্গ হইয়া যায়। যেমন, কোরআন কিম্বা হাদীছের দ্বারা অকাট্য প্রমাণে প্রমাণীত কোন আকিদাকে প্রত্যাখ্যান করা বা ঐরূপ কোন আকিদার বিপরিত আকিদা অবলম্বন করা, কোরআন কিম্বা হাদীছের দ্বারা অকাট্য প্রমাণে প্রমাণীত কোন শরীয়তের হুকুমকে অস্বীকার করা, অবজ্ঞা ও তুচ্ছ করা উহার প্রতি বিদ্রুপ করা, হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল বলা ও গণ্য করা, দ্বীন ইসলামের মূল—আল্লাহ, আল্লার কোরআন, আল্লার রসুল সম্পর্কে অপমানজনক তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যজনক, উপেক্ষা ও অবজ্ঞাজনক বা বিদ্রুপাত্তক উক্তি করা, হযরত মোহাম্মদ (দঃ)কে সর্ব্ব শেষ নবী গণ্য না করা, এমন কোন কাজ করা যাহা একমাত্র কাফেরগণই করিয়া থাকে বা একমাত্র কাফেরের পক্ষেই উহা করা সম্ভব হইতে পারে। যথা—দেব-দেবীকে সেজদা করা, (নাউজু বিল্লাহ) পবিত্র কোরআন শরীফ পায়খানায় নিক্ষেপ করা ইত্যাদি। এই সকল ক্ষেত্রে দিলের আকিদা শুদ্ধ থাকিলেও বিনা ওজরে ঐরূপ কার্য্য করিলে বা উক্তি করিলে কাফের মোরতাদ্ হইয়া যাইবে। এমনকি বিনা ওজরে হাসি-ঠাট্টারূপে করিলেও ঐ হুকুমই বলবৎ করা হইবে বলিয়া ইমামগণ মত্ প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব এই ব্যাপারে সতর্ক থাকা আবশ্যক, অবশ্য যদি প্রাণ বাঁচাইবার জন্য ঐরূপ কাজ বা উক্তি করিতে বাধ্য হয় এবং দিলের ঈমানকে সুষ্ঠু ও সুদৃঢ় রাখিয়া শুধু বাহ্যতঃ উহা করিয়া ফেলে তবে আল্লাহ তায়ালা তাহার দিলের অবস্থাকে কবুল করিয়া বাহ্যিক কার্য্যটা ক্ষমা করিয়া দিবেন।

মোরতাদ্ সম্পর্কে মছআলাহ এই যে, ইসলাম পুনঃ গ্রহণের সুযোগ দানার্থে তাহাকে তিন দিন অবকাশ দেওয়া হইবে এবং আবদ্ধ রাখিয়া ইসলামের জন্য বুঝ-প্রবোধ দেওয়া হইবে। যদি ইসলামে প্রত্যাবর্ত্তন না করে তবে পুরুষ হইলে তাহাকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হইবে, আর মহিলা হইলে তাহাকে কতল করা হইবে না, ইসলামে প্রত্যাবর্ত্তন করা পর্য্যন্ত কারারুদ্ধ রাখিয়া শাস্তি প্রদান করতঃ ইসলামের জন্য বাধ্য করা হইবে। (ফত্ওয়া শামী—৩)

ছাহাবী আবহুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এবং ইমাম জুহরীর মতে মহিলা মোরতাদকেও প্রাণদণ্ড দেওয়া হইবে।

জবরদস্তিমুলক কোন কাফেরকে মোসলমান করার নীতি ইসলামে নাই, কিন্তু মোসলমানকে কাফের হইয়া যাওয়ার সুযোগ কিছুতেই দেওয়া হইবে না—কঠোর হস্তে তাহা দমন করিতে হইবে। ইহা সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বাভাবিক আইন। সুতরাং মোরতাদকে প্রাণদণ্ড দেওয়া যুক্তি সঙ্গতই বটে।

২৫৯০। **হাদীছ ঃ—** আবহুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা এক গ্রাম্য ব্যক্তি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রসুলাল্লাহ! কবিরা গোনাহগুলি কি কি? তদুত্তরে হযরত নবী (দঃ) সর্ব্বপ্রথম বলিলেন, শেরেকী গোনাহ। ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, তারপর? হযরত (দঃ) বলিলেন, তারপর মাতা-পিতার নাফরমানী করা। ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, তারপর? হযরত (দঃ) বলিলেন, তারপর মিথ্যা কসম—বিশেষতঃ মিথ্যা কসম দ্বারা অন্যের কোন জিনিষ হস্তগত করা।

২৫৯১। **হাদীছ ঃ—** عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَنُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ مَنْ

اَحْسَنَ فِى الْاِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَمَنْ

اَسَاءَ فِى الْاِسْلَامِ اُخِذَ بِالْاَوَّلِ وَالْاٰخِرِ

অর্থ—আবহুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রসুলাল্লাহ! ইসলাম গ্রহণের পূর্ব্বে আমরা যে সব পাপ করিয়া ছিলাম উহার খেসারত আমাদিগকে ভোগ করিতে হইবে কি? হযরত (দঃ) বলিলেন, যে ব্যক্তি খাঁটিভাবে ইসলাম গ্রহণ করিবে তাহাকে ইসলাম-পূর্ব্ব পাপের খেসারত ভুগিতে হইবে না। আর যে ব্যক্তি মোনাফেকীরূপে ইসলাম প্রকাশ করিবে সে পূর্ব্বের ও পরের সব পাপেরই আজাব ভোগ করিবে।

মোর্তাদ হইলে তাহার সমুদয় নেক আমল বিনষ্ট হইয়া যাইবে

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলিয়াছেন—

وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ

فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"মোসলমানদের মধ্য হইতে যাহারা ধর্ম্ম-চ্যুত হইবে এবং কুফরি অবস্থায়ই মরিবে তাহাদের সমুদয় আমল বিনষ্ট হইয়া যাইবে—ছুনিয়ার দিক দিয়াও আখেরাতের দিক দিয়াও এবং তাহারা হইবে দোযখী। চিরকাল তাহারা দোযখবাসী হইয়া থাকিবে।

ব্যাখ্যা ঃ—ছুনিয়ার দিক দিয়া আমল বিনষ্ট হওয়ার অর্থ এই যে, সে দীর্ঘ দিন মোসলমান নেক আমলকারী থাকা সত্ত্বেও মোর্‌তাদ্ হওয়ার কারণে তাহার জানাযা পড়া হইবে না, মোসলমানদের কবরস্থানে তাহাকে দাফন করা যাইবে না এবং মোর্‌তাদ্ সাব্যস্ত হইয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মোসলমান স্ত্রীর বিবাহ ভাঙ্গিয়া যাইবে, তাহার সমুদয় ধন-সম্পত্তি ওয়ারেসদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে, তাহাকে কেহ হত্যা করিয়া ফেলিলে উহার বিচার হইবে না ইত্যাদি ইত্যাদি।

আর আখেরাতের দিক দিয়া বিনষ্ট হওয়ার অর্থ এই যে, সারা জীবন লক্ষ লক্ষ নেক আমল করিয়া থাকিলেও উহার উপর বিন্দু মাত্র ছওয়াব সে পাইবে না এবং সাধারণ কাফেরদের ন্যায় চিরজাহান্নামী হইবে।

আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন—

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ

وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

"যাহারা আল্লার সঙ্গে কুফুরী করিবে ঈমান গ্রহণের পর—ঐ লোক ব্যতীত যে অপারগ হইয়া বাহ্যতঃ উহা করিয়াছে, কিন্তু তাহার অন্তর সুদৃঢ় রহিয়াছে ঈমানের উপর ; অবশ্য যাহারা খোলা অন্তরে কুফুরি অবলম্বন করিয়াছে তাহাদের উপর আল্লার গজব এবং তাহাদের জন্য ভীষণ আজাব নির্দ্ধারিত রহিয়াছে।"

(১৪ পারা—১৪ রুকু)

আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন—

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا

كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا

"নিশ্চয় যাহারা ঈমান গ্রহণ করিয়া অতঃপর কুফুরী করিবে, তারপর পুনরায় ঈমান গ্রহণ করিয়া আবার কুফুরী করিবে এবং কুফুরীর উপরই জীবন কাটাইয়া যাইবে আল্লাহ তায়ালা তাহাদের সঙ্গে এইরূপ ব্যবহার মোটেই করিবেন না যে, তাহাদের গোনাহ মাফ করিয়া দেন এবং তাহাদের নাজাতের পথ করিয়া দেন।"

মোর্‌তাদ্‌কে হত্যা করা হইবে

২৫৯২। হাদীছ ঃ একরেমা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খলীফা আলী (রাঃ)-এর নিকট একদল লোককে উপস্থিত করা হইল যাহারা (আলী (রাঃ)কে খোদা বলিয়া) জিন্দীক মোর্‌তাদ্ হইয়াছিল। আলী (রাঃ) তাহাদিগকে আগুনে পোড়াইয়া দিলেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই সংবাদ অবগত হইয়া বলিলেন, আমি শাসনকর্ত্তা হইলে তাহাদিগকে আগুনে পোড়াইতাম না। কারণ, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) নিষেধ করিয়াছেন—তোমরা আল্লার আজাব তথা আগুণে পোড়াইবার শাস্তি কাহাকেও প্রদান করিও না। অবশ্য আমি তাহাদিগকে হত্যা করিতাম, কারণ রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি দ্বীন ইসলাম ত্যাগ করিবে তাহাকে কতল করিয়া ফেল।

২৫৯৩। হাদীছ ঃ— আবু বোরদাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আবু মূছা (রাঃ) এবং মোয়াজ (রাঃ)কে ইয়ামান দেশের শাসনকর্ত্তা বানাইয়া পাঠাইয়া ছিলেন। ইয়ামান দেশ দুইটি এলাকায় বিভক্ত ছিল, (তাই এক এক এলাকার জন্য এক একজনকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।) তাঁহারা উভয়ে নিজ নিজ এলাকার দায়িত্বে চলিয়া গেলেন। তাঁহাদের নীতি ছিল—একজন অপর জনের এলাকার নিকট দিয়া যাওয়ার সময় অবশ্যই পরস্পর সাক্ষাৎ ও সালাম-কালাম করিয়া যাইতেন।

একদা মোয়াজ (রাঃ) আবু মূছার নিকট দিয়া যাইতে তাঁহার সাক্ষাতে আসিলেন। দেখিলেন, আবু মূছা (রাঃ) বসিয়া আছেন এবং তাঁহার সম্মুখে অনেক লোকের ভিড়, আর এক ব্যক্তিকে উভয় হস্ত ঘাড়ের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। মোয়াজ (রাঃ) আবু মূছা (রাঃ)কে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, এই ব্যক্তি ইহুদী ছিল, পরে মোসলমান হইয়া ছিল ; এখন সে ইসলাম ত্যাগ করতঃ পুনরায় ইহুদী (তথা মোর্‌তাদ) হইয়া গিয়াছে। মোয়াজ (রাঃ) বলিলেন, তাহাকে প্রাণদণ্ড না দিলে আমি আপনার নিকট অবতরণ করিব না। আবু মূছা (রাঃ) বলিলেন, প্রাণদণ্ড দেওয়ার জন্যই তাহাকে বন্দী করিয়া আনা হইয়াছে, আপনি অবতরণ করুন। মোয়াজ (রাঃ) বলিলেন, প্রথমে তাহার প্রাণদণ্ড কার্য্যকারী করুন, তারপর আমি অবতরণ করিব। আবু মূছা (রাঃ) প্রাণদণ্ডের হুকুম দিলেন ; তাহাকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হইল।

অতঃপর তাঁহারা উভয়ে তাহাজ্জোদ নামায সম্পর্কে আলোচনা করিলেন। আবু মুছা (রাঃ) বলিলেন, প্রতি রাত্রে আমি পর পর একাধিক বার জাগ্রত হইয়া তাহাজ্জোদ নামাযে কোরআন শরীফ তেলাওত করিয়া থাকি। মোয়াজ (রাঃ) বলিলেন, আমি নিদ্রার অংশে নিদ্রা পূর্ণ করিয়া জাগ্রত হই এবং আল্লাহ প্রদত্ব তৌফিক অনুযায়ী তাহাজ্জোদ নামাযে কোরআন তেলাওত করি। তাহাজ্জোদ নামাযে যেরূপ ছওয়াবের আশা রাখি তদ্রূপ নিদ্রায়ও ছওয়াবের আশা রাখি। (কারণ, তাহাজ্জোদ নামাষের জন্য স্বাস্থ্-বল ঠিক রাখার নিয়্যতেই নিদ্রা যাওয়া হয়।)

ইসলামের কোন ফরজ হুকুম মান্য করিতে অস্বীকার করিলে মোর্‌তাদ্ হইবে; ঐরূপ ব্যক্তিকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হইবে

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ইহকাল ত্যাগের পর খলীফা আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর আমলে এক দল লোক ইসলামের কলেমা ও ইসলামের সমুদয় হুকুম-আহকামের স্বীকৃতির উপর থাকিয়া শুধু কেবল যাকাতকে এন্‌কার করিয়াছিল—যাকাত আদায় করা ফরজ তাহা মান্য করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিয়াছিল। তাহাদিগকে মোর্‌তাদ্ কাফের গণ্য করতঃ তাহাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করা হইয়াছিল।

প্রকাশ থাকে যে, ফরজ-ওয়াজেব ভিন্ন কোন সুন্নতও যদি আকাট্য প্রমাণে প্রমাণিত থাকে, তবে সেইরূপ সুন্নতকেও সুন্নত বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। উহা সুন্নত হওয়া অস্বীকার করিলে বা উহার প্রতি এনকার ও বিদ্রূপ করিলে কাফের সাব্যস্ত হইবে। যেমন--মেছওয়াক করা সুন্নত, যাহা বহু সংখ্যক হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। উহা সুন্নত হওয়া অস্বীকার করিলে কাফের সাব্যস্ত হইবে। (এক্‌ফারুল-মোলহেদীন)

আল্লার রসুলকে মন্দ বলিলে

মছআলাহ ঃ—আল্লার রসুলকে মন্দ বলিলে মোর্‌তাদ্ হইয়া যাইবে। এমনকি কোন কোন ফকীহ আলেমের মতে যদি সে পরে তওবা করে এবং খাঁটী তওবা হয় তবে হয়ত আখেরাতে মুক্তি পাইতে পারে, কিন্তু জাগতিক বিচারে তওবা করার পরও তাহাকে শাস্তি স্বরূপ কতল করিয়া দেওয়া হইবে। আর কোন জিম্মী তথা অমোসলেম অনুগত নাগরিক ঐরূপ করিলে তাহাকে বিদ্রোহী গণ্য করিয়া প্রাণদণ্ড দেওয়া হইবে। অবশ্য যদি অস্পষ্ট ভাষায় তাহা করে তবে প্রমাণের অভাব হেতু প্রাণদণ্ড মৌকুফ থাকিবে, যেমন নিম্নে বর্ণিত হাদীছের ঘটনা—

২৫৯৪। **ছাদীছ**ঃ— আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা এক ইহুদী ব্যক্তি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট দিয়া গমনকালে (সালামের ভান করিয়া "আচ্ছালামু আলাইকা" বলার পরিবর্তে) "আচ্ছামু আলাইকা" বলিল (—"আচ্ছালামু শব্দের স্থলে "আচ্ছামু" শব্দ বলিল—যাহার অর্থ 'মৃত্যু' ; অর্থাৎ আপনার উপর মৃত্যু পতিত হউক।) হযরত (দঃ) তাহার উত্তরে বলিলেন, আলাইকা—তোমার উপর। অতঃপর হযরত (দঃ) ছাহাবীগণকে বলিলেন, তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ কি সে কি বলিয়াছে ? সে বলিয়াছে, আচ্ছামু আলাইকা। ছাহাবীগণ বলিলেন, তাহাকে কতল করিয়া দিব কি ? হযরত (দঃ) বলিলেন, না। অবশ্য ইহুদ-নাছারাগণ তোমাদিগকে সালাম করিলে (যেহেতু তাহারা সালামের ভান করিয়া অনেক সময় আচ্ছামু শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে, তাই) তোমরা উত্তরে বলিয়া দিও আলাইকুম—তোমাদের উপর।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—মোর্তাদের যে সংজ্ঞা বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছে যে, ইসলমামের কলেমা ইত্যাদির পূর্ণ স্বীকারোক্তি বরং নামায-রোযা ইত্যাদির পাবন্দীর সহিতও মানুষ মোর্তাদ শ্রেণীর কাফের হইতে পারে (এক্ফারুল-মোলহেদীন)। উপরোল্লেখিল পরিচ্ছেদদ্বয়ে ইমাম বোখারী (রঃ) উহারই দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন যে, ইসলামের কলেমা ইত্যাদির স্বীকারোক্তির সহিত কেহ কোন ফরজ হুকুমকে অস্বীকার করিলে সে মোরতাদ কাফের সাব্যস্ত হইবে। তদ্রূপ ইসলামের স্বীকৃতি কর্তনকারী কোন কাজ করিলে, যেমন—হযরত নবী (দঃ)কে মন্দ বলিলে ঐরূপ ব্যক্তি মোরতাদ কাফের সাব্যস্ত হইবে।

কলেমার স্বীকৃতি ও নামায-রোযার পাবন্দির সহিত যাহারা বিভিন্ন কারণে মোরতাদ গণ্য হয় এই শ্রেণীর কোন কোন মোরতাদকে ইসলামের পরিভাষায় বিশেষ বিশেষ নামেও আখ্যায়িত করা হয়। যেমন—

(১) মোল্হেদ—অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইসলামের দাবী ও ইসলামের কলেমা ইত্যাদির স্বীকারোক্তি করিলেও কোরআন-হাদীছ বা ইসলামী মতবাদের কোন বিষয়ে গর্হিত ব্যাখ্যার আড়ালে গোঁজামিল হেরফের ও বিতর্কের আশ্রয় লইয়া ইসলামের কোন সুস্পষ্ট মতবাদের পরিপন্থী মতবাদ পোষণ করে (ফয়জুল বারী ৪—৪৭৩)। যেমন—কোন ব্যক্তি ইসলামের কলেমা স্বীকার করে নামায-রোযার পাবন্দী করে কোরআন পাকও তেলাওয়াত করে, কিন্তু সে হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পর অন্য কাহাকেও নবী বলিয়া বিশ্বাস বা স্বীকার করে—এইরূপ ব্যক্তি "মোল্হেদ" নামীয় মোরতাদ কাফের সাব্যস্ত হইবে। কারণ, ইসলামের একটি সুস্পষ্ট মতবাদ এই যে, হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) খাতেমুন-নাবীয়্যীন

তথা সর্ব্বশেষ নবী ; তাঁহার পরে কোন প্রকারের কোন নূতন নবী আসিবেন না। তদ্রূপ যদি কেহ যাকাত ফরজ না হওয়ার মত পোষণ করে. ইত্যাদি।

(২) জিন্দীক্—অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইসলামের সব কিছুই স্বীকার করে কিন্তু ইসলামের সুস্পষ্ট মতবাদ বা হুকুম-আহকামের কোন একটির এরূপ ব্যাখ্যা করে যে ব্যাখ্যা ইসলামী শরীয়তে বিদ্যমান ব্যাখ্যার তথা ছাহাবীদের, তাবেয়ীদের এবং পূর্ব্বাপর মোসলেম জন সমাজে প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত গরমিল ব্যাখ্যা। যেমন কোন ব্যক্তি ইসলামের রোকন "ছালাত" তথা নামাযকে স্বীকার করে, কিন্তু ছালাতের এরূপ আজগুবী ব্যাখ্যা করিয়া থাকে যাহাতে রুকু-সেজদা নাই, কোরআন তেলাওয়াত নাই– মোসলেম সমাজে প্রচলিত নামাযের কোন কিছুই নাই। তদ্রূপ কোন ব্যক্তি হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)কে খাতেমুন-নাবীয়্যীন স্বীকার করে, কিন্তু খাতেমুন-নাবীয়্যীনের এরূপ আজগুবী ব্যাখ্যা করে যাহাতে হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পরে অন্য নবীর আবীর্ভাবেও উহা ক্ষুণ্ণ না হয়। কোন ব্যক্তি বেহেশ্‌ত-দোযখকে বিশ্বাস করে, কিন্তু বেহেশ্‌তের ব্যাখ্যা করে শুধু কেবল আত্মার আনন্দ এবং দোযখের ব্যাখ্যা করে শুধু কেবল আত্মার অনুতাপ ও পরিতাপ ইত্যাদি ইত্যাদি। (ফয়জুল বারী, ৪—৪৭২, এক্‌ফারুল মোল্‌হেদীন)।

পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে ইমাম বোখারী (রঃ) মোল্‌হেদ শ্রেণীর মোরতাদ কাফেরের উল্লেখ করিয়াছেন এবং রাষ্ট্র কর্ত্তৃক তাহাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাবলম্বনের হুকুম বয়ান করিয়াছেন যে, তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইবে।

মোল্‌হেদ শ্রেণীর মোরতাদের মধ্যেই একটি বিশেষ দল রহিয়াছে "খারেজী ফের্কা"। মোসলেম সমাজে আবিভূর্ত সর্ব্ব প্রথম বিভ্রান্ত গোমরাহ্ ভ্রষ্ট ফের্কা বা উপদলই ছিল এই খারেজী ফের্কা। খারেজী ফের্কার ভ্রষ্টতার কাহিনী সুদীর্ঘ এবং মোসলমানদের ক্ষতি সাধনে ও দ্বীন-ইসলামের মুলে কুঠারাঘাত হানায় তাহাদের জঘন্য ভূমিকা অত্যন্ত হৃদয় বিদারক এবং উহার ইতিহাস সুবিস্তীর্ণ। বক্ষমান কেতাবের পরিশিষ্টে ইনশা-আল্লাহ তায়ালা সেই ইতিহাসের বিস্তারিত আলোচনা হইবে। এই উপদলটির প্রতি অত্যন্ত ক্ষোভ ও ক্রোধ প্রকাশার্থে ইমাম বোখারী (রঃ) মোলহেদ শ্রেণীর মোরতাদ কাফেরের বয়ান-পরিচ্ছেদে বিশেষ ভাবে উহার নাম উল্লেখ করিয়া উহার বিরুদ্ধে জেহাদ করার হুকুম দিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে ইমাম বোখারী (রঃ) ছয়টি হাদীছ বয়ান করিয়াছেন এবং ৬২৪ পৃঃ হইতে আরও একখানা হাদীছ অনুবাদে শমিল করা হইয়াছে। উক্ত হাদীছসমূহে মোসলমানদের মধ্যে আবিভূর্ত একটি বিশেষ দল সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ রহিয়াছে। সেই দলটি ইসলামের ভয়ঙ্কর ক্ষতি সাধনকারী, ইসলাম বহিভূর্ত দল

বলিয়া উল্লেখ রহিয়াছে এবং ঐ দলটির প্রতি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অতিশয় ক্রোধ ও কোপের প্রকাশও রহিয়াছে। ইমাম বোখারী (রঃ) ঐ হাদীছসমূহকে খারেজী ফের্কার আলোচনায় উল্লেখ করিয়া বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, উল্লেখিত হাদীছসমূহে বর্ণিত উপদলটি এই খারেজী ফের্কাই। খারেজী ফের্কার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই—

ইসলামের তৃতীয় মহান ব্যক্তি ও তৃতীয় খলীফা ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর শাসনকালে হিজরী ২৫ সনে আবদুল্লাহ ইবনে সাবা নামক এক ইহুদী-বাচ্চা মোনাফেকীরূপে মোসলেম সমাজে শামিল হইয়াছিল এবং সে নূতন পুরাতন মোনাফেকদেরকে একত্রিত করিয়া মোসলমানদের ক্ষতি সাধন উদ্দেশ্যে একটি ষড়যন্ত্রকারী সন্ত্রসবাদী দল গঠন করিয়াছিল। এই দলটিই খলীফা ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিরুদ্ধে অপবাদ ও অপপ্রচারে লিপ্ত হইয়াছিল। ধোকা দিয়া তাহারা অনেক মোসলমানকেও দলে ভিড়াইয়াছিল। খলীফা ওসমানের বিরুদ্ধে নিজেদের আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য তাহারা প্রকাশ্যে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আহ্‌লে-বাইত বিশেষতঃ আলী রাজিয়াল্লাহু আনহুর মহব্বৎ ও পক্ষাবলম্বনের ঘোষনা করিয়াছিল। আর তৃতীয় খলীফা ওসমান (রাঃ) এবং তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী খলীফাদ্বয় আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ)—এই তিন জনের বিরুদ্ধে অপবাদ প্রচারে লিপ্ত ছিল। এই পর্য্যায়ে উক্ত দলটির নাম করা হইত রাফেজী ফের্কা। রাফেজী অর্থ বিশৃঙ্খলাবাদী—আনুগত্য ত্যাগী। তাহারা সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম-তান্ত্রিক খলীফা ওসমানের আনুগত্য ত্যাগ করায় তাহাদিকে উক্ত আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। এই দলটিই হিজরী ৩৫ সনে খলীফা ওসমানকে হত্যা করিতে কৃতকার্য্য হইয়া পরবর্ত্তী খলীফা আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য গায়ে পড়িয়া এমন সব কেলেঙ্কারী করে যাহাতে আলী (রাঃ)ও সন্তুষ্ট ছিলেন না। এবং ঐ সব কেলেঙ্কারীর ফলে মোসলমানদের মধ্যে বিভেদ, সংশয় এবং দ্বিধা বিভক্তি অনিবার্য্যতঃ সৃষ্টি হইয়া পড়ে। তারপর তাহারা সুপরিকল্পিতরূপে মোসলমানদের সেই বিভেদ জিয়াইয়া রাখার ষড়যন্ত্র অবিরাম চালাইয়া যাইতে থাকে। আলী (রাঃ) এবং তাঁহার নীতির প্রতিবাদী আয়েশা (রাঃ), তাল্‌হা (রাঃ), যোবায়ের (রাঃ) ও মায়াবিয়া (রাঃ)—এই প্রতিপক্ষদ্বয়ের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টি ও বিরোধ অবসানের ব্যবস্থা বহু বারই সম্পন্ন করা হইয়াছে, কিন্তু ঐ দলটির জঘন্যতম ষড়যন্ত্রে প্রত্যেক বারই তাহা বানচাল হইয়া গিয়াছে; যাহার ইতিহাস অত্যন্ত হৃদয় বিদারক। যেহেতু আলী রাজিয়া-ল্লাহু তায়ালা আনহুর সঙ্গে বস্তুতঃ তাহাদের কোন মহব্বতই ছিল না, শুধু কেবল

মোসলমানদের মধ্যে থাকিয়া মোসলমানদের পরস্পর বিরোধ জিয়াইয়া রাখার উদ্দেশ্যেই আলী রাজিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষে তাহারা গা-ঢাকা দিয়া ছিল। তাই ৩৭ হিজরী সনে যখন আলী (রাঃ) এবং তাঁহার প্রতিপক্ষ মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যে "তাহ্‌কীম" তথা উভয় পক্ষের প্রতিনিধি দুই জন বিশিষ্ট ছাহাবীর সালিসী দ্বারা সমুদয় বিরোধের চিরঅবসান ঘটাইবার সুব্যবস্থা এমন দৃঢ়রূপে সম্পন্ন করা হইল যে, উহা বানচাল করার কোন অবকাশই উক্ত দলটির জন্য রহিল না; তখন তাহারা আলী রাজিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষ ত্যাগ করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। তাহারা পবিত্র কোরআনের কোন কোন আয়াতের গর্হিত ব্যাখ্যা করিয়া আলী (রাঃ)কে কাফের বলিয়া ঘোষণা করিল (নাঊজু বিল্লাহে মিন্ জালেকা)।

সুদীর্ঘ ১৪ বৎসরকাল ষড়যন্ত্র ও মিথ্যা প্রচারণার দ্বারা তাহারা প্রায় বার হাজার লোক নিজেদের দলে ভিড়াইতে সমর্থ হইয়াছিল। আলী রাজিয়াল্লাহু আনহুর রাজধানী কুফার অনতি দুরে "হারুরা" নামক স্থানে তাহারা উক্ত সালিসী ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করিয়া আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিরুদ্ধে এক সম্মেলন করিল। উক্ত সম্মেলনে তাহারা শুধু আলী (রাঃ)কেই নয়, বরং তাহাদের মতামত বিরোধী সমুদয় মোসলেম সমাজকে কাফের সাব্যস্ত করিল*। তাহারা মোসলমান-দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার এবং মোসলমানদের ধন-জন লুণ্ঠন করার সিদ্ধান্তও নিল, যেরূপ সাধারণ কাফেরদের বিরুদ্ধে করা হয়।

তাহাদের এই জঘন্য আকিদা ও মতবাদ সূত্রেই অবশেষে তাহারা একযোগে আলী (রাঃ), মোয়াবিয়া (রাঃ) এবং অন্যতম বিশিষ্ট ছাহাবী আম্‌র ইবনুল আ'ছ (রাঃ)কে হত্যা করার গোপন ষড়যন্ত্র করিল এবং নির্দ্ধারিত একই তারিখে উক্ত তিন জনের উপর আক্রমণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ঘাতক নিয়োগ করিল। ফজরের নামাযে উপস্থিতির পথে আক্রমণ করা হইল। আম্‌র ইবনুল আ'ছ (রাঃ) অসুস্থতার দরুণ ঐ তারিখে নিজ গৃহে নামায আদায় করিয়াছিলেন, তাঁহার পরিবর্ত্তে যে ব্যক্তি নামায পড়াইবার জন্য মসজিদে আসিতেছিলেন, তিনি ঘাতকের আক্রমণে নিহত হইলেন—এইরূপে আম্‌র ইবনুল আ'ছ (রাঃ) রক্ষা পাইলেন। মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহুর উপর আক্রমণ হইল তিনি গুরুতররূপে আহত হইলেন, কিন্তু চিকিৎসার অছিলায় তিনি আরোগ্য লাভ করিলেন। আলী

---

* বর্ত্তমান যুগে যেরূপ কাদিয়ানী ফের্কা; তাহাদের গর্হিত নবী মির্জ্জা গোলাম আহমদকে অস্বীকারকারী সমুদয় মোসলেম সমাজকে তাহারা কাফের বলিয়া থাকে।

রাজিয়াল্লাহু আনহুর আঘাত এরূপ ভীষণ ছিল যে, কোন প্রকার চিকিৎসাই ফলদায়ক হইল না, তিনি শহীদ হইয়া গেলেন। তাঁহার ঘাতকের নাম ছিল আবদুর রহ্‌মান ইবনে মোলজেম খারেজী।

এই উপদলটি পবিত্র কোরআনের অপব্যাখ্যার আড়ালে ইসলামের সুস্পষ্ট বিধান বিরোধী আরও অনেক মতামতের জন্মই দিতেছিল। এই পর্য্যায়ে উক্ত দলটির নাম করা হইয়াছিল "খারেজী ফের্কা" খারেজী অর্থ দল ত্যাগী। দীর্ঘ দিন আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর দলে ভিড়িয়া থাকিয়া তাঁহার দল ত্যাগ করার পরিপ্রেক্ষিতে তাহাদের এই নাম করা হইয়া ছিল।

এই আলোচনার দ্বারা স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হইল যে, রাফেজী ফের্কা ও খারেজী ফের্কা উভয় ফের্কারই মূল এক; তাহা হইল আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকের সৃষ্ট সন্ত্রাসবাদী দল। এই সূত্রেই উক্ত উভয় দলকেই খারেজী নামে আখ্যায়িত করা হয়। ইতিহাসের মূল গ্রন্থ সমূহে উভয় ফের্কাকেই খারেজী আখ্যায় ব্যক্ত করা হইয়াছে। ইমাম বোখারী (রঃ)ও এই অর্থেই খারেজী ফের্কার উল্লেখ করিয়াছেন।

খারেজী ফের্কার মধ্যে যাহারা মোনাফেক ছিল তাহারা ত আল্লাহ তায়ালার নিকট নিকৃষ্টতম কাফের সাব্যস্ত রহিয়াছেই। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

"নিশ্চয় মোনাফেকগণ জাহান্নামের সর্ব্বাধিক গভীর তলদেশে অবস্থান করিবে।" কিন্তু জাগতিক বিধি-বিধানে মোনাফেকগণ মোসলমানই গণ্য হয়। এতদ্ভিন্ন তাহাদের দলে অনেক লোক এমনও ছিল যাহারা পূর্ব্ব হইতে মোনাফেক ছিল না—মোসলমানই ছিল, কিন্তু ঐ মূল খারেজী মোনাফেকদের প্ররোচনায় তাহারা খারেজীদের ইসলাম বিরোধী মতবাদগুলি গ্রহণ করিয়াছিল এবং ছাহাবীগণের বিরুদ্ধে মাতিয়া উঠিয়াছিল। সে মতে খারেজী ফের্কার গর্হিত মতবাদ ও পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন অপব্যাখ্যা দৃষ্টে ইমাম বোখারী (রঃ) সহ অধিকাংশ ইমামগণ খারেজী ফের্কাকে মোরতাদ—ইসলাম ত্যাগী কাফের সাব্যস্ত করিয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, খারেজী ফের্কা মোলহেদ শ্রেণীর একটি উপদল। মোলহেদ হইল—যাহারা কোরআন-হাদীছ বা ইসলামী কোন বিষয়ের অপব্যাখ্যার আড়ালে ইসলামের কোন সুস্পষ্ট মতবাদের পরিপন্থী মতবাদ অবলম্বন করে।

খারেজী ফের্কার লোকেরা সর্ব্বপ্রথম পবিত্র কোরআনের যে আয়াত ও যে বিষয়ের অপব্যাখ্যার আড়ালে আলী (রাঃ) এবং তাঁহার পক্ষীয় ও বিপক্ষীয়

ছাহাবীগণকে কাফের সাব্যস্ত করিয়া নিজেরাই কাফের হইয়াছিল তাহা ছিল এই যে, পবিত্র কোরআনে ঘোষণা রহিয়াছে—ان الحكم الا لله "ফয়ছালা করার অধিকার একমাত্র আল্লার জন্য।" পবিত্র কোরআনে আরও আছে—

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ

"যাহারা আল্লার কোরআন দ্বারা ফয়ছালা না করিবে তাহারা নিশ্চয়ই কাফের।" সুতরাং কোরআন ভিন্ন অন্য কিছুকে সালিস নিয়োগ করা কুফুরী। অতএব আলী (রাঃ) এবং উভয় পক্ষের সমস্ত ছাহাবী তাবেয়ী ও মোসলেম সমাজ ৩৭ হিজরী সনে আপসের বিরোধ মীমাংসার জন্য মানুষকে সালিস নিয়োগ করিয়া কাফের হইয়া গিয়াছেন।*

খারেজী ফের্কা ও মোল্‌হেদগণের বিরুদ্ধে জেহাদ করা

ইসলামের দাবী এবং ইসলামের কলেমার স্বীকৃতির সাথে যাহারা কোন বিতর্কের আড়ালে ইসলামের সুস্পষ্ট মতবাদ পরিপন্থী কোন মতবাদ অবলম্বন করে তাহাদিগকে মোলহেদ বলা হয়। তাহারা মোর্‌তাদ্—ইসলামের গণ্ডি-বহির্ভূত। এইরূপ কোন দল বা শক্তি সঙ্ঘবদ্ধ আকার ধারণ করিলে তাহাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করা হইবে, অবশ্য যদি তাহারা কোন ভুলের বশীভুত হইয়া ঐরূপ মতবাদ অবলম্বন করিয়া থাকে তবে তাহাদের সেই ভুল নিরসনের চেষ্টা ও ব্যবস্থা করিতে হইবে। ঐরূপ সর্ব্বাত্মক চেষ্টা ব্যর্থ হইলে তাহাদের বিরুদ্ধে জেহাদের পথ গ্রহণ করা হইবে। আর ঐ শ্রেণীর ব্যক্তি বিশেষের প্রতি মোর্‌তাদের বিধান বলবৎ করা হইবে।

---

* আলী (রাঃ) তাহাদের এই গর্হিত মতবাদ ও অপব্যাখ্যার সহজ ও সরল উত্তর প্রদানে তাহাদিগকে বুঝাইবার বহু চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, আমাদের সম্মুখে পবিত্র কোরআন যে আকৃতিতে রহিয়াছে তাহা হইল—কাগজের উপর কালি দ্বারা লেখা আরবী অক্ষরের সমবায়ে গঠিত শব্দাবলীর সমষ্টি আয়াতের সমাবেশ। এই শব্দাবলীর সমষ্টি আয়াতনিচয় কোন প্রকার জীব নহে যাহা স্বয়ং কোন ফয়ছালা বা রায় দান করিতে পারে। বরং কোন মানুষ ঐ কোরআনকে অনুসরণ করিয়া উহা অনুযায়ী ফয়ছালা ও রায় দান করিবে—অন্য কোন প্রভাবে ফয়ছালা ও রায় দান করিবে না। ইহাই উল্লেখিত আয়াতের তাৎপর্য্য।

৩৭ হিজরী সনের সালিসী প্রস্তাবে তাহাই করা হইয়াছে যে, দুইজন ছাহাবী কোরআন সম্মুখে রাখিয়া উহা অনুযায়ী উভয় পক্ষের বিরোধের ফয়ছালা করিয়া দিবেন। সুতরাং এই সালিসী প্রস্তাব বস্তুতঃ কোরআনের ফয়ছালা ও রায় দানেরই স্বাভাবিক আকার, কোরআনের ফয়ছালা ও রায় বাদ দেওয়া নহে। (বেদায়াহ-ওয়ান-নেহায়াহ)

২৫৯৫। হাদীছ :— একদা আলী (রাঃ) বলিলেন, আমি যখন আমার বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলি, তখন হয়ত বাকচাতুরী—কথার মারপেঁচ অবলম্বন করি। কারণ, বিরোধীদের মোকাবিলায় কূটনীতি বিশেষ ফলপ্রসূ, কিন্তু যখন হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কোন হাদীছ বর্ণনা করি তখন উহা অবশ্যই হুবহু অবিকল সুস্পষ্টরূপের হইয়া থাকে। কসম খোদার—আমি আসমান হইতে জমিনে নিক্ষিপ্ত হইয়া ছিন্ন-বিচ্ছিন্নরূপে ধ্বংস হইয়া যাই উহাও আমার নিকট ইহা অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয় যে, আমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নামে কোন কথা জাল করি—তিনি যাহা বলেন নাই তাহা হাদীছরূপে বর্ণনা করি।

আমি নিজ কানে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মুখে শুনিয়াছি—তিনি বলিয়াছেন, আমার সময়কাল শেষ হওয়ার পরে* অচিরেই একটি উপদলের আবির্ভাব হইবে, সেই দলের লোকগুলি কাঁচা বয়স ও কাঁচা বুদ্ধির হইবে। মানুষের নিকট উত্তম পরিগণিত কথা তাহারা বলিবে। তাহাদের ঈমান (শুধু মুখে থাকিবে—ঈমানের তাছির অন্তরে মোটেই হইবে না, এমনকি তাহাদের ঈমান) তাহাদের হলকোমের নীচে নামিবে না। তাহারা দ্বীন-ইসলাম হইতে বহির্ভূত হইবে যেরূপ কোন জীবের প্রতি সজোরে নিক্ষিপ্ত দ্রুতগামী তীর জীবটিকে ভেদ করিয়া বাহির হইয়া যায়। তদ্রূপ তাহারাও দ্বীন-ইসলাম ছেদন করতঃ উহা হইতে বহির্ভূত হইবে।

ঐ শ্রেণীর লোকদিকে যথায় পাও তাহাদিগকে হত্যা করিবে, কারণ তাহাদেরকে হত্যা করার বহু ছওয়াব রহিয়াছে যাহা হত্যাকারী কেয়ামতের দিন লাভ করিবে।

ব্যাখ্যা :—"মানুষের নিকট উত্তম পরিগণিত কথা তাহারা বলিবে" অর্থাৎ মুখে তাহারা ভাল ভাল কথা কলিবে, কিন্তু সেই ভাল কথার আসল তাছীর তাহাদের আমলে ও কার্য্য-কলাপে মোটেই হইবে না। অধিকন্তু তাহারা ঐ ভাল কথা তাহাদের ইসলাম বিধ্বংসী খারাব উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ব্যবহার করিবে।

ইমাম বোখারী (রঃ) ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে ঐ শ্রেণীর একটি তথ্য উল্লেখও করিয়াছেন—

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَاهُمْ شِرَارَ خَلْقِ اللّٰهِ وَقَالَ اِنَّهُمْ اِنْطَلَقُوْا اِلٰى

اٰيَاتٍ نَزَلَتْ فِى الْكُفَّارِ فَجَعَلُوْهَا عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ

---

* মোসলেম শরীফের এক হাদীছ উল্লেখ আছে— سيكون بعدى من امتى

অর্থ— আবহুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) খারেজী ফের্কার লোকদেরকে আল্লার সৃষ্টির মধ্যে জঘন্যতম গণ্য করিতেন। এবং তিনি বলিয়াছেন, ঐ ফের্কার লোকেরা কাফেরদের সম্পর্কে অবতারিত আয়াত সমূহকে মোমেন মোসলমানদের উপর প্রয়োগ করে।

আবহুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) যে কথাটি বলিয়াছেন ইহা খারেজী ফের্কার একটি বৃহত্তম অপকর্ম্ম এবং ভয়ঙ্কর মতবাদ। এই অপকর্ম্মের দ্বারাই তাহারা অসংখ্য ছাহাবী এবং সাধারণ মোসলমানগণকে কাফের সাব্যস্ত করিয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছিল। মোসলমানগণকে, এমনকি বড় বড় ছাহাবীগণকে হত্যা করিয়াছিল, বিজয়ের সুযোগে তাহাদের মতবিরোধী মোসলমানদের ধন-সম্পত্তি লুট করিয়াছিল এবং সেই মোসলমানদের পরিবার-পরিজনকে যুদ্ধবন্দী করিয়া কাফেরদের ন্যায় গোলাম বান্দী বানাইয়াছিল।

আলোচ্য হাদীছে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) উল্লেখিত দলের লোকদিগকে হত্যা করার জন্য মোসলমানদের প্রতি নির্দ্দেশ দান করিয়াছেন। মোসলেম শরীফে বর্ণিত এক হাদীছে স্বয়ং নিজের সম্পর্কে হযরত (দঃ) বলিয়াছেন—لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد "আমি তাহাদের আবির্ভাবের সময়কাল পাইলে নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে পাইকারীভাবে হত্যা করিয়া খোদাদ্রোহী অভিশপ্ত আ'দ জাতির ন্যায় ভূপৃষ্ঠ হইতে নির্মূল করিয়া দিতাম।" মোসমলম শরীফেরই আর এক হাদীছে এবং ২৫৯৯ নং হাদীছে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন— لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل ثمود "আমি তাহাদের আবির্ভাবের সময়কাল পাইলে নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে পাইকারীভাবে হত্যা করিয়া খোদাদ্রোহী অভিশপ্ত ছামূদ জাতির ন্যায় ভূপৃষ্ঠ হইতে নির্মূল করিয়া দিতাম।"

পবিত্র কোরআনে বর্ণিত অভিশপ্ত জাতিনিচয়ের মধ্যে আ'দ ও ছামূদ জাতিদ্বয়ের অভিশাপ ও কলঙ্কময় ইতিহাস অত্যন্ত জঘন্য এবং আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে যে ভাবে সমূলে ধ্বংস করিয়াছেন তাহার কাহিনীও অতি ভয়ঙ্কর। সুতরাং উক্ত জাতিদ্বয়ের তুলনা ও দৃষ্টান্ত উল্লেখ করার মধ্যে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যে পরিমাণ ক্ষেদ ও ক্ষোভের ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাহা অতি সুস্পষ্ট।

২৫৯৬। হাদীছ ঃ—তুইজন লোক ছাহাবী আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি হারুরিয়াহ্ ফের্কা সম্পর্কে হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে কিছু শুনিয়াছেন কি? আবু সায়ীদ (রাঃ) বলিলেন, "হারুরিয়াহ্" নাম উল্লেখ করিয়া হযরত (দঃ) কিছু বলিয়াছেন তাহা আমি জানি না, অবশ্য আমি হযরত নবী (দঃ)কে এই বলিতে শুনিয়াছি—এই উম্মতের মধ্যে এমন একটি

দল দেখা দিবে যাহাদের (বাহ্যিক অতি-ভক্তির রূপ এমন হইবে যে, তাহাদের) নামাযের সম্মুখে তোমাদের (তথা খাঁটী মোসলমান জন সাধারণের) নামাযকে তোমরা তুচ্ছ মনে করিবে। তাহারা কোরআনও তেলাওয়াত করিবে, কিন্তু কোরআন তাহাদের হলকুমের নীচে উতরিবে না। (অর্থাৎ অন্তরে উহার কোন তাছীর থাকিবে না।)

তাহারা দ্বীন-ইসলাম হইতে ছিন্ন ও বহির্ভূত হইবে ঠিক সেইরূপে যেরূপে শিকারের প্রতি সজোরে নিক্ষিপ্ত তীর অতিশয় দ্রুতগতিতে শিকারটিকে ভেদ করিয়া এমনভাবে বাহির হইয়া যায় যে, ঐ জীবটির রক্ত মাংসের কোন চিহ্ন সেই তীরের মধ্যে নজরে আসে না—উহার ফলার মধ্যেও নয়, হাতলের মধ্যেও নয়, হামি বা লৌহ বন্ধনীর মধ্যেও নয়। অবশ্য হাতলের নিম্নভাগে লৌহ বন্ধনীর মধ্যে হয়ত কিছু নিদর্শনের সন্দেহ মাত্র হয়।

ব্যাখ্যা ঃ—"হারুরিয়াহ্" ফের্কা খারেজী ফের্কারই আর এক নাম। কুফা নগরী অঞ্চলে একটি বিশেষ বস্তির নাম "হারুরা"। খারেজী ফের্কার নিয়মতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠা এবং তাহাদের সর্ব্বপ্রথম ও অন্যতম সম্মেলন ঐ বস্তিতে হইয়া ছিল, তাই খারেজী ফের্কাকে এই নামের আখ্যাও দেওয়া হয়।

হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) এস্থলে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত উল্লেখ করিয়াছেন। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, ঐ দলটি এই উম্মতের মধ্যে দেখা দিবে; হযরত (দঃ) এরূপ বলেন নাই যে, ঐ দলটি এই উম্মত হইতে দেখা দিবে বা বাহির হইবে।

ছাহাবী আবু সায়ীদ (রাঃ) "মধ্যে" ও "হইতে" শব্দদ্বয়ের তাৎপর্য্য দ্বারা প্রমাণ করিতেছেন যে, উক্ত দলটি মোসলমানদের অন্তর্ভুক্ত নহে এবং অন্তর্ভুক্ত ছিলও না, বরং ঐ দলের প্রতিষ্ঠাতাগণ হইবে পাক্কা মোনাফেক—যাহাদের অবস্থা এই হয় যে, বস্তুতঃ তাহারা বেদ্বীন কাফের থাকিয়াই বাহ্যতঃ মোসলমানদের সঙ্গে মিশিয়া থাকে। এই ভাবে তাহারা মোসলমানদের মধ্যে থাকে বটে, কিন্তু মোসলমানদের অন্তর্ভুক্ত থাকে না, কাফেরই থাকে। অতঃপর যখন বাহ্যতঃও স্বীয় কার্য্য-কলাপ দ্বারা ইসলাম বহির্ভূত হয় তখন ত তাহাদের কাফের হওয়া প্রকাশই হইয়া পড়ে। মোনাফেকদের এই অবস্থা পবিত্র কোরআনে কি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে—

وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَد دَّخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ

"মোনাফেক দল তোমাদের মজলিসে আসিয়া বলে, আমরা ঈমান আনিলাম; বস্তুতঃ তাহাদের অবস্থা এই যে, তাহারা আসিয়াও ছিল কুফরীর সাথে চলিয়াও যায় কুফরীর সাথে।" অর্থাৎ পূর্ব্বাপর সব সময়ই তাহারা কাফের।

এস্থলেও তদ্রূপই যে, মোসলমানের দলে শামিল হওয়ার পর তাহারা ইসলামকে ছেদন করতঃ উহা হইতে বাহির হইয়া পড়িবে, এর পূর্ব্বে অর্থাৎ যখন মোসলমানদের দলে শামিল হইয়াছিল তখনও তাহারা কাফের ছিল; শুধু বাহ্যতঃ মোনাফেকীরূপে মোসলমানদের সাথে শামিল ছিল।

সার কথা এই যে, পূর্ব্বাপর সব সময়ই ঐ দলের প্রতিষ্ঠাতাগণ ইসলাম হইতে বহির্ভূত, মোসলমানদের সহিত শামিল হওয়া শুধু মোনাফেকীরূপে।

তাহাদের ইসলাম বহির্ভূত হওয়াকে প্রত্যেক হাদীছেই যে দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝান হইয়াছে তাহা অতিশয় তাৎপর্য্য পূর্ণ। দৃষ্টান্তে বলা হইয়াছে যে, সজোরে নিক্ষিপ্ত অতি দ্রুতগামী তীর শিকার প্রাণীকে ভেদ করিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ তীর বাহির হইয়াছে, এবং ঐ প্রাণীটির ভয়ঙ্কর ক্ষতি সাধন করিয়া বাহির হইয়াছে। খারেজী ফের্কা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীও ইহাই যে, তাহারা ইসলাম ও মোসলমানদের হইতে বাহির হইয়া পড়িবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম ও মোসলমানদের ভয়ঙ্কর ক্ষতি সাধন করিয়া বাহির হইবে।

২৫৯৭। হাদীছঃ— আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) একদা হারুরিয়াহ্ ফের্কার উল্লেখ করতঃ বলিলেন, (এই শ্রেণীর ফের্কা সম্পর্কে) হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তাহারা দ্বীন-ইসলাম হইতে তদ্রূপ বহির্ভূত যেরূপ সজোরে নিক্ষিপ্ত দ্রুতগামী তীর লক্ষ্য বস্তুকে ভেদ করিয়া বাহির হইয়া যায়।

২৫৯৮। হাদীছঃ— আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম গণিমত তথা জেহাদে বিজীত মাল লোকদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিতেছিলেন। হঠাৎ বনী-তমীম গোত্রীয় আবদুল্লাহ নামক শীর্ণ কোমর-বিশিষ্ট একটি লোক বলিয়া উঠিল, ইয়া রসুলাল্লাহ! ন্যায় ভাবে বন্টন করুন (আপনি ন্যায় অবলম্বন করেন নাই)। হযরত (দঃ) বলিলেন, তোর কপালে ধ্বংস—আমি ন্যায় অবলম্বন না করিলে আর কে তাহা করিবে? ওমর (রাঃ) উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, হুজুর! আমাকে অনুমতি দিন আমি এই (মোনাফেকের) গর্দ্দান কাটিয়া ফেলি।

হযরত (দঃ) বলিলেন, তাহাকে ছাড়িয়া দাও; ভবিষ্যতে তাহার একটি ইতিহাস সৃষ্টি হইবে—তাহার সমন্বয়ে একটি দল গঠিত হইবে যেই দলের লোকগুলি (বাহ্যিক দৃশ্যে এমন মুছল্লি-মোত্তাকীন দেখাইবে যে,) তাহাদের নামায দৃষ্টে তোমরা তোমাদের নামাযকে তুচ্ছ গণ্য করিবে, তাহাদের রোযা দৃষ্টে তোমরা তোমাদের রোযাকে তুচ্ছ গণ্য করিবে। প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা দ্বীন-ইসলাম হইতে ঐরূপ বহির্ভূত হইবে যেরূপ শিকারের প্রতি সজোরে নিক্ষিপ্ত দ্রুতগামী তীর

শিকারটিকে এমন দ্রুত গতিতে ভেদ করিয়া বাহির হইয়া যায় যে, রক্ত-মাংসের কোন চিহ্ন উহার (কোথাও পাওয়া যায় না। এমনকি গতি সোজা থাকার জন্য গোড়ায় লাগান) পালখেও পাওয়া যায় না, ফলায়ও পাওয়া যায় না, লৌহ বন্ধনীতেও পাওয়া যায় না, হাতলেও পাওয়া যায় না—এত দ্রুত গতিতেই উহা বাহির হইয়াছে যে, প্রাণীটির শরীরে প্রবাহমান রক্ত বা উহার ভুঁড়ি ভরা আবর্জ্জনা ঐ তীরকে মোটেই স্পর্শ করিতে পারে নাই।

ঐ দলের একটি পরিচয় এই যে, দলের মধ্যে একটি লোক হইবে যাহার এক হাত পঙ্গু—শুধু কনুই পর্য্যন্ত থাকিবে এবং ঐ পঙ্গু হাতটির মাথায় স্তনের বোঁটার ন্যায় ঝুলান একটি মাংসখণ্ড থাকিবে। মোসলমানদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টির মূহূর্ত্তে ঐ দলটি আত্মপ্রকাশ করিবে।

হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী আবু সায়ীদ (রাঃ) শপথ করিয়া বলেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি—আমি উক্ত বিবরণ নিজ কানে হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মুখ হইতে শুনিয়াছি এবং ইহাও সাক্ষ্য দিতেছি যে, আলী (রাঃ) (তাঁহার খেলাফৎকালে ঐ দলটির বিরুদ্ধে জেহাদ করিয়া) তাহাদিগকে হত্যা করিয়াছিলেন, আমিও তাঁহার সঙ্গে ছিলাম। নিহত লাশগুলির মধ্য হইতে উক্ত ব্যক্তির লাশ বাহির করা হইয়াছিল যাহা পূর্ণরূপে হযরত নবী (দঃ) কর্ত্তৃক বর্ণিত অবস্থার অনুরূপ ছিল।

ব্যাখ্যা ঃ—মুল হাদীছের অনুবাদে বর্দ্ধিত প্রথম বন্ধনীদ্বয়ের বিষয়বস্তু মোসলেম শরীফের হাদীছে স্পষ্টরূপে উল্লেখ আছে, যদ্দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঐ ব্যক্তি মোনাফেক ছিল, কারণ ওমর (রাঃ) যে, তাহাকে মোনাফেক বলিয়াছেন, হযরত (দঃ) উহা খণ্ডন করেন নাই।

মোসলেম শরীফের হাদীছে আরও উল্লেখ আছে, ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পরে খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)ও ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করার অনুমতি প্রার্থী হইয়াছিলেন। হযরত (দঃ) তাঁহাকেও নিষেধ করিয়াছেন।

আলোচ্য হাদীছে আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) খারেজী ফের্কার পরিচয় ও উহার বাস্তবতা সম্পর্কে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন মোসলেম শরীফে একাধিক হাদীছে স্বয়ং আলী (রাঃ) হইতেও ঐরূপ বয়ান উল্লেখ রহিয়াছে। আলী (রাঃ) বয়ান করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) উক্ত দলটির পরিচয় বর্ণনায় বলিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে একটি লোক হইবে কৃষ্ণ বর্ণের, তাহার একটি হাত পঙ্গু—কনুইর নিম্ন অংশ বিহীন, উহার অগ্র ভাগ স্তনের বোটার ন্যায় হইবে, তাহার উপর কতিপয় সাদা লোম থাকিবে।

হারুরিয়াহ্ বা খারেজী ফের্কার আবির্ভাব হইলে আলী (রাঃ) তাহাদের বিরুদ্ধে এক রক্ত ক্ষয়ী যুদ্ধ পরিচালনা করিলেন। সেই যুদ্ধে আলী রাজিয়াল্লাহ তায়ালা আনহুর পক্ষের মাত্র দুইজন শহীদ হইয়াছিলেন। আর খারেজী দলের এত অধিক সংখ্যক লোক নিহত হইয়াছিল যে, তাহাদের মৃতদেহের স্তূপ জমিয়া গিয়াছিল। যুদ্ধ শেষে খলীফা আলী (রাঃ) বলিলেন, পঙ্গু হাতওয়ালাকে তালাশ করিয়া বাহির কর, কিন্তু ঐরূপ কোন লাশ পাওয়া গেল না। তখন আলী (রাঃ) বলিলেন, এই দলের পরিচয়ে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) মিথ্যা বলেন নাই, আমিও মিথ্যা বর্ণনা করি নাই, অতএব ভালরূপে তালাশ কর। এই বলিয়া স্বয়ং আলী (রাঃ) লোকদেরকে সঙ্গে লইয়া উহার খোঁজ করিতে লাগিলেন। অবশেষে একটি পতিত জায়গায় কতকগুলি লাশের স্তূপ দেখা গেল। আলী (রাঃ) ঐ লাশগুলি স্থানান্তরের আদেশ করিলেন। ঐরূপ করা হইলে সমস্ত লাশের তলদেশে সেই পঙ্গু হাতওয়ালার লাশ পাওয়া গেল। তখন খলীফা আলী (রাঃ) তকবীর ধ্বনী দিয়া বলিলেন, (পরিচয় বর্ণনায়—) আল্লাহ সত্য বলিয়াছেন এবং রসুল (দঃ) তাহা সঠিকরূপে পৌঁছাইয়াছেন।

প্রকাশ থাকে যে, হিজরী ৩৮ সনে "নহ্‌রওয়ান" স্থানে আলী (রাঃ) খারেজীদের বিরুদ্ধে এই অভিযান চালাইয়াছিলেন।

২৫৯৯। হাদীছ ঃ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—আলী (রাঃ) ইয়ামান দেশ হইতে (ওয়াসিলকৃত বাইতুল-মালের প্রাপ্য) কিছু পরিমাণ অপরিশোধিত স্বর্ণ চামড়ার থলি ভরিয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট পাঠাইলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) ঐ মাল সম্পূর্ণটাই চার জন লোকের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিয়া দিলেন। একজন ছাহাবী এই সম্পর্কে উক্তি করিলেন যে, আমরা এই মাল পাইবার অধিক যোগ্য ছিলাম। এই উক্তির সংবাদ নবী (দঃ) জ্ঞাত হইলেন এবং (লোকদিগকে একত্রিত করিয়া) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে নির্ভরযোগ্য গণ্য করিয়াছেন; সকাল-বিকাল আমার নিকট (তাঁহার তরফ হইতে) ওহী আসিয়া থাকে। তোমরা আমাকে নির্ভরযোগ্য গণ্য কর না কি?

এই সময় এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান হইল—যাহার চোখদ্বয় গভীরস্থ ছিল, গণ্ডদ্বয় স্ফীত ছিল, ললাট উঁচু ছিল, দাড়ি ঘন ও মাথা মুড়া ছিল এবং পরিধেয় বস্ত্র গোছের মধ্যবর্ত্তী ছিল। সে (ভীষণ বেয়াদবী করিয়া) বলিল—ইয়া রসুলাল্লাহ! খোদাকে ভয় করুন। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে বলিলেন, পোড়া কপাল তোর! দুনিয়ার বুকে আমি কি খোদাকে সর্ব্বাধিক ভয় করিয়া থাকি না?

অতঃপর ঐ লোকটি তথা হইতে সরিয়া পড়িল। খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! ঐ লোকটার মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া দেই। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, সে ত বোধ হয়—নামায পড়ে। খালেদ (রাঃ) বলিলেন, কত নামাযী শুধু মুখে ইসলামের দাবী করে যাহা অন্তরে নাই। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, অন্তর ছেদ করিয়া ভিতর ভেদ করিয়া দেখার জন্য আমাকে আদেশ করা হয় নাই। অর্থাৎ বাহ্যিক ইসলামের দাবীর দ্বারা জাগতিক নিরাপত্তার অধিকার লাভ হইয়া যায়। মোনাফেক দলের অবস্থা তাহাই; এই ব্যক্তিও মোনাফেকই ছিল।

লোকটি তথা হইতে সরিয়া পড়িলে রসুলুল্লাহ (দঃ) দুর হইতে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তাহারই সম্প্রদায়ে এমন দলের আবির্ভাব হইবে যাহারা মধুর স্বরে কোরআন তেলাওত করিবে, কিন্তু তাহাদের অন্তরে উহার কোন তাছীর হইবে না। তাহারা দ্বীন-ইসলাম হইতে এইরূপ বহির্ভূত হইবে যেরূপ সজোরে নিক্ষিপ্ত দ্রুতগামী তীর শিকারকে ভেদ করিয়া পূর্ণ রূপে বাহির হইয়া যায়।

মনে পড়ে—রসুলুল্লাহ (দঃ) ইহাও বলিয়াছেন, আমি যদি ঐ দলের সময়কাল পাইতাম তবে আমি তাহাদিগকে ব্যাপক হারে হত্যা করিতাম। যেরূপে আল্লাহ ব্যাপক আজাব নাযেল করিয়া ছমূদ জাতিকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়াছেন। (৬২৪ পৃঃ)

২৬০০। হাদীছ ঃ—সাহ্‌ল ইবনে হোনায়ফ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি—তিনি ইরাকের দিকে হাত তুলিয়া ইশারা করতঃ বলিলেন, ঐ অঞ্চল হইতে এমন একটি দলের আবির্ভাব হইবে যাহারা কোরআন তেলাওয়াত করিবে, কিন্তু কোরআন তাহাদের হলকুমের নীচে উতরিবে না। তাহারা দ্বীন-ইসলাম হইতে বহির্ভূত হইবে যেরূপ সজোরে নিক্ষিপ্ত তীর শিকার প্রাণীকে ছেদ করিয়া বাহির হইয়া পড়ে।

ব্যাখ্যা ঃ— হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সতর্কতাপূর্ণ ভবিষ্যৎবাণী পূর্ণরূপে অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হইয়াছিল। ভবিষ্যদ্বাণীর মূল উদ্দেশ্য খারেজী ফের্কার দলটিই ছিল যাহাদিগকে হারুরিয়াও বলা হইত। হযরত (দঃ) কর্তৃক বর্ণিত উক্ত দলের সমুদয় পরিচয় ও নিদর্শনই খারেজী ফের্কার মধ্যে বাস্তবায়িত দেখা গিয়াছে। এই ফের্কার মূল কেন্দ্র ছিল ইরাকস্থিত কুফা এলাকা। এই এলাকায়ই "হারুরা" নামক বস্তিতে তাহাদের সর্ব্বপ্রথম ও অন্যতম সম্মেলন ৩৭ হিজরী সনে অনুষ্ঠিত হইয়া ছিল; উক্ত সম্মেলনেই তাহারা সুসঙ্গবদ্ধ দলরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।

২৬০১। হাদীছ ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামত তথা মহাপ্রলয় আসিবে না যাবৎ না পরস্পর যুদ্ধে জড়িত হইয়া পড়ে এমন দুইটি দল যাহাদের উভয়ের দাবী ও উদ্দেশ্য একই।

(উক্ত দল দুইটির বিবাদের সুযোগে আর একটি দল আত্মপ্রকাশ করিবে। যে দলটি দ্বীন-ইসলাম বহির্ভূত হইবে। এই দলটিকে প্রথমোক্ত দলদ্বয় হইতে যে দলের লোকেরা হত্যা ও নিধন করিবে সেই দল তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী অপেক্ষা অধিক নিকটবর্ত্তী হইবে হক্ ও ন্যায়ের।)

ব্যাখ্যা ঃ—বোখারী শরীফের শরাহ্ ফত্‌হুলবারী কেতাব ১২—২৫৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত বন্ধনীর মধ্যবর্ত্তী বিষয়টি আলোচ্য হাদীছেরই অংশরূপে উদ্ধৃত আছে। এই হাদীছের পূর্ণ বিবরণে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ রহিয়াছে—

একটি হইল খারেজী ফের্কার সম্যক পরিচয়ের ভবিষ্যদ্বাণী যাহা অক্ষরে অক্ষরে তাহাদের উপর বর্ত্তিয়াছে। খারেজী ফের্কার মুল ব্যক্তিবর্গ যথা—আবদুল্লাহ ইবনে ছাবা, গাফেকী ইবনে হরব ইত্যাদি লোকগণ প্রকৃত প্রস্তাবে ঈমানদার ছিল না, তাহারা ছিল মোনাফেক। খলীফা ওসমান রাজিয়াল্লাহ তায়ালা আনহুর খেলাফৎ কালে তাহারা গা-ঢাকা দিয়া মোসলমানদের দলভুক্ত হইয়া পড়ে এবং মোসলমানদের শান্তি ও শৃঙ্খলার মূল উৎস নেজামে খেলাফৎ তথা সুশৃঙ্খল সুসঙ্গবদ্ধ সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়মতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার উপর কুঠারাঘাত করার চেষ্টায় লাগিয়া যায়। সেমতে তাহারা খলীফা ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিরুদ্ধে তাঁহার ব্যক্তিগত অবাস্তব কুৎসা এবং তাঁহার শাসন-কার্য্য পরিচালনায় অলিক ও মনগড়া দুর্ণাম ছড়াইতে থাকে। তাহাদের ষড়যন্ত্র ও কলা-কৌশল শেষ পর্য্যন্ত সফলতা লাভ করে। এমনকি খলীফা ওসমান (রাঃ) তাহাদের সৃষ্ট ষড়যন্ত্র ও বিশৃঙ্খলার কবলে পতিত হইয়া তাহাদেরই দলের হাতে প্রকাশ্য দিবালোকে নিজ গৃহে শহীদ হন।

খলীফা ওসমান রাজিয়াল্লাহু আনহুর শহীদ হওয়ার পর ঐ মোনাফেক ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী দল এই সত্য ভালরূপেই উপলব্ধি করিতে লাগিল যে, তাহাদের মধ্য হইতে কেহ সরাসরি খলীফা হইতে চাহিলে তাহাকে মোসলেম জাতি কখনও গ্রহণ করিবে না; তাই তাহারা আর এক ষড়যন্ত্র করিল। পরবর্ত্তী খলীফা আলী (রাঃ) নির্ব্বাচিত হওয়া সুনিশ্চিত ছিল; তখন তাঁহার ব্যক্তিত্বই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল। কিন্তু সেই ব্যাপারে তাহাদের জবরদস্তিমূলক ও স্বার্থজনিত মোড়লগিরী এবং ষড়যন্ত্রের দ্বারা শাসনযন্ত্রে তাহাদের বড় বড় পদ দখল করিয়া নেওয়ার দরুন ভাল কাজে মন্দ পরিণতি রূপে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হইল যাহার ফলে নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবেই ছাহাবা কেরামের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হইল। আলী (রাঃ) এবং তাঁহার সঙ্গে এক জামাত ভাবিতেছিলেন যে, অসৎ লোকদের দ্বারা যে ঘটনা ঘটিয়াছে উহার জঘন্যতা ত সুস্পষ্ট, কিন্তু যথাসত্বর শাসনকর্ত্তা খলীফার স্থান পূর্ণ করতঃ

খেলাফত প্রতিষ্ঠার দ্বারাই বিশৃঙ্খলা প্রশমিত হইতে পারে। আলী (রাঃ) খলীফা নির্দ্ধারিত হইয়াছেন; অবিলম্বে তাঁহার খেলাফতকে স্বীকৃতি দিয়া তাঁহাকে শক্তিশালী করা হউক। অপর পক্ষে তাল্‌হা (রাঃ), যোবায়ের (রাঃ), আয়েশা (রাঃ), মোয়াবিয়া (রাঃ) এবং তাঁহাদের সঙ্গে এক জামাত বলিতেছিলেন—অসৎ লোকদের ষড়যন্ত্র ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে নেজামে-খেলাফৎ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। অতঃপর মদিনায় তাহাদেরই প্রাধান্য ও বিদ্রোহ জনিত ঘোলাটে পরিস্থিতিতে এবং হজ্জের দরুন বহু সংখ্যক বিশিষ্ট ছাহাবীবর্গের অনুপস্থিতিতে খেলাফত নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এবং উহার কর্ম্মকর্ত্তা দলের পুরো ভাগ দখল করিয়া রাখিয়াছে ঐ অসৎ লোক দল যাহারা ইসলামের শক্তির উৎস নেজামে-খেলাফত ধ্বংস করার পরিকল্পনা লইয়া খলীফা ওসমান (রাঃ)কে হত্যা করিয়াছে। তাহারা শক্তিশালী হইলে ত আলী (রাঃ)কেও তাহারা হত্যা করিয়া ফেলিতে পারে। এই কাঠামোর খেলাফত দ্বারা ঐ ষড়যন্ত্রকারীদের মূলোচ্ছেদ সুষ্ঠুরূপে হইতে পারিবে না। কারণ, ষড়যন্ত্রকারীরা এই কাঠামোতে এমন ব্যবস্থা রাখার প্রয়াস পাইয়াছে যাহাতে তাঁহাদেরে শায়েস্তা করা যাইবে না। সুতরাং উক্ত কাঠামোর খেলাফতের স্থলে নেতৃস্থানীয় সকল মোসলমানদের পরামর্শে গঠিত কাঠামোর খেলাফতের প্রয়োজন।

এই পক্ষের বিরোধিতার মূল লক্ষ্য ছিল—খলীফা হত্যাকারী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত দল কর্ত্তৃক খেলাফত কাঠামোতে বড় বড় পদ ও স্থান দখল করা। খেলাফত কাঠামো হইতে এই দস্যুদলের বিতাড়নই ছিল তাঁহাদের মূল উদ্দেশ্য। তাই তাঁহারা উহাদের শাস্তির দাবী লইয়া দাঁড়াইলেন।

আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেলাফত-কাঠামোতে সন্ত্রাসবাদী দল তাঁহার অভিপ্রায়ের বিপরীত জবরদস্তিমূলকভাবে এবং গোপন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে অধিকাংশ ক্ষমতা হস্তগত করিয়া রাখিয়া ছিল। তাই তালহা, যোবায়ের, মোয়াবিয়া ও আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষের ভয় হইতে ছিল যে, সন্ত্রাসবাদী দস্যু দলের শাস্তি এবং বিতাড়নের পূর্ব্বে আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেলাফতকে স্বীকৃতি দিলে এই খেলাফত-কাঠামোতে বড় বড় পদের দখলদার সন্ত্রাসবাদী খেলাফত ধ্বংসকারীদের অধিকতর সুবিধা হইয়া যাইবে এবং তাহাদের শক্তিশালী হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। খেলাফত-কাঠামোতে ঐ দস্যুদলের দখল অবস্থায় আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেলাফতের স্বীকৃতি দেওয়ার অর্থ তাঁহারা বুঝিতেছিলেন—খেলাফত ধ্বংসযজ্ঞের নীরব দর্শকের ভূমিকা অবলম্বন করা। কাজেই তাঁহারা আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেলাফতের স্বীকৃতির পূর্ব্বে হত্যাকারী সন্ত্রাসবাদীদের শাস্তির দাবীর উপর দৃঢ় থাকিলেন।

সার কথা—আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ইচ্ছা এই ছিল যে, প্রথমে সর্ব্বস্বীকৃত খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হইয়া দেশে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসুক, তারপর খলীফা হত্যাকারীদের বিচার হইবে। পক্ষান্তরে তালহা, যোবায়ের, আয়েশা ও মোয়াবিয়া (রাঃ)গণের ইচ্ছা ছিল যে, প্রথমে হত্যাকারীদের বিচার করিলেই ষড়যন্ত্রকারীরা ধরা পড়িবে ফলে দেশে শান্তি ফিরিয়া আসিবে এবং নেজামে-খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা সহজ সাধ্য হইবে।

এই নীতিগত মতবিরোধটি খুবই স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পক্ষে ঐ অসৎ কুচক্রী লোকগণ প্রাধান্যের অধিকারী ছিল; তাহারা সর্ব্বদা ষড়যন্ত্র চালাইয়া যাইতে লাগিল। তাহারা অপর পক্ষের উপর আলী (রাঃ) দ্বারা চাপ প্রয়োগ করাইতে আরম্ভ করিল। অপর পক্ষ নব প্রতিষ্ঠিত খেলাফত-কাঠামোর সামরিক ও বেসামরিক উচ্চ পদসমূহের গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় পদে ঐ অসৎ লোকদের দখল দেখিতেছিলেন এবং তাঁহাদের যে ধারণা ছিল—এই খেলাফত কাঠামো দ্বারা মূল উদ্দেশ্য হাসিল হইবে না, কারণ ষড়যন্ত্রকারী মূল অপরাধীরা এই খেলাফত-কাঠামোতে পদাধিকার লাভের প্রয়াস পাইবে। সেই ধারণা বাস্তবায়িত হইতে দেখিয়া তাঁহারা তাঁহাদের নীতিতে অধিক মজবুত হইতে লাগিলেন। এই সুযোগে গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী অসৎ কুচক্রী লোকগণ আলী (রাঃ)কে বাধ্য করিল বিপক্ষদলের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণে। এইরূপে ষড়যন্ত্রকারী কুচক্রী অসৎ লোকগুলি ছাহাবা কেরামের নিছক নীতিগত বিরোধটাকে ধাপে ধাপে যুদ্ধে পরিণত করিতে প্রয়াস পাইল। সেই অবস্থায়ও প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ছাহাবা কেরামের উভয় পক্ষ বিরোধ নিষ্পত্তি করিয়া এক হইয়া যাওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা ফলবতী হওয়ার মুহূর্ত্তে ঐ অসৎ কুচক্রী লোকগণ উহাকে বানচাল করিয়া দিয়াছে, যাহার বিবরণ সুদীর্ঘ ও অতিশয় হৃদয় বিদারক। উহারই আলোচনা করা হইবে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের পরিশিষ্টে।

অসৎ লোকদের ষড়যন্ত্রে নীতিগত বিরোধ সামরিক বিরোধে পরিণত হওয়ার পর ঘটনা প্রবাহে আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পক্ষ এবং মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পক্ষ ছিফ্‌ফীনের রণাঙ্গনে যুদ্ধরত ছিল। এই সময় বিশিষ্ট ছাহাবী আম্‌র ইবনুল আ'ছ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রচেষ্টায় উভয় পক্ষের মধ্যে আপোষ মীমাংসার ব্যবস্থা হইয়াছিল—ঐ সময় পর্য্যন্ত উক্ত দুষ্কৃতিকারীরা সাধারণভাবে আলী (রাঃ)এর পক্ষে গা-ঢাকা দিয়াছিল। এই আপোষ-মীমাংসার ব্যবস্থা-মুহূর্ত্তে তাহারা আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পক্ষ হইতেও বাহির হইয়া গেল। এত দিন তাহারা শুধু ওসমান (রাঃ) এবং তাঁহার পর তাল্‌হা (রাঃ), যোবায়ের (রাঃ), আয়েশা (রাঃ), মোয়াবিয়া (রাঃ) এবং তাঁহাদের পক্ষের ছাহাবীগণকে

গালি-গালাজ করিত, খারাব বলিত। এখন তাহারা আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিরুদ্ধেও ঐ পন্থা অবলম্বন করিল এবং ইসলামের সাধারণ আকিদা ও বিধানের বরখেলাফ কতিপয় আকিদা ও মতবাদ অবলম্বন পূর্ব্বক উভয় পক্ষ ছাহাবা কেরামের বিরুদ্ধে একটি তৃতীয় দল সৃষ্টি করিয়া ইরাক অঞ্চলের কুফা এলাকাস্থিত "হারুরা" নামক স্থানে প্রায় বার হাজার লোকের সম্মেলনরূপে তাহারা আত্মপ্রকাশ করিল। এবং কুফা-বছরা তথা ইরাকের মধ্যে তাহাদের কেন্দ্র কায়েম করিয়া তাহাদের ভ্রষ্ট মতবাদ ও উহার কার্য্য চালাইয়া যাইতে লাগিল। ঐ সময় তাহাদের বিরুদ্ধে আলী রাজিয়াল্লাহ তায়ালা আনহুর দলই রুখিয়া দাঁড়ায় এবং আলী (রাঃ) তাহাদের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। এমনকি ৩৮ হিজরী সনে "নাহ্‌রওয়ান" নামক স্থানে ভীষণ যুদ্ধে আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পক্ষ তাহাদের বহু সংখ্যক সদস্য হত্যা করিতে সমর্থ হয়। আলোচ্য হাদীছে উক্ত খারেজী ফের্কার পরিচয়ে ভবিষ্যদ্বাণীরূপে এই সব ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

আলী (রাঃ) এবং তাল্‌হা, যোবায়ের, আয়েশা ও মোয়াবিয়া (রাঃ) এই দুই পক্ষের মধ্যে খলীফা নির্ব্বাচনে নীতিগত বিরোধ সৃষ্টি হইয়া ছিল, কিন্তু উভয় দল ইসলামের গণ্ডিভুক্ত, বরং মোসলমানদের শীর্ষস্থানীয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের দাবী এবং উদ্দেশ্যও একই ছিল—মোসলমানদের শক্তি, শান্তি ও শৃঙ্খলার হৃত উৎস সুষ্ঠু নেজামে-খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা। দুষ্কৃতিকারীরা উভয় দলের সেই নীতিগত বিরোধের মূহূর্ত্তে দল গঠন করে এবং ইরাকস্থ কুফা এলাকায় ভিন্ন দলরূপে আত্মপ্রকাশ করে; তাহারাই ছিল আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত তৃতীয় দল।

আলোচ্য হাদীছের দ্বিতীয় গুরুত্বপুর্ণ বিষয়টি হইল ছাহাবা কেরামের বিরোধমান পক্ষদ্বয়ের কার্য্যক্রমের সুষ্ঠুতা নির্ণয়ের ভবিষ্যদ্বাণী। প্রথমতঃ হযরত (দঃ) উভয় পক্ষকে দাবী ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়া সমপর্য্যায়ের ঘোষনা করিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবেও তাহাই ছিল—উভয়ের দাবী ও উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম এবং মোসলমানদের শক্তি, শান্তি ও সুশৃঙ্খলার হৃত উৎস সুষ্ঠু নেজামে-খেলাফৎ পুনরুদ্ধার করা।* অতঃপর হযরত (দঃ) উভয় পক্ষের চুলচেরা মাননির্ণয়ের নিদর্শনেরও ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন যাহার বিস্তারিত বিবরণ এই—

* তাল্‌হা (রাঃ), যোবায়ের (রাঃ), আয়েশা (রাঃ), মোয়াবিয়া (রাঃ) এবং তাঁহাদের পক্ষ যে, ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হত্যাকারীদের বিচার দাবী করিতেছিলেন, উহা একটি বাহ্যিক শ্লোগান ছিল মাত্র এবং মূল দাবী উদ্ধারের পথ হইতে বাধা ও প্রতিবন্ধক অপসারণ ছিল মাত্র। তাঁহাদের আসল দাবী ও উদ্দেশ্য ছিল সুষ্ঠু নেজামে-খেলাফৎ প্রতিষ্ঠা করা যাহার মধ্যে ষড়যন্ত্রকারী মোনাফেক অসৎ লোকদের কোন হাত না থাকে, বরং তাহারা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

ছেরাতে মোস্তাকিম তথা প্রকৃত হক্ ও ন্যায় পর্য্যায়টা মানুষের কার্য্যাবলীর প্রতি ক্ষেত্রেই আছে এবং উহা একটি সুনির্দ্দিষ্ট সীমিত আকারের সূক্ষ্ম পর্য্যায়। ছোট-বড় সর্ব্ব-প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতিই উহার পরিপন্থী। অথচ নিষ্পাপ পয়গাম্বরগণ ব্যতীত অন্য কেহই সম্পুর্ণরূপে ত্রুটি-বিচ্যুতি মুক্ত হইতে পারে না। স্বয়ং হযরত (দঃ) এক হাদীছে বলিয়াছেন—استقيموا ولن تحصوا "অর্থাৎ তোমরা পূর্ণ মাত্রায় ছেরাতে-মোছতাকীমের উপর থাকিবার জন্য অবিরাম চেষ্টা চালাইয়া যাইবে, অবশ্য এই চেষ্টার সফলতায় পূর্ণতা লাভ তোমাদের সাধ্যে জুটিবে না; তথাপি তোমরা হাত-পা ছাড়িয়া দিবে না—আজীবন এই চেষ্টায় রত থাকিবে; এই চেষ্টায় রত থাকাই তোমাদের জীবনের সাফল্য।"

মানুষ সম্পূর্ণ ত্রুটি-বিচ্যুতি মুক্ত থাকিতে পারে না বলিয়াই হেদায়েত তথা সৎ পথের সীমা কিছুটা সম্প্রসারিত করা হইয়াছে যে, হক্ ও ন্যায়ের নিকটবর্ত্তী থাকাকে হেদায়েত গণ্য করা হইয়াছে। হযরত (দঃ) উপরোক্ত হাদীছেই বলিয়াছেন—ولكن سددوا وقاربوا অর্থাৎ দ্বীন-ইসলাম তথা ছেরাতে-মোছতাকীমের সমুদয় পর্য্যায়কে তুমি জয় করিয়া ফেলিবে ইহাত তোমার সাধ্যে জুটিবে না, কিন্তু তোমাকে স্বীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি দুর করিবার চেষ্টায় লাগিয়া থাকিতে হইবে এবং সর্ব্বাত্মক চেষ্টায় যথাসাধ্য হক্ ও ন্যায়ের ধারে ধারে, নিকটে নিকটে থাকিয়া চলিতে হইবে। এই নিকটবর্ত্তিতায় যে যত অগ্রে হইতে পারিবে তাহার মর্য্যাদা ততটুকু বেশী হইবে। পক্ষান্তরে হক্ ও ন্যায় হইতে দুরে সরিয়া পড়াই হইল "দ্বালালত" —গোমরাহী বা ভ্রষ্টতা।

আলোচ্য হাদীছে হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, উভয় পক্ষের যে পক্ষ তৃতীয় দলটিকে হত্যা ও নিধন করিবে সেই পক্ষ হক্ ও ন্যায়ের অধিক নিকটবর্ত্তী তথা অধিক হেদায়েত ও সৎপথের অধিকারী গণ্য হইবে।

এস্থলে একটি বিষয় বিশেষ লক্ষ্যণীয় যে, ঐ দল নিধনকারী পক্ষকে হক্ ও ন্যায়ের নিকটবর্ত্তী বলা হয় নাই যদ্দ্বারা অপর পক্ষ হক্ ও ন্যায় হইতে দুরে তথা ভ্রষ্টতা ও গোমরাহীওয়ালা সাব্যস্ত হইতে পারে। বরং ঐ দল নিধনকারী পক্ষকে হক্ ও ন্যায়ের অধিক নিকটবর্ত্তী বলা হইয়াছে, যদ্দ্বারা অপর পক্ষও হক্ ও ন্যায়ের মূল নিকটবর্ত্তীতায় শামিল বলিয়া সাব্যস্ত হয়। সুতরাং এই পক্ষও হেদায়েত বা সৎ পথের আওতাভুক্ত প্রমাণিত হইল। কারণ, হক ও ন্যায়ের কম বা বেশ নিকটবর্ত্তীতা—উভয়ই হেদায়েত ও সৎপথ।

(تطهير الجنان واللسان — فى حاشية الصواعق المحرقة)

আহ্লে-সুন্নত-ওয়াল-জামাতের আকিদা ইহাই যে, উক্ত উভয় পক্ষই হেদায়েতের উপর অধিষ্ঠিত ছিল, কোন পক্ষই ভ্রষ্ট ছিল না। ভ্রষ্ট ও গোমরাহ্ হইল ঐ তৃতীয়

দলটি যাহারা উক্ত উভয় পক্ষ হইতে ছিন্ন ও ভিন্ন ছিল; যাহাদের হত্যা ও নিধনের প্রতি রসুলুল্লাহ (দঃ) সকলকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন।

আলোচ্য হাদীছে উল্লেখিত পক্ষদ্বয় হইল আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পক্ষ এবং অপর দিকে আয়েশা (রাঃ), তাল্‌হা (রাঃ), যোবায়ের (রাঃ) এবং মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পক্ষ। এই পক্ষদ্বয়ের প্রথম পক্ষ তথা আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পক্ষ উক্ত তৃতীয় দলটির বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রথম ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন—৩৮ হিজরী সনে সামরিক অভিযান চালাইয়া নাহ্‌রওয়ান যুদ্ধে তাহাদের বিপুল সংখ্যাকে হত্যা করিয়াছিলেন। অতঃপর তাহাদের বাহ্যিক তৎপরতা কমিয়া গেলেও তাহারা গোপন ষড়যন্ত্র করিয়া চলিতেছিল, যাহার ফলে তাহাদেরই এক ঘাতকের হাতে আলী (রাঃ) শহীদ হইয়াছিলেন। তাঁহার পর মোয়াবিয়া (রাঃ) এই খারেজী দলকে হত্যা ও পর্য্যুদস্ত করেন। সুতরাং এই হাদীছে বর্ণিত মর্তবার অধিকারী মোয়াবিয়া (রাঃ)ও বটেন। (تطهير الجنان و اللسان)
বিস্তারিত বিবরণ এই—

আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর শহীদ হওয়ার পর তাঁহার পক্ষের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন হাসান (রাঃ)। এই সময় আবার সেই আবদুল্লাহ ইবনে ছাবা ইত্যাদি কুচক্রী মোনাফেক ও অসৎ লোকদের ষড়যন্ত্রকারী সন্ত্রাসবাদী দলটি যাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে পূর্ব্বালোচিত উভয় পক্ষ হইতে ছিন্ন ও ভিন্ন ছিল তাহারা গা-ঢাকা দিয়া হাসান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পক্ষে মিশিয়া পড়ে এবং তাহাদের চিরাচরিত ষড়যন্ত্রের দ্বারা হাসান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের ময়দান পর্য্যন্ত টানিয়া আনে। কিন্তু মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর অকৃত্রিম আগ্রহ ও প্রচেষ্টা এবং হাসান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিচক্ষণতার ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও অভিযানের পরিবর্ত্তে স্থায়ী মীমাংসা হয়।

দ্বন্দ্ব ও কলহের পরিবর্ত্তে মীমাংসার প্রতি মোয়াবিয়া (রাঃ)এর অকৃত্রিম আগ্রহ ও হাসান (রাঃ)এর প্রচেষ্টা কিরূপ ছিল বোখারী শরীফ ৩৭৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত একটি হাদীছে উহার কিঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যায়। হাদীছটি এই—

২৬০২। হাদীছঃ—বিশিষ্ট তাবেয়ী হাসান বছরী (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আলী-পুত্র হাসান (রাঃ) পর্ব্বত মালার ন্যায় বৃহৎ সৈন্য দল লইয়া মোয়াবিয়ার দিকে যাত্রা করিলেন। তখন আম্‌র ইবনুল আ'ছ (রাঃ) মোয়াবিয়া (রাঃ)কে (তাঁহার মনোবল দৃঢ় রাখার জন্য) বলিলেন, (আমাদের পক্ষেও) এত বড় বিশাল সৈন্য বাহিনী দেখিতেছি, যাহাকে পরাস্ত করা যাইবে না, সে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করিয়া শেষ করিবে।

মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ইচ্ছা আমূর ইবনুল আ'ছ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর কথা অপেক্ষা উত্তম ছিল (—তাঁহার ইচ্ছা ছিল সংঘর্ষ এড়াইয়া মীমাংসা করা)। সেমতে মোয়াবিয়া (রাঃ) বলিলেন, আমার দল অপর দলকে এবং অপর দল আমার দলকে হত্যা করিলে উভয় পক্ষের মোসলমানদের তুরাবস্থার উপায় কি হইবে? তাহাদের অনাথ নিরাশ্রয় বিধবা-এতীমদের উপায় কি হইবে?

অতঃপর মোয়াবিয়া (রাঃ) কোরায়েশ বংশের আবতুর রহমান ইবনে সামুরা ও আবতুল্লাহ ইবনে আমের—এই তুই ব্যক্তিকে হাসান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট পাঠাইলেন। তাঁহাদিগকে বলিলেন, আপনারা তাঁহার নিকট যাইয়া মীমাংসার প্রস্তাব পেশ করুন, মীমাংসার জন্য যাহা কিছু বলিতে হয় বলুন; আপনারা তাঁহাকে মীমাংসার জন্য অনুরোধ করুন।

তাঁহারা উভয়ে হাসান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট আসিলেন, তাঁহার সঙ্গে আলোচনা করিলেন, মীমাংসার কথা বলিলেন এবং উভয়ে তাঁহাকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিলেন।

হাসান (রাঃ) বলিলেন, আমরা (দানবীর) আবতুল মোত্তালেবের গোষ্টি—টাকা-পয়সা নাড়া-চাড়া করায় (ও দান-খয়রাত করায়) আমরা অভ্যস্ত। মোসলমান সম্প্রদায় বর্ত্তমানে গৃহ-যুদ্ধে রক্তাক্ত অবস্থায় রহিয়াছে (তাহাদের জন্য বিপুল টাকা-পয়সার দান-খয়রাত আবশ্যক)।

মীমাংসার জন্য আগত ব্যক্তিদ্বয় বলিলেন, (গৃহ যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদেরে আপনার ইচ্ছামতে সাহায্যার্থে) মোয়াবিয়া (রাঃ) এত এত ধন-সম্পদ আপনার বরাবরে পেশ করার অঙ্গীকার করিয়াছেন, আপনাকে অনুরোধ করিয়াছেন এবং আপনার নিকট মীমাংসা-ভিক্ষা চাহিয়াছেন।

হাসান (রাঃ) বলিলেন, এই অঙ্গীকার বাস্তবায়নের দায়িত্ব কে নিবে? ঐ ব্যক্তিদ্বয় বলিলেন, উহার সর্ব্বময় দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করিতেছি। এতদ্ভিন্ন হাসান (রাঃ) যত রকম শর্ত্তই উল্লেখ করিয়াছেন ঐ ব্যক্তিদ্বয় উহার প্রত্যেকটির জন্য মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পক্ষ হইতে জামিন হইয়াছেন।

অবশেষে হাসান (রাঃ) মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সঙ্গে স্থায়ী ও পুর্ণাঙ্গ মীমাংসা সম্পন্ন করিলেন।

মূল হাদীছ বর্ণনাকারী তাবেয়ী হাসান বছরী (রঃ) ইমাম হাসান (রাঃ) কর্ত্তৃক উক্ত মীমাংসা সম্পাদনকে লক্ষ্য করিয়া বলেন—

"আমি ছাহাবী আবু বকরা (রাঃ) হইতে শুনিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন, আমি হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)কে দেখিয়াছি—তিনি মিম্বারে উপবিষ্ট ছিলেন এবং আলী-

পুত্র শিশু হাসান (রাঃ) হযরতের পার্শ্বে বসা ছিলেন; ঐ অবস্থায় হযরত (দঃ) একবার লোকদের প্রতি আর একবার বালক হাসানের প্রতি তাকাইয়া বলিতেছিলেন, আমার এই পৌত্র মোসলমানদের সর্দ্দার। আল্লাহ তায়ালা তাঁহার দ্বারা মোসলমানদের দুইটি বৃহৎ বৃহৎ দলের মধ্যে মীমাংসা করাইবেন।”

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ— তাবেয়ী হাসান বছরী (রঃ) যে তথ্যের উল্লেখ উল্লেখ করিয়াছেন যে, হাসান (রাঃ) কর্ত্তৃক উক্ত মীমাংসা সম্পাদন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একটি ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তবায়ন ছিল স্বয়ং হাসান (রাঃ)ও সেই তথ্যের উল্লেখ করিয়া থাকিতেন।

বর্ণিত আছে—হাসান (রাঃ) উক্ত মীমাংসা সম্পন্ন করাকালে তাঁহার পক্ষের কিছু লোক তাঁহাকে বলিল, আপনি আমাদের মুখ কালা করিয়া দিয়াছেন। তদুত্তরে হাসান (রাঃ) উল্লেখিত ভবিষ্যদ্বাণীর হাদীছটি পেশ করিয়া বলিলেন, আমি এই ভবিষ্যদ্বাণীকে অবশ্যই বাস্তবায়িত করিব—আমি মীমাংসাকে চরম পর্য্যায়ে পৌঁছাইবই পৌঁছাইব। (ফয়জুল বারী, ৩—৩৯৮)

এই মীমাংসার সময়ও কুচক্রী দল নিজেদের বিপদ আশঙ্কা করিয়া মীমাংসাকে বানচাল করার চেষ্টায় মাতিয়া উঠে, এমনকি শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের মুখুস ফেলিয়া হাসান (রাঃ)কে কাফের বলিয়া উঠে এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতঃ স্বয়ং তাঁহার ক্যাম্পের উপর আক্রমণ চালাইতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু হাসান (রাঃ) অতিশয় বিচক্ষণ ও দূরদর্শী ছিলেন। তিনি কুচক্রীদের কার্য্যকলাপে ভীত হওয়ার পরিবর্ত্তে স্বীয় মীমাংসা-পরিকল্পনার উপর অধিক দৃঢ় হইয়া গেলেন এবং অনতিবিলম্বে সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতঃ চিরতরে দ্বিপাক্ষিক দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাইয়া দিলেন। তিনি নেজামে-খেলাফতের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর উপর ন্যস্ত করতঃ তাঁহাকে খলীফাতুল-মোসলেমীনরূপে গ্রহণ করিয়া নিলেন।

এইবার মোয়াবিয়া (রাঃ) সুযোগ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আগ্রহ ও আকাঙ্খা—ঐ তৃতীয় দলটির হত্যা ও নিধন কার্য্যের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দিলেন এবং বিক্ষিপ্ত ও সমষ্টিগত ভাবে ঐ দলের লোকদিগকে হত্যা করতঃ সেই দলকে নিপাত করিতে সমর্থ হইলেন। এই ভাবে মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেলাফৎ আমলে কুচক্রী দল পূর্ণরূপে নিষ্পেষিত হওয়ায় মোসলমানগণ স্বস্তির নিঃশ্বাসই নয় শুধু, বরং তাঁহার খেলাফৎ কালের সুদীর্ঘ সময় পূর্ণ শান্তি ও শৃঙ্খলা উপভোগ করিল।

পাঠক বর্গ! পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—আলোচ্য হাদীছের “হক্ ও ন্যায়ের অধিক নিকটবর্ত্তী” বাক্যের মর্ম্ম অনুযায়ী আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পক্ষ এবং

আয়েশা (রাঃ), তাল্‌হা (রাঃ), যোবায়ের (রাঃ) ও মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পক্ষ—উভয় পক্ষই হেদায়াত ও সৎ পথের উপর অধিষ্ঠিত বলিয়া প্রমাণিত হয় এবং বাস্তবও তাহাই। কারণ, উভয় পক্ষই খাঁটী ও অকৃত্রিমভাবে চাহিতে ছিলেন যে, নেজামে-খেলাফত সুপ্রতিষ্ঠিত হউক, দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসুক এবং ইসলামের উন্নতি ও গৌরব পুনঃ উদ্ধার হউক।

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এক হওয়া সত্ত্বেও আনুষাঙ্গিক কারণে বিরোধ হওয়া বিচিত্র নহে। যথা এস্থানে লক্ষাধিক ছাহাবীগণের বিশিষ্ট দশ জন "আশারা-মোবাশ্‌শারা" হইতে তাল্‌হা (রাঃ) ও যোবায়ের (রাঃ) এবং আয়েশা (রাঃ) ও মোয়াবিয়া (রাঃ) এবং তাঁহাদের সঙ্গী হাযার হাযার ছাহাবীগণের নিকট আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নীতি সম্পর্কে এই অভিযোগ ছিল যে—বিশৃঙ্খলার মুল, সন্ত্রাসবাদী, খলীফা ওসমানের হত্যাকারীদের শাস্তি বিধানে বিলম্ব হইতেছে। অধিকন্তু তাহারা বড় বড় পদ দখলের সুযোগ পাইতেছে। পরন্তু এই পরিস্থিতিতে পরস্পর ভুল বুঝা-বুঝির সুস্পষ্ট অবকাশ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সেই শাস্তির দাবীদারদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা হইতেছে। এমনকি মদীনা হইতে সৈন্য বাহিনী লইয়া সুদুর বছরায় যাওয়া হইয়াছে।* যদ্দরুন অতি সহজেই সংঘর্ষ বাঁধা সম্ভব হইয়াছে। এই সব ঐ মোনাফেক সন্ত্রাসবাদীদের কারসাজিতেই হইয়া ছিল, কিন্তু তাহারা গা-ঢাকা দিয়া আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পক্ষে ভিড়িয়া ছিল।↑

আলী (রাঃ) তাঁহার খেলাফতের অঙ্কুরে সন্ত্রাসবাদীদের উপর ক্ষমতা ও প্রাবল্য রাখিতেন না বটে, কিন্তু পরবর্ত্তী ঘটনাবলী দৃষ্টে বিপক্ষ দল তাঁহার শক্তি সঞ্চারের ধারণা করার যথেষ্ট অবকাশ পাইতেছিলেন; যদ্দরুন ঘাতকদের শাস্তির দাবী তাঁহারা ত্যাগ করিতেছিলেন না। ফলে উত্তরোত্তর উভয় পক্ষের হানাহানি দানা বাঁধিয়া উঠিল এবং ঐ মোনাফেক কুচক্রীদের ষড়যন্ত্রে পরস্পর দুইটি মর্ম্মান্তিক সংঘর্ষে উভয় পক্ষে রক্তের স্রোত বহিল।

---

* মদীনা হইতে বছরা অভিমুখে যাত্রায় অধিকাংশ মদীনাবাসী বিরূপভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) এবং হাসান (রাঃ) প্রবলরূপে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন। আবু মূছা আশয়ারী (রাঃ) বিশেষ দৃঢ়তার সহিত বিরোধিতা করিয়াছিলেন। (বেদায়াহ)

↑ পরিশিষ্টে জামাল-যুদ্ধের ইতিহাসে দেখিতে পাইবেন, আলী (রাঃ) সন্ত্রাসবাদী খলীফা ওসমানকে হত্যাকারী দলকে নিজ সঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করার কত জোরদার ঘোষনা দান করিয়া ছিলেন। এবং কত আগ্রহের সাথে পরস্পর মিমাংসার ব্যবস্থা সম্পন্ন করিয়া ছিলেন। এতদসত্ত্বেও কুচক্রিদের কারসাজিতে কিরূপ দুঃখজনক ঘটনা ঘটিয়া গেল।

তদ্রূপ আশরা-মোবাশ্‌শারা হইতে স্বয়ং আলী (রাঃ) এবং তাঁহার সঙ্গী হাযার হাযার ছাহাবীগণের নিকটও আয়েশা, তালহা, যোবায়ের ও মোয়াবিয়া (রাঃ) -গণের নীতি সম্পর্কে এই অভিযোগ ছিল যে, আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেলাফতকে স্বীকৃতি প্রদান করিয়া তাঁহাকে সর্ব্ব-সম্মতরূপে শাসন-ক্ষমতার অধিকারী শক্তিশালী খলীফা হওয়ার সুযোগ তাঁহারা প্রদান করিতেছেন না; যাহার ফলে বিশৃঙ্খলা উপশমের উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা সম্ভব হইতেছে না।

উভয় পক্ষের এই মতবিরোধ সম্পর্কে অধিকাংশ ইমামগণের ভাষ্য এই যে, আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মত্‌ই অধিক যুক্তিযুক্ত এবং বেশী শক্তিশালী ছিল। আলোচ্য হাদীছেও যেই পক্ষকে হক্‌ ও ন্যায়ের অধিক নিকটবর্ত্তী বলা হইয়াছে ঐ পক্ষ আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পক্ষই সাব্যস্ত। এবং আলী (রাঃ) খলীফা-বর্‌হক ছিলেন।

তবে ছাহাবীগণের কোন পক্ষকেই আমরা দোষী ও অপরাধী ত বলিতে পারিবই না; তাঁহাদেরকে মন্দ জানা বা তাঁহাদের প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করাও হারাম। এতদ্ভিন্ন আল্লাহ তায়ালার নিকটও তাঁহাদের উভয় পক্ষের কোন পক্ষই অপরাধী গণ্য হইবেন না—বাস্তবে যদি কোন পক্ষের মতামতে ত্রুটি হইয়াও থাকে। কারণ, ইসলামের ভালায়ী ও উন্নতির প্রকৃত ও বাস্তব আন্তরিক উদ্দেশ্যে তাঁহাদের উভয় পক্ষের অসাধারণ একনিষ্ঠতা ও নিঃস্বার্থতা এতই স্বচ্ছ ও নির্ম্মল ছিল যে, উহার প্রভাবে কার্য্যক্রম ও কর্ম্ম-ব্যবস্থার ভুল-ত্রুটি আল্লার নিকট মার্জিত ও ক্ষমার্হ।

মুল উদ্দেশ্য শুদ্ধ সঠিক ও হক্‌ হওয়ার পর একনিষ্ঠতার সহিত উহা হাসিলের চেষ্টা-তদবির ও উপায় অবলম্বনে ত্রুটি-বিচ্যুতি হইলে আল্লাহ তাহা ক্ষমা করিয়া দিয়া থাকেন; ইহাকেই বলা হয় "খাতায়ে-ইজতেহাদী ক্ষমার্হ।" কিন্তু বিশেষ সতর্কতার সহিত খেয়াল রাখিতে হইবে যে, মূল উদ্দেশ্যের সুষ্ঠুতা এবং স্বীয় কার্য্যের একনিষ্ঠতা শুধু মুখের দাবীর পর্য্যায়ে মূল্যহীন; আন্তরিকতার পর্য্যায়েই হইল উহার মূল্য। আর যিনি ক্ষমা করিবেন তথা আল্লাহ তায়ালা তিনি হইলেন সর্ব্বজ্ঞ, অন্তর্য্যামী।

ছাহাবা কেরামের পরস্পর বিবাদের দ্বারা মোসলমানদের রক্ত ক্ষয় হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেই বিবাদের দরুন ছাহাবীদের বিবাদমান কোন পক্ষই দ্বীন, ঈমান, ছওয়াব ও আল্লার নিকট মর্য্যাদাবান থাকার ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও ক্ষতিগ্রস্ত হন নাই—ইহা আল্লার রসূলের ছাহাবীদের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ছাহাবীদের এই বৈশিষ্ট্য তাঁহাদেরই একটি বিশেষ গুণের কারণে ছিল। সেই গুণটি ছিল নিয়্যত তথা উদ্দেশ্যের চরম বিশুদ্ধতা ও নির্ম্মল সুষ্ঠুতা এবং উদ্দেশ্য হাসিলের উপায় অবলম্বনে নিষ্কলুষ এখ্‌লাছ ও একনিষ্ঠতা। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এই গুণটির দরুনই মানুষ তাহার নীতির মধ্যে ভুল ও ত্রুটি-বিচ্যুতি করিয়াও ক্ষমার্হ গণ্য হয়।

রসুলের পরশ-দৃষ্টি ও সাহচার্য্যের বদৌলতে উক্ত গুণটি ছাহাবীদের যে পর্য্যায়ে লব্ধ ও হাসিল ছিল সেই পর্য্যায়টা অন্যদের জন্য শুধু হাসিল করাই অসাধ্য ও অসম্ভব নহে, বরং উহার উপলব্ধি এবং অনুভূতিও অসাধ্য। এই কারণেই ছাহাবীদের উভয় পক্ষ তাঁহাদের আপসের বিবাদে শুধু কেবল ক্ষমার্হই ছিলেন না, বরং সমালোচনার ঊর্দ্ধেও বটেন। ইহা শুধু আমাদের কথা বা ভাবাবেগ নহে, বরং সর্ব্বস্বীকৃত সত্য।

প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্ব যুগের হাফেজে হাদীছ—লক্ষ হাদীছ কণ্ঠস্থকারী, বোখারী শরীফের সুপ্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকার হাফেজ ইবনে হজর (রঃ) ফত্‌হুল বারী ১৩—২৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "রসুলের সুন্নতপন্থীগণ সকলে এক মত্ যে, ছাহাবীদের আপসে কলহ-বিবাদের দরুন যে কোন ছাহাবীর সমালোচনা নিষিদ্ধ; যদিও সূক্ষ্ম দলীল প্রমাণাদির সার্ব্বিক গবেষণার প্রেক্ষিতে নির্দ্দিষ্ট এক পক্ষকে ন্যায়ের উপর অধিষ্ঠিত বলিয়া সাব্যস্ত করা যায়। কারণ, ছাহাবীগণ একমাত্র ইজ্‌তেহাদের উপরই বিবাদে লিপ্ত হইয়াছিলেন; পরন্তু খাতায়ে-ইজ্‌তেহাদী ক্ষমার্হ।"

ছাহাবা কেরামের পক্ষদ্বয়ের বিরোধ নিছক নীতিগত ছিল এবং উহা নিতান্ত স্বাভাবিক ছিল, তাই উহা ছিল সম্পূর্ণ ক্ষমার্হ। এই নীতিগত বিরোধকে যাহারা যুদ্ধবিগ্রহে পরিণত করিয়াছিল তাহারা ছিল ঐ তৃতীয় দল। এই দলের হোতা ছিল আবদুল্লাহ ইবনে ছাবা ছদ্মবেশী-মোসলেম মোনাফেক ইহুদী এবং তাহার সহকর্ম্মী ছিল অন্যান্য নূতন-পুরাতন মোনাফেক গোষ্ঠি। আর তাহাদের সঙ্গে ভিড়িয়া গিয়াছিল স্বার্থান্বেষী মোসলমান যাহাদের অধিকাংশই ছিল ঐ সব মোসলমান যাহারা দেশ বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে রাতা-রাতি হাজার হাজার লাখ লাখের সংখ্যায় মোসলমান হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের ইসলাম গ্রহণীয় ছিল অবশ্যই, কিন্তু নবীর পরশ-দৃষ্টি হইতে বঞ্চিত ঐ সব লোকদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ ইসলামী গুণাবলীর পরিপক্কতা মোটেই বিদ্যমান ছিল না। ফলে তাহারা সহজেই সন্ত্রাস-বাদীদের খপ্পরে পড়িয়া গিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কতিপয় খান্দানী মোসলমানও ছিল বটে, কিন্তু তন্মধ্যে একজনও ছাহাবী ছিলেন না।

সার কথা এই যে, ছাহাবা কেরামের আমলে যে সব যুদ্ধ-বিগ্রহ হইয়াছিল ঐ সবের জন্য দায়ী ও অপরাধী ছিল সেই তৃতীয় দল যাহাদেরকে হত্যা করার প্রতি হযরত (দঃ) মোসলেম সমাজকে আকৃষ্ট করিয়াছেন। যাহাদেরকে হযরত (দঃ) সম্পূর্ণরূপে ইসলাম বহির্ভূত বলিয়াছেন, যাহাদের প্রতি হযরত (দঃ) অতিশয় ক্ষোভ ও ক্রোধ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

এই তৃতীয় দলটির জঘন্য দুষ্কৃতির সংখ্যা অনেক, যাহার মধ্যে এই কয়টি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য—

১। প্রথম ধাপে তাহারা দলগতরূপে আত্মপ্রকাশ না করিয়া মোনাফেকী ভাবে মোসলমানদের মধ্যে থাকে এবং মোসলমানদের সুদৃঢ় সংহতি বিনষ্ট করার জন্য নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্ত্তা খলীফা ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ অলিক ও ভিত্তিহীন মিথ্যা অভিযোগের বহর পরিচালিত করে। এমনকি, গোয়েবলী প্রোপাগাণ্ডা ও পরিকল্পিত প্রচারণার মাধ্যমে অলিক ভিত্তিহীন মিথ্যা অভিযোগগুলিকেও সত্যের সারিতে দাঁড় করিতে প্রয়াস পায়।

২। দ্বিতীয় ধাপে এক বিশেষ সুযোগে, অর্থাৎ পবিত্র হজ্জের মৌসুমে—যখন সাধারণভাবে মোসলমানগণ বিশেষতঃ রাজধানী মদীনার অধিকাংশ মোসলমান সুদুর মক্কায় চলিয়া গিয়াছিল, তখন ঐ দুর্বৃত্তরা বিভিন্ন অঞ্চল হইতে তাহাদের দলীয় সন্ত্রাসবাদী লোকদিগকে হজ্জে গমনের ভান করিয়া রওয়ানা করিয়া দেয়। অনন্তর মক্কায় যাওয়ার পরিবর্ত্তে পরিকল্পিতরূপে মদীনার অদুরে সমবেত হইয়া একযোগে মদীনার উপর হামলা চালায় এবং অবরোধ সৃষ্টি করিয়া খলীফা ওসমান (রাঃ)কে শহীদ করিয়া ফেলে।

৩। তৃতীয় ধাপে তাহারা তাহাদের আত্মরক্ষা ও স্বার্থ হাসিলের জন্য নিজেদের কর্ত্তৃত্ব ও মোড়লগিরী খাটাইয়া এমন একটি কাজকে ঘোলাটে করিয়া দেয় যাহা স্বাভাবিক ভাবেই হইত এবং তাহাতে কোনই বিশৃঙ্খলা আসিত না। কিন্তু সেই অবস্থায় তাহাদের স্বার্থ রক্ষিত হইত না বলিয়া তাহারা নিজেদের কর্ত্তৃত্ব ও মোড়লগিরী খাটায় এবং ভাল কাজকে খারাব করে। মদিনা যেহেতু তাহাদের দ্বারা অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিল, তাই এই কর্ত্তৃত্ব ও মোড়লগিরীতে তাহাদেরে বাধা দেওয়া সম্ভব হয় নাই। এমনকি স্বয় আলী (রাঃ) তাহাদের এই ভূমিকার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকা সত্তেও তাহাদেরে বাধা দানে সক্ষম হন নাই। ঐ কাজটি ছিল আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খলীফা হওয়া।

স্বাভাবিকভাবে খলীফা-নির্ব্বাচন হইলে আলী (রাঃ)ই খলীফা হইতেন, কিন্তু সেই অবস্থায় শাসন-যন্ত্রে উক্ত সন্ত্রসবাদীদের মোটেই কোন দখল থাকিত না, বরং তাহাদের আত্মরক্ষাই সম্ভব হইত না—তাহারা ধরা পড়িয়া যাইত। এই জন্য নিজেদের রক্ষা উদ্দেশ্যে তাহারা উক্ত কাজকে নিজেদের কর্ত্তৃত্বে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করে। এই ব্যাপারে তাহাদের সুযোগও ছিল উত্তম যে, আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খলীফা নির্ব্বাচনে জনগণের সাড়া পাওয়া যাইবে।

বাস্তবে হইলও তাহাই—তাহারা মাত্র দুই দিনের মধ্যে আলী (রাঃ)কে খলীফা নির্ব্বাচন করিয়া নেওয়ার জন্য অবরুদ্ধ মদিনায় ভীষন চাপের সৃষ্টি করিল। মদিনায়

উপস্থিত ছাহাবী ও মোসলমানগণের অধিকাংশের সমর্থনে আলী (রাঃ) খলীফা নির্ব্বাচিত হইলেন বটে, কিন্তু জবরদস্তি ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে শাসনক্ষমতা ও সামরিক ক্ষমতা উভয় ক্ষমতার চাবি-কাঠি দুষ্কৃতি দল নিজেদের হাতে রাখিয়া দিতে প্রয়াস পাইল।*

এই অবস্থা দৃষ্টে—

× উক্ত সমর্থনকারীগণের কতিপয় শীর্ষস্থানীয় ছাহাবী যথা—আশারা-মোবাশ্শারা ভুক্ত তাল্‌হা (রাঃ) ও যোবায়ের (রাঃ) অবরুদ্ধ মদিনা হইতে পালাইয়া মক্কায় চলিয়া যান এবং সমর্থন প্রত্যাহার করেন।

× মদিনায় উপস্থিত ছাহাবীগণের মধ্যে যাঁহারা প্রথম ধাপে সমর্থন দানে অংশ গ্রহণ করিয়া ছিলেন না, তাঁহারা সমর্থন দান হইতে বিরত থাকেন।

× মক্কায় অবস্থিত এবং অন্যান্য এলাকার অনেক বিশিষ্ট বিশিষ্ট ছাহাবীও সমর্থন দানে বিরত থাকেন এবং তাঁহারা শর্ত্ত আরোপ করেন যে, প্রথমে খলীফা হত্যাকারী সন্ত্রাসবাদীদের শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হউক।

এই ছাহাবীগণের মূল ক্ষোভ ও ক্রোধ ছিল সন্ত্রাসবাদীদের উপর। শাসনযন্ত্রে তাহাদের দখল দেখিয়াই তাঁহারা ক্ষুব্ধ ছিলেন। তাঁহারা ভাবিতে ছিলেন যে, খেলাফত-কাঠামোর বর্ত্তমান অবস্থায় আলী (রাঃ)কে খলীফারূপে স্বীকৃতি দিলে তাঁহার খেলাফত বা সরকারের অগ্রভাগ দখলকারী সন্ত্রাসবাদীদের ক্ষমতার আওতায় পড়িয়া খেলাফত ধ্বংসযজ্ঞের নীরব দর্শকের ভূমিকা অবলম্বনে বাধ্য হইতে হইবে। সন্ত্রাসবাদীরা আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সরকারের বেশীর ভাগ ক্ষমতা ষড়যন্ত্রমূলক দখল করিয়া নিয়াছে। কাজেই এখন বসিয়া থাকিলে মোসলমানদের শান্তি এবং ইসলামের গৌরব পুনরুদ্ধারের আর কোন সম্ভাবনাই থাকিবে না।

এই জন্যই তাঁহারা সন্ত্রাসবাদীদের বিচারের দাবী করিতে ছিলেন। তাহাদের বিচার করা হইলে তাহাদের মুখুস খুলিয়া যাইবে, সরকারের মধ্য হইতে তাহাদের দখল ছুটিয়া যাইবে এবং তাহাদের দল বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে।

---

* এই পরিস্থিতি ও অবস্থা আলী (রাঃ) অনুভব ও অনুধাবন করিতে ছিলেন। কিন্তু সন্ত্রাসবাদীরা ছাড়া আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পক্ষে ও সমর্থনে খাঁটী মোসলমানদের যে শক্তি ছিল তাহা উহাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মোটেই যথেষ্ট ছিল না। স্বয়ং খলীফা আলী (রাঃ) ওজর পেশ পূর্ব্বক বলিয়াছেন—"আমরা তাহাদের (সন্ত্রাসবাদীদের) হর্ত্তাকর্ত্তা নহি, তাহারাই আমাদের হর্ত্তাকর্ত্তা।" (কামেল ৩—১০০) এই জন্যই আলী (রাঃ) তাহাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্ব্বে সকলের সমর্থন ও ঐক্য দাবী করিতে ছিলন।

আলী (রাঃ) নিজেও সন্ত্রাসবাদীদের এই ষড়যন্ত্র জনিত দখল আঁচ করিতে ছিলেন, কিন্তু তিনিও ত অবরুদ্ধ মদিনায় সন্ত্রাসবাদীদের চাপ হইতে মুক্ত ছিলেন না। তাহাদের চাপের মোকাবিলা করার কোন অবকাশ যদি তাঁহার থাকিত তবে খলীফা ওসমান (রাঃ)কে শহীদ করা সন্ত্রাসবাদীদের জন্য সম্ভবই হইত না এবং আলী (রাঃ) ঐ পরিস্থিতির খেলাফত গ্রহণও করিতেন না।

যেভাবেই হউক মদিনায় উপস্থিত ছাহাবী ও মোসলমানদের অধিকাংশের সমর্থনে খেলাফতের দায়িত্ব আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর উপর আসিয়া গেলে সেই দায়িত্ব পালন করা তাঁহার ফরজ হইয়া গেল। বিশেষতঃ তখন তিনি ভিন্ন অন্য কেহ কোন প্রকারেই খলীফা মনোনীত হন নাই বা দাবীও করেন নাই। এই সময় তিনি খলীফার দায়িত্ব পালন না করিলে মোসলমানগণ খলীফাহীন হইয়া পড়ে। তাই তিনি স্বীয় পদে ও দায়িত্ব পালনে স্থির থাকিলেন এবং যাঁহারা তাঁহার প্রতি সমর্থন জানাইয়াছিলেন তাঁহারাও তাঁহাকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাখিতে সচেষ্ট থাকিলেন।

খলীফা আলী (রাঃ) এবং তাঁহার সমর্থনকারী ছাহাবীগণ ভাবিতে ছিলেন যে, সকলের সমর্থন ও ঐক্যের দ্বারা খেলাফত শক্তিশালী হইয়া দেশের শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসুক ; তারপর সন্ত্রাসবাদীদের শাস্তি দান সম্ভব ও সহজ হইবে।

দুর্ভাগ্য বশতঃ যেহেতু সন্ত্রাসবাদী দল শুধু নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে এই পক্ষের সঙ্গেই মিশিয়া ছিল এই শাসনযন্ত্রের বড় বড় পদ দখল করিয়া ছিল, তাই বিপক্ষ দল এই পক্ষের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন বেশী। এই পর্য্যায়ে মোসলমানদের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হইয়া গেল।

সন্ত্রাসবাদীরা যেহেতু ভালভাবেই বুঝিতে ছিল যে, এই বিরোধ মিটিয়া গিয়া শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপিত হইলেই তাহাদের আর রক্ষা থাকিবে না। তাই তাহারা গোপন ষড়যন্ত্রের দ্বারা বিরোধ জিয়াইয়া রাখায় সচেষ্ট থাকিল।

৪। চতুর্থ ধাপে ঐ সন্ত্রাসবাদী গ্রুপ যাহারা আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেলাফত-কাঠামোতে কারসাজি দ্বারা সামরিক ও বেসামরিক সরকারী ক্ষমতার চাবিকাঠি হস্তগত করিয়া রাখিয়া ছিল—তাহারা ষড়যন্ত্র করিয়া এমন চাপ সৃষ্টি করে যাহাতে উল্লেখিত মোসলমানদের দুইটি দলের নীতিগত বিরোধ সামরিক বিরোধে পরিণত হইয়া যায় এবং ঐ সন্ত্রাসবাদীদেরই অত্যন্ত জঘন্য ষড়যন্ত্রের দ্বারা পর পর দুইটি ভয়ঙ্কর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই পর্য্যায়ে সন্ত্রাসবাদী গ্রুপটি বিশেষ একটি অমূলক ছুতা অবলম্বনে ছাহাবীদের উভয় দল হইতে ছিন্ন হইয়া মোনাফেকীরূপে মোসলমানদের মধ্যে থাকিয়া তৃতীয় দল আকারে আত্মপ্রকাশ করে।

তৃতীয় ধাপে মোসলমানদের মধ্যে দুইটি দল সৃষ্টি হওয়া এবং চতুর্থ ধাপে সন্ত্রাসবাদীদের তৃতীয় দলরূপে আত্মপ্রকাশ করা। ইহাই তাৎপর্য্য আলোচ্য হাদীছের এই ভবিষ্যদ্বাণীটির—يخرجون على حين فرقة من الناس "তাহারা আত্মপ্রকাশ করিবে মোসলমানদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হওয়ার সুযোগে।"

বলা বাহুল্য—সেই বিরোধকে চরম পর্য্যায়ে টানিয়া নিয়া সন্ত্রাসবাদী দলটি আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল সেই বিরোধের জন্মও তাহাদেরই ষড়যন্ত্রে ছিল এবং সেই বিরোধকে কেন্দ্র করিয়া যত রকম জটিলতা ও কেলেঙ্কারী সৃষ্টি হইয়াছিল সবের গোড়ায়ই ছিল ঐ সন্ত্রাসবাদী দলটি। একমাত্র তাহাদেরই ষড়যন্ত্রে ছাহাবাদের শেষ যুগে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ-বিগ্রহের ঝড় বহিয়াছিল। তাই তাহাদের প্রতি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এই অগ্রিম ক্রোধ ও আক্রোশ ছিল যাহা তিনি পূর্ব্বোল্লেখিত হাদীছ সমূহে ব্যক্ত করিয়াছেন।

আলোচ্য সন্ত্রাসবাদী দলটির এই সকল ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ অতিশয় হৃদয় বিদারক ও প্রামাণিক ইতিহাসের একটি বিরাট অধ্যায়। ইনশা-আল্লাহ তায়ালা সেই বিবরণ ও ইতিহাসই বর্ণিত হইবে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের পরিশিষ্টে।

পরম পরিতাপের বিষয়—মোসলমানদের শিক্ষিত সমাজেরও বিরাট অংশ উক্ত সন্ত্রাসবাদী দলটির ইতিহাস হইতে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এবং সেই অজ্ঞতার ফলেই তাহারা এক ঈমান বিধ্বংসী ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া আছে—তাহারা অনেক অনেক কেলেঙ্কারীর জন্য বিশিষ্ট বিশিষ্ট ছাহাবীবর্গকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া থাকে—যাহা হারাম এবং কবিরা গোনাহ।*

---

* বহু কথিত চিন্তাবিদ ও প্রসিদ্ধ লেখক জনাব মৌদুদী সাহেব তাঁহার নিজের প্রসূত একটি প্রবন্ধের দ্বারা উক্ত ব্যাধিকে আরও ব্যাপক ও দুরারোগ্য করার স্থায়ী ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। উক্ত প্রবন্ধটি পাঠ করিলে ঈমানদার ঐতিহাসিককে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যাইতে হয় যে, মৌদুদী সাহেব উহাতে ছাহাবা কেরামের যুগের অনেক কেলেঙ্কারীর বর্ণনাই দিয়াছেন, কিন্তু ঐ সন্ত্রাসবাদী দলটির উল্লেখ সমগ্র প্রবন্ধের কোন এক স্থানেও নাই। পক্ষান্তরে তিনি সমস্ত কেলেঙ্কারীর জন্য দায়ী করিয়াছেন বিশিষ্ট বিশিষ্ট ছাহাবীবর্গকে।

এই প্রবন্ধটি পাঠ করিলে দুঃখের সীমা থাকে না। মৌদুদী সাহেব পূর্ব্বাপর মোসলেম মনীষী সমুদয় ইমাম ও আলেমগণের ঐক্যমত ও এজমা'কে উপেক্ষা করিয়া বিশিষ্ট বিশিষ্ট ছাহাবীর প্রতি কঠোর দোষারোপ ও কটাক্ষপাত করিয়াছেন। এমনকি সেই কুখ্যাত প্রবন্ধের পরিশিষ্টে ছাহাবীদের উক্ত কার্য্যক্রমকে খাতায়ে-ইজ্‌তেহাদী হওয়ারও বিরোধিতা করিয়াছেন।

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—মোলহেদ ও জিন্দিক শ্রেণীর মোরতাদগোষ্টি সাধারণতঃ ইসলাম এবং কোরআন ও হাদীছের প্রতি স্বীকৃতি দানকারী হয়। এমনকি তাহারা তাহাদের ভ্রষ্টতাপূর্ণ মতবাদের সপক্ষে মিথ্যা ও অপব্যাখ্যার সাহায্যে কোরআন-হাদীছ হইতে সূত্র এবং প্রমাণও পেশ করিয়া থাকে। যেমন আলী (রাঃ) এবং বহু ছাহাবীদের বিরুদ্ধে খারেজীদের একটি দৃষ্টান্ত দেখান হইয়াছে। তদ্রূপই বর্ত্তমান যুগে কাদিয়ানী ফের্কাকেও দেখা যায় তাহাদের গহিত নবীর নবুয়তের সপক্ষে কোরআন-হাদীছ হইতে প্রমাণ ও সূত্র পেশ করিয়া থাকে।

বর্ত্তমান যুগে ত এই ব্যাধির প্রাদুর্ভাবই হইয়া গিয়াছে, এমনকি ইসলামের নামে বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হইয়াছে যাহার মাধ্যমে ইসলাম বিরোধী বহু মতবাদ ও কার্য্যাবলীর সপক্ষে অপব্যাখ্যার সাহায্যে কোরআন-হাদীছ হইতে সূত্র ও প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়; যেন মোসলেম সমাজের ঈমানী চেতনা ও ইসলামী জয্‌বা ঐসব ইসলাম বিরোধী মতবাদ ও কার্য্যাবলীর বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হইয়া না উঠে।

ইসলাম বিরোধী মতবাদে নিমজ্জমান ভ্রষ্টগণ কর্ত্তৃক কোরআন-হাদীছ হইতে ঐরূপ ফাঁকিবাজীর সাহায্য গ্রহণ কুফরীর গহ্বর হইতে পরিত্রাণের জন্য মোটেই ফলদায়ক হইবে না।

এস্থলে একটি সূক্ষ্ম বিষয় অতিশয় সতর্কতার সহিত লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। তাহা এই যে, অপব্যাখ্যার দ্বারা স্বীয় কুমতলব বা পূর্ব্ব-পরিকল্পিত ভ্রান্ত মতবাদের পক্ষে কোরআন-হাদীছ হইতে প্রমাণ ও সূত্র কুড়ানো—শরীয়তের দৃষ্টিতে অত্যন্ত জঘন্য। পক্ষান্তরে সাধারণ ভাবে কোরআন-হাদীছের কোন বিষয় বুঝিতে ভুল করিয়া কোন ভুল মত পোষণকারী হইলে ভুল নিরসনের ব্যবস্থা সাপেক্ষে উহা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখা যাইতে পারে।

কিন্তু অপব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা আর বুঝিতে ভুল করা সাধারণ দৃষ্টিতে এই দুইটির পরস্পর পার্থক্য উজ্জ্বল না হইলেও বাস্তব ক্ষেত্রে উভয়ের পার্থক্য অতি বিরাট। এই সত্য তথ্যটি বুঝাইবার জন্য ইমাম বোখারী (রঃ) রকমারি মোরতাদ কাফেরের বর্ণনা দান করিয়া পরে নিম্নলিখিত পরিচ্ছেদটি উল্লেখ করিয়াছেন—

মৌদুদী সাহেব ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ খলীফা ওসমান (রাঃ) নিহত হওয়ার ব্যাপারে স্বয়ং খলীফা ওসমানকেই আসামী ও অপরাধী সাব্যস্ত করিয়াছেন যে, তাঁহার স্বজন প্রীতির দরুন মোসলমান জন-সাধারণ তাঁহার প্রতি বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিল। এই পর্য্যায়েও ঐ সন্ত্রাসবাদী দলটি মৌদুদী সাহেবের চোখে ধরা পড়ে নাই; মোসলমান জনগণকেই খলীফা ওসমান-হত্যাকারী সাব্যস্ত করিয়াছেন।

পরিশিষ্টে উক্ত প্রবন্ধের এই শ্রেণীর অসংখ্য লজ্জাকর অবাস্তব তথ্যাবলী হইতে নমুনা স্বরূপ কতিপয় তথ্যের সমালোচনাও ইনশা-আল্লাহ তায়ালা করা হইবে।

"তাবীল" তথা ভুল বুঝের কতিপয় নজীর

অর্থাৎ এক্ষেত্রে দুইটি বিষয় এবং উভয়ের প্রতিক্রিয়ার পার্থক্য বিষ ও তিক্ত পানির পার্থক্য অপেক্ষা অধিক। কিন্তু উভয়ের মধ্যকার বাহ্যিক সামান্যতম সাদৃশ্যের দ্বারা বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারীগণ মতলব সিদ্ধ করিতে প্রয়াস পায়।

একটি হইল "তাহরীফ" আর একটি হইল "তাবীল"। তাহরীফ অর্থ—কোরআন-হাদীছের কোন শব্দ, বাক্য বা কোন সুস্পষ্ট বিষয়কে কিম্বা শরীয়তের কোন সুস্পষ্ট বিধানকে অপব্যাখ্যার দ্বারা বিকৃত করা। যেরূপ পূর্ব্বাপর গোম্‌রাহ ফের্কাগুলির কার্য্যাবলীর মধ্যে দেখা গিয়াছে এবং বর্ত্তমান যুগেও ইসলামকে (Modernize) যুগের সামঞ্জস্যে আধুনিক করার প্রচেষ্টাবলীতে দেখা যায়। সেই সব প্রচেষ্টাকারীগণ তাহাদের পরিকল্পিত ইসলাম বিরোধী মতবাদ ও ইসলাম পরিপন্থী কার্য্যাবলীকে কোরআন-হাদীছের এবং ইসলামের পোশাক পরাইতে ইসলামের ঐরূপ বিকৃতি সাধনের দ্বারাই প্রয়াস পায়।

তাহারা যে, কোরআন-হাদীছের অপব্যাখ্যা করে সেই ব্যাপারে তাহাদের অবস্থা এইরূপ মোটেই নহে যে, আল্লার রসুলের ছাহাবীগণের এবং তাঁহাদের তাবেয়ীগণের মাধ্যমে পরম্পর মোসলেম সমাজে ইসলামের যে শ্বাসত রূপ ও আকৃতি সুদৃঢ় ও সুস্পষ্টরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে তাহারা সেই ইসলামেরই অনুসরণ ও অনুকরণ করিয়া চলে, কিন্তু ঘটনাচক্রে কোরআন-হাদীছ অধ্যয়নে তাহারা কোন বিষয় বুঝিতে ভুল করিয়াছে। বরং তাহাদের প্রকৃত অবস্থা এই যে—প্রথম হইতেই তাহারা কোন ইসলাম পরিপন্থী মতবাদ পোষণ করিয়া থাকে এবং উক্ত মতবাদের পরিকল্পনা তাহাদের মনে গাঁথা থাকে। কিন্তু উহা প্রকাশ করার সময় বা প্রকাশ করার পরে ঈমানী চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও ইসলামী জয্‌বায় পরিপূর্ণ মোসলেম সমাজের বিদ্রোহের ভয়ে কোরআন-হাদীছ ও ইসলামী বিধানের অপব্যাখ্যা পূর্ব্বক উহাকে নিজেদের পূর্ব্ব-পরিকল্পিত মতবাদের সামঞ্জস্যরূপ দান করিয়া থাকে। এক কথায়—তাহাদের মতবাদ ও পরিকল্পনা কোরআন-হাদীছের নিয়ন্ত্রণে গঠিত এবং ইসলামের ছাঁচে ঢালাই করা হয় না, বরং কোরআন-হাদীছকে তাহাদের মতবাদ ও পরিকল্পনার নিয়ন্ত্রণে ব্যাখ্যা করা হয় এবং ইসলামকে তাহাদের মতবাদ ও পরিকল্পনার ছাঁচে ঢালাই করার প্রচেষ্টা হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর অপচেষ্টাকারীদের সম্পর্কেই হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন—

من قال فى القران برايه واصاب فقد اخطا

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজের মতবাদকে কেন্দ্র করিয়া উহার নিয়ন্ত্রণে কোরআনের ব্যাখ্যা করে—যে ব্যক্তি কোরআনের (Instruction) নির্দ্দেশ অনুসারে স্বীয় মতবাদ

স্থির করে না, বরং স্বীয় মতবাদের (Instruction) নির্দেশ অনুসারে কোরআনের ব্যাখ্যা করে; শাব্দিক অর্থে ঐ ব্যাখ্যা শুদ্ধ হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে উহা ভুল ও অশুদ্ধ পরিগণিত। (মেশকাত শরীফ)

"তাবীল" হইল উহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিষ। পরিকল্পিত মতবাদের পায়রবীরূপে নয়, বরং সাধারণ ভাবে কোন একটা ভুল বুঝের কারণে ভুল মতবাদ পোষণ বা ভুল পন্থা গ্রহণকে তাবীল বলা হয়।

"তাহ্‌রীফ" তথা কোরআন-হাদীছ বা ইসলামের বাস্তবরূপের বিকৃতি সাধন দ্বারা কেহ মোরতাদ-কাফের হওয়া হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে না, বরং ঐরূপ বিকৃতি সাধনও বিশেষ কুফরী। পক্ষান্তরে তাবীলের দরুন অন্ততঃ কাফের-মোরতাদ হওয়া হইতে নিস্তার পাওয়া যায়। সুতরাং "তাহ্‌রীফ" ও "তাবীলের" প্রতিক্রিয়ার উক্ত পার্থক্য সূত্রে উভয়টি বিরাট ব্যবধানের জিনিষ। কিন্তু বাহ্যিক দৃষ্টিতে উভয়টির বিভিন্নতাজনক পার্থক্য নির্ণয় করার সুস্পষ্ট নিদর্শন অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় না, বরং বাহ্যিক দৃষ্টিতে উভয়টি সদৃশ বলিয়া মনে হয়। হাঁ—"ভুল করা" এবং "বিকৃত করা" উভয়টির পার্থক্য বিভিন্ন নজীরের সাহায্যে সহজেই ধরা যাইতে পারে। সেই উদ্দেশ্যেই ইমাম বোখারী (রঃ) এস্থানে ভুল বুঝের নজীর সম্বলিত কতিপয় হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন। হাদীছগুলি পূর্ব্বে যথা স্থানে অনূদিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং পুনঃ ঐ হাদীছ সমূহের অনুবাদ করা হইল না। অবশ্য ঐ শ্রেণীর নজীর দৃষ্টে এবং প্রকৃত প্রস্তাবেও তাহ্‌রীফ এবং তাবীল উভয়ের মধ্যে যেসব পার্থক্য আলেমগণ দেখাইয়াছেন সংক্ষেপে উহা উল্লেখ করা হইল—

কোরআন-হাদীছের কোন শব্দ বা বাক্য কিম্বা ইসলামের কোন বিষয়বস্তু ও মতবাদ সম্পর্কে কোন বিশেষ ব্যাখ্যাকে "তাবীল" তখনই বলা যাইতে পারে যখন—(১) ঐ ব্যাখ্যাটি কোরআন-হাদীছের বাক্য ও শব্দের সঙ্গে আভিধানিক অর্থ ও ভাষাগত সমুদয় আবশ্যকাদির সামঞ্জস্য রক্ষাকারী হয়। অন্যথায় ঐ ব্যাখ্যাকে "তাহ্‌রীফ" বলা হইবে; "তাবীল" বলা যাইবে না। (২) ঐ ব্যাখ্যাটি জরুরীয়াতে-দ্বীন তথা ইসলামের কোন সুস্পষ্ট বিধান বা মতবাদকে ক্ষুন্নকারী না হয়; অন্যথায় ঐ ব্যাখ্যা "তাহ্‌রীফ" গণ্য হইবে। (৩) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আমলে, ছাহাবীদের আমলে পবিত্র কোরআনের যে আয়াতের বা যে হাদীছের যে অর্থ প্রচলিত ছিল, কিম্বা ইসলামের কোন বিধান বা মতবাদের যে (Defination) সংজ্ঞা প্রচলিত ছিল উক্ত ব্যাখ্যায় সেই অর্থ ও সংজ্ঞার কোন ব্যতিক্রম না ঘটে, অন্যথায় ঐ ব্যাখ্যা "তাহ্‌রীফ গণ্য হইবে। (৪) উক্ত ব্যাখ্যার মর্ম্ম বা কোন একটি আনুষাঙ্গিক বিষয়ও যেন কোরআন, হাদীছ, এজ্‌মা বা ফেকার সুস্পষ্ট মছআলার বরখেলাফ না হয়; নতুবা সেই ব্যাখ্যা "তাহ্‌রীফ" গণ্য হইবে।

ভয়ে বাধ্য হইয়া কোন কাজ করিলে

ভয় দেখাইয়া কুফরী কাজ বা কুফরী কথায় বাধ্য করা হইলে সে সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলিয়াছেন—

(১) مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهٖۤ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ـ

"যে ব্যক্তি কুফরী করিবে আল্লার প্রতি—ঐ শ্রেণীর লোক ব্যতিরেকে যাহাকে ভয় দেখাইয়া বাধ্য করা হইয়াছে, কিন্তু তাহার অন্তর সুদৃঢ় রহিয়াছে ঈমানের প্রতি ; অবশ্য যাহার অন্তর দ্বিধাহীন হইয়া গিয়াছে কুফরীর প্রতি তাহার উপর আল্লার গজব ও ক্রোধ পতিত হইবে এবং তাহার জন্য ভীষণ আজাব প্রস্তুত রহিয়াছে।" (১৪ পারা—২০ রুকু)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রাণের ভয়ে কোন কুফরী কাজ করে, যেমন মূর্তি বা দেব-দেবীর প্রতি সেজদা করিতে হয় বা কোন কুফরী কথা বলিতে হয়—যদি ঐরূপ কাজ করা কালেও তাহার অন্তর সুদৃঢ় থাকে ঈমানের প্রতি তবে সে ক্ষমার্হ গণ্য হইবে। আর যদি দ্বিধাহীনরূপে সে কুফরী কাজ করে, কুফরী কথা বলে তবে সে মোরতাদ কাফের পরিগণিত হইবে এবং সে আল্লার গজবের পাত্র হইবে। তাহার জন্য ভীষণ আজাব রহিয়াছে।

(২) لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً

"মোমেনগণ মোমেনদের ছাড়া কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিবে না। যে কেহ ঐরূপ করিবে, আল্লার সঙ্গে তাহার কোনই সম্পর্ক থাকিবে না। অবশ্য যদি তোমরা কেহ কাফেরদের হইতে প্রাণ বাঁচাইবার ও রক্ষা পাইবার কৌশল স্বরূপ তাহা কর, তবে উহা ক্ষমার্হ হইবে।" (৩ পারা—১১ রুকু)

অর্থাৎ কাফেরের সহিত প্রকৃতভাবে বন্ধুত্ব করা কুফরী কাজ। কোন মোসলমান তাহা করিলে তাহার ঈমান নষ্ট হইবে, কিন্তু প্রাণের ভয়ে বাধ্য হইয়া রক্ষা পাইবার কৌশল স্বরূপ শুধু বাহ্যিক বন্ধুত্ব দেখাইলে তাহা ক্ষমার্হ গণ্য হইবে।

(৩) إِنَّ الَّذِينَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِىٓ أَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ ...... إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ ...... فَأُولٰٓئِكَ عَسَى اللّٰهُ أَنْ يَّعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُوْرًا ۔

"নিশ্চয়—ফেরেশতাগণ এক শ্রেণীর লোকের রূহ্ কবজ করিবেন এমন অবস্থায় যে, তাহারা ইসলাম বিহীন জীবন যাপনের অপরাধী। ফেরেশতাগণ ভর্ৎসনা স্বরূপ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, কি অবস্থায় তোমরা ছিলে? তাহারা উত্তর করিবে, আমরা আমাদের দেশে দুর্ব্বল ছিলাম। ফেরেশতাগণ তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া বলিবেন—আল্লার সৃষ্ট ভূমণ্ডল কি সুপ্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা দেশ ত্যাগ করতঃ হিজরত করিতে? আখেরাতে এই শ্রেণীর লোকদের বাসস্থান হইবে জাহান্নাম যাহা অতিশয় জঘন্য বাসস্থান। অবশ্য যে সব দুর্ব্বল পুরুষ-নারী বা বালক-বালিকা হিজরত করার ব্যবস্থাবলম্বনে অক্ষম এবং হিজরত করার কোন উপায়ই তাহাদের নাই—আশা করা যায় এই লোকদেরে আল্লাহ তায়ালা মাফ করিয়া দিবেন। আল্লাহ তায়ালা অতিশয় ক্ষমাশীল।" (৫ পাঃ—১১ রুঃ)

অর্থাৎ কোন দেশে কোন পরিবেশে দ্বীন-ইসলামের আরকান-আহ্‌কাম আদায় করা অসম্ভব হইলে, সেই ক্ষেত্রে দ্বীন-ইসলামের আরকান-আহ্‌কাম ত্যাগ করিয়া সেই দেশে ও সেই পরিবেশে থাকা যাইবে না, বরং সেই পরিবেশকেই ত্যাগ করিতে হইবে—ইহাকেই হিজরত বলা হয়। ঐরূপ ক্ষেত্রে হিজরত করা ফরজ। এমনকি ইসলামের আবির্ভাব যুগে যখন মোসলমানদের জন্য মক্কায় ইসলামী জীবন যাপনের অবকাশ ছিল না, মদীনায় উহার অনুকুল পরিবেশ ছিল, তখন মক্কা হইতে হিজরত করিয়া মদীনায় চলিয়া আসা ব্যতিরেকে কাহারও ইসলাম গ্রহণই হইত না। এইরূপ অপরিহার্য্য ফরজ কাজ হিজরতও যদি কেহ নিরুপায় ও অক্ষম হওয়ার দরুণ আদায় করিতে না পারে তবে সে ক্ষমার্হ গণ্য হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—কোন মানুষ নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভয় ও আশঙ্কার দরুণ কোন কাজ করিয়াছে—এই কথা শরীয়তের বিধানে তখনই বলা যাইতে পারে যখন—

(ক) তাহার প্রতি এমন কোন কষ্ট যাতনা বা ক্ষয়-ক্ষতির হুমকী আসে যাহা স্বভাবতঃই মানুষকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করে। (খ) ভীতি প্রদর্শনকারী স্বীয় হুমকী কার্য্যে পরিণত করিতে পূর্ণ শক্তিমান। (গ) অনতিবিলম্বে হুমকী বাস্তবায়িত হওয়ার উপক্রম দেখা যায়। (ঘ) উক্ত হুমকীর কবল হইতে নিজকে বাঁচাইবার কোন পথ ও সুযোগ না থাকে। এইরূপ পরিস্থিতিময় ভয় ও আশঙ্কা আবার দুই প্রকার ঃ

(১) এমন ভয় ও আশঙ্কা যাহা উপেক্ষা করার কোন অবকাশই মানুষের জন্য থাকে না। এই শ্রেণীর ভয় ও আশঙ্কা শুধু দুইটি ক্ষেত্রেই হইতে পারে—(ক) নিজ প্রাণের ভয়, যেমন যদি বলা হয় যে, এই কাজ না করিলে তোমাকে প্রাণে বধ করিয়া ফেলিব। (খ) নিজের কোন অঙ্গহানির ভয়, যেমন যদি বলা হয়, এই কাজ না করিলে তোমার হাত, পা, নাক-কান কাটিয়া ফেলিব। এতদ্ভিন্ন এরূপ প্রহার বা যাতনার হুম্‌কী যাহার দ্বারা সাধারণতঃ প্রাণ বধ বা অঙ্গহানি ঘটিবার প্রবল আশঙ্কা থাকে তাহাও এই শ্রেণীরই গণ্য হইবে। ধন সম্পত্তি সম্পূর্ণ ধ্বংস করার হুম্‌কীও এই শ্রেণীভুক্ত।

(২) এমন ভয় ও আশঙ্কা যদ্দরুণ মানুষ ভীত ও বাধ্য হয় সত্যই, কিন্তু প্রথম শ্রেণী অপেক্ষা কম। এই শ্রেণীর ভয় ও আশঙ্কা নানাপ্রকারে হইতে পারে—(ক) সন্তান, মাতা-পিতা বা রক্তের সম্পর্কধারী কোন আত্মীয়কে হত্যা করার বা তাহার অঙ্গহানি ঘটাইবার হুম্‌কী। (খ) তাহার নিজকে বা উল্লেখিত কোন লোককে বেদম প্রহারের হুম্‌কী, কিম্বা দীর্ঘকাল আবদ্ধ বা কারারুদ্ধ রাখার হুমকী।

এই দুই প্রকার ভয় ও আশঙ্কা অপেক্ষা ক্ষীণ কোন ভয় ও আশঙ্কার সম্মুখীন হইলে, উহা বিপদ বটে এবং উহার হুম্‌কী প্রদানকারী জালেম অত্যাচারী গোনাহগার হইবে বটে, কিন্তু বিধানগতভাবে ঐরূপ ভয় ও আশঙ্কার সম্মুখীন ব্যক্তির কার্য্যকলাপের উপর উহার কোন প্রতিক্রিয়া হইবে না। ঐ অবস্থায়ও তাহার কার্য্যকলাপ সাধারণ অবস্থার ন্যায় গণ্য হইবে। পক্ষান্তরে উল্লেখিত দুই প্রকার ভয় ও আশঙ্কার কারণে বিধানগত ভাবেই বিভিন্ন রকমের গভীর প্রতিক্রিয়া হইয়া থাকে যাহার বিবরণ এই—

(১) ঈমান ও ইসলাম বিনষ্টকারী কোন কাজ; যেমন, কুফুরী বাক্য বলা বা মুর্ত্তি ও দেব-দেবীর সামনে মাথা নত করা—এই শ্রেণীর কোন কার্য্যের জন্য দ্বিতীয় প্রকার ভয় ও আশঙ্কার সম্মুখীন হইলে, সেস্থলে বিপদ ও ক্ষয়-ক্ষতি বরণ করিয়া নিবে, ঐ কার্য্য করা জায়েয হইবে না। আর যদি প্রথম প্রকার ভয় ও আশঙ্কার সম্মুখীন হয় তবে অন্তরে ঈমানের পরিপক্কতাকে উপস্থিত রাখিয়া শুধু বাহ্যিকরূপে ঐ কার্য্য করিয়া নিলে তাহা জায়েয হইবে।* কিন্তু যদি ঈমানের মহামায়ায়

---

* এই অবস্থায়ও একটি বিষয়ে সচেষ্ট হইবে, তাহা এই যে, যদি কুফুরী কথা বলিতে বাধ্য হয় তবে যথাসাধ্য এমন শব্দ ব্যবহারের চেষ্টা করিবে যাহার মধ্যে কুফুরী বিহীন অর্থেরও অবকাশ থাকে এবং অন্তরে সেই অর্থেরই নিয়্যত রাখিবে। আর যদি কুফুরী কাজে বাধ্য হয় সেস্থলেও নিয়্যতের মধ্যে কুফুরী পরিহার করিয়া চলিবে। যেমন, দেব-দেবীর সম্মুখে সেজদা করিতে বাধ্য হইলে সেস্থলেও আল্লাহকে সেজদা করার নিয়ত উপস্থিত রাখিবে। এমনকি যদি মোহাম্মদ নাম লইয়া গালি দিতে বাধ্য হয় তবে সেস্থলে মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (দঃ)কে উদ্দেশ্য না করার এবং অন্য কোন মোহাম্মদ উদ্দেশ্য করার নিয়্যত উপস্থিত রাখিবে। (শামী ৫—১১৪)

ঐ কার্য্য না করিয়া বিপদকেই বরণ করিয়া নেয় তবে আল্লাহ তায়ালার নিকট অসীম ছওয়াবের অধিকারী হইবে।

(২) আর যদি কোন অকাট্য হারাম বস্তু খাইতে বা পান করিতে বাধ্য হয় যেমন শূকরের মাংস খাইতে বা মদ্য পান করিতে বাধ্য হয়, তবে ইমাম বোখারী রহমতুল্লাহে আলাইহের মতে যে কোন প্রকার ভয় ও আশঙ্কা, এমনকি যে কোন একজন মোসলমান ভাইকে হত্যা করার হুমকীর দরুণও ঐ হারাম বস্তু হালাল হইয়া যাইবে। হানফী মজহাব মতে কোন মোসলমান ভাইকে হত্যা করার ভয় কিম্বা দ্বিতীয় প্রকারের ভয় ও আশঙ্কার দরুণ উহা জায়েয হইবে না। আর প্রথম প্রকার ভয় ও আশঙ্কার দরুণ উহা শুধু জায়েযই নহে, ওয়াজেব হইয়া পড়িবে। যদি উহা গ্রহণ না করিয়া নিহত হয় তবে অতি বড় গোনাহগার হইবে। অবশ্য যদি কোন কাফেরের সম্মুখে ইসলামের প্রতি মোসলমানদের অনুরোক্তির দৃঢ়তা দেখাইয়া সেই কাফেরকে হেয় ও পরাজিত করার উদ্দেশ্যে হারামকে গ্রহণ না করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দেয়, তবে গোনাহ হইবে না বরং ছওয়াব হইবে।

(৩) অপর কোন মোসলমানকে হত্যা করিতে বা তাহার অঙ্গহানি ঘটাইতে বাধ্য করা হইলে প্রথম বা দ্বিতীয় যে কোন প্রকারের ভয় ও আশঙ্কাই হউক না কেন তাহাতে উহা করা জায়েয হইবে না। যদি প্রথম বা দ্বিতীয় প্রকার বিপদ হইতে নিজকে রক্ষা করার জন্য অপরকে হত্যা বা তাহার অঙ্গহানি করিয়া ফেলে তবে সে গোনাহগার হইবে, কিন্তু উহাতে প্রাণদণ্ড বা অঙ্গের বিনিময়ে অঙ্গহানির শাস্তি আসিলে সেই শাস্তি বাধ্যকারীর উপর প্রবর্ত্তিত হইবে।

(৪) কোন পুরুষ জেনা বা ব্যাভিচার করিতে বাধ্য হইলে যে কোন প্রকার ভয় ও আশঙ্কাই হউক না কেন তাহার জন্য জেনা করা জায়েয হইবে না। যদি সেই অবস্থায় জেনা করে তবে গোনাহগার হইবে, কিন্তু প্রথম প্রকার ভয় ও আশঙ্কার স্থলে তাহার উপর "হদ্দ্" তথা জেনার নির্দ্ধারিত শাস্তি জারি হইবে না। আর দ্বিতীয় প্রকার ভয় ও আশঙ্কার স্থলে তাহার উপর সেই শাস্তিও প্রয়োগ করা হইবে।

কোন মহিলা জেনা করিতে বাধ্য হইলে, যদি ভয় ও আশঙ্কা প্রথম প্রকারের হয়, তবে তাহার জন্য উহা জায়েয হইবে। আর যদি ভয় ও আশঙ্কা দ্বিতীয় প্রকারের হয়, তবে জেনার সুযোগ প্রদান জায়েয হইবে না। যদি দেয় তবে গোনাহগার হইবে, কিন্তু তাহার উপর "হদ্দ্" বা নির্দ্ধারিত শাস্তি প্রয়োগ করা হইবে না।

খলীফা ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর শাসন আমলে এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। খলীফা ওমরের একজন দাস সরকারী ধন-ভাণ্ডারের একটি দাসীর সঙ্গে

বলপুর্ব্বক জেনা করিয়াছিল। খলীফা ওমর (রাঃ) তাঁহার সেই দাসকে জেনার হদ্দ্ তথা শরীয়তে দাস-দাসীর জন্য নির্দ্ধারিত দণ্ডে দণ্ডিত করেন—পঞ্চাশ ঘা বেত্রদণ্ড এবং ছয় মাসের জন্য দেশান্তরিত করার শাস্তি প্রদান করেন। আর দাসীটিকে খালাস দেন।

(৫) যে সকল ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া শরীয়তের বিধানে ইচ্ছা-অনিচ্ছা সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি উভয় অবস্থাতেই সম্পন্ন হইয়া যায়, যেমন বিবাহের ইজাব বা বন্ধনকে কবুল ও গ্রহণ করা, স্ত্রীকে তালাক দেওয়া—এই ক্ষেত্রে হানফী মজহাব মতে কোন প্রকার ভয় ও আশঙ্কার বাধ্যতাই প্রতিবন্ধক হইবে না। সর্ব্বক্ষেত্রেই বিবাহ ও তালাক প্রযোজ্য গণ্য হইবে। অবশ্য বাধ্যকারী জালেম গোনাহগার হইবে। ইমাম বোখারী রহমতুল্লাহে আলাইহের মতে ঐরূপ তালাক ও বিবাহ বাতিল গণ্য হইবে। এমনকি যে কোন মোসলমানকে মারিয়া ফেলার হুমকী দেখাইয়া তালাক বা বিবাহের সম্মতি গ্রহণ করা হইলে পরিণামে সেই তালাক ও বিবাহও বাতিল গণ্য হইবে।

(৬) যে সকল ক্রিয়া শুদ্ধ ও সম্পাদিত হওয়ার জন্য শরীয়তের বিধানে উক্ত ক্রিয়া স্বেচ্ছা প্রণোদিত হওয়া আবশ্যক, যেমন—কোন জিনিষ খরিদ করা, বিক্রি করা, কাহাকেও দান করা, কাহারও জন্য কোন স্বীকারোক্তি করা বা স্বীকৃতি প্রদান করা ইত্যাদি। ইমাম বোখারী রহমতুল্লাহে আলাইহের মতে যে কোন প্রকার ভয় ও আশঙ্কা, এমনকি কোন মোসলমান ভাইকে মারিয়া ফেলার হুমকীর দরুণও ঐ শ্রেণীর কোন ক্রিয়া সাধন করিলে তাহা বাতিল গণ্য হইবে। হানফী মজহাব মতে উহা বাতিল গণ্য হইবে না বটে, কিন্তু ভয় ও আশঙ্কা দুরীভূত হওয়ার পর উহা বহাল রাখা, না রাখা পূর্ণরূপে বাধ্যকৃত ব্যক্তির ইচ্ছাধীন হইবে—বাতিল করিয়া দিলে বাতিল হইয়া যাইবে, আর বহাল রাখিলে বহাল থাকিবে।

হিল্লা করা

"হিল্লা" অর্থাৎ আইন ও বিধানগত কোন কর্ত্তব্যকে এড়াইবার জন্য বা কোন উদ্দেশ্যকে হাসিল করার জন্য এমন কৌশল অবলম্বন করা যদ্বারা আইন ও বিধান ভঙ্গ ব্যতিরেকেই উক্ত কর্ত্তব্যকে এড়ান যায় বা আইন ও বিধানের মারপেঁচ দ্বারাই ঐ উদ্দেশ্য হাসিল হইয়া আসে। এইরূপ হিল্লা করা বৈধ কি না এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে উহার ফলাফল প্রযোজ্য কি না—তাহাই এই শিরোনামার উদ্দেশ্য।

ইমাম বোখারী রহমতুল্লাহে আলাইহের মত্ এই যে, কোন ক্ষেত্রেই কোন প্রকার হিল্লা করা জায়েয নহে এবং তাহা করা হইলে উহার ফলাফল শরীয়তের দৃষ্টিতে প্রযোজ্য নহে। ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহে আলাইহের মত্ এই যে,

আইন ও বিধানের ধারা উপধারার স্বষ্ট প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল (Judicial vieue) আদালতী দৃষ্টিতে সর্ব্বত্র সমান। অর্থাৎ আদালতের দৃষ্টিতে আইন ও বিধানের ধারা-উপধারার ফলাফল প্রত্যেকেই লাভ করিবে ; যদিও কেহ সেই ধারা-উপধারার আওতাভুক্ত হওয়ার সুযোগ হিল্লা ও কৌশল দ্বারাই হাসিল করিয়া থাকে। সুতরাং শরীয়তের আদালত বিভাগীয় নিয়ম মতে হিল্লার ক্ষেত্রেও আইনগত ফলাফল প্রযোজ্য হইবে। অবশ্য হিল্লা অবলম্বনকারীর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাহার দোষী-নির্দ্দোষী হওয়ার ফয়ছালা করা হইবে। উদাহরণ স্বরূপ ইমাম বোখারী (রঃ) কতিপয় হিল্লাযুক্ত মছআলাহ উল্লেখ করিয়াছেন। নিম্নে ঐ সবের বিবরণ দেওয়া হইল—

(১) শরীয়তের বিধানে যাকাত একটি বিশেষ ফরজ। শরীয়তের বিধানেই যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য কতিপয় শর্ত্ত রহিয়াছে এবং সেই সব শর্ত্তের ভিত্তিতে যাকাত ফরজ না হওয়ার বিভিন্ন উপধারাও শরীয়তে আছে। কোন ব্যক্তি যাকাত ফরজ হয়—এই পরিমাণ ধনের ধনী হইয়াও এমন কোন কৌশল অবলম্বন করিল যদ্দরুণ যাকাত ফরজ হওয়ার কোন একটি শর্ত্ত ব্যাহত হওয়ায় উপধারা মতে ঐ ব্যক্তি যাকাতের আওতামুক্ত সাব্যস্ত হয়, সে ক্ষেত্রে ইমাম বোখারীর মতে ঐ ব্যক্তির উপর যাকাত ফরজ থাকিয়া যাইবে। ইমাম আবু হানিফার মতে আদালতের দৃষ্টিতে ঐ ব্যক্তি উপধারার ফল ভোগ করিবে অর্থাৎ যাকাত উসুলের আইনগত চাপ তাহার উপর প্রযোজ্য হইবে না, কিন্তু যদি কৃপণতা ও বখিলী বশে, শুধু কেবল ধন-লিপ্সার উদ্দেশ্যে সে ঐরূপ হিল্লা ও কৌশল অবলম্বন করে, তবে আল্লাহ তায়ালার নিকট দোষী ও অপরাধী গণ্য হইবে।

(২) "(pre-emptio) শোফা-হক্‌" শরীয়তের বিধানেও একটি আইনগত দাবী। কোন ব্যক্তি যদি সেই দাবীর সুযোগ নষ্ট করার জন্য হিল্লা বা কৌশল অবলম্বন করে। যেমন—একটি জমি যাহা বস্তুতঃ দশ হাজার টাকা মূল্যমানের। জমির মালিক উহা এমন এক ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক, যে ঐ জমির প্রতিবেশী নহে ; অথচ অপর এক ব্যক্তি সেই জমির সংলগ্ন প্রতিবেশী আছে। সুতরাং ঐ প্রতিবেশীর শোফা-হক্‌ তথায় বিদ্যমান। কিন্তু জমির মালিক ঐ প্রতিবেশীর নিকট বিক্রি করিবে না বিধায় সে শোফা-হকের দাবী বানচাল করার উদ্দেশ্যে এই কৌশল অবলম্বন করিল যে, দশ হাজার টাকা মূল্যমানের সেই জমির মূল্য বিশ হাজার টাকা নির্দ্ধারিত করিল। বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়ে বিশ হাজার টাকা মূল্যের উপর উক্ত জমির ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত করিল। জমির মালিক মূল্য গ্রহণের সময় শুধু ৯৯৯৯ টাকা গ্রহণ করিল এবং নিদ্ধারিত মূল্যের অবশিষ্ট ১০,০০১ টাকা

নগদ না লইয়া উহার বিনিময়ে স্বেচ্ছায় এমন একটি বস্তু গ্রহণ করিল যাহা বস্তুতঃ মাত্র এক টাকা মূল্যের। এই ভাবে সে তাহার নির্দ্ধারিত মূল্যের অঙ্ক ২০,০০০ হাজার পূর্ণ করিল এবং মিথ্যার আশ্রয় ব্যতিরেকেই ক্রেতার উপর প্রকৃত প্রস্তাবে শুধু ১০,০০০ হাজার টাকাই বর্তিল। এই অবস্থায় প্রতিবেশী ব্যক্তি যদি উক্ত জমির উপর শোফা-হকের দাবী করিতে চায় তবে তাহাকে অবশ্যই পূর্ণ ২০,০০০ হাজার টাকা দিতে হয়। কারণ আসল মূল্য ত তাহাই নির্দ্ধারিত ছিল। আর ইহা অতি সুস্পষ্ট যে, প্রতিবেশী ব্যক্তি দশ হাজার টাকা মূল্যমানের জমি বিশ হাজার টাকায় লইবে না। এই ভাবে তাহার শোফা-হকের দাবী প্রতিহত হইবে।

এ ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফার মত্ এই যে, প্রতিবেশী ব্যক্তি বিশ হাজার টাকায় ঐ জমি ক্রয়ে সম্মত না হইলে আদালতের রায়ে তাহার শোফা-হক্ বাতিল হইয়া যাইবে। কিন্তু জমির মালিক যদি বিনা কারণে তাহাকে তাহার শোফা-হক্ হইতে বঞ্চিত করার এই হিল্লা ও কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকে তবে সে অবশ্যই দোষী ও অপরাধী গণ্য হইবে এবং অপরের হক নষ্ট করার গোনাহে গোনাহগার হইবে। আর যদি প্রতিবেশী ব্যক্তির কোন প্রকার জুলুম অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে সে ঐরূপ করিয়া থাকে, তবে ঐরূপ হিল্লা ও কৌশল করায় তাহার কোন গোনাহ হইবে না।

(৩) হিল্লা করা প্রসঙ্গে ইমাম বোখারী (রঃ) আরও একটি অতিশয় নাজুক মছআলাহ উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা এই—এক ব্যক্তি কোন মহিলার প্রতি আসক্ত, কিন্তু মহিলাটি তাহার সহিত বিবাহে সম্মত হয় না। ঐ ব্যক্তি উক্ত মহিলাকে লাভ করার জন্য এই হিল্লা ও কৌশল করিল যে, মহিলাটির উপর স্বীয় স্ত্রী হওয়ার দাবী করিয়া ইসলামী শাসনের বিচারক বা জজ তথা কাজির নিকট মামলা দায়ের করিল। এবং অমন ভাবে সাজাইয়া সাক্ষীও পেশ করিল যাহাতে কাজি তাহার পক্ষে রায় দিয়া দিল যে, উক্ত মহিলাটি ঐ ব্যক্তির বিবাহিতা স্ত্রী। ফলে মহিলাটি ঐ ব্যক্তির গৃহিণী হইতে বাধ্য হইয়া পড়িল।

এ ক্ষেত্রে ইমাম বোখারী রহমতুল্লাহ আলাইহের মত্ এই যে, মিথ্যা মোকদ্দমা ও মিথ্যা সাক্ষী বিজড়িত এই হিল্লা ও কৌশল হারাম ছিল। সেই হারাম হিল্লায় অধিকৃত গৃহিণীর সহিত সহবাসও অবৈধ হারাম হইবে। ইমাম আবু হানিফার মত্ এই যে, মিথ্যা মোকদ্দমা করা হারাম ও ভয়াবহ আজাবের কবিরা গোনাহ হইয়াছে। মিথ্যা সাক্ষী প্রদান এবং মিথ্যা সাক্ষী সংগ্রহ করাও হারাম ভয়াবহ আজাবের কবিরা গোনাহ হইয়াছে। কিন্তু কাজির রায়ে অধিকৃত গৃহিণীর সহিত সহবাস বৈধ হইবে। উক্ত সহবাসের সন্তান বৈধ হইবে—জারজ হইবে না। এস্থলে ইমাম আবু হানিফার যুক্তিও বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। তিনি বলেন,

ইসলামী শাসনের জজ তথা কাজীকে বিধানগতরূপে এই ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যে, তিনি বিশেষ বিশেষ স্থানে স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। সুতরাং কাজির রায়ে যেরূপ বিবাহ ভাঙ্গিতে পারে তদ্রূপ স্থান বিশেষে তাঁহার রায়ে উহা গড়িতেও পারিবে। অতএব যেভাবে দুইজন সাক্ষীর সহিত তৃতীয় ব্যক্তি নর-নারীর মধ্যে বিবাহ বন্ধন গড়িয়া দেয়, তদ্রূপ আলোচ্য ঘটনায় কাজির রায়কে উক্ত নারী-পুরুষের মধ্যে বিবাহ বন্ধন সৃষ্টিকারী গণ্য করা হইবে এবং মামলার সাক্ষীদ্বয়কে সেই বিবাহের সাক্ষী গণ্য করা হইবে। ইমাম আবু হানিফার এই যুক্তিযুক্ত মতামতটি কতই না সুফলদায়ক! ইহাকে প্রত্যাখ্যান করা হইলে উক্ত পুরুষ ও তাহার প্রাপ্ত গৃহিণীর পরবর্ত্তী সারা জীবনের আচার ব্যবহার ও সহবাস হারামকারীতে পরিণত হইবে এবং তাহাদের সন্তান-সন্ততি জারজ গণ্য হইয়া পরবর্ত্তী বংশধরই কলুষিত হইয়া পড়িবে।

স্বপ্ন ও উহার তা'বীর বা ব্যাখ্যা সম্পর্কে

সুস্বপ্ন বিশেষতঃ নেক লোকদের সুস্বপ্ন একটি উত্তম বস্তু। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নবুয়ত প্রাপ্তির সময় ঘনাইয়া আসিলে নবুয়তের বৈশিষ্ট্য ওহীর আগমন আরম্ভের পূর্ব্বাভাস ও সূচনায় ছিল সত্য ও বাস্তব সুস্বপ্ন। ছয় মাসকাল সুস্বপ্নের আগমণ হইতে থাকার পরই হযরত (দঃ) হেরা-গুহায় প্রত্যক্ষরূপে ফেরেশতা জিব্রাইল (আঃ)এর মারফৎ আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে ওহী প্রাপ্ত হইয়া নবুয়ত লাভ করিয়াছিলেন।

সুস্বপ্ন যে প্রকৃত প্রস্তাবে নবীদের বহু সংখ্যক বৈশিষ্ট্যের একটি প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য এবং নবীর সুন্নতের তাবেদার নেক লোকগণ নবীর সেই বৈশিষ্ট্যটি লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারে তাহা বুঝাইবার জন্য নিম্নে বর্ণিত হাদীছের বিবরণ দান করা হইয়াছে।

২৬০৩। হাদীছঃ— عن انس بن مالك رضى الله تعالى عنه

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الحسنة من الرجل

الصالح جزء من ستة واربعين جزءا من النبوة

অর্থ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, নেক লোকদের সুস্বপ্ন নবুয়তের ছয়চল্লিশ ভাগের এক ভাগ।

ব্যাখ্যাঃ—সুস্বপ্ন যে নবুয়তের বৈশিষ্ট্য সমূহের একটি, শুধু সেই সত্যটি বিশেষ জোরের সহিত বুঝাইবার জন্য উহাকে নবুয়তের একটি ভাগ বা অংশ বলিয়া

আখ্যায়িত করা হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে বৈশিষ্ট্যতা বুঝানই একমাত্র উদ্দেশ্য ; ভাগ বা অংশ হওয়ার বাস্তবতা উদ্দেশ্য নহে। তাই অংশের পরিমাণ সুনির্দ্দিষ্টরূপে নির্দ্ধারিত করার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় নাই এবং বিভিন্ন হাদীছে অংশের মান নির্ণয়ে বিভিন্ন সংখ্যার উল্লেখ রহিয়াছে। কোন হাদীছে পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ, কোন হাদীছে সত্তর ভাগের এক ভাগও বলা হইয়াছে। অবশ্য আলোচ্য হাদীছে যে, ছয়চল্লিশ ভাগের এক ভাগ বলা হইয়াছে উহার একটি বাহ্যিক সূত্র আছে। তাহা এই যে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নবুয়ত কাল ছিল তেইশ বৎসর এবং তাঁহার নিকট সুস্বপ্নের আগমন ছিল ছয় মাস। তেইশ বৎসরের তুলনায় ছয় মাস ছয়চল্লিশ ভাগের এক ভাগই বটে।

আর একটি বিষয় এস্থলে বিশেষরূপে অনুধাবণ করিতে হইবে। তাহা এই যে, প্রকৃত প্রস্তাবেও যদি শুভ স্বপ্ন নবুয়তের একটি অংশ হয়, তবুও উহা লাভ করিয়া কেহ নবুয়তের পদ লাভ করিতে পারে না। যেরূপ ক্লাস ওয়ান টু, থ্রি—এইগুলি গ্রেজুয়েশনের এক একটি প্রাথমিক অংশই বটে ; গ্রেজুয়েশন লাভ করিতে হইলে, ঐ সব ক্লাস অবশ্যই অতিক্রম করিতে হয়, কিন্তু সে জন্য কেহ ওয়ান, টু, থ্রি, ক্লাস পড়িয়াই গ্রেজুয়েটের পদাধিকারী হইতে পারে না।

এই হাদীছের তাৎপর্য্য তদ্রূপই যেরূপ অন্য এক হাদীছে বর্ণিত আছে—হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, "আলেমগণ নবীদের উত্তরাধিকারী। নবীদের ত্যাজ্য সম্পদ হইল এল্‌ম। যে ব্যক্তি সেই এল্‌ম হাসিল করিয়াছে, সে অতি মূল্যবান রত্ন লাভ করিয়াছে।" নবীর ত্যাজ্য সম্পদ এল্‌ম হাসিল করিয়া কেহ নবীর পদ লাভ করিতে পারে না, তদ্রূপ সুস্বপ্ন নবুয়তের অংশ হইলেও উহা দ্বারা কেহ নবুয়তের পদাধিকারী হইতে পারে না।

২৬০৪। হাদীছ ঃ— ওবাদাহ ইবনে ছামেত (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মোমেন ব্যক্তির স্বপ্ন নবুয়তের ছয়চল্লিশ ভাগের এক ভাগ।

২৬০৫। হাদীছ ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মোমেন ব্যক্তির স্বপ্ন নবুয়তের ছয়চল্লিশ ভাগের এক ভাগ।

স্বপ্ন দেখিলে কি করিবে?

২৬০৬। হাদীছ ঃ— আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছেন, তোমাদের কেহ সন্তুষ্টকারী সুস্বপ্ন দেখিলে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করিয়া তাঁহার দরবারে কৃতজ্ঞতা

প্রকাশ করিবে। কারণ, ঐ শ্রেণীর স্বপ্ন আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে দেখান হয় এবং ঐরূপ স্বপ্ন বর্ণনা করা যায়।

আর পছন্দ নয় এরূপ দুঃস্বপ্ন দেখিলে উহার খারাবী হইতে আল্লার আশ্রয় প্রার্থনা করিবে। ঐ শ্রেণীর স্বপ্ন শয়তানের তরফ হইতে দেখান হইয়া থাকে। ঐরূপ স্বপ্ন দেখিয়া কাহারও নিকট উহা ব্যক্ত করিবে না; তাহা হইলে ঐ দুঃস্বপ্নের কোন ক্ষতি তাহার হইবে না।

২৬০৭। হাদীছ ঃ— আবু সালামাহ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কোন কোন স্বপ্নের দরুণ মানসিক চিন্তায় আমি অসুস্থ হইয়া পড়িতাম। একদা আমি ছাহাবী আবু কাতাদাহ (রাঃ) হইতে শুনিলাম—তিনি বলিতে ছিলেন, আমিও কোন কোন স্বপ্ন দেখিয়া এরূপ অসুস্থ হইয়া পড়িতাম। একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট শুনিলাম, ভাল স্বপ্ন আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে দেখান হয়। ঐরূপ পছন্দের স্বপ্ন কেহ দেখিলে, একমাত্র বন্ধু-বান্ধব ছাড়া অন্য কাহারও নিকট উহা বর্ণনা করিবে না। আর নাপছন্দের কোন স্বপ্ন দেখিলে ঐ স্বপ্নের অশুভ পরিণতি ও শয়তানের দুরভিসন্ধি হইতে আল্লার আশ্রয় প্রার্থনা করিবে এবং তিনবার (বাম দিকে) থুথু দিবে ঐরূপ স্বপ্ন কাহারও নিকট বর্ণনা করিবে না (এবং মনে পূর্ণ বিশ্বাস বাঁধিয়া রাখিবে যে,) এই স্বপ্ন তাহার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না।

২৬০৮। হাদীছ ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন। কেয়ামত বা মহাপ্রলয়ের সময় ঘনাইয়া আসিলে মোমেনের স্বপ্ন খুব কমই অবাস্তবায়িত দেখা যাইবে। কারণ, (ঐ সময়ে মোমেনের অধিকাংশ স্বপ্নই আল্লার তরফ হইতে হইবে এবং) মোমেনের স্বপ্ন (যাহা আল্লার তরফ হইতে হয় উহা) নবুয়তের ছয়চল্লিশ ভাগের এক ভাগ। আর যে বস্তু নবুয়তের অংশ হয়, উহা মিথ্যা হয় না।

এস্থলে আলোচ্য হাদীছ বর্ণনাকারী—স্বপ্ন-শাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ জ্ঞানী মোহাম্মদ ইবনে সীরীন (রঃ) বলিয়াছেন, স্বপ্ন তিন প্রকার—(১) স্বীয় আভ্যন্তরীণ ভাব, চিন্তা, প্রলাপ বা স্নায়ুবিক ও মস্তিষ্কের কোন অবস্থায় সৃষ্ট বুদবুদ শ্রেণীর প্রতিক্রিয়া সমূহ। (২) শয়তানের কুপ্রচেষ্টায় সৃষ্ট ভয়-ভীতি ও দুশ্চিন্তা আনয়ণকারী ঘটনা বা দৃশ্যাবলী। (৩) আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে প্রেরিত শুভ ইঙ্গিত। সুতরাং স্বপ্নে অশুভ কোন কিছু দেখিলে তাহা কাহারও নিকট ব্যক্ত করিবে না এবং উঠিয়া যাইয়া নামায পড়িবে।

২৬০৯। হাদীছ ঃ—আবু কাতাদাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, সুস্বপ্ন আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে

দেখান হয়। আর দুঃস্বপ্ন শয়তানের পক্ষ হইতে দেখান হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি এমন স্বপ্ন দেখিবে যাহা পছন্দ নয় সে বাম দিকে তিন বার থুথু দিবে এবং শয়তান হইতে আল্লার আশ্রয় প্রার্থনা করিবে। তাহা হইলে ঐ দুঃস্বপ্নের দরুণ তাহার কোনই ক্ষতি হইবে না।

হযরত (দঃ) ইহাও বলিয়াছেন, শয়তান আমাকে দেখার স্বপ্ন দেখাইতে সক্ষম নহে।

স্বপ্নের ভুল ব্যাখ্যা দিলে বাস্তবে কোন ক্ষতি হয় না

২৬১০। ছাদীছ :—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়া থাকিতেন, একদা এক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিল, অদ্য রাত্রে আমি একটি স্বপ্ন দেখিয়াছি। একটি মেঘখণ্ড মধু এবং ঘি বর্ষন করিতেছে, জনমণ্ডল প্রত্যেকে উহা নিজ নিজ হস্তে সংগ্রহ করিতেছে—কেহ বেশী কেহ কম। আরও দেখিয়াছি, একটি রজ্জু ভূপৃষ্ঠ হইতে আকাশ পর্য্যন্ত; আপনি উহা ধরিয়া আকাশে উঠিয়া গেলেন। আপনার পরে আর এক ব্যক্তি ধরিলেন; তিনিও আকাশে উঠিয়া গেলেন। তাঁহার পরে আর এক ব্যক্তি উহাকে ধরিলেন; তিনিও আকাশে উঠিয়া গেলেন। তাঁহার পরে আর এক ব্যক্তি উহা ধরিলেন; তখন উহা ছিন্ন হইয়া গেল, অতঃপর তাঁহার জন্য রজ্জুটিকে সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইল।

স্বপ্নটি ব্যক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত আবুবকর (রাঃ) বলিয়া উঠিলেন ইয়া রসুলাল্লাহ! আমার মাতা পিতা আপনার চরনে উৎসর্গ—আমাকে সুযোগ দিন; আমি এই স্বপ্নটির ব্যাখ্যা দিব। নবী (দঃ) বলিলেন, আচ্ছা—ব্যাখ্যা করুন।

আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, মেঘ খণ্ড হইল দ্বীন-ইসলাম, মধু ও ঘৃত যাহা বর্ষিত হইয়াছে তাহা হইল পবিত্র কোরআনের মহাস্বাদময় বিষয়বস্তু; উহার জ্ঞান কেহ বেশী লাভ করে কেহ কম। আর আকাশ হইতে জমিন পর্য্যন্ত রজ্জুটি হইল—সেই মহাসত্য (ইসলামের নীতি ও আদর্শ) যাহার উপর আপনি সুপ্রতিষ্ঠিত। উহাকে আপনি সুদৃঢ় রূপে ধারণ করিয়া থাকিবেন এবং আল্লাহ তায়ালা আপনাকে উহার বদৌলতে উচ্চ আসনে পৌঁছাইবেন। অতঃপর আর এক ব্যক্তি উহাকে ধারণ করিবেন, তিনিও উহার বদৌলতে উচ্চ আসনে পৌঁছিবেন। তাঁহার পরে আর এক ব্যক্তি উহাকে ধারণ করিবেন এবং তিনিও উহার বদৌলতে উচ্চাসনে পৌঁছিবেন। অতঃপর আর এক ব্যক্তি উহাকে ধারণ করিবেন, তখন উহা ছিন্ন হইয়া যাইবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উহা তাঁহার জন্য সংযুক্ত করা হইবে এবং তিনিও উহার বদৌলতে উচ্চাসনে পৌঁছিবেন।

আবু বকর (রাঃ) স্বপ্নটির এই ব্যাখ্যা দান করিয়া বলিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ। আমার মাতা পিতা আপনার চরনে উৎসর্গ—বলুন, আমি ঠিক বলিয়াছি, না—ভুল করিয়াছি? নবী (দঃ) বলিলেন, কিছু অংশ ঠিক বলিয়াছেন, কিন্তু কিছু অংশে ভুল করিয়াছেন।

আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! খোদার কসম—আপনি আমার ভুলগুলি ব্যক্ত করিয়া দিবেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, কসম দিবেন না।

ব্যাখ্যা ঃ—উল্লেখিত স্বপ্নের ব্যাখ্যা যাহা আবু বকর (রাঃ) প্রদান করিয়াছিলেন উহাতে ভুল ছিল বলিয়া স্বয়ং নবী (দঃ) বলিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে কাহারও কোন ক্ষতি বা অনিষ্ট হয় নাই। সুতরাং ব্যাখ্যার দরুণ স্বপ্নের পরিণতি ক্ষতিকর ও অনিষ্টকর হওয়ার কোন বাস্তবতা নাই।

কোন কোন হাদীছ দ্বারা এরূপ ধারনা আসে যে, স্বপ্নের ফল উহার ব্যাখ্যা অনুপাতে হইয়া থাকে। এবং বন্ধু বা জ্ঞানী ছাড়া অন্য কাহারও নিকট স্বপ্ন বলিতে নাই। অর্থাৎ শত্রু বা বোকা লোক হয়ত খারাব ব্যাখ্যা দিবে; তাহাতে ক্ষতি ও অনিষ্ট হইতে পারে।

ইমাম বোখারী (রঃ) বুঝাইতে চাহেন যে, ঐ শ্রেণীর হাদীছের উদ্দেশ্য এই যে, কোন অশুভ ব্যাখ্যা শুনিলে স্বাভাবিক ভাবে স্বপ্ন-ওয়ালার মনের উপর একটা খারাব প্রতিক্রিয়া হইবে। মনস্তাত্তিক দিক দিয়া ইহা ক্ষতিকর ও অনিষ্টকর; ইহাতে মানসিক বিভ্রাট ও দুর্ব্বলতা সৃষ্টি হয়। ইহা ভিন্ন স্বপ্নের ভুল ব্যাখ্যা দ্বারা বাস্তব কোন কুফল সংঘটিত হয় না।

● আলোচ্য স্বপ্নটির ব্যাখ্যায় আবু বকর (রাঃ) কি ভুল করিয়াছিলেন সেই প্রসঙ্গকে যখন হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)ই এড়াইয়া গিয়াছেন তখন উহা আবিষ্কার ও নির্দ্ধারিত করণে আমাদের হাতড়ানি নিশ্চয় অবাঞ্ছনীয় হইবে।

হযরত (দঃ)কে স্বপ্নে দেখিলে

২৬১১। হাদীছ ঃ— ان ابا هريرة رضى الله تعالى عنه قال

سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَاٰنِىْ فِى الْمَنَامِ

فَسَيَرَانِىْ فِى الْيَقَظَةِ وَلَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِىْ

অর্থ— আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি—যে ব্যক্তি আমাকে নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নে দেখিবে অচিরেই সে আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখিতে পারিবে এবং শয়তান আমার আকৃতি অবলম্বন করিতে পারে না।

ব্যাখ্যা ঃ— রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জীবদ্দশায় ত এই হাদীছের মর্ম্ম বাস্তবায়িত হওয়া অতি সুস্পষ্ট ছিল যে, কোন ব্যক্তি হযরতের সাক্ষাৎ হইতে দুরে থাকাবস্থায় হযরত (দঃ)কে স্বপ্নে দেখিলে তাহার জন্য সুসংবাদ ছিল যে, অচিরেই সে হযরতের সাক্ষাতে পৌঁছিতে সক্ষম হইবে। পরবর্ত্তী কালের জন্যও ইহার মর্ম্ম বাস্তবায়িত হওয়ার অবকাশ আছে। কেয়ামতের দিন হযরতের সঙ্গে তাহার এক বিশেষ ধরণের সাক্ষাৎ হইবে যাহা সাধারণ ভাবে অন্যদের ভাগ্যে জুটিবে না।

২৬১২। ছাদীছ ঃ— عن انس رضى الله تعالى عنه قال

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَاٰنِىْ فِى الْمَنَامِ فَقَدْ رَاٰنِىْ

فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَكَوَّنُ بِىْ

অর্থ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখিয়াছে বস্তুতঃ সে আমাকেই দেখিয়াছে। কারণ, শয়তান আমার আকার আকৃতি ধারণ করিতে সক্ষম নহে।

২৬১৩। ছাদীছ ঃ— قال ابو قتادة رضى الله تعالى عنه

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَاٰنِىْ فَقَدْ رَاَى الْحَقَّ

অর্থ—আবু কাতাদাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি (স্বপ্নে) আমাকে দেখিয়াছে সে বাস্তবই দেখিয়াছে।

২৬১৪। ছাদীছ ঃ— عن ابى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه

سَمِعَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ رَاٰنِىْ فَقَدْ رَاَى الْحَقَّ

فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَكَوَّنُ بِىْ

অর্থ— আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছেন—যে ব্যক্তি আমাকে (স্বপ্নে) দেখে সে বাস্তবই দেখিল, কারণ শয়তান আমার আকৃতি ধারণে সক্ষম নহে।

ব্যাখ্যা ঃ—এই হাদীছসমুহের সুসংবাদটি অতিশয় সৌভাগ্যের বস্তু। বিশিষ্ট আলেমগণের মতে এই সুসংবাদ শুধু মাত্র ঐ ক্ষেত্রে যেখানে হযরত (দঃ)কে

তাঁহার এরূপ আকার আকৃতিতে দেখা হয় যে আকার আকৃতি হাদীছের মাধ্যমে ছাহাবীদের বর্ণনায় তাঁহার বলিয়া প্রমাণিত আছে। অবশ্য অনেক অনেক আলেমগণ এই শর্ত আরোপ করেন না। তাঁহারা শুধু এতটুকু বলেন যে, যে আকার আকৃতিতেই দেখা হউক, কিন্তু স্বপ্নের মধ্যে সুস্পষ্ট ও দ্বিধাহীনরূপে উপলব্ধি ও বিশ্বাস হওয়া চাই যে, হযরত (দঃ)কে দেখিতেছে।

স্বপ্ন সম্পর্কে বিবিধ তথ্য

● একমাত্র নবীগণের স্বপ্ন ব্যতীত অন্য কোন স্বপ্ন আইন ও বিধানগত প্রমাণ সাব্যস্ত হইতে পারে না। অবশ্য যদি বিভিন্ন লোকের স্বপ্ন দ্বারা কোন একটি বিষয় পরিলক্ষিত হয়, তবে সেই বিষয়টি সম্পর্কে যত্নবান হওয়া উত্তম। যেমন বিভিন্ন ছাহাবীগণ লাইলাতুল-কদরকে স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন। প্রত্যেকের দেখা তারিখই রমজান মাসের শেষ সাত দিনের মধ্যে ছিল বিধায় হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম উহার প্রতি যত্নবান হওয়ার পরামর্শ দিয়াছিলেন।

২৬১৫। হাদীছ ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, কতিপয় লোককে লাইলাতুল-কদরের রাত্রি স্বপ্নে দেখান হইল। প্রত্যেকের পরিদৃষ্ট তারিখ ভিন্ন ভিন্ন হইলেও সব তারিখগুলি রমজান মাসের শেষ সাত দিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সে মতে হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সকলকে পরামর্শ দিলেন, তোমরা লাইলাতুল-কদর লাভ করার জন্য রমজানের শেষ সাত রাত্র এবাদত-বন্দেগীতে বিশেষ তৎপর থাক।

● সাধারণতঃ মোসলমান এবং নেক লোকদের স্বপ্নই ফলিয়া থাকে। কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে অমোসলেম ফাছেক-ফাজের দুষ্ট লোকের স্বপ্নও ফলিয়া থাকে। যেরূপ পবিত্র কোরআনে হযরত ইউসুফ আলাইহেচ্ছালামের কাহিণীতে একটি ঘটনা বর্ণিত আছে—

হযরত ইউসুফ (আঃ) জেলখানায় থাকা কালে তথায় দুই জন কয়েদী দুইটি স্বপ্ন দেখিল। একজন দেখিল, তাহার মাথায় রুটির বোঝা এবং পাখীর দল তাহার মাথা হইতে সেই রুটি ঠোক্‌রাইয়া খাইতেছে। অপর জন দেখিল, সে আঙ্গুর ফল হইতে রশ বাহির করিতেছে।

হযরত ইউসুফ আলাইহেচ্ছালামের ন্যায় মহতী মানুষের প্রতি জেলখানার সকলেই আকৃষ্ট ছিল। তাই ঐ কয়েদীদ্বয় তাঁহার নিকট আসিয়া নিজ নিজ স্বপ্ন ব্যক্ত করিল। হযরত ইউসুফ (আঃ) প্রথম ব্যক্তিকে বলিলেন, বিচারে তোমার প্রাণদণ্ড হইবে এবং শুলিকাষ্ঠে তোমাকে হত্যা করা হইলে পর পাখীর দল তোমার মাথার মগজ ঠোক্‌রাইয়া খাইবে। অপর ব্যক্তিকে বলিলেন, বিচারে

তুমি মুক্তি পাইবে এবং স্বীয় মনীবের জন্য আঙ্গুরের সুরা সংগ্রহের চাকুরী পাইবে। তাহাদের উভয়ের স্বপ্নের ফলন ঐরূপই ফলিয়া গেল। তাহারা উভয়েই অমোসলেম এবং অপরাধী আসামী ছিল।

● বিশ্বকোষের চাবি প্রাপ্তি-স্বপ্নের ফল—

২৬১৬। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে আমাকে ব্যাপক অর্থের সংক্ষেপ বাক্য বলার বিশেষ শক্তি দেওয়া হইয়াছে। শত্রুর উপর ভয়-ভীতি পতিত হওয়ার বিশেষ প্রভাব দান করিয়া আমাকে বিশেষরূপে সাহায্য করা হইয়াছে।

গত রাত্রে আমি নিদ্রায় ছিলাম, স্বপ্নে আমাকে বিশ্বকোষের ছাবিগুচ্ছ দেওয়া হইল—উহা আমার হস্তগত করিয়া দেওয়া হইল।

আবু হোরায়রা (রাঃ) এই হাদীছ বয়ান করিয়া বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই স্বপ্ন দেখিয়া দুনিয়া হইতে চলিয়া গিয়াছেন। হে মোসলমানগণ! এখন তোমরা সেই স্বপ্নের ফল আহরণ করিতেছ।

ব্যাখ্যা ঃ—হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পরে তাঁহার খলীফাদের আমলে বিশেষতঃ খলীফা ওমর (রাঃ) এবং খলীফা ওসমানের আমলে তৎকালীন বিশ্বের বৃহত্তম রাষ্ট্রদ্বয় রোম ও পারস্যের পতন ঘটিয়াছিল। উক্ত রাষ্ট্রদ্বয় সম্পূর্ণরূপে মোসলমানদের করতলগত হইয়াছিল এবং প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের সমুদয় ধন-ভাণ্ডার মোসলমানদের মধ্যে বিতরিত হইয়াছিল। মোসলমানদের হাতে উক্ত রাষ্ট্রদ্বয়ের পতন বস্তুতঃ তৎকালীন বিশ্বের সমুদয় রাষ্ট্রেরই পতন ছিল এবং ইহাই যে, হযরতের আলোচ্য স্বপ্নের ফলন ছিল তৎপ্রতিই আবু হোরায়রা (রাঃ) তাঁহার মন্তব্যে ইঙ্গিত করিয়াছেন।

আলোচ্য হাদীছের প্রথম বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যা এই কেতাবের প্রথম খণ্ডের মুখবন্ধে দেওয়া হইয়াছে। বিষয়টি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয় বিষয়টি সম্পর্কে কোন কোন রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে, সুদীর্ঘ এক মাসের পথের দূরত্বে থাকিয়া শত্রু ভীত ও প্রকম্পিত হইত। কিন্তু হযরতের এই বৈশিষ্ট্যটি হিজরী পঞ্চম সালে অনুষ্ঠিত খন্দকের জেহাদের পরে লাভ হইয়াছিল। তাই ইহার পূর্ব্বে ত শত্রুগণ হযরতকে আক্রমণ করার জন্য মদীনার দিকে চলিয়া আসিত, কিন্তু ইহার পরে আর ঐরূপ ঘটনা ঘটে নাই।

● রূপক আকৃতি ছাড়াই কোন বস্তু হুবহু স্বপ্নে পরিদৃষ্ট হইতে পারে—

২৬১৭। হাদীছঃ— আবছল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, অদ্য রাত্রে আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি—আমি যেন কাবা শরীফের নিকটে উপস্থিত। তথায় এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলাম—যাহার শরীর অতি সুন্দর শ্যামল, মাথায় অতি সুন্দর বাবরি আঁচড়াইয়া রাখিয়াছে, (এই মাত্র যেন গোসল খানা হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে, তাই অতিশয় পরিচ্ছন্ন এবং) মাথা হইতে পানি ঝরিতেছে। ঐ ব্যক্তি ছুইজন লোকের কাঁধে ভর করিয়া কাবা শরীফের তওয়াফ করিতেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম এই ব্যক্তি কে? বলা হইল, তিনি মরয়্যাম-পুত্র ঈছা মছীহ্ (আঃ)।

অতঃপর আর এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলাম যাহার মাথার চুল অতিশয় কোঁকড়ানো, ডান চক্ষুটা এরূপ দোষল—যেন চোখের তারাটা বাহির হইয়া আছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম এই ব্যক্তি কে? বলা হইল সে কানা-দজ্জাল।

ব্যাখ্যাঃ—হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) এই স্বপ্নে ঈসা (আঃ)কে যে আকৃতিতে দেখিয়াছিলেন উহা তাঁহার বাস্তব রূপই ছিল এবং কানা-দজ্জালকে যে আকৃতিতে দেখিয়াছিলেন উহাই তাহার আকৃতি হইবে।

● এই অধ্যায়ে ইমাম বোখারী (রঃ) বিভিন্ন কতিপয় বস্তু স্বপ্নে দেখার তা'বীর বা ফলাফল হাদীছ দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন, যথা—(১) দুগ্ধ পান করার ফল—এলম তথা দ্বীন ও ইসলামের জ্ঞান লাভ হওয়া। (২) গায়ে জামা দেখার ফল—জামার পরিমাপে দ্বীনের প্রভাব হওয়া। (৩) সবুজ বাগান দেখার অর্থ স্থান বিশেষে বেহেশত। (৪) মজবুত কড়া বা আংটা ধরিয়া থাকার ফল—দ্বীন-ইসলামের উপর সুদৃঢ় থাকা। (৫) বেহেশতে প্রবেশ করার ফল—নেক্‌কার হওয়া। (৬) লোহার আংটায় পা আবদ্ধ দেখার অর্থ—দ্বীন ও ধর্ম্মে দৃঢ়পদ হওয়া। (৭) গলায় ফাঁদ দেখার অর্থ—পরিণাম অশুভ হওয়া। (৮) কাহারও জন্য প্রবাহমান নদী-নালা দেখার অর্থ—ঐ ব্যক্তির আমল এরূপ হওয়া যাহার ছওয়াব সর্ব্বদা জারী থাকিবে। (৯) কূপ হইতে পানি উঠাইয়া লোকদিগকে পান করানোর অর্থ—তাহার দ্বারা লোকদের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হওয়ার ব্যবস্থা হইবে। (১০) কোন বস্তু উড়িয়া যাইতে দেখার ফল—উহার বিলুপ্তি। (১১) কোন প্রকার মহামারী এলাকা হইতে কুৎসিত বিশ্রী নারীকে বাহির হইয়া যাইতে দেখার অর্থ—সেই মহামারী ঐ অঞ্চল হইতে স্থানান্তরিত হওয়া। (১২) তরবারি ভাঙ্গিয়া যাওয়ার অর্থ—নিজের দল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া।

স্মরণ রাখিতে হইবে, উল্লেখিত স্বপ্ন সমূহের যে যে অর্থ বর্ণিত হইল, তাহা স্থান বিশেষে হযরত (দঃ) কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। সর্ব্বস্থানে উহাই হইবে তাহার

বাধ্যবাধকতা নাই। কারণ, স্বপ্নের ব্যাপারে নানারূপ সূক্ষ্ম তারতম্যের পরিপ্রেক্ষিতে একই বস্তু এবং একই শ্রেণীর স্বপ্নের বিভিন্ন তা'বীর বা অর্থ দাঁড়াইয়া থাকে এবং ঐসব তারতম্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা সকলের জন্য সহজ সাধ্য নহে।

ভয়ভীতির স্বপ্ন দেখিয়াও যদি সেই স্বপ্নের মধ্যেই সান্ত্বনাও পাওয়া যায় তবে উহা সুস্বপ্নই

২৬১৮। **ছাদীছঃ**—* আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সময়ে অবিবাহিত যুবক ছিলাম। আমার ঘর-সংসার ছিল না। আমি মসজিদেই শুইয়া থাকিতাম।

রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবীগণ বিভিন্ন স্বপ্ন দেখিয়া হযরতের নিকট উহা ব্যক্ত করিতেন। হযরত (দঃ) আল্লার ইচ্ছায় ঐ সবের ব্যাখ্যা প্রদান করিতেন। আমি মনে মনে ভাবিতাম এবং নিজকে তিরস্কার করিতাম যে, তোর মধ্যে সৌভাগ্য থাকিলে তুইও এই লোকদের ন্যায় স্বপ্ন দেখিতে পাইতে।

একদা আমি শুইবার সময় এই দোয়া করিয়া শুইলাম—হে আল্লাহ! আপনার নিকট যদি আমার জন্য সৌভাগ্য থাকে, তবে আমাকে স্বপ্ন দেখাইবেন যেন আমি রসূলুল্লাহ (দঃ) হইতে উহার ব্যাখ্যা লাভ করিতে পারি। এই বলিয়া আমি নিদ্রামগ্ন হইয়া পড়িলাম এবং স্বপ্নে দেখিলাম, আমার নিকট দুইজন ফেরেশতা আসিয়াছেন। তাঁহাদের উভয়ের হাতেই লোহার গুর্জ্জ বা গদা রহিয়াছে। তাঁহারা আমাকে সঙ্গে নিয়া অগ্রসর হইলেন। আমি তাঁহাদের উভয়ের মধ্যস্থলে থাকিয়া চলিতে লাগিলাম। আমি দোয়া করিতে ছিলাম—হে আল্লাহ। আমি জাহান্নাম হইতে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। অতঃপর আরও একজন ফেরেশতার সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার হাতেও একটি লোহার গদা। তিনি আমাকে বলিলেন, ভয় পাইও না; তুমি ভাল মানুষ—কতই না ভাল হইত যদি তুমি বেশী করিয়া নামায পড়িতে!

অতঃপর ফেরেশতাগণ আমাকে সঙ্গে নিয়া জাহান্নামের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং আমাকে জাহান্নামের সম্মুখে নিয়া দাঁড় করাইলেন। উহার চতুষ্পার্শ্ব কূপের ন্যায় উঁচু, কূপের পার্শ্বস্থ খুঁটির ন্যায় উহারও চতুর্দিকে অনেক খুঁটি আছে এবং প্রতি দুইটি খুঁটির মধ্যস্থলে লোহার গদা হাতে এক একজন ফেরেশতা দাঁড়াইয়া আছেন। উহার মধ্যে অনেক লোক—মাথা নীচের দিকে পা উপরের দিকে

* এই হাদীছ খানা অত্র অধ্যায়ে তিন স্থানে উল্লেখ হইয়াছে, উহার সমষ্টির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তরজমা করা হইয়াছে।

শিকলে বাঁধা অবস্থায় ঝুলান রহিয়াছে। উহাদের মধ্যে কোরায়েশ গোত্রীয় কতিপয় লোককে আমি চিনিতেও পারিলাম।

তারপর ফেরেশতাগণ আমাকে তথা হইতে ডান দিকে লইয়া চলিলেন। আমার হাতে যেন এক খণ্ড রেশমের কাপড় রহিয়াছে। আমি বেহেশতের যে কোন জায়গায় যাওয়ার ইচ্ছা করি ঐ রেশমখণ্ড আমাকে নিয়া উড়িয়া চলে।

এই স্বপ্ন আমি (আমার ভগ্নি—উম্মুল-মোমেনীন) হাফ্‌ছার নিকট বর্ণনা করিলাম এবং তিনি উহা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট বর্ণনা করিলেন। হযরত (দঃ) বলিলেন, তোমার ভ্রাতা আবদুল্লাহ নেক্‌কার মানুষ; সে তাহাজ্জোদ নামায বেশী পড়িলে বড় ভাল হইত। সেই দিন হইতে আবদুল্লাহ (রাঃ) বেশী পরিমাণে তাহাজ্জোদ নামায পড়িতেন।

মিথ্যা স্বপ্ন বয়ান করা

২৬১৭। হাদীছ:— عن ابى عباس رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من تحلم بحلم لم يره كلف ان يعقد بين شعيرتين ولن يفعل ومن استمع الى حديث قوم وهم له كارهون او يفرون منه صب فى اذنيه الآنك يوم القيمة ومن صور صورة عذب وكلف ان ينفخ فيها وليس بنافخ

অর্থ— ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যারূপে এমন স্বপ্ন বর্ণনা করে যাহা সে দেখে নাই; কেয়ামতের দিন তাহাকে বাধ্য করা হইবে দুইটি জবের দানায় গিড়া লাগাইবার জন্য। (অন্যথায় আজাব হইবে;) কিন্তু দুইটি জবের দানায় গিড়া লাগানো সম্ভবই হইবে না, (ফলে তাহার আজাব ভোগ করিয়া যাইতে হইবে।)

যে ব্যক্তি অন্য লোকের গোপন কথা শুনিতে তৎপর হয়, অথচ তাহারা ইহাতে অসন্তুষ্ট অথবা তাহারা অপর হইতে পালাইয়া কথা বলিয়াছে। কেয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তির উভয় কানে সীসা ঢালিয়া দেওয়া হইবে।

যে ব্যক্তি ছবি তৈরী করে কেয়ামতের দিন তাহাকে বাধ্য করা হইবে তাহার তৈরী ছবির মধ্যে আত্মা দেওয়ার জন্য, কিন্তু সে আত্মা প্রদানে সক্ষম হইবে না, (ফলে ভীষণ আজাব ভোগ করিতে থাকিবে)

২৬২০। **হাদীছ ঃ—** عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَفْرَى الْفِرَى

أَنْ يُرِىَ عَيْنَيْهِ مَا لَمْ تَرَيَا

অর্থ— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, সর্ব্বাধিক বড় মিথ্যা—যাহা দেখে নাই তাহা দেখিয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা।

এই অধ্যায়ে ইমাম বোখারী (রঃ) বিভিন্ন হাদীছ দ্বারা এই সব বিষয়ও প্রমাণ করিয়াছেন—(১) রাত্রি কালের স্বপ্ন এবং দিনের বেলার স্বপ্ন উভয়ই সমপর্য্যায়ের। (২) পুরুষের স্বপ্ন এবং নারীর স্বপ্ন উভয়ই সমপর্য্যায়ের। (৩) স্বপ্নের ব্যাখ্যা সর্ব্বপ্রথম যাহা দেওয়া হইবে তাহাই ফলিবে—এরূপ বাধ্য-বাধকতা নাই; উহা ভুলও হইতে পারে!

এই উক্তির দ্বারা ইমাম বোখারী (রঃ) দুর্ব্বল সাক্ষ্যে প্রাপ্ত অপর একটি হাদীছের খণ্ডন করিয়াছেন। হাদীছটির মর্ম্ম এই যে, "কোন স্বপ্নের সর্ব্বপ্রথম যে ব্যাখ্যা দেওয়া হইবে তাহাই ফলিবে।" এই হাদীছ খানা প্রাপ্তির সাক্ষ্য ও সূত্র দুর্ব্বল, ইহার বিপরীত মজবুত সাক্ষ্য ও সূত্রে প্রাপ্ত হাদীছ দ্বারা ইমাম বোখারী প্রমাণ করিয়াছেন, সর্ব্বপ্রথম ব্যাখ্যা ভুল হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন উক্ত হাদীছের উদ্দেশ্য ইহাও হইতে পারে যে, স্বপ্ন যে-সে লোকের নিকট বলিতে নাই। কারণ, প্রথমই যদি ঐ স্বপ্নের কোন অপব্যাখ্যা কানে আসে তবে উহা ভুল হইলেও মনের মধ্যে তদ্দারা একটা অশান্তি ও দুর্ব্বলতা সৃষ্টি হইতে পারে যাহার প্রতিক্রিয়া ও পরিণাম অত্যন্ত আশঙ্কাজনক।

ফেৎনা-ফসাদ—বিপর্য্যয়-বিশৃঙ্খলার প্রাদুর্ভাবের উপর আলোকপাত ঃ

২৬২১। **হাদীছ ঃ—** সায়ীদ ইবনে আম্‌র (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি ছাহাবী আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সঙ্গে মসজিদে নববীতে বসিয়া ছিলাম, মারওয়ানও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। ঐ সময় আবু হোরায়রা (রাঃ) হাদীছ বয়ান করিলেন—হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) ভবিষ্যদ্বানী করিয়াছেন, আমার উম্মতের ভীষণ ক্ষতির সূচনা হইবে কোরায়েশ বংশীয় কাঁচা বয়স্ক যুবক শাসনকর্ত্তাদের হাতে।

ইহা শুনিয়া মারওয়ান বলিয়া উঠিলেন, ঐরূপ যুবক শাসকগণ আল্লার লা'নতের উপযুক্ত। আবু হোরায়রা (রাঃ) আরও বলিলেন, হযরতের বিস্তারিত বয়ান মারফৎ আমি সেই যুবক শাসকদের পরিচয় এত সুস্পষ্টরূপে জ্ঞাত আছি যে, ইচ্ছা করিলে আমি তাহাদের বংশ বিবরণও বর্ণনা করিতে পারি।

ব্যাখ্যা ঃ—উল্লেখিত যুবক শাসকদের প্রথম ব্যক্তি ছিল এজীদ। তাহার শাসন আমলে মোসলমানদের পার্থিব উন্নতি অনেকই হইয়াছিল। বহু দেশ জয় হইয়াছিল এবং মোসলমানদের প্রভাব প্রতিপত্তি বহু গুণে বাড়িয়া ছিল। কিন্তু তাহার নিজের ফাছেকী কার্য্যকলাপ, চরিত্রহীনতা এবং স্বেচ্ছাচারিতা, অপকর্ম্ম ও উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপন এবং শাসন ক্ষমতার অপব্যবহার মোসলেম জাতির নৈতিকতার পতনই নয় শুধু, বরং ধ্বংসের সূচনা করিয়াছিল। রাষ্ট্রপ্রধান ও শাসকগোষ্ঠীর ফাছেকী কার্যকলাপ, অন্যায় আচরণ তাহার হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। আর শাসকগোষ্ঠী স্বেচ্ছাচারী দুর্নীতি পরায়ণ ও ন্যায়-অন্যায়ে অন্ধ হইলে উহার তাছির সমগ্র জাতির উপর পড়িয়া থাকে এবং উহাই জাতির নৈতিক ধ্বংস। আর সেই নৈতিক ধ্বংসই কালক্রমে বাহ্যিক ধ্বংসে পরিণত হয়।

এস্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এজীদ দুর্নীতি পরায়ণ শাসকরূপ ধারণ করিয়াছিল তদ্দরুণ ছাহাবী মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহুর উপর কোন গ্লানি আসিতে পারে না। কারণ, গণ নির্ব্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধান নিঃস্বার্থভাবে জাতির কল্যাণ ও মঙ্গল কামনায় যদি তাঁহার উত্তরাধীকারী মনোনীত করেন তবে উহা গণ-সমর্থন সাপেক্ষে অনৈসলামিক গণ্য হয় না। এজীদের প্রাথমিক জীবন যাহা মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহুর সম্মুখে ছিল তাহা ত্রুটি পূর্ণ ছিল না। তাহার বীরত্ব, অদম্য সাহস এবং ইসলামী যোশ তখন সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত।

একদা হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার পরবর্ত্তীকালে স্বীয় উম্মতের একটি দুর্গম অভিযানের ভবিষ্যদ্বাণীতে বলিয়াছিলেন, সেই অভিযানে অংশ গ্রহণকারী সকলেই মগফুর তথা জীবনের সমস্ত গোনাহ হইতে ক্ষমাপ্রাপ্ত হইবে। ঐতিহাসিকগণের সাক্ষ্যে ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান যে, সেই অভিযানের সর্ব্বাধিনায়ক ছিলেন এই এজীদ। ছাহাবীগণও এজীদের সেই অভিযানকে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর উদ্দেশ্য সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। এমনকি আবু আইয়ুব আনছারী (রাঃ), আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ), আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর ন্যায় প্রবীণ বিশিষ্ট ছাহাবীবর্গ হযরতের সুসংবাদ দৃষ্টে ক্ষমার্হদের দলভুক্ত হওয়ার অভিলাষে এজীদের অধীনে উক্ত অভিযানে শরীক হইয়াছিলেন।

মানুষ আলেমুল-গায়েব নয়, তাই সে তাহার কার্য্যের উপস্থিত অবস্থার জন্য দায়ী। কোন রকম উপস্থিত ত্রুটি না থাকিলে ভবিষ্যতের অবস্থার জন্য কেহ দায়ী

হয় না। মোয়াবিয়া (রাঃ)এর সম্মুখে মোসলেম সমাজে ইসলাম বহির্ভূত খারেজী ফের্কার আবির্ভাব ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছিল তাহাদের দ্বারাই খলীফা ওসমান (রাঃ) ও খলীফা আলী (রাঃ) শহীদ হইয়াছিলেন। ইহার বৃত্তান্ত পরিশিষ্টে আলোচিত হইবে। ঐরূপ ফের্কার প্রাদুর্ভাব যে, মোসলমানদের জন্য কত বড় ক্ষতিকর তাহা সহজেই অনুমেয়। তাহাদের প্রাদুর্ভাব দমনের গুরুদায়িত্ব এড়াইবার জন্যই খলীফা হাসান (রাঃ) খেলাফতের বোঝা মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহুর উপরে ন্যাস্ত করিয়া নিজে উহা হইতে অব্যাহতি লাভ করেন। মোয়াবিয়া (রাঃ) সেই দায়িত্ব পালনে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। এই খারেজী ফের্কার প্রাদুর্ভাব দমনকারীর জন্য হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অনেক সুসংবাদও বিভিন্ন হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে। মোয়াবিয়া (রাঃ) স্বয়ং সেই সুসংবাদে ধন্য হইয়া তাঁহার পরে অদম্য সাহস ও বীরত্বের অধিকারী এজীদকে ঐ দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত ভাবিয়া ছিলেন এবং বিশৃঙ্খলার আশঙ্কাময় পরিস্থিতির মধ্যে মোসলেম সমাজের মঙ্গল ও কল্যাণ কামনার ভিত্তিতেই তিনি এজীদকে তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোণীত করিয়াছিলেন।

মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহুর বর্ত্তমানে এজীদ দুশ্চরিত্র ও অনাচারী ছিল না এবং এজীদ তাঁহার ছেলে—এই প্রভাবে তিনি তাহাকে উত্তরাধিকারী মনোণীত করেন নাই। ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিজ মুখের উক্তিতে লক্ষ্য করুন। একদা তিনি সর্ব্বসমক্ষে প্রদত্ব ভাষনের মধ্যে বলিলেন—

اللهم ان كنت تعلم انى وليته لانه فيما اراه اهل لذلك فاتمم له ما وليته وان كنت وليته لانى احبه فلا تتمم له ما وليته

البداية والنهاية ج ٨ -

"হে আল্লাহ এজীদকে উত্তরাধিকারী মনোনয়নে তুমি যদি জান যে, আমি তাহাকে যোগ্যতম পাত্র পাইয়াই পরবর্ত্তী খলীফা পদের জন্য মনোনয়ন দান করিয়াছি তবে আমার এই কার্য্যকে তুমি সুসম্পন্ন কর। আর যদি এই মনোনয়ন দানে সে আমার পুত্র হওয়ার ভালবাসার বিন্দু মাত্র প্রভাব থাকিয়া থাকে, তবে তুমি এই মনোনয়ন কখনও বাস্তবায়িত হইতে দিও না।" বিশিষ্ট ছাহাবী মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর অন্তরের নির্ম্মলতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করাও গুরুতর অন্যায় হইবে।

এজীদকে পরবর্ত্তী খলীফা হওয়ার মনোনয়ন দানে মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পক্ষ হইতে জবরদস্তি করা এবং ক্ষমতা ও শক্তি প্রয়োগ করার যে সব অলীক কাহিনী ইতিহাসরূপে সচরাচর বর্ণিত দেখা যায় উহা সম্পূর্ণ গর্হিত। এই সব ইতিহাসরূপী মিথ্যা কাহিনী খারেজী ফের্কার জন্ম দেওয়া। পরবর্ত্তী যুগে এই সব মিথ্যা বিবরণ ভাল লোকদের সঙ্কলনে ও রচনাবলীতে স্থান লাভ করিয়াছে—তাহা অতীব দুঃখজনক হইয়াছে। কিন্তু ইহা প্রকৃত ইতিহাস নহে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে মানুষ আলেমুল-গায়েব হয় না। মোয়াবিয়া (রাঃ) এজীদের দ্বারা মোসলেম সমাজের মঙ্গল ও কল্যাণ আশা করিয়াছিলেন। তাহার দ্বারা মোসলমানদের রাষ্ট্রীয় উন্নতি সাধিতও হইয়াছিল, কিন্তু কালক্রমে সে স্বেচ্ছাচারী, অনাচারীও হইয়াছিল। তাহার হইতেই মোসলেম সমাজের নৈতিক অবনতিই নয় শুধু, বরং নৈতিক বিকৃতির সূচনা হইয়াছিল এবং ঐ অবনতি ও বিকৃতিই পরে এই উম্মতের ধ্বংসের কারণ হইয়াছে।

মোসলেম সমাজের অবনতি ও বিকৃতি এবং ধ্বংসের সূচনা যে এজীদের আমল হইতে আরম্ভ—এর পূর্ব্ব হইতে নয়; তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, আলোচ্য হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী আবু হোরায়রা (রাঃ) সর্ব্বদা দোয়া করিতেন, "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি ৬০ হিজরী সনের আরম্ভ হইতে।" বস্তুতঃ ৬০ হিজরী সন হইতেই এজীদ ক্ষমতাসীন হইয়াছিল। আল্লাহ তায়ালা আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহুর এই দোয়া কবুলও করিয়াছিলেন। তিনি ৬০ হিজরী সনের পূর্ব্বেই ৫৭, ৫৮ বা ৫৯ হিজরী সনে ইহজগত ত্যাগ করেন।

২৬২২। হাদীছঃ উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মদীনাস্থ একটি উঁচু টিলার উপর দাঁড়াইয়া ছিলেন। তথা হইতে নীচের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, একটি দৃশ্য আমার দৃষ্টিগোচর হইতেছে; তোমরা কি তাহা দেখিতেছ? ছাহাবীগণ বলিলেন, আমরা ত কিছু দেখিতেছি না। হযরত (দঃ) বলিলেন, নিশ্চয় আমি দেখিতেছি, বৃষ্টি বর্ষণের ন্যায় বিপর্য্যয়-বিশৃঙ্খলা তোমাদের গৃহগুলিকে ঘিরিয়া লইতেছে।

ব্যাখ্যাঃ—হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পরে কালক্রমে মোসলেম সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির মাধ্যমে নানাপ্রকার অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটিবে। ঐসব ঘটনাবলীর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মোসলমানদের প্রাণকেন্দ্র মদীনার ঘরে ঘরেও দেখা দিবে। আল্লাহ তায়ালার কুদরতে উহারই অগ্রিম চিত্র হযরত (দঃ) দেখিতেছিলেন। তাহাই সতর্ক করণরূপে উপস্থিত উম্মতের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন।

২৬২৩। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج قالوا يا رسول الله ايما هو قال القتل القتل -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, (কেয়ামত ঘনাইয়া আসিলে এই সব অবস্থার সৃষ্টি হইবে—) সময় দ্রুতগামী মনে হইবে। কাজ কম হইবে। কৃপণতা ও কাঠিন্য লোকদের স্বভাবে পরিণত হইবে। উৎকণ্ঠাজনক অবাঞ্ছিত ঘটনাবলীর প্রাদুর্ভাব হইবে। হত্যাকাণ্ডের আধিক্য হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ—সময় দ্রুতগামী মনে হওয়ার অর্থ—সময়ের বরকত থাকিবে না, সময়ের অনুপাতে কাজ হইবে না এবং সময়ের অপচয়ের অনুভূতিও হইবে না। সুতরাং সময়ের ফল তথা কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি করিলে একটি দিন যেন একটি ঘণ্টার ন্যায়, একটি সপ্তাহ একটি দিনের ন্যায়, একটি মাস একটি সপ্তাহের ন্যায়, একটি বৎসর একটি মাসের ন্যায় মনে হইবে। কাজ কম হওয়ার অর্থ এইযে, মানুষের মধ্যে বেশী ও বড় বড় কথা বলার প্রবণতা দেখা দিবে, কিন্তু কাজ করার মনোবল হইবে অতি ক্ষীণ।

২৬২৪। হাদীছ ঃ— عن عبد الله وابى موسى رضى الله عنهما قال النبى صلى الله عليه وسلم ان بين يدى الساعة لاياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القتل -

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) এবং আবু মূছা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামত বা মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বে একটা যুগ এরূপ আসিবে যখন দ্বীনের অজ্ঞতা অতিশয় বাড়িয়া যাইবে। দ্বীনের জ্ঞান ও এল্‌ম বিলুপ্ত হইয়া যাইবে এবং খুনাখুনি বৃদ্ধি পাইবে।

২৬২৫। হাদীছ ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী (দঃ) বলিয়াছেন, কেয়ামতের পূর্ব্বে খুনাখুনির যুগ আসিবে। তখন দ্বীনের জ্ঞান ও এল্‌ম থাকিবে না। অজ্ঞতা বাড়িয়া যাইবে। যাহাদের জীবদ্দশায় কেয়ামত বা মহাপ্রলয় সংঘটিত হইবে তাহারা হইবে মানব সমাজের সর্ব্বাধিক ও জঘন্যতম মানুষ।

২৬২৬। **হাদীছ**ঃ—যোবায়ের ইবনে আদী (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা ছাহাবী আনাছ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট তৎকালীন (অত্যাচারী শাসনকর্ত্তা) হাজ্জাজ সম্পর্কে জনগণের প্রতি তাহার অন্যায় অত্যাচারের অভিযোগ করিলাম। তিনি বলিলেন, তোমরা ধৈর্য্য ধারণ কর; নিশ্চয় জানিও, যেই সময়টা অতিবাহিত হইয়া যায় পরবর্ত্তী সময় তদপেক্ষা অধিক খারাব আসিবে—যাবৎ না প্রভু-পরওয়ারদেগারের দরবারে পৌঁছিবে। এই তথ্য আমি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট শুনিয়াছি।

ব্যাখ্যাঃ—কোন শাসনকর্ত্তার অন্যায় অত্যাচার যদি ব্যক্তিগত পর্য্যায়ে হয় এবং তাহার দ্বারা দেশের ও দশের সার্ব্বিক উন্নতি ব্যাহত না হইয়া সেই উন্নতি দ্বীন-দুনিয়ার দিক দিয়া উর্দ্ধ মুখীই থাকে সে ক্ষেত্রে শান্তি ও শৃঙ্খলা অক্ষুন্ন রাখার খাতিরে ধৈর্য্য ধারণ করাই শ্রেয়।

অতীত সময় অপেক্ষা আগত সময় অধিক খারাব হওয়া মোসলমানদের পক্ষে শুধু দুনিয়ার জিন্দেগীতেই সীমাবদ্ধ। তাহাও দুনিয়ার সাধারণ অবস্থারূপে এই উক্তি করা হইয়াছে। ক্ষেত্র বিশেষে ইহার ব্যতিক্রম না হওয়া অবধারিত নহে।

২৬২৭। **হাদীছ**ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَكُوْنُ فِتَنٌ اَلْقَاعِدُ فِيْهَا خَيْرٌ

مِّنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيْهَا خَيْرٌ مِّنَ الْمَاشِىْ وَالْمَاشِىْ فِيْهَا خَيْرٌ مِّنَ

السَّاعِىْ مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ فَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً اَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهٖ -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, অচিরেই নানারকম অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটিবে। (ঐ সবের সহিত যাহার সম্পর্ক যতই কম হইবে সে ততই উত্তম গণ্য হইবে—) উহার প্রতি তাকাইবার উদ্দেশ্যে দাঁড়ানো ব্যক্তি অপেক্ষা বসা ব্যক্তি উত্তম। উহার প্রতি যে পা বাড়াইবে তাহার অপেক্ষা শুধু দাঁড়াইয়া আছে ঐরূপ ব্যক্তি উত্তম। উহার প্রতি ধাবমান ব্যক্তি অপেক্ষা ধীর পদক্ষেপকারী উত্তম।

ঐ ঘটনাবলীর প্রতি যে তাকাইবে উহা তাহাকেই জড়াইয়া লইবে। অতএব যে ব্যক্তি উহা হইতে দূরে থাকিবার কোন আশ্রয় পাইবে তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য হইবে সেই আশ্রয় গ্রহণ করা।

ব্যাখ্যা ঃ—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পর কালক্রমে মোসলেম সমাজের মধ্যে মোনাফেক—রাফেজী ও খারেজী ফের্কাদের দ্বারা পরস্পর যে রক্তক্ষয়ী বিরোধ ও বিবাদ সৃষ্টি হয় আলোচ্য হাদীছের ভবিষ্যদ্বাণীর প্রথম লক্ষ্যস্থল উহাই। উক্ত ফের্কাদ্বয়ের বিস্তারিত বিবরণ ইনশাআল্লাহ তায়ালা পরিশিষ্টে বর্ণিত হইবে।

২৬২৮। হাদীছ ঃ—হোযায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, সকলেই হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লালাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট হইতে ভাল তথা ছওয়াব ও শান্তির বিষয়াবলী সম্পর্কে খোঁজ নিয়া থাকিত। আর আমি খোঁজ নিতাম মন্দ তথা গোনাহ ও অশান্তির বিষয়াবলী সম্পর্কে; এই ভয়ে যে, ঐ শ্রেণীর কোন বিষয় যেন আমাকে পাইয়া না বসে।

সেমতে একদা আমি বলিলাম, ইয়া রসুলুল্লাহ! আমরা অন্ধকার, অজ্ঞতা, পাপাচার ও সকল প্রকার খারাবীর মধ্যে নিমজ্জমান ছিলাম। তৎপর আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে সত্যের আলো—শান্তি ও শিষ্টতার আকর এই ইসলাম দান করিয়াছেন। সেই ইসলামের আলো ও শিষ্টতা আমাদের মধ্যে পূর্ণরূপে বিকশিত হওয়ার পর আবার কি মন্দের প্রাবল্য ও অন্ধকারের ঘনঘটার প্রাদুর্ভাব হইবে? হযরত (দঃ) বলিলেন, হাঁ। আমি আরজ করিলাম, সেই মন্দের অন্ধকার যাইয়া পুনঃ শিষ্টতার আলো আসিবে কি? হযরত (দঃ) বলিলেন আসিবে, কিন্তু উহাতে ধূয়াঁ মিশ্রিত থাকিবে। জিজ্ঞাসা করিলাম, ধূয়াঁর উদ্দেশ্য কি? হযরত (দঃ) বলিলেন, মোসলেম সমাজে এমন সব লোকদের আবির্ভাব হইবে যাহারা আমার তরীকা ও নীতি ছাড়া অন্য নীতিও অবলম্বন করিবে। তাহাদের কোন কোন কাজ ভালও দেখিতে পাইবে এবং কোন কোন কাজ মন্দও দেখিতে পাইবে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এই শ্রেণীর শিষ্টতার পর পুনঃ মন্দের প্রাবল্য হইবে কি? হযরত (দঃ) বলিলেন, হঁা—এমন লোকদের আবির্ভাব হইবে যাহাদের অবস্থা এরূপ যে, তাহারা যেন জাহান্নামের দ্বারে দাঁড়াইয়া সকলকে উহারই প্রতি ডাকিতেছে। তাহাদের ডাকে যে সাড়া দিবে তাহারা তাহাকে জাহান্নামে ফেলিবে।

আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! ঐ শ্রেণীর লোকদের পরিচয় আমাদিগকে জ্ঞাত করুন। হযরত (দঃ) বলিলেন, (বহিরদৃশ্যে তাহারা খাঁটী মোসলমানদের হইতে কোন ভিন্ন ধরণের হইবে না—) তাহারা মোসলমানদেরই বংশধর হইবে। মুখে মুখে তাহারাও ঐ কথাই বলিবে যাহা মোসলমানগণ বলিয়া থাকে। আমি আরজ করিলাম, ইয় রসুলুল্লাহ! ঐ শ্রেণীর লোকদের আবির্ভাবের যুগ যদি আমাকে পাইয়া বসে তবে আমার কর্তব্য সম্পর্কে আপনার আদেশ ও

পরামর্শ কি ? হযরত (দঃ) বলিলেন, খাঁটী মোসলমানদের জমাতকে এবং মোসলমানদের সুপ্রতিষ্ঠিত ইমাম বা নেতাকে আঁকড়াইয়া থাকিবে। আমি আরজ করিলাম, যদি ঐ সময় খাঁটী মোসলমানদের সংঘবদ্ধ কোন জমাত ও প্রতিষ্ঠিত কোন নেতা না থাকে তবে কি করিব ? হযরত (দঃ) বলিলেন, খাঁটী মোসলমানদের সংঘবদ্ধ জমাত বা দল না থাকিয়া অন্য যত দলই থাকুক সব দল হইতে তুমি বিচ্ছিন্ন থাকিবে। গাছের শিকড় কামড় দিয়া থাকিতে হইলেও ঐসব হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিতে সচেষ্ট এবং মৃত্যু আসা পর্য্যন্ত এই অবস্থার উপরই সুদৃঢ় থাকিবে।

ব্যাখ্যা :—এই অস্থায়ী জগতের একটি স্বাভাবিক অবস্থা—ভালর পরে মন্দ, সৎ-এর পরে অসৎ, শিষ্টতার পরে দুষ্টতার আবির্ভাব ও প্রভাব হইয়া থাকে। এই গমনাগমন ও পরিবর্ত্তনের মধ্যে ধীরে ধীরে ও ধাপে ধাপে ভাল, সৎ ও শিষ্টতার ক্ষয়, অবনতি ও হ্রাসপ্রাপ্তি এবং অসৎ, দুষ্টতা ও মন্দের উন্নতি ও বিস্তার লাভই সাধারণ ভাবেও পরিলক্ষিত হইবে। এবং শেষ ফলেও তাহাই হইবে ; ইহার বিপরিত অবস্থা দেখা গেলে তাহা অতি সাময়িক হইবে। এই অবস্থা যে মোসলেম সমাজেও দেখা দিবে—হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) সেই ভবিষ্যদ্বাণী ও সতর্কবাণীই আলোচ্য হাদীছে করিয়াছেন।

ভাল-মন্দের এই গমনাগমান ও অবর্ত্তন-বিবর্ত্তন পূর্ব্বেও হইয়াছে, সম্মুখেও হইতে থাকিবে। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের তিরোধানের পরে মোসলেম সমাজে প্রথম যে, এই পরিবর্ত্তন দেখা দিবে উহা সম্পর্কে হযরত (দঃ) তিনটি ধাপের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন—(১) মন্দের আবির্ভাব, (২) মন্দের ধূয়াঁ যুক্ত ভালর পুনঃ প্রবর্ত্তন, (৩) অধিক মন্দের প্রাদুর্ভাব।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পরে ঘটনা প্রবাহের মধ্যে উক্ত তিনটি ধাপের নির্দ্ধারণ সম্পর্কে বোখারী শরীফের সুপ্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকার হাফেজ ইবনে হজর (রঃ) যে মত ব্যক্তি করিয়াছেন তাহা সর্ব্বাধিক উত্তম ও অগ্রগণ্য মনে হয়।

হিজরী ২৫ সনে আবদুল্লাহ ইবনে সাবা নামক এক ইহুদী-বাচ্চা মোনাফেক রূপে ইসলামের নাম গ্রহণ করিয়া মোসলেম সমাজে প্রবেশ করে এবং মোসলমানদের শক্তি, সমৃদ্ধি, শান্তি ও শৃঙ্খলা বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে ঐ সবের মূল—মোসলমানদের সুপ্রতিষ্ঠিত সুদৃঢ় খেলাফত দুর্গের উপর আক্রমণের ষড়যন্ত্র আঁটিতে থাকে। তখন খলীফা ছিলেন ওসমান (রাঃ)। তাঁহার বিরুদ্ধে কুৎসা ও মিথ্যা অপবাদের ঝড় বহাইতে সেই মোনাফেক আবদুল্লাহ ইবনে সাবার ষড়যন্ত্র সফল হয়। এই ভাবে হযরতের পর সর্ব্ব প্রথম মোসলেম সমাজে মন্দের সূচনা হয়। সেই মন্দের স্রোতেই খলীফা ওসমান (রাঃ) শহীদ হন এবং মোনাফেক আবদুল্লাহ ইবনে সাবার

সৃষ্ট সন্ত্রাসবাদী দল যাহারা পরবর্ত্তী ইতিহাসে "রাফেজী" ফের্কা নামে অভিহিত হইয়াছে তাহাদের প্রাবল্য কিছু দিন প্রকাশ্যরূপে বিরাজমান থাকে। এমনকি পবিত্র মদীনাকেও সে প্রাবল্য ঘিরিয়া ফেলে এবং উহার দ্বারা বিপর্য্যয়-বিশৃঙ্খলা মদীনার ঘরে ঘরে প্রবেশ করে। যেই অবস্থার অগ্রিম ইঙ্গিত ২৬২২ নং হাদীছে ব্যক্ত হইয়াছে। এই সব ঘটনাবলীই আলোচ্য হাদীছে উল্লেখিত পরিবর্ত্তনের প্রথম ধাপ তথা পূর্ণ ভালর পর মন্দের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য।

তারপর অচিরেই রাফেজী ফের্কার সৃষ্ট ঐ মন্দের স্রোতকে বন্ধ করার ব্যবস্থা হয়। খলীফা আলী (রাঃ) সর্ব্বপ্রথম ঐ ফের্কার বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়া তাহাদের কোমর ভাঙ্গিয়া দেন। প্রথমে তাহারা তাঁহারই দলে গা-ঢাকা দিয়া থাকে এবং গোপন ষড়যন্ত্র ও কূটনীতি দ্বারা মোসলমানদের মধ্যে বিভেদ ও বিবাদ সৃষ্টি করিতে প্রয়াস পায়; এমনকি তাহারা গোপনে বিরাট দল সৃষ্টি করতঃ আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। এই পর্য্যায়ে তাহাদিগকে ইতিহাসে খারেজী ফের্কা নামে অবিহিত করা হয়। খলীফা আলী (রাঃ) তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তাহাদের বিরাট সংখ্যাকে হত্যা করেন এবং তাহাদের প্রাবল্য স্তিমিত করিয়াদেন। আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পরে মোয়াবিয়া (রাঃ) খলীফা হইয়া উক্ত খারেজী ফের্কাকে ভীষণ ভাবে পদদলিত করেন। এই উদ্দেশ্য সাধনে মোয়াবিয়া (রাঃ) কোন কোন এলাকায় কঠোর ব্যক্তিকে গভর্ণর বা শাসনকর্ত্তা নিয়োগ করেন এবং তাহারা অন্যায় অত্যাচার চালায়— যেমন, কুফার গভর্ণর যেয়াদ। আলোচ্য হাদীছে উল্লেখিত দ্বিতীয় ধাপ তথা মন্দের পর ধূয়াঁযুক্ত ভালর উদ্দেশ্য এই আলী (রাঃ) ও মোয়াবিয়া (রাঃ) রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর শাসন আমল। তাঁহারা উভয়ে নিজ নিজ সময়ে খলীফা বরহক হইয়া রাফেজী ও খারেজী ফের্কার সৃষ্ট ব্যাপক বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির স্রোতের মুখে বাঁধার সৃষ্টি করতঃ শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু আলী রাজিয়াল্লাহু আনহুর আমলেও মন্দের ধূয়াঁ মিশ্রিত থাকে যে, রাফেজী ফের্কার সন্ত্রাসবাদীগণ গা-ঢাকা দিয়া মোনাফেকী করিয়া তাঁহার দলে ভিড়িয়া থাকে এবং তাহারা গোপনে গোপনে ষড়যন্ত্র করিয়া মোসলমানদের মধ্যে বিভেদ ও বিবাদ সৃষ্টি করিয়া বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির ছোবল মারিতে থাকে। মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর আমলেও মন্দের ধূয়াঁ মিশ্রিত থাকে যে, তাঁহার কোন কোন শাসনকর্ত্তা দুষ্টের দমনে শিষ্টদের উপরও অত্যাচার উৎপীড়ন চালায়—যেমন, কুফার শাসনকর্ত্তা যেয়াদ।

মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পরে মোসলমানদের এক কেন্দ্রিক শাসন কায়েম থাকে। কিন্তু খারেজী ফের্কার সন্ত্রাসবাদীদের সশস্ত্র অভ্যুত্থান ও ভিন্ন

শাসন কায়েমের অপচেষ্টার ঘটনা পর পর হইতেই থাকে। আলোচ্য হাদীছে উল্লেখিত তৃতীয় ধাপ তথা মন্দের ধূঁয়া মিশ্রিত ভালর পর মন্দের প্রাদুর্ভাব ও জাহান্নামের প্রতি আহ্বানকারী লোকদের কথা বলিয়া খারেজী ফের্কার সন্ত্রাসবাদ-মূলক কার্য্যকলাপ ও ষড়যন্ত্র এবং এই দলের অভ্যুত্থানকারী বিদ্রোহীগণের প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। (ফতহুল বারী, ১৩—৩০)

রাফেজী ফের্কার ও খারেজী ফের্কার সৃষ্ট ফেৎনা-ফাসাদের ইতিহাস ইনশা-আল্লাহ তায়ালা অত্র গ্রন্থের পরিশিষ্টে বর্ণিত হইবে।

২৬২৯। হাদীছ ঃ—হোযায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদেরে দুইটি তথ্য শুনাইয়া ছিলেন। উহার একটির যথার্থতা আমি নিজ চোখে দেখিয়াছি, অপরটি দেখার অপেক্ষায় আছি।

প্রথমটি হইল আমানতদারী—দায়িত্ববোধ, শিষ্টতা ও নৈতিকতা গুণের উৎপত্তি এবং উহার প্রসার সম্পর্কে। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, আমানতদারী গুণটি মানুষের মধ্যে সৃষ্টিগত ভাবেই রহিয়াছে। অতঃপর কোরআন ও হাদীছের শিক্ষায় উক্ত গুণের উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। (ফলে কোরআন হাদীছের শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রত্যেক মোসলমান উক্ত গুণে গুণান্বিত হইয়াছিল।)

দ্বিতীয় তথ্যটি হইল উক্ত গুণের হ্রাসপ্রাপ্তি ও বিলুপ্তির বর্ণনা সম্পর্কে। (অর্থাৎ কোরআন-হাদীছের শিক্ষা ও সাধনায় উক্ত গুণের চরম উন্নতি ও উৎকর্ষ বিস্তারের পর পারিপার্শ্বিক দোষে এবং উক্ত গুণ বিনষ্টকারী রিপুর প্রভাবে যে, উক্ত গুণের দ্রুত ক্ষয় ও বিলুপ্তি হইবে তাহার বর্ণনা দানে।) হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, (উক্ত গুণের ক্ষয় ও বিলুপ্তি এত দ্রুত সাধিত হইবে যে,) কোন কোন লোক দিনের শেষ বেলা পর্য্যন্ত আমানতদারী গুণের ধারক ও বাহক ছিল, (কিন্তু দুষিত পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া বা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য রিপুসমূহের কোন রিপুতে আক্রান্ত হইয়া) রাত্রি যাপনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার উক্ত গুণ ক্ষীণ হইয়া যাইবে—তাহার দিল ও অন্তরের অন্তস্থল হইতে আমানতদারী গুণ উঠিয়া যাইবে। অর্থাৎ খাঁটী অন্তরে উক্ত গুণের প্রতি তাহার আকর্ষণ থাকিবে না। চর্ম্মের উপরে যেরূপ তিল হয় (যাহার কোন মুল মাংসের ভিতরে থাকে না) তদ্রূপ ঐ ব্যক্তির দিলের উপরে উপরে আমানতদারীর শুধু একটু রং বাকি থাকিয়া যাইবে; (দিলের ও মনের ভিতরে আমানতদারীর প্রতি কোন টান বা আকর্ষণ মোটেই থাকিবে না।)

পরের দিনে তাহার উক্ত গুণের অবশিষ্টাংশের আরও অবনতি ঘটিবে। (চর্ম্ম-তিলের স্থায়িত্ব ও মজবুতী আছে, আগুনে পোড়া ফোস্কার কোনই স্থায়িত্ব নাই।

গতকল্য যে ব্যক্তি আমানতদারী-গুণের অবশিষ্টাংশ তিলের ন্যায় ছিল যাহার মূল ছিল না, শুধু উপরে উপরে বাহ্যিক রং রূপে ছিল, কিন্তু মজবুত ছিল ;) আজ রাত্রি যাপনের সঙ্গে সঙ্গে দিলের উপরের সেই রংটুকুও অতি ক্ষণস্থায়ী ফোস্কার ন্যায় হইয়া যাইবে। যেরূপ একটি অগ্নি-আঙ্গার পায়ের উপর গড়াইয়া দিলে ফোস্কা ফুলিয়া উঠিবে যাহার ভিতরে কোন মজবুত বস্তু থাকে না, ফলে উহা অতি ক্ষণস্থায়ী হয় এবং অচিরেই উহার বিলুপ্তি ঘটে। তদ্রূপ ঐ ব্যক্তির আমানতদারী-গুণের অবশিষ্ট রংটুকু ক্ষণস্থায়ী হইয়া অচিরেই বিলুপ্ত হইবে। এই ভাবে সমস্ত লোকই আমানতদারী বিহীন হইয়া যাইবে। তাহারা পরস্পর লেনদেনের আদান-প্রদানের কাজ করিবে বটে, কিন্তু কেহই কোন কাজ আমানতদারীর সহিত করিবে না।

আমানতদার লোকের এত অভাব পরিলক্ষিত হইবে যে, কোন কোন গোত্রে ও বংশে হয়ত একজন আমানতদার ব্যক্তির খবর শুনা যাইবে মাত্র।

আমানতদারী বিলুপ্ত হইয়া মানুষের ভাবধারাই পাল্‌টিয়া যাইবে। যাহার ভিতরে আমানতদারী ও ঈমানদারীর লেশ মাত্র থাকিবে না (—দাগাবাজী, ধোকাবাজী প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, মিথ্যা জালিয়াতীর দ্বারা যে ব্যক্তি স্বার্থ সিদ্ধিতে পটু হইবে) তাহাকেই বলা হইবে, কি বুদ্ধিমান ! কি চালাক চতুর ! কি সাহসী !

প্রথম তথ্যটির যথার্থতা হোযায়ফা (রাঃ) পূর্ণরূপেই দেখিয়াছিলেন। উহার বর্ণনা দানে তিনি বলেন, এক যুগ আমাদের উপর এরূপ গিয়াছে যে, যে কোন লোকের সঙ্গে লেনদেন আদান-প্রদানের কাজ-কারবার বিনা দ্বিধায় করিয়াছি। সে লোক মোসলমান হইলে তাহার ইসলাম ও আমানতদারীই তাহাকে আমার প্রাপ্য বুঝাইয়া দিতে বাধ্য করিত। আর অমোসলেম হইলে আমনতদার শাসন পরিচালকদের প্রভাব প্রাপ্য হক্ আদায়ে বাধ্য করিত।

দ্বিতীয় তথ্যটির বাস্তবতার পূর্ণরূপ যদিও হোযায়ফা (রাঃ) দেখিতে পান নাই, উহার শুধু অপেক্ষাই করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু উহার আরম্ভ ও সূচনা তিনি দেখিয়াছেন। উহার বর্ণনা দানে তিনি বলেন, প্রথম অবস্থার যুগ শেষ হইয়া আমানতদার লোকের সংখ্যাল্পতা এই পর্য্যায়ে পৌঁছিয়াছে যে, গণা-বাছা কতিপয় লোক ব্যতীত অন্য কাহারও সঙ্গে লেনদেন আদান-প্রদানের কাজ করিতে সাহস হয় না।

ব্যাখ্যা ঃ—আলোচ্য হাদীছে "আমনতদারী" বলিতে শুধু মানুষের পরস্পর আদান-প্রদানের বা কাজ-কারবারে বিশ্বস্ততা কিম্বা গচ্ছিত বস্তুর ব্যাপারে বিশ্বস্ততাই উদ্দেশ্য নহে। এস্থলে আমানতদারীর উদ্দেশ্য হইল—দায়িত্ববোধ, নৈতিকতা ও শিষ্টতার সমষ্টি এমন একটি গুণ যাহার প্রভাবে অন্যের যে কোন হক্ প্রাপ্য

বা দায়িত্ব নিজের উপর আসিলে মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত্তরূপে—নিজ হইতে তাহা আদায় করিতে উদ্‌গ্রীব হইবে। তদুপরি এস্থলে অন্যের হক্‌ বলিতে শুধু অন্য মানুষের হক্‌ ও প্রাপ্যই উদ্দেশ্য নহে, বরং সর্ব্বাগ্রে স্বীয় সৃষ্টিকর্ত্তা, রক্ষাকর্ত্তা পালনকর্ত্তার হক্‌ এবং সেই হক্‌ আদায়ের দায়িত্বও উদ্দেশ্য। সুতরাং এই আমানতদারীর প্রধান প্রতিক্রিয়াই হইবে ঈমান ও ইসলাম তথা সৃষ্টিকর্ত্তা, রক্ষাকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা প্রভু-পরওয়ারদেগারের অস্তিত্ব ও একত্বের প্রতি এবং তাঁহার মহা বাণী ও মহান প্রতিনিধির প্রতি শুধু বিশ্বাস স্থাপনই নয়, বরং সর্ব্বান্তঃকরণে সেই বিশ্বাসকে কার্য্যতঃ গ্রহণ করা। সেই গুণটির উন্নতি ও উৎকর্ষেই মানুষ ইসলামের সমুদয় অনুশাসন তথা সৃষ্টিকর্ত্তা, পালন-কর্ত্তার আদেশ-নিষেধাবলীর অনুগত হইতে বাধ্য হয়।

দায়িত্ববোধ, নৈতিকতা ও শিষ্টতার এই গুণ যাহাকে আমানতদারী বলা হইয়াছে এই গুণটি একমাত্র মানবেরই বৈশিষ্ট্য। সৃষ্টির অন্য কোন শ্রেণীর মধ্যে এই গুণটি নাই। মানুষের উপর ঈমান ইসলাম ও সমুদয় ফরজ-ওয়াযেবের দায়িত্ব ন্যস্ত করার মূলেও রহিয়াছে এই গুণটিই।

সৃষ্টির গোড়াপত্তনে মানবের সম্মতি ও অভিপ্রায় অনুসারেই আল্লাহ তায়ালা মানুষের মধ্যে এই গুণটি রাখিয়াছেন। মানুষ এই গুণের বাহক হওয়ার কারণেই বেহেশত লাভের চাবিকাঠি ঈমান ইসলাম ও ফরজ-ওয়াযেবের বোঝা তাহার কাঁধে চাপান হইয়াছে—যেই বেহেশতের লালসায়ই মানব আমানতদারী গুণের বাহক হইয়াছিল। ফল ভোগ করিতে চাহিলে উহার দায়িত্বের বোঝা অবশ্যই উঠাইতে হয় এবং বোঝা বহনে স্বীকৃতির পর উহা বহন না করিলে শুধু ফল ভোগ হইতেই বঞ্চিত থাকে না, তাহাকে শাস্তিও ভোগ করিতে হয়। ঈমান ইসলামের বোঝা বহন হইতে পলায়নকারীর সেই শাস্তিই হইল দোযখ।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা এই বিষয়টির পূর্ণ ও সুস্পষ্ট বিবরণ দান করিয়াছেন :—

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ
أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ……

"(বেহেশতের যোগ্যতা দানকারী ঈমান ইসলাম এবং উহার কর্ত্তব্যাবলীর দায়ী সাব্যস্ত হওয়ার মূল ভিত্তি—) আমানতদারী প্রস্তাব বহনের প্রশ্ন সুপ্ত আকাশ, ভূমণ্ডল ও পাহাড়সমূহের সম্মুখেও আমি রাখিয়া ছিলাম। উহারা সকলেই তাহা বহনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিয়াছিল এবং উহার দায়িত্বকে ভয় করিয়াছিল। কিন্তু মানব উহাকে বহন করিয়াছিল। (২২ পারা—ছুরা আহ্‌যাব শেষ রুকু)

শেখ ফরিদ আত্তার (রঃ) কাব্যে এই বিষয়ের প্রতিই ইঙ্গিত করিয়া বলিয়াছেন :—

کردۀ بارِ امانت را قبول — از کشیدن پس نباید شد ملول

আমানতদারী গুণ বহনে স্বীকৃতি দিয়াছ ; এখন উহার দায়িত্ব পালনে মোটেই গড়িমশি করা চাই না।"

স্মরণ রাখিবেন ! আমানতদারীর উক্ত গুণটি সৃষ্টিগতভাবে সব মানুষের মধ্যেই থাকে এবং ঐ গুণটি মানুষের অন্যান্য সৃষ্টিগত শক্তি ও গুণাবলীর ন্যায় পরিপুষ্টকারী অবলম্বনের সাহায্যে উন্নতি লাভ করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে ক্ষতিকারক পরিবেশ বা বিনষ্টকারী ব্যাধির আক্রমণ বা শত্রুর আক্রমণ দ্বারা উহার অবনতিও ঘটিয়া থাকে। এমনকি ধীরে ধীরে বিলুপ্তও হইয়া যায়। যেমন মানুষের মধ্যে সৃষ্টিগত ভাবে চলনশক্তি রহিয়াছে। শিশু অবস্থায় তাহাকে হাটা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করিলে এবং ঐ শক্তির পরিপুষ্টকারী খাদ্য সামগ্রী শিশুকে খাওয়াইতে থাকিলে অবিলম্বেই সে হাটিতে শিখিবে। আরও উন্নতি করিয়া সে দৌড়াইতে সক্ষম হইবে। নিয়মিত অভ্যাস দ্বারা ৫।১০ মাইল অতি দ্রুত বেগে দৌড়িতে পারিবে। পক্ষান্তরে যদি শিশুকে এমন পরিবেশে রাখা হয় যেখানে তাহার হাটিবার সুযোগ মোটেই নাই বা কোন ব্যাধির আক্রমণে তাহার পা শুকাইয়া যায় কিম্বা শিশুকাল হইতেই পদদ্বয় বাঁধিয়া রাখা হয় তবে সে হাটিতে শিখিবে না। ধীরে ধীরে তাহার সৃষ্টিগত চলনশক্তি বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

তদ্রূপ কোরআন-হাদীছের শিক্ষা লাভ, উক্ত শিক্ষার পরিবেশ এবং ঐ শিক্ষার রঙ্গে রঞ্জিত সমাজ-ব্যবস্থা ও জীবন ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণের দ্বারা সৃষ্টিগত আমানতদারী গুণের অপরিসীম উন্নতি লাভ হইয়া থাকে ; যেরূপ হইয়াছিল ছাহাবী তাবেয়ী, তাবয়ে-তাবেয়ীগণের। পক্ষান্তরে কোরআন-হাদীছের আলোহীন অন্ধকার যুগ ও পরিবেশের অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকিয়া ঐ সৃষ্টিগত আমানতদারী গুণ মোটে উদ্ভাসিতই হইতে পারে না। তদ্রূপ উদ্ভাসিত হওয়ার পর বিপরীত প্রভাব বা ক্ষতিকর ব্যাধির আক্রমণে দুর্ব্বল হইতে থাকে, এমনকি ধীরে ধীরে বিলুপ্তির পর্য্যায়ে আসিয়া যায়। আলোচ্য হাদীছে আমানতদারী গুণের মূল উৎস বর্ণনা করার পর উহার উন্নতি ও অবনতির এই সব স্তরের প্রতিই আলোকপাত করা হইয়াছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—উল্লেখিত হাদীছ দ্বারা ইমাম বোখারী (রঃ) এস্থলে প্রমাণ করিয়াছেন যে, মন্দের প্রাবল্যের যুগে মোসলমানের কর্ত্তব্য হইবে মন্দ লোকদের সঙ্গে আদান-প্রদানের আচার-অনুষ্ঠান যথা সাধ্য পরিহার করিয়া চলা। যেমন, ছাহাবী হোযায়ফা (রাঃ) তাঁহার যুগে মন্দের সূচনার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,

গণা-বাছা কতিপয় আমানতদার ব্যক্তি ব্যতীত কাহারও সহিত কোন আদান-প্রদান করিতে আমি প্রস্তুত নহি।

এ সম্পর্কে আর একখানা হাদীছের প্রতি ইমাম বোখারী (রঃ) ইঙ্গিত করিয়াছেন।

আবদুল্লাহ ইবনে আম্‌র (রাঃ) ছাহাবীকে একদা হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবদুল্লাহ ইবনে আম্‌র! তুমি যদি ভাল লোকদের অতীত হওয়ার পর মন্দ লোকদের পরিবেশে পতিত হও যাহাদের মধ্যে বিশ্বস্ততা ও আমানতদারীর অভাব হইবে এবং তাহাদের পরস্পর বিরোধ সৃষ্টির দরুণ একে অন্যের বিপরীত হইয়া দাঁড়াইবে, তবে তুমি কি করিবে? ছাহাবী আরজ করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনি এই ব্যাপারে আমাকে কি পরামর্শ দেন? হযরত (দঃ) বলিলেন, যতটুকু ভাল দেখিবে উহা গ্রহণ করিবে এবং মন্দকে বর্জ্জন করিবে। আর ঐরূপ পরিবেশে নিজকে মন্দ হইতে বাঁচাইয়া রাখার চেষ্টা করিবে; অপরের প্রতি তাকাইবে না। (ফতহুল-বারী ১৩—৩২)

ফেৎনা-ফাছাদকারীদের দলের সঙ্গেও থাকিতে নাই

২৬৩০। হাদীছঃ— আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (রসুলুল্লাহ (দঃ) হিজরত করিয়া চলিয়া আসিবার পরেও) কিছু সংখ্যক মোসলমান নিজেদের ইসলামকে লুকাইয়া রাখিয়া মোশরেকদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া থাকিত। এমনকি মোশরেকরা যখন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আসিত তখন ঐ মোসলমানরাও তাহাদের দলের সঙ্গে থাকিত।

কোন সময় ঐ শ্রেণীর কোন লোকের উপর মোসলমানদের তীরের বা তরবারির আঘাত লাগিয়া যাইত এবং সে নিহত হইত। ঐরূপ লোকদের সম্পর্কেই আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযেল করিয়াছেন—

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ ...... أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ

"যে সমস্ত লোকের আত্মা নিবার জন্য ফেরেশতাগণ আসেন তাহাদের ঐরূপ অবস্থায় যে, তাহারা (মোশরেকদের দলের সঙ্গে থাকিয়া) নিজেদেরই ক্ষতিকারক অপরাধে লিপ্ত—তাহাদেরে ফেরেশতাগণ ধমক-স্বরে জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমরা (দ্বীনের বিধি-বিধান পালনে) কি অবস্থায় ছিলে? তাহারা বলিবে, দেশে আমরা দুর্ব্বল ছিলাম। (তাই সবলদের কারণে আমরা দ্বীন পালন করিয়া চলিতে সক্ষম হই নাই।) ফেরেশতাগণ তাহাদেরে তিরস্কার করিয়া বলিবেন, আল্লার জগত কি সুপ্রসস্ত ছিল না—যে, তোমরা অন্যত্র হিজরত করিয়া যাইতে? ঐ শ্রেণীর লোকদের বাসস্থান হইবে জাহান্নাম। (৫ পাঃ ১১ রুঃ)

ফেৎনা-ফাছাদ ও বিপর্য্যয় বিশৃঙ্খলার প্রাবল্য কালে পল্লীনিবাস অবলম্বন করা

২৬৩১। হাদীছ ঃ—ছাহাবী সালামাতুবনুল আক্ওয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (হিজরী ৭৪ সালের ঘটনা, তৎকালীন ইতিহাস প্রসিদ্ধ অত্যাচারী শাসনকর্ত্তা—) হাজ্জাজ আমার নিকট আসিয়া বলিল, আপনি হিজরত হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক মদীনা ত্যাগ করিয়া পল্লী-বাস অবলম্বন করিয়াছেন; সালামা (রাঃ) বলিলেন, না, না—আমি হিজরত হইতে ফিরি নাই, কিন্তু রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাকে (পরিস্থিতি দৃষ্টে) পল্লী-বাস অবলম্বনে অনুমতি দিয়াছিলেন।

বিশিষ্ট তাবেয়ী এজীদ ইবনে আবু ওবায়দ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মোসলেম সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে ওসমান (রাঃ) শহীদ হওয়ায় হইতেই সালামাতুবনুল আক্ওয়া (রাঃ) মদীনা শহর ত্যাগ করিয়া পল্লী অঞ্চল রাবাযায় বসবাস অবলম্বন করিয়াছিলেন। তথায় বিবাহ করিয়াছিলেন, সন্তানাদিও হইয়াছিল এবং অবশিষ্ট জীবনকাল তথাই অতিবাহিত করিয়াছেন। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বে মদীনায় চলিয়া আসিয়াছিলেন।

২৬৩২। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার মসজিদে মিম্বারের এক পার্শ্বে পূর্ব্বদিক মুখ করিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, সতর্ক থাকিও! (যত প্রকার ফেৎনা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইবে সব) ফেৎনার স্রোত এই দিক হইতে আসিবে—যে দিকে সূর্য্য উদিত হয়—যে দিকে শয়তানের শিং উঁচু হয়।

২৬৩৩। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম দোয়া করিলেন—"হে আল্লাহ! আমাদের সিরিয়া এলাকায় বরকত ও উন্নতি দান কর, আমাদের ইয়ামান এলাকায় বরকত ও উন্নতি দান কর। উপস্থিত লোকগণ আরজ করিল, আমাদের নজ্‌দ এলাকায় (বরকত ও উন্নতি দানের উল্লেখ করুন।) হযরত (দঃ) পুনঃ ঐ সিরিয়া ও ইয়ামান এলাকারই উল্লেখ করিয়া বরকত ও উন্নতির দোয়া করিলেন। এই বারও উপস্থিত লোকগণ নজ্‌দ সম্পর্কে আরজ করিল। তৃতীয় বার হযরত (দঃ) বলিলেন, নজ্‌দ এলাকায় ত ফেৎনা-ফাছাদ সৃষ্টি হইবে এবং তথায় ভয়ঙ্কর ভূকম্পনের হিড়িক পড়িবে। ইহাও (পূর্ব্বাঞ্চলের) একটি এলাকা যথায় শয়তানের শিং উঁচু হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ—কেয়ামতের পূর্ব্বে যত সব ফেৎনা-ফাছাদ বিপর্য্যয়-বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে হযরতের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ঐসব মদীনা হইতে পূর্ব্বাঞ্চল সমূহেই সৃষ্টি হইবে। নজ্‌দ অঞ্চল মদীনার পূর্ব্ব দিকেই অবস্থিত। উহাও ঐসব ফেৎনা-ফাছাদের একটি বিশেষ কেন্দ্র হইবে।

খোদায়ী আজাব ও বালা-মছিবতে মৃত্যু হইলে ?

২৬৩৪। হাদীছ ঃ— ابن عمر رضى الله تعالى عنه يقول

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا

اَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيْهِمْ ثُمَّ بُعِثُوْا عَلٰى اَعْمَالِهِمْ -

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন সম্প্রদায়ের উপর আল্লার আজাব নাযেল হইলে, তাহাদের (ভাল-মন্দ) সকলের উপরই সেই আজাব আসিতে পারে। কিন্তু আখেরাতে পুনঃজীবনকালে প্রত্যেকে নিজ নিজ আমল অনুপাতে বিভক্ত হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ—কোন কোন সময় পাপ ও গোণাহের দরুণ আল্লার আজাব আসিয়া থাকে। কোন অঞ্চলে যদি সেইরূপ গোণাহের আধিক্যের দরুণ আল্লার আজাব আসে এবং তথায় কিছু সংখ্যক নেক্‌কার লোকও থাকে, তবে সেই নেক লোকদিগকে উক্ত আজাব হইতে বাঁচাইয়া নেওয়া নীতিগত ভাবে আল্লাহ তায়ালা নির্দ্ধারিত করিয়া রাখেন নাই। বরং ইহজগতে আল্লাহ তায়ালার সাধারণ নীতি ইহাই যে, ভাল-মন্দের বাছ-বিচার ব্যতিরেকেই উক্ত আজাবের ধ্বংসলীলা চলিতে পারে। এই মর্ম্মে আলোচ্য হাদীছের একটি বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, ইহজগতে আল্লার আজাব ও খোদায়ী বালা-মছিবত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য শুধু নিজের নেক্‌কারী যথেষ্ট নহে, দেশকেও নেককার বানাইতে হইবে। অন্যথায় দেশে পাপের প্রাবল্যের দরুণ আজাব আসিলে তথায় অবস্থানকারী স্বল্প সংখ্যক নেককারগণও সেই আজাবের গ্রাসে পতিত হইতে পারে, বরং সেইরূপ হওয়াই আল্লার স্বাভাবিক নিয়ম—ইহার বিপরীত কোথাও কোন কিছু ঘটিলে তাহা অলৌকিক গণ্য হইবে।

পাপের প্রাবল্যের দরুণ আগত আজাবে নেককারদেরও পতিত হওয়ার শুধু সম্ভাবনা এবং আখেরাতের হিসাবে উহা আজাব ও শাস্তি পরিগণিত না হইয়া রহমত গণ্য হওয়া শুধু তখনই যখন তদঞ্চলীয় নেককারগণ শরীয়ত কর্তৃক প্রবর্ত্তিত কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব পালনে তথা নেক কাজের তবলীগ ও বদ কাজের প্রতিরোধ চেষ্টায় কোন প্রকার ত্রুটি না করে এবং বদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ভুমিকা গ্রহণে অবহেলা না করে। অন্যথায় উক্ত নেককারদের সেই আজাবে পতিত হওয়া শুধু সম্ভব ও স্বাভাবিকই নহে, বরং ঐ আজাব তাহাদের পক্ষেও বিধানগত শাস্তি গণ্য হয় এবং কেয়ামতের দিনও তাহারা অপরাধী সাব্যস্ত হইবে। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের সুস্পষ্ট বর্ণনা রহিয়াছে—

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً

"তোমরা" ঐ আজাব হইতে বাঁচিবার চেষ্টা কর যে আজাব শুধু কেবল পাপে লিপ্ত ব্যক্তিদেরকেই ঘায়েল করিবে না।" অর্থাৎ সেই আজাব ঐ লোকদেরকেও ঘায়েল করিবে যাহারা পাপে লিপ্ত নহে, কিন্তু তাহারা পাপের প্রতিরোধ চেষ্টাও চালায় নাই। সে ক্ষেত্রে পাপের দরুণ আজাব আসিলে সেই আজাব ঐ লোকদেরকেও আজাবরূপেই ঘায়েল করিবে। (৯ পারা ছুরা আন্‌ফাল)

এতদ্ভিন্ন এ সম্পর্কে চারিটি হাদীছও উল্লেখ যোগ্য।

(১) আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যে সব লোক বদ কাজ দেখিয়া উহা প্রতিরোধের চেষ্টা না করে অচিরেই আজাব তাহাদেরকে গ্রাস করিয়া নিবে। (ফতহুল বারী ১৩—১৫)

(২) হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কোন একটি শহর সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা জিব্রাঈল ফেরেশতাকে নির্দ্দেশ দিলেন—অমুক শহরকে উহার অধিবাসীদের সহ উল্টাইয়া দাও। জিব্রাঈল আরজ করিলেন, হে পরওয়ারদেগার! তথাকার অধিবাসীদের মধ্যে আপনার অমুক বন্দা রহিয়াছে যে এক পলকের জন্যও আপনার নাফরমানী করে নাই। তদুত্তরে আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, ঐ ব্যক্তি সহ সকলের উপর শহরটিকে উল্টাইয়া দাও। কারণ, আমার নাফরমানীর প্রতি কোন সময় তাহার ভ্রুও কুঞ্চিত হয় নাই। (বায়হাক্বী)

(৩) হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, দেশে যখন বদ কাজ চলিতে থাকে তখন যাহারা উপস্থিত থাকিয়াও উহার বিরোধিতা করে তাহারা তথায় অবস্থানকারী হইয়াও উহা হইতে পৃথক গণ্য হয়। আর যাহারা তথায় উপস্থিত না থাকিয়াও সম্মতি দেখায় তাহারা দূরে থাকিয়াও উহার মধ্যে শামিল গণ্য হয়। (আবু দাউদ)

(৪) হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, কোন মোসলমান—তাহার দেশে শরীয়ত বিরোধী কাজ হইতে দেখিল তাহার কর্ত্তব্য হইবে বলপূর্ব্বক উহার প্রতিরোধ করা। সেই সামর্থ্য না থাকিলে মুখে প্রতিরোধ করিবে। ততটুকু সুযোগও যদি না থাকে, তবে অন্তরে উহার প্রতি ঘৃণা রাখিবে এবং সুযোগ প্রাপ্তে উহা প্রতিরোধের দৃঢ় সংকল্প রাখিবে—ইহা ঈমানের সর্ব্বশেষ স্তর, ইহার পরে সরিষা পরিমাণ ঈমানেরও কোন স্তর নাই। (মোসলেম শরীফ)

পক্ষান্তরে বদকারের সঙ্গে বসবাসকারী যে সব নেককারগণ বদের প্রতিরোধে তাহাদের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য পূর্ণরূপে আদায় করিয়া থাকে বা যে সব ক্ষেত্রে নেক-কারগণ সাময়িকভাবে বদকারদের সঙ্গে মিশ্রিত হয়—যেমন, হাটে-মাঠে পথে-ঘাটে বা যানবাহনে একত্রিত নেক-বদ লোকগণ—তাহাদের সম্পর্কেই আলোচ্য হাদীছে

বলা হইয়াছে যে, পাপের পরিণামে আজাব আসিলে আজাবের ধ্বংসলীলা হইতে ঐ নেক লোকদিগকে বাঁচাইয়া নেওয়ার কোন বাধ্য বাধকতা নাই, বরং আজাবের করাল গ্রাসে তাহারাও পতিত হইতে পারে। কিন্তু এইরূপ ক্ষেত্রের জন্য একটি সুনির্দ্দিষ্ট বিধান আলোচ্য পরিচ্ছেদের মূল হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, আজাবের ধ্বংসলীলায় ভাল-মন্দের বাছ-বিচার না হওয়া পার্থিব জীবনে সীমাবদ্ধ। পারলৌকিক জীবনে ভাল-মন্দের তারতম্য অবশ্যই হইবে। পাপাচারী দুনিয়াতে আগত আজাবে ধ্বংস হইয়া আখেরাতেও আজাবে আবদ্ধ হইবে। আর নেককার দুনিয়ার আজাবের করাল গ্রাসে পতিত হইয়া মৃত্যু বরণ করার পর আখেরাতে স্বীয় নেক আমলের বিনিময় অফুরন্ত নেয়ামত লাভ করিবেন। অধিকন্তু আকস্মিক ধ্বংসলীলায় ডুবিয়া মরা, পুড়িয়া মরা, চাপায় মরা, কলেরায় মরা ইত্যাদি শহীদী মৃত্যুর কোন সূত্র পাওয়া গেলে সে ক্ষেত্রে তাঁহারা শহীদের মর্ত্তবাও লাভ করিবেন। এতদ্ভিন্ন আল্লাহ তায়ালার বিশেষ রহমতও তাঁহারা লাভ করিবেন। এ সম্পর্কে একটি হাদীছ—আলী (রাঃ) রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। দেশে পাপাচারের প্রাবল্য দেখা দিলে দেশবাসীর উপর আল্লাহ তায়ালা তাঁহার আজাব নাযেল করেন। জিজ্ঞাসা করা হইল, তাহাদের মধ্যে নেককার থাকিলেও? হযরত (দঃ) বলিলেন, হাঁ। অবশ্য পুনর্জীবনকালে সেই নেককারগণ আল্লার রহমত লাভ করিবেন। (ফতহুল বারী ১৩—৫১)

মোসলমানদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-বিবাদ সৃষ্টি কালে স্বীয় পরিবার পরিজনকে উহা হইতে কঠোরভাবে বিরত রাখিবে

২৬৩৫। **হাদীছ**ঃ— নাফে (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মদীনাবাসীরা যখন শাসনকর্ত্তা এজীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল, তখন বিশিষ্ট ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) স্বীয় পরিবার-পরিজনকে একত্রিত করিয়া তাহাদিগকে হাদীছ শুনাইলেন—আমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এই বলিতে শুনিয়াছি। কেয়ামত দিবসে প্রত্যেক বিশ্বাস-ঘাতকের (পরিচয় ও সর্ব্ব সমক্ষে লাঞ্ছনার) জন্য এক একটি ঝাণ্ডা থাকিবে।

তারপর তিনি বলিলেন, আমরা এই ব্যক্তির (তথা শাসনকর্ত্তা এজীদের) আনুগত্যের শপথ দান করিয়াছি আল্লাহ এবং আল্লার রসূলের বিধান মোতাবেক। আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের বিধানমতে কাহাকেও আনুগত্যের শপথ প্রদানের পর তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার ন্যায় বড় বিশ্বাসঘাতকতা আমি আর অন্য কিছুকে মনে করি না। অতএব তোমাদের মধ্যে যে কেহ এজীদের আনুগত্য ভঙ্গ করিবে ও বিদ্রোহে শামিল হইবে তাহার ও আমার সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইবে।

ক্ষমতা লোভী দ্বন্দ্বকারীদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করা এবং তাহাদের হইতে পৃথক থাকা

২৬৩৬। হাদীছ ঃ— আবুল মেনহাল (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) মক্কায় খেলাফত প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে সিরিয়ার যেয়াদ-পুত্র (ওবায়দুল্লাহ) ও মারওয়ান শাসনক্ষমতা লাভের চেষ্টায় দাঁড়াইল। এতদ্ভিন্ন বছরা অঞ্চলেও খারেজী দল ক্ষমতা লাভের চেষ্টার প্রয়াস পাইতেছিল। এই সময় আমি আমার পিতার সহিত ছাহাবী আবু বরজা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর (নিকট তাঁহার) বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। তিনি তাঁহার কাঁচা গৃহের ছায়ায় বসিয়া ছিলেন। আমরা তাঁহার সম্মুখে বসিলাম এবং আমার পিতা তাঁহার হইতে কথা বাহির করার উদ্দেশ্যে বলিলেন, হে আবু বরজা (রাঃ)! লোকদের অবস্থা লক্ষ্য করিয়াছেন কি? তদুত্তরে তাঁহার মুখে সর্ব্বপ্রথম যাহা শুনিলাম তাহা ছিল এই—

আমি আল্লার নিকট এই বিষয়ের ছওয়াব প্রাপ্তির আশা রাখি যে, আমি কোরায়েশ বংশীয় কোন কোন গোত্রের কার্য্যকলাপের প্রতি ঘৃণা ও অসন্তুষ্টি পোষণ করি। হে আরববাসী! তোমরা যেরূপ গোমরাহী, দুর্ব্বলতা ও লাঞ্ছনার মধ্যে ছিলে, তাহা তোমরা জান। আল্লাহ তায়ালা দ্বীন-ইসলাম ও মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অছিলায় তোমাদিগকে যেই আসনে সমাসীন করিয়াছেন তাহাও তোমরা দেখিতেছ।

দুঃখের বিষয়—এই দুনিয়ার লোভ তোমাদের পরস্পর দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে। সিরিয়ায় যে ব্যক্তি ক্ষমতা লাভের জন্য দাঁড়াইয়াছে। খোদার কসম, সে একমাত্র দুনিয়ার লোভেই বিবাদ করিতেছে।

রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কাহারও বাস্তব মর্য্যাদা ক্ষুন্ন করিতে নাই

২৬৩৭। হাদীছ ঃ—ওবায়দুল্লাহ ইবনে যেয়াদ আসাদী বর্ণনা করিয়াছেন, তাল্হা (রাঃ) যোবায়ের (রাঃ) এবং আয়েশা (রাঃ) যখন (আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেলাফত-কাঠামোর বিরুদ্ধে আন্দোলন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে) বছরায় গেলেন তখন আলী (রাঃ) তাঁহার সমর্থক বিশিষ্ট ছাহাবী আম্মার (রাঃ) ও হাসান (রাঃ)কে কুফায় পাঠাইলেন। তাঁহারা উভয়ে কুফার জামে মসজিদের মিম্বারে উঠিয়া হাসান (রাঃ) মিম্বারের উপরের ধাপে বসিলেন এবং আম্মার (রাঃ) নীচের ধাপে দাঁড়াইয়া বলিলেন, আয়েশা (রাঃ) বছরায় গিয়াছেন। কসম

খোদার—নিশ্চয় নিশ্চয় তিনি বিশ্ববাসী সকলের পয়গাম্বরের স্ত্রী—ইহজতেও এবং পরকালেও। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে তোমাদের পরীক্ষার বস্তু বানাইয়াছেন। দেখা যাইবে, তোমরা আল্লার বিধানের পায়রবী কর (অর্থাৎ নির্ব্বাচিত খলীফার অনুগত হও) না—আয়েশার পায়রবী কর।

২৬৩৮। হাদীছঃ— আবু ওয়ায়েল (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আলী (রাঃ) তাঁহার সমর্থক সংগ্রহের জন্য আম্মার (রাঃ)কে কুফায় পাঠাইলেন। তখন বিশিষ্ট ছাহাবী আবু মুছা (রাঃ) এবং আবু মসউদ (রাঃ) আম্মারের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আপনি বিরোধের ব্যাপারে এতদঞ্চলে আসিয়াছেন—আপনার ইসলাম গ্রহণ পরে এই কাজটি অপেক্ষা অধিক অপছন্দনীয় আপনার আর কোন কাজ আমরা দেখি নাই। আম্মার (রাঃ) তাঁহাদিগকে বলিলেন। এই বিরোধে হস্তক্ষেপ করা হইতে আপনারা দূরে রহিয়াছেন—আপনাদের ইসলাম গ্রহণের পর আমি এই কাজটি অপেক্ষা অধিক অপছন্দনীয় আর কোন কাজ আপনাদের দেখি নাই। এই কথোপ-কথনের পর ধনাঢ্য আবু মসউদ (রাঃ) স্বীয় সঙ্গী আবু মুছা এবং বিরুদ্ধবাদী আম্মার (রাঃ)—এই উভয়কে এক এক জোড়া নূতন কাপড় দিলেন এবং একত্রে জুমার নামাযে হাজির হইলেন।

ব্যক্তিগত মর্য্যাদা স্বীকার করিয়াও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিজ বিবেক অনুযায়ী চলা যায়

২৬৩৯। হাদীছঃ— হারমালাহ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, উসামা (রাঃ) আমাকে (কিছু সাহায্যের জন্য) আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট পাঠাইলেন এবং বলিয়াদিলেন, আলী (রাঃ) তোমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন—উসামা কেন আমার সমর্থন হইতে নিরপেক্ষ রহিয়াছে? তুমি তাঁহাকে উত্তরে বলিবা—উসামা বলিয়াছেন, আপনি বাঘের মুখে থাকিলে সেখানেও আমি আপনার সঙ্গে অবস্থান করা পছন্দ করিব। কিন্তু খেলাফত নিয়া বিরোধের ব্যাপারটা আমার বুঝে আসে নাই।

হারমালাহ (রঃ) বলেন, আলী (রাঃ) কোন সাহায্য করিতে পারিলেন না। আমি হাসান (রাঃ), হোসাইন (রাঃ) এবং জাফর-পুত্র আবদুল্লার নিকট উপস্থিত হইলাম। তাঁহারা দুইটি উট বোঝাই করিয়া সাহায্য দ্রব্য দিয়া দিলেন।

মোসলমানদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বিবাদ মোনাফেকদের দ্বারা সৃষ্টি হয় *

২৬৪০। হাদীছ ঃ—হোযায়ফা (রাঃ) বলিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সময়ের মোনাফেকদের অপেক্ষা পরবর্ত্তীকালের মোনাফেকরা অধিক জঘন্য ও ক্ষতিকর। কারণ, সেই মোনাফেকরা (বস্তুতঃ আত্মরক্ষার উদ্দেশ্য হাছিলের জন্য ইসলাম প্রকাশ করিয়া) অন্তরে মোনাফেকী লুকাইয়া রাখিত। আর এই মোনাফেকরা (মোসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্য লইয়া ইসলাম প্রকাশ করে এবং) সর্ব্বদা মোসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টাই করিয়া থাকে।

ব্যাখ্যা ঃ—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যুগের মোনাফেকরাও মোসলমানদের মধ্যে বিবাদ ও বিভেদ সৃষ্টির সুযোগ সন্ধানী ছিল এবং কোন কোন সময় তাহা সৃষ্টির প্রয়াসও পাইত, যাহার নজীরও কোরআন হাদীছে পাওয়া যায়। অতএব পূর্ব্বাপর সকল মোনাফেকের স্বভাবই মোসলমানদের মধ্যে বিবাদ-বিভেদ সৃষ্টি করা। হোযায়ফা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, হযরতের যুগের মোনাফেকদের ইসলাম প্রকাশের মুখ্য উদ্দেশ্য হইত আত্মরক্ষা আর পরবর্ত্তীকালে মোনাফেকদের ইসলাম প্রকাশের মুখ্য উদ্দেশ্যই হয় মোসলমানদের মধ্যে বিবাদ-বিভেদ সৃষ্টি করা। অতএব ইহারা মোসলেম সমাজের পক্ষে অধিক জঘন্য ও ক্ষতিকর। ইহাদের হইতে সতর্কতা অবলম্বনেও অধিক তৎপর হইতে হইবে।

এতদ্ভিন্ন হযরতের সময় অপেক্ষা পরবর্ত্তীকালে মোনাফেকগণ কর্ত্তৃক মোসলেম সমাজকে ঘায়েল করার তৎপরতা ও উহার সুযোগ-সুবিধা অনেক বেশী। কারণ, হযরতের যমানায় মোনাফেকগণ অন্তরে মোনাফেকী লুক্কায়িত রাখিয়া ইসলাম প্রকাশ করা সত্ত্বেও ওহী মারফৎ তাহাদের দল নির্দ্দিষ্ট ছিল। হযরত (দঃ) পূর্ণরূপে এবং মোসলমানগণও বহুলাংশে তাহাদেরকে চিনিতেন। সুতরাং তাহাদের তৎপরতা অপেক্ষাকৃত কম হইত এবং যাহা কিছু হইত উহার প্রতিক্রিয়া সামান্য ও সাময়িক হইত। পক্ষান্তরে হযরতের পর মোনাফেক দলকে অকাট্যরূপে চিনিবার কোন ব্যবস্থা নাই। সুতরাং মোসলেম সমাজে গা-ঢাকা দিয়া বিবাদ-বিভেদ সৃষ্টির পথ তাহাদের জন্য সুগম হইয়া গিয়াছে। হযরতের পরে মোনাফেকগণ কিরূপ মারাত্মক ভাবে মোসলেম সমাজকে ঘায়েল করার প্রয়াস পাইয়াছে উহার সামান্য

---

* উপরোল্লেখিত পাঁচটি পরিচ্ছেদের হাদীছ সমুহ বোখারী শরীফ ১০৫২ ও ১০৫৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রহিয়াছে। কিন্তু শিরোনামাগুলি নির্দ্দিষ্টরূপে ইমাম বোখারী উল্লেখ করেন নাই উহা অনুবাদকের।

নমুনা পরিশিষ্টে বর্ণিত হইবে। ছাহাবী হোযায়ফা (রাঃ) এই তথ্যটির প্রতিও নিম্নে বর্ণিত হাদীছে ইঙ্গিত করিয়াছেন।

২৬৪১। হাদীছ ঃ— হোযায়ফা (রাঃ) বলিয়াছেন, একমাত্র হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সময়ে মোসলমানদের মধ্যে মোনাফেক দল চিহ্নিত ও নির্দ্দিষ্ট ছিল। পরবর্ত্তীকালে (উহার কোন ব্যবস্থা থাকে নাই, সুতরাং মোনাফেক নামে কোন দল চিহ্নিত ও নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। অতএব, প্রকাশ্য অবস্থাসূত্রে) কাফের বা মোসলমান এই দুই দলই নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে।

ব্যাখ্যা ঃ—আলোচ্য হাদীছের তাৎপর্য্য এই যে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানার পরে ওহী বন্ধ হইয়া যাওয়ায় কাহাকেও অকাট্যরূপে মোনাফেক বলিয়া চিহ্নিত ও নির্দ্দিষ্ট করার কোন ব্যবস্থা নাই। অবশ্য প্রকৃত প্রস্তাবে সমাজে মোনাফেক থাকিবেই। কাহারও দ্বারা প্রকাশ্যে কোন কুফর অনুষ্ঠিত হইলে তাহাকে কাফের গণ্য করা হইবে, কিন্তু প্রকাশ্যে কোন কুফরী না করিয়া অন্তরে মোনাফেকী লুকাইয়া রাখিলে সে আল্লাহ তায়ালার নিকট অবশ্য মোনাফেক কাফের সাব্যস্ত হইবে, কিন্তু জাগতিক পর্য্যায়ে তাহার প্রকাশ্য অবস্থা দৃষ্টে তাহাকে মোসলমানই গণ্য করিতে হইবে। এই জন্যই হযরতের পরবর্ত্তী সময়ে খাঁটী মোসলমানগণকে মোনাফেকদের সম্পর্কে অনেক বেশী সতর্ক থাকা আবশ্যক। এই হুসিয়ারীই উল্লেখিত হাদীছদ্বয়ের মূল উদ্দেশ্য।

কেয়ামত বা মহাপ্রলয়ের বিভিন্ন আলামত ও নিদর্শন

২৬৪২। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামতের পূর্ব্বে নিশ্চয় এরূপ অবস্থা সৃষ্টি হইবে যে, মানুষ কবরের নিকট দিয়া যাইবার সময় আগ্রহ করিয়া বলিবে, আমার স্থান এই কবরের ভিতরে হইলে ভাল হইত।

ব্যাখ্যা ঃ—কালক্রমে মানব জীবনে যে বিভীষিকাময় অশান্তির করাল ছায়া নামিয়া আসিবে উহারই ভবিষ্যদবাণী এই হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ধর্ম্মীয় জীবনের বিপর্য্যয় সম্পর্কে নিম্নে বর্ণিত হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে।

২৬৪৩। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, অধঃপতন প্রবাহে কেয়ামতের পূর্ব্বে নিশ্চয় এরূপ অবস্থাও সৃষ্টি হইবে যে, দৌস গোত্রীয় নারীরা "জুল-খালাছাহ" নামক দেবী-মূর্ত্তির পূজা-প্রদক্ষিনে লিপ্ত হইবে। জুল-খালছাহ অন্ধকার যুগে দৌস গোত্রের বিশেষ পুজণীয় মূর্ত্তি ছিল।

ব্যাখ্যা ঃ—উল্লেখিত হাদীছদ্বয়ের ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বারা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় উম্মতকে সতর্ক করিয়াছেন। সময় থাকিতে কাজ করিয়া যাও। সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত্তকে যত্নের সহিত কাজে লাগাও। প্রতিটি পরবর্ত্তীকাল পূর্ব্ববর্ত্তীকাল অপেক্ষা সংকীর্ণ ও সঙ্কটময়; সুতরাং অধিক সুযোগের বৃথা আশায় সময় না হারাইয়া দ্রুত গতিতে উপস্থিত সময়কে কাজে লাগাইতে থাক ইত্যাদি।

এই শ্রেণীর সতর্কবাণী মোসলেম শরীফের একটি হাদীছে অতি সুন্দর ও সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন—

بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي

كَافِرًا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا ـ

"আমল ও কাজ করিয়া চল বিপর্য্যয় বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির আগে আগে যাহা রাত্রির অন্ধকারের ন্যায় ঘনীভূত হইয়া আসে। (শেষ পর্য্যন্ত এমন অবস্থার সৃষ্টি হইবে যে,) অনেক লোক সকালে মোমেন থাকিবে, বিকালে কাফের হইয়া যাইবে। বিকালে মোমেন থাকিবে সকালে কাফের হইয়া যাইবে। পার্থিব ধন-সম্পদের বিনিময়ে স্বীয় দ্বীন ও ধর্ম্মকে বিক্রি করিবে।"

২৬৪৪। **হাদীছ ঃ**— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামতের পূর্ব্বে নিশ্চয় এইরূপ হইবে যে, কাহ্‌তান গোত্রীয় একটি লোক শাসন-ক্ষমতা দখল করিবে এবং লাঠির জোরে লোকদিকে বশ করিবে।

ব্যাখ্যা ঃ—কাহ্‌তান গোত্র ইয়ামানের অধিবাসী। সেই গোত্রের একটি লোকের উল্লেখই এই ভবিষ্যদবাণীতে রহিয়াছে। হাদীছের মূল তাৎপর্য্য এই যে, কেয়ামতের পূর্ব্বে বিশ্বে বিভিন্ন ধরনের বিপর্য্যয় ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। উহার মধ্যে ইহাও একটি যে, নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় শাসন ক্ষমতা দখল ও পরিচালনের পরিবর্ত্তে অভ্যুত্থান ও বল প্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল ও পরিচালনের হিড়িক পড়িয়া যাইবে। তন্মধ্যে এই কাহ্‌তানী ব্যক্তির নাম দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ হইয়াছে, এই লোকটির অভ্যুত্থান ও ক্ষমতা দখল অবশ্যই কেয়ামতের পূর্ব্বে বাস্তবায়িত হইবে।

২৬৪৫। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামতের পূর্ব্বে অবশ্যই হেজাজ অঞ্চলের কোন এক স্থানে ভূগর্ভ হইতে অগ্নি উত্থিত হইবে যাহার আলোতে সিরিয়াস্থ বছরা (হুরাণ) শহরে অবস্থিত উটের গর্দ্দান পর্য্যন্ত দৃষ্টি-গোচর হইবে।

ব্যাখ্যা :— কেয়ামত বা মহাপ্রলয়ের আলামত ও নিদর্শনরূপে বহু রকম অস্বাভাবিক ঘটনা ও বস্তু প্রকাশ পাইবে—যে সমস্তের বয়ান হাদীছে রহিয়াছে। তন্মধ্যে অগ্নি উত্থিত হওয়াও একটি। অগ্নি উত্থিত হওয়ার দুইটি ভবিষ্যদবাণী হাদীছে বর্ণিত আছে। একটি মোছলেম শরীফের হাদীছে—হোযায়ফা ইবনে আসীদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত নবী (দঃ) আমাদিগকে কেয়ামতের আলোচনা করিতে দেখিয়া বলিলেন, কেয়ামত অনুষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে দশটি আলামত অবশ্যই পরিদৃষ্ট হইবে।......

উক্ত হাদীছে দশটি নিদর্শনের বয়ানে একটি এই نار تخرج من قعر عدن "(আরব সাগর ও লোহিত সাগরের সংযোগস্থলে অবস্থিত উপকূলবর্ত্তি শহর) ইডেনের নিকট সমুদ্রগর্ভ হইতে আগুন বাহির হইয়া লোকদিগকে হাঁকাইয়া চলিবে।" এই ঘটনা কেয়ামতের অতি সন্নিকট সময়ে ঘটিবে। এই আগুণ উত্থিত হওয়ার স্থান হইল ইয়ামান এবং উহা সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত হইবে।

অগ্নি উত্থিত হওয়ার দ্বিতীয় ভবিষ্যদবাণী বর্ণিত হইয়াছে মূল আলোচ্য হাদীছে। এই আগুন উত্থিত হওয়ার স্থান হইল হেজাজ এবং ইহা ভূগর্ভ হইতে উত্থিত হইবে। এই অগ্নির ভবিষ্যদবাণী সম্পর্কে আলোচ্য আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হাদীছ ছাড়া ইমাম বোখারী (রঃ) ছাহাবী আনাছ (রাঃ) হইতেও একটি হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন। হযরত নবী (দঃ) বলিয়াছেন, কেয়ামতের (বড় বড় আলামতগুলির) প্রথম আলামত হইল একটি আগুন যাহা লোকদিগকে পূর্ব্ব দিক হইতে পশ্চিম দিকে হাঁকাইয়া নিবে। বোখারী শরীফের বিশিষ্ট ব্যাখ্যাকার হাফেজ ইবনে হজর (রঃ) লিখিয়াছেন এই ভবিষ্যদবাণীর ঘটনা সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। ৬৫৪ হিজরী সনের জমাদিউছ্ছানী মাসের তিন তারিখ বুধবার রাত্রে এশার নামাযের পর মদীনা শহরের বাহিরে প্রস্তরময় এলাকার ভূগর্ভ হইতে আগুন উত্থিত হইয়া ছিল। ভীষণ এক ভূমিকম্প হইয়া সেই আগুন বাহির হইয়া ছিল এবং মঙ্গলবার দিবাগত বুধবার রাত্র হইতে শুক্রবার দিন দ্বিপ্রহরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রজ্জলিত ছিল। (ফতহুল বারী ১৩—৬৮)

২৬৪৬। **হাদীছ** :—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামতের পূর্ব্বে অচিরেই এমন একটি দিন আসিবে যে দিন ফোরাদ নদীর কূল শুখাইয়া পর্ব্বৎ আকারে এক স্বর্ণ-খনি আবির্ভূত হইবে। তথায় উপস্থিত কেহ যেন উহা ছুঁইতেও না যায়।

ব্যাখ্যা :— উল্লেখিত স্বর্ণ-খনি স্পর্শ না করার নিষেধাজ্ঞার কারণটা মোসলেম শরীফে বর্ণিত রেওয়ায়েত দ্বারা স্পষ্ট হইয়া যায়। সেই রেওয়ায়েতে

আলোচ্য ভবিষ্যদবাণীর সহিত আরও একটি ভবিষ্যদবাণী উল্লেখ আছে যে, فيقتتل عليه الناس فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون ويقول كل رجل منهم لعلى اكون انا الذى انجو "উক্ত স্বর্ণ-খনির জন্য লোকদের মধ্যে রক্তারক্তি চলিবে এবং শতকরা নিরানব্বই জন নিহত হইবে; প্রত্যেকেরই ধারণা হইবে, আমি হয় ত সফলকাম হইব।

২৬৪৭। হাদীছঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামতের পূর্ব্বে অবশ্যই এই ঘটনাগুলি ঘটিবে। (১) দুইটি সুবৃহৎ দলের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হইবে তাহারা উভয় দল একই সম্প্রদায় ভুক্ত হওয়ার দাবীদার। (২) বিভিন্ন সময়ে এমন এমন মিথ্যাবাদী জালিয়াতের আবির্ভাব হইবে যাহাদের প্রত্যেকেই দাবী করিবে, সে আল্লার রসুল—তাহাদের মোট সংখ্যা প্রায় ত্রিশে দাঁড়াইবে। (৩) দ্বীনের এল্‌ম বিলুপ্ত হইবে। (৪) ভূমিকম্পের আধিক্য হইবে। (৫) সময় দ্রুতগামী মনে হইবে—সপ্তাহ, মাস ও বৎসরগুলি যেন পরস্পর নিকটবর্ত্তী তথা অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট মনে হইবে। (৬) বিপর্য্যয় ও বিশৃঙ্খলার প্রাদুর্ভাব হইবে। (৭) মারামারী খুনাখুনির আধিক্য হইবে। (৮) ধন-দৌলতের প্রাচুর্য হইবে—ধনের গড়াগড়ী ও ছড়াছড়ী হইবে, এমনকি দান-খয়রাত গ্রহণকারীর তালাশে ধনীগণকে খুবই ব্যস্ত হইতে হইবে। কাহাকেও টাকা-পয়সা নিতে বলা হইলে সে বলিবে, এখন আমার কোন প্রয়োজন নাই। (৯) মানুষ উঁচু উঁচু অট্টালিকা তৈরী করায় পরস্পর গর্ব্ব ও প্রতিযোগীতা করিবে। (১০) জীবিত মানুষ মৃতের কবর সন্নিকটে চলাকালে আকাঙ্ক্ষা করিয়া বলিবে, আমার স্থান কবরের ভিতরে হইলে ভাল হইত। (১১) সূর্য্য তাহার অস্তমিত হওয়ার দিক হইতে উদিত হইবে। যেই সময় এই ঘটনা ঘটিবে এবং লোকগণ উহা প্রকাশ্যে অবলোকন করিবে উহাই সেই সময়টি যাহার সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে উল্লেখ রহিয়াছে যে, তখন ঐ লোকদের ঈমান কবুল হইবে না যাহারা ইহার পূর্ব্বে ঈমান গ্রহণ করে নাই এবং ঐ লোকদের তওবা কবুল হইবে না যাহারা ইহার পূর্ব্বে তওবা করে নাই।

কেয়ামত বা মহাপ্রলয় অকস্মাৎ উপস্থিত হইয়া পড়িবে। দুই ব্যক্তি কাপড় ক্রয়-বিক্রয়ে লিপ্ত হইয়া তাহা সম্পন্ন করার বা ভাজ করিয়া রাখার পূর্ব্বেই কেয়ামতের প্রলয় আরম্ভ হইয়া যাইবে। কেহ তাহার দুগ্ধবতি জানওয়ারের দুধ দোহাইয়াছে উহা পান করার পূর্ব্বেই প্রলয় আরম্ভ হইয়া যাইবে। কেহ তাহার পানিরচৌবাচ্চা তৈরী করিতেছে উহার পানি পান করার পূর্ব্বেই প্রলয় আরম্ভ হইয়া যাইবে। কেহ খাদ্য-গ্রাস মুখের নিকটে উঠাইয়াছে উহা খাইবার পূর্ব্বেই প্রলয় আরম্ভ হইয়া যাইবে।

ব্যাখ্যা ঃ—কেয়ামতের পূর্ব্ববর্তী অস্বাভাবিক ঘটনাবলীর অন্যতম একটি ঘটনা। সূর্য্যের সাধারণ অস্তমিত হওয়ার দিক হইতে উদিত হওয়া। এই ঘটনার প্রতি পবিত্র কোরআনেও ইঙ্গিত রহিয়াছে — ৮ পারা ৭ রুকু দ্রষ্টব্য। ঘটনার বিবরণ এই যে, ঈদুল-আজহার মাস—জিলহজ্জ চাঁদের দশ তারিখের পর অকস্মাৎ কোন একটি রাত্র অতিশয় দীর্ঘ হইবে; মানুষ শুইতে শুইতে অতিষ্ঠ হইয়া পড়িবে, পশুপাল মাঠে-ময়দানে যাওয়ার জন্য চিৎকার করিতে থাকিবে। এই বিভীষিকাময় অবস্থায়ই সেই রাত্রটি সাধারণ তিন রাত্রের সমপরিমাণ হওয়ার পর গ্রহণযুক্ত সূর্য্যের ন্যায় ক্ষীণ আলো লইয়া সূর্য্য উহার অস্তের দিক হইতে উদিত হইবে এবং মধ্য-আকাশ বরাবর আসার পূর্ব্বাহ্নে পুনঃ অস্তমিত হওয়ার দিকেই যাইয়া অস্তমিত হইবে। শুধু এক দিন এইরূপ হইয়া তারপর সূর্য্য স্বাভাবিকরূপেই উদিত ও অস্তমিত হইতে থাকিবে। (বেহেশ্‌তি জেওর ৭—৪৮)

কেয়ামতের পূর্ব্ববর্ত্তী অপর ঘটনা—"সময় দ্রুতগামী মনে হওয়া" ইহার দুইটি কারণ হইবে। (১) সময়ের পরিমাণে কাজ হইবে না—এক মাসে এক সপ্তাহের মাত্র কাজ হইবে, ফলে কাঁজের প্রতি দৃষ্টিপাতে মাস সপ্তাহ তুল্য মনে হইবে। (২) প্রত্যেকের সম্মুখে চরম বিশৃঙ্খলা ও লিপ্ততা বিরাজমান থাকিবে; যাহার ব্যতিব্যস্ততায় মানুষ সময়ের গতি-গমনের প্রতিও লক্ষ্য রাখার ফুরছুত্‌ পাইবে না। কেহ মনে করিতেছে—আজ সোমবার, অথচ সোম মঙ্গল বুধবার অতীত হইয়া আজ বৃহস্পতিবার আসিয়া গিয়াছে। কেহ মনে করিতেছে, এইটা চৈত্র মাস, অথচ চৈত্র মাস অতীত হইয়া বৈশাখ মাসও শেষ প্রায়।

দজ্জালের আলোচনা

২৬৪৮। হাদীছ ঃ—মুগিরা ইবনে শোবা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, দজ্জাল সম্পর্কে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে আমি যত বেশী জিজ্ঞাসা করিয়াছি অন্য কেহ এত বেশী জিজ্ঞাসা করে নাই। একদা হযরত (দঃ) আমাকে বলিলেন, দজ্জাল দ্বারা তোমার কি ক্ষতি হইতে পারিবে? আমি আরজ করিলাম, লোকেরা বলে, তাহার সঙ্গে সর্ব্বদা রুটির পাহাড় ও পানির নহর থাকিবে (—অর্থাৎ পানাহার সামগ্রীর প্রাচুর্য্য তাহার নিকট থাকিবে এবং উহার লালসে মানুষ তাহার দলভুক্ত হইয়া গোমরাহ হইবে; সেই ভীতিই আমার মনে জাগে।)

হযরত (দঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা দজ্জালকে এতটুকু মূল্য দেন নাই যে, তোমার ন্যায় পাকা-পোক্তা মোমেনকেও সে বিভ্রান্ত করিতে প্রয়াস পায়।

২৬৪৯। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জন-সমাবেশে ভাষণ দানে

দাঁড়াইলেন এবং আল্লাহ তায়ালার ছানা-ছিফত বর্ণনার পর দজ্জালের উল্লেখ করিলেন। হযরত (দঃ) বলিলেন—

إِنِّى لَأُنْذِرُكُمُوهُ وَمَا مِنْ نَبِىٍّ إِلَّا أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ وَلَكِنِّى سَأَقُولُ لَكُمْ

فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِىٌّ لِقَوْمِهِ إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ

"হে লোক সকল! আমি তোমাদিগকে দজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করিতেছি। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রত্যেক নবীও নিজ নিজ উম্মতকে দজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমি এখন তোমাদিগকে দজ্জাল সম্পর্কে এমন একটি কথা বলিব, যাহা কোন নবীই তাঁহার উম্মৎকে বলেন নাই। (মিথ্যাবাদী দজ্জাল খোদায়ী দাবী করিবে; তাহার সেই দাবী মিথ্যা হওয়ার শত শত প্রমাণের মধ্যে সহজ সরল সুস্পষ্ট একটি প্রমাণ এই—) জানিয়া রাখিও যে, দজ্জালের চক্ষু দোষী হইবে—আর মহান আল্লাহ তায়ালা হইলেন (সর্ব্ব দোষমুক্ত, নির্দ্দোষ—) তাঁহার দর্শন শক্তিও দোষ-ত্রুটি মুক্ত।"

২৬৫০। হাদীছ:— عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنٰى كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ

অর্থ—দজ্জালের ডান চক্ষু এরূপ দোষল হইবে যে, উহা যেন আঙ্গুর গুচ্ছের একটি বহির্ভূত আঙ্গুর।

ব্যাখ্যা:—সাধারণ ও স্বাভাবিক অবস্থায় চক্ষু যে আকারে চক্ষু কোটরে সুসমঞ্জস থাকে দজ্জালের মূল চক্ষুটা বা উহার পুতলিটা তদপেক্ষা অধিক বহির্মুখী স্ফীত হইবে, কিন্তু এই চক্ষুটির দৃষ্টিশক্তি থাকিবে। তাহার অপর চক্ষুটি সম্পর্কে মোছলেম শরীফে একটি হাদীছ আছে—

ان الدجال ممسوح العين عليها ظفرة غليظة

"দজ্জালের একটি চক্ষু হইবে লেপা-পোছা—ঐ চোখের কোটর পুরু চামড়া বা বর্দ্ধিত মাংসে আবৃত হইবে।" দৃষ্টিশক্তির কোন বস্তুই ইহাতে থাকিবে না। এই সূত্রেই দজ্জালকে কানা-দজ্জাল বলা হয়।"

২৬৫১। হাদীছ: আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বয়ান করিয়াছেন, একদা আমি নিদ্রিত ছিলাম। স্বপ্নে দেখিলাম, আমি কা'বা শরীফের তওয়াফ করিতেছি। হঠাৎ দেখি,

একটি লোক শ্যাম বর্ণের, মাথার লম্বা চুলগুলি সোজা—অকুঞ্চিত, মাথা হইতে পানি ঝরিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এই লোকটি কে? উপস্থিত সকলেই বলিল, মরয়্যাম-পুত্র ঈসা (আঃ)। তারপর অন্য দিকে তাকাইয়া আর একটি লোক দেখিতে পাইলাম—মোটা দেহী, লাল বর্ণ, মাথার চুল কুঞ্চিত, চোখ দোষল—একটা চোখ আঙ্গুর-গুচ্ছের বহির্ভূত আঙ্গুরটির ন্যায়। লোকেরা বলিল, এইটা হইল দজ্জাল। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, সে ছিল খোজায়া গোত্রের ইবনে-কাতান নামক ব্যক্তির সাদৃশ।

২৬৫২। হাদীছঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে নামাযের মধ্যে দজ্জালের ফেৎনা হইতে আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় চাহিতে শুনিয়াছি।

২৬৫৩। হাদীছঃ— হোযায়ফা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আল্লাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, দজ্জালের সহিত শীতল পানি এবং আগুন উভয়টিই থাকিবে, কিন্তু তাহার শীতল পানি প্রকৃত প্রস্তাবে হইবে আগুন এবং আগুন হইবে শীতল পানি।

ব্যাখ্যাঃ—মোছলেম শরীফে এক হাদীছে আছে—

معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار

"দজ্জালের সহিত একটি বেহেশত ও একটি দোযখ থাকিবে। তাহার বেহেশত প্রকৃত প্রস্তাবে দোযখ হইবে এবং তাহার দোযখ প্রকৃত প্রস্তাবে বেহেশত হইবে।"

অপর এক রেওয়ায়েতে বেহেশত-দোযখ বলিতে উহার রূপক অর্থ উদ্দেশ্য হওয়া উল্লেখ রহিয়াছে—

معه مثل الجنة والنار فالتى يقول انها الجنة هى النار

"দজ্জালের সহিত বেহেশত স্বরূপ একটি বস্তু থাকিবে এবং দোযখ স্বরূপ একটি বস্তু থাকিবে। যে বস্তুটিকে সে বেহেশত বলিবে সেইটি প্রকৃত প্রস্তাবে হইবে দোযখ।"

এই সব তথ্যের সারমর্ম এরূপ বলা যাইতে পারে যে, মোটা-মুটি ভাবে দজ্জালের নিকট সুখ-শান্তির একটি ব্যবস্থা এবং দুঃখ-যাতনার একটি ব্যবস্থা উভয়টিই থাকিবে। দজ্জাল স্বীয় তাবেদারগণকে তাহার সুখ-শান্তির ব্যবস্থার সুযোগ প্রদান করিবে, আর তাহার বিরুদ্ধবাদীগণকে দুঃখ-যাতনার ব্যবস্থায় নিক্ষেপ করিবে। দজ্জালের প্রদত্ত সুখ-শান্তির ব্যবস্থার পরিণাম যে, আখেরাতে দোযখ হইবে তাহা

অবধারিত। পক্ষান্তরে তাহার শাস্তি ও নির্য্যাতনের পরিণাম যে, আখেরাতে বেহেশত হইবে তাহাও আশ্বাসিত। এতদ্ভিন্ন হইতে পারে—আল্লাহ তায়ালার বিশেষ কুদরতে পার্থিব দিক দিয়াও দজ্জালের প্রদত্ত সুখ-শান্তির ব্যবস্থায় দুঃখ-কষ্ট হইবে এবং দুঃখ-যাতনার ব্যবস্থায় সুখ-শান্তি বিরাজ করিবে। যেরূপ নমরূদের ভয়াবহ অগ্নি কুণ্ডলীর অভ্যন্তরে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ তায়ালার কুদরতে সুশীতল বস্তুর সুখ-শান্তি লাভ করিয়াছিলেন।

২৬৫৪। হাদীছঃ— عن انس رضى الله تعالى عنه

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بُعِثَ نَبِىٌّ اِلَّا اَنْذَرَ اُمَّتَهُ الْاَعْوَرَ الْكَذَّابَ اَلَا اِنَّهُ اَعْوَرُ وَاِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِاَعْوَرَ وَاِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوْبًا كَافِرٌ

অর্থ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, প্রত্যেক প্রেরিত নবীই স্বীয় উম্মতকে মিথ্যাবাদী কানা দজ্জাল হইতে সতর্ক করিয়া গিয়াছেন। (সে যে মিথ্যাবাদী উহার একটি সহজ প্রমাণ আমি তোমাদিগকে বলিতেছি। সে খোদা হওয়ার দাবী করিবে, অথচ) সে হইবে কানা—দোষী-চোখবিশিষ্ট, আর তোমাদের প্রভু পরওয়ারদেগার আল্লাহ তায়ালা কানা নন—তিনি সর্ব্ব-দোষমুক্ত।

আরও জানিয়া রাখিও, দজ্জালের চক্ষুদ্বয়ের মধ্যস্থলে—কপালে লিখিত থাকিবে "কাফের"।

ব্যাখ্যাঃ—বিভিন্ন হাদীছে উল্লেখ আছে, দজ্জালের কপালে আরবী ভাষায় খচিত কাফের শব্দটি প্রত্যেক মোসলমান—যে দজ্জালের দলে না ভিড়িবে সে পড়িতে পারিবে। এমনকি যে অশিক্ষিত লেখা-পড়া জানে না সেও উহা পড়িতে সক্ষম হইবে বলিয়া হাদীছে স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। (ফতহুল বারী ১৩—৮৫)

প্রকৃত প্রস্তাবে দজ্জালের আবির্ভাব দুনিয়ার আয়ুষ্কালের শেষ ভাগে কেয়ামতের অতি সন্নিকটে হইবে। পূর্ব্ববর্ত্তী নবীগণকে আল্লাহ তায়ালা দজ্জালের আবির্ভাব সম্পর্কে অবহিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার আবির্ভাবের সময় অবহিত করেন নাই, তাই তাঁহারা নিজ নিজ উম্মৎকে সতর্ক করিয়াছিলেন। প্রথম দিকে আমাদের পয়গাম্বর সর্ব্বশেষ নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)কে তদ্রূপ শুধু দজ্জালের আবির্ভাবের বিষয় অবহিত করা হইয়াছিল, আবির্ভাবের সময়কাল অবহিত করা

হয় নাই। এই কারণেই মোছলেম শরীফের এক হাদীছে হযরতের এই উক্তি বর্ণিত আছে। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন—

ان يخرج وانا فيكم فانا حجيجه دونكم وان يخرج ولست فيكم فامرء حجيج نفسه والله خليفتي عليكم......

"দজ্জালের আবির্ভাব যদি আমার জীবদ্দশায় হয় তবে তাহাকে পরাস্ত করার ব্যবস্থা আমিই করিব ; তোমাদের কিছু করার প্রয়োজন হইবে না। আর যদি আমার অবর্ত্তমানে তাহার আবির্ভাব হয় তবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে ; সেই অবস্থায় তোমাদের জন্য আমার স্থলে আল্লার সাহায্য কামনা করি। যাহারা দজ্জালের সম্মুখে পতিত হইবে তাহারা যেন তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ছূরা কাহাফের প্রাথমিক আয়াতগুলি পাঠ করে।"

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—কেয়ামত বা মহাপ্রলয় ঘনাইয়া আসার সাথে সাথে জগতে বিভিন্ন অস্বাভাবিক ও অসাধারণ ঘটনা ঘটিবার ভবিষ্যদ্বাণী কোরআন হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে। যথা—(১) অস্তমিত হওয়ার দিক হইতে সূর্য্য উদিত হওয়া। যাহার বিবরণ ২৬৪৭ নং হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে। (২) ইয়াজুজ-মাজুজ গোষ্টির আবির্ভাব, যাহার বিবরণ সম্মুখে আসিতেছে। (৩) দাব্বাতুল-আরদ বা ভূ-ভেদী জন্তুর আবির্ভাব। পবিত্র কোরআন ২০ পারা ২ রুকুতে ইহারও সুস্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। ইহা হইবে একটি অতি অস্বাভাবিক জীব। ইহার আকৃতি হইবে চতুষ্পদ জন্তুর, জন্ম হইবে উদ্ভিদের ন্যায় ভূ-ভেদী। মক্কাস্থিত ছাফা পাহাড় ভূকম্পনে ফাটিয়া জন্তুটি বাহির হইবে (বেহেশতি জেওর ৭—৪৯)। সর্ব্বাধিক আশ্চর্য্যজনক বিষয় যাহার সুস্পষ্ট উল্লেখ পবিত্র কোরআনেও রহিয়াছে যে, ঐ জন্তুটি লোকদের সহিত মানুষের ন্যায় কথা বলিবে। তাহার বক্তব্যের একটি অতি সত্য কথা পবিত্র কোরআনে এই উল্লেখ আছে—

أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ

সে অভিযোগ করিয়া বলিবে, "মানুষ আল্লার কুদরতের নিদর্শন সমূহের প্রতি একিন, বিশ্বাস ও আস্থা ছাড়িয়া দিয়াছে।" (২০ পারা ২ রুকু)

দজ্জাল ঐ শ্রেণীর অস্বাভাবিক বস্তুনিচয়েরই একটি। তাহার হাল-অবস্থা এবং যাদু ও নজর-বন্দীর ঘটনাবলী অতিশয় অসাধারণ ও অস্বাভাবিক হইবে। দজ্জাল অর্থ অতিশয় জালিয়াত। তাহার জালিয়াতি আরম্ভ হইবে নবুয়তের দাবী হইতে। অতঃপর খোদায়ী দাবীও সে করিবে। সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্ত্তী

পথ বহিয়া দজ্জালরূপে তাহার আবির্ভাব-অভিযান আরম্ভ হইবে। চতুর্দিকে বিভীষিকা ও বিপর্য্যয় ছড়াইয়া সে বিদ্যুৎ গতিতে অগ্রসর হইতে থাকিবে। সে ইহুদী সম্প্রদায়ের হইবে এবং সকল ইহুদীই তাহার আনুগত্য গ্রহণ করিবে। এতদ্ভিন্ন বেদ্বীন এবং শুধু নামের মোসলমান শ্রেণীর বহু লোক তাহার দলে ভিড়িবে। যাদুর সাহায্যে বিভিন্ন রকম অলৌকিক ও অস্বাভাবিক ঘটনাবলী সে দেখাইবে। যথা,—

(১) দজ্জালরূপে আবির্ভাবের পর দুনিয়ায় তাহার জীবনকাল দিনের হিসাবে ৪০ দিন হইবে। কিন্তু উহার মধ্যে একটি দিন এক বৎসর পরিমাণ দীর্ঘ হইবে। তারপরের দিনটি এক মাস পরিমাণ এবং তারপরের দিনটি এক সপ্তাহ পরিমাণ হইবে। অবশিষ্ট দিনগুলি স্বাভাবিক পরিমাণের হইবে। এক বৎসর ও এক মাস ও এক সপ্তাহ পরিমাণের দিনগুলিতেও স্বাভাবিক রকমের দিবা-রাত্রির গমনাগমন হইতে থাকিবে, কিন্তু যাদুর সাহায্যে নজর-বন্দীর দরুণ মানুষের দৃষ্টিতে তাহা উদ্ভাষিত হইবে না। ফলে দীর্ঘ এক বৎসর, এক মাস ও এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত মানুষের চোখে দিনের আলোই দেখা যাইবে। এই সূত্রেই ঐ দিনগুলিতে শুধু একদিনের নামায পাঁচ ওয়াক্ত যথেষ্ট হইবে না, বরং স্বাভাবিক সময়ের পরিমাণ করিয়া এক বৎসর, এক মাস ও এক সপ্তাহের নামাযই আদায় করিতে হইবে বলিয়া মোছলেম শরীফের হাদীছে স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে।

(২) যে সব সম্প্রদায় তাহার অনুগত হইবে এবং তাহাকে খোদা বলিয়া স্বীকার করিবে সে তাহাদের এলাকায় যথেষ্ট পরিমাণে বৃষ্টি বর্ষাইবার জন্য আকাশকে আদেশ করিবে। সেই এলাকায় প্রচুর বৃষ্টি বর্ষিবে, ফলে সেই এলাকায় শষ্য-ঘাসের প্রাচুর্য্য হইবে, পশুপাল অধিক মোটা-তাজা হইয়া বেশী বেশী পরিমাণে দুগ্ধ প্রদান করিবে। পক্ষান্তরে যে সম্প্রদায় তাহার ডাকে সাড়া দিবে না তাহাদের এলাকায় অনাবৃষ্টি দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে, ঘাসের অভাবে পশুপাল ধ্বংস হইয়া যাইবে, লোকগণ নিঃস্ব হইয়া পড়িবে।

(৩) পাহাড় পর্ব্বত বন-জঙ্গল ইত্যাদি পতিত এলাকা অতিক্রম কালে দজ্জাল ভূখণ্ডকে আদেশ করিবে—সমস্ত খনিজ দ্রব্যের ভাণ্ডার বাহির করিয়া দাও। সেমতে ভূগর্ভ হইতে সমুদয় খনিজ দ্রব্য উথলিয়া উঠিবে।

(৪) দজ্জালের বিভীষিকাময় অভিযানকালেই হযরত ঈসা (আঃ) আসমান হইতে অবতরণ করিবেন। দুইজন ফেরেশতার কাঁধে ভর করিয়া দামেশ্‌ক শহরের পূর্ব্ব প্রান্তে এক মসজিদের মিনারের উপর তিনি অবতরণ করিবেন। সিরিয়া অন্তর্গত "লুদ্দ্" নামক স্থানে যুদ্ধ ক্ষেত্রে দজ্জাল হযরত ঈসা আলাইহেচ্ছালামের হস্তে নিহিত হইবে। (মোছলেম শরীফ)

দজ্জালের অসাধারণ যাদু-শক্তির আরও একটি ঘটনা নিম্নে বর্ণিত হাদীছে প্রত্যক্ষ করুন।

২৬৫৫। হাদীছ ঃ— আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদের সম্মুখে দজ্জাল সম্পর্কে এক সুদীর্ঘ বিবৃতি প্রদান করিলেন। হজরতের বয়ানে এই ঘটনাটিও উল্লেখ ছিল যে, দজ্জাল মদীনায় প্রবেশের উদ্দেশ্যে আসিবে, কিন্তু উহা তাহার জন্য অসাধ্য। মদীনায় প্রবেশের প্রতিটি দ্বার ও পথ তাহার জন্য আল্লার তরফ হইতে রুদ্ধ হইবে। তাই সে মদীনার নিকটস্থ একটি লোনা ভূমিতে অবস্থান করিবে। মদীনা শহর হইতে তাহার প্রতি একটি লোক ছুটিয়া আসিবে। লোকটি তৎকালীন বিশ্বের উত্তম ব্যক্তিদের একজন। তিনি বলিবেন—

اشهد انك الدجال الذى حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه

"আমি সাক্ষ্য দিতেছি, তুই সেই দজ্জাল যাহার বিবরণ রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাদের জন্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।"

তখন দজ্জাল তাহার দলের লোকদিগকে বলিবে, আমি যদি এই ব্যক্তিকে মারিয়া পুনঃ জীবিত করিয়া দিতে পারি তবুও কি আমার (খোদা হওয়া) সম্পর্কে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকিবে? দলের লোকেরা বলিবে, না। তখন দজ্জাল ঐ লোকটিকে হত্যা করিবে এবং তৎপর তাঁহাকে জীবিত করিবে। তখন সেই লোকটি বলিবেন, তোর (দজ্জাল হওয়া) সম্পর্কে পূর্ব্বে এত সুদৃঢ় ও সুস্পষ্ট উপলব্ধি আমার ছিল না যেরূপ এখন হইয়াছে। তখন দজ্জাল পুনরায় ঐ লোকটিকে হত্যা করিতে চাহিবে, কিন্তু সেই ক্ষমতা তাহার হইবে না।

ব্যাখ্যা ঃ—মদীনা শহরে দজ্জাল কেন প্রবেশ করিতে পারিবে না সে সম্পর্কে কতিপয় সুস্পষ্ট হাদীছ অত্র গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে মদীনার ফজিলত পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে।

দজ্জাল একজন উত্তম ব্যক্তিকে হত্যা করার যে ঘটনা আলোচ্য হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে উহার আরও বিবরণ মোছলেম শরীফে বর্ণিতে আছে। যথা—ঐ লোকটি হইবেন খাঁটী দ্বীনদার, মদীনাবাসী। মদীনা শহর হইতে বাহিরে আসিলে পর দজ্জালের সৈন্যদলের সহিত ঐ লোকটির সাক্ষাত হইবে। তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, তুমি আমাদের খোদার (তথা দজ্জালের) প্রতি ঈমান রাখ না কি? লোকটি বলিবেন, প্রকৃত প্রস্তাবে কে খোদা তাহা ত অতি সুস্পষ্ট। তখন ঐ সৈন্য দলের লোকেরা বলিবে, তাহাকে হত্যা কর। আবার কেহ কেহ বলিবে, তোমাদের খোদা (দজ্জাল) নিষেধ করেন নাই—তিনি ভিন্ন অন্য কেহ যেন

কাহাকেও হত্যা না করে ? সেমতে তাহারা ঐ লোকটিকে দজ্জালের নিকট উপস্থিত করিবে। দজ্জাল তাঁহাকে প্রহারের আদেশ করিবে। তাঁহাকে প্রহার করা হইবে। দজ্জাল পুনরায় তাঁহাকে পাকড়াও করিবার ও প্রহার করিবার আদেশ করিবে। প্রহারের ফলে তাঁহার পেট ও পিঠ চেপ্টা হইয়া যাইবে। অতঃপর দজ্জাল তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, আমার প্রতি ঈমান স্থাপন করিয়াছ কি ? ঐ লোকটি বলিলেন, তুই মিথ্যাবাদী কানা-দজ্জাল। তখন তাঁহাকে করাত দ্বারা চিরিয়া ফেলার আদেশ করা হইবে। তাঁহাকে মাথার তালু হইতে চিরিয়া দুই পায়ের দুই অংশকে বিভক্ত করিয়া দূরে দূরে রাখা হইবে। তারপর দজ্জাল উক্ত খণ্ডদ্বয়ের মধ্য দিয়া পায়চারি করিবে এবং বলিবে, ক্বুম্—উঠিয়া দাঁড়াও। তৎক্ষণাৎ ঐ নিহত লোকটি জীবিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িবে।

অতঃপর দজ্জাল পুনরায় ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিবে, আমার প্রতি ঈমান স্থাপন করিবে কি ? তিনি বলিবেন, তোর (দজ্জাল হওয়া) সম্পর্কে আমার উপলব্ধি আরও সুদৃঢ় ও সুস্পষ্ট হইয়াছে। তিনি সমবেত লোক সমক্ষে সকলকে বজ্রকণ্ঠে আহ্বান করিয়া এই ঘোষণাও দিবেন, "হে লোক সকল ! এ-ই মিথ্যাবাদী কানা-দজ্জাল। যে কেহ তাহার দলভুক্ত হইবে জাহান্নামী হইবে এবং যে তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবে সে বেহেশতী হইবে।*

তিনি আরও বলিবেন, হে লোক সকল ! (তোমরা ভয় পাইও না ;) সে আমার পর অন্য কোন মানুষের প্রতি এরূপ করিতে পারিবে না। তখন দজ্জাল ঐ ব্যক্তিকে জবাই করার জন্য ধরিয়া আনিবে, কিন্তু তাঁহার গলায় অস্ত্র চলিবে না এবং তাঁহাকে সে হত্যা করিতে পারিবে না। তখন দজ্জাল তাঁহাকে তাঁহার হাত-পা ধরিয়া অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিবে। তিনি তথায় এরূপ শান্তি লাভ করিবেন যেন তিনি বেহেশতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন।

হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) এই লোকটি সম্পর্কে বলিয়াছেন, এই ব্যক্তি সারা জাহানের প্রভু-পরওয়ারদেগারের নিকট অতি বড় শহীদের মর্ত্তবা লাভ করিবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ— দজ্জালের সমুদয় ব্যাপারই অসাধারণ ও অস্বাভাবিক। উপরে তাহার সম্পর্কে যাহা বর্ণিত হইয়াছে সবই তাহার দজ্জালরূপে আবির্ভূত হওয়ার পরের অবস্থা। তাহার পূর্ব্ববর্তী হাল-অবস্থাও অত্যন্ত রহস্যজনক।

পবিত্র কোরআন ও বিভিন্ন হাদীছ দ্বারা অকাট্যরূপে প্রমাণিত ইয়াজুজ-মাজুজ গোষ্টি—তাহাদের আবির্ভাব কেয়ামতের নিকটবর্ত্তী সময়ে হইবে, কিন্তু ঐ গোষ্টির জন্ম ও অস্তিত্ব ভূপৃষ্ঠে বহু পূর্ব্ব হইতে আছে বলিয়াও পবিত্র কোরআনে উল্লেখ

* এই প্রথম ঘোষণাটি ফতহুল বারী কেতাবে উল্লেখ আছে—১৩—৮৮ দ্রষ্টব্য।

রহিয়াছে। ইয়াজুজ-মাজুজ গোষ্টির জন্মকাল হইতে তাহাদের আবির্ভাব কাল পর্য্যন্ত এই বিরাট গোষ্টি জগতেরই এক নিখোঁজ প্রান্তে জগতবাসীর দৃষ্টির অগোচরে অবস্থান করিতেছে। কেয়ামতের নিকটবর্ত্তী তাহারা ভূপৃষ্ঠে ছড়াইয়া পড়িবে।

(পবিত্র কোরআন ১৬ পারা ছুরা কাহাফ ও ১৭ পারা ছুরা আম্বিয়া দ্রষ্টব্য)

মোছলেম শরীফের এক হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয়, দজ্জালের অবস্থাও তদ্রূপ। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামেরও পূর্ব্ব হইতে দজ্জাল ভূপৃষ্ঠের এক অজ্ঞাত স্থানে আবদ্ধ অবস্থায় রহিয়াছে। কেয়ামতের নিকটবর্ত্তী সময়ে লোকালয়ে তাহার আবির্ভাব হইবে। একজন বিশিষ্ট ছাহাবী তাঁহার ইসলাম গ্রহণের পূর্ব্বে সামুদ্রিক ছফরে দুর্য্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় এক অজ্ঞাত নামা দ্বীপে পৌঁছিয়া ছিলেন। তিনি তথায় দজ্জালকে আবদ্ধ অবস্থায় দেখিয়া ছিলেন। তিনি সেই তথ্য হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)কে জ্ঞাত করিলে পর হযরত (দঃ) তাহা সমর্থন করিয়াছেন। এমনকি এক বিশেষ ভাষণে হযরত (দঃ) তাহা লোক সমক্ষে প্রকাশ করিয়াছেন। মোসলেম শরীফের উক্ত হাদীছের তরজমা নিম্নে দেওয়া হইল।

ফাতেমা বিন্‌তে কায়েস (রাঃ) সর্ব্বপ্রথম হিজরতকারী লোকদের মধ্যে একজন নারী ছাহাবী। তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের তরফ হইতে একজন আহ্বানকারী নামাযের জমাতে উপস্থিত হওয়ার জন্য বিশেষভাবে আহ্বান করিতে লাগিল। আমি জমাতে উপস্থিত হইয়া পেছনের কাতারে নারীদের সঙ্গে শামিল হইলাম। নামাযান্তে হযরত (দঃ) হাসিমুখে মিম্বারে যাইয়া বসিলেন এবং সকলকে বসিয়া থাকার আদেশ করিলেন। হযরত (দঃ) বলিলেন—আমি কেন তোমাদিগকে সমবেত করিয়াছি তাহা জান কি? আমি একটি বিশেষ ঘটনা শুনাইবার জন্য তোমাদিগকে সমবেত করিয়াছি।

তামীম দারী নামক একজন নাছরানী খৃষ্টান, আমার হাতে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে এবং আমাকে তাহার একটি ঘটনা শুনাইয়াছে। তাহার বর্ণনা ঐ তথ্যের পূর্ণ সমর্থক যাহা আমি তোমাদিগকে কানা-দজ্জাল সম্পর্কে বলিয়াছি। তাহার ঘটনাটি এই যে, সে অন্যান্য ত্রিশজন লোকের সহিত একটি সামুদ্রিক নৌকার যাত্রী ছিল। দীর্ঘ এক মাস কাল দুর্য্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় সমুদ্র তরঙ্গের হানাহানিতে নৌকাটি পথচ্যুত হইয়া একটি অপরিচিত দ্বীপে উপনীত হইল—তখন সূর্য্যাস্তের সময়। নৌকার সহিত একটি ডিঙ্গা ছিল, লোকেরা উহাতে বসিয়া দ্বীপে অবতরণ করিল। তথায় তাহাদের সাক্ষাত হইল একটি জন্তুর সহিত—উহার দেহ লোমে এমনভাবে আবৃত যে, উহার অগ্র-পশ্চাৎ স্থির করা যায় না। লোকেরা চমকিত হইয়া বলিল, তুই কে? জন্তুটি বলিল, আমি জাছ্‌ছাছাহ্ অর্থাৎ তথ্য সংগ্রহকারী।

লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, কি তথ্য সংগ্রহকারী? সে বলিল, ঐ কুড়ে ঘরে একটি লোক আছে, তাহার নিকট চল; তোমাদের সংবাদাদির ব্যাপারে তাহার বিশেষ আগ্রহ রহিয়াছে।

ঐ লোকদের সহিত তামীম দারীও ছিলেন, তিনি বলেন, আমরা যখন মানুষের সংবাদ শুনিলাম তখন আমরা দ্রুত কুড়ে ঘরের দিকে চলিলাম। তথায় একটি বিরাট কায়-বিশিষ্ট মানুষ দেখিতে পাইলাম। মানুষটি অতিশয় কঠিন ও শক্ত বন্ধনে আবদ্ধ—তাহার হস্তদ্বয় ঘাড়ের সহিত এবং পা উরুর সহিত লৌহ শৃংখলে আবদ্ধ। আমরা তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, আমার সংবাদ পাইবার স্থানেই তোমরা উপস্থিত হইয়াছ; আগে তোমাদের পরিচয় বল। উত্তরে বলিলাম, আমরা আরবের অধিবাসী। আমরা কিভাবে উক্ত দ্বীপে এবং তৎপর তাহার কুড়ে ঘরে পৌঁছিয়াছি সেই বিবরণও বলিলাম। ঐ লোকটি আমাদের নিকট কতিপয় নিদর্শনের কথা জিজ্ঞাসা করার পর আরবের নবীর আবির্ভাব সম্পর্কেও প্রশ্ন করিল। আমরা বলিলাম, মক্কায় তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছে এবং তিনি মদীনায় অবস্থান করিতেছেন। সে জিজ্ঞাসা করিল, আরবরা তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে কি? আমরা বলিলাম, যুদ্ধ বিগ্রহের পর তাঁহার চতুষ্পার্শ্বস্থ সকল অধিবাসীই তাঁহার অনুগত হইয়া গিয়াছে। সে বলিল, ইহাই তাহাদের জন্য উত্তম।

অতঃপর সে নিজ পরিচয় দানে বলিল, আমি হইলাম কানা-দজ্জাল। অচিরেই আমাকে বাহির হওয়ার অনুমতি দেওয়া হইবে। আমি বাহির হইয়া সকল দেশ ভ্রমন করিব, শুধু মাত্র মক্কা ও তায়বা নগরদ্বয়ে প্রবেশ করিতে পারিব না। উক্ত নগরীদ্বয়ে ফেরেশতাদের কড়া পাহারা থাকিবে।

হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় বিবৃতির এই পর্য্যায়ে লাঠি দ্বারা মিম্বারে আঘাত করতঃ বলিলেন, এই সেই "তায়বা" এই সেই "তায়বা"। তায়বা মদীনারই অপর নাম। অতঃপর হযরত (দঃ) উপস্থিত লোকদিগকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তমীম দারীর এই বর্ণনায় আমি আনন্দ লাভ করিয়াছি। কারণ, দজ্জাল এবং মক্কা মদীনা সম্পর্কে আমি তোমাদিগকে যাহা বলিয়াছিলাম উহার পূর্ণ সামঞ্জস্য রহিয়াছে উক্ত বর্ণনার সহিত।

● আলোচ্য ঘটনার দ্বীপটি সম্পর্কে ঘটনার বর্ণনা দানকারী তমীম দারী কোন সঠিক তথ্য দানে সক্ষম হন নাই, হযরত (দঃ)ও উহাকে নির্দ্দিষ্ট করেন নাই। মদীনা হইতে পূর্ব্বাঞ্চলে অবস্থিত বলিয়া মোসলেম শরীফের এক হাদীছে ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন মাত্র।

দজ্জালের জন্ম সম্পর্কে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সময়ে ইহুদী সম্প্রদায়ে একটি বালক জন্মিয়া ছিল—যাহার মধ্যে দজ্জালাকৃতির অনেক নমুনা বিদ্যমান থাকায় ছাহাবীদের মধ্যে আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছিল। এমনকি অনেকে তাহাকে দজ্জাল বলিয়া সাব্যস্ত করিতেন। সে "ইবনে-ছাইয়্যাদ" নামে পরিচিত ছিল। তাহাকে কেন্দ্র করিয়া চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইলে স্বয়ং হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহার সঠিক অবস্থা ওয়াকেফহাল হওয়ার চেষ্টা করিয়া ছিলেন এবং নিকট হইতে তাহাকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য তাহার বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহার অবস্থা রহস্যাবৃতই রহিয়া গিয়াছে।

ইমাম বোখারী (রঃ) উক্ত তথ্য সম্বলিত একটি হাদীছ ১৮১, ৪৩১ এবং ৯১২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন। উহার অনুবাদ নিম্নে দেওয়া হইল।

২৬৫৬। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ওমর (রাঃ) সহ অন্যান্য কতিপয় ছাহাবীর সহিত ইবনে ছাইয়্যাদ নামীয় বালকটির বাড়ীর দিকে রওয়ানা হইলেন। তাঁহারা পথিমধ্যেই একস্থানে তাহাকে অন্যান্য ছেলেদের সহিত খেলায় লিপ্ত দেখিতে পাইলেন। ইবনে ছাইয়্যাদ তখন সাবালক প্রায়।

হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) পেছন দিক হইতে অকস্মাৎ তাহার পিঠে করাঘাত করিলেন এবং বলিলেন, "আমি আল্লার রসুল" ইহার স্বীকৃতি ও বিশ্বাস তোর আছে কি ? সে হযরতের প্রতি তাকাইয়া বলিল, আমি এতটুকু বলিতে পারি যে, আপনি অশিক্ষিত আরবদের রসুল। অতঃপর সে হযরত (দঃ)কে পাল্টা প্রশ্ন করিল, আপনি কি স্বীকার করেন, আমি আল্লার রসুল ? তখন হযরত (দঃ) তাহাকে গলাধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিলেন এবং বলিলেন, আল্লার উপর এবং আল্লার প্রকৃত রসুলগণের উপর আমার ঈমান রহিয়াছে।

হযরত (দঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন শ্রেণীর আগন্তুক তোর গোচরে আসিয়া থাকে ? সে বলিল, সত্য-মিথ্যা বাস্তব-অবাস্তব মিশ্রিত তথ্যবাহীর আগমন আমার নিকট হয়। হযরত (দঃ) বলিলেন, মিথ্যার সংমিশ্রনে গড়ান তথ্যাবলীই তোর নিকট সরবরাহ করা হইয়া থাকে ; (ইহা হইল দুষ্ট জ্বীনদের কাজ।)

অতঃপর ইবনে ছাইয়্যাদের আসলরূপ প্রকাশ করিয়া দেওয়ার জন্য হযরত (দঃ) বলিলেন, তোর পরীক্ষার্থে আমি আমার মনে একটি কথা উপস্থিত করিয়া গোপন রাখিলাম। (তোর যদি গুপ্ত বিষয় জ্ঞাত হওয়ার ক্ষমতা থাকে তবে তাহা ব্যক্ত কর।

নবী (দঃ) ঐ সময় ছুরা দোখানের আয়াত—يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ তাঁহার মনে উপস্থিত করিয়াছিলেন। আয়াতটিতে একটি শব্দ ছিল "দোখান"। ইবনে ছাইয়াদ পূর্ণ আয়াতটি ব্যক্ত করিতে সক্ষম হইবে তাহাত অতি দূরের কথা; সে দোখান শব্দটিও ব্যক্ত করিতে পারিল না;) শুধু কেবল বলিল "দোখ্"।

হযরত (দঃ) তাহাকে ধিক্কার দিয়া বলিলেন, এতটুকুই তোর ক্ষমতার শেষ সীমা। ইহা অতিক্রম করার শক্তি তোর হইতে পারে না।

ওমর (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! ইহার শিরোচ্ছেদের অনুমতি আমাকে দিবেন কি? আপনি বাধা দিবেন না, আমি তাহার শিরোচ্ছেদ করিয়া দেই। উত্তরে হযরত (দঃ) বলিলেন, যদি সে প্রকৃত প্রস্তাবেই দজ্জাল হইয়া থাকে, তবে তাহাকে হত্যা করা তোমার দ্বারা হইবে না। (দজ্জালের হত্যাকারী হযরত ঈসা (আঃ) নির্দ্ধারিত রহিয়াছেন।) আর যদি সে দজ্জাল না হয় তবে তাহাকে হত্যা করায় কোন লাভ নাই।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) আরও বর্ণনা করিয়াছেন, এই ঘটনার পর হযরত (দঃ) পুনরায় এক দিন ছাহাবী উবাই ইবনে কায়াব (রাঃ) সমভিব্যহারে ইবনে ছাইয়্যাদের বাসস্থান খেজুর বাগানের দিকে রওয়ানা হইলেন। বাগানে পৌঁছিয়া হযরত (দঃ) খেজুর গাছের আড়ালে আড়ালে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। হযরত (দঃ) ইবনে ছাইয়্যাদের অগোচরে তাহার কথা-বার্ত্তা শুনিবার গোপন চেষ্টা করিতেছিলেন। ঐ সময় ইবনে ছাইয়্যাদ স্বীয় বিছানায় চাদর মুড়ি দিয়া বিড়বিড় করিতে ছিল। তাহার মাতা হযরত (দঃ)কে গাছের আড়ালে আড়ালে অগ্রসর হইতে দেখিয়া ফেলিল। সে ইবনে ছাইয়্যাদকে সতর্ক করিয়া বলিল, এই যে—মোহাম্মদ আসিয়া গিয়াছেন। ইবনে ছাইয়্যাদ তৎক্ষণাৎ নীরব হইয়া গেল। হযরত (দঃ) বলিলেন, তাহার মাতা তাহার বিড়বিড় বন্ধ না করিলে সে উহাতেই স্বীয় বাস্তব অবস্থা প্রকাশ করিয়া দিত।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এই ঘটনার পর হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) ভাষণ দানে দাঁড়াইলেন এবং আল্লাহ তায়ালার ছানা-ছিফৎ বর্ণনা করিয়া দজ্জালের উল্লেখ করিলেন। হযরত (দঃ) বলিলেন, আমি তোমাদিগকে দজ্জাল হইতে সতর্ক করিতেছি। প্রত্যেক নবীই নিজ নিজ উম্মতকে সতর্ক করিয়া গিয়াছেন, এমনকি নূহ (আঃ)ও তাঁহার উম্মতকে সতর্ক করিয়া গিয়াছেন। দজ্জাল মিথ্যাবাদী হওয়ার প্রমাণে এমন একটি কথা আমি তোমাদিগকে বলিব যাহা কোন নবী তাঁহার উম্মতকে বলেন নাই।

তোমরা জানিয়া রাখিও, দজ্জাল (খোদায়ী দাবী করিবে, অথচ) তাহার চোখ হইবে দোষল—আর আল্লাহ তায়ালা হইলেন সর্ব্ব দোষমুক্ত।

ব্যাখ্যা ঃ—ইবনে ছাইয়্যাদ সম্পর্কে গুজব ছড়াইয়া ছিল যে, সে গোপন কথা বলিয়া দিতে পারে। সেই গুজবের অবাস্তবতা প্রমাণ করার ব্যবস্থাই হযরত (দঃ) অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং তাহা সার্থক হইয়াছিল। হযরত (দঃ) নিজের মনে একটি আয়াত উপস্থিত করিয়া ইবনে ছাইয়্যাদকে উহা ব্যক্ত করার চ্যালেঞ্জ করিয়াছিলেন। ইবনে ছাইয়্যাদ তাহা ব্যক্ত করিতে অক্ষম হইয়াছিল। পূর্ণ আয়াতটির শুধু একটি শব্দের দুইটি অক্ষর মাত্র বলিতে পারিয়াছিল। ইহা দ্বারাই তাহার মিথ্যার রহস্য উদ্ঘাটিত হয়।

ইবনে ছাইয়্যাদের অবস্থার গোপন রহস্য এই ছিল যে, তাহার সহিত শয়তান শ্রেণীর জ্বীনের গাঢ় সম্পর্ক ছিল। সৃষ্টিগত ভাবে জ্বীন জাতির ক্ষমতা রহিয়াছে, তাহারা মানুষের আভ্যন্তরিক পয়তে পয়তে বিচরণ করিতে সক্ষম হয়। শিরায় শিরায় চলিতে পারে বলিয়া ছহীহ হাদীছে সুস্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে।

মানুষ তাহার অন্তরে কোন কিছু উপস্থিত করিলে অন্তরের উপর উহার ছায়া সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক বিষয়। কিন্তু তাহা হয় ত স্বয়ং সম্পূর্ণ ও সুস্পষ্ট হয় না। কোন জ্বীন কাহারও অভ্যন্তরে বিচরণ করিয়া তাহার অন্তরের উপর ঐ শ্রেণীর কোন অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ ছাপ্ দেখিয়া কিছু বলিলে তাহা নিশ্চয়ই সুস্পষ্ট ও সম্পূর্ণ হইবে না; নিতান্ত অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণই হইবে। হযরতের পরীক্ষার মাধ্যমে ইবনে ছাইয়্যাদের সেই রূপটাই প্রস্ফুটিত হইয়াছে। হযরতের অন্তরে উপস্থিত পূর্ণ আয়াতের শুধু একটি শব্দের দুইটি মাত্র অক্ষর সে ধরিতে পারিয়াছে যদ্দ্বারা বুঝা গিয়াছে যে, শয়তান শ্রেণীর জ্বীনের খেলাই হইল ইবনে ছাইয়্যাদের সর্ব্বময় পুঁজি। তাই হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, দুই অক্ষর শ্রেণীর অসম্পূর্ণ খোঁজ লাভের মধ্যেই তোর সর্ব্বময় দৌরাত্ম্য সীমিত। ইহার অধিক ক্ষমতা তোর নাই।

ইবনে ছাইয়্যাদের সহিত যে, শয়তান শ্রেণীর জ্বীনের সম্পর্ক ছিল মোসলেম শরীফের এক হাদীছে উহার সুস্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। হযরত (দঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ما ترى তোর নজরে কি দৃষ্ট হয়? সে উত্তরে বলিয়াছে, ارى عرشا على الماء আমি পানির উপর সিংহাসন দেখিয়া থাকি। এতচ্ছ্রবনে হযরত (দঃ) তাহাকে বলিয়াছিলেন, ترى عرش ابليس على البحر তোর ঐ দেখা বস্তুটি হইল সমূদ্র বুকে ইবলিসের সিংহাসন। (মোছলেম শরীফ ৩৯৭ পৃষ্ঠা)

পানির উপর ইবলিসের সিংহাসন প্রতিষ্ঠার কথা এই হাদীছ ছাড়া মোসলেম শরীফের আরও একখানা হাদীছে বর্ণিত আছে—যাহা মেশকাত শরীফের ১৮ পৃষ্ঠায়

উল্লেখ রহিয়াছে। জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) ইবলিসের দুষ্কৃতি অভিযানের বর্ণনা দানে বলিয়াছেন, ইবলিস পানির উপর তাহার সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া চুতুর্দ্দিকে তাহার দল-বলকে ভ্রষ্টতা ও গোমরাহীর উদ্দেশ্যে পাঠাইয়া থাকে। তারপর ইবলিস কর্ত্তৃক সিংহাসনে বসিয়া স্বীয় দল-বলের নিকট হইতে তাহাদের কার্য্যের রিপোর্ট গ্রহণের বিবরণ হযরত (দঃ) বয়ান করিয়াছেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—ইবনে ছাইয়্যাদের উল্লেখিত বিবরণ তাহার শৈশব কালের। সেই কারণেই তাহার অত্যন্ত ধৃষ্ঠতাপূর্ণ উক্তিকে হযরত (দঃ) সহ্য করিয়া গিয়াছেন এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই। বয়স্ক হওয়ার পর ত সে মোনাফেকরূপে হইলেও প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু তাহার অবস্থা এতই ঘোলাটে ছিল যে, তাহাকে প্রত্যক্ষকারী ছাহাবীগণ পর্য্যন্ত তাহার সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্ত নিতে পারেন নাই।

বিশিষ্ট ছাহাবী আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) নিজের ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন—এক সময় আমরা হজ্জ বা ওমরা করার উদ্দেশ্যে মদীনা হইতে মক্কায় যাইতে ছিলাম। আমাদের সঙ্গে ইবনে ছাইয়্যাদও ছিল। আমরা রৌদ্রের উত্তাপ সময়ে বিশ্রামের জন্য অবতরণ করিলাম। সকলেই এক একটা গাছের ছায়া-তলে চলিয়া গেল। ইবনে ছাইয়্যাদ ও আমি একত্রে থাকিয়া গেলাম। ইহাতে আমি বিচলিত হইলাম, কারণ ইবনে ছাইয়্যাদ সম্পর্কে লোকদের মধ্যে নানারকম কথা চলিতে ছিল। ইবনে ছাইয়্যাদ তাহার আসবাবপত্র নিয়া আসিয়া আমার আসবাবপত্রের সঙ্গে রাখিল। তখন আমি ভান করিয়া তাহাকে বলিলাম, উত্তাপ অনেক বেশী, সুতরাং তুমি ভিন্ন গাছের ছায়ায় চলিয়া গেলে ভাল হইত। সে তাহাই করিল। কিছু সময় পর সে আমাকে পান করাইবার জন্য বকরির দুগ্ধ নিয়া আসিল। আমি বলিলাম, এত গরমের সময় দুগ্ধ পান করিব না। এরূপ বলার একমাত্র কারণ এই ছিল যে, তাহার হাত হইতে কিছু গ্রহণ করাকে আমি এড়াইতে চাহিয়া ছিলাম।

সেই সময়ে ইবনে ছাইয়্যাদ আমাকে বলিল, হে ভাই আবু সায়ীদ! লোকদের কথা-বার্ত্তায় আমার মনে চায়, কোন বৃক্ষের সঙ্গে দড়ি লটকাইয়া গলায় ফাঁসি দিয়া মৃত্যু বরণ করি। অন্য লোকদের পক্ষে সঠিক সিদ্ধান্ত অজানা থাকিলেও আপনারা ত মদীনাবাসী ছাহাবী—আপনাদের পক্ষে তাহা অজানা থাকা চাই না। আপনারা ত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাদীছসমূহ ভাল-ভাবেই জানেন।

রসুলুল্লাহ (দঃ) কি বলেন নাই—দজ্জাল কাফের হইবে? আমি ত মোসলমান।

রসুলুল্লাহ (দঃ) কি বলেন নাই—দজ্জাল নিঃসন্তান হইবে ? আমি আমার ছেলেকে মদীনায় রাখিয়া আসিয়াছি।

রসুলুল্লাহ (দঃ) কি বলেন নাই—দজ্জাল মক্কা-মদীনায় প্রবেশ করিতে পারিবে না ? আমি মদীনায় থাকি এবং এখন মক্কাপানে যাইতেছি।

আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বলেন, তাহার কথায় আমার বিশ্বাস জন্মিয়া যাইতে ছিল যে, তাহার দজ্জাল হওয়া সম্পর্কে যত কিছু বলা হয় সব অবাস্তব। কিন্তু সে সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া ফেলিল, খোদার কসম—আমি দজ্জালকে চিনি, তাহার মাতা-পিতাকে চিনি, তাহার জন্মস্থান জানি এবং এখন সে কোথায় আছে তাহাও অবগত আছি। তখন আমি তাহাকে তিরষ্কার করিয়া বলিলাম, চিরকালের জন্য তোর কপালে ছাই-ভস্ম।

তাহাকে কেহ ইহাও জিজ্ঞাসা করিল, তুমি দজ্জাল হওয়া পছন্দ কর কি ? সে বলিল, যদি আমাকে তাহা বলা হয় তবে আমি উহা প্রত্যাখ্যান করিব না। (মোসলেম শরীফ ৩৯৮ পৃষ্ঠা।

ইবনে ছাইয়্যাদের সর্ব্বশেষ খবরও রহস্যাবৃত। কাহারও মতে তাহার মৃত্যু মদীনায়ই হইয়াছিল এবং সাধারণভাবে জন-সাধারণ তাহার মৃত্যু অবলোকন করিয়াছিল। কিন্তু আবু দাউদ শরীফে ছাহাবী জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, এজীদের শাসন আমলে মদীনার উপর এজীদ বাহিনীর এক পৈশাচিক আক্রমণ হইয়াছিল যাহা ইতিহাসে "হার্‌রা অভিযান" নামে প্রসিদ্ধ। সেই ঘটনায় মদীনার অসংখ্য লোক নিহত হইয়াছিল। জাবের (রাঃ) বলিয়াছেন, ইবনে ছাইয়্যাদ সেই ঘোলাটে অবস্থায় নিখোঁজ ও উধাও হইয়াছে।

সেমতে ইহাও হইতে পারে যে, ইবনে ছাইয়্যাদ প্রকৃত দজ্জাল ছিল না, অন্যান্য নিহত লোকদের ন্যায় সেও ঐ ঘটনায় নিহত হইয়াছে। আর ইহাও হইতে পারে যে—দজ্জালকে হত্যাকারী হযরত ঈসা (আঃ) যেরূপ বহু কাল পূর্ব্বেই দুনিয়ায় জন্ম গ্রহণ করিয়া দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর সাধারণ্যে বসবাস করিয়াছিলেন ; অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে দীর্ঘায়ু দান করিয়া জীবিতাবস্থায় জগদ্বাসীর দৃষ্টির অন্তরালে আসমানে রাখিয়া দিয়াছেন ; কেয়ামতের পূর্ব্বে নির্দ্ধারিত সময়ে দুনিয়ার বুকে পুনরায় তাঁহার আগমন হইবে। তদ্রূপ দলজ্জালও দজ্জালরূপে তাহার আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বে দুনিয়ায় জন্ম গ্রহণ করিয়া ইবনে ছাইয়্যাদ নামে বসবাস করার পর আল্লাহ তায়ালা তাহাকে মানব চোখের অগোচরে গুম করিয়া কোনও অজ্ঞাত দ্বীপে বা পর্ব্বত গুহায় আবদ্ধ রাখিয়া দিয়াছেন এবং তাহার আবদ্ধ জীবনের অগ্রিম মেছালী বা রূপক দৃশ্যই তামীম দারী (রাঃ) দেখিয়া ছিলেন ;

যাহার বিবরণ মোছলেম শরীফ হইতে পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। কেয়ামতের পূর্ব্বে নির্দ্ধারিত সময়ে দজ্জালরূপে পুনরায় দুনিয়ার বুকে তাহার আবির্ভাব হইবে। এই সূত্রে কতকগুলি জটিলতার মীমাংসাও সহজ হইয়া যায়।

মোছলেম শরীফ হইতে উদ্ধৃত আবু সায়ীদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হাদীছে স্বয়ং ইবনে ছাইদ্যাদের মুখে তাহার দজ্জাল হওয়ার বিরুদ্ধে কতিপয় দলীল উল্লেখ হইয়াছে। আলোচিত বক্তব্য অনুযায়ী ঐ সবের খণ্ডন সহজ হইয়া যায় যে, সে মক্কা-মদীনায় প্রবেশ করিতে পারিবে না, সে প্রকাশ্যে কাফের হইবে ইত্যাদি—এই সব শুধু কেবল দজ্জালরূপে পুনঃ আবির্ভাবকালের বিষয়। এই কারনেই তাহার সকল যুক্তি উপেক্ষা করিয়া আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ও জাবের (রাঃ) শপথ করিয়া বলিতেন যে, নিশ্চয় ইবনে ছাইয়্যাদ দজ্জাল। ওমর (রাঃ) স্বয়ং হযরতের সম্মুখে কসম খাইয়া বলিয়াছেন, ইবনে ছাইয়্যাদ নিশ্চয় দজ্জাল এবং হযরত (দঃ) সেই কথার উপর চুপ রহিয়াছেন। এই মর্ম্মে বর্ণিত একটি হাদীছ বোখারী শরীফ ১০৯৩ পৃষ্ঠায় আছে—

২৬৫৭। হাদীছ ঃ—বিশিষ্ট তাবেয়ী মোহাম্মদ ইবনুল-মোনকাদের (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি ছাহাবী জাবের (রাঃ)কে দেখিলাম—তিনি আল্লার নামে কসম করিয়া বলিতেছেন, নিশ্চয় ইবনে ছাইয়্যাদ দজ্জালই বটে। আমি বলিলাম, এই বিষয়ের উপর আপনি আল্লার নামে কসম করিতেছেন! তিনি বলিলেন, তাহাতে ভয় কি? আমি ওমর (রাঃ)কে হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে এই বিষয়ের উপর কসম করিতে শুনিয়াছি এবং হযরত (দঃ) তাঁহার এই কসমে বাধা দেন নাই।

রাষ্ট্র বিজ্ঞান অধ্যায়

শাসন ক্ষমতার উৎস

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলিয়াছেন ঃ—

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

"তোমরা আনুগত্য অবলম্বন কর আল্লার, অনুগত্য অবলম্বন কর রসূলের এবং তাঁহাদের যাঁহারা তোমাদের মধ্যে শাসন ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়।"

ব্যাখ্যা ঃ—মানুষের ফরমাবরদারী ও আনুগত্য লাভের মর্য্যাদা ও অধিকার প্রকৃত প্রস্তাবে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার। মানবের উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করার এবং মানবকে শাসন করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই রহিয়াছে যিনি

মানবের সৃষ্টিকর্ত্তা রক্ষাকর্ত্তা পালনকর্ত্তা। মানবের জন্য জীবন-ব্যবস্থা ও শাসন-বিধানের মূল নীতিরূপে আল্লাহ তায়ালা তাঁহার বাণী পবিত্র কোরআন দান করিয়াছেন এবং স্বীয় প্রতিনিধি বা রসুল প্রেরণ করিয়াছেন। পবিত্র কোরআনের মূল নীতি ও ধারাসমূহ ছাড়াও রসুল (দঃ) কার্য্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় খুঁটি-নাটি বিষয়াবলী ও উপধারা এবং বিশেষ ব্যাখ্যা স্বয়ং আল্লার তরফ হইতে অকাট্য ওহী মারফত প্রাপ্ত হইয়া মানবের উপর শাসন পরিচালন করিবেন। পবিত্র কোরআনে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই এই তথ্য ব্যক্ত করিয়াছেন—

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّٰهُ

"আমি আপনার প্রতি সত্যে পরিপূর্ণ মহান কেতাব অবতীর্ণ করিয়াছি; যেমতে আপনি মানবগণের মধ্যে সর্ব্ব বিষয়ের বিচার-মীমাংসা করিবেন ঐ পন্থায় যে পন্থা আল্লাহ তায়ালা আপনাকে প্রদর্শন করিয়াছেন।" (ছুরা নেছা, ১৫ রুকু)

আল্লার প্রেরিত সেই কেতাব হইল "কোরআন" এবং আল্লাহ কর্ত্তৃক রসুলকে প্রদর্শিত বিষয়-বস্তু সমূহই হইল "সুন্নাহ্"। সুতরাং মানবকে শাসন করার একমাত্র অবলম্বন হইল কোরআন ও সুন্নাহ্। আর ভূপৃষ্ঠে মানবের উপর শাসন পরিচালনের একমাত্র অধিকারী হইলেন রসুল; আল্লাহ কর্ত্তৃক মনোনীত ও প্রেরিত হওয়া হিসাবে। রসুল যেহেতু স্বয়ং আল্লার মনোনীত ও প্রেরিত এবং আল্লাহ কর্ত্তৃক নিষ্পাপরূপে সৃষ্ট, তাই রসুলের ক্ষেত্রে নির্ব্বাচনের কোন প্রশ্নই আসিতে পারে না—তিনি ত ক্ষমতা ও অধিকারের মূল মালিকের মনোনীত ও প্রেরিত। অতএব রসুলের আনুগত্য বস্তুতঃ মূল মালিকের আনুগত্যই গণ্য হইবে। কোরআনে এই তথ্য স্পষ্টরূপে ব্যক্ত রহিয়াছে—مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ "যে কেহ ফরমাবরদারী করিয়া চলে রসুলের সে ত বস্তুতঃ আল্লারই ফরমাবরদারী করিয়া থাকে।" (ছুরা নেছা, ১১ রুকু)

ভূপৃষ্ঠে রসুলের আগমনধারা বিদ্যমান থাকাবস্থায় মানব-শাসনের জন্য অন্য কোন চিন্তারই প্রয়োজন হয় না। কিন্তু হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) সর্ব্বশেষ রসুল—তাঁহার পরে আর কোন রসুল আসিবেন না। এই ক্ষেত্রে আবশ্যক হইয়াছে, রসুলের পর ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইয়া অন্য কোন ব্যক্তি বিশেষের উপর ন্যস্ত হওয়া। কারণ, শাসন ব্যবস্থা প্রয়োগ ও পরিচালন নির্দ্ধারিত দায়িত্বধারী ব্যতিরেকে সম্ভব হয় না। এই বিষয়টি বোখারী শরীফেরই এক হাদীছে সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে (পঞ্চম খণ্ড দ্রষ্টব্য)। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, বনী-ইস্রাঈলদের উপর শাসন কার্য্য পরিচালন করিতেন নবী বা রসুলগণ; এক নবী অতীত হওয়ার পর আর এক নবী তাঁহান স্থলে আসিতেন। আমার পরে আর

কোন নবীর আগমন হইবে না; হাঁ—আমার (পরে শাসন কার্য্য পরিচালনের জন্য) স্থলাভিষিক্ত হইবে। (৪৯১ পৃষ্ঠা)

সুতরাং রসুলের পরবর্ত্তী শাসন-ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন মানুষই স্বয়ং-কর্ত্তা মালিক-মোখ্‌তার শাসক নহে, বরং সে শাসন ক্ষমতার মূল কর্ত্তা রসুলের স্থলাভিষিক্ত। তাই ইসলামী পরিভাষায় রাষ্ট্র নায়ককে "খলীফা" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। "খলীফা" অর্থ স্থলাভিষিক্ত ; এই সূত্রেই প্রথম খলীফা আবু বকর (রাঃ)কে "খলীফাতু-রসুলিল্লাহ্" রসুলুল্লার স্থলাভিষিক্ত বলা হইত।

এখানেই রাষ্ট্র বিজ্ঞানের মূল বিষয়-বস্তুর মীমাংসা হইয়া যায় যে, শাসন-ক্ষমতার মূল অধিকারী মালিক হইলেন সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালা এবং মূল কেন্দ্র হইলেন আল্লার রসুল। সুতরাং শাসন ব্যবস্থার মূল অবলম্বন হইবে আল্লার প্রেরিত বাণী কোরআন এবং রসুলের হাদীছ বা সুন্নাহ্।

উল্লেখিত মীমাংসা সূত্রে রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের আরও দুইটি জরুরী বিষয় সপ্রমাণ হইয়া যায়। একটি হইল শাসকের মর্য্যাদা। যেহেতু বৈধ শাসক প্রকৃত প্রস্তাবে রসুলের স্থলাভিষিক্ত, সুতরাং রসুলের আনুগত্য ও ফরমাবরদারী এবং অনুসরণ করিয়া চলা যেরূপ ফরজ তদ্রূপ বৈধ শাসকের আনুগত্য, ফরমা-বরদারী এবং অনুসরণ করিয়া চলাও ফরজ বা অবশ্য কর্ত্তব্য। আর একটি বিষয় হইল শাসকের গুরুদায়িত্ব। কোন শাসক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করিয়া সে পৈত্রিক স্বত্বের উত্তরাধিকারী হয় না, বরং রসুলের স্থলাভিষিক্ত হয়। সুতরাং রসুলের যে মূল দায়িত্ব ছিল—মানবের দ্বীন-দুনিয়ার কল্যাণ কামনা ও উহার ব্যবস্থা করা, শাসককে সেই গুরুদায়িত্ব অবশ্যই বহন করিতে হইবে। অন্যথায় আল্লাহ ও আল্লার রসুলের নিকট তাহাকে অভিযুক্ত ও অপরাধী হইতে হইবে।

ইমাম বোখারী (রঃ) আলোচ্য পরিচ্ছেদের শিরোনামার আয়াত দ্বারা শাসন ক্ষমতা প্রাপ্তির সূত্র-পরম্পরার ইঙ্গিত দান করার পর উল্লেখিত জরুরী বিষয়দ্বয়ের জন্য দুইটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

২৬৫৮। হাদীছ :— سمع ابوهريرة رضى الله تعالى عنه

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ

اللهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي

وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي

অর্থ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) শুনিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার অনুগত ও ফরমাবরদার হইয়াছে—আমার অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে সে আল্লার অনুগত ও ফরমাবদার হইয়াছে—(অর্থাৎ বান্দার উপর সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য ও ফরমাবরদারী আবশ্যক। সেই আনুগত্য ও ফরমাবরদারী আদায় করার পথ হইল আমার আনুগত্য ও ফরমাবরদারী করা। আমার আনুগত্য ও ফরমাবরদারী করিলেই আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য ও ফরমাবরদারী করা সাব্যস্ত হইবে।) তদ্রূপ যে ব্যক্তি আমার নাফরমানী করিবে সে আল্লার নাফরমান সাব্যস্ত হইবে।

আর যে ব্যক্তি বৈধ শাসনকর্ত্তার অনুগত ও ফরমাবরদার হইয়াছে সে আমার অনুগত ও ফরমাবরদার হইয়াছে। (অর্থাৎ আমার অনুপস্থিতিতে বা আমার পরে আমার অনুগত ও ফরমাবরদার সাব্যস্ত হওয়ার পথ হইল আমার নীতি অনুসারী শাসনকর্ত্তার অনুগত ও ফরমাবরদার হওয়া।) আর যে ব্যক্তি বৈধ শাসনকর্ত্তার নাফরমানী ও বিরোধিতা করিবে সে আমার নাফরমানী ও বিরোধিতাকারী সাব্যস্ত হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ—এস্থলে যে, শাসনকর্ত্তার আনুগত্য রসুলের আনুগত্য ও শাসনকর্ত্তার বিরোধিতা রসুলের বিরোধিতা সাব্যস্ত করা হইয়াছে তাহা দুইটি শর্ত্ত সাপেক্ষ। একটি হইল বৈধ উপায়ে শাসন ক্ষমতা প্রাপ্ত হওয়া। বৈধ উপায়ে শাসন ক্ষমতা প্রাপ্তির একমাত্র পথ হইল রসুল প্রদত্ত সূত্রে শাসন ক্ষমতা প্রাপ্ত হওয়া। সৃষ্টিগত ভাবে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার মনোনয়ন প্রাপ্ত রসুলই যেরূপ ভূপৃষ্ঠে মানবের উপর শাসন পরিচালনের একমাত্র অধিকারী হইয়া থাকেন; তদ্রূপ রসুল প্রদত্ত সূত্রে শাসন ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তিই রসুলের পরে শাসন পরিচালনের অধিকারী হইতে পারেন। নতুবা শাসন ক্ষমতার প্রকৃত মালিক সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালা হইতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সূত্র-পরম্পরা ছিন্ন হইবে।

হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার শাসন ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে স্বীয় জীবনের শেষ শয্যায় দুইটি সূত্রের ইঙ্গিত দান করিয়া ছিলেন। একটি হইল তাঁহার মনোনয়ন আর একটি হইল মোমেনগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচন। হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বাক্যগুলি এই ছিল—

لقد هممت أن ارسل الى ابى بكر وابنه فاعهد ان يقول القائلون
او يتمنى المتمنون ثم قلت يدفع الله ويأبى المؤمنون -

* মোছলেম শরীফের রেওয়ায়েতে **الا ابابكر** উল্লেখ আছে। (২—২৭৩)

"আমি ইচ্ছা করিয়া ছিলাম, আবু বকরকে সংবাদ দেই ; কিম্বা তাহার সঙ্গে মিলিত হই এবং তাহার মনোনয়ন চূড়ান্ত করিয়া দেই, যেন কাহারও কিছু বলার বা কাহারও কোনরূপ আশা করার অবকাশই না থাকে। পরে ভাবিলাম আবু বকর ভিন্ন আর কাউকে আল্লাহ্ তায়ালাও গ্রহণ করিবেন না এবং মোমেনগণও অন্য কাউকে নির্ব্বাচন করিবে না।" (বোখারী শরীফ ১০৭২ পৃষ্ঠা)

হযরতের এই উক্তিতে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হইল যে, শাসন ক্ষমতা প্রাপ্তির বৈধ উপায় দুইটি। একটি হইল মোমেনগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হওয়া, আর একটি হইল রসুল (দঃ) কর্ত্তৃক মনোনীত হওয়া ↑।

অপর শর্ত্ত হইল মানবের উপর শাসন পরিচালনের একমাত্র অবলম্বন কোরআন ও সুন্নাহ্ মোতাবেক শাসন পরিচালনা করা। যেই শাসনকর্ত্তার মধ্যে এই শর্ত্ত দুইটি বিদ্যমান তাহারই ক্ষেত্রে হযরতের এই উক্তি যে, শাসন-কর্ত্তার আনুগত্য বস্তুতঃ আমার আনুগত্য এবং শাসনকর্ত্তার বিরোধিতা বস্তুতঃ আমার বিরোধিতা।

আলোচ্য হাদীছের শব্দ "اميرى—আমার শাসনকর্ত্তা" এস্থলে "আমার" বলিবার তাৎপর্য্য উক্ত শর্ত্তদ্বয়ই। উক্ত শর্ত্তদ্বয় সম্বলিত শাসনকর্ত্তা প্রকৃত প্রস্তাবে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খলীফা বা স্থলাভিষিক্ত এবং ইহাই "আমার শাসনকর্ত্তা"-এর অর্থ ও উদ্দেশ্য। (ফতহুল বারী ১৩—৯৫)

২৬৫৭। হাদীছ :— عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالامام الذى على الناس راع وهو مسئول عن رعيته والرجل راع على اهل بيته وهو مسئول عن رعيته والمرأة راعية على اهل بيت زوجها وهى مسئولة عنهم وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسئول عنه الا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته

অর্থ :—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের অনেকেই উপরিস্থ ; এবং প্রত্যেক উপরিস্থই স্বীয় অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইবে।

↑ বৈধভাবে শাসন ক্ষমতা প্রাপ্ত শাসনকর্ত্তার মনোনয়ন সম্পর্কে আলোচনা পরে বিস্তৃত হইবে।

রাষ্ট্রপ্রধান লোকদের উপর শাসনকর্ত্তা ও উপরিস্থ ; সে জিজ্ঞাসিত হইবে তাহার শাসিত লোকদের সম্পর্কে। গৃহকর্ত্তা উপরিস্থ হয় স্বীয় পরিবারবর্গের ; সে তাহার পরিবারবর্গ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইবে। গৃহকর্ত্রী উপরিস্থ হয় স্বামীর অন্দর মহলের এবং তাহার সন্তানগণের ; সে জিজ্ঞাসিত তাহাদের সম্পর্কে। মানুষের ভৃত্য বা কর্মচারী উপরিস্থ হয় স্বীয় মালিকের মাল-সম্পদের ; সে উহা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইবে।

স্মরণ রাখিও—তোমাদের প্রত্যেকেই উপরিস্থ এবং প্রত্যেক উপরিস্থ তাহার অধীনস্থ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইবে।

ব্যাখ্যা :—আলোচ্য হাদীছে হযরত (দঃ) শাসনকর্ত্তার বিরাট দায়িত্ব সম্পর্কে ইঙ্গিত দান করিয়াছেন। হাদীছটির মর্ম্ম এই যে, মানুষের উপর তাহার নিজস্ব পরিবারবর্গের ব্যাপারে যে শ্রেণীর গুরুদায়িত্ব রহিয়াছে—সারা দেশবাসীর ব্যাপারে সেই শ্রেণীর গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত থাকিবে শাসনকর্ত্তার উপর। স্ত্রীর উপর স্বামীর সন্তান-সন্ততি ও তাহার অন্দর-মহলের সর্ব্বময় রক্ষণাবেক্ষণের যেরূপ গুরুদায়িত্ব রহিয়াছে—সারা দেশবাসীর রক্ষণাবেক্ষণের সেইরূপ গুরুদায়িত্ব রহিয়াছে শাসনকর্ত্তার উপর। একজন ভৃত্য খাদেম বা কর্মচারীর উপর যেরূপ দায়িত্ব রহিয়াছে স্বীয় মনীবের ধন-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের—ঠিক তদ্রূপই শাসনকর্ত্তার উপর দায়িত্ব রহিয়াছে সারা দেশবাসীর ধন-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের।

শাসনকর্ত্তা তাহার এই গুরুদায়িত্ব যথাযথ পালন না করিলে দুনিয়াতেও সে অভিযুক্ত এবং আখেরাতেও সে অভিযুক্ত। আল্লার দরবারে তাহার অন্যান্য আমলের সহিত এই গুরুদায়িত্ব পালনের হিসাবও দিতে হইবে।

খলীফা তথা রাষ্ট্রপ্রধান নির্ব্বাচনে আইনগত কাঠামোর দুইটি বিশেষ ধারা

২৬৬০। **হাদীছ** :— قال معاوية رضى الله تعالى عنه

سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ هٰذَا الْاَمْرَ فِىْ قُرَيْشٍ لَا يُعَادِيْهِمْ اَحَدٌ اِلَّا كَبَّهُ اللّٰهُ عَلٰى وَجْهِهٖ مَا اَقَامُوْا الدِّيْنَ

অর্থ :— মোয়াবিয়া (রাঃ) স্বীয় ভাষণে বলিয়াছেন, আমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মুখে শুনিয়াছি—তিনি বলিয়াছেন, খেলাফত বা রাষ্ট্রপ্রধানের পদ কোরায়েশ বংশের মধ্যেই থাকিবে—যাবৎ এই বংশের লোকগণ পূর্ণাঙ্গ দ্বীন-ইসলামের ধারক ও বাহক থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে কেহ তাহাদের প্রতি শত্রু ভাবাপন্ন হইলে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে পরাস্ত ও অপদস্ত করিবেনই।

২৬৬১। হাদীছ ঃ— قال ابن عمر رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ هٰذَا الْاَمْرُ فِىْ قُرَيْشٍ مَا بَقِىَ مِنْهُمْ اِثْنَانِ

অর্থ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, খেলাফত বা রাষ্ট্রপ্রধানের পদ কোরায়েশদের মধ্যে থাকিতে হইবে যাবত মানব গোষ্টির দুই ব্যক্তিও বিদ্যমান থাকে।

ব্যাখ্যা ঃ—বিশ্ব-মোসলেম-জাতীয় স্বার্থের স্থদৃঢ় দুর্গ গঠনে স্থচিন্তিত এক মহা প্রকল্প ছিল বিশ্ব-নবীর সম্মুখে।

যে প্রকল্প বাস্তবায়নের বদৌলতে কয়েক শতাব্দি পর্য্যন্ত মোসলেম জাতি সারা বিশ্বের উপর প্রাধান্য ও প্রভাব বিস্তারকারী ছিল।

যেই প্রকল্পের ফাটল হইতেই মোসলেম জাতির দুর্ব্বলতা ও হেয়তার স্থচনা হইয়াছে।

যেই প্রকল্প পর্য্যুদস্ত ও বিধ্বস্ত হওয়ার ফলেই বর্ত্তমান বিশ্ব-মোসলেম জাতি সর্ব্বহারা, সর্ব্বস্বান্ত ও মৃত্যু কবলিত হইয়া পড়িয়াছে।

যেই প্রকল্প পুনরুদ্ধারের জন্য যুগে যুগে রাজনৈতিক প্রজ্ঞাশীল মোসলেম নেতৃবৃন্দ কাঁদিয়া কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়া গিয়াছেন।

যেই প্রকল্পটির জন্য আজও বিশ্ব-মোসলেম হাহাকার করিতেছে, তাহাদের উর্দ্ধতন মহল ছুটাছুটি করিতেছে, কিন্তু তাহা গড়িয়া উঠিতেছে না। ফলে মোসলেম সমাজের দুর্দ্দিনের নিশিও প্রভাত হইতেছে না।

সেই প্রকল্পটি হইল মোসলমানদের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সর্ব্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় "প্যান-ইসলাম-ইজম" তথা বিশ্বের সমুদয় মোসলেম সমবায়ে এক কেন্দ্রিক সংযুক্ত মোসলেম-রাষ্ট্র স্থাপন।

ইসলামী রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বিশ্বে খণ্ড খণ্ড বিভক্ত মোসলেম রাষ্ট্রের কোন বিধান বা কাঠামো নাই; সেখানে আছে এক কেন্দ্রিক সম্মিলিত মোসলেম রাষ্ট্রের কাঠামো ও বিধান। উপরোল্লেখিত হাদীছদ্বয় সেই কাঠামোর একটি ধারা বা স্থপারিশ। এবং সেই দৃষ্টিতে উক্ত ধারা ও স্থপারিশটি খুবই যুক্তিযুক্ত। যাহার বিশ্লেষণ এই—

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ-মহাদেশগুলির দুর-দুরান্তের মোসলেম এলাকা সমূহ একত্রে গুটাইয়া এক কেন্দ্রিক রাষ্ট্র রূপায়নে সেই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান নির্ব্বাচন অত্যন্ত জটিল বিষয় হইয়া দাঁড়াইবে। কেন্দ্রিয় রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য প্রতিটি শাখার আন্তরিক আনুগত্য

অপরিহার্য্য ; উহা ব্যতিরেকে রাষ্ট্রের উন্নতি ত দুরের কথা শান্তি-শৃঙ্খলাও কায়েম হইতে পারে না। সংখ্যাধিক্য বা ভোটের জোরে আন্তরিক আনুগত্য লাভ হইতে পারে না, অথচ পূর্ব্বালোচিত প্রকল্পের স্থায়িত্বের জন্য আন্তরিক আনুগত্যের প্রয়োজন অনেক বেশী।

এক কেন্দ্রিক মোসলেম-রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান নির্ব্বাচনের আইনগত কাঠামোর উল্লেখিত ধারা ও সে সম্পর্কে হযরতের উক্ত সুপারিশ সেই প্রয়োজনীয় বস্তুটি লাভের চেষ্টারই একটি পদক্ষেপ। বিশ্বের সকল দেশ সকল অঞ্চল ও সকল এলাকার মোসলমানদেরই জাতিগত ও স্বভাবগত বিশেষ আকর্ষণ ও শ্রদ্ধা রহিয়াছে কোরায়েশ বংশের প্রতি—যাহা আন্তরিক আনুগত্য প্রতিষ্ঠার বিশেষ সহায়ক। শুধু মাত্র এই কারণেই হযরত (দঃ) স্বীয় উম্মতের কল্যাণ ও মঙ্গল কামনারূপে উক্ত সুপারিশ করিয়াছেন।

এই সঙ্গে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) একটি শর্তও আরোপ করিয়া দিয়াছেন—ما اقاموا الدين "যাবত কোরায়েশ বংশের লোকগণ পূর্ণাঙ্গ দ্বীন-ইসলামের ধারক ও বাহক থাকে।" দ্বীন-ইসলাম বলিতে শুধু নামায-রোযার পরহেজগারীই উদ্দেশ্য নহে, বরং ইসলামের সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, পূর্ণ ইনসাফ ও ন্যায় পরায়ণতাও অবশ্যই উদ্দেশ্য। এ সম্পর্কীয় এক হাদীছে স্পষ্টরূপেই এই বিষয়ের উল্লেখ আছে— ما اذا حكموا فعدلوا "যাবত কোরায়েশ বংশের লোকগণ তাহাদের প্রতিটি সিদ্ধান্তে ইনসাফ ও ন্যায় পরায়ণতার পূর্ণ অনুসরণ করে।"

(ফতহুল বারী ১৩—৯৭)

এই শর্তের সহিত রাষ্ট্রপ্রধানের নির্ব্বাচন কোরায়েশ বংশ হইতে করা হইলে সে ক্ষেত্রে মানবীয় দুর্ব্বলতা—আঞ্চলিকতাবাদের প্রতিক্রিয়া যে বহুলাংশে বিদুরিত হইবে তাহা একটি বাস্তব সত্য এবং সেই দৃষ্টিতেই উল্লেখিত হাদীছদ্বয়ের উক্ত সুপারিশ।

২৬৬২। হাদীছ ঃ—আবু বক্‌রাহ্ (রাঃ) বলিয়াছেন, জামাল-যুদ্ধের সময়ে আমি অত্যন্ত উপকৃত হইয়াছি (হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের) একটি উক্তি দ্বারা। হযরত নবী (দঃ) যখন জানিতে পারিলেন, পারস্যবাসী তাহাদের পরলোকগত শাসনকর্ত্তা কেছ্‌রার কন্যাকে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করিয়াছে তখন হযরত (দঃ) বলিয়াছিলেন—

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً

"ঐ জাতির উন্নতি হইবে না যে জাতি তাহাদের শাসন-কার্য্য পরিচালন ভার কোন নারীর উপর ন্যস্ত করিয়াছে। (১০৫৩ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যাঃ— কেন্দ্রিয় শাসনকর্ত্তা বা রাষ্ট্রপ্রধান নির্ব্বাচনের জন্য আলোচ্য পরিচ্ছেদের আইনগত কাঠামোর দ্বিতীয় ধারাটির প্রতিই অত্র হাদীছে ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, রাষ্ট্রপ্রধান পুরুষ হইতে হইবে।

মানবের সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালা। স্রষ্টা স্বীয় সৃষ্ট বস্তুর খুঁটি-নাটি সমুদয় বিষয় সর্ব্বাধিক বেশী জ্ঞাত থাকেন—এই সত্য সম্পর্কে কাহারও দ্বিমতের অবকাশ নাই।

সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ্ তায়ালা স্বয়ং তাঁহার বাণী পবিত্র কোরআনে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন—

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ

"পুরুষগণ কর্ত্তৃত্বের অধিকারী নারীদের উপর এই কারণে যে, (সৃষ্টিকর্ত্তা) আল্লাহ তায়ালাই এক শ্রেণীকে অপর শ্রেণীর উপর বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব, মর্য্যাদা ও অগ্রাধিকার দান করিয়াছেন।" (৫ পারা ৬ রুকু)

নারীদের উপর পুরুষের এই সৃষ্টিগত শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রাধিকার শুধু কেবল একটা পারস্পারিক সন্মান ও শ্রদ্ধার দিক দিয়াই নহে, বরং মানুষের মধ্যে দৈহিক ও আভ্যন্তরীণ যতগুলি শক্তি বা শক্তির কেন্দ্র রহিয়াছে সব গুলিরই পরিমাণ, কাঠামো ও উপাদানের মধ্যে পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে নারীদের উপর। বিজ্ঞানের বিকাশ এই সত্যকে প্রত্যক্ষরূপ দান করিয়াছে।

যদিও এক-দুই জন ভাবাবেগ-পরাভুত বৈজ্ঞানিককে নারী-পুরুষে শক্তি-স্বামর্থের সমতার পক্ষে পাওয়া যায়, কিন্তু বহু সংখ্যক বৈজ্ঞানিক যাঁহারা বর্ত্তমান বিশ্বের সেরা বৈজ্ঞানিকরূপে খ্যাতি সম্পন্ন তাঁহাদের সুচিন্তিত অভিমতই নয় শুধু, বরং তাঁহারা গবেষণা মূলক হিসাব-নিকাশ ও পরিমাপের দ্বারা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, সৃষ্টিগত ভাবেই নারী-পুরুষের মানবীয় শক্তি-স্বামর্থে বিরাট ব্যবধান ও পার্থক্য রহিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর এন্‌সাইক্লোপীডিয়া তথা বিশ্বকোষ গ্রন্থে নারী-পুরুষের শক্তি স্বামর্থের ব্যবধান দেখাইতে নারীর মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত পর্য্যালোচনা করা হইয়াছে। নারী ও পুরুষের যে সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বাহ্যত একান্তই একরূপ মনে হয় সেগুলির মধ্যেও ব্যবধান প্রমাণে অনেক রকম তথ্যের সমাবেশ করা হইয়াছে। (physiology) দেহতত্ব শাস্ত্রের গবেষণা অনুযায়ী নারী-পুরুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কে বহু উদ্ধৃতির উল্লেখ করা হইয়াছে যদ্বারা নারী-পুরুষের শক্তি-স্বামর্থের ব্যবধান দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। নিম্নে ঐ সব আলোচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল।

দৈহিক শক্তির ব্যবধানঃ বিশ্বকোষের গ্রন্থকার লেখেন, "নারীর তুলনায় পুরুষের দৈহিক অবস্থা বহুগুণ বেশী শক্তিশালী।" এই দাবীটি এতই সত্য যে, ইহার জন্য দলীল প্রমাণের আবশ্যক হয় না। এই দাবীর বাস্তবতা মানব শ্রেণীতে সীমাবদ্ধ নহে। হায়ওয়ান-জানোয়ার শশু-পক্ষীর মধ্যেও মাদীর উপর নরের প্রাবল্য ও শক্তির আধিক্য এবং অপ্রতিহত আধিপত্য হইয়া থাকে। ইহা প্রমাণের জন্য বৈজ্ঞানিক যুক্তিব আবশ্যক হয় না, প্রাত্যহিক চাক্ষুষ ঘটনাবলীই যথেষ্ট। চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রামান্য কথা এই যে, মাদী অপেক্ষা নরের মাংস বহুগুণ বেশী শক্তিশালী ও বলদায়ক। আমাদের মুখের ভাষাও এই সাক্ষ্য বহন করে; গাভীর নর তথা ষাঁড় বা দামড়াকে এই অর্থেই "বলদ" বলা হয়—"বলদ" অর্থ বলদায়ক। রসায়ন শাস্ত্রের (Chemistry) গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, উদ্ভিদ ও বৃক্ষ-লতা—যেমন অগুরু, খেজুর, কলা ইত্যাদি গাছের মধ্যেও নর-মাদী রহিয়াছে এবং স্বাভাবিক শক্তির দিক দিয়া মাদী গাছের তুলনায় নর গাছ অধিকতর শ্রেষ্ঠ।

মাংসপেশীর অবস্থায় ব্যবধানঃ প্রফেসার ডক্টর ছ ফরিনি বিশ্বকোষ গ্রন্থে ইহাও লিখিয়াছেন যে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার সমষ্টিগত দৃষ্টিতে দেখা যায়, নারীর মাংসপেশী ও পুরুষের মাংসপেশী উভয়ের ব্যবধান এত অধিক এবং ঘনত্ব ও শক্তির দিক দিয়া প্রথমটি দ্বিতীয়টি অপেক্ষা এত দুর্ব্বল যে, এইগুলির স্বাভাবিক শক্তিকে তিন ভাগ করা হইলে দুই ভাগই পুরুষের পক্ষে পড়িবে এবং নারীর পক্ষে পড়িবে শুধু এক ভাগ। মাংসপেশীর দ্রুত সঞ্চালন-গতি এবং সংকোচনের ব্যাপারেও ঐ একই অবস্থা। নারীর তুলনায় পুরুষের মাংসপেশী চলনগতিতে দ্রুততর এবং ক্রিয়ায় অধিকতর শক্তিশালী।

দেহের পরিমাপে ব্যবধানঃ বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, পুরুষের গড়পড়তা উচ্চতার তুলনায় নারীর গড়পড়তা উচ্চতা ১২ সেন্টি-মিটার (প্রায় পাঁচ ইঞ্চি) কম। এই পার্থক্য দেশ-জাতি নির্ব্বিশেষে ভদ্র-অভদ্র সকল শ্রেণীর মধ্যেই বিদ্যমান।

দেহের ওজনে ব্যবধানঃ পুরুষের গড়পড়তা ওজন ৪৭ কিলোগ্রাম কিন্তু নারী-দেহের গড়পড়তা ওজন ৪২½ কিলোগ্রামের অধিক হয় না। অর্থাৎ পুরুষ অপেক্ষা নারী দেহের ওজন প্রায় পাঁচ কিলোগ্রাম (পাঁচ সের) কম। বলা বাহুল্য—নারী-পুরুষের বয়সের গড়পতায় ও এই হারের পার্থক্য বিদ্যমান রহিয়াছে।

মানসিক অবস্থার ব্যবধানঃ বিশ্বকোষের গ্রন্থকার দেহতত্ত্ব শাস্ত্রের গবেষণা অনুযায়ী নারী দেহের সূক্ষ্ম আলোচনার পর গোটা আলোচনার সারমর্ম উদ্ধার করিয়া বলেন, দেহ তৈরীর উপাদান সমূহের সংমিশ্রন নারীর বেলায় এইরূপ

হইয়াছে যাহাতে নারীর অনুভূতি শক্তির মধ্যে বিশেষ উত্তেজনা ও তীক্ষ্ণতা সৃষ্টির প্রক্রিয়া স্থান লাভ করিয়াছে। ফলে নারীর অনুভূতি শক্তি যে কোন প্রকার প্রতিক্রিয়ায়ই অতি দ্রুত এবং অতি মাত্রায় প্রভাবিত হইয়া পড়ে—যেরূপ অবস্থা শিশুদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। শিশুর নিয়ম হইল—দুঃখ-কষ্টের কোন ব্যাপার ঘটিলে তৎক্ষণাৎ কাঁদিতে শুরু করে, আর খুসির কিছু দেখিলে আনন্দে আত্মহারা হইয়া লাফাইতে আরম্ভ করে। নারীর অবস্থাও অনেকটা তেমনই—অনুভূতি প্রভাব ক্ষেত্রে পুরুষ অপেক্ষা নারী অধিকতর দ্রুত প্রভাবিত ও আক্রান্ত হইয়া থাকে। অনুভূতি উদ্রেককারীর বিষয়াবলী নারীর হৃদয়পটে এতই প্রভাব বিস্তার করে যে, সে ক্ষেত্রে জ্ঞান-বুদ্ধির সম্পর্ক থাকে না। এই কারণেই নারীদের মধ্যে ধীরস্থিরতার বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হয় এবং এই কারণেই যে কোন কঠিন ও দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে নারীগণ স্থিরপদ থাকিতে পারে না।

পুরুষের মগজের তুলনায় নারীর মগজে অনুভূতির প্রতিক্রিয়া সৃষ্টীর ও উত্তেজনা-শক্তির কেন্দ্রের সংগঠন অধিকতর শক্তিশালী। এই একটি বিষয়ে পুরুষ অপেক্ষা নারী অগ্রগামিনী বটে, কিন্তু ইহা নারীর জন্য অশুভই প্রমাণিত হইয়াছে। কারণ, অনুভূতি-প্রতিক্রিয়ার তীব্রতা ও উত্তেজনার আধিক্যের পরিণামে নারী বিবেক-বুদ্ধির কোঠায় পঙ্গু হইয়া থাকে।

বিশ্বকোষ প্রণেতা প্রফেসার ফ্ব ফরিনি অনুভূতি-প্রতিক্রিয়ার তীব্রতা ও উত্তেজনার আধিক্যে নারী-পুরুষের ব্যবধানের উল্লেখ করিয়া বলেন, "এই ব্যবধানটা উভয় শ্রেণীর অন্য কতকগুলি সুস্পষ্ট ব্যবধানের সহিত পুরাপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। পুরুষের মধ্যে জ্ঞান-বুদ্ধি ও বোধশক্তির প্রখরতা অধিক, আর নারীর মধ্যে চঞ্চলতা ও উত্তেজনার স্বভাব প্রবল।

প্রখ্যাত দার্শনিক ডক্টর প্রোডন লিখিয়াছেন, পুরুষের তুলনায় নারীর তত্ত্বজ্ঞান, বরং বুদ্ধির অষ্টবিধ গুণ যেগুলিকে "ধীগুণ" বলা হয় ঐ পরিমাণই দুর্ব্বল যে পরিমাণ নারীর মূল জ্ঞান-বুদ্ধি পুরুষের তুলনায় দুর্ব্বল !

হৃৎপিণ্ড Heart ঃ মানব-প্রাণের মূল কেন্দ্র হইল হৃৎপিণ্ড। নারী এবং পুরুষের এই হৃৎপিণ্ডেও যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত হইয়াছে—পুরুষের হৃৎপিণ্ডের তুলনায় নারীর হৃৎপিণ্ড ৬০গ্রাম ছোট এবং অপেক্ষাকৃত হাল্‌কা ও লঘুভার হইয়া থাকে।

শ্বাস-প্রশ্বাস ঃ এ ক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষের মধ্যে বিরাট ব্যবধান রহিয়াছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত হইয়াছে—শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে কারবনিক এসিডের

(Carbonic acid —অঙ্গারাম্ল) যে সব অণুকণা বহির্গত হয় তাহা আভ্যন্তরিণ তাপের দরুণ বায়ুতে রূপান্তরিত হইয়া শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় নির্গত হয়। এই অভিজ্ঞতার উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় জানা যায় যে, পুরুষ প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ১১ ড্রাম কারবন জ্বালাইয়া ফেলে; পক্ষান্তরে নারী প্রতি ঘণ্টায় কিঞ্চিতাধিক ছয় ড্রাম মাত্র জ্বালাইয়া থাকে। ইহাতে প্রমাণ হয়, পুরুষের তুলনায় নারী-দেহের মূল আভ্যন্তরিণ তাপও (Animal heat) খুবই কম—অর্থাৎ অর্দ্ধেকের সামান্য বেশী মাত্র।

মগজ বা মস্তিষ্ক—Brain ঃ মানবের মধ্যে বোধশক্তির মূল কেন্দ্র হইল মগজ। উহারই স্বল্পতা ও প্রাচুর্য্য এবং শক্তি ও দুর্ব্বলতার উপর বোধশক্তির প্রখরতা ও ক্ষীণতা নির্ভরশীল। দেহতত্ত্ব শাস্ত্রের (Physiology) সর্ব্ববাদী সম্মত একটি মৌলিক কথা এই যে, মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির প্রখরতা ও দুর্ব্বলতার মূল উৎস হইল তাহার মগজ। আহ্‌মক ও বোকাদের মগজ খ্যাতনামা বুদ্ধিমান-জ্ঞানীদের মগজ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের হইয়া থাকে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার অভিজ্ঞতায় প্রতিপন্ন হইয়াছে— যে সকল লোক তাহাদের জীবনে বোকা ও নির্বোধ বলিয়া খ্যাত ছিল তাহাদের মগজ ওজনে কোন ক্রমেই ২৩ আউন্সের (প্রতি আউন্স) ২॥ তোলা হিসাবে ৫৭½ তোলার) অধিক হয় নাই। পক্ষান্তরে যাঁহারা সাধারণভাবে গভীর জ্ঞান ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন এবং উন্নত চিন্তাশীল বলিয়া স্বীকৃত হইতেন তাঁহাদের মগজ ওজন করা হইলে উহা ৬০ আউন্সেরও (তথা ১৫০ তোলারও) বেশী দেখা গিয়াছে। মনস্তত্ত্ব-বিজ্ঞানের (Psychology) পরীক্ষা-নিরীক্ষা সমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করতঃ চিন্তা করিলে মগজ বা মস্তিষ্কের ব্যাপারেও নারী একান্ত দুর্ব্বল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। মনোবিজ্ঞান প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, নারীর মগজ এবং পুরুষের মগজের মধ্যে ধাতুগত ও আকৃতিগত বিরাট ব্যবধান রহিয়াছে। বোকা-নির্বোধ বলিয়া খ্যাত নয় এমন ২৭৮ জন পুরুষের মগজ ওজন করার সুযোগে দেখা গিয়াছে, সর্ব্ববৃহত মগজটির ওজন ৬৫ আউন্স এবং ক্ষুদ্রতম মগজটির ওজন ৩৮ আউন্স। পক্ষান্তরে (ঐ শ্রেণীর) ২৯১ জন নারীর মগজ ওজনের সুযোগে দেখা গিয়াছে— সর্ব্বাধিক বড় মগজটি ৫৪ আউন্স এবং সবচেয়ে ছোট মগজটি ৩১ আউন্স। এই অভিজ্ঞতা সূত্রে প্রতিপন্ন হয় যে, গড়পড়তা পুরুষের মগজ অপেক্ষা নারীর মগজের ওজন ৯ আউন্স কম।

এতদ্ব্যতীত নারীর মাথার মগজে ঢেউ ও উহার রেখাগুলির প্যাঁচের সংখ্যা পুরুষের মগজ অপেক্ষা অনেক কম এবং নারীর মগজের আবরণগুলির ব্যবস্থাপনাও পুরুষের মগজ অপেক্ষা অসম্পূর্ণ। মনস্তত্ত্ব-বিজ্ঞানীগণ এই পার্থক্যটি নারী-পুরুষের গুণাবলীর ব্যবধান ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ গণ্য করিয়াছেন। তদ্রূপ নারী ও

ও পুরুষের মগজের স্নায়ুমণিতেও বিরাট ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। স্নায়ুমণিই হইল বোধশক্তির মূল উৎস ; সুতরাং এই ব্যবধানটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নহে।

পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ে ব্যবধান ঃ মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি ও মস্তিষ্ক-শক্তির (Intellectual side বা merit) ক্রমবর্দ্ধমান উন্নতির সূত্র হইল পঞ্চ-ইন্দ্রিয়। এই জন্যই জ্ঞানকে ইন্দ্রিয়লব্ধ বস্তু গণ্য করা হয়। সেই পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রেও নারী-পুরুষের বিরাট ব্যবধান রহিয়াছে। ডক্টর নেকোলাস্ ও ডক্টর বেলী প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, নারীর পঞ্চ-ইন্দ্রিয় পুরুষের পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের তুলনায় অত্যন্ত দূর্ব্বল ; উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই—

নাসিকা বা ঘ্রাণশক্তি ঃ পুরুষের ঘ্রাণশক্তি সহজেই যে পরিমাণ ঘ্রাণ অনুভব করিতে পরে উহার প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ ঘ্রাণ হইলে তবে নারী তাহা অনুভব করিতে পারে। পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে—হাল্‌কা ব্রসিক এসিডের গন্ধ নারী $\frac{১}{২০০০০}$ অনুপাতে এবং পুরুষ $\frac{১}{১০০০০}$ অনুপাতে অনুভব করিতে পারে। নারীর ঘ্রাণশক্তি দুর্ব্বল হওয়ার পক্ষে ইহা একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

কর্ণ ও জিহ্বা বা শ্রবণেন্দ্রিয় ও আস্বাদন-ক্ষমতা ঃ বিশ্বকোষ গ্রন্থে বিস্তারিত বিশ্লেষণ দ্বারা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, এই শক্তিদ্বয়ের ব্যাপারেও নারী-পুরুষের মধ্যে বিরাট ব্যবধান রহিয়াছে।

ত্বক বা স্পর্শেন্দ্রিয় ঃ এ সম্পর্কেও ডক্টর লম্বোরোযার এবং সেজি প্রমুখ পণ্ডিত প্রফেসারগণের সর্ব্ব সম্মত অভিমত এই যে, পুরুষের তুলনায় নারীর স্পর্শেন্দ্রিয় খুবই দূর্ব্বল।*

পাঠাকবৃন্দ। লক্ষ্য করুন—পবিত্র কোরআন সৃষ্টিকর্ত্তার এই ঘোষণা করিয়া ছিল—

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ

অর্থাৎ ঃ—সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালা নারী-পুরুষের এক শ্রেণীকে অপর শ্রেণীর উপর বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব, মর্য্যাদা ও অগ্রাধিকার দান করিয়াছেন ; তদ্দরুণ পুরুষ নারীর উপর কর্ত্তৃত্তের অধিকারী। চিরসত্য কোরআনের বিজ্ঞপ্তি "নারীর উপর পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব" ইহার বিশ্লেষণ ও বাস্তবতা প্রকাশের জন্য পবিত্র কোরআনের শত্রুকেই কি ভাবে খাটানো হইয়াছে! এবং যুগে যুগে যে, চিরসত্য কোরআনের

---

* মিশরে জন্ম, ইউরোপের বহু ভাষা-বিশেষজ্ঞ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ফরিদ ওয়াজদির নারী-গবেষণার বিশেষ গ্রন্থ "আল-মার্‌আতুল-মোছলেমাহ"—যাহার উর্দ্দূ অনুবাদ করিয়াছেন সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক মাওলানা আবুল কালাম আজাদ—সেই গ্রন্থ হইতে উল্লেখিত সমুদয় তথ্য উদ্ধৃত।

বাস্তবতার বিজয় ধ্বনিই রণিত হইয়া থাকে উহার এই নমুনাটি কত উজ্জ্বল নমুনা! বর্ত্তমান যুগের পরম পুজনীয় বস্তু হইল বিজ্ঞান। সেই বিজ্ঞানের পণ্ডিতগণই সারা জীবনের হাতড়ানি ও গবেষণার দ্বারা যাহা আবিষ্কার করিয়াছেন পবিত্র কোরআন পূর্ব্বেই তাহা প্রচার করিয়া রাখিয়াছে।

সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালা নারীর উপর পুরুষের সৃষ্টিগত শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। প্রশাসনিক ব্যাপারে এই ব্যবধানের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াও পবিত্র কোরআনে ব্যক্ত করিয়াছেন। যেমন—সাক্ষ্য সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে এই বিধান ঘোষণা করিয়াছেন—

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ - فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا

رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَأَتَانِ

"তোমাদিগকে পুরুষদের মধ্য হইতে দুইজন সাক্ষী সংগ্রহ করিতে হইবে। যদি দুইজন পুরুষ না জোটে তবে একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা হইতে হইবে।" শরীয়তের বিধানে সাধারণতঃ শুধু মহিলার সাক্ষ্য বা একজন পুরুষের সহিত একজন মহিলার সাক্ষ্য পর্য্যাপ্ত গণ্য হয় না।

নারীর এই সৃষ্টিগত দুর্ব্বলতা ও নারীর উপর পুরুষের সৃষ্টিগত শ্রেষ্ঠত্বের কারণেই রাষ্ট্রপ্রধান নির্ব্বাচনে আইনগত কাঠামোরূপে আলোচ্য হাদীছের এবং ইসলামের এই সুপারিশ যে, রাষ্ট্রপ্রধান পুরুষ হইতে হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—আলোচ্য হাদীছটি সম্পর্কে মোজাদ্দেদ মাওলানা আশরফ আলী থানভী (রঃ) এক প্রশ্নের উত্তরে বিশেষ গবেষণা মুলক সুদীর্ঘ বিবৃতি দান করিয়াছেন। উহার সারমর্ম্ম এই যে, এই হাদীছের সুপারিশ ও বিষয়-বস্তু একজন স্বাধীন সার্ব্বভৌম একনায়কতন্ত্রীয় প্রেসিডেন্সিয়াল কিম্বা ঐ শ্রেণীর রাজতন্ত্রীয় রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ। সংখ্যাধিক পুরুষদের সমবায়ে গঠিত পার্লামেন্টের অধীন পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থার রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান বা অধীনস্ত দেশীয় রাজ্যের রাষ্ট্রপ্রধান সম্পর্কে এই হাদীছের বিষয়-বস্তু প্রযোয্য নহে। মোজাদ্দেদ থানভী (রঃ) তাঁহার এই ব্যাখ্যার সপক্ষে বিভিন্ন দলীল প্রমাণের সহিত এই সরল যুক্তিও পেশ করিয়াছেন যে, আলোচ্য হাদীছের উদ্দেশ্য হইল এককভাবে নারীর হস্তে শাসনভার ন্যস্ত হওয়া। পক্ষান্তরে পার্লামেন্টারী পদ্ধতির শাসনব্যবস্থায় শাসনের মূল ক্ষমতা ও ভার ন্যস্ত থাকে পার্লামেন্টের উপর; রাষ্ট্রপ্রধান এককভাবে শাসনের অধিকারী হয় না। তদ্রূপ অধীনস্ত রাজ্যের রাষ্ট্রপ্রধানও মূল শাসন ক্ষমতার অধিকারী হয় না। (এমদাদুল-ফতাওয়া ২—৯৯ দ্রষ্টব্য)

শাসনকর্ত্তার আনুগত্য অতিশয় জরুরী যাবৎ শরীয়ত বিরোধী কাজ না হয়

২৬৬৩। হাদীছ ঃ— عن انس رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِىٌّ كَاَنَّ رَأْسَهٗ زَبِيْبَةٌ

অর্থ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা শাসনকর্ত্তার আদেশ-নিষেধ মানিয়া চলিও এবং তাঁহার অনুগত থাকিও—অত্যন্ত ছোট মাথা-বিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ হাবশী লোককেও যদি তোমাদের উপর শাসনকর্ত্তা নিয়ুক্ত করা হয়।

ব্যাখ্যা ঃ—খলীফা তথা রাষ্ট্রপ্রধানের অনুগত থাকা অতিশয় জরুরী। এমনকি রাষ্ট্রপ্রধানের অধীনে যদি কোন নিকৃষ্ট লোকও কার্য্যরত থাকে তাহারও সহযোগিতা করিয়া রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্য চালাইয়া যাও, যাবৎ না কোন স্তরে শরীয়ত বিরোধিতার প্রশ্নের সম্মুখীন হও।

২৬৬৪। হাদীছ ঃ—ওবাদাহ্ ইবনে ছামেত (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আহ্বানে উপস্থিত হইলাম। হযরত (দঃ) আমাদের নিকট হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করিলেন। হযরতের হাতে হাত দিয়া আমরা যে অঙ্গীকার করিয়াছিলাম উহার মধ্যে ছিল—আমরা আনুগত্যের উপর থাকিব শান্তির পরিবেশেও অশান্তির পরিবেশেও, সুদিনেও, দুর্দিনেও এবং পশ্চাতে রাখিলেও। সেই অঙ্গীকারে ইহাও ছিল যে, কোন পদে যোগ্য ও উপযুক্ত ব্যক্তি থাকিলে তাহার বিরুদ্ধে ক্ষমতা ছিনাইবার দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইব না। অবশ্য যদি সুস্পষ্ট রূপে খোদাদ্রোহিতা পাও—যাহা সম্পর্কে আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়তের দলীল তোমার নিকট বিদ্যমান থাকে (সেস্থলে আনুগত্য প্রত্যাহার করা চলিবে)। (১০৪৫ পৃষ্ঠা)

২৬৬৫। হাদীছ ঃ—ওছায়েদ ইবনে হোজায়ের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা মদীনাবাসী এক ছাহাবী নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিল, ইয়া রসুলাল্লাহ! অমুক ব্যক্তিকে আপনি চাকরি দিয়াছেন, আমাকে চাকরি দিলেন না! তাহাকে যেরূপ চাকরি দিয়াছেন আমাকেও চাকরি দিন।

হযরত (দঃ) ঐ ছাহাবীকে বলিলেন, আমার পরে (প্রকৃত প্রস্তাবেই) তোমাদের উপর অন্যদের অগ্রগামীতা দেখিতে পাইবে। ছবর করিয়া থাকিও যেন হাওজে-কাওছরে আমার সঙ্গে মিলিত হইতে পার। (৫৩৫ পৃষ্ঠা)

২৬৬৬। হাদীছ :— عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَأٰى مِنْ اَمِيْرِهٖ شَيْئًا يَكْرَهُهٗ فَلْيَصْبِرْ

فَاِنَّهٗ لَيْسَ اَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوْتُ اِلَّا مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً

অর্থ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তি তাহার শাসককে কোন কিছু অন্যায় করিতে দেখিলে, সে স্থলে তাহাকে ধৈর্য্যের পরিচয় দিতে হইবে। (এরূপ ক্ষেত্রে শুধু এককভাবে শাসনকর্ত্তার আনুগত্য প্রত্যাহার করিয়া দেওয়া ঠিক হইবে না,) কারণ (এককভাবে) যে কোন ব্যক্তি সংহতি ছিন্ন করিয়া এক বিঘতও সরিয়া যায় এবং ঐ অবস্থায় তাহার মৃত্যু হয়—সেই মৃত্যু অন্ধকার যুগের মৃত্যু পরিগণিত হইবে।

ব্যাখ্যা :—অন্যায়ের সমর্থন না করা বা দেশের ও সমাজের সংহতি বিনষ্ট না করিয়া অন্যায়কে অন্যায় বলিয়া প্রকাশ করা, অন্যায়ের পরিবর্ত্তে ন্যায় প্রতিষ্ঠার দাবী করা, অন্যায় ব্যবস্থা প্রত্যাহারের দাবী করা ইত্যাদি—এই সব আলোচ্য হাদীছের উদ্দেশ্য নহে।

আলোচ্য হাদীছের উদ্দেশ্য হইল—নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্ত্তার কোন একটি অন্যায়-ত্রুটি দেখিয়াই এককভাবে তাহার আনুগত্য প্রত্যাহার করিয়া তাহার উচ্ছেদের চেষ্টায় লিপ্ত হওয়া। ইহাতে সাধারণ জীবন যাত্রা ব্যহত হয়, দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা ও সংহতি বিনষ্ট হয়, তাই ইহার বিরুদ্ধে হুসিয়ারি উচ্চারণ করা হইয়াছে। অবশ্য শাসনকর্ত্তা যদি প্রকাশ্য খোদাদ্রোহিতায় লিপ্ত হয় সে স্থলে প্রতিটি ব্যক্তির কর্ত্তব্য হয় তাহাকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করা।

২৬৬৭। হাদীছ :— عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ

الْمُسْلِمِ فِيْمَا اَحَبَّ وَكَرِهَ مَالَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَاِذَا اُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ

فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযতর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মোসলমানের কর্ত্তব্য হইল, শাসনকর্ত্তার অনুসরণ ও আনুগত্য—পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় সর্ব্ব বিষয়েই ; যাবৎ না তাহাকে শরীয়ত

বিরোধী কাজের আদেশ করা হয়। অবশ্য যদি শরীয়ত বিরোধী কাজের আদেশ করা হয় সে ক্ষেত্রে মোটেই অনুসরণ ও আনুগত্য নাই।

২৬৬৮। হাদীছ ঃ— আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একদা একটি সৈন্যবাহিনী রওয়ানা করিলেন। একজন মদীনাবাসী ছাহাবীকে তাহাদের আমীর বা প্রধান নিযুক্ত করিয়া দিলেন এবং উক্ত বাহিনীর লোকদিগকে তাঁহার আনুগত্যের কথা বলিয়া দিলেন।

পথি মধ্যে সেই আমীর দলের লোকদের প্রতি কোন বিষয়ে ক্রুদ্ধ হইলেন। তখন তিনি বলিলেন, নবী (দঃ) কি তোমাদিগকে আমার আনুগত্যের আদেশ করেন নাই? সকলেই উত্তর করিল, হাঁ। তিনি বলিলেন, তোমাদের প্রতি আমার অলঙ্ঘনীয় আদেশ—তোমরা খড়ি জমা করিয়া আগুন জ্বালাইবে এবং সকলে সেই আগুনে প্রবেশ করিবে। দলের লোকগণ আগুন জ্বালাইল এবং আগুনে ঝাপ দিবার প্রস্তুতি লইয়া একে অন্যের প্রতি তাকাইতে লাগিল। তখন কেহ কেহ বলিল, আমরা (দোযখের) আগুন হইতে বাঁচিবার উদ্দেশ্যেই নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের তাবেদারী অবলম্বন করিয়াছি, অতএব আগুনে আমরা প্রবেশ করিতে পারি কি? এই ইস্তুতের মধ্যেই আগুন নিভিয়া গেল এবং আমীরের ক্রোধও প্রশমিত হইয়া গেল।

এই ঘটনা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আলোচনা করা হইলে হযরত (দঃ) বলিলেন, দলের লোকগণ আগুনে প্রবেশ করিলে আগুন হইতে আর পরিত্রাণ পাইত না। (অর্থাৎ এই আগুনে প্রবেশ করিয়া আত্মহত্যার গোনাহের শাস্তিতে দোযখের আগুন ভোগ করিতে হইত।)

হযরত (দঃ) ইহাও বলিলেন, উপরিস্থের আনুগত্য একমাত্র শরীয়ত সম্মত কাজেই সীমাবদ্ধ।

ক্ষমতা লাভের প্রার্থী হইবে না

২৬৬৯। হাদীছ ঃ— عن عبد الرحمن بن سمرة رضى الله تعالى

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلِ

الْاِمَارَةَ فَاِنَّكَ اِنْ اُوْتِيْتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ اِلَيْهَا وَاِنْ اُوْتِيْتَهَا

عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ اُعِنْتَ عَلَيْهَا

অর্থ— আবদুর রহমান (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহাকে বলিয়াছেন, হে আবদুর রহমান! ক্ষমতা লাভের প্রার্থী হইও না। প্রার্থী হইয়া ক্ষমতা লাভ করিলে (আল্লার সাহায্য হইতে তোমাকে বঞ্চিত করিয়া) তোমাকে উহার দায়িত্ব পালনে একা ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। পক্ষান্তরে প্রার্থী না হইয়া উহা প্রাপ্ত হইলে (আল্লার তরফ হইতে) উহার দায়িত্ব পালনে তোমার সাহায্য করা হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ— আলোচ্য হাদীছটি দ্বারা ইমাম বোখারী (রঃ) উল্লেখিত পরিচ্ছেদ ভিন্ন অপর একটি পরিচ্ছেদে স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন, ক্ষমতা লাভের জন্য আল্লাহ্ তায়ালার নিকট দোয়াও করা চাই না।

ক্ষমতা লাভের লোভ করা

২৬৭০। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّكُمْ سَتَحْرِصُوْنَ عَلَى الْاِمَارَةِ

وَسَتَكُوْنُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা অচিরেই ক্ষমতা লাভে লালায়িত হইবে এবং অচিরেই কেয়ামতের দিন ক্ষমতাধিকারী হওয়া তোমাদের জন্য লাঞ্ছনা ভোগের ও অপদস্ত হওয়ার কারণ হইবে। ক্ষমতার দুগ্ধ পানের দিনগুলা কতই না মনোরম এবং সেই দুগ্ধ ছুটিবার সময়টা কতই না দুঃখজনক!

২৬৭১। হাদীছ ঃ—আবু মূছা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট হাজির হইলাম, আমার সঙ্গে আমার গোত্রীয় দুই জন লোকও ছিল। তাহাদের একজন বলিল, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমাদিগকে শাসন-ক্ষমতা পদে কোথাও মনোনীত করুন। অপর জনও ঐরূপই বলিল। হযরত (দঃ) বলিলেন—

اِنَّا لَا نُوَلِّىْ هٰذَا الْاَمْرَ مَنْ سَأَلَهٗ اَوْ حَرَصَ عَلَيْهِ

"আমরা ঐরূপ ব্যক্তিকে এই শ্রেণীর কোন পদে মনোনীত করি না যে উহার প্রার্থী হয় বা তৎপ্রতি লালায়িত হয়।"

শাসনকর্ত্তা জনগণের হিতাকাঙ্খী না হইলে

২৬৭২। হাদীছ ঃ— قال معقل رضى الله تعالى عنه

سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيْهِ

اللّٰهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحُطْهَا بِالنَّصِيْحَةِ لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ

অর্থ—বছরার গভর্ণর ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ মা'ক্বেল (রাঃ) ছাহাবীকে তাঁহার মৃত্যু শয্যায় দেখিতে আসিলেন। তখন মা'ক্বেল (রাঃ) গভর্ণরকে বলিলেন, আপনাকে একটি হাদীছ শুনাইব যাহা আমি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে শুনিয়াছি।

হযরত নবী (দঃ) বলিয়াছেন, কোন বন্দাকে আল্লাহ তায়ালা কিছু সংখ্যক লোকের উপর শাসন-ক্ষমতা দান করিলে যদি সে সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল ও কল্যাণের সহিত লোকদের রক্ষণাবেক্ষণের সুব্যবস্থা না করে, তবে তাহার ভাগ্যে বেহেশতের খুশবুও জোটিবে না।

২৬৭৩। হাদীছ ঃ—হাসান বছরী (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা ছাহাবী মা'ক্বেল (রাঃ)কে তাঁহার রোগ-শয্যায় দেখিতে আসিলাম। বছরার শসনকর্ত্তা ওবায়দুল্লাহও তখন তথায় পৌঁছিলেন। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া মা'ক্বেল (রাঃ) বলিলেন, আপনাকে আমি (আজও) একটি হাদীছ শুনাইব যাহা আমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে শুনিয়াছি—

مَا مِنْ وَالٍ يَلِىْ رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَيَمُوْتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهُمْ

اِلَّا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

"যে কোন শাসনকর্ত্তা মোসলমানদের কিছু সংখ্যক লোকের উপর শাসন-ক্ষমতা লাভ করে, অতঃপর তাহার মৃত্যু এমতাবস্থায় হয় যে, সে ঐ লোকদের প্রতি (স্বীয় দায়িত্ব পালনে) শঠতা ও প্রতারণাকারী ছিল—এইরূপ প্রত্যেক শাসনকর্ত্তার জন্যই আল্লাহ তায়ালা বেহেশতকে হারাম করিয়া দিবেন।

জনগণকে সঙ্কীর্ণ জীবনে পতিত করার কুফল

২৬৭৪। হাদীছ :— قال جندب رضى الله تعالى عنه

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ......وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ........

অর্থ— জুন্দুব (রাঃ) লোকদিগকে নছিহত করতঃ বলিয়াছেন, আমি হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, ...যে ব্যক্তি লোকদেরকে সঙ্কীর্ণ জীবন—দুঃখ-কষ্টে ও দুর্ভোগে পতিত করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে কেয়ামতের দিন দুর্ভোগে নিপতিত করিবেন।

লোকেরা বলিল, আমাদিগকে আরও উপদেশ দান করুন। জুন্দুব (রাঃ) বলিলেন, (মৃত্যুর পর) মানুষের পেটই সর্ব্বাগ্রে বিকৃত ও দুর্গন্ধময় হয়, অতএব, যথাসাধ্য হালাল খাইতে যত্নবান হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। মানুষের জন্য বেহেশত লাভের অতি বড় প্রতিবন্ধক হইল অন্যায়রূপে রক্তপাত করা, সুতরাং অন্যায়ভাবে সামান্যতম রক্তপাত করা হইতেও যথাসাধ্য বিরত থাকায় যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য।

ক্রোধাবস্থায় বিচারের রায় প্রদান করিবেন না

২৬৭৫। হাদীছ :—ছাহাবী আবু বকরাহ্ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পুত্র সিজিস্তানের কাজি তথা বিচারক ছিলেন। তিনি তাঁহাকে লিখিয়া পাঠাইলেন, ক্রোধাবস্থায় কখনও বাদী-বিবাদীর মধ্যে রায় দান করিও না। আমি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি—

لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ

"বিচারকের জন্য ক্রোধাবস্থায় বাদী-বিবাদীর মধ্যে রায় প্রদান করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।"

শাসনকর্ত্তা ও বিচারকের জন্য শরীয়তের দৃষ্টিতে কতিপয় প্রয়োজনীয় শর্ত্ত

সুপ্রসিদ্ধ তাবেয়ী হাসান বছরী (রঃ) পবিত্র কোরআন দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা শাসনকর্ত্তা ও বিচারকের উপর তিনটি কর্ত্তব্য বলবৎ করিয়াছেন।

১। প্রবৃত্তির অনুসারী না হওয়ার স্বভাবে পরিপক্ক হইতে হইবে।

২। হক্ ব্যবস্থা গ্রহণে মানুষের ভয় না করায় সুদৃঢ় হইতে হইবে।

৩। কোন প্রকার স্বার্থের সম্মুখে আল্লার বিধান বিসর্জন না দেওয়ার স্বভাবে অটল হইতে হইবে।

হাসান বছরী (রঃ) উক্ত তিনটি শর্ত্তের প্রমাণে পবিত্র কোরআনের দুইটি আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়াছেন।

(১) يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ

بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى ...... بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

"হে দাউদ! আমি তোমাকে ভূপৃষ্ঠে শাসনকর্ত্তা নিয়োগ করিয়াছি; তোমাকে লোকদের মধ্যে সত্য ও খাঁটী বিচার মীমাংসা করিতে হইবে। আর তুমি প্রবৃত্তির বশে কোন কাজ করিও না, অন্যথায় প্রবৃত্তি তোমাকে আল্লার পথ হইতে বিচ্যুৎ করিয়া দিবে। নিশ্চয় যাহারা আল্লার পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া যায় তাহাদের জন্য কঠোর আজাব প্রস্তুত রহিয়াছে, যেহেতু সে হিসাব-নিকাশের দিনকে ভুলিয়া গিয়াছে।"

(২) إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ...... وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا

أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"আমি তাওরাত কেতাব অবতীর্ণ করিয়াছিলাম। উহাতে ছিল সত্যের আলো ও সত্য পথের সন্ধান। উহা দ্বারা বিচার-মীমাংসা করিতেন খোদাভক্ত নবীগণ, আল্লাহওয়ালাগণ এবং আলেমগণ ইহুদী সম্প্রদায়ের জন্য। এই কারণে যে, তাঁহাদের উপর আল্লার কেতাব তাওরাতের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পিত ছিল এবং তাঁহারা উহার উপর অঙ্গিকারাবদ্ধ ছিলেন।

("হে উম্মতে মোহাম্মদীগণ! তোমাদের উপরও আল্লার কেতাব পবিত্র কোরআনের বেলায় সেই দায়িত্ব রহিয়াছে।) সুতরাং তোমরা মানুষকে ভয় করিও না—আমাকে ভয় কর এবং কোন স্বার্থের খাতিরে আমার বিধানকে বিসর্জন দিও না। যাহারা আল্লাহ প্রদত্ত বিধানমতে বিচার-মীমাংসা না করিবে তাহারা নিশ্চয় কাফেরে পরিগণিত হইবে।"

দ্বিতীয় আয়াতের শেষ বাক্যটি ঐ শ্রেণীর লোকদের জন্য অত্যন্ত কঠোর যাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে অন্তরে খোদার ভয় পোষণ করেন। কারণ, মানুষের ভুল-ভ্রান্তিও

হইতে পারে, অথচ উক্ত বাক্যে গয়রহ ভাবেই বলা হইয়াছে—যে কেহ আল্লার বিধানমতে বিচার-মামীংসা না করিবে সে কাফেরে পরিগণিত হইবে।

হাসান বছরী (রঃ) পবিত্র কোরআনের বর্ণিত একটি ঘটনা দ্বারা এই ভয়-ভীতির নিরসন করিয়াছেন যে, "ইজ্‌তেহাদ" তথা কোরআন-হাদীছে স্পষ্ট ফয়ছালাহ পাওয়া যায় না এইরূপ ঘটনায় শরীয়ত সম্পর্কীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্ব্বশেষ বিন্দু ব্যয়ে সার্ব্বিক চেষ্টা দ্বারা কোন মীমাংসা সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে যদি অজ্ঞাতসারে ভুল-ত্রুটি হয় তবে তাহা ক্ষমার্হ গণ্য হইবে। পবিত্র কোরআনের উক্ত ঘটনাটি হইল এই—হযরত সোলায়মান আলাইহেচ্ছালামের পিতা হযরত দাউদ আলাইহে-চ্ছালামের আমলে এক ব্যক্তির শস্যশ্যামল ক্ষেতে রাত্রি বেলায় অন্যের বকরিপাল প্রবেশ করিয়া শস্য নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল। ক্ষেতের মালিক হযরত দাউদ আলাইহেচ্ছালামের নিকট বকরিওয়ালার বিরুদ্ধে মকদ্দমা দায়ের করিল। এইরূপ ঘটনার বিচার আসমানী কেতাবে স্পষ্টরূপে না পাইয়া হযরত দাউদ (আঃ) ইজ্‌তেহাদ করিলেন। তিনি দেখিলেন, বাদীর ক্ষতির পরিমাণ এবং বকরির মূল্য সমান সমান, তাই বাদীকে ক্ষতিপূরণ দানার্থে তিনি এই রায় দিলেন যে, বিবাদী তাহার বকরিপাল বাদীকে দিয়া দিবে।

দাউদ-পুত্র সোলায়মান (আঃ) এই বিচার অবগত হইয়া বলিলেন, আমার নিকট এই ঘটনার ভিন্ন একটি উত্তম মীমাংসা আছে। তিনি ইজ্‌তেহাদ করিলেন এইরূপে যে, বিবাদীকে তাহার বকরির মালিকানা হইতে বঞ্চিত না করিয়াও বাদীর ক্ষতিপূরণ করা যায়। পিতা দাউদ (আঃ) তাঁহাকে তাঁহার মীমাংসা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, উভয় পক্ষকে স্বেচ্ছায় এই ব্যবস্থা গ্রহণে সম্মত করা হউক যে—বিবাদী তাহার নিজ ব্যয়ে ও পরিশ্রমে বাদীর বিনষ্ট ক্ষেতের সেবা করিয়া যাইবে এবং যাবৎ না ঐ ক্ষেত পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া আসে বাদী বিবাদীর বকরি-পাল নিজ দখলে রাখিয়া দুগ্ধ ভোগ করিয়া যাইবে। বিনষ্ট ক্ষেত পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া আসিলে বাদী তাহার ক্ষেত বুঝিয়া নিবে এবং বিবাদী তাহার বকরি ফেরত পাইবে।

দাউদ (আঃ) এই ইজ্‌তেহাদের সমর্থনে নিজের ইজ্‌তেহাদ ত্যাগ করিয়া এই রায় বহাল করিয়া দিলেন। পবিত্র কোরআনে উক্ত ঘটনার আলোচনায় নিম্নে বর্ণিত আয়াত উল্লেখ হইয়াছে—

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمٰنَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِى الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ

وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شٰهِدِيْنَ - فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ وَكُلًّا اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا

"দাউদ ও সোলায়মানের একটি ঘটনা—তাঁহারা উভয়ে একটি ক্ষেত সম্পর্কে বিচার করিতেছিলেন। উক্ত ক্ষেতে অপর লোকদের বকরিপাল প্রবেশ (করিয়া উহার ক্ষতি সাধন) করিয়াছিল। আমি তাহাদের ঘটনায় বিচার নিরীক্ষণকারী ছিলাম। অনতিবিলম্বে আমি ঐ ঘটনার সুষ্ঠু মীমাংসা সোলায়মানকে বুঝাইয়া দিলাম। প্রকৃত প্রস্তাবে আমি (দাউদ ও সোলায়মান) উভয়কেই বিচারশক্তি ও জ্ঞান দান করিয়াছি।" (১৭ পারা ৬ রুকু)

উক্ত আয়াতের বাক্য "আমি ঐ ঘটনার সুষ্ঠু মীমাংসা সোলায়মানকে বুঝাইয়া দিলাম" এখানে আল্লাহ তায়ালা হযরত সোলায়মানের প্রশংসা করিয়াছেন এবং তাঁহার মীমাংসাকে আল্লাহ স্বীয় প্রদত্ত বলিয়াছেন। সুতরাং বলিতে হইবে, তাঁহার মীমাংসাই আল্লাহ তায়ালার নিকট পছন্দণীয় ছিল। হযরত দাউদের রায় দানে উহার ব্যতিক্রম হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেই জন্য আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে অপরাধী বলিয়া উল্লেখ করেন নাই, বরং তাঁহার প্রতিও প্রশংসামূলক ও সম্মানসূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়া বলিয়াছেন—আমি উভয়কেই বিচারশক্তি ও জ্ঞান দান করিয়াছি।

কোরআন-হাদীছে স্পষ্ট মীমাংসা ও ফয়ছালাহ পাওয়া যায় না এইরূপ ঘটনায় শরীয়তের সাম্ভাব্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্ব্বশেষ বিন্দু ব্যয়ে সার্ব্বিক চেষ্টায় কোন মীমাংসার উদ্ভাবনে যদি অজ্ঞাত সারে কোন ভুল-ত্রুটি হয় এবং সেই ভুল ধরা না পড়ায় উহার সংশোধনও না হয় তবুও সেই ভুল-ত্রুটি ক্ষমার্হ গণ্য হয়। বরং সে ক্ষেত্রেও ইজতেহাদের অর্থাৎ শরীয়তের সাম্ভাব্য জ্ঞান-বিজ্ঞান তথা স্বীয় এল্‌ম খাটাইয়া চেষ্টা ও পরিশ্রম করার ছওয়াবও হইবে।

এই মর্ম্মে ইমাম বোখারী (রঃ) ১০৯২ পৃষ্ঠায় একটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করিয়াছেন— "বিচারক বা প্রশাসক সঠিক পন্থায় ইজতেহাদ করিলে মীমাংসা ও ফয়ছালাহ নির্দ্ধারণে ভুল হইলেও ছওয়াবের অধিকারী হইবে।" এ সম্পর্কে নিম্নে বর্ণিত হাদীছখানাও বর্ণনা করিয়াছে—

২৬৭৬। হাদীছঃ— عن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنه

إِنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَاَصَابَ فَلَهُ اَجْرَانِ وَاِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ اَخْطَأَ فَلَهُ اَجْرٌ -

অর্থ—আম্‌র ইবনুল আছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—তিনি শুনিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—বিচারক বিচার-কার্য্যে (প্রয়োজন ক্ষেত্রে) ইজতেহাদ করিয়া নির্ভুল মীমাংসার উদ্ভাবন করিতে পারিলে

সেস্থলে (ইজতেহাদের পরিশ্রম এবং নির্ভুল মীমাংসা প্রদান উভয়টির জন্য) দুইটি ছওয়াব লাভ করিবে। আর যদি মীমাংসা নির্দ্ধারণে ভুল হয় তবুও (ইজতেহাদ করার পরিশ্রমের) একটি ছওয়াবের অধিকারী হইবে।

● বিশিষ্ট তাবেয়ী এবং ইতিহাস প্রসিদ্ধ ন্যায়পরায়ণ খলীফাতুল মোসলেমীন ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (রঃ) বলিয়াছেন—শাসক শ্রেণীর প্রতিটি লোকের মধ্যে এই পাঁচটি গুণের সমাবেশ প্রয়োজন; উহার একটির অভাবও শাসকের জন্য জঘন্যতম কলঙ্ক। (১) তীক্ষ্ণ বুদ্ধি-সম্পন্ন হইতে হইবে। (২) অতিশয় সহিষ্ণু ও সহনশীল হইতে হইবে। (৩) পাক পবিত্র নিষ্কলুষ চরিত্রে চরিত্রবান হইতে হইবে। (৪) সুদৃঢ় ও অটল হইতে হইবে। (৫) বিজ্ঞ আলেম জ্ঞানী ও জ্ঞানান্বেষী হইতে হইবে।

শাসকদের ভাতা

এই পরিচ্ছেদে ইমাম বোখারী (রঃ) দুইটি মছআলাহ বর্ণনা করিয়াছেন—(১) সরকারী ধনভাণ্ডার হইতে শাসকদের ভাতা বা বেতন জায়েয আছে কি না? (২) সেই ভাতা বা বেতনের পরিমাণ কি হইবে।

ভাতা বা বেতন গ্রহণ করা সম্পর্কে অতি সামান্য মতভেদ থাকিলেও ইমাম বোখারী (রঃ) সহ অধিকাংশ ইমামগণের মত্ এই যে, শাসকদের জন্য সরকারী ধনভাণ্ডার হইতে ভাতা বা বেতন গ্রহণ করা জায়েয আছে। এই সম্পর্কে ইমাম বোখারী (রঃ) একটি উদ্ধৃতি ও একটি হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন।

উদ্ধৃতিটি হইল এই যে, খোলাফায়ে-রাশেদীন আমলের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কাজী শোরায়হ্ (রঃ) শাসন ও বিচার বিভাগীয় কার্য্য পরিচালনা করিতেন এবং তজ্জন্য বেতনগ্রহণ করিতেন।

২৬৭৭। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে সা'দী (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি খলীফা ওমরের সাক্ষাতে আসিলে খলীফা ওমর (রাঃ) তাঁহাকে বলিলেন, আমি সংবাদ পাইয়াছি—আপনি জনগণের কার্য্য পরিচালনের সরকারী দায়িত্ব পালন করেন, কিন্তু বেতন দেওয়া হইলে তাহা গ্রহণ করেন না! আমি বলিলাম, হাঁ—আমি বেতন গ্রহণ করি না। খলীফা ওমর (রাঃ) বলিলেন, এরূপ করায় আপনার উদ্দেশ্য কি? আমি বলিলাম, আমি বহু সংখ্যক ঘোড়ার মালিক, ক্রীত দাসের মালিক, আমার আর্থিক অবস্থা ভাল। অতএব, আমার ইচ্ছা এই যে, জনগণের কার্য্যটা আমার তরফ হইতে জনগণের জন্য দান ও সেবা পরিগণিত হউক।

ওমর (রাঃ) বলিলেন, আপনি এরূপ করিবেন না। আমিও ঐরূপ ইচ্ছা করিয়াছিলাম যেরূপ ইচ্ছা আপনি পোষণ করেন। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে

সরকারী ধনভাণ্ডার হইতে আমার প্রাপ্য দিয়া থাকিতেন ; আমি বলিতাম, আমার চাইতে অভাবীকে দিয়া দিন। একদা হযরত নবী (দঃ) আমাকে কিছু অর্থ দান করিলেন ; আমি আরজ করিলাম, আমার চাইতে অভাবীকে দান করুন। হযরত (দঃ) আমাকে বলিলেন, তুমি ইহা গ্রহণ কর এবং ইহাকে নিজ সম্পদে পরিগণিত কর, অতঃপর দান করিয়া দাও। যাজ্ঞা ও লালসার পন্থা ছাড়া অন্য কোন (হালাল) পন্থায় যে সম্পদ আসে তাহা গ্রহণ করিও এবং যাহা না আসে তাহার পেছনে নিজকে উৎকণ্ঠিত করিও না—ব্যাকুল বানাইও না।

● শাসন কর্ত্তৃপক্ষের বেতন-ভাতার পরিমাণ সম্পর্কে ইমাম বোখারী (রঃ) একটি উদ্ধৃতি এবং একটি নজীর উল্লেখ করিয়াছেন। উদ্ধৃতিটি হইল এই—আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, অভিভাবক স্বীয় খাটুনীর পারিশ্রমিক পরিমাণ ভাতা গ্রহণ করিতে পারে। স্বয়ং আয়েশা (রাঃ) স্বীয় উক্তিটির মর্ম্ম পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়াও বলিয়াছেন যে, এতিমের অভিভাবক সম্পর্কে যে আল্লাহ্ তায়ালা বলিয়াছেন, "অভিভাবক দরিদ্র হইলে ন্যায়পরায়ণতার সহিত ভাতা গ্রহণ করিতে পারে।" ইহার ব্যাখ্যা এইযে, অভিভাবক এতিমের রক্ষণাবেক্ষণে ব্যাপৃত থাকিয়া পারিশ্রমিক গ্রহণ না করিলে তাহার জীবিকা-নির্ব্বাহ কঠিন হইয়া পড়িবে, এরূপ দরিদ্র হইলে সেই অভিভাবক এতিমের মাল হইতে স্বীয় ভাতা গ্রহণ করিতে পারিবে, কিন্তু সেই ভাতা তাহার খাটুনির পারিশ্রমিক পরিমাণ হইবে। (ফতহুল বারী ১৩—১২৮)

এই ব্যাপারে অনেক আলেমের মত এই যে, অভাবী অভিভাবকের ভাতা তাহার অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন পরিমাণ হইবে, কিন্তু এই ভাতা সে তখনই গ্রহণ করিতে পারিবে যখন সে এতিমের রক্ষণাবেক্ষণে খাটুনি খাটে এবং এই কাজে নিজকে নিয়োজিত রাখে। অধিকাংশ আলেমের মত এই যে, তাহার খাটুনির পারিশ্রমিক এবং অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন এই দুই-এর মধ্যে যেইটা কম হইবে সেই পরিমাণ ভাতাই গ্রহণ করিতে পারিবে উহার উর্দ্ধে নহে। (তফছীর ইবনে কাছীর)

শাসন-কার্য্য পরিচালকদের বেতন-ভাতার বয়ানে এতিমের অভিভাবকের উল্লেখ এই জন্য হইয়াছে যে, ইসলামের দৃষ্টিতে সরকারী ধনভাণ্ডারের মালিক শাসকগোষ্ঠি নহে যে, তাহারা উক্ত ধনভাণ্ডারকে স্বেচ্ছাচারিতার সহিত ব্যয় করিবে। বরং উক্ত ধনভাণ্ডারের মালিক আল্লাহ তায়ালার বিধানমতে দেশের জনগণ। আর রাষ্ট্রনায়ক ও তাহার সহকর্ম্মিগণ ঐ ধনভাণ্ডারের আমানতদার—রক্ষণাবেক্ষণকারী, যেরূপ হয় এতিমের অভিভাবক। সুতরাং রাষ্টনায়কদের সম্পর্ক রাষ্ট্রীয় ধনভাণ্ডারের সহিত ঐরূপই হইবে যেরূপ সম্পর্ক এতিমের ধন-সম্পত্তির সহিত এতিমের অভিভাবকের হইয়া থাকে—যাহার বিধান স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে এরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

مَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ

"এতিমের অভিভাবক যদি স্বচ্ছল হয় তবে তাহার পক্ষে এতিমের মাল হইতে ভাতা গ্রহণে বিরত থাকাই উত্তম +। আর যদি সে দরিদ্র হয় তবে সে পূর্ণ ন্যায়পরায়ণতার সহিত ভাতা গ্রহণ করিতে পারে।"

হাদীছ শরীফে বর্ণিত ঘটনা দ্বারা উহার ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়। এক ব্যক্তি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আরজ করিল, আমার প্রতিপালনে এতিম রহিয়াছে। আমি তাহার মাল হইতে ভাতা গ্রহণ করিতে পারি কি ? হযরত (দঃ) বলিলেন, ভাতা গ্রহণ করিতে পার ন্যায়পরায়নতার সহিত—অর্থাৎ এতিমের মাল হইতে ভাতা গ্রহণ করিয়া নিজের সম্পদ বাড়াইতে পারিবে না। এবং নিজের ধন বাঁচাইবার জন্যও উহা গ্রহণ করিতে পারিবে না। (তফছীর মাজহারী)

শাসন কর্তৃপক্ষের ভাতার পরিমাণ সম্পর্কে ইমাম বোখারী (রঃ) যে নজীর পেশ করিয়াছেন তাহা হইল ইসলামের প্রথম খলীফা আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ভাতা এবং দ্বিতীয় খলীফা ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ভাতা।

খলীফা আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ভাতার পরিমাণ সম্পর্কে ইতিহাসের বিভিন্ন বর্ণনা দৃষ্টে এই প্রকাশ পায় যে, তাঁহার জন্য বৎসরে ৬০০০ দেরহাম মঞ্জুর করা হইয়া ছিল। বর্ত্তমান প্রচলিত মূদ্রায় উহার মূল্য হয় ১৫০০ টাকা। অর্থাৎ মাসিক ১২৫ টাকা ছিল খলীফা আবু বকরের জন্য নির্দ্ধারিত ভাতার পরিমাণ। কিন্তু তিনি তাহাও পূর্ণ গ্রহণ করিতেন না। তাঁহার পরিবারের ব্যয় বহনে নিজস্ব সম্পত্তির উৎপন্ন ব্যয় করিয়া যে পরিমাণ ঘাটতি পড়িত সেই পরিমাণই তিনি ভাতা গ্রহণ করিতেন। সেমতে তাঁহার গৃহিত ভাতার পরিমাণ ছিল বৎসরে ২৫০০ দেরহাম—বর্ত্তমান মূদ্রায় ৭২৪ টাকা, অর্থাৎ মাসিক ৫২ টাকা।

(এলাউছ্-ছুনান ১৫—৬৪)

ইসলামী শাসন ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রথম খলীফার ভাতার পরিমাণ ছিল এই। তদসঙ্গে উক্ত খলীফা আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মৃত্যুকালের দুইটি অছিয়তও বিশেষ অনুধাবনযোগ্য।

(১) আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, আবু বকর (রাঃ) মৃত্যু শয্যায় বলিলেন, আমার স্থাবর-অস্থাবর সমুদয় সম্পত্তি তদন্ত করিয়া দেখ—আমি খলীফা হওয়ার

+ ধনী অভিভাবকের ভাতা গ্রহণ হইতে বিরত থাকা সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে আদেশ মূলক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তবে মোফাচ্ছেরগণ ইহাকে সৌজন্য মূলক আদেশ সাব্যস্ত করিয়াছেন। (তফছীরে আহমদী দ্রষ্টব্য)

পূর্ব্বেকার বিষয়-সম্পত্তির উপর কোন কিছু বর্দ্ধিত হইয়া থাকিলে তাহা আমার পরবর্ত্তী খলীফার নিকট জমা দিয়া দিও। সেমতে তদন্ত করিয়া দেখা গেল, তাঁহার ব্যবহারে দুইটি জিনিষ তাঁহার পূর্ব্বের ধন-সম্পদের অধিক পাওয়া যায়। একটি হইল ছেলে-মেয়ে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি ক্রীতদাস, আর দ্বিতীয়টি হইল খেজুর বাগানে পানি দেওয়ার জন্য একটি উট। খলীফার অছিয়ত অনুযায়ী উক্ত বস্তুদ্বয় পরবর্ত্তী খলীফা ওমরের নিকট জমা দিয়া দেওয়া হইল। ওমর (রাঃ) উহা গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন, আল্লাহ আবু বকরের প্রতি রহমত বর্ষিত করুন; তিনি তাঁহার পরবর্ত্তী শাসকদেরকে কঠিন সাধনার ছবক দান করিয়া গিয়াছেন।

(ফতহুল বারী ৪—২৪৩)

(২) আয়েশা (রাঃ) হইতে ইহাও বর্ণিত আছে, আবু বকর (রাঃ) তাঁহার মৃত্যু মুহূর্ত্তে অছিয়ত করিলেন, তোমরা হিসাব করিয়া দেখ, আমি খলীফা মনোনীত হওয়ার পর ভাতারূপে কি পরিমাণ অর্থ সরকারী ধনভাণ্ডার বাইতুল-মাল হইতে গ্রহণ করিয়াছি। উহার বিনিময়ে আমার অমুক স্থানের খেজুর বাগানটি প্রদত্ত হইল। (এলাউছ্-ছুনান ১৫—৬২)

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ভাতার পরিমাণ জ্ঞাত হওয়া সম্পর্কে তাঁহার একটি ঘোষনাই যথেষ্ট। তিনি ঘোষণা করিয়া ছিলেন—আল্লার মাল (তথা বাইতুল-মাল) বা সরকারী ধনভাণ্ডার ক্ষেত্রে আমি নিজকে এতিমের অভিভাবক রূপে পরিগণিত করিব। যদি আমি উহাকে এড়াইয়া থাকিতে সমর্থ হই তবে উহাকে স্পর্শও করিব না। আর যদি প্রয়োজনে বাধ্য হই তবে উহা হইতে পূর্ণ ন্যায়পরায়ণতার সহিত ভাতা নিব।

এই উক্তির তাৎপর্য্যের ব্যাখ্যা প্রদানে তিনি আরও বলিয়াছেন, আমি তোমাদিগকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলিব— কি কি জিনিষ আমি সরকায়ী ধনভাণ্ডার হইতে নিজের জন্য হালাল গণ্য করিব। হজ্জ এবং ওমরা করার জন্য একটি যান-বাহন, শীতের জন্য এক জোড়া এবং গরমের জন্য এক জোড়া পরিধেয় বস্ত্র। আর আমার এবং আমার পরিবারবর্গের খোরাকী—কোরায়েশ বংশীয় একজন মধ্যবিত্ত মানুষের খোরপোশের ন্যায়—উচ্চমানেরও নয় অথবা একেবারে নিম্নমানেরও নয়।

(এলাউছ্-ছুনান ১৫—৬২)

এস্থলে খলীফা ওমরের শেষ জীবনের একটি অছিয়তও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ওমর (রাঃ) মৃত্যুর পূর্ব্বে স্বীয় পুত্র বিশিষ্ট ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে বলিলেন, হে আবদুল্লাহ। আমি তোমাকে কসম দিয়া বলিতেছি, আমার মৃত্যুর

পর আমাকে দাফন করিয়া তোমার মাথা ধুইবার পূর্ব্বেই আমার একটি জমি ৮০,০০০ দেরহামে বিক্রি করিবা এবং তাহা বাইতুল-মাল—সরকারী ধনভাণ্ডারে জমা করিয়া দিবা।

বিশিষ্ট ছাহাবী আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) খলীফা ওমরকে উহা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, এই পরিমাণ ধন আমি স্বীয় হজ্জ ও বিভিন্ন প্রয়োজনে বাইতুল-মাল হইতে ব্যায় করিয়াছি।

তিনি আরও বলিলেন, হে আউফ-পুত্র! ওমরের আকাঙ্খা এই যে, যেই অবস্থায় সে জনগণের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া ছিল সেই অবস্থায়ই যেন উহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে। আমার একমাত্র বাসনা, আমি আল্লার দরবারে উপস্থিত হইলে পর জনগণ সামান্য দাবী দ্বারাও যেন আমাকে অভিযুক্ত করিতে না পারে। (এলাউছ্-ছুনান ১৫—৬৫)

এই আলোচনায় খলীফা ওমরের ভাতার পরিমাণ সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইল। তিনি দশ বৎসর খলীফা ছিলেন এবং সর্ব্ব মোট ভাতা ছিল ৮০,০০০ দেরহাম; প্রতি বৎসরে ৮০০০ দেরহাম তথা ২০০০ টাকা। অর্থাৎ প্রতি মাসে ১৬৬ টাকার কিছু বেশী।

শাসনকর্ত্তার সাক্ষাতে তাঁহার প্রশংসা করিয়া অসাক্ষাতে সমালোচনা করা

২৬৭৮। হাদীছ ঃ—কতিপয় ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট প্রকাশ করিল, আমরা আমাদের শাসনকর্ত্তার সাক্ষাতে উহার বিপরীত কথা বলিয়া থাকি যাহা তাহার অসাক্ষাতে বলি। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমরা (—হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবীগণ) এই কার্য্যকে মোনাফেকী গণ্য করিয়া থাকি।

শাসন পরিচালক নিয়োগে অজ্ঞ লোকদের সমালোচনায় কর্ণপাত না করা

২৬৭৯। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক অঞ্চলে একটি সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিয়া ছিলেন এবং উহার অধিনায়ক মনোনীত করিয়া ছিলেন, যায়েদ-পুত্র উসামা (রাঃ)কে। তাঁহার অধিনায়কত্বের সমালোচনা করা হইল। তখন হযরত (দঃ) বলিলেন, উসামার অধিনায়কত্বের সমালোচনা তোমরা করিতেছ। ইতিপূর্ব্বে তাহার পিতা যায়েদের অধিনায়কত্বেও সমালোচনা করিয়া ছিলে। খোদার কসম—যায়েদ অধিনায়ক হওয়ার উপযুক্ত ছিল এবং সে আমার সর্ব্বাধিক প্রিয় ছিল। তাহার পর উসামা আমার নিকট সর্ব্বাধিক প্রিয়।

রাষ্ট্রপ্রধান তাঁহার পরামর্শ-পরিষদ এবং গুপ্ত নৈকট্যধারী লোক রাখিতে পারেন অবশ্য তাহাদের একান্তই সৎ ও নিষ্ঠাবান হইতে হইবে

২৬৮০। **হাদীছ ঃ**—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা যে কোন নবীকে পাঠাইয়াছেন এবং যে কাহাকেও (শাসনকর্ত্তারূপে) খলীফা হওয়ার সুযোগ দান করিয়াছেন—তাহাদের প্রত্যেকেরই গোপন পরামর্শদাতা হইয়াছে। তাহা দুই শ্রেণীর হয়—এক হয় সৎ ও ভাল পরামর্শদাতা ; যে ভালকাজের পরামর্শ দেয়, ভাল কাজের প্রতি আকৃষ্ট করে। আর এক হয় অসৎ ও খারাব পরামর্শদাতা ; যে অসৎ কাজের পরামর্শ দেয় খারাব কাজের প্রতি আকৃষ্ট করে।

ঐরূপ অসৎ পরামর্শের ক্রিয়া ও খারাব আকর্ষণ হইতে যাঁহাকে আল্লাহ তায়ালা রক্ষা করেন তিনি অবশ্যই নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকেন।

ব্যাখ্যা ঃ—গোপন পরামর্শদাতার উভয় শ্রেণীই দুই সম্প্রদায় হইতে হইয়া থাকে। মানুষ সম্প্রদায় হইতে ত হইয়া থাকেই—যাহাদের ভাল শ্রেণী শাসনকর্ত্তা ও নেতৃবর্গকে সদা সৎ পরামর্শ দান ও ভাল কাজের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে যাহারা হয় খারাব শ্রেণীর তাহারা শাসনকর্ত্তা ও নেতৃবর্গকে সদা বিভ্রান্ত করিতে থাকে—অসৎ পরামর্শ দিয়া থাকে, অসৎ কাজের পরিকল্পনা পেশ করিয়া সেই দিকে তাহাদিগকে আকৃষ্ট করিতে থাকে। সুতরাং শাসনকর্ত্তা ও নেতৃবর্গের বড় কর্ত্তব্য ও ফরজ হইবে পরামর্শদাতা মনোনয়ন বা গ্রহণ করিতে বিশেষভাবে সতর্ক হইতে ও থাকিতে হইবে যেন কোন অসৎ স্বার্থপর লোক তাঁহার পরামর্শদাতা হওয়ার সুযোগ না পায়। বক্ষমান পরিচ্ছেদ এবং আলোচ্য হাদীছের উদ্দেশ্য ইহাই।

গোপন পরামর্শদাতার দ্বিতীয় সম্প্রদায় হইল ফেরেশতা ও শয়তান। ফেরেশতা হইলেন সৎ পরার্শদাতা, ভাল কাজের আকর্ষণ সৃষ্টিকারী। আর শয়তান হইল অসৎ পরামর্শদাতা অসৎ কাজের আকর্ষণ সৃষ্টিকারী। এই সম্প্রদায়ের কার্য্যকলাপ মানুষের অভ্যন্তরে হইয়া থাকে।

শাসনকর্ত্তা বা নেতৃবর্গ যদি প্রথম সম্প্রদায়ের পরামর্শদাতা ভাল ও সৎ গ্রহণ করেন তবে দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের সৎ পরামর্শদাতা তথা ফেরেশতার পরামর্শ দানের ও আকর্ষণ সৃষ্টির প্রভাব শক্তিশালী হয়, প্রাবল্য লাভ করে। ফলে সেই শাসনকর্ত্তা ও নেতা সৎ ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিতে প্রয়াস পায়। পক্ষান্তরে শাসনকর্ত্তা বা নেতা যদি প্রথম সম্প্রদায়ের পরামর্শদাতা অসৎ গ্রহণ করে তবে দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের অসৎ পরামর্শদাতা তথা শয়তানের পরামর্শ দানের ও আকর্ষণ

সৃষ্টির প্রভাব ও প্রাবল্য বেশী হয় এবং সেই শাসনকর্ত্তা ও নেতা অসৎ কার্য্য অসৎ পরিকল্পনা এবং অসৎ ব্যবস্থাপনায় উদ্বুদ্ধ ও অগ্রসর হইতে থাকে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—নবীগণের ক্ষেত্রেও খারাব পরামর্শদাতার দ্বিতীয় সম্প্রদায় তথা শয়তানের অবকাশ থাকা বিচিত্র নহে। কিন্তু নবীগণ অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার রক্ষা ব্যবস্থায় সুরক্ষিত থাকেন—যাহার উল্লেখ আলোচ্য হাদীছেই রহিয়াছে।

এই সম্পর্কে মোসলেম শরীফে একখানা হাদীছও রহিয়াছে—

আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন তোমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে তাহার একজন সঙ্গী জ্বিন সম্প্রদায়ের (তথা শয়তান) আর একজন সঙ্গী ফেরেশতা সম্প্রদায়ের থাকে। ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার সঙ্গেও ঐরূপ দুইজন আছে? হযরত (দঃ) বলিলেন, আমার সঙ্গেও ঐরূপ দুইজন রহিয়াছে। তবে আমার সঙ্গে জ্বিন সম্প্রদায়ের যে রহিয়াছে তাহার প্রতিরোধে আল্লাহ তায়ালা আমার বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন, ফলে সে আমার অনুগত হইয়া গিয়াছে—আমি তাহার হইতে সম্পূর্ণ নিরাপদ; আমাকে সে বিপথগামী করার প্রয়াস পায় না।

রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্যের শপথ কিরূপ হইবে

২৬৮১। হাদীছ ঃ—ওবাদাহ ইবনে ছামেৎ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাতে হাত দিয়া এইরূপ অঙ্গিকার ও প্রতিজ্ঞা করিয়া ছিলাম, আমরা আপনার আদেশ-নিষেধ গ্রহণে ও অনুসরণে পূর্ণ অনুগত থাকিব—সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি উভয় অবস্থায়। আর উপযুক্ত ব্যক্তির ক্ষমতা প্রাপ্তির বিরোধী হইব না। হক্ ও আদর্শের উপর দৃঢ় পদ থাকিব—যথায়, যে অবস্থায় থাকি। আল্লার সন্তুষ্টির কাজে কাহারও নিন্দার পরওয়া করিব না।

২৬৮২। হাদীছ ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে দীনার (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মারওয়ান-পুত্র আবদুল মালেক যখন রাষ্ট্রপ্রধানরূপে সকলের সমর্থন পাইল তখন আমি ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি আবদুল মালেকের প্রতি সমর্থন প্রকাশে এইরূপ লিখিয়া ছিলেন— আমি আল্লার বান্দা আবদুল মালেক আমীরুল-মোমেনীনের যথাসাধ্য আনুগত্যের প্রতিজ্ঞা করিতেছি—আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের আদর্শ অনুসরণের শর্ত্তে। আমার পুত্রগণও এই প্রতিজ্ঞা করিতেছে।

রাষ্ট্রপ্রধান কর্ত্তৃক পরবর্ত্তী রাষ্ট্রপ্রধান মনোনীত করা

রাষ্ট্রপ্রধান নিয়োগে ইসলাম উভয় পদ্ধতি সমর্থন করিয়া থাকে—(১) জনগণের প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তিবর্গের দ্বারা নির্ব্বাচন। (২) প্রতিষ্ঠিত নিয়ম-তান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান কর্ত্তৃক পরবর্ত্তী রাষ্ট্রপ্রধান মনোনয়ন।

দ্বিতীয় পদ্ধতির বিনিয়োগে জনগণের প্রতিনিধিত্বশীল লোকদের আস্থা ভোট লাভ করার প্রয়োজনও রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন এই বিনিয়োগ বিশেষতঃ নিরপেক্ষ ও নিঃস্বার্থ ভাবে শুধু জনগণের মঙ্গল কামনা ও পাত্রের গুণাবলীর মাপ-কাঠিতে হইতে হইবে; অন্য কোন প্রভাবে নহে। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন—

مَنْ وَلِيَ مِنْ اَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْئًا فَاَمَّرَ عَلَيْهِمْ اَحَدًا مُحَابَاةً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ صَرْفًا وَّلَا عَدْلًا حَتّٰى يُدْخِلَهٗ جَهَنَّمَ

"যে ব্যক্তি মোসলমানদের উপর ক্ষমতা লাভ করিয়া তাহাদের উপর কাহাকেও শাসক নিয়োগ করে স্বজন-প্রীতি বশে; তাহার উপর আল্লার লা'নৎ ও অভিশাপ। আল্লাহ তায়ালা তাহার ফরজ-নফল কোন এবাদৎই কবুল করিবেন না, পরিণামে তাহাকে জাহান্নামে পৌছাইবেন। (তারগীব-তারহীব)

রাষ্ট্রপ্রধান কর্ত্তৃক পরবর্ত্তী রাষ্ট্রপ্রধান বিনিয়োগে কিরূপ নিষ্কলুষ একনিষ্ঠতা আবশ্যক খলীফা আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) কর্ত্তৃক তাঁহার পরবর্ত্তী খলীফারূপে ওমরের মনোনয়ন দানে উহার দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। ইতিহাসে বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিত আছে যে, খলীফা আবু বকর (রাঃ) তাঁহার জীবনের শেষ এক দিন আনছার ও মোহাজেরদের মধ্য হইতে বিশিষ্ট বিশিষ্ট ছাহাবীবর্গের সহিত পরামর্শ করিলেন— ওমর (রাঃ)কে পরবর্ত্তী খলীফা মনোনীত করা সম্পর্কে। তাঁহারা সকলেই বলিলেন, আমাদের মধ্যে তাঁহার তুল্য আর কেহ নাই। তখন আবু বকর (রাঃ) ওসমান (রাঃ)কে এইরূপ লিখিতে বলিলেন—বিছমিল্লাহির রহমানির রহীম: আবু কোহাফা-পুত্র আবু বকরের একটি বিশেষ নির্দ্দেশ-নামা তাহার ছুনিয়া ত্যাগের প্রাক্কালে জীবনের শেষ দিনে এবং আখেরাতে প্রবেশকালের সর্ব্বপ্রথম দিনে—যে সময়ে অবিশ্বাসী বিশ্বাসী হইয়া যায়, অর্দ্ধ বিশ্বাসী পূর্ণ বিশ্বাসী হইয়া যায়, মিথ্যাবাদীও সত্যবাদী হইয়া যায়। হে লোক সকল! আমি তোমাদের উপর খাত্তাব-পুত্র ওমরকে আমার পরবর্ত্তী খলীফা মনোনীত করিয়াছি; তোমরা সকলে তাঁহার আনুগত্য ও বশ্যতা অবলম্বন করিবে। পরবর্ত্তী খলীফা মনোনয়ন দানে আমি আল্লাহ ও আল্লার রসুলের ক্ষেত্রে, দ্বীন-ইসলামের ক্ষেত্রে, আমার ও তোমাদের ক্ষেত্রে কল্যাণ ও

মঙ্গলের প্রচেষ্টায় বিন্দু মাত্র ত্রুটি করি নাই। এখন ওমর যদি ন্যায় অবলম্বন করে তাহা হইবে তাহার সম্পর্কে আমার ধারণা ও অবগতির প্রকৃত রূপ। আর যদি সে উহার ব্যতিক্রম করে তবে প্রত্যেকের ন্যায় তাহাকে নিজের কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইবে। তাহাকে মনোনীত করায় আমি একমাত্র কল্যাণ ও মঙ্গলই কামনা করিয়াছি এবং উহারই চেষ্টা করিয়াছি। আমি গায়েবের খবর জ্ঞাত নহি। (আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন,) অন্যায়কারীরা অচিরেই জ্ঞাত হইয়া যাইবে তাহাদের পরিণাম কি ঘটে। তোমাদের প্রতি সালাম ও আল্লার রহমতের দোয়া।

অতঃপর উক্ত নির্দ্দেশ নামাকে সীলমোহরের ছাপ লাগান হইল। তারপর আবু বকর (রাঃ) ওমর (রাঃ)কে নির্জনে ডাকিয়া আনিলেন, তাঁহাকে যাহা বলিবার বলিলেন। ওমর (রাঃ) তথা হইতে চলিয়া আসিলে পর আবু বকর (রাঃ) আল্লার দরবারে হাত উঠাইলেন এবং বলিলেন, হে আল্লাহ! আমি যাহা করিলাম একমাত্র মঙ্গল ও কল্যাণের উদ্দেশ্যেই করিলাম। আমি জন-সাধারণের মধ্যে বিশৃঙ্খলার ভয় করিয়া দ্রুত তাহাদের জন্য এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিলাম যাহা আপনি জ্ঞাত রহিয়াছেন। আমি জনগণের হিতের খুব ভালরূপে চিন্তা করিয়াছি, তারপর এমন ব্যক্তিকে তাহাদের উপর শাসনকর্ত্তা মনোনীত করিয়াছি যে তাহাদের পক্ষে উত্তম ও মজবুত এবং তাহাদের মঙ্গল কামনায় অতিশয় লালায়িত।

হে আল্লাহ! আমার প্রতি আপনার নির্দ্ধারিত বস্তু (মৃত্যু) উপস্থিত হইয়া গিয়াছে। জনগণকে আপনারই হাওয়ালা করিলাম; তাহারা আপনারই বন্দা, আপনারই করতলগত। তাহাদের শাসকদেরকে সৎপথে পরিচালিত করুন, তাহাদের শাসকদেরকে আপনার প্রকৃত খলীফা বানাইয়া দিন এবং জনগণকে তাহাদের মঙ্গলকামী বানাইয়া দিন। (নেব্‌রাছ—শরহে আকায়েদ গ্রন্থে তারীখুল-খোলাফা হইতে উদ্ধৃত)

তারপর আবু বকর (রাঃ) তাঁহার নির্দ্দশ-নামাকে জন সমক্ষে প্রকাশ করিলেন এবং নির্দ্দেশ-নামায় লিখিল ব্যক্তির প্রতি আস্থা প্রকাশের জন্য বলিলেন। সেমতে সকলেই পূর্ণ আস্থা স্থাপন তাহা করিল। এই ভাবে সর্ব্ব সম্মতরূপে ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মনোনয়ন প্রতিষ্ঠিত হইল। (শরহে আকায়েদ)

২৬৮৩। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খলীফা ওমর (রাঃ)কে (তাঁহার অন্তিমকালে) অনুরোধ করা হইল, আপনি আপনার পরবর্ত্তী রাষ্ট্রপ্রধান মনোনীত করিবেন না—কি? তিনি বলিলেন, যদি আমি মনোনীত করিতে চাই তবে তাহা করিতে পারি; আমার চেয়ে উত্তম যিনি তথা আবু বকর (রাঃ) তিনি মনোনীত করিয়া ছিলেন। আর যদি মনোনীত না করিতে

চাই তাহাও করিতে পারি ; আমার ছেরতাজ হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) (আনুষ্ঠানিকরূপে কাহাকেও) মনোনীত করিয়া যান নাই।

অতঃপর উপস্থিত লোকগণ খলীফা ওমরের প্রশংসা করিতে লাগিল। ওমর (রাঃ) বলিলেন, আল্লার রহমতের আশাও রহিয়াছে, আজাবের ভয়ও রহিয়াছে। শাসন ক্ষমতার দায় হইতে সমান সমান থাকিয়া রেহায়ী পাই—এতটুকুই আকাঙ্খা রাখি ; পুরস্কৃত না হই, অভিযুক্তও না হই। তিনি আরও বলিলেন, জীবনকালে এই দায়িত্ব বহন করিয়াছি, মৃত্যুর পরেও সেই বোঝা আমার কাঁধে থাকিবে তাহা আমি চাই না। (অর্থাৎ পরবর্ত্তী খলীফা আমি মনোনীত করিয়া গেলে উহার দায়িত্ব আমার উপর থাকিয়া যায়।)

প্রতিনিধীত্বশীল লোকদের দ্বারা রাষ্ট্রপ্রধান নির্ব্বাচন

২৬৮৪। হাদীছঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে খলীফা নির্ব্বাচন করা সম্পর্কীয় ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ভাষণ শুনিয়াছেন। হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মৃত্যুর দ্বিতীয় দিনের ঘটনা—আবু বকর (রাঃ) চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, কিছুই বলেন না। ওমর (রাঃ) মসজিদের মিম্বারে আরোহণ করিলেন এবং কলেমা শাহাদৎ পাঠ করিয়া ভাষণ দিলেন। তিনি বলিলেন, আমার আশা ছিল, আমরাই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পূর্ব্বে মরিব, তিনি আমাদের পরেও জীবিত থাকিবেন। যদি ইহাই সাব্যস্ত হইয়া থাকে যে, মোহাম্মদ (দঃ) মৃত্যু বরণ করিয়াছেন তবুও আল্লাহ তায়ালা আপনাদের মধ্যে স্বীয় নূর ও আলো (তথা পাক কালাম—কোরআন) বিদ্যমান রাখিয়াছেন; উহা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকেও পথ প্রদর্শন করিয়া ছিলেন। আর আবু বকর (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিশিষ্ট সহচারী, এমনকি ছোর পর্ব্বৎ গুহায়ও তিনি তাঁহার সহিত দ্বিতীয় জন ছিলেন। তিনি আপনাদের শাসন কার্য্যের জন্য মোসলমানদের মধ্যে সর্ব্বোত্তম ও সর্ব্বাধিকারী। অতএব আপনারা সকলে তাঁহার হাতে হাত দিয়া আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করুন। ইতিপূর্ব্বে বনু-সায়েদা গোত্রের বৈঠকঘরের সম্মেলনে বিশিষ্ট লোকগণ আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিয়া ছিলেন। এইবার মসজিদের মধ্যে ব্যাপকভাবে জনসাধারণ হইতে আনুগত্যের শপথ অনুষ্ঠান পরিচালিত হইল। ওমর (রাঃ) অতিশয় পীড়াপীড়ি করিয়া আবু বকর (রাঃ)কে মিম্বারে উপবেশন করিতে বাধ্য করিলেন এবং লোকগণ তাঁহার হাতে আনুগত্যের শপথ করিল।

শাসন-ক্ষমতা সম্পর্কে হযরতের ভবিষ্যদবাণী

২৬৮৫। **হাদীছ** ঃ—জাবের ইবনে ছামুরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ভবিষ্যতে (দীর্ঘ দিন মোসলমানদের হাতে শাসন ক্ষমতা থাকিবে;) বার জন শাসনকর্ত্তা নিশ্চয়ই হইবে—তাহাদের প্রত্যেকই কোরায়েশ বংশীয় হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ—বিভিন্ন হাদীছে আলোচ্য ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে আরও কতিপয় বাক্য সংযুক্ত আছে, যথা—বার জন শাসনকর্ত্তার আমলে দ্বীন-ইসলাম অত্যন্ত শক্তিশালী থাকিবে। বার জন শাসনকর্ত্তার আমলে মোসলমানদের অবস্থা সমৃদ্ধ সুষ্ঠু ও উন্নত হইবে। বার জন যাহাদের প্রত্যেকই সর্ব শ্রেণীর লোকের আস্থা ভাজন হইবে—এই বারজন শাসনকর্ত্তার সংখ্যা পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত দ্বীন-ইসলাম কায়েম থাকিবেই।

আলোচ্য হাদীছের তাৎপর্য্য সম্পর্কে দুইটি বিষয় লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। একটি এই যে, উল্লেখিত শ্রেণীর শাসনকর্ত্তা বার জনই হইবে, অধিক হইবে না—হাদীছের উদ্দেশ্য ইহা নহে, বরং উদ্দেশ্য এই যে, উক্ত শ্রেণীর শাসনকর্ত্তার সংখ্যা বার হইতে কম হইবে না। সুতরাং ঐ শ্রেণীর শাসনকর্ত্তার সংখ্যা বার হইতে অধিক হওয়া এই হাদীছের পরিপন্থী নহে।

এই বার জন শাসনকর্ত্তার উদ্দিষ্ট কে কে এবং তাঁহারা সব অতীত হইয়া গিয়াছেন, না—ইমাম মেহদী (আঃ) এই সংখ্যার একজন—এই সব বিষয়ের প্রতি হাদীছে কোন ইঙ্গিত নাই। বিশিষ্ট ব্যাখ্যাকারগণ আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু মতানৈক্য অনেক বেশী।

দ্বিতীয় লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, মোসলমানদের অবস্থা উন্নত ও সমৃদ্ধময় থাকা উক্ত বার জন শাসনকর্ত্তার শাসনকালের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়া হাদীছের উদ্দেশ্য নহে। উক্ত শাসনকর্ত্তাদের সময়ে মোসলমানদের অবস্থা অবশ্যই উন্নত ও সমৃদ্ধ হইবে হাদীছের উদ্দেশ্য এতটুকুই। অতএব আরও অধিক কাল এবং অন্যান্য শাসনকর্ত্তাদের আমলেও মোসলমানদের অবস্থা উন্নত ও সমৃদ্ধময় হওয়া এই হাদীছের পরিপন্থী নহে।

শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ সম্পর্কে বিভিন্ন মছআলাহ

মছআলাহ ঃ—শাসনকর্ত্তা বা বিচারকের দারোয়ান রাখা সম্পর্কে ইমাম বোখারী (রঃ) একটি বিশেষ পরিচ্ছেদে বলিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দারোয়ান ছিল না।

ইহা সত্য যে, হযরত নবী (দঃ) পেশাদার দারোয়ানরূপে কাহাকেও নিযুক্ত রাখেন নাই। ইহাও সত্য যে, কতিপয় হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয়—বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ছাহাবী হুযরতের জন্য দারোয়ানীর কাজ করিয়াছেন। এতদৃষ্টে আলেম-গণের মত এই যে, দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনে বা অন্য কোন প্রয়োজনে দারোয়ান রাখা জায়েয আছে। অথচ শুধু কেবল আত্মশ্লাঘা বশে দারোয়ান রাখা নিষিদ্ধ। বিশেষতঃ জনগণের ফরিয়াদ আর্তনাদ পৌঁছাইতে বাধা প্রাপ্ত হয়, বিঘ্ন ও বিলম্বের কারণ হয় এই পর্য্যায়ের বা এই শ্রেণীর দারোয়ান রাখা শাসনকর্ত্তা ও বিচারকের জন্য হারাম।

১। হাদীছ ঃ— হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যে কোন শাসক বা প্রশাসক অভাব-অভিযোগের ফরিয়াদী এবং সঙ্কটাপন্ন বিপদগ্রস্ত লোকদের হইতে স্বীয় দরওয়াজা বন্ধ রাখিবে আল্লাহ তায়ালা উক্ত শাসক ও প্রশাসকের আপদ-বিপদ ও সঙ্কট উদ্ধারে রহমতের দরওয়াজা আবদ্ধ রাখিবেন। (তিরমিজী শরীফ)

২। হযরতের ঘোষণা—যে ব্যক্তি শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়া জনগণের অভাব-অতিযোগ হইতে আড়ালে থাকে আল্লার রহমতও তাহার অভাব-অভিযোগ হইতে আড়ালে থাকিবে। (আবু দাউদ, তিরমিজী)

প্রশ্ন ঃ—কোন ঘটনা সম্পর্কে স্বয়ং বিচারক অবগত রহিয়াছে এমতাবস্থায় সাক্ষী প্রমাণ ব্যতিরেকে বিচারক স্বীয় অবগতির উপর বিচার ও রায় দান করিতে পারে কি ?

উত্তর ঃ—যে সব দণ্ড নিছক "হক্কুল্লাহ্" অর্থাৎ যে অপরাধের দণ্ড শরীয়তে নির্দ্ধারিত রহিয়াছে এবং সরকার কর্তৃক সেই দণ্ড প্রয়োগে শুধু কেবল বিধান মোতাবেক অপরাধ সাব্যস্ত হওয়া আবশ্যক—নির্দ্ধারিত দণ্ড প্রয়োগ কোন মানুষের দাবী উত্থাপনের উপর নির্ভরশীল ও সীমাবদ্ধ নহে। যেমন, জেনা বা ব্যভিচারের দণ্ড এক শত বেত্রাঘাত কিম্বা প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা। এবং মদ্য পানের শাস্তি আশি বেত্রাঘাত। এই শ্রেণীর কোন দণ্ডের আদেশ দান করা শুধু বিচারকের অবগতির উপর ভিত্তি করিয়া হইতে পারে না—বিধানগত প্রমাণ অবশ্যই বিচারালয়ে উপস্থিত পাইতে হইবে। হাঁ—ঐ শ্রেণীর অপরাধ ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধানগত প্রমাণের অভাব অবস্থায় বিচারক স্বীয় অবগতির উপর ভিত্তি করিয়া নির্দ্ধারিত দণ্ডের পরিবর্ত্তে তাঁহার বিবেচনা অনুযায়ী শাসন রক্ষার উপযোগী কোন শাস্তি প্রয়োগ করিতে পারেন। এই মছআলায় পূর্ব্বাপর সকল ফেকাহ-শাস্ত্রবিদগণই এক মত—তাঁহাদের মতভেদ নাই।

পক্ষান্তরে যে সব বিষয় নিছক হক্কুল্লাহ্ নহে, বরং উহার সহিত হক্কুল-এবাদের সম্পর্কও রহিয়াছে—যেমন, পরস্পর মানুষের দাবী-দাওয়া কিম্বা কোন মানুষকে হত্যা করার বা অঙ্গহানি করার কিম্বা কাহারও প্রতি অপ্রমাণিত জেনা তথা ব্যভিচারের গ্লানি আরোপ করার দণ্ড। এই সব ক্ষেত্রে ফেকাহ-শাস্ত্রবিদগণের মতভেদ রহিয়াছে। যেই যুগে সমাজের মধ্যে ন্যায়-নিষ্ঠা, আমানতদারী, খোদাভীরুতা ও খোদা-ভক্তি বিদ্যমান ছিল; বিশেষতঃ বিচারকের মধ্যে সততা, সাধুতা, একনিষ্ঠতা এবং দায়িত্ব-বোধ ও বিচার-কার্য্যের পবিত্রতার উপলব্ধি পূর্ণ বিদ্যমান ছিল—সেই যুগের ফেকাহ্-শাস্ত্রবিদগণের মত এই যে, উল্লেখিত ক্ষেত্রসমূহে বিচারক স্বীয় অবগতির উপর ভিত্তি করিয়া রায় দান করিতে পারেন। পরবর্ত্তী যুগে অর্থাৎ যখন হইতে সমাজেও দুর্নীতি ছড়াইয়া পড়িয়াছে, বিচারকের মধ্যেও সাধারণভাবে স্বার্থপ্রীতি স্বজনপ্রীতি পক্ষপাতিত্ব ও দুর্নীতি প্রসার লাভ করিয়াছে, তখন হইতে ফেকাহ-শাস্ত্রবিদগণ উল্লেখিত ক্ষেত্রসমূহেও সাক্ষী প্রমাণ ছাড়া শুধু বিচারকের স্বীয় অবগতির উপর রায় দানে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিয়াছেন।

ইমাম বোখারী (রঃ)ও এই ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতঃ বলিয়াছেন, বিচারক শুধু কেবল হক্কুল-এবাদ সম্পর্কে স্বীয় অবগতির উপর ভিত্তি করিয়া বিচার করিতে পারেন যে ক্ষেত্রে কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব ও দুর্নীতির সংশয়-সন্দেহের লেশ মাত্র না থাকে।

মছআলাহ ঃ—বিচারক যদি কোন ঘটনার সাক্ষী হন তবে তাঁহার বিচার কার্য্যে তাঁহার সাক্ষ্য গৃহিত নহে। হাঁ—অপর বিচারকের এজলাসে তাঁহার সাক্ষ্য গৃহিত হইবে। ছাহাবীদের যুগে ইতিহাস প্রসিদ্ধ বিচারক কাজী শোরায়হ্‌কে এক ব্যক্তি সাক্ষ্য দিবার জন্য অনুরোধ করিলে তিনি বলিলেন, আমার বিচারে আমি সাক্ষী হইতে পারিব না। তুমি অন্য বিচারকের নিকট বিচারপ্রার্থী হও আমি তাঁহার নিকট যাইয়া সাক্ষ্য দিব।

মছআলাহ ঃ—বিচারক ও শাসক ঘুষ-রেশওয়াত মুক্ত থাকার জন্য কাহারও হইতে হাদিয়া—উপঢৌকন, উপহার ইত্যাদি গ্রহণ করিতে পারিবেন না। অবশ্য রক্তের সম্পর্কধারী আত্মীয় ও এরূপ বন্ধু-বান্ধব হইতে তাহা গ্রহণ করিতে পারেন যাহারা এই পরিমাণ হাদিয়া বিচারক ও শাসক হওয়ার পূর্ব্বেও তাঁহাকে দিয়া থাকিত। কিন্তু এই শ্রেণীর লোকদেরও যদি তাঁহার এজলাসে বিচার চলিতে থাকে তবে তাহাদের হাদিয়াও গ্রহণ করিবেন না।

বিশেষ দাওয়াত যাহা বিচারক বা শাসকের জন্য ব্যবস্থা করা হয় তাহাও হাদিয়ার ন্যায়ই। অবশ্য যদি সাধারণ দাওয়াত হয় যেমন বিবাহ-শাদী ইত্যাদি

উপলক্ষের দাওয়াত, তবে তাহা গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু অপরিচিত লোকের এবং যাহার বিচার চলিতেছে ইহাদের কোন দাওয়াতই গ্রহণ করিবেন না।

(শামী ৪—৪৩৯ × ৪৩৩)

মছআলাহ ঃ—সর্দার প্রথাকে শরীয়ত অনুমোদন করিয়া থাকে। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যুগে উহা প্রচলিত ছিল। অবশ্য সর্দারদের সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীছে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হইয়াছে। এক হাদীছে আছে—সর্দার প্রথা একটি শুদ্ধ ব্যবস্থা বটে, সমাজের জন্য সর্দারদের প্রয়োজন আছে। অবশ্য সর্দারগণ দোযখী হইবে। আর এক হাদীছে আছে—"সর্দারদের জন্য ওয়ায়েল দোযখ।"

সাধারণভাবে সর্দারগণ অত্যাচারী এবং জুলুম-অন্যায়ের অনুসারী হইয়া থাকে, সেই দৃষ্টিতেই এই সব সতর্কবাণী। ন্যায়পরায়ণ নিষ্ঠাবান সর্দারদের জন্য ভয়ের কোন কারণ নাই।

মছআলাহ ঃ—অনুপস্থিত ব্যক্তির বিচার সম্পর্কে তফসীল নিম্নরূপ—

যে সমস্ত বিষয় নিছক হক্কুল্লাহ যথা জেনা বা ব্যভিচারের শাস্তি এবং মদ্য পানের দণ্ড এই সবের বিচার অনুপস্থিত ব্যক্তির উপর হইতে পারে না। আর হক্কুল-এবাদ তথা মানুষের দাবী-দাওয়ার বিচারে বিবাদী উপস্থিত না হইলে সে ক্ষেত্রে অধিকাংশ ইমামগণের মতে বিবাদীর অনুপস্থিতিতে বিচার হইতে পারে। ইমাম আবু হানিফার মতে বিচারক অনুপস্থিত বিবাদীর পক্ষে কোন একজন উকিল attorney নিযুক্ত করিয়া হইলেও বিবাদী পক্ষের বক্তব্য শুনিবার যথা সম্ভব ব্যবস্থা করিবেন। ক্ষেত্র বিশেষে সেইরূপ ব্যবস্থা না করিয়া বিচার করিয়া দিলে সেই বিচারও প্রযোজ্য হইবে। (শামী ৪—৫৭০)

মছআলাহ ঃ—মিথ্যা সাক্ষী বা অন্য যে কোন কারণে বিচারকের বিভ্রান্তি ঘটায় এক জনের হক অপর জনকে দেওয়ার রায় প্রদত্ত হইলে প্রাপকের জন্য প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা হালাল হইবে না যদিও জাগতিক আইনের বিচারে সে উহার অধিকারী হইয়াছে—ইহা সকল ইমামগণের সর্ব্বসম্মত মছআলাহ। অবশ্য কোন বস্তু সম্পর্কে নয়, বরং শুধু ইজাব-কবুল—বন্ধন বা ছেদন সম্বন্ধীয় কোন ব্যাপারে যদি ঐরূপ বিভ্রান্তির দরুন বিচারক বাস্তবের বরখেলাফ রায় দান করেন এবং সেই বিচারক ইসলামী শাসন ব্যবস্থার বিচারক তথা কাজী হন, তবে ইমাম আবু হানিফার মতে সে ক্ষেত্রে বিচারকের রায় দানের কারণে অবাস্তবই বাস্তব বলিয়া পরিগণিত হইবে। যেমন—এক ব্যক্তি কোন এক স্বামী বিহীন মহিলার উপর বিবাহের দাবী করিয়া দুইজন মিথ্যা সাক্ষীর দ্বারা তাহা প্রমাণ করিয়া দিল

এবং কাজী বিবাহের রায় দান করিলেন। অথচ প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদের মধ্যে বিবাহ তথা ইজাব-কবুল হয় নাই। এরূপ ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফার মতে কাজীর রায়কে ইজাব-কবুলের বন্ধন স্বরূপ সাব্যস্ত করিয়া উক্ত মহিলাকে ঐ ব্যক্তির স্ত্রী গণ্য করা হইবে এবং বাস্তবেই সে স্ত্রী গণ্য হইবে। সুতরাং তাহাদের মধ্যে দাম্পত্য জীবনের সমুদয় আচার-ব্যবহার শুদ্ধ ও জায়েয হইবে। অবশ্য মিথ্যা দাবী ও মিথ্যা সাক্ষ্যের কবিরা গোনাহ্ নিশ্চয় হইবে।

মছআলাহ ঃ—শাসনকর্ত্তা ক্ষেত্র বিশেষে কাহারও ধন-সম্পত্তি বিক্রি করিতে পারেন। যেমন, কোন ব্যক্তি তাহার ধন-সম্পত্তির সম পরিমাণ বা অধিক ঋণ রাখিয়া মারা গিয়াছে এবং তাহার ওয়ারেছগণ সেই ঋণ পরিশোধ করিতে রাজী নহে। এরূপ ক্ষেত্রে শাসনকর্ত্তা ঐ মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধের জন্য তাহার সম্পত্তি বিক্রি করিতে পারেন।

মছআলাহ ঃ—অধিক মামলাবাজ লোক আল্লাহ তায়ালার নিকট অত্যন্ত ঘৃণিত বলিয়া হাদীছে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। সুতরাং এইরূপ ব্যক্তির প্রতি শাসন কর্ত্তৃপক্ষের কড়া দৃষ্টি রাখা চাই।

মছআলাহ ঃ–শাসনকর্ত্তা বা বিচারক যদি কোরআনের বা সুন্নার কিম্বা এজমা তথা ফেকার সর্ব্ব সম্মত মছআলার পরিপন্থী রায় দান করেন সেই রায় গ্রহণীয় হইবে না। অবশ্য নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে অপর বিচারকের মাধ্যমে উহাকে নাকচ করা হইবে।

মছআলাহ ঃ—শাসনকর্ত্তাকে জনগণের মধ্যে মীমাংসার ব্যবস্থায়ও চেষ্টা করা চাই। লোকদের মধ্যে মীমাংসার জন্য আবশ্যক হইলে স্বয়ং রাষ্ট্রপ্রধান বিরোধের ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইবেন।

মছআলাহ ঃ—আমলা বা কেরাণী নিয়োগ করিতে দায়িত্বশীল বিশ্বাসী ও বুদ্ধিমান দেখিয়া নিয়োগ করা শাসন কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ কর্ত্তব্য।

মছআলাহ ঃ–শাসনকর্ত্তা তাঁহার আমলাদের প্রতি এবং কাজী তথা প্রশাসক তাঁহার কর্ম্মচারীদের প্রতি কোন লিপি প্রেরণ করিলে তাহা গৃহিত হইবে যদিও কোন সাক্ষীর ব্যবস্থা না থাকে।

আর যদি এক এলাকার বিচারপতি প্রয়োজন বশতঃ অপর এলাকার বিচারপতির নিকট কোন মামলার রায় বা সাক্ষ্যের ব্যাপারে লিপি প্রেরণ করেন, তবে ইমাম বোখারীর মতে তাহাও সাক্ষী ব্যক্তিরেকেই গৃহিত হইবে; এমনকি খুনের মামলা সম্পর্কে হইলেও তাহা গৃহিত হইবে। ইমাম আবু হানিফার মতে কেছাছ তথা

প্রাণদণ্ড এবং হদ্দ্ তথা শরীয়তের নির্দ্ধারিত ও নির্দ্দিষ্ট চারটি শাস্তি সম্পর্কীয় মামলার ব্যাপারে কাহারও কোন লিপি গৃহিত হইবে না। অন্য শ্রেণীর মামলা সম্পর্কীয় লিপি একমাত্র সাক্ষীর সহিত গৃহিত হইতে পারে।

মছআলাহ :—শাসক বা প্রশাসকের পক্ষ হইতে কোন বিষয় তদন্তের জন্য একজন তদন্তকারী যথেষ্ট। তদ্রূপ অধিকাংশ ইমামগণের মতে প্রয়োজন স্থলে দোভাষীও একজন যথেষ্ট। কাহারও মতে দুইজন দোভাষী আবশ্যক; যেরূপ সাক্ষী অন্ততঃ দুইজন হওয়া আবশ্যক।

মছআলাহ :—সরকারী আমলাদের কার্য্যাবলীর তদন্ত পরিচালনা রাষ্ট্রপ্রধানের বিশেষ কর্ত্তব্য।

মছআলাহ :—রাষ্ট্রপ্রধান স্বীয় উপদেষ্টা বোর্ড রাখিতে পারেন।

মছআলাহ :—শুধুমাত্র ব্যক্তিগত জাগতিক স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে কাহাকেও সমর্থন (Support) করার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাদীছ মতে—যে ব্যক্তি দুনিয়ার ব্যক্তিগত স্বার্থবশে কাহারও প্রতি শাসনকর্ত্তা হওয়ার সমর্থন দেয়, কেয়ামতের দিন সে আল্লাহ তায়ালার রহমত হইতে বঞ্চিত থাকিবে।

মূল হাদীছের বাক্য দৃষ্টে ইহাও সুস্পষ্ট যে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নির্ব্বাচনী ভোটের সমর্থন এবং ক্ষমতা লাভ যথা মন্ত্রিপরিষদ (Cabinet) গঠনের সমর্থন কিম্বা রাষ্ট্রপ্রধান নির্ব্বাচনের সমর্থন এই শ্রেণীর প্রত্যেকটি বিষয়ই উক্ত হাদীছের প্রথম লক্ষ্য।

আকাঙ্খা ও বাসনা পোষণ করা

মানুষ সাধারণতঃ দীর্ঘাকাঙ্খী হইয়া থাকে। মানবের আশা তাহার জীবন অপেক্ষা অধিক লম্বা হয়। কোন কোন হাদীছে মানবের এই স্বভাবটির প্রতি কটাক্ষ করা হইয়াছে। অবশ্য কোন কোন বস্তুর আকাঙ্খা ও আশা পোষণ করা প্রশংসনীয়ও বটে। ইমাম বোখারী (রঃ) এস্থানে ঐ শ্রেণীর বিভিন্ন আশা-আকাঙ্খার বর্ণনাই দান করিবেন।

এই ছোট অধ্যায়টিতে বর্ণিত হাদীছ সমূহের অনুবাদ যথাস্থানে হইয়া গিয়াছে। নিম্নে অত্র অধ্যায়ের বিশেষ কতিপয় বিষয়ের উল্লেখ করা হইল।

১। শহীদি-মৃত্যুর আকাঙ্খা ও বাসনা করা জায়েয ও প্রশংসনীয়। অর্থাৎ মৃত্যু কামনা করা সাধারণ ভাবে নিষিদ্ধ, কিন্তু শহিদী-মৃত্যুর বাসনা রাখা জায়েয আছে। স্বয়ং হযরত (দঃ) এক হাদীছে বলিয়াছেন—

لَوَدِدْتُ اَنِّىْ اُقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ اُحْيٰى ثُمَّ اُقْتَلُ ثُمَّ اُحْيٰى

ثُمَّ اُقْتَلُ ثُمَّ اُحْيٰى ثُمَّ اُقْتَلُ

"আমার আকাঙ্খা ও বাসনা এই যে, আমি আল্লার রাস্তায় শহীদ হই অতঃপর পুনর্জীবিত হই ; আবার শহীদ হই অতঃপর পুনর্জীবিত হই ; আবার শহীদ হই অতঃপর পুনর্জীবিত হই এবং আবার শহীদ হই।

২। কোন নেক কাজের বাসনা করা জায়েয। অর্থাৎ শুধু কেবল পার্থিব উন্নতির দৃষ্টিতে উত্তরোত্তর বিভিন্ন বাসনা পোষণ করিতে থাকা মোবাহ এবং জায়েয বিষয় সম্পর্কে হইলেও মোসলমানের পক্ষে উহা নিন্দনীয়। কিন্তু নেক কাজের কামনা ও বাসনায় কোন ক্ষতি নাই ; বরং উহাতে ছওয়াব হইবে। এক হাদীছে বর্ণিত আছে, স্বয়ং হযরত (দঃ) এরূপ কামনা করিয়াছেন যে, ওহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ আমার হইলে তিন দিন অতিক্রম হওয়ার পূর্ব্বেই আমি উহা দান-খয়রাত করিয়া দিতাম।

৩। কোরআন তেলাওয়াত বা দ্বীনের জ্ঞান ও এল্‌ম কিম্বা দান-খয়রাত ইত্যাদি যে কোন নেক কাজ সম্পর্কে কাহারও প্রতিযোগিতায় তাহার সমকক্ষতার বাসনা পোষণ করা জায়েয, বরং এখলাছ ও নির্ম্মল অকৃত্রিমতার প্রেক্ষিতে উহা ছওয়াবেরও অছিলা হইয়া দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে পার্থিব উন্নতি ও ধন-দৌলত সম্পর্কে ঐরূপ প্রতিযোগিতাজনিত বাসনা ধ্বংসের কারণ হয়। এক হাদীছে বর্ণিত আছে—কোন ব্যক্তি কোনআনের শিক্ষা লাভ করিয়া দিবা-রাত্র উহা তেলাওয়াত করিতে থাকে ; তাহাকে দেখিয়া এরূপ বাসনা করা যে, আমি তাহার ন্যায় হইতে পারিলে আমিও ঐরূপ আমল করিতাম যেরূপ সে করিয়া থাকে। কোন ব্যক্তি ধনের অধিকারী হইয়া ন্যায় ও ছওয়াবের ক্ষেত্রে ব্যয় করে তাহাকে দেখিয়া বাসনা করা যে, এইরূপ ধন আমার থাকিলে আমিও এইভাবে খরচ করিতাম—এই শ্রেণীর কামনা ও বাসনা প্রশংসনীয় +।

+ এক ব্যক্তি স্বপ্নে ইব্রাহিম আদহাম (রঃ)কে দেখিতে পাইয়া তাঁহার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা অনেক বড় মর্তবাই দান করিয়াছেন, তবে আমার মর্তবা আমার এক পড়শীর মর্তবাকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। ঐ পড়শীর আমল এই ছিল যে, তিনি আমার এবাদৎ-বন্দেগী ও দান-খয়রাত দেখিয়া কাঁদিত এবং এই বাসনা করিত যে, ইব্রাহিম আদহামের ন্যায় সুযোগ পাইলে আমিও তাঁহার ন্যায় আমল করিতাম। তাঁহার এই অকৃত্রিম আবেগ ও বাসনার বদৌলতে আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে আমল সম পরিমাণ মর্তবা দান করিয়াছেন।

৪। কোন কোন বস্তু যাহা নিষিদ্ধ নয়, তবুও উহার কামনা ও বাসনা পোষণ করা নিষিদ্ধ। যেমন পবিত্র কোরআনে আছে—

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ

পুরুষের মিরাস (উত্তরাধীকার স্বত্বের অংশ) নারীর তুলনায় দ্বিগুণ, পুরুষের সাক্ষ্য নারীর সাক্ষ্যের দ্বিগুণ শক্তিমান এবং পুরুষের সংমিশ্রণ ব্যতিরেকে নারীর সাক্ষ্য গৃহিতই নহে—অনেক ক্ষেত্রেই নারীর উপর পুরুষের এইরূপ মর্য্যাদা রহিয়াছে। ইহা দৃষ্টে কোন কোন নারী হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সমীপে নারী না হইয়া পুরুষ হওয়ার বাসনা প্রকাশ করিল। সেই উপলক্ষেই উক্ত আয়াত নাযেল হয় যাহার ব্যাখ্যা এই যে—মানবের কোন কোন শ্রেণী বা ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় দান হিসাবে কোন মর্য্যাদা দিয়াছেন; অপরদের সেই মর্য্যাদার অভিলাষী হওয়া চাই না। অর্থাৎ স্বীয় আমল ও চেষ্টা-তদবীরে নয়, বরং নিছক খোদা প্রদত্ত কোন মর্য্যাদা কাহারও হাসিল থাকিলে অপরের জন্য উহার কামনা ও বাসনা করা নিষিদ্ধ। যেমন—নবী হওয়া, পুরুষ হওয়া ইত্যাদি।

মৃত্যু কামনা করাও নিষিদ্ধ। অবশ্য হাদীছেই স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, দুনিয়ার দুঃখ-যাতনা ও দুর্ভোগ-দুর্যোগে অতিষ্ট হইয়া মৃত্যু কামনা নিষিদ্ধ। অর্থাৎ আল্লার প্রেমে মত্ত হইয়া আল্লার মিলন আকাঙ্খায় মৃত্যু কামনা করা নিষিদ্ধ নহে।

৫। শত্রুর সহিত যুদ্ধ ও সংঘর্ষ কামনা করা চাই না। অর্থাৎ সাধারণ ভাবে জেহাদের তৌফিক কামনা করা ত ভাল কথা—উহা নেক কাজের বাসনা গণ্য হইবে। কিন্তু শত্রুর সহিত যুদ্ধে ও সংঘর্ষে পতিত হওয়ার অবস্থা কামনা করিতে নাই। সংঘর্ষ না বাঁধিয়া ভয়-ভীতির দরুন শত্রু উপস্থিত না হয়—এইভাবেও মোসলমানদের বিজয়লাভ ও উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব। এমনকি যুদ্ধ ও সংঘর্ষ ছাড়াই এরূপ ক্ষেত্রে মোসলমানগণ জেহাদের ছওয়াবত লাভ করিয়া থাকে। যেরূপ পবিত্র কোরআনে আলোচিত স্বয়ং হযরত (দঃ) কর্ত্তৃক পরিচালিত ঐতিহাসিক তবুকের জেহাদে হইয়াছিল। এরূপ ক্ষেত্রে অধিক বাড়াবাড়ীর অবতারণা করা এবং যুদ্ধ ও সংঘর্ষ অনুষ্ঠিত হওয়ার অভিপ্রায় প্রকাশ করা নিষিদ্ধ। সর্ব্বদা আল্লাহ তায়ালার নিকট শান্তি কামনা করা চাই। হাঁ—সংঘর্ষ বাঁধিয়া গেলে তখন সর্ব্বময় ত্যাগের সহিত ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে, তখন কোন প্রকার অবহেলা ও দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিবে না। ইহাই হইল জেহাদের তৌফিক কামনার অর্থ; আর মৃত্যু যাহা মানুষের জন্য অপরিহার্য্য সেই মৃত্যু যথায়-তথায় না হইয়া এইরূপ ক্ষেত্রেই হউক ইহাই শহীদি মৃত্যু কামনার অর্থ। শহীদি মৃত্যুর বাসনা রাখিবে, কিন্তু সরাসরি

শক্রর সংঘর্ষ কামনা করিবে না। উক্ত বাসনার জন্য এই কামনা আবশ্যকও নহে। ইহা শয়তানের কর্ম্ম তৎপরতার সুযোগ করিয়া দেয়। (ফতহুলবারী ১৩—১৯২)

ইমাম বোখারী (রঃ) কতিপয় হাদীছের উদ্ধৃতি পেশ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, অনেক ক্ষেত্রে হযরত নবী (দঃ) "যদি" (অর্থে আরবী لو "লাও") শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। অতএব "যদি" শব্দের ব্যবহার সর্ব্বক্ষেত্রে পরিহার্য্য নহে।

এ সম্পর্কে তারতম্যের ব্যাখ্যা এই যে—কোন বাহ্যিক কার্য্যকারণকে উপলক্ষ্য করিয়া "যদি" শব্দ ব্যবহার করা, যেমন—যদি অমুক ডাক্তার আনিতাম, তবে আমার ছেলে মারা যাইত না, বা তবে রোগ সারিত।" "যদি এরূপ ব্যবস্থা করি তবে এই ফল হইবেই" ইত্যাদি। এরূপ ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার শক্তিমত্তা, তাঁহার ইচ্ছার প্রাধান্য ও অগ্রাধিকারকে এবং তকদীরকে উপেক্ষা করার অর্থ "যদি" শব্দের ব্যাবহার ত সম্পূর্ণ হারাম, বরং কুফুরী মতবাদের শামিল। মানুষের মধ্যে এইরূপ ভাবধারা সৃষ্টি করাই শয়তানের প্রচেষ্টা। আর আল্লাহ তায়ালার শক্তিমত্তা ও তাঁহার ইচ্ছার প্রাধান্য এবং তকদীরের প্রতি পূর্ণ আস্থা ও একিন রাখিয়া শুধু কেবল বাহ্যিক কার্য্যকারণ পর্য্যায়ের অর্থে "যদি" শব্দ ব্যবহার করা মূলতঃ জায়েয, কিন্তু উহার আধিক্য ভাল নহে। কারণ, এইভাবে বাহ্যিক কার্য্যকারণের বুলি বলিতে থাকিলে উহার প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়া যাইবে এবং ধীরে ধীরে আল্লাহ তায়ালার শক্তি, ইচ্ছা এবং তকদীরের প্রতি আস্থা ও একীন ক্ষীণ হইয়া আসিবে। এই অবস্থাটাই শয়তানের কাম্য এবং এই অবস্থার সূত্রপাত হয় বারংবারের "যদি" হইতে। ইহাই অর্থ, হাদীছের এই বাক্যের যে—"যদি" শয়তানের কর্ম্ম-তৎপরতার সুযোগ করিয়া দেয়।

পক্ষান্তরে কার্য্যকারণ ক্ষেত্রে নয়, বরং শুধু কেবল ভাষাগত তাৎপর্য্যে এক বিষয়ের উপর অপর বিষয়কে স্থাপন করার অর্থে "যদি" ব্যবহার করায় কোন দোষ নাই। যেমন—এক হাদীছে বর্ণিত আছে, হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, যদি সকল লোক এক পথে এবং আনছার তথা মদীনাবাসী ছাহাবীগণ অন্য পথে চলে, তবে আমি আনছারদের পথে চলিব। আর এক হাদীছে বর্ণিত আছে, হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, যদি আমি আমার উম্মতের পক্ষে কঠিন বোধ না করিতাম তবে মেছওয়াক করা ফরজরূপে আদেশ করিতাম।

এই শ্রেণীর কতিপয় হাদীছ বর্ণনা করিয়া ইমাম বোখারী (রঃ) প্রমাণ করিয়াছেন, এরূপ অর্থে "যদি" শব্দ ব্যবহার করায় কোন দোষ নাই। পক্ষান্তরে "যদি" শব্দের ব্যবহার হইতে সতর্ককারী হাদীছ সমূহের উদ্দেশ্য হইল কার্য্যকারণ ক্ষেত্রে উহার ব্যবহার।

মানবের কর্ত্তব্য হইল—স্বীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে বা আবশ্যক ও প্রয়োজন মিটাইতে বৈধ চেষ্টা-তদবীর সবই অবলম্বন করিবে; ইহা আল্লাহ তায়ালারই নির্দ্দেশ। কিন্তু মন-মগজ ও ধ্যান-ধারণা এবং আস্থা ও নির্ভর, একিন ও বিশ্বাস সবকেই আল্লার শক্তিমত্তা ও তাঁহার ইচ্ছার প্রাধান্যের প্রতি এবং তকদীরের প্রতি রুজু ও নিবদ্ধ রাখিবে। তৎসঙ্গে উহার বিপরীত বাক্যাবলী হইতে জবান এবং মুখকেও সংযত রাখিবে।

একজন সাক্ষীর সাক্ষ্যে প্রমাণিত সংবাদ সম্পর্কে

এই ক্ষুদ্রতম অধ্যায়টিতেও ইমাম বোখারী (রঃ) যে কয়টি হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন, ঐ হাদীছসমূহের অনুবাদ যথাস্থানে করা হইয়াছে। এই অধ্যায়টিতে শুধু একটি বিষয় বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য, তাহা এই—

সাক্ষ্য দুই প্রকার। এক হইল—বিচারালয়ে একজনের দাবী অপর জনের উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সাক্ষ্য। দ্বিতীয় হইল—সংবাদ আদান-প্রদানের সাক্ষ্য। প্রথম প্রকার সাক্ষ্যের জন্য সাক্ষীর সত্যবাদিতার সহিত নির্দ্ধারিত সংখ্যা তথা কমপক্ষে দুইজন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা হওয়া আবশ্যক। শত সত্যবাদী সাক্ষী হইলেও উক্ত সংখ্যার কম সাক্ষীর দ্বারা কোন দাবী আইনের দৃষ্টিতে প্রমাণিত গণ্য হইবে না। দ্বিতীয় প্রকার সাক্ষ্যের জন্য সংখ্যার প্রয়োজন নাই। একজন সত্যবাদী সাক্ষীর সাক্ষ্যেই সংবাদকে সত্য বলা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় প্রকার সাক্ষ্যের জন্য যে, সংখ্যার প্রয়োজন নাই—একজন সত্যবাদী সাক্ষীর সাক্ষ্যই যথেষ্ট, ইহা প্রমাণ করাই এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য। কতিপয় বিশেষ নজীর ও কতিপয় হাদীছের ঘটনা উল্লেখ করিয়া ইমাম বোখারী (রঃ) উহাই প্রমাণ করিয়াছেন। যথা—আজান, রোযা ও শরীয়তের হুকুম-আহকাম সম্পর্কীয় সংবাদে ইসলামের বিধান মতে এবং সচরাচরও একজন সত্যবাদী সাক্ষী যথেষ্ট পরিগণিত হয়।

আজান দ্বারা নামাজের ওয়াক্ত উপস্থিতি-সংবাদ অবগত করা হয় এবং একজন লোকের আজানই যথেষ্ট গণ্য করা হয়। নামাযের মধ্যে একজন মোকাব্বেরের তকবীর শুনিয়াই উহার উপর আমল করা হয়। রোযার ইফতারের জন্য এবং ছেহরীর সময় শেষ হওয়ার জন্য একজন লোকের আজানের উপর নির্ভর করা হয়। শরীয়তের হুকুম-আহকাম সম্পর্কে একজন ওয়ায়েজ, একজন মুফতি, একজন আলেমের কথার উপর নির্ভর করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) এক এক রাজা-বাদশার নিকট এক একজনকে দুতরূপে প্রেরণ করিয়াছেন, কোন একজনকে

কোথাও কোন দায়িত্ব দিয়া পাঠাইয়াছেন বা প্রশাসক নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছেন—এই সব ক্ষেত্রে সেই একজনের কথা ও সংবাদের উপর আস্থা স্থাপন করা হইয়াছে।

হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতে হাদীছ বর্ণনা করার মধ্যে যে ছনদ তথা পরম্পরা ধারাবাহিক সাক্ষ্যের আবশ্যক হয় সেই সাক্ষ্যও দ্বিতীয় প্রকারের মধ্যে শামিল। তাই উহাতে একজন সত্যবাদী সাক্ষীর সাক্ষ্য যথেষ্ট। হাদীছের সাক্ষ্যে একাধিক সাক্ষীর প্রয়োজন নাই এবং পুরুষ হওয়ারও আবশ্যক নাই। একজন গ্রহণীয় সাক্ষীর সাক্ষ্য যথেষ্ট বটে। অবশ্য হাদীছ শাস্ত্রে সাক্ষী গ্রহণীয় হওয়ার জন্য যে সব শর্ত ও ধারা নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে উহা দৃষ্টে এরূপ বলিলে মোটেই অত্যুক্তি হইবে না যে, ঐ শ্রেণীর একজন সাক্ষী সাধারণ সত্যবাদী দশ জন সাক্ষী অপেক্ষাও অধিক নির্ভরশীল। উক্ত শর্ত ও ধারা সমূহের বিস্তারিত বিবরণ প্রথম খণ্ডের মুখবন্ধে বর্ণিত হইয়াছে।

কোরআন ও সুন্নাহকে দৃঢ়রূপে আঁকড়াইয়া থাকা

২৬৮৬। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবু বকর (রাঃ) খলীফা নির্ব্বাচিত হওয়ার প্রাক্কালে ওমর (রাঃ) তাঁহার পূর্ব্বেই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মিম্বারে দাঁড়াইয়া লোকদিগকে বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা তাঁহার রসুলের জন্য তোমাদের মধ্যেকার পরিশ্রম ও ক্লান্তির পরিবর্ত্তে তাঁহার নিকটস্থ নেয়ামত সামগ্রীকেই অধিক পছন্দ করিয়াছেন। (তাই রসুল (দঃ)কে তোমাদের নিকট হইতে উঠাইয়া নিয়াছেন।)

তোমরা ঐ কেতাবকে আঁকড়াইয়া থাক যে কেতাবের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের রসুলকে সঠিক পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তবেই তোমরা ঐ পথ লাভ করিতে পারিবে যেই পথ আল্লাহ তায়ালা তাঁহার রসুলকে দান করিয়া ছিলেন।

২৬৮৭। হাদীছ ঃ—আবু বরযাহ্ (রাঃ) বলিয়াছেন, হে লোক সকল! তোমরা ঘৃণিত, লাঞ্ছিত ও পথভ্রষ্ট ছিলে; আল্লাহ তায়ালা দীন-ইসলাম ও মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম দ্বারা তোমাদের উন্নতি দান করিয়াছেন। (সুতরাং তোমাদের উন্নতির স্থায়িত্ব ঐ পথেই নিবদ্ধ; অন্য কোন পথে তোমাদের উন্নতি হাসিল হইতে পারে না।) তোমরা রসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সুন্নত তথা তাঁহার আদর্শের অনুসারী হইবে।

● ইবনে আ'উন (রঃ) বহুবার বলিয়াছেন, তিনটি জিনিষকে আমি নিজের জন্য এবং আমার ভাই-বন্ধুদের জন্য অত্যন্ত পছন্দ করিয়া থাকি। (১) রসুলের সুন্নতকে সকলে সযত্নে শিক্ষা করিবে এবং উহার অন্বেষণ করিবে। (২) পবিত্র

কোরআনকে সকলে গভীরভাবে বুঝিবে এবং উহার অনুসন্ধান করিবে (৩) লোকদের মধ্যে শুধু কেবল ভাল কথাই প্রচার করিবে।

২৬৮৮। হাদীছ ঃ—শায়বা (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা খলীফা ওমর (রাঃ) হরম শরীফের মসজিদে বসিয়া বলিলেন, আমার ইচ্ছা হয়—কা'বা শরীফের ভিটার মধ্যে ভূগর্ভে যে সোনা-চান্দি পোঁতা রহিয়াছে উহা বাহির করিয়া গরীব মোসলমানদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেই। আমি তাঁহাকে বলিলাম, এরূপ করার অধিকার আপনার নাই। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন ? আমি বলিলাম, আপনার মুরব্বিদ্বয়—হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) এবং আবু বকর (রাঃ) ইহা করেন নাই।

ওমর (রাঃ) নতশিরে বলিলেন, সত্যই—তাঁহারা দুই জন অবশ্যই অনুসরণীয়।

২৬৮৯। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে মসঊদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন,* সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ আল্লার কেতাব—কোরআন। সর্ব্বোত্তম আদর্শ মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আদর্শ। আর (আল্লার কেতাব—কোরআন ও রসুলের আদর্শ সুন্নাহ ব্যতীত—) গর্হিত বিষয়াবলী নিশ্চয় খারাপ ও মন্দ।

স্মরণ রাখিও—(কোরআন ও সুন্নার মধ্যে) যত কিছুর ভয় দেখান হইয়াছে ঐ সব নিশ্চয়ই বাস্তবায়িত হইবে ; উহা প্রতিরোধের ক্ষমতা তোমাদের নাই।

২৬৯০। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার উম্মতের সকলই বেহেশতে যাইতে পারিবে—এন্‌কার ও অস্বীকারকারী ব্যতীত।

ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, অস্বীকারকারী কে ? হযরত (দঃ) উত্তরে বলিলেন, যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য অবলম্বন করিয়া চলিবে সে বেহেশতে যাইবে ; আর যে ব্যক্তি আমার নাফরমানী করিবে সে অস্বীকারকারী সাব্যস্ত হইবে।

২৬৯১। হাদীছ ঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিদ্রা অবস্থায় তাঁহার নিকট কতিপয় ফেরেশতা আসিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন, নবী সাহেব ত নিদ্রামগ্ন। অপর একজন বলিলেন, তাঁহার চক্ষু ঘুমন্ত, কিন্তু অন্তর জাগ্রত। অতঃপর তাঁহারা পরস্পর বলিলেন, এই বন্ধুবর নবী সাহেবের একটি দৃষ্টান্ত আছে উহা তাঁহার সমক্ষে আলোচনা করা হউক।

তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন, তিনি ত নিদ্রিত। অপর একজন বলিলেন, তাঁহার চক্ষু ঘুমন্ত, কিন্তু অন্তর জাগ্রত। অতঃপর তাঁহারা আলোচনা করিলেন,

---

* ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মসঊদ (রাঃ) বস্তুতঃ ইহা হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতেই বর্ণনা করিয়াছেন। (ফতহুলবারী ১৩—২১৩ দ্রষ্টব্য)

তাঁহার দৃষ্টান্ত এরূপ—যেরূপ এক ব্যক্তি গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া সেই গৃহে লোকদিগকে দাওয়াত খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছে এবং একজন লোককে চতুর্দিকে দাওয়াতের আহ্বান জানাইবার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছে। অতএব, যাহারা ঐ আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দিবে তাহারা ঐ গৃহে প্রবেশ করিবে এবং দাওয়াতের খানা খাইতে পারিবে। আর যাহারা ঐ আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দিবে না তাহারা ঐ গৃহে প্রবেশও করিবে না এবং খানা খাওয়ারও সুযোগ পাইবে না।

আগন্তুক ফেরেশতাগণ পরস্পর বলিলেন, বন্ধুবর নবী সাহেবের সমক্ষে দৃষ্টান্তটির ব্যাখ্যা দান করা হউক যেন তিনি বুঝিতে পারেন। তাহাদের মধ্যে এক জন্য বলিলেন, তিনি ত ঘুমন্ত। অপর একজন বলিলেন, তাঁহার চক্ষু ঘুমন্ত কিন্তু অন্তর জাগ্রত। তারপর তাঁহারা ব্যাখ্যা দান করতঃ বলিলেন, (গৃহকর্ত্তা হইলেন আল্লাহ তায়ালা, আর) গৃহ হইল বেহেশত (যাহার মধ্যে অফুরন্ত নেয়ামত সামগ্রী রহিয়াছে।) আর আহ্বানকারী হইলেন মোহাম্মদ (দঃ)।

যাহারা মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আহ্বানে সাড়া দিবে তাহারা আল্লাহ তায়ালার দাওয়াতে সাড়া দানকারী সাব্যস্ত (হইয়া বেহেশতে প্রবেশ করিবে এবং তথাকার অফুরন্ত নেয়ামত-সামগ্রী লাভকারী) হইবে। আর যাহারা মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আহ্বান প্রত্যাখ্যানকারী হইবে তাহারা বস্তুতঃ আল্লাহ তায়ালার দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারী সাব্যস্ত (হইয়া বেহেশত হইতে বঞ্চিত) হইবে।

অতএব মোহাম্মদ (দঃ) হইলেন দুই শ্রেণীর লোকদের বিভক্তকারী—এক শ্রেণী যাহারা বেহেশত লাভ করিবে অপর শ্রেণী যাহারা বেহেশত হইতে বঞ্চিত থাকিবে।

(হযরত (দঃ) জাগ্রত হইয়া এই ঘটনা ছাহাবীদের নিকট ব্যক্ত করিয় ছেন। ফতহুল বারী ১৩—২১৬)

২৬৯২। হাদীছঃ— আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খলীফা ওমরের পরামর্শ পরিষদের একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন—হোর্ ইবনে কায়স (রাঃ)। একদা তাঁহার চাচা ওয়ায়না (রাঃ) তাঁহার অতিথি হইলেন। তিনি ভ্রাতষ্পুত্র হোর্ (রাঃ)কে বলিলেন, তুমি ত শাসনকর্ত্তা খলীফার নৈকট্যধারী; আমার জন্য তাঁহার সাক্ষাতের অনুমতি লাভ করিতে পার কি? হোর্ (রাঃ) বলিলেন, আমি আপনার জন্য অনুমতি লাভের চেষ্টা করিব। অনুমতি প্রাপ্তে ওয়ায়না (রাঃ) খলীফা ওমরের নিকট উপস্থিত হইয়াই বলিয়া উঠিলেন— হে খাত্তাবের পুত্র! খোদার কসম—আপনি আমাদেরকে উদারভাবে দান করেন না।

এবং ন্যায়ের সহিত বিচার করেন না। (উক্ত ছাহাবী গরম মেজাজের ছিলেন ; হয় ত কোন ভুল তথ্যের উপর রাগান্বিত হইয়া ঐরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। অবাস্তব অভিযোগের দরুন) ওমর (রাঃ) ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহাকে অভিযুক্ত করার ইচ্ছা করিলেন।

এই সময় হোর (রাঃ) (খলীফা ওমরের ক্রোধ প্রশমিত করার উদ্দেশ্যে) বলিলেন, হে আমীরুল-মোমেনীন আল্লাহ তায়ালা তাঁহার নবীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ

"ক্ষমা করা অবলম্বন করুন, সৎ অবলম্বনের আহ্বান করুন! আর অজ্ঞদের দোষ-ত্রুটি হইতে দৃষ্টি এড়াইয়া চলুন।"

এই উক্তিকারক ব্যক্তি একজন অজ্ঞই বটে।

খোদার কসম—পবিত্র কোরআনের এই আয়াত তেলাওত করিতেই খলীফা ওমর (রাঃ) উহার মর্ম্মের উপর ক্ষান্ত হইয়া গেলেন, আর অগ্রসর হইলেন না। খলীফা ওমরের এই বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি মহান আল্লার কেতাবের সম্মুখে জড় ও অচল হইয়া পড়িতেন।

২৬৯৩। ছাদীছ :— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَعُوْنِىْ مَا تَرَكْتُكُمْ اِنَّمَا اَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ سُؤَالُهُمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلٰى اَنْبِيَائِهِمْ فَاِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوْهُ وَاِذَا اَمَرْتُكُمْ بِاَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

অর্থ :— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন বিষয়ে আমি তোমাদিগকে মুক্ত ও স্বাধীন রাখিলে আমাকে ঐ অবস্থায়ই থাকিতে দিও। (ঐরূপ ক্ষেত্রে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া কোন শর্তের বন্ধন সৃষ্টি করিও না।)

তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী উম্মতের এই কাজ তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছে যে—তাহারা তাহাদের নবীকে প্রশ্ন করিয়া শর্তের বন্ধন সৃষ্টি করার পর সেই শর্তের উপর আমল না করিয়া নবীর কথা অমান্য করিয়াছে।

স্থতরাং আমি যখন কোন বস্তু হইতে তোমাদিগকে নিষেধ করি তোমরা উহা হইতে পূর্ণরূপে বিরত থাক। আর যখন কোন বিষয়ের আদেশ করি তখন নিজের সর্ব্বশক্তি ব্যয় করিয়া উহার উপর আমল কর।

ব্যাখ্যা ঃ—কোন বস্তু বা বিষয় সম্পর্কে নবী (দঃ) আদেশ কিম্বা নিষেধ করিলে উহা নিশ্চয় এতটুকু স্পষ্ট ও পরিষ্কার হইবে যাহাতে কার্য্যক্ষেত্রে কোন প্রকার জটিলতার উদ্ভব না হয় এবং উহা দুর্বোধ্য না হয়। অবশ্য উহা শর্তহীন ও ব্যাপক আকারের হইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে কোন শর্ত বা সীমাবদ্ধতার প্রশ্নের অবতারণা করিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

যেমন হযরত মূছা আলাইহেচ্ছালামের একটি ঘটনা পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে। বিশেষ এক ব্যাপারে মূছা (আঃ) তাঁহার ছাহাবীগণকে আদেশ করিয়াছিলেন, তোমরা একটি গরু জবেহ কর। আদেশটি নিতান্তই স্পষ্ট ও পরিষ্কার ছিল; যে কোন গাভী জবেহ করাতেই উহার বাস্তবায়ন ছিল। কিন্তু তাহারা প্রশ্ন করিল, কি বয়সের গাভী হইতে হইবে? মূছা (আঃ) বলিলেন, বুড়াও নয়, কচিও নয়—মধ্যম বয়সের। এখনও আদেশটি স্পষ্ট ছিল—যে কোন গাভী এই বয়সের যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তাহারা প্রশ্ন করিল, গাভীটি কি রঙ্গের হইতে হইবে? মূছা (আঃ) বলিলেন, খুব চকমকা হলদে রঙ্গের হইতে হইবে।

এইরূপে ব্যাপক আকারের আদেশ ক্ষেত্রে প্রশ্ন করাকে নিষেধ করা হইয়াছে। কারণ, প্রশ্নের দ্বারা এইরূপ শর্ত ও সীমাবদ্ধতার সঙ্কীর্ণতা আসিয়া যাইতে পারে।

আলোচ্য হাদীছটি যে উপলক্ষে বর্ণিত হইয়াছে তাহাও এই শ্রেণীর একটি প্রশ্নই ছিল। মোসলেম শরীফে বর্ণিত আছে, একদা হযরত রস্থলুল্লাহ (দঃ) ভাষণ দানে বলিলেন, হে লোক সকল! আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর হজ্জ ফরজ করিয়াছেন; তোমরা হজ্জ সমাপন কর। ঐ সময় এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রস্থলাল্লাহ! প্রতি বৎসরই হজ্জ করিতে হইবে কি? হযরত (দঃ) কোন উত্তর না দিয়া চুপ থাকিলেন। ঐ ব্যক্তি প্রশ্নটি তিনবার দোহ্রাইল। অতঃপর হযরত (দঃ) বলিলেন, এই প্রশ্নের উত্তরে আমি যদি "হাঁ" বলিতাম তবে প্রতি বৎসরই হজ্জ ফরজ হওয়া প্রবর্ত্তিত হইয়া যাইত; কিন্তু সাধারণ ভাবে উহা সাধ্যকর হইত না; অথচ সে ক্ষেত্রে প্রতি বৎসর হজ্জ না করিলে মস্ত বড় গোনাহ হইত। এই কথার পরই হযরত (দঃ) আলোচ্য হাদীছের বিষয়বস্তুটি উল্লেখ করিলেন।

এই শ্রেণীর অনাবশ্যক, অহেতুক ও বাড়াবাড়ি জনিত প্রশ্নাবলী হইতে সতর্ক করণার্থে এস্থলে ইমাম বোখারী (রঃ) একটি বিশেষ পরিচ্ছেদ উল্লেখ করিয়াছেন, যাহার কতিপয় হাদীছ পূর্ব্বে অনূদিত হইয়াছে, অবশিষ্ট দুইটি হাদীছ এই—

২৬৯৪। হাদীছ ঃ—عن سعد بن ابى وقاص رضى الله تعالى عنه

ان النبى صلى الله عليه وسلم قال ان اعظم المسلمين جرما

من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألته

অর্থ ঃ—সায়াদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মোসলমানদের মধ্যে ঐ ব্যক্তির অপরাধ অনেক বড় যে ব্যক্তি এমন কোন বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করে যাহা হারাম করা হইয়াছিল না। কিন্তু তাহার প্রশ্নের দরুন উহা হারাম হওয়ার হুকুম আসিয়াছে।

ব্যাখ্যা ঃ—হারাম না হওয়া ও হওয়া ইহা শুধু দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ হইয়াছে। মূল উদ্দেশ্য এই যে, প্রশ্নের পূর্ব্বে লোকদের জন্য কার্য্যক্ষেত্রে সুযোগ ও স্বাধীনতা এবং করা না-করার অধিকার ছিল—আমলের ময়দান সুপ্রশস্ত ছিল; প্রশ্নের কারণে সেই সুযোগ স্বাধীনতা ও প্রশস্ততা রহিত হইয়া সঙ্কীর্ণ ও বাধ্যতামূলক হইয়া গিয়াছে। এই শ্রেণীর প্রশ্ন মস্ত বড় অপরাধ।

২৬৯৫। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, আমরা খলীফা ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি বলিলেন, অযথা কোন বিষয়ের জন্য বাড়াবাড়ি করিতে আমাদিগকে (নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের তরফ হইতে) নিষেধ করা হইয়াছে।

কাল, যুগ, দেশ ও পরিবেশ নির্ব্বিশেষে কেয়ামত পর্য্যন্ত মানব কল্যাণের জন্য রসুলুল্লার আদর্শ ও শিক্ষা প্রযোজ্য ও যথেষ্ট

ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এবং বর্ত্তমান যুগের একটি অতি অবাঞ্ছিত প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)ও বিশেষ গুরুত্বের সহিত এই সম্পর্কীয় ঘোষণা প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

যাহারা হযরতের সেই ঘোষণার খবর রাখে না বা উহার প্রতি লক্ষ্য করে না একমাত্র তাহারাই এরূপ অবাঞ্ছিত প্রশ্নের অবতারণা করিয়া থাকে যে—

অধুনা জগতের অনেক অগ্রগতি সাধিত হইয়াছে, রসুলের যুগ বহু পেছনের যুগ। বর্ত্তমান যুগে যাহা প্রয়োজন এবং বর্ত্তমান যুগে যে সব সমস্যাবলী আছে সেই যুগে তাহা ছিল না। সুতরাং সেই যুগের আদর্শ বর্ত্তমান প্রগতিশীল যুগের

জন্য যথেষ্ট হইতে পারে না। পুরাতন যুগের আদর্শ দ্বারা বর্তমান যুগের চাহিদা মিটিতে পারে না।

এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে আলোচ্য পরিচ্ছেদের হাদীছটি কতইনা সুস্পষ্ট এবং মনে হয় যেন এই হাদীছের প্রথম বাক্য ও ঘোষণাটি এই রকম প্রশ্নেরই খণ্ডন ও প্রতিরোধ স্বরূপ ছিল।

২৬৯৬। হাদীছঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ব্যাপক ও সুপ্রশস্ত পরিধিময় অর্থের শব্দ ও বাক্যের* মাধ্যমে আদর্শ ও বিধি-বিধান ব্যক্ত ও রচনা করার এক অসাধারণ শক্তি প্রদান করিয়া আল্লাহ তায়ালা আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।

শক্রুরা দূরদুরান্তে থাকিয়া আমার ভয়ে ভীত ও সন্ত্রস্ত হইবে—এইরূপ প্রভাব দান করিয়া আল্লার তরফ হইতে আমার বিশেষ সাহায্য করা হইয়াছে।

একদা আমি নিদ্রায় স্বপ্নে দেখিয়াছি, বিশ্বকোষের চাবিগুচ্ছ আমার নিকট উপস্থিত করা হইয়াছে এবং আনুষ্ঠানিকরূপে উহা আমার হস্তে অর্পন করা হইয়াছে।

ব্যাখ্যাঃ—আলোচ্য হাদীছটি এস্থলে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত হইয়াছে! এই মর্মে পূর্ণ হাদীছ মোসলেম শরীফে বর্ণিত আছে যাহা এই—

عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

انّ رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال فُضّلتُ على الانبياء بستّ

أُعطيتُ جوامع الكلم ونُصرتُ بالرّعب واُحلّت لى المغانم وجُعلت

لى الارض طهورا ومسجدا واُرسلتُ الى الخلق كافّةً وخُتم بى النّبيّون

"আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, সমস্ত নবীগণের উপর আমাকে অতিরিক্ত মর্য্যাদা দান করা হইয়াছে ছয়টি বৈশিষ্ট্যের দ্বারাঃ—(১) ব্যাপক ও সুপ্রশস্ত পরিধিময় অর্থের শব্দ ও বাক্যের মাধ্যমে আদর্শ ও বিধি-বিধান ব্যক্ত ও রচনা করার এক অসাধারণ শক্তি আমাকে দান করা হইয়াছে। (২) শক্রুরা আমার ভয়ে ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকিবে এরূপ প্রভাব দ্বারা

* "কালেম" "কলেমাহ" শব্দের বহুবচন। কলেমাহ্ সাধারণতঃ শব্দকে বলা হয়, কিন্তু বাক্য অর্থেও উহা ব্যবহৃত হয় বলিয়া আল্লামা সুয়ূতী উল্লেখ করিয়াছেন এবং দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, যেমন—কলেমাহ্ তাইয়্যেবাহ্। ইহার উদ্দেশ্য-বস্তুটি শব্দ নহে, বরং পূর্ণ বাক্য।

আমার সাহায্য করা হইয়াছে। (৩) গণিমত তথা জেহাদে বিজীত সম্পদ আমার (উম্মতের) জন্য হালাল করা হইয়াছে। (৪) ভূপৃষ্ঠকে আমার (উম্মতের) জন্য অবাধে নামাযের উপযোগী ও (তায়াম্মুমের মাধ্যমে) পবিত্রতা লাভের উপযোগী করা হইয়াছে। (৫) সারা বিশ্বের লোকদের প্রতি আমি প্রেরিত হইয়াছি। (৬) নবীগণের আগমন আমাতেই শেষ করা হইয়াছে।"

মোসলেম শরীফের এই হাদীছে দুইটি বিষয় অতিশয় তাৎপর্য্যপূর্ণ। একটি এই—ইহাতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, এই গুণগুলি হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এইরূপ বৈশিষ্ট্য ছিল যাহা একমাত্র তাঁহাকেই দান করা হইয়াছিল। হযরত (দঃ) ভিন্ন অন্য কোন নবীকেও উহা দান করা হয় নাই। সুতরাং উল্লেখিত গুণাবলী শুধু গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যই নহে, বরং গভীর ও সুদুর প্রসারী ফলাফল এবং সাফল্যের ভিত্তিও বটে।

আলোচ্য গুণাবলীর সর্ব্বপ্রথম গুণ—أعطيت جوامع الكلم। "ব্যাপক ও সুপ্রশস্ত পরিধিময় অর্থের শব্দ ও বাক্যের মাধ্যমে আদর্শ ও বিধি-বিধান ব্যক্ত ও রচনা করার অসাধারণ শক্তি আমাকে দান করা হইয়াছে।" এই গুণটির সাফল্য ইহাই যে, হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) এরূপ আদর্শ ও বিধি-বিধান সঙ্কলনে ও স্থাপনে সিদ্ধ ও কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন যে আদর্শ ও বিধি-বিধান ব্যাপক ও সীমাহীনরূপে কাল-যুগ, দেশ-পরিবেশ ও ভাষা-বর্ণ নির্ব্বিশেষে সর্ব্বক্ষেত্রে মানব কল্যাণের জন্য শুধু যথেষ্টই নহে, বরং সর্ব্বোত্তমও বটে। এই তথ্যটি মোসলেম শরীফের হাদীছের অপর তাৎপর্য্যপূর্ণ বিষয়টির দ্বারা অধিক পাকাপোক্ত হয়।

ঐ অপর তাৎপর্য্যপূর্ণ বিষয়টি এই যে, উক্ত হাদীছে হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এই দুইটি বৈশিষ্ট্যও বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে—(১) আমি বিশ্বমানবের সকলের প্রতি প্রেরিত হইয়াছি। বোখারী শরীফ ৪৮ পৃষ্ঠার হাদীছে এই বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে—

وكان النبى يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة

"আমার পূর্ব্বে প্রত্যেক নবী শুধু মাত্র তাঁহার জাতির প্রতি প্রেরিত হইতেন, কিন্তু আমি ব্যাপকভাবে সকল মানবের প্রতি প্রেরিত হইয়াছি। (২) আমার উপর নবীর আগমন শেষ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।"

এই দুইটি বৈশিষ্ট্যের জন্য বস্তুতঃ প্রথম বৈশিষ্ট্যটি অপরিহার্য্য। কারণ, হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) যখন দেশ-পরিবেশ, ভাষা ও বর্ণ নির্ব্বিশেষে সকল বিশ্বমানবের জন্য নবী এবং কাল-যুগ নির্ব্বিশেষে কেয়ামত পর্য্যন্ত সকল যুগের

জন্য নবী ; সুতরাং তিনি যে আদর্শ ও বিধি-বিধান সঙ্কলন ও স্থাপন করিবেন দেশ-পরিবেশ, ভাষা ও বর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলের এবং কেয়ামত পর্য্যন্ত সর্ব্ব যুগের উপযোগী ও কল্যাণ সাধনকারী হইতে হইবে। তাই সর্ব্ব জ্ঞানী, সর্ব্ব শক্তিমান, সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালা হযরত মোহাম্মদ (দঃ)কে جوامع الكلم তথা ব্যাপক ও সুপ্রশস্ত পরিধিময় অর্থের শব্দ ও বাক্যাবলীর মাধ্যমে আদর্শ ও বিধি-বিধান সঙ্কলন ও রচনার এক অসাধারণ শক্তি দিয়াছিলেন—যাহা আল্লাহ তায়ালা অন্য কোন নবীকেও প্রদান করেন নাই। তাঁহাদের জন্য এই গুণের প্রয়োজনও ছিল না, কারণ তাঁহাদের নবুয়ত ব্যাপক ছিল না এবং তাঁহারা সর্ব্বশেষ ও কেয়ামত পর্য্যন্ত সর্ব্ব যুগের জন্য নবী ছিলেন না।

এতদৃষ্টে মূল প্রশ্নের উত্তর এই হইল যে, সর্ব্ব শক্তিমান আল্লাহ তায়ালা চন্দ্র-সূর্য্য, গ্রহ-নক্ষত্র, পাহাড়-পর্ব্বত, বায়ু-বাতাস, আগুন-পানি ইত্যাদি হাজার হাজার প্রাকৃতিক বস্তুনিচয় এমনভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন যে, উহা সৃষ্টির আদি হইতে দুনিয়ার অন্ত পর্য্যন্ত দেশ-পরিবেশ, ভাষা ও বর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলের এবং সর্ব্ব যুগের উপযোগী ও কল্যাণসাধনকারী। সেই সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)কে এমন এক মহাশক্তি দিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রবর্ত্তিত আদর্শ ও বিধি-বিধান দুনিয়ার অন্ত পর্য্যন্ত সর্ব্ব যুগ ও সকল পরিবেশের উপযোগী ও কল্যাণ সাধনকারী।

সুতরাং জগতের অন্য যে কোন আদর্শ বা বিধি-বিধানের সহিত হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আদর্শ ও বিধি-বিধানকে তুলনা করা বস্তুতঃ সাধারণ প্রদীপের সহিত চন্দ্র-সূর্য্যকে তুলনা করা অপেক্ষা অধিক সামঞ্জস্যহীন।

হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আদর্শ ও বিধি-বিধান সম্পর্কে এই দাবী শুধু ভাবাবেগের প্রবণতা নহে, বরং বাস্তব। কিন্তু উহার গবেষণা ও ব্যবহারিক পরীক্ষা আবশ্যক। "বৃক্ষের নাম ফলে পরিচয়"।

রসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কার্য্যাবলীও অনুসরণীয়

হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) ব্যক্তিগত ভাবে কোন কাজ করিলে যদি সেই কাজ হযরতের জন্য সীমাবদ্ধ বলিয়া সুস্পষ্ট প্রমাণে প্রমাণিত হয় তবে উহা অন্যের জন্য অনুকরণীয় হইবে না। যেমন, এফ্‌তার ও ছেহরী ব্যতীরেকে লাগালাগি ৩ ৪ দিন রোযা রাখা। হযরত (দঃ) এরূপ করিতেন, কিন্তু অন্যদেরকে এরূপ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আর যদি সীমাবদ্ধ হওয়ার প্রমাণ না থাকে তবে উহা অনুসরণীয় হইবে। অবশ্য যদি একান্তই প্রমাণিত হয় যে, হযরত (দঃ) উহা শুধুমাত্র স্বীয়

দেশ ও পরিবেশের আচার-ব্যবহাররূপে করিয়াছেন, তবে উহার অনুসরণ বাধ্যতামূলক হইবে না। কিন্তু হযরতের অনুকরণরূপে উহার আমল করিলে বরকত ও ছওয়াব অবশ্যই হইবে। আর যদি শুধু দেশ ও পরিবেশের আচার-ব্যবহাররূপে করা সুস্পষ্ট প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত না হয় তবে উহা হযরতের আদর্শরূপে অনুসরণীয় সুন্নত গণ্য হইবে।

পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে ইমাম বোখারী (রঃ) রসুলের আদর্শে অতিক্রম, ব্যতিক্রম, বিতর্ক ও বিচ্যুতি হইতে সতর্ক করিয়াছেন। যাহার বিস্তারিত বিবরণ এই—

● দ্বীন-ইসলামের কোন নেক কাজেও রসুলের নির্দেশিত আদর্শ অতিক্রম করা নিন্দনীয় ও পরিহার্য্য। যেমন—রোযা রাখা একটি নেক কাজ; দিনের বেলায় রোযার সহিত রাত্রি বেলায়ও পানাহার বর্জ্জন করিয়া পরবর্ত্তী দিনেও রোযা রাখা—এই ভাবে দুই-তিন দিনের লাগালাগি রোযা রাখায় সাধারণ দৃষ্টিতে অধিক ছওয়াব হওয়ার কথা। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) নিজে এইরূপ রোযা রাখিতেন, কিন্তু অন্যদেরকে এইরূপ রোযা রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন। হযরতের দেখাদেখি যাহারা এইরূপ রোযা আরম্ভ করিয়াছিল তাহাদের প্রতি হযরত (দঃ) ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং শরীয়তে এই ভাবের রোযাকে লোকদের জন্য মক্‌রূহ্‌ তাহ্‌রিমী সাবাস্ত করা হইয়াছে। এই শ্রেণীর সীমা অতিক্রমকেই ইমাম বোখারী (রঃ) "التعمق" তথা মাত্রাতিরিক্ত গভীরতায় যাওয়ার চেষ্টা বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন।

● কোন বিষয়ে রসুলের কথার অপেক্ষা না করিয়া বিতর্কে লিপ্ত হওয়া, কিম্বা রসুলের কোন কথার মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি করা নিষিদ্ধ। এই শ্রেণীর বিতর্ককেই ইমাম বোখারী "التنازع" বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। যেমন একবার হযরতের নিকট বনী-তমীম গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল আসিল। হযরত (দঃ) তাহাদের অনুরোধে তাহাদের জন্য একজন শাসন পরিচালক নিযুক্তির ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ঐ মজলিসে আবু বকর (রাঃ) এবং ওমর (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন; তাঁহারা উভয়ে ঐ পদের জন্য এক একজনের নাম প্রস্তাব করিলেন এবং উভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটি হইল।

এ ক্ষেত্রে রসুলের কথার অপেক্ষা না করিয়া নিজের প্রস্তাব আনয়ন করার এবং বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার প্রতি ভীষণ কটাক্ষপাত করিয়া সরাসরি পবিত্র কোরআনের আয়াত অবতীর্ণ হইল—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ -

"হে মোমেনগণ! আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের আগে আগে কথা বলিও না। আল্লাহকে ভয় কর; নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছু শুনেন এবং জানেন।" (ছুরা হুজ্‌রাত)

রসুলের কথার আগে আগে কথা বলা এবং বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার প্রতি পবিত্র কোরআনের কটাক্ষপাত এতই ভয়ঙ্কর ছিল যে, আলোচ্য ঘটনা বর্ণনার হাদীছে এই বাক্য উল্লেখ আছে—كاد الخيران ان يهلكا ابو بكر وعمر "দুইজন সর্ব্বোত্তম ব্যক্তি—আবু বকর ও ওমর ধ্বংসের নিকটবর্ত্তী হইয়া গিয়াছিলেন।"

রসুলের কোন কথার মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি করা সম্পর্কেও একটি ঘটনা হাদীছে বর্ণিত আছে। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) ইহকাল ত্যাগের রোগ-শয্যায় একদা মসজিদে যাইতে অক্ষম হইয়া পড়িলেন। লোকজন নামাযের জন্য মসজিদে সমবেত অবস্থায় হযরতের অপেক্ষা করিতেছিল। ঐ সময় হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন—مروا ابا بكر فليصل بالناس "আবুবকরকে বল—লোকদের নামায পড়াইয়া দিবার জন্য।" তখন আয়েশা (রাঃ) ও হাফ্‌ছাহ্ (রাঃ) হযরতের ঐ কথা কাটিবার চেষ্টা করিলে হযরত (দঃ) তাঁহাদের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন।

রসুলের আগে আগে কথা বলা বা রসুলের কথায় বিতর্কের সৃষ্টি করা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জীবনকালের পরেও এইরূপে হইতে পারে যে, মানুষ কোন একটা বিষয়ের সম্মুখীন হইয়া উহা সম্পর্কে কোরআন-হাদীছ হইতে কোন আলো পাওয়ার অপেক্ষা ও চেষ্টা না করিয়া নিজে নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, কিম্বা কোরআন-হাদীছের আদর্শ পাওয়ার পর উহাতে বিতর্কের সৃষ্টি করে। এই উভয়টিই ভ্রান্ত পন্থা যাহা মানব-জীবনে বিপর্য্যয় টানিয়া আনে।

● মোমেনের জন্য কল্যাণকর অবস্থা হইল এই যে, রসুলের যে সব আদর্শের চর্চ্চা বিদ্যমান রহিয়াছে সেই সব আদর্শের উপর স্বীয় জীবনকে পরিচালিত করিবে এবং যদি কোন এরূপ বিষয়ের সম্মুখীন হয় যাহা সম্পর্কে রসুলের আদর্শ তথা শরীয়তের বিধান জ্ঞাত নহে তবে উহা সম্পর্কে দ্বীনের আলেমকে জিজ্ঞাসা করিয়া জ্ঞাত হইবে এবং আমল করিবে। মানব জীবনকে পরিপূর্ণরূপে আদর্শবান করার জন্য উক্ত ব্যবস্থাদ্বয়ই যথেষ্ট।

দ্বীনের বিষয়াবলী ও মছ্‌লা-মছায়েল লইয়া অনাবশ্যক হাতড়ানি এবং অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি পরিহার্য্য। ইহাকেই ইমাম বোখারী (রঃ) "والغلو فى الدين" বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। যেরূপ অনেককে দেখা যায়, সে যেই বিষয়ের সম্মুখীন নহে এবং যে বিষয়ের প্রয়োজন তাহাকে বাধ্য করে নাই সেই শ্রেণীর বিষয়াবলী সম্পর্কে প্রশ্ন করিয়া বেড়ায়—ইহা অবাঞ্ছীয় ও পরিহার্য্য। হাদীছ শরীফে আছে, একদা ছাহাবী আছেম ইবনে আদী (রাঃ) হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)কে জিজ্ঞাসা

করিলেন, যদি কেহ তাহার স্ত্রীর সহিত কোন পুরুষকে লিপ্ত দেখিতে পাইয়া তাহাকে হত্য করিয়া ফেলে তবে সেই হত্যাকারীকে প্রাণদণ্ড দিবেন কি ?

এ ক্ষেত্রে বাস্তব ঘটনায় আমলের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য জিজ্ঞাসা ছিল না, বরং শুধু কেবল একটা প্রশ্নই প্রশ্ন ছিল। এই শ্রেণীর প্রশ্নের প্রতি হযরত নবী (দঃ) ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন এবং উহাকে দোষণীয় গণ্য করিলেন।

● যে কোন ক্ষেত্রে রসুলের আমল বা আদর্শ বিদ্যমান থাকিলে সেস্থলে অন্য কোন নীতি বা ব্যবস্থা গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। ইহাকেই ইমাম বোখারী (রঃ) "البدع" বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন যাহা "বেদ্‌য়াত" শব্দের বহুবচন।

অবশ্য সাধারণত ইসলামী পরিভাষায় "বেদ্‌য়াত"-এর অর্থ আরও একটু প্রশস্ত। যথা—যে কাজ দ্বীন বা ধর্ম্মীয় হওয়ার কোন দলীল নাই এবং দলীলে প্রমাণিত ধর্ম্মীয় কোন কাজের জন্য উহা নির্ভরস্থল অথবা উপকারী ও সাহায্যকারীও নহে— সেই রকম কাজকে দ্বীন বা ধর্ম্মীয় গণ্য করা হইলে কিম্বা উহাকে দ্বীন ও ধর্ম্মীয়রূপ দান করা হইলে তাহাকেই "বেদ্‌য়াত" বলা হয়। এই শ্রেণীর কাজ বাহ্যিক দৃষ্টিতে ভাল দেখাইলেও ইসলামের বিধানে উহা বর্জ্জনীয়। হাদীছ শরীফে আছে, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন—

مَنْ اَحْدَثَ فِىْ اَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

"যেই কাজ দ্বীন-ইসলামের গণ্ডির মধ্যে শামিল নহে উহাকে দ্বীন-ইসলাম ভুক্ত গণ্য করা হইলে তাহা বর্জ্জনীয়।"

দ্বীন-ইসলামের গণ্ডির মধ্যে শামিল হওয়ার অর্থ—ঐ কাজটি সরাসরিরূপে দ্বীন বা ধর্ম্মীয় হওয়া দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয়, কিম্বা ঐ কাজটি দলীলে প্রমাণিত দ্বীন ও ধর্ম্মীয় অন্য কোন কাজের নির্ভরস্থল হয় অথবা উহার জন্য উপকারী ও সহায়ক হওয়া সাব্যস্ত হয়।

● পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে ইমাম বোখারী (রঃ) প্রমাণ করিয়াছেন যে, রসুলের আদর্শ ভিন্ন অন্য আদর্শ তথা কোরআন-হাদীছের নীতি ছাড়া অন্য নীতি যাহাকে "বেদ্‌য়াত" বলা হইয়াছে উহা অবলম্বন করা যেরূপ নিষিদ্ধ তদ্রূপ উহার প্রতি সমর্থন দানও নিষিদ্ধ। ঐরূপ কার্য্যকলাপ বা নীতির সমর্থনকারীর প্রতি হাদীছে কঠোর বাণী উচ্চারিত হইয়াছে। এ সম্পর্কে ইমাম বোখারী (রঃ) আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত একটি হাদীছের ইঙ্গিত দান করিয়াছেন। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি গর্হিত নীতি অবলম্বন করিবে, অথবা উহার সমর্থনকারী হইবে তাহার প্রতি লা'নৎ ও অভিশাপ—আল্লার তরফ হইতে, ফেরেশতাদের

তরফ হইতে এবং সকল মানুষের তরফ হইতে। এতদ্ভিন্ন আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তির ফরজ বা নফল কোন প্রকার এবাদৎ-বন্দেগীই কবুল করিবেন না।

এই হাদীছখানা যদিও পবিত্র মদীনা সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু সমস্ত ব্যাখ্যাকারই বলিয়াছেন যে, মদীনার উল্লেখ শুধু বিশেষভাবে হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে গর্হিত নীতি অবলম্বনকারী ও সমর্থনকারীর প্রতি এই কঠোর বাণী সকল দেশ ও পরিবেশের জন্যই। ইমাম বোখারী (রঃ)ও তাঁহার এই পরিচ্ছেদে উক্ত কঠোর বাণীকে শুধু মদীনার জন্য নির্দ্দিষ্ট না করিয়া ব্যাপক আকারে সকল দেশ ও পরিবেশের জন্যই উল্লেখ করিয়াছেন।

২৬৯৭। হাদীছ ঃ— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম শরীয়তের অবকাশ জনিত কোন একটি কাজ করিলেন। কিছু সংখ্যক লোক অবকাশের সুযোগ এড়াইয়া কঠোরতা অবলম্বনের উদ্যোগী হইল। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই সংবাদ পাইয়া (তাহাদের উদ্যোগের বিরুদ্ধে বিশেষ) ভাষণ দান করিলেন।

(ভাষণ আরম্ভের নিয়ম অনুযায়ী) আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা বর্ণনা করিয়া বলিলেন, কিছু সংখ্যক লোকের বুদ্ধিতে কী ঢুকিল ? তাহারা ঐ সুযোগ ও অবকাশকে এড়াইয়া চলে যাহাকে আমি গ্রহণ করিয়াছি। খোদার কসম—আমি আল্লাহকে তাহাদের অপেক্ষা অধিক চিনি এবং অধিক ভয় করিয়া থাকি।

কোরআন-সুন্নাহকে উপেক্ষা করিয়া বিবেক ও যুক্তির অবতারণা করা অতি জঘন্য

২৬৯৮। হাদীছ ঃ—ছাহাবী সাহ্‌ল ইবনে হোনায়েক (রাঃ) বলিয়াছেন, হে মোসলমানগণ ! তোমরা দ্বীন-ধর্ম্মের ব্যাপারে স্বীয় বিবেকের প্রতি সন্দিহান থাকিও। (উহার উপর নির্ভর করিয়া চলিও না, উহার ভ্রান্তি অবধারিত। মানুষের বিবেকের ভ্রান্তির একটা সুস্পষ্ট নজির প্রত্যক্ষ কর।)

ষষ্ঠ হিজরী সনে মক্কাবাসী কাফেরদের সহিত হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সন্ধি হইয়াছিল—যাহা "হোদায়বিয়ার সন্ধি" নামে ইতিহাস প্রসিদ্ধ। সেই সন্ধি উপলক্ষে আবু জন্দল নামক ব্যক্তির এক হৃদয় বিদারক ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল।

আবু জন্দল (রাঃ) একজন মক্কাবাসী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণের অপরাধে কাফের পিতা,-মাতা আত্মীয়-স্বজন কর্ত্তৃক শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় ভীষণ কষ্ট-যাতনার মধ্যে বন্দী জীবন কাটাইতেছিলেন। ষষ্ঠ হিজরী সনে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)

চৌদ্দ শতের অধিক ছাহাবীগণ সহ ওমরার জন্য মক্কাভিমুখে রওয়ানা হইয়া মক্কা হইতে মাত্র দশ মাইল ব্যবধানে হোদায়বিয়া নামক ময়দানে অবস্থান করিয়াছিলেন। মক্কাবাসীরা হযরত (দঃ)কে মক্কায় প্রবেশে বাধা দিতেছিল।

অবশেষে উভয় দলের মধ্যে সন্ধি-চুক্তি সাব্যস্ত হইল। এখনও উহা চূড়ান্ত পর্য্যায়ে পৌঁছে নাই, এমতাবস্থায় ঐ আবু জন্দল (রাঃ) শৃঙ্খল বন্ধন সহই মোসলমানদের মধ্যে পৌঁছিতে সক্ষম হইলেন। তাঁহার পিতাই ছিল কাফের পক্ষে সন্ধি-চুক্তির নায়ক; সে হঠ্ করিল যে, আবু জন্দলকে প্রত্যর্পণ না করিলে সন্ধি হইবে না। আবু জন্দল (রাঃ) কাফেরদের হস্তে অর্পিত হওয়ার আশংকায় মোসলমানদের নিকট রোদন করিতেছিলেন।

হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) কোন বিকল্প ব্যবস্থায় উপায় করিতে না পারিয়া সন্ধি-চুক্তি সম্পাদনের জন্য আবু জন্দল (রাঃ)কে প্রত্যর্পণের সিদ্ধান্ত করিলেন।

আলোচ্য হাদীছ বর্ণনাকারী সাহ্‌ল ইবনে হোনায়েক (রাঃ) বলেন, উক্ত হৃদয় বিদারক ঘটনায় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সিদ্ধান্তের বিপক্ষে ছিল আমাদের সকলের বিবেক। অবশ্য রসুলের সিদ্ধান্ত অলঙ্ঘনীয় বিধায় আমরা বিবেকের দ্বারা রসুলের সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করিতে পারি নাই।

পরবর্ত্তী ঘটনা প্রবাহে প্রতীয়মান হইয়াছে এবং পবিত্র কোরআনের—
انا فتحنا لك فتحا مبينا আয়াতের ইঙ্গিতেও প্রমাণিত হইয়াছে যে, হযরতের সিদ্ধান্তই সঠিক ও সমচীন ছিল এবং লোকদের বিবেক যাহা বুঝাইতে ছিল উহাতে মারাত্মক ভ্রান্তি ছিল।

এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ অত্র গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে হোদায়বিয়ার সন্ধি পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—পরবর্ত্তী কতিপয় পরিচ্ছেদে ইমাম বোখারী (রঃ) বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। পরিচ্ছেদগুলির হাদীছ সমূহ পূর্ব্বে অনুদিত হইয়াছে, তাই এস্থলে শুধু পরিচ্ছেদগুলির মূল বিষয় আলোচনা করা হইতেছে।

● হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নীতি ছিল—যে সব বিষয়ে আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে তাঁহার নিকট ওহী আসে নাই সেই শ্রেণীর কোন বিষয়ের প্রশ্ন তাঁহাকে করা হইলে তদুত্তরে তিনি হয় ত সাময়িক ভাবে বলিয়া দিতেন, আমি জানি না; অথবা ওহী প্রাপ্তির অপেক্ষায় নিরুত্তর থাকিতেন। ওহীলব্ধ জ্ঞানের সূত্র না ধরিয়া শুধু বিবেক ও যুক্তির প্রবণতায় কোন বিষয়ের মীমাংসা প্রদান করিতেন না। এমনকি, আল্লার তরফ হইতে ওহী প্রাপ্তির অপেক্ষা না করিয়া ইজতেহাদ (তথা কোন দলীলের সহিত সূক্ষ্ম সংযোগ সম্পর্ক উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক মীমাংসা স্থির) করিতেও অগ্রসর হইতেন না।

এই শ্রেণীর বহু দৃষ্টান্ত হাদীছে বিদ্যমান রহিয়াছে। যেমন, হাদীছ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ভূপৃষ্ঠের কোন্ খণ্ড উত্তম? হযরত (দঃ) বলিলেন, আমি জানি না। এই বলিয়া চুপ থাকিলেন* এবং (প্রশ্নকারীকে) বলিলেন, তুমি চুপ করিয়া থাক যাবৎ না জিব্রাঈলের আগমন হয়। ঐ ব্যক্তি চুপ করিয়া থাকিল। ইতি মধ্যেই জিব্রাঈল (আঃ) আসিলেন। হযরত (দঃ) জিব্রাঈল (আঃ)কে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। জিব্রাবল (আঃ) বলিলেন, যাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল সে জিজ্ঞাসাকারী হইতে অধিক কিছু জ্ঞাত নহে। তবে আমি মহামহিম পরওয়ারদেগারের নিকট জিজ্ঞাসা করিব। তারপর জিব্রাঈল (আঃ) ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, হে মোহাম্মদ (দঃ)! আজ আমি পরওয়ারদেগারের এত নিকটবর্ত্তী হইয়াছিলাম যে, অন্য কোন দিন এত নিকটবর্ত্তী হই নাই। হযরত (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জিব্রাঈল! এই নৈকট্য কতটুকু ছিল? জিব্রাঈল (আঃ) বলিলেন, আমার সম্মুখে নূর জাতীয় সত্তর হাজার পর্দ্দা ছিল (—ইহার অধিক ছিল না)। প্রভু-পরওয়ারদেগার বলিয়াছেন, মসজিদ হইল ভূপৃষ্ঠের উত্তম ভূখণ্ড এবং বাজার হইল ভূপৃষ্ঠের নিকৃষ্ট ভূখণ্ড।

ইমাম বোখারী (রঃ)ও এই পরিচ্ছেদে দুইটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। একটি হইল—একদা হযরত নবী (দঃ)কে প্রশ্ন করা হইল রূহ্ বা আত্মা কি জিনিষ? হযরত (দঃ) কোন উত্তর না দিয়া চুপ থাকিলেন। ইতি মধ্যেই পবিত্র কোরআনের আয়াত অবতীর্ণ হইল—

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ - وَمَا اُوْتِيْتُمْ

مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا

"কেহ কেহ আপনাকে রূহ্ বা আত্মা সম্পর্কে প্রশ্ন করে; আপনি বলিয়া দিন—রূহ্ বা আত্মা (কোন প্রকার ধাতু ও উপাদান ব্যতিরেকে) আমার প্রভু-পরওয়ারদেগারের আদেশে তৈরী একটি বস্তু। তোমাদেরকে শুধুমাত্র অতি সামান্য জ্ঞান-বিন্দুই দেওয়া হইয়াছে। (১৫ পারা ১০ রুকু) অর্থাৎ—তোমাদের জ্ঞান-বিন্দু অতি ক্ষুদ্র এবং দুর্ব্বল; উহা দ্বারা একমাত্র উপাদানে তৈরী বস্তুনিচয়ই বুঝিবার অবকাশ রহিয়াছে। রূহ্ বা আত্মা ঐ শ্রেণী হইতে বহু উর্দ্ধে— উহা কোন প্রকার উপাদানে তৈরী বস্তু নহে, উপাদান ব্যতিরেকে শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালার

---

* ফতহুলবারী ১৩—২৪৭ এবং মেশকাত শরীফ উভয় কেতাবে এই হাদীছখানার বর্ণনা দৃষ্টে সমষ্টিগতভাবে অনুবাদ করা হইল।

"কুন্—হইয়া যাও" আদেশে সৃষ্ট বস্তু। অতএব, মানবীয় জ্ঞানে রূহ্ বা আত্মা সম্পর্কে অধিক কিছু বুঝিবার অবকাশ নাই।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি হইল—ছাহাবী জাবের (রাঃ) রোগ শয্যায় অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে দেখার জন্য আসিলেন এবং অজু করতঃ তাঁহার উপর অজুর পানি ঢালিয়া দিলেন। তাঁহার চেতনা আসিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! (উত্তরাধিকারীদের জন্য) আমার মাল-সম্পত্তি সম্পর্কে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিব? হযরত (দঃ) কোন উত্তর দিলেন না। ইতি মধ্যেই মিরাস তথা উত্তরাধিকারীদের মধ্যে পরিত্যক্ত মাল-সম্পত্তি বণ্টনের বিধান সম্বলিত আয়াত অবতীর্ণ হইল।

পাঠকবৃন্দ! এই পরিচ্ছেদ এবং উহার দৃষ্টান্তগুলির দ্বারা সতর্ক করা হইয়াছে যে, কোন একটা বিষয় সম্মুখে আসিলেই তাড়াহুড়া করিয়া শুধু বিবেক ও যুক্তির পুঁজি লইয়াই উহার মামীংসায় অগ্রসর হওয়া চাই না। এইরূপ করা একান্তই রসুলের আদর্শ ও ইসলামের নীতির পরিপন্থী। যে কোন বিষয়ের মীমাংসায় আল্লাহ এবং আল্লার প্রেরিত প্রতিনিধি তথা রসুলের দেওয়া বিধান অর্থাৎ শরীয়তের প্রতি অবশ্যই ধাবিত হইতে হইবে। শরীয়ত হইতেই মীমাংসা লাভের অপেক্ষা ও চেষ্টা করিতে হইবে। স্বীয় জ্ঞান-বিদ্যায় যদি শরীয়তের মীমাংসা খুজিয়া বাহির করা না যায়, তবে পরিষ্কারভাবে "আমি জানি না" বলিয়া নিজের অক্ষমতা স্বীকার পূর্ব্বক মীমাংসা দানে বিরত থাকিতে হইবে। কোন অবস্থাতেই শরীয়তকে উপেক্ষা করিয়া—উহার ধার না ধারিয়া শুধু বিবেক ও যুক্তির উপর নির্ভর করা যাইবে না।

বিশিষ্ট ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, হে লোক সকল! কোন বিষয় সম্পর্কে মতামত প্রদান ঐ ব্যক্তিই করিতে পারে যাহার সে বিষয় এল্‌ম (তথা শরীয়তের জ্ঞান) রহিয়াছে। সেই বিষয়ে যাহার এল্‌ম নাই তাহার কর্ত্তব্য হইল উহার মীমাংসাকে আল্লার উপর ন্যস্ত করা। সুষ্ঠু জ্ঞানের পরিচায়ক ইহাই যে, কাহারও কোন বিষয় সম্পর্কে এল্‌ম না থাকিলে সে উহার মীমাংসা আল্লাহ তায়ালার উপর ন্যস্ত করে। (বোখারী শরীফ ৭১০ পৃঃ)

আল্লার উপর মীমাংসা ন্যস্ত করার অর্থ আমাদের ক্ষেত্রে হইল—আল্লার বাণী পবিত্র কোরআন এবং আল্লার প্রতিনিধি রসুলের ছুন্নাহ বা হাদীছ এই দুইটি মহাসত্যের উপর ন্যস্ত করা।

● হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের শিক্ষা-নীতিও এই ছিল যে, তিনি ওয়াজ-নছিহত তা'লীম-তবলীগের মাধ্যমে নারী-পুরুষদেরকে শিক্ষা দিতেন—

সে ক্ষেত্রেও হযরত (দঃ) যথাসম্ভব আল্লার দেওয়া বিষয়াবলীর শিক্ষা দিতেন; বিবেক-যুক্তি প্রসুত বিষয়বস্তু অপেক্ষা আল্লাহ-প্রদত্ত বিষয়বস্তুরই অধিক গুরুত্ব তিনি দিতেন।

বান্দা হিসাবে মানুষের পক্ষে উল্লেখিত নীতিই বাঞ্ছনীয়। অনেক লোককে ওয়াজ-নছিহতের মধ্যেও আল্লার এবং আল্লার রসুলের কোরআন-হাদীছ অপেক্ষা নিজের যুক্তি-প্রমাণ ও বিষয়-বিবৃতির প্রতিই অধিক ব্যাপৃত দেখা যায়। ইহা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আদর্শ ও নীতির পরিপন্থী।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—কেয়ামত পর্য্যন্ত সকল দেশ ও পরিবেশেই মোসলমানদের জন্য সমুদয় বিষয়ের মীমাংসা দানে কোরআন ও সুন্নাহ্‌ই হইল একমাত্র অধিকারী (Authority)। কোন বিষয় সম্পর্কে কোরআন-সুন্নার মধ্যে মীমাংসা পাওয়া না গেলে সেরূপ ক্ষেত্রের জন্য কোরআন-সুন্নার বিধানেই অপর দুইটি জিনিষকেও মীমাংসাদানকারী সাব্যস্ত করা হইয়াছে। একটি হইল—"এজ্‌মা" তথা সর্ব্ব সম্মত সিদ্ধান্ত। অপরটি হইল—"ইজ্‌তেহাদ" অর্থাৎ যে বিষয়ের সুস্পষ্ট মীমাংসা কোরআন-সুন্নার মধ্যে পাওয়া না যায় ঐ বিষয়টিকে শরীয়ত তথা ইসলামী বিধি-বিধানের দৃষ্টিভঙ্গীতে কোরআন-সুন্নার কোন মীমাংসার আওতাভুক্ত করার প্রচেষ্টা ও গবেষণা। যে ক্ষেত্রে কোরআন-সুন্নাহ্ বা এজ্‌মা' ইহার কোনটিরই মীমাংসা পাওয়া না যায় সেইরূপ ক্ষেত্রে উক্ত গবেষণা-লব্ধ মীমাংসাও গৃহিত হয়—ইহাকেই সাধারণ কথায় ফেক্কাহ্ বলা হয়।

● ইমাম বোখারী (রঃ) এস্থলে কতিপয় পরিচ্ছেদে এজ্‌মা' এবং ইজ্‌তেহাদ সম্পর্কেও আলোচনা করিয়াছেন। উক্ত আলোচনার প্রারম্ভে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। সেই বিষয়টি এই—

এজ্‌মা' অর্থ সর্ব্ব-সম্মত সিদ্ধান্ত; অতএব, প্রশ্ন আসে যে, কোন্ শ্রেণীর লোকের সম্মতি এ ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য? তদ্রূপ—ইজ্‌তেহাদ অর্থ কোরআন-সুন্নার মীমাংসার আওতাভুক্ত করার প্রচেষ্টা ও গবেষণা। সুতরাং প্রশ্ন হয় যে, সেই প্রচেষ্টা ও গবেষণা কিরূপ ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব ও শোভনীয়। এই প্রশ্নের উত্তরই ইমাম বোখারী (রঃ) একটি পরিচ্ছেদে ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, এজ্‌মার জন্য যে শ্রেণীর লোকের সিদ্ধান্ত উদ্দেশ্য এবং ইজ্‌তেহাদ যেই শ্রেণীর লোকের পক্ষে সম্ভব ও শোভনীয় তাঁহারা হইলেন ঐ সমস্ত লোক যাঁহারা হযরতের এই ভবিষ্যবাণীটির সৌভাগ্যের পাত্র। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, আমার উম্মতের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক তাঁহারা সর্ব্বদা হকের উপর দৃঢ়-পদ থাকিবে। কেয়ামত পর্য্যন্ত এই দলটি হকের উপর প্রবল থাকিয়া চলিবে।

এই ভবিষ্যদবাণীর হাদীছটি উল্লেখ করার সঙ্গে সঙ্গে ইমাম বোখারী (রঃ) নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, উক্ত শ্রেণীর দলটি হইল এল্‌মওয়ালাদের শ্রেণী ও দল। অর্থাৎ যাঁহারা কোরআন ও হাদীছের এল্‌ম রাখেন। এল্‌ম বলিতে কোরআন-হাদীছের শুধু কেবল সাধারণ জ্ঞান—বিশেষতঃ তরজমা ও অনুবাদের (Translution) সাহায্যে আহরিত ধার করা জ্ঞান বা কতিপয় অংশ বিশেষের সীমিত জ্ঞান মোটেই যথেষ্ট ও উদ্দেশ্য নহে। মূল (Original) কোরআন ও হাদীছ হইতে সরাসরি উহার জ্ঞান হাসিলের জন্য প্রয়োজনীয় ভাষা ও আভিধানিক সকল প্রকার শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়া সুদীর্ঘ সাধনার মাধ্যমে আদ্যোপান্ত পবিত্র কোরআনের এবং হাদীছ শাস্ত্রের গবেষণা-লব্ধ জ্ঞানই হইল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

ইজ্‌তেহাদের জন্য এই শর্ত্তের উল্লেখ বস্তুতঃ ইজ্‌তেহাদের ব্যাপারে বাস্তব প্রয়োজনের তাকিদেই করা হইয়াছে। প্রথমতঃ মোসলমানদের জন্য নীতি নির্দ্ধারক হইল একমাত্র কোরআন-সুন্নাহ্। যদ্দরুন পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে ক্ষেত্রে কোরআন-সুন্নার মীমাংসা পাওয়া না যায় একমাত্র সে ক্ষেত্রেই ইজ্‌তেহাদের অবকাশ রহিয়াছে। সুতরাং আদ্যোপান্ত কোরআন-সুন্নার পূর্ণ জ্ঞান এবং কোরআন-সুন্নার সমুদয় মীমাংসাবলীর জ্ঞান সম্মুখে উপস্থিত থাকা ইজ্‌তেহাদের জন্য অপরিহার্য্য। দ্বিতীয়তঃ বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়া ও বুঝিয়া রাখা চাই যে, শুধু জ্ঞান-বিবেকের দ্বারা মীমাংসা স্থির করার নাম ইজ্‌তেহাদ নহে ; বরং কোরআন-সুন্নার কোন স্পষ্ট মীমাংসার আওতাভুক্ত করতঃ প্রয়োজনীয় বিষয়ের মীমাংসা উদ্ভাবনের নাম হইল ইজ্‌তেহাদ। এত বড় দায়িত্বের জন্য কোরআন-সুন্নার কিরূপ বিস্তীর্ণ ও সুপ্রশস্ত বাস্তব জ্ঞানের আবশ্যক তাহা সহজেই অনুমেয়।

মূল (Original) কোরআন শরীফ ও হাদীছ শরীফ বুঝিতে সক্ষম নয়, তরজমা ও অনুবাদের উপর নির্ভরশীল ; অথবা কোরআন-সুন্নার শুধু কেবল বিভিন্ন অংশ বিশেষের জ্ঞানই শেষ সীমা—এই শ্রেণীর ধার করা বা আংশিক জ্ঞানের পুঁজি লইয়া যাহারা ইজ্‌তেহাদের ময়দানে অবতীর্ণ হয় তাহাদের কার্য্য অনধিকার চর্চ্চা বৈ আর কিছুই নহে। এই শ্রেণীর অনধিকার চর্চ্চার অভিলাসীদের সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য ইমাম বোখারী (রঃ) পরবর্ত্তী একটি পরিচ্ছেদে ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, ঐ শ্রেণীর লোকদের অস্তিত্ব মোসলেম সমাজের জন্য আল্লার আজাব ও বিপদ বটে।

তারপর একটি পরিচ্ছেদে ইমাম বোখারী (রঃ) সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ক্ষেত্র বিশেষে ইজ্‌তেহাদের প্রয়োজন হয়। যেমন—বিচারক দৈনন্দিন বিভিন্ন ঘটনার সম্মুখীন হন ; তাঁহাকে নিত্য নূতন ঘটনার বিচার করিতে হয়। বিচার কার্য্য সমাধানে ইজ্‌তেহাদের প্রয়োজন হইলে বিচারককে অবশ্যই আল্লাহ-প্রদত্ত

তথা কোরআন বা আল্লার প্রতিনিধি রসুলের হাদীছের মীমাংসার আওতাভুক্তির ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্য সফলের জন্য আবশ্যক হইলে বিচারককে অন্যের পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইবে, কিম্বা কোন এল্‌মওয়ালার সাহায্যের আশ্রয় লইতে হইবে। আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের আওতাভুক্তি ছাড়া অন্য যে কোন সূত্র ধরিয়া মীমাংসা দেওয়া হইলে তাহা অত্যন্ত ভয়ের কারণ হইবে। পবিত্র কোরআনের স্পষ্ট ঘোষণা—

(১) وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"যাহারা আল্লাহ-প্রদত্ত মীমাংসা সূত্রে মীমাংসা ও ফয়ছালাহ্ না দেয় তাহারা নিশ্চয়ই কাফের।"

(৩) وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"যাহারা আল্লাহ-প্রদত্ত মীমাংসা সূত্রে মীমাংসা ও ফয়ছালাহ্ না দেয় তাহারা নিশ্চয়ই অন্যায়কারী স্বৈরাচারী।"

(৩) وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

"যাহারা আল্লাহ প্রদত্ত মীমাংসা সূত্রে মীমাংসা ও ফয়ছালাহ্ না দেয় তাহারা নিশ্চয়ই ফাছেক—স্বেচ্ছাচারী।"

আল্লার কেতাব ও রসুলের আদর্শকে উপেক্ষা করিয়া যুক্তি ও বিবেকের উপর চলা বস্তুতঃ অমোসলেমদের অনুকরণ

২৬৯৯। **হাদীছঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (অনুতাপ ও আক্ষেপ স্বরূপ ভবিষ্যদবাণী করতঃ) বলিয়াছেন, কেয়ামতের পূর্ব্বে আমার উম্মতগণ তাহাদের পূর্ব্বেকার যুগের প্রচলিত প্রথা ও প্রচলনের পূর্ণ অনুকরণ করিবে। পূর্ব্ববর্ত্তীগণ যে দিকে এক বিঘত অগ্রসর হইয়াছিল আমার উম্মতও সেই দিকে পূর্ণ এক বিঘত অগ্রসর হইবে, যে দিকে এক হাত অগ্রসর হইয়াছিল আমার উম্মতও সেই দিকে পূর্ণ এক হাত অগ্রসর হইবে।

কোন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রসুলাল্লাহ! পূর্ব্ববর্ত্তীগণ বলিতে পারস্য ও রোমবাসী অমোসলেমদেরকে উদ্দেশ্য করিতেছেন কি? হযরত (দঃ) বলিলেন, (প্রাচীনকাল হইতে প্রাবল্যের অধিকারী একমাত্র তাহারাই) তাহারা ভিন্ন আর কে আছে?

২৭০০। হাদীছ ঃ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, হে আমার উম্মতগণ! তোমরা বিঘতে বিঘতে, গজে গজে তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী উম্মতদের আদৎ-অভ্যাসের ও চাল-চলনের অনুকরণ করিবে। এমনকি তাহারা যদি (কোন উদ্দেশ্যে) সাণ্ডার গর্ত্তে প্রবেশ করিয়া থাকে তবে তোমরা উহারও অনুসরণ করিবে। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! (আমরা কি অনুসরণ করিব—) ইহুদী নাছারাদের? হযরত (দঃ) বলিলেন, আর কাহাদের?

ব্যাখ্যা ঃ—রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা ও আচার-অনুষ্ঠানে মোসলমানগণ অন্ধকার যুগের জাতিনিচয় যথা পারস্য ও রোমকদের অনুকরণ করিবে। আর দ্বীন-ধর্ম্মের অনুশাসন এবং রসুল ও আসমানী কেতাবের ব্যাপারে মোসলমানগণ অভিশপ্ত ও ভ্রষ্ট ইহুদ-নাছারাদের ভূমিকা গ্রহণ করিবে। হযরত (দঃ) অনুতাপ, আক্ষেপ ও ক্ষোভ প্রকাশার্থে উল্লেখিত হাদীছদ্বয়ে এই ভবিষ্যদবাণী করিয়াছেন এবং ইহা কেয়ামত তথা মহাপ্রলয়ের আলামত বা নিদর্শন বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন।

● পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে ইমাম বোখারী (রঃ) অধিক সতর্ক-করন উদ্দেশ্যে ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, আল্লার কেতাব ও রসুলের আদর্শ উপেক্ষা করিয়া অন্য কোন নীতির প্রচলন করিলে তাহা কুপ্রথা এবং ভ্রষ্টতা পরিগণিত হইবে। সেইরূপ নীতির আহ্বায়ক অসংখ্য পাপের ভাগী হইবে। এই প্রসঙ্গে ইমাম বোখারী (রঃ) পবিত্র কোরআনের এই আয়াতখানা উল্লেখ করিয়াছেন—

وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ

আল্লাহ তায়ালা এক শ্রেণীর পাপীদের উল্লেখ পূর্ব্বক বলিয়াছেন, তাহারা কেয়ামতের দিন নিজেদের পাপের বোঝাত বহন করিবেই, "তদুপরি ঐ লোকদের পাপের (সমপরিমাণ) বোঝাও বহন করিবে যাহাদেরকে তাহারা ভ্রষ্টতায় নিপতিত করিয়াছিল।" (১৪ পারা ৯ রুকু)

১০৯২ পৃষ্ঠায় ইমাম বোখারী একটি পরিচ্ছেদে প্রমাণ করিয়াছেন, যদি কোন সরকারী কর্ম্মকর্ত্তা বা বিচারক ইজ্‌তেহাদ করেন এবং অজ্ঞাতসারে সেই ইজ্‌তেহাদে উদ্ভাবিত মীমাংসা রসুলের দেওয়া বিধানের পরিপন্থী হইয়া পড়ে তবে উক্ত ইজ্‌তেহাদ বাতিল গণ্য হইবে।

● অতঃপর আর এক পরিচ্ছেদে ইমাম বোখারী (রঃ) বিশেষ একটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। ইজ্‌তেহাদের জন্য সর্ব্বপ্রথম শর্ত্ত হইল—যে

বিষয়ে ইজ্‌তেহাদ করা হইবে উহা সম্পর্কে কোরআন-হাদীছের কোন মীমাংসা অপ্রাপ্য হইতে হইবে। এই শর্ত্ত দৃষ্টে ইজ্‌তেহাদ করার পূর্ব্বে কোরআন-হাদীছের সুবিস্তীর্ণ অন্বেষণ আবশ্যক। এই পর্য্যায়ে পবিত্র কোরআন অপেক্ষা হাদীছের ক্ষেত্রে অধিক পরিশ্রম ও ব্যপক অন্বেষণের প্রয়োজন। কারণ, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাদীছসমূহ এরূপ নহে যে, সমুদয় হাদীছ সর্ব্ব সমক্ষে সকলের গোচরীভূত হয়। হযরতের হাদীছ তথা হযরতের কথা-বার্ত্তা ও কার্য্যকলাপ সর্ব্বদা সব ছাহাবার উপস্থিতিতে হইত না। অনেক ক্ষেত্রে উপস্থিতগণের সংখ্যা স্বল্পই হইত। এতদকারণেই বড় বড় ছাহাবীও কোন কোন হাদীছ অজ্ঞাত ছিলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইমাম বোখারী (রঃ) একটি হাদীছের ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন।

হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, কাহারও গৃহে প্রবেশের অনুমতি চাহিয়া একবারে সাড়া না পাইলে দ্বিতীয় বার, দ্বিতীয় বারেও সাড়া না পাইলে তৃতীয় বার চাহিবে; এই বার সাড়া না পাইলে ফিরিয়া আসিবে। ওমর (রাঃ) এই হাদীছটি জ্ঞাত ছিলেন না, বহু দিন পরে ইহার খোঁজ পাইয়া তিনি উহার অন্বেষণ চালাইয়াছিলেন। এইরূপ ঘটনার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং ইজ্‌তেহাদের জন্য হাদীছ সম্পর্কে সুপ্রশস্ত জ্ঞান এবং সুদীর্ঘ অন্বেষণ আবশ্যক।

● আর এক পরিচ্ছেদে ইমাম বোখারী (রঃ) হাদীছের সংজ্ঞা প্রশস্ত করতঃ বলিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের গোচরে বা অগোচরে তাঁহার সময়ে ব্যাপকভাবে কোন কাজ হইয়াছে, কিন্তু হযরতের তরফ হইতে উহাতে অসম্মতি প্রকাশ বা খণ্ডন করা হয় নাই—ঐরূপ কাজ শরীয়ত সম্মত হাদীছ বলিয়া গণ্য হইবে। হযরত (দঃ) ভিন্ন অন্য কাহারও বেলায় ঐরূপ গণ্য হইবে না।

● এই ক্ষেত্রে আর একটি জরুরী বিষয়ের পরিচ্ছেদ ইমাম বোখারী (রঃ) উল্লেখ করিয়াছেন যে—ইহুদ খৃষ্টানদের নিকট অসমানী কেতাব নামে যাহা প্রচলিত আছে উহার কোন কিছুই তোমরা তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসাও করিবে না। উহার সঙ্গে তোমরা কোন সম্পর্কই রাখিবে না। কারণ, প্রথমতঃ—হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আবির্ভাবে তাঁহার শরীয়ত দ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী সমুদয় শরীয়ত মনছুখ বা রহিত হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ—তৌরাত ও ইঞ্জিল নামে পবিত্র আসমানী কেতাব ছিল বটে, কিন্তু হযরত মুছা ও হযরত ঈসার তিরোধানের পর সেই কেতাবদ্বয়কে ইহুদী ও খৃষ্টানগণ বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে। তৌরাত, ইঞ্জিল বা বাইবেল নামে যাহা বর্তমানে প্রচলিত রহিয়াছে তাহা ইহুদী ও খৃষ্টানদের মনগড়া রচনার সংমিশ্রনে সম্পূর্ণ বিকৃত হইয়া গিয়াছে। অতএব উহার কোনই মূল্য নাই। এই তথ্যই নিম্নে বর্ণিত হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে।

২৭০১। **হাদীছঃ**—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন - ইহুদী-খৃষ্টানদের নিকট (ধর্ম্মীয় কোন বিষয়) তোমরা কিরূপে জিজ্ঞাসা করিতে পার? অথচ তোমাদের আসমানী কেতাব যাহা তোমাদের নবীর প্রতি প্রেরিত হইয়াছে উহা আল্লার প্রেরিত বিষয়াবলীর সর্ব্বাধিক নূতন। এবং তোমরা উহাকে সম্পূর্ণ খাঁটিরূপে পাঠ করিতে পারিতেছ; উহাকে কেহই মিশ্রিত করিতে সক্ষম হয় নাই।

পক্ষান্তরে ইহুদী-খৃষ্টানদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা (পবিত্র কোরআনে) বলিয়া দিয়াছেন, তাহারা আল্লার দেওয়া কেতাবকে পরিবর্ত্তন করিয়াছে, তাহারা নিজ হাতের লেখাকে কেতাবে মিশ্রিত করিয়া উহাকে বিকৃত করিয়াছে। এবং অতি সামান্য দুনিয়ার স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে ঐ পরিবর্ত্তিত ও বিকৃত কেতাবকেই আল্লার কেতাব বলিয়া প্রচার করিয়াছে।

(পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে) যে খাঁটী জ্ঞান তোমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে উহা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নহে—তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করা হইতে? কসম খোদার—তাহাদের একটি লোককেও ত দেখি না, তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতি অবতারিত কেতাব (কোরআন) সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে!

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—এক হাদীছে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সরাসরি সুস্পষ্টরূপে নিষেধ করিয়াছেন—তোমরা ইহুদী-খৃষ্টানদের নিকট (ধর্ম্মীয়) কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিবে না।

এই হাদীছখানা ইমাম বোখারী (রঃ) ছনদহীন রূপে উল্লেখ করিয়াছেন। অন্য কেতাবে ইহা ছনদের সহিত বর্ণিত আছে। (ফতহুলবারী ১৩—২৮৬ দ্রষ্টব্য)

● পরবর্ত্তী এক পরিচ্ছেদে ইমাম বোখারী (রঃ) প্রমাণ করিয়াছেন—ইসলামের বিধান ও শরীয়ত মতে হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিষেধাবলী হারাম হওয়া অর্থে এবং আদেশাবলী ফরজ-ওয়াজেব হওয়া অর্থে পরিগণিত হইবে। অবশ্য যদি সেই অর্থ উদ্দেশ্য না হওয়ার অপর কোন দলীল পাওয়া যায় তবে তাহা স্বতন্ত্র কথা।

● কোরআন-হাদীছকে দৃঢ়রূপে আঁকড়াইয়া থাকার আলোচনা সমাপ্তে সর্ব্বশেষ একটি পরিচ্ছেদে ইমাম বোখারী (রঃ) "আপসে পরামর্শ করা" সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। পরামর্শ করা ইসলামের একটি বিশেষ নীতি। আখেরাতে আল্লার নেয়ামত ও প্রতিদান লাভকারীগণের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে—وامرهم شورى بينهم "তাঁহারা আপসে পরামর্শ করিয়া কাজ করিয়া থাকেন" (২৫ পাঃ ৫ রুঃ)।

এতদ্ভিন্ন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতিও পরামর্শ করার নির্দ্দেশ পবিত্র কোরআনে উল্লেখ রহিয়াছে—وشاورهم فى الامر "কাজ করিতে মোসলমানদের সহিত পরামর্শ করুন।"

ইমাম বোখারী (রঃ) হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত কতিপয় ঘটনার আলোকে দেখাইয়াছেন যে, পরামর্শ করা উত্তম বটে, কিন্তু আল্লাহ বা আল্লার রসুলের সুস্পষ্ট ও সুনির্দ্দিষ্ট আদেশ বা নিষেধ বিদ্যমান থাকার ক্ষেত্রে পরামর্শের কোন অবকাশ থাকিবে না। আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের সিদ্ধান্তকে এড়াইবার অবকাশ কাহারও জন্য নাই।

ওহোদের জেহাদ উপলক্ষে মদিনা শহর হইতে বাহিরে ময়দানে উপস্থিত হওয়া সম্পর্কে রসুলুল্লাহ (দঃ) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর ছাহাবীগণ বিপরীত পরামর্শ দিয়া ছিলেন, কিন্তু রসুল (দঃ) তাহা গ্রহণ করেন নাই।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পরেও ছাহাবা-তাবেয়ীগণের শাসনকর্ত্তাগণ ওলামা-পরিষদের সঙ্গে পরামর্শ করিতেন—এইরূপ ক্ষেত্রের জন্য যাহা সম্পর্কে শরীয়তের আদেশ-নিষেধ নাই। ঐরূপ ক্ষেত্রে জনগণের জন্য সহজ সাধ্য দিক নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে পরামর্শ করা হইত। কিন্তু যেই ক্ষেত্রে কোরআন বা ছুন্নার সুস্পষ্ট বিধান বিদ্যমান—সেইরূপ ক্ষেত্রে উহার ব্যতিক্রম করার কোন উদ্যোগই তাঁহারা গ্রহণ করিতেন না।

খলীফা আবু বকর (রাঃ) যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালইয়া ছিলেন। উহার বিপরীত পরামর্শ দেওয়া হইলে তিনি অভিযানের পক্ষে হাদীছের প্রমাণ পেশ করিয়া উক্ত পরামর্শকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

খলীফা ওমর (রাঃ) আলেমগণের পরামর্শ-পরিষদ গঠন করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু কোরআনের ফয়ছালার উপর তিনি সর্ব্বদা দৃঢ়পদ থাকিতেন।

তৌহিদ বা একত্ববাদ সম্পর্কে ভুল ধারণা খণ্ডন

ইহাই বোখারী শরীফের সর্ব্বশেষ অধ্যায়। তৌহীদ যাহা ইসলাম ও ঈমানের মূল বস্তু উহা সম্পর্কে বিশেষ একটি ভ্রান্ত মতবাদের খণ্ডনই হইল এই অধ্যায়ের একমাত্র উদ্দেশ্য।

জাহ্‌মিয়া নামে ইসলামের দাবীদার একটি ভ্রষ্ট দল ছিল। তাহাদের মতবাদ এই যে, "আল্লাহ" যে একটি সত্তা সেই সত্তাটি শুধুমাত্র সত্তাই বটে—উহার সহিত কোন গুণেরও সম্পর্ক নাই। তাহাদের ধারণা এই যে, ঐ সত্তার সহিত অন্য কোন বস্তুর সম্পর্ক ও সংমিশ্রণ বিশ্বাস করিলে তাহা হইবে শেরক বা অংশীবাদ যাহা তৌহীদ ও একত্ববাদের পরিপন্থী।

তাহাদের ভ্রান্তির মূল হইল, তাহাদের বিশ্বাস– আল্লাহ তায়ালার গুণাবলী আল্লাহ হইতে ভিন্ন জিনিষ; বস্তুতঃ ইহা একেবারেই ভুল। আল্লার গুণাবলী আল্লাহ হইতে ভিন্ন কোন বস্তু নহে। সুতরাং "আল্লাহ" যে সত্তা সেই সত্তায় গুণাবলীর অস্তিত্বে শেরক সাব্যস্ত হইতে পারে না।

ইমাম বোখারী (রঃ) অত্র অধ্যায়ে তাহাদের ভ্রান্ত মতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু উহা খণ্ডনের জন্য যুক্তি-তর্কের আশ্রয় না লইয়া কোরআন-সুন্নার দ্বারা উহা খণ্ডন করিয়াছেন এবং পবিত্র কোরআন হইতে বিভিন্ন উদ্ধৃতি ও বহু সংখ্যক হাদীছের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার বিভিন্ন গুণাবলী প্রমাণ করিয়াছেন। কারণ, তাহারা মোসলমান হওয়ার দাবীদার। সুতরাং তাহাদের ভুল ভাঙ্গাইবার জন্য কোরআন-হাদীছই যথেষ্ট।

এই অধ্যায়ের সর্ব্বশেষ তথা এই পবিত্র গ্রন্থ বোখারী শরীফের সর্ব্বশেষ হাদীছটি এবং আর একটি হাদীছ ব্যতীত অত্র অধ্যায়ের সমুদয় হাদীছেরই অনুবাদ যথাস্থানে হইয়াছে। অতএব, প্রথমে সমগ্র অধ্যায়ের সারমর্ম্ম বর্ণনা করা হইবে, তারপর অননূদিত হাদীছ দুইটির তরজমা করা হইবে।

এই অধ্যায়ে ইমাম বোখারী (রঃ) আল্লাহ তায়ালার তিন প্রকার গুণাবলী সম্পর্কে কোরআন-হাদীছের উদ্ধৃতি পেশ করিয়াছেন। এক প্রকার—যে সব গুণাবলীর উপর আল্লাহ তায়ালার গুণবাচক নাম কোরআন-হাদীছে ব্যবহৃত হইয়াছে। ঐ সব গুণবাচক নামসমূহই ইসলামে "আস্‌মায়ে-হুসনা" বলিয়া প্রসিদ্ধ। পবিত্র কোরআনে আছে, وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا "আল্লার সুন্দর সুন্দর অনেক নাম রহিয়াছে; ঐ সব নামের দ্বারা তোমরা আল্লাহকে ডাক।" আরও আয়াতে আস্‌মায়ে-হুস্‌নার উল্লেখ রহিয়াছে। এই আস্‌মায়ে-হুস্‌না সম্পর্কে ইমাম বোখারী (রঃ) একটি হাদীছও উল্লেখ করিয়াছেন; হাদীছটি ষষ্ঠ খণ্ডের শেষ পৃষ্ঠায় অনূদিত হইয়াছে। উক্ত হাদীছে আস্‌মায়ে-হুস্‌নার সংখ্যা ৯৯ বলা হইয়াছে যাহার নির্দ্ধারণও তিরমিজী শরীফের এক হাদীছে বর্ণিত আছে। ঐ সংখ্যা শুধু কেবল উক্ত হাদীছে বর্ণিত ফজিলত হাসিলের জন্য নির্দ্দিষ্ট। উক্ত হাদীছে বলা হইয়াছে, ঐ ৯৯ নামকে মনে-মুখে সংরক্ষণ ও স্বীয় জীবনে প্রতিফলনকারী বেহেশত লাভের অধিকারী হইবে।

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালার গুণবাচক নাম ৯৯ সংখ্যায় সীমাবদ্ধ নহে। পবিত্র কোরআনেই উক্ত ৯৯ নাম ছাড়া আরও বহু নাম ব্যবহৃত রহিয়াছে। আরও

বর্ণিত আছে যে, তৌরাত কেতাবে আল্লাহ তায়ালা তাঁহার এক হাজার নাম অবতীর্ণ করিয়াছিলেন। (তফছীরে মাজহারী, ৩—৪৯১)

ইমাম বোখারী (রঃ) অত্র অধ্যায়ে এই প্রকার নাম হইতে শুধু দৃষ্টান্ত স্বরূপ কতিপয় নাম উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

(১) আল্লাহ তায়ালা "আহাদ" অর্থাৎ এক—অদ্বিতীয়। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) মোয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ)কে ইয়ামান দেশের শাসনকর্ত্তারূপে প্রেরণ করাকালে বলিয়াছিলেন, ঐ দেশবাসীর প্রতি তোমার সর্ব্বপ্রথম আহ্বান এই হওয়া চাই যে, তাহারা যেন আল্লার একত্বের প্রতি বিশ্বাসী হইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত পবিত্র কোরআনের সুপ্রসিদ্ধ ছুরা এখ্‌লাছ আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদের বর্ণনায় নাযেল হইয়াছে...... قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ "আপনি এই ঘোষণা দিয়া দিন যে, মহান আল্লাহ এক – অদ্বিতীয়। আল্লাহ কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন ; সকলেই তাঁহার মুখাপেক্ষী। তিনি (সৃষ্টিকর্ত্তা বটেন, কিন্তু) জন্ম দেন না এবং (তিনি স্বয়ম্ভু— স্বয়ং সত্তা নিজেই অস্তিত্ববান ; কাহারও হইতে) জনম নেন নাই। তাঁহার সমকক্ষ কেহ হইতে পারে না।"

(২) আল্লাহ তায়ালা "রহমান" তথা অসীম দয়াল। পবিত্র কোরআনে আছে—

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى

"আপনি বলিয়া দিন, আল্লাহ নামেও ডাকিতে পার কিম্বা রহমান নামেও ডাকিতে পার। যে নামেই ডাক উভয় ডাকই শুদ্ধ হইবে ; যেহেতু তাঁহার অনেক (গুণবাচক) নাম রহিয়াছে।"

(৩) আল্লাহ তায়ালা "রাজ্জাক" অর্থাৎ সকল প্রাণীর আহার দাতা।

(৪) আল্লাহ তায়ালা "মতিন" অর্থাৎ মজবুত, শক্ত ও সুদৃঢ় ; তাঁহার অস্তিত্বে বিলুপ্তির সম্ভাবনা বা অবকাশ নাই। পবিত্র কোরআনে আছে—

اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ "একমাত্র আল্লাহই হইলেন সকলের আহার দাতা, শক্তিমান, মজবুত—শক্ত ও সুদৃঢ়।

(৫) আল্লাহ তায়ালা "আলেমুল-গায়ব" অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞানী—এমনকি আমাদের পক্ষে যাহা অদৃশ্য ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির নাগালের বাহিরে তাহাও তিনি পরিজ্ঞাত আছেন। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖ اَحَدًا

আল্লাহ তায়ালাই গায়েবের জ্ঞান রাখেন। অন্য কাহাকেও তাহা জ্ঞাত করেন না, অবশ্য তিনি তাঁহার মনোনীত কোন রসূলকে যতটুকু অবহিত করিতে চাহেন, শুধু ততটুকুই ওহী মারফত অবহিত করেন।"

(৬) আল্লাহ তায়ালা "জাহের" অর্থাৎ তিনি প্রত্যেকটি বস্তুর বাহ্যিক ও প্রকাশ্য অবস্থার অবগতি রাখেন।

(৭) আল্লাহ তায়ালা "বাতেন" অর্থাৎ তিনি প্রত্যেকটি বস্তুর আভ্যন্তরিন ও গোপন অবস্থার অবগতি রাখেন। পবিত্র কোরআনে আছে—

هُوَ الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

অর্থাৎ—"আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেকটি বস্তুর বাহ্যিক ও প্রকাশ্য অবস্থা যেরূপ জানেন তদ্রূপ উহার আভ্যন্তরিক ও গোপন অবস্থাও জানেন এবং তিনি প্রতিটি বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।" এই নামদ্বয়ের ব্যাখ্যা অন্য রকমও করা হয়।

(৮) আল্লাহ তায়ালা "সালাম" অর্থ তিনি সর্ব্বদোষ-ত্রুটিমুক্ত বা তিনি শান্তির আকর।

(৯) আল্লাহ তায়ালা "মোমেন" অর্থ তিনি নিরাপত্তা বিধানকারী। পবিত্র কোরআনের ছুরা হাশরে এই দুই নামেরও উল্লেখ রহিয়াছে।

(১০) আল্লাহ তায়ালা "মালেক" তথা সকল বাদশার বাদশাহ। পবিত্র কোরআনে আছে, مَلِكِ النَّاسِ—বিশ্ব মানবের বাদশার বাদশাহ। হাদীছ শরীফেও বর্ণিত আছে, কেয়ামতের মহাপ্রলয়ে সব কিছুর লয় সাধিত হওয়ার পর আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে ধ্বনিত হইবে—انا الملك اين ملوك الارض এখন প্রকাশ হইয়া গেল, একমাত্র আমিই বাদশাহ; দুনিয়ার বাদশাহগণ এখন কোথায়?

(১১) আল্লাহ তায়ালা "আজীজ" তথা মহান।

(১২) আল্লাহ তায়ালা "হাকীম" তথা হেক্‌মতওয়ালা—সুদক্ষ ও সুকৌশলী। পবিত্র কোরআনে আছে, وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ "আল্লাহ তায়ালাই হইলেন মহান ও হেক্‌মতওয়ালা।

(১৩) আল্লাহ তায়ালা "হক" তথা বাস্তব। অস্তিত্বের দিক দিয়া একমাত্র আল্লার অস্তিত্বই প্রকৃত অস্তিত্ব। কারণ তিনি নিজেই অস্তিত্ববান স্বয়ম্ভু তাঁহার

অস্তিত্ব অন্যের প্রদত্ত নহে, অন্যের উপর নির্ভরশীলও নহে; তাই তাঁহার অস্তিত্ব চিরাগত ও অনাদি-অনন্ত। এতদ্ভিন্ন তাঁহার অস্তিত্ব অকাট্য; সংশয় ও সন্দেহের অবকাশ উহাতে নাই। উপাস্য হওয়ার দিক দিয়াও বাস্তব ও প্রকৃত (Real) তিনিই; অন্যান্য যাহাদের পূজা করা হয়, তাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে পূজনীয় নহে—তাহারা পূজনীয় হইতেও পারে না।

হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) গভীর রাত্রে তাহাজ্জোদের জন্য ঘুম হইতে উঠিয়া একটি সুদীর্ঘ দোয়া পাড়িতেন। সেই দোয়া হইতে ইমাম বোখারী (রঃ) একটি বাক্যের উদ্ধৃতি দিয়া আলোচ্য বিষয়ের প্রমাণ দেখাইয়াছেন। বাক্যটি এই—أَنْتَ الْحَقُّ হে আল্লাহ! তুমি সত্য ও বাস্তব—প্রকৃত প্রস্তাবে অস্তিত্ববান একমাত্র তুমিই; তোমার অস্তিত্বে এবং বাস্তবতায় সংশয়-সন্দেহের অবকাশই নাই।

(১৪) আল্লাহ তায়ালা "ছামী —سَمِيعٌ" সব কিছু শোনেন। তাঁহার শ্রবণশক্তি সর্ব্বব্যাপী ও অসীম এবং চিরাগত ও অনাদি-অনন্ত।

(১৫) আল্লাহ তায়ালা "বাছীর" সব কিছু দেখেন। তাঁহার দর্শনশক্তি সর্ব্বব্যাপী ও অসীম এবং চিরাগত ও অনাদি-অনন্ত।

এক হাদীছে বর্ণিত আছে—আল্লাহ তায়ালাকে ডাকিতে বা আল্লার গুণগান করিতে কিম্বা আল্লার নিকট দোয়া করিতে উচ্চ স্বরের বা চিৎকারের প্রয়োজন নাই। এই কথা বুঝাইতে যাইয়া হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, তোমরা যাঁহাকে ডাক (অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা) তিনি বধির নন, অনুপস্থিত দুরবর্ত্তীও নন। তিনি سَمِيعٌ وَبَصِيرٌ সব কিছু শোনেন, সব কিছু দেখেন এবং তিনি তোমাদের নিকটবর্ত্তী।

এতদ্ভিন্ন ইমাম বোখারী (রঃ) আরও একটি সূক্ষ্ম প্রমাণের ইঙ্গিত দান করিয়াছেন। তাহা এই যে, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্ত্তৃক শিক্ষা দেওয়া অসংখ্য দোয়ার মধ্যে বন্দার তরফ হইতে আল্লাহ তায়ালার প্রতি সম্বোধনের ভাষা ব্যবহার করা হইয়াছে; অথচ আল্লাহ তায়ালা যদি বন্দার ডাক ও দোয়া না শোনেন তবে সম্বোধনের কোন অর্থ হয় না।

(১৬) আল্লাহ তায়ালা "ক্বাদের" তথা ক্ষমতাবান ও শক্তিমান—তিনি যখন যাহা ইচ্ছা করেন উহাই কার্য্যে পরিণত করার শক্তি ও ক্ষমতা রাখেন; কাহারও জন্য উহাকে প্রতিরোধ করার অবকাশই থাকে না।

পবিত্র কোরআনে এই ছেফৎ বা গুণটির বর্ণনায় অনেক আয়াতই বিদ্যমান রহিয়াছে। যথা—قُلْ هُوَ الْقَادِرُ "আপনি বলিয়া দিন, নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিমান ও ক্ষমতাবান।"

(১৭) আল্লাহ তায়ালা "মোকাল্লেবুল-কুলূব" তথা সকলেরই মনের গতি পরিচালনকারী। অর্থাৎ প্রত্যেকটি জীবের গতিবিধি ও কার্য্যকলাপ তাহার অন্তর বা মনের যেই ইচ্ছা ও খেয়াল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় সেই ইচ্ছা ও খেয়ালের জন্মদাতা, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনকারী হইলেন আল্লাহ তায়ালা। তিনি যখন যাহার মনের গতি যেরূপ করিতে চান করিয়া দেন। পবিত্র কোরআনে এই গুণটির উল্লেখ রহিয়াছে।

গোঁড়া ও হঠকারী কাফেরদের প্রতি আল্লাহ তাঁহার অভিশাপরূপে বলিয়াছেন,

وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ

"ঐ কাফেরদের দৃষ্টির এবং অন্তরের গতি আমি ফিরাইয়া রাখিব যেরূপ তাহারা আমার কোরআন আগমনের আরম্ভে উহার প্রতি ঈমান গ্রহণ করে নাই। আর আমি তাহাদিগকে তাহাদের ঔদ্ধত্যতায় উদভ্রান্ত থাকিতে দিব।"

হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) অঙ্গীকারোক্তি ক্ষেত্রে দৃঢ়তা প্রকাশার্থে শপথ করিলে আল্লাহ তায়ালার বিশেষভাবে এই গুণবাচক নামটি উল্লেখ করতঃ বলিতেন—لا ومقلب القلوب "অন্তরের গতি পরিবর্ত্তন কারীর শপথ—এরূপ নহে।"

(১৮) আল্লাহ তায়ালা "খালেক" অর্থাৎ স্রষ্টা ও নির্মাতা।

১৯) আল্লাহ তায়ালা "বারী" অর্থাৎ নির্মিতকে নিখুঁত পর্য্যায়ে আনয়নকারী।

(২০) আল্লাহ তায়ালা "মোছাওয়্যের" অর্থাৎ ছুরত, গঠন বা আকৃতি ও রূপ দানকারী। পবিত্র কোরআনে আছে, هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ

"তিনি (আল্লাহই) সৃজনকর্ত্তা, নিখুঁতরূপ দানকারী এবং গঠন ও আকৃতি প্রদানকারী।"

আল্লাহ তায়ালার উল্লেখিত তিনটি গুণ পরস্পর অতি নিকটবর্ত্তী, কিন্তু ধারাবাহিক। উক্ত পর্য্যায়ত্রয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন তিনটি গুণবাচক নামের তাৎপর্য্যে একটি সরল কথা এই যে, আমরা দেখি—মানবীয় শিল্প বা কল-কারখানার উৎপাদনে একটি উৎপন্ন বস্তু এক হাতে প্রস্তুত হয়, অপর হাতে ঘষিত ও মাজিত হইয়া নিখুঁত হয়, আর এক হাতে পূর্ণ গঠন ও আকৃতি লাভ করে। পক্ষান্তরে আল্লাহ তায়ালার কুদরতের কারখানায় প্রত্যেকটি স্তরের কর্ম্মকর্ত্তা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই। এক আল্লাহ সৃষ্টিকর্ত্তা "খালেক", নিখুঁতকারক "বারী", গঠন ও আকৃতি দানকারী "মোছাওয়্যের"।

স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, মানুষের নির্ম্মাণ-কার্য্যে উল্লেখিত পর্য্যায়ত্রয় পরস্পর কর্ম-বেশ সময় সাপেক্ষ। পক্ষান্তরে আল্লাহ তায়ালার সৃজন-কার্য্যে উক্ত পর্য্যায়ত্রয়ের জন্য সময় সাপেক্ষতার প্রয়োজন মোটেই নাই। আল্লাহ তায়ালার সৃজন-কার্য্যে সমুদয় পর্য্যায়ের সমষ্টি মুহূর্ত্তে সাধিত হইতে পারে—উহাতে সময়ের প্রয়োজন হয় না।

অত্র অধ্যায়ে বর্ণিত উদ্ধৃতি সমূহের দ্বিতীয় প্রকার গুণাবলী হইল—যাহা আসমায়ে-হুসনা ছাড়া। অর্থাৎ উহার উপর আল্লাহ তায়ালার গুণবাচক নাম ব্যবহৃত নাই; পরন্তু ঐ সব গুণাবলী মোতাশাবেহাতের মধ্যে শামিল। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে কোরআন-হাদীছে ব্যবহৃত এমন সব শব্দাবলী যাহার সাধারণ অর্থ অত্যন্ত সরল, কিন্তু নিরাকার নিরাধার অসীম অতুলন মহামহিম আল্লাহ তায়ালার বেলায় সেই সব শব্দের প্রচলিত অর্থ উদ্দেশ্য হওয়া সম্ভবই নহে। আর আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে উহার অর্থের স্থির তাৎপর্য্য ও সুষ্ঠু ব্যাখা আমাদের ব্যুৎপত্তির নাগালের বাহিরে। এই শ্রেণীর সাতটি গুণাবলীর উদ্ধৃতি অত্র অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

মোতাশাবেহাত সম্পর্কে পবিত্র কোরআন ছুরা আল-এমরানের প্রারম্ভে দুইটি কথা সুস্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে। উহার প্রতি প্রত্যেক মোমেন-মোসলমানের সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। একটি কথা হইল—যাহারা মোতাশাবেহাতের ব্যাখ্যার পেছনে পড়ে এবং উহাতে মাথা ঘামায় তাহারা ভ্রষ্ট। দ্বিতীয় কথা হইল—মোতাশাবেহাত শ্রেণীর যাহা কিছু কোরআন-হাদীছে উল্লেখ আছে ঐ সবের যথার্থতায় পূর্ণ বিশ্বাস ও দৃঢ় ঈমানের উপর ক্ষান্ত হওয়াই জ্ঞান-বুদ্ধির পরিচয়।

( ) আল্লাহ তায়ালার "ওয়াজ্‌হ্"। পবিত্র কোরআনে আছে—

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ "আল্লার ওয়াজহ্ ব্যতীত অন্য সব কিছুই লয়শীল"।

হাদীছ শরীফে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একটি দোয়ায় একাধিক বার বলিয়াছেন, أَعُوذُ بِوَجْهِكَ "হে আল্লাহ! আমি তোমার ওয়াজহ্-এর আশ্রয় চাই।" "ওয়াজহ্" শব্দের আভিধানিক অর্থ চেহারা।

(২) আল্লাহ তায়ালার "আ'ঈন"। পবিত্র কোরআনে আছে—আল্লাহ তায়ালা মূছা আলাইহেচ্ছালামের প্রতি স্বীয় করুণা বিকাশে বলিয়াছেন, وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي "আমার আ'ঈনের ছায়ায় আপনাকে গড়িয়া তোলা হইবে।" আল্লাহ তায়ালা হযরত নূহ আলাইহেচ্ছালামের নৌকা বা জাহাজ সম্পর্কে বলিয়াছেন—

تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا "আমার আ'ঈনের ছায়ায় উহা চলিতে লাগিল।" আ'ঈন শব্দের আভিধানিক অর্থ চক্ষু।

(৩) আল্লাহ তায়ালার "য়্যাদ"। পবিত্র কোরআনে আছে—ইবলিস হযরত আদম (আঃ)কে সেজদা করার আদেশ অমান্য করিলে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে ভৎর্সনা পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন— مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ "আমার য়্যাদদ্বয়ে যাঁহাকে পয়দা করিয়াছি তাঁহাকে সেজদা করিতে তোর জন্য কি বাধা ছিল?" এতদ্ভিন্ন বোখারী (রঃ) একটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন যাহাতে আল্লাহ তায়ালার "য়্যাদ" উল্লেখ আছে। "য়্যাদ" শব্দের আভিধানিক অর্থ হাত।

(৪) আল্লাহ তায়ালার "য়্যামীন"। হাদীছ শরীফে আল্লাহ তায়ালার "য়্যামীন" উল্লেখ আছে। "য়্যামীন" শব্দের আভিধানিক অর্থ দক্ষিণ হস্ত।

(৫) আল্লাহ তায়ালার "এছ্‌বা"। এ স্থানে বর্ণিত একটি হাদীছে আল্লাহ তায়ালার এছ্‌বা' উল্লেখ আছে। এছ্‌বা' শব্দের আভিধানিক অর্থ আঙ্গুল।

(৬) আল্লাহ তায়ালার "সাক্‌"। ইমাম বোখারী (রঃ) একটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন উহাতে আল্লাহ তায়ালার "সাক্‌" উল্লেখ আছে। পবিত্র কোরআন ২০ পারা ছুরা কলমেও ইহার উল্লেখ রহিয়াছে। "সাক্‌" শব্দের আভিধানিক অর্থ পায়ের গোছা বা নালা তথা গোড়ালির উপরের অংশ।

(৭) আল্লাহ তায়ালার "ক্বদম"। ১১১০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত একটি হাদীছে আল্লাহ তায়ালার "ক্বদম" উল্লেখ আছে। "ক্বদম" শব্দের আভিধানিক অর্থ পা।

প্রিয় পাঠক! উল্লেখিত সাতটি শব্দ কোরআন-হাদীছে আল্লাহ তায়ালার জন্য ব্যবহৃত আছে। এই শব্দ সমূহের অর্থও অতি সরল ও সুস্পষ্ট, কিন্তু ঈমান ও ইসলামের অপরিহার্য্য আকিদা ও অকাট্য মতবাদ এই যে, এই সব শব্দের যে অর্থ সচরাচর আমরা বুঝি ও দেখি; নিরাকার নিরাধার মহামহিম আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে ঐ অর্থ কস্মিনকালেও উদ্দেশ্য হইতে পারে না। এতদকারণে এই শব্দাবলীর তাৎপর্য্য সম্পর্কে ইমামগণের দুই রকম ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। একটি হইল—ঐ সব মূল শব্দের বা উহা সম্বলিত বাক্যের রূপক-অর্থ কিম্বা উপঅর্থ ধরা হয়। আর এক ব্যাখ্যা—এই সব শব্দের রূপক-অর্থ, উপঅর্থ ইত্যাদি কোন প্রকার অর্থ না হাতড়াইয়া শুধু কেবল এই আকিদা ও বিশ্বাস স্থাপন করিবে যে, উক্ত শব্দাবলীর যে অর্থ ও উদ্দেশ্য আমাদের জ্ঞানে ও দৃষ্টির গোচরে রহিয়াছে আল্লাহ তায়ালার মহান সত্তার সহিত উহার আদৌ কোন সম্পর্ক নাই; বরং এই সব শব্দাবলীর দ্বারা আল্লাহ তায়ালার এমন বিভিন্ন গুণ বা ছেফৎ উদ্দেশ্য যাহা সেই মহান সত্তার উপযোগী।

উল্লেখিত সাতটি শব্দ সবই সাধারণ ও সচরাচর অর্থে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বুঝাইয়া থাকে। সেই প্রচলিত অর্থ আল্লাহ তায়ালার বেলায় উদ্দেশ্য হওয়ার সম্ভাবনা নাই। অবশ্য কোরআন-হাদীছে উহার উল্লেখ থাকায় উপরোল্লেখিত কোন একটি ব্যাখ্যার মাধ্যমে আল্লার নামের সহিত সম্পৃক্ত হইবে। এই প্রসংঙ্গে ইমাম বোখারী (রঃ) আরও কতিপয় ব্যবহারিক বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—

[ক] কতিপয় বিশেষ্যপদ যাহা সাধারণভাবে সৃষ্টের জন্য ব্যবহৃত, কিন্তু কোরআন-হাদীছে আল্লাহ তায়ালার জন্যও ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন— ذَاتٌ অর্থ "সত্তা"। এক হাদীছে এই শব্দটি আল্লাহ তায়ালাকে উদ্দেশ্য করিয়া উল্লেখ হইয়াছে। তদ্রূপ نفس অর্থ "নিজ"। পবিত্র কোরআনে আছে, وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ "আল্লাহ তোমাদিগকে সতর্ক করিতেছেন তাঁহার নিজ হইতে।" এক হাদীছে আছে, আল্লাহ তায়ালা সৃষ্ট-জগৎকে সৃষ্টি করার পর— كَتَبَ فِىْ كِتَابِهٖ وَهُوَ يَكْتُبُ عَلٰى نَفْسِهٖ "নিজের উপর লিখিতে যাইয়া স্বীয় লিপিতে লিখিয়াছেন—আমার গজব অপেক্ষা আমার রহমত বেশী হইবে। উক্ত লিপিখানা আরশের উপর রক্ষিত রহিয়াছে।" এতদ্ভিন্ন ইমাম বোখারী (রঃ) পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াতের ইঙ্গিতে প্রমাণ করিয়াছেন, شَىْءٌ (অর্থ "বস্তু") শব্দও আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে বলা যায়।

[খ] আল্লাহ তায়ালা নিরাকার নিরাধার বিধায় তিনি অবশ্যই দিক-মুক্ত তিনি দিকের সহিত সীমাবদ্ধ নহেন। এতদসত্ত্বেও "দিক" বোধক অব্যয়পদ আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে কোরআন-হাদীছে ব্যবহৃত আছে। যেমন— اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ "(কালেমা-তায়্যেবাহ—আল্লার জিকির ও দোওয়া ইত্যাদি) সুবাক্য সমূহ আল্লার দিকে উত্থিত হয়।" অপর এক হাদীছে আছে, একমাত্র হালাল মালের দান-খয়রাতই আল্লার দিকে উত্থিত হইয়া থাকে।

পবিত্র কোরআনে আরও আছে— وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ অর্থাৎ—নেককারদের চেহারা কেয়ামতের দিন আনন্দিত ও উৎফুল্ল হইবে, স্বীয় প্রভু-পরওয়ারদেগারের দিকে তাকাইবার ও দৃষ্টিপাতের সৌভাগ্য লাভকারী হইবে।

আল্লাহ তায়ালা নিরাকার নিরাধার ও দিক-মুক্ত। এতদসত্ত্বেও কেয়ামতের দিন নেককারগণ আল্লাহ তায়ালাকে সুস্পষ্টরূপে তৃপ্তির সহিত দেখিতে পাইবেন। আলোচ্য আয়াতের মর্ম্ম ইহাই এবং এই মর্ম্মে বহু হাদীছও বর্ণিত রহিয়াছে। এ সম্পর্কে কোন প্রকার দ্বিধা বোধ করা ঈমান ও ইস্‌লাম পরিপন্থী।

[গ] কোন কোন ক্রিয়াপদ যাহার অর্থ শুধু শরীরী ও দেহধারী বস্তুর জন্যই খাপ খায়, কিন্তু কোরআন-হাদীছে উহা আল্লাহ তায়ালার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন—اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى

اسْتَوٰى "ইস্‌তাওয়া" অর্থ উপবেশন ও আসন গ্রহণ করিয়াছেন। আয়াতের অর্থ হয়—দয়াল প্রভু আরশের উপর উপবেশন করিয়া আছেন। এইরূপ আয়াত পবিত্র কোরআন—৮, ১১ ও ১৬ পারায় আছে। আর এক হাদীছে আছে—

يَنْزِلُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى كُلَّ لَيْلَةٍ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا......

يَنْزِلُ "য়্যান্‌যেলু" অর্থ অবতরণ করিয়া থাকেন। তাই হাদীছের অর্থ—প্রতি রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশে আলীশান প্রভু-পরওয়ারদেগার সর্ব্বনিম্ন আকাশে অবতরণ করেন…। হাদীছখানা অত্র গ্রন্থের ষষ্ঠ খণ্ডে অনূদিত হইয়াছে।

উপবেশন তথা আসন গ্রহণ করা এবং অবতরণ করা—এই সব ক্রিয়াপদের যে অর্থ ও রূপ মানবীয় ধ্যান-ধারণায় রহিয়াছে তাহা একমাত্র শরীরী ও দেহধারী বস্তুর সহিত খাপ খাইতে পারে। আর শরীর ও দেহ ত সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য; সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালা এই সবের ঊর্দ্ধে—নিরাকার নিরাধার। অতএব আল্লাহ তায়ালার বেলায় এই শ্রেণীর ক্রিয়াপদের তাৎপর্য্যে পূর্ব্বাপর ইমামগণের দুই প্রকার ব্যাখ্যা দেখা যায়। এক হইল—ঐ শ্রেণীর ক্রিয়াপদের বাক্যকে কোন সংগতিপূর্ণ রূপক-অর্থে বা উপঅর্থে গ্রহণ করা। যেমন, عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى বাক্যের মর্ম্ম এই বলা হয় যে, সমস্ত সৃষ্ট জগৎ পরিচালন-ব্যবস্থায় আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে যত (Circular—) আদেশ-নিষেধ, ফরমান বা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয় ঐ সবের (Circulaton—) প্রচার ও ঘোষনা হয় আরশ হইতে। সৃষ্ট জগতের নিয়ন্ত্রণকারী এবং উহার প্রতিপালন ও পরিচালনকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালার ফরমান সমূহের ঘোষণা ও প্রচার যেহেতু আরশ হইতে হইয়া থাকে, তাই রূপকভাবে বলা হইয়াছে—আরশ যেন আল্লাহ তায়ালার উপবেশন-স্থল। কিম্বা যেরূপ উপঅর্থ হিসাবে বলা হয় সলীম কলীমের উপর সওয়ার হইয়া আছে—এস্থলে সওয়ার হওয়ার প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য নহে, বরং উপঅর্থ উদ্দেশ্য যে, কলীম সম্পুর্ণরূপে সলীমের অধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন। উক্ত আয়াতের মধ্যেও "اسْتَوٰى" উপবেশনের তদ্রূপ উপঅর্থই উদ্দেশ্য। সমুদয় সৃষ্টের মধ্যে সবচেয়ে বড় ও সকলের উপরের বস্তু হইল আরশ। সেই আরশকে সম্পুর্ণরূপে মহামহিম আল্লাহ তায়ালার অধীনস্থ

ও নিয়ন্ত্রণাধীন বলা হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা সমুদয় জগৎকে আল্লাহ তায়ালার অধীনস্থ ও নিয়ন্ত্রণাধীন বুঝান হইয়াছে। এই ভাবেই আল্লাহ তায়ালার অবতরণ করার রূপক-অর্থ যথা—আল্লাহ তায়ালার বিশেষ (Special) দৃষ্টিপাত উদ্দেশ্য। কিম্বা উহার উপঅর্থ, যথা—আল্লাহ তায়ালার বিশেষ রহমত অবতরণ উদ্দেশ্য।

আলোচ্য ক্রিয়াপদ সমূহের দ্বিতীয় ব্যাখ্যা যাহা অধিকাংশ ইমামগণের অভিমত, তাহা এই যে, এই সব ক্রিয়াপদের শাব্দিক অর্থ যাহা সকলের জানা তাহাই, কিন্তু সেই অর্থ বাস্তবায়নের আকার-আকৃতি ও রূপ আমাদের ধ্যান-ধারণায় ও গোচরে যাহা রহিয়াছে তাহা আল্লাহ তায়ালার বেলায় মোটেই উদ্দেশ্য নহে। বরং আল্লাহ তায়ালার নিরাকার, নিরাধার, অতুলন, অসীম ইত্যাদি গুণাবলীর সংগতি ও সামঞ্জস্যে উহার বাস্তবায়ন যাহা হইতে পারে তাহাই উদ্দেশ্য—উহা আমাদের বিদিতও নহে বোধগম্যও নহে, কিন্তু উহার যথার্থতার প্রতি পূর্ণ পাকা-পোক্তা ঈমান আমাদের রহিয়াছে।

এক ব্যক্তি الرحمن على العرش استوى আয়াতের বাহ্যিক অর্থের বিভ্রান্তি ছড়াইবার উদ্দেশ্যে স্বনামধন্য ইমাম মালেক (রঃ)কে প্রশ্ন করিলে তদুত্তরে তিনি অতি সুন্দর ও সুস্পষ্ট উত্তর করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, "الاستواء উপবেশন" —ইহার অর্থ অজানা নহে, (আল্লাহ তায়ালার বেলায়) ইহার প্রকৃত অবস্থা বোধগম্য নহে, উহার যথার্থতায় ঈমান রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য; ইহা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ ও হাতড়ানি বেদয়া'ৎ বা ভ্রষ্টতা—এই বলিয়া প্রশ্নকারীকে তাড়াইয়া দিলেন। (তফছীরে মাজহারী ৩—৪০৬)

উল্লেখিত শ্রেণীর ক্রিয়াপদও মোতাশাবেহাতের অন্তর্ভুক্ত। মোতাশাবেহাত সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে যে সতর্কবাণী আছে উহার প্রতি লক্ষ্য রাখিবে।

অত্র অধ্যায়ে বর্ণিত উদ্ধৃতি সমূহের তৃতীয় প্রকার গুণাবলী হইল—যাহা আসমায়ে-হুসনার মধ্যে নাই, অর্থাৎ উহার উপর আল্লাহ তায়ালার কোন গুণবাচক নাম ব্যবহৃত নাই, কিন্তু উহা মোতাশাবেহাত ভুক্তও নহে; যথা—

(১) "ছিফতে-তাক্ওয়ীন্" অর্থাৎ অস্তিত্ব দান-ক্ষমতা। এই গুণটির বহিঃপ্রকাশই হইল খালেক, বারী, মোছাওয়্যের ইত্যাদি বহু গুণাবলী। এই গুণটিরই বিকাশ-সূত্র হইল আল্লাহ তায়ালার আদেশ-বাণী "كن কুন্"—হইয়া যাও। পবিত্র কোরআনে এই বিষয়টির উল্লেখ বিভিন্ন স্থানে রহিয়াছে। যথা—ছুরা নহল, ৫ রুকু; আল্লাহ তায়ালা বলেন—

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ -

"আমি যখন কোন বস্তুর হওয়া ইচ্ছা করি তখন আমার আদেশ-বাণী "কুন্"-এর সঙ্গে সঙ্গেই উহা হইয়া যায়।" ছুরা ইয়াছীনে আছে—

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

"আল্লাহ তায়ালা যখন কোন বস্তুর হওয়া ইচ্ছা করেন তখন কেবল মাত্র তাঁহার আদেশ-বাণী "কুন্"-এর সঙ্গে সঙ্গেই উহা হইয়া যায়।" এমনকি আল্লাহ তায়ালার আদেশ-বাণীর সম্মুখে কোন বস্তুর অস্তিত্ব কোন প্রকার উপাদান উপকরণের অপেক্ষা করে না এবং উহার উপর নির্ভরও করে না। আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি-কাজ উপাদান উপকরণের মাধ্যমেও হয় বটে, কিন্তু উহার উপর নির্ভরশীল নহে। যেমন আল্লাহ তায়ালা রূহ্ বা আত্মাকে কোন উপাদান উপকরণ ব্যতিরেকে শুধু স্বীয় আদেশ দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন। পবিত্র কোরআনে আছে—

يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى -

"লোকেরা আপনাকে রূহ্ বা আত্মা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে; আপনি বলিয়া দিন, রূহ্ বা আত্মা আমার প্রভুর শুধু আদেশে সৃষ্ট বস্তু। তোমাদিগকে ত জ্ঞানের সামান্য বিন্দুই দান করা হইয়াছে।" (উপাদান উপকরণ ব্যতীত সৃষ্টি করা তোমাদের অনুভূত না-ও হইতে পারে।) (১৫ পারা, ১০ রুকু)

প্রাথমিক পর্য্যায়ের সমুদয় সৃষ্টি, এমনকি সকল শ্রেণীর উপাদান উপকরণ সমূহ শুধু আল্লাহ তালালার আদেশ-বাণীতেই সৃষ্ট।

(২) "মাশ্য়্যাত ও এরাদা" অর্থাৎ ইচ্ছা-ক্ষমতা। বহু আয়াত ও হাদীছে এই গুণটির উল্লেখ রহিয়াছে। যথা—

تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ
تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ

"হে আল্লাহ! তুমি যাহাকে ইচ্ছা কর রাজত্ব দিয়া থাক এবং যাহার হইতে ইচ্ছা কর রাজত্ব ছিনাইয়া লও। আর যাহাকে ইচ্ছা কর সম্মান দিয়া থাক এবং যাহাকে ইচ্ছা কর অপমান কর।"

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّى فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ

অর্থাৎ—কোন কাজ সম্পর্কে কস্মিনকালেও বলিও না যে, আমি আগামী কাল নিশ্চয় হই৷ করিবই ; হাঁ -এরূপ বল যে, আল্লার ইচ্ছা হইলে (আমি করিব)।

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

"আপনি হেদায়েত দিতে পারেন না যাহাকে ভালবাসেন, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা হেদায়েত দিতে পারেন যাহাকে ইচ্ছা করেন।"

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য সহজ সরল পন্থা চাহেন, তোমাদের জন্য কঠিন পন্থা চাহেন না।

(৩) "ছিফতে-কালাম" অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা মোতাকাল্লেম—বাকপতি। অবশ্য আল্লার কালাম তথা বাণী ও কথা আল্লাহ তায়ালার নিরাকার নিরাধার অতুলন সত্তার সহিত সংগতিপূর্ণ ও সামঞ্জস্য রক্ষাকারী। আমাদের শ্রবণে ও ধ্যান-ধারণায় বাণী ও কথার যে রূপ ও আকার রহিয়াছে আল্লার কালাম উহার উর্দ্ধে।

আল্লাহ তায়ালার কালাম সম্পর্কে বোখারী (রঃ) বিভিন্ন উদ্ধৃতি দিয়াছেন।

(১) قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ......

"আপনি বলিয়া দিন, আমার প্রভু-পরওয়ারদেগারের কালাম লিখার জন্য যদি সমুদ্র কালি হয়, তবে নিশ্চয় সমুদ্র নিঃশেষ হইয়া যাইবে ; প্রভু-পরওয়ারদেগারের কালাম শেষ হইবে না—যদিও আমরা উপস্থিত করি অতিরিক্ত আরও সমুদ্র।"

(১৬ পারা ছুরা কাহাফ)

এই বিষয়েরই আরও একটি আয়াত আছে—

وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ...

"সারা জগতের বৃক্ষগুলি যদি কলম হয় এবং এক সমুদ্রের সহিত অতিরিক্ত সাত সমূদ্র যোগ (করিয়া কালি তৈরী) করা হয় (এবং সেই সব কলম ও কালি দ্বারা আল্লার কালাম লেখার প্রয়াস পাওয়া যায়, তবে এতসব কালি-কলমও নিঃশেষ হইয়া যাইবে, কিন্তু) আল্লার কালাম শেষ হইবে না।

অর্থাৎ—আল্লাহ তায়ালা যদি স্বীয় মহত্ব, মহিমা, শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরবের এবং তাঁহার গুণাবলীর ও জ্ঞান ভাণ্ডারের বিবরণ দান করিতে থাকেন (যেরূপ আসমানী

কেতাবসমূহে কিছু কিছু রহিয়াছে।) তবে জগৎ-জোরা বৃক্ষগুলিকে কলম বানাইয়া এবং অতিরিক্ত অসংখ্য সমুদ্র সহ সমুদয় সমুদ্রকে কালি বানাইয়া লিখিতে থাকিলে ঐ সমস্ত কলম ও কালি সব নিঃশেষ হইয়া যাইবে, কিন্তু আল্লার কালাম ও বর্ণনা শেষ হইবে না! (তফছীর ইবনে কাছীর ২—৫৫১)

(২) বিভিন্ন হাদীছ দ্বারা বোখারী (রঃ) ফেরেশতাদের সঙ্গে বিশেষতঃ জিব্রাঈল আলাইহেচ্ছালামের সঙ্গে আল্লাহ তায়ালার কালাম প্রমাণ করিয়াছেন।

(৩) কতিপয় হাদীছ দ্বারা ইমাম বোখারী (রঃ) প্রমাণ করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন নবীদের সঙ্গে আল্লাহ তায়ালার কালাম হইবে।

(৪) ইহজগতেই আল্লাহ তায়ালা হযরত মূছা আলাইহেচ্ছালামের সঙ্গে কালাম করিয়াছেন বলিয়া পবিত্র কোরআনে স্পষ্ট বর্ণনা রহিয়াছে।

وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوسٰى تَكْلِيْمًا "আল্লাহ তায়ালা মূছা আলাইহেচ্ছালামের সঙ্গে প্রকৃত প্রস্তাবে এবং বাস্তবিক পক্ষেই কালাম করিয়াছেন।" একাধিক হাদীছেও এই বিষয়ের উল্লেখ রহিয়াছে।

(৫) আল্লাহ তায়ালা বেহেশতবাসীদের সঙ্গে কালাম করিবেন। সেই কালামের বিভিন্ন বর্ণনাও বিভিন্ন হাদীছে বর্ণিত রহিয়াছে।

(৬) ধরাপৃষ্ঠে আমাদের সম্মুখেও পবিত্র কোরআনরূপে আল্লাহ তায়ালার কালাম বিদ্যমান রহিয়াছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—আল্লার সত্তা নিরাকার; বস্তুতঃ আল্লার গুণাবলীও তদ্রূপ নিরাকার—তথা মানবীয় জ্ঞান-বোধের ধরা-ছোঁয়ার উর্দ্ধে। এই তথ্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া দুই শ্রেণীর লোক গোমরাহ্ ও ভ্রষ্ট হইয়াছে। এক শ্রেণীর মধ্যে রহিয়াছে জাহ্‌মিয়া ফের্কা—যাহারা আল্লার সমুদয় গুণাবলীকে অস্বীকার করিয়াছে এবং আল্লাহ তায়ালার সত্তাকে সব রকম গুণাবলী-শূন্য ধরিয়া লইয়াছে। মো'তাজেলা ফের্কাও যে পেঁচের কথা বলে তাহা আল্লাহ তায়ালার ছেফৎ বা গুণাবলী অস্বীকার করারই নামান্তর। তদুপরি তাহারা আল্লাহ তায়ালার ছেফতে-কালামকে সরাসরি অস্বীকারই করিয়াছে।

আর এক শ্রেণী—যাহারা কোরআন-হাদীছে উল্লেখিত আল্লার গুণাবলী বর্ণনার শব্দ সমূহকে উহার সাধারণ অর্থে এবং সেই অর্থের প্রচলিত রূপ ও আকারকেই আল্লার বেলায়ও স্থির করিয়া আল্লাহকে শরীরী ও দেহধারী সাব্যস্ত করিয়াছে।

কোরআন-সুন্নার আদর্শবাদী ইমামগণ উভয় শ্রেণীর ভ্রষ্ট ফের্কার বিরুদ্ধে এই আকিদা ও মতবাদ সাব্যস্ত করিয়াছেন যে, আল্লার গুণাবলী নিশ্চয়ই আছে।

আল্লাহ গুণাবলী-শূন্য নহেন। আর কোরআন-হাদীছের মাধ্যমে আল্লার যে সব গুণাবলীর অবগতি লাভ হইয়াছে, যেমন—আল্লাহ তায়ালার শ্রবণ, আল্লাহ তায়ালার দর্শন, আল্লাহ তায়ালার কালাম; এই সব গুণাবলী যে সব শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত হইয়াছে ঐ শব্দসমূহের প্রচলিত অর্থের সাধারণ রূপ এবং উহা বাস্তবায়িত হওয়ার আকার-আকৃতি শরীরী ও দেহধারীর বৈশিষ্ট্য বটে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালার বেলায় ঐ সব শব্দের মাধ্যমে শুধু মূল গুণাবলীই উদ্দেশ্য; ঐ সবের সাধারণ রূপ ও প্রচলিত আকার-আকৃতি মোটেই উদ্দেশ্য নহে।

যেমন, سمع—শ্রবণ, بصر—দর্শন ইহা মানবীয়, বরং সৃষ্ট জীবের গুণও বটে এবং আল্লাহ তায়ালার গুণরূপেও কোরআন-হাদীছে উল্লেখ আছে। কিন্তু উভয়ের سمع—শ্রবণের ও بصر—দর্শনের মধ্যে ঐ ব্যবধানই আছে যে ব্যবধান সৃষ্ট ও স্রষ্টার মধ্যে রহিয়াছে। আল্লার সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে চুড়ান্ত কথা এই—

اے برتر از خیال وقیاس وگمان و وہم
وز ہرچہ گفتہ اند شنیدہ ایم وخواندہ ایم

"হে খোদা! তুমি অতি মহান ও অতি ঊর্দ্ধে—আমাদের চিন্তা, অনুমান, ধারণা ও কল্পনা হইতে। যে যাহা কিছু বলিয়াছে, যাহা কিছু আমরা শুনিয়াছি বা পড়িয়াছি সব হইতে ঊর্দ্ধের ঊর্দ্ধে তুমি।" এই সত্য কোরআনেরই উক্তি—ليس كمثله شئ وهو السمع البصير "কোন কিছুর সহিতই তাঁহার (আল্লার) তুলনা হইতে পারে না; অবশ্য তিনি শুনেন এবং দেখেন।" অর্থাৎ আল্লার শ্রবণ ও দর্শন ইত্যাদি গুণ রহিয়াছে, কিন্তু সেই শ্রবণ ও দর্শনকে আমাদের শ্রবণ ও দর্শনের তুলনায় ধারণা, কল্পনা বা অনুমান করা মারাত্মক ভুল ও ভ্রষ্টতা।

আমরা সৃষ্ট এবং শরীরী ও দেহধারী। দৈহিক অঙ্গের সাহায্যে আমাদের শ্রবণ, দর্শন ও কালাম বা কথা হয়। আর মহামহিম আল্লাহ হইলেন স্রষ্টা; তিনি শরীর, দেহ, অঙ্গ ইত্যাদি সৃষ্টির বৈশিষ্ট্যাবলীর বহু ঊর্দ্ধে, ঐ সবের মুখাপেক্ষিতা হইতেও পাক-পবিত্র। ইহাই উদ্দেশ্য পূর্ব্বাপর ইমামগণের এই উক্তির—
له سمع لا كسمعنا وبصر لا كبصرنا "আল্লাহ তায়ালার শ্রবণগুণ রহিয়াছে, কিন্তু তাঁহার শ্রবণ আমাদের ন্যায় কর্ণের মাধ্যমে এবং উহার সাহায্যে ও নির্ভরতায় নহে। তাঁহার দর্শনগুণ রহিয়াছে, কিন্তু তাঁহার দর্শন আমাদের ন্যায় চোখের মাধ্যমে এবং উহার সাহায্যে ও নির্ভরতায় নহে।

আল্লাহ তায়ালার কালাম সম্পর্কেও ঠিক এ-ই তথ্য এবং এ-ই তাৎপর্য্য। পবিত্র কোরআন যে আল্লার কালাম তাহাও উল্লেখিত তথ্যাবলীর সহিত

সুসামঞ্জস্যপূর্ণ। অবশ্য এ সম্পর্কীয় সামঞ্জস্য-বিধান সূক্ষ্ম তাৎপর্য্যের অন্তর্নিহিত। ইমাম বোখারী (রঃ) উহার প্রতি ইঙ্গিতও প্রদান করিয়াছেন। আমরা অত্র আলোচনা পূর্ব্বাপর ইমামগণের সর্ব্বসম্মত একটি আকিদা ও মতবাদের উপর ক্ষান্ত করিলাম যে—القران كلام الله غير مخلوق অর্থাৎ—পাক পবিত্র কোরআন আল্লাহ তায়ালার কালাম; উহা আল্লাহ তায়ালার সৃষ্ট (তথা শুধু কেতাবই) নহে।

একটি হাদীছে-কুদ্‌ছী

রসুল (দঃ) যাহা বলিয়াছেন—আল্লার তরফ হইতে ওহী প্রাপ্তে বলিয়াছেন। কোরআনেরই বর্ণনা—وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى

"রসুল (দঃ) প্রবৃত্তি বশে কিছু বলেন না; যাহা বলেন ওহী প্রাপ্ত হইয়াই বলেন।" এই হিসাবে সব হাদীছই আল্লার তরফ হইতে বলিতে হইবে; তবে সাধারণতঃ হাদীছ বর্ণনার সূত্র হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) পর্য্যন্তই ক্ষান্ত হয়, আল্লাহ তায়ালা হইতে বর্ণিত বলিয়া উল্লেখ থাকে না। কিন্তু কোন কোন হাদীছে উহা আল্লাহ তায়ালা হইতে বর্ণিত বলিয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। ঐরূপ হাদীছকেই "হাদীছে-কুদ্‌সী" বলা হয়। হাদীছে-কুদ্‌সীর বিষয়-বস্তু আল্লার তরফ হইতে, আর উহার পাঠ (Reabing বা এবারত) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বাচনিক, কিন্তু উহা আল্লার উক্তি আকারে বর্ণিত। এখানেই হাদীছে-কুদ্‌সী ও কোরআনের পার্থক্য; পবিত্র কোরআনের বিষয়-বস্তু ও পাঠ (Reabing বা এবারত) উভয়ই আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে।

২৭০২। হাদীছ:— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اللّٰهُ اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ بِىْ وَاَنَا مَعَهٗ اِذَا ذَكَرَنِىْ فَاِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ نَفْسِهٖ ذَكَرْتُهٗ فِىْ نَفْسِىْ وَاِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ مَلَاٍ ذَكَرْتُهٗ فِىْ مَلَاٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ وَاِنْ تَقَرَّبَ اِلَىَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ ذِرَاعًا وَاِنْ تَقَرَّبَ اِلَىَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ بَاعًا وَاِنْ اَتَانِىْ يَمْشِىْ اَتَيْتُهٗ هَرْوَلَةً

অর্থ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন—(১) আমার বান্দা আমার প্রতি যেই ধারণা পোষণ করে আমি তাহার সঙ্গে সেই ব্যবহারই করি। (২) আমার বান্দা আমাকে স্মরণ করিলে আমি তাহার সঙ্গী হই। (৩) আমার বান্দা যদি আমাকে স্মরণ করে একাকী, আমিও তাহাকে স্মরণ করি একাকী। যদি সে আমাকে স্মরণ করে লোক সমাবেশে, তবে আমি তাহাকে স্মরণ করি তদপেক্ষা উত্তম সমাবেশে। (৪) আমার বান্দা যদি আমার প্রতি অগ্রসর হয় এক বিঘত, আমি তাহার প্রতি অগ্রসর হই এক হাত; যদি সে অগ্রসর হয় এক হাত, আমি অগ্রসর হই এক বাঁও। (৫) আমার বান্দা আমার প্রতি হাটিয়া আসিলে আমি তাহার প্রতি দ্রুত ছুটিয়া আসি।

ব্যাখ্যা ঃ—প্রথম উক্তিটিকে অনেক ব্যাখ্যাকার ব্যাপক অর্থে না লইয়া বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের জন্য সাব্যস্ত করিয়াছেন। যথা—[ক] মোমেন মৃত্যু উপস্থিতির সময় দিলের সহিত আল্লার প্রতি যে ধারণা রাখিবে আল্লাহ তায়ালা তাহার সেই ধারণা বাস্তবায়নে বিশেষ দৃষ্টি দান করিবেন। মোসলেম শরীফের হাদীছে আছে—"তোমরা প্রত্যেকে মৃত্যুকালে অবশ্যই আল্লার প্রতি ভাল ধারণা রাখিবে।" [খ] দোয়া করার সময় আল্লার প্রতি বান্দার ধারণা বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ হয়। বান্দার ধারণায় যদি দোয়া কবুল হওয়ার দৃঢ় আশা থাকে, তবে আল্লার বিশেষ দৃষ্টি সেই দিকেই হইবে। পক্ষান্তরে বান্দা নিজেই যদি স্বীয় দোয়া কবুল হওয়ার প্রতি আশান্বিত না হয়, তবে ঐ দোয়ার প্রতি আল্লাহ তায়ালা দৃষ্টিপাত করিবেন না। এক হাদীছে আছে—আল্লার নিকট দোয়া করিতে উহা কবুল হওয়ার দৃঢ় আশা রাখ। [গ] তওবা করার সময় উহা কবুল হওয়ার ব্যাপারেও তদ্রূপ আল্লার প্রতি বান্দার ধারণা বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। [ঘ] এস্তেগফার তথা আল্লার নিকট ক্ষমা প্রার্থনার সময়ও ক্ষমা পাওয়া সম্পর্কে আল্লার প্রতি বান্দার ধারণা বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। [ঙ] যে কোন এবাদৎ উহার সাধারণ নিয়ম ও শর্তের সহিত সম্পাদন করিয়া উহার নিয়মিত ছওয়াব বা বিঘোষিত ফজিলত লাভের ব্যাপারে আল্লার প্রতি বান্দার ধারণাও অতিশয় তাৎপর্য্যপূর্ণ। যেমন, দান-খয়রাতে দানের পরিমাণ অপেক্ষা দশ হইতে সাত শত গুণ বেশী ছওয়াবের নীতি শরীয়তে রহিয়াছে। ৯ই জিলহজ্জ তারিখের রোযার দ্বারা দুই বৎসরের গোনাহ মাফ হওয়ার ফজিলত হাদীছে বিঘোষিত রহিয়াছে। এই শ্রেণীর আমল করিয়া বান্দা ঐ ছওয়াব লাভে আল্লার প্রতি পূর্ণ আশান্বিত থাকিলে তাহার সৌভাগ্য। আর যদি সে ঐ পরিমাণ ছওয়াবকে অতিরিক্ত মনে করে তবে সে আল্লার তরফ হইতে সেই ব্যবহারই পাইবে। (ফতহুলবারী ১৩—৩২৯)

কোন কোন ব্যাখ্যাকার আলোচ্য উক্তিটিকে বিশেষ ক্ষেত্রের জন্য নির্দ্দিষ্ট না করিয়া সর্ব্বক্ষেত্রেই প্রযোয্য বলিয়াছেন। সেমতে উক্তিটির উদ্দেশ্য হইবে, আল্লাহ তায়ালার রহমতের আশা প্রবল রাখার প্রতি বান্দাকে আকৃষ্ট করা।

প্রকাশ থাকে যে, সর্ব্বক্ষেত্রে বা বিশেষ ক্ষেত্রে—যে ভাবেই এই উক্তিকে প্রয়োগ করা হউক ইহার দ্বারা বিভ্রান্তির অবকাশ নাই। এস্থলে "ধারণা" বলিতে একমাত্র উদ্দেশ্য—যে ধারণা বান্দার দেল ও অন্তরের অন্তস্থলে সৃষ্ট ও উত্থিত হয়। আর ইহা বাস্তব সত্য যে, কাজ না করিয়া ফল লাভের আশা স্বাভাবিকভাবেই দেলে ও অন্তরে স্থান পায় না। হাঁ—মুখে স্থান পাইতে পারে—মুখের দ্বারা আশা প্রকাশ করিতে পারে, কিন্তু উহা মানুষের নিকটও বাতুলতা গণ্য হয়; অন্তর্যামী আল্লার নিকট ত ঐরূপ আশা-প্রকাশ গজবের কারণ হইবে। যেরূপ পবিত্র কোরআনে ছুরা মরইয়াম ৫ রুকুর একটি আয়াতে এক ব্যক্তির সমালোচনা উল্লেখ আছে। আছ ইবনে-ওয়ায়েল নামক এক কাফের ব্যক্তি কোন প্রসঙ্গে বলিরাছিল, আমি মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হইলে তখনও প্রচুর ধন-জন প্রাপ্ত হইব। ঐ ব্যক্তির উক্ত আশাবাদীতার খণ্ডনে এই আয়াত নাজেল হয়—

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ......

অর্থ:—ঐ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়াছ কি? যে আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে, অথচ বলে—(মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হইলে) আমাকে ধন-জনের প্রাচুর্য্য দেওয়া হইবে! সে কি গায়েবের খবর জানিয়াছে, কিম্বা আল্লার তরফের কোন অঙ্গীকার পাইয়াছে? কখনও নহে। আমি তাহার এই কথা লিখিয়া রাখিতেছি। (মৃত্যুর পর) তাহার আজাব বাড়াইতেই থাকিব। তাহার কথাগুলি আমার নিকট জমা থাকিবে। সে শূন্যহাত সাথীহীন অবস্থায় আমার নিকট আসিবে।

যাঁহারা এবাদৎ ও আমল করিয়া থাকেন তাঁহাদের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক এরূপ হন যে, তাঁহারা অতি ভয় ও আতঙ্কের দরুন আমলের ফলাফল লাভেও এবং সাধারণভাবে আল্লাহ তায়ালার প্রতিও হতাশাগ্রস্ত, নৈরাশ্যের অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকেন। আর এক শ্রেণীর লোক হন—যাঁহারা আমলের বেলায় অত্যন্ত সতর্ক থাকেন, আমলে ত্রুটি বিচ্যুতি সম্পর্কে সদা সঙ্কিত এবং ভয়ে প্রকম্পিত থাকেন, আল্লার ভয়ও অন্তরে রাখেন, কিন্তু আমলের ফলাফল লাভের প্রতি এবং আল্লাহ তায়ালার রহমতের প্রতি আশান্বিত থাকেন। এমনকি চেষ্টার পরেও আমলের মধ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি হইয়া গেলে তাহাতেও তাঁহারা হতাশ হন না,

নিয়মিত সংশোধন করিয়া আশাকে অক্ষুন্ন রাখেন। আলোচ্য উক্তিতে আল্লাহ তায়ালা বান্দাদিগকে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হওয়ার প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছেন এবং তাহাদের আশা পুরণের ভরসা দান করিয়াছেন। শরীয়তে এই দ্বিতীয় শ্রেণীর অবস্থাই অগ্রগণ্য। প্রথম শ্রেণীর অবস্থাটা অত্যন্ত ভয়সঙ্কুল; ইহাতে মানুষ অনেক সময় সন্তপ্ত হইয়া আমল ছাড়িয়া দিয়া সর্ব্বহারা হয়, আল্লার প্রতি সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়া পড়ে—যাহা কুফুরী গোনাহ।

দ্বিতীয় উক্তির ব্যাখ্যায় আল্লাহকে স্মরণ করার অর্থ শুধু মৌখিক জিক্‌র তথা আল্লার নাম জপাই নহে, বরং অন্তরেও আল্লার নাম, আল্লার মহত্ব, আল্লার ভয়-ভক্তি উপস্থিত দাখা উদ্দেশ্য↑, কাজে ও কথায় আল্লার আনুগত্য, ফরমাবরদারী ও দাসত্ব বিকাশের মাধ্যমে আল্লাহকে স্মরণ করার প্রমাণ দেওয়াও উদ্দেশ্য। আল্লাহ তায়ালা সঙ্গী হওয়া উক্তির উদ্দেশ্য আল্লার বিশেষ রহমতের ছায়া লাভ হওয়া (ফতহুলবারী ১৩—৩২৯)। বান্দা আল্লাহকে স্মরণ করিলে আল্লাহ সেই বান্দার সঙ্গী হন—ইহার একটি বাস্তব ক্রিয়া পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে—

الا بذكر الله تطمئن القلوب "জানিয়া রাখ—আল্লার জিক্‌রে তথা আল্লাহকে স্মরণ করিলে দেলের শান্তি, মনের সোয়াস্তি ও স্থিরতা লাভ হয়।" আল্লার স্মরণে আল্লাহ সঙ্গী হওয়ার ইহা একটি বড় লক্ষণ ও প্রতিক্রিয়া।

তৃতীয় উক্তিটির মর্ম্ম এই যে, আল্লার স্মরণ ও জিক্‌রের বদৌলতে মানুষের জন্য দুনিয়াতে আত্মিক, বরং পার্থিব উন্নতি এবং সাফল্য রহিয়াছে। আখেরাতেও বেহেশতী সওগাত এবং নেয়ামতরাশীর প্রতিদান রহিয়াছে। সেই প্রতিদান দেওয়া সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, বান্দা যদি আমাকে নির্জনে একাকী স্মরণ করে তবে আমিও তাহাকে একাকী স্মরণ করিব। অর্থাৎ তাহার প্রাপ্য প্রতিদান তাহাকে আমি স্বয়ং পৌঁছাইব, অন্যের মাধ্যমে নয়। এমনকি আখেরাতে তাহাকে দেওয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালা যে ছওয়াব ও নেয়ামত নির্দ্ধারিত রাখেন তাহাও গোপন রাখেন, কাহাকেও জ্ঞাত হইতে দেন না। যেরূপ সে তাহার আমল—আল্লাহকে স্মরণ করা লুক্কায়িত ভাবে করিয়াছে কাহাকেও জ্ঞাত হইতে দেয় নাই।

↑ এক হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে :—কেয়ামতের দিন সাত শ্রেণীর মানুষ আল্লার রহমতের ছায়া লাভ করিবে। তন্মধ্যে এক শ্রেণীর বর্ণনায় উল্লেখ আছে—رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه "যে ব্যক্তি একাকী আল্লাহকে স্মরণ করিয়াছে, যাহাতে তাহার চোখদ্বয়ের অশ্রুধারা বহিয়াছে।" অন্তরে এরূপ মহব্বৎ ও ভয়-ভক্তির সহিত আল্লার স্মরণ হওয়া চাই যাহাতে চোখে অশ্রুধারা নামিয়া আসে—এইরূপ স্মরণই আলোচ্য হাদীছের উদ্দেশ্য।

আর বান্দা যদি আমাকে লোক সমক্ষে স্মরণ করে, তবে আমি তাহাকে তদপেক্ষা উত্তম সমাবেশে স্মরণ করি; অর্থাৎ—তাহার প্রশংসা এবং প্রতিদানের চর্চ্চা ও আলোচনা ফেরেশতাদের মধ্যে করি। (মেরকাত, ৫—৫১)

জানিয়া রাখিবেঃ—প্রকাশ্য জিক্‌র গুপ্ত জিক্‌র অপেক্ষা উত্তম হওয়ার কোন ইঙ্গিত-ইশারা অত্র হাদীছে নাই। এখানে শুধু এতটুকুই উদ্দেশ্য যে, আল্লার জিক্‌র ও স্মরণে বান্দা যে পন্থায় স্বাদ ও আনন্দ পায় আল্লাহ তায়ালা তাহার সেই স্বাদ ও আনন্দে ব্যঘাত ঘটান না। এমনকি তাহাকে উহার প্রতিদান দেওয়ার ব্যাপারেও সেই পন্থাই বজায় রাখেন (ফয়জুলবারী ৪—৫১৮)।

বিষয়টির খোলাসা এই যে, মহব্বৎ ও ভালবাসার ক্ষেত্রে প্রেমিকদের দুই রকম অবস্থা দেখা যায়। কোন সময় প্রেমিক প্রেমাস্পদের সহিত নীরব ও লুক্কায়িত নিবিড় প্রেম গড়িতে স্বাদ পায়; প্রেমাস্পদের জপনা, প্রেমাস্পদের ধ্যান একাকী নিরালায় করিতে আনন্দ পায়। আবার কোন সময় প্রেমিক প্রেমাস্পদের জপনা, প্রেমাস্পদের আলোচনা প্রকাশ্যে ও লোক সমক্ষে করিতে উৎফুল্ল হয়।

আল্লার মহব্বৎ ও ভালাবাসারও ঐ উভয় অবস্থাই দেখা যায়। অনেক আল্লার ওলী এমন গুজরিয়াছেন যাঁহাদের সারা জীবনেও তাঁহাদের আল্লাহ-প্রেম লোকদের মধ্যে প্রকাশ পায় নাই। তাঁহারা প্রকাশ্য দেখায় সাধারণ মোসলমানরূপে জীবন-যাপন করিয়াছেন; আল্লার জপনা, আল্লার ধ্যান, আল্লাহ-প্রেমের কার্য্যাবলী গোপন রাখিয়াছেন।

আল্লার ওলীগণের এক শ্রেণী এইরূপও আছেন যাঁহারা দিবা-রাত্রের বিভিন্ন অংশে নিরিবিলি জনশূন্য অবস্থায় আল্লার ধ্যান ও জপনা করিলেও আল্লার বান্দাদেরকে আল্লাহ প্রেম শিক্ষা দান কর্ত্তব্যের তাকিদে আল্লাহ-প্রেমের অনেক কাজ তাঁহারা সাধাণতঃ প্রকাশ্যে লোক সমক্ষে করিয়া থাকেন।

আলোচ্য উক্তিতে আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের ঐ উভয় শ্রেণীর অবস্থার উপরই করুণা প্রদর্শনের কথা বলিতেছেন যে, বান্দা যে পন্থায় আমার প্রেম-নিবেদনে স্বাদ ও আনন্দ পায় আমি তাহাকে সেই পন্থাপোযোগী প্রেম-বিনীময় দান করি; যেন তাহার স্বাদে ও আনন্দে ব্যাঘাত না ঘটে। এক কথায়—আল্লাহ তায়ালা স্বীয় প্রেমিকের সহিত প্রেম-বিনীময়ে প্রেমিক-বান্দার মনের স্বাদ ও আনন্দের পন্থায়ই বিনীময় ও প্রতিদান দিয়া থাকেন। বান্দা যে পন্থায় স্বাদ ও আনন্দ পায় সেই পন্থাতেই আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট থাকেন। নির্দ্ধারিতরূপে এক পন্থাকে অগ্রগণ্যতা না দিয়া আল্লাহ তাঁহার সন্তুষ্টিকে বান্দার মনস্তুষ্টির সামঞ্জস্যে পরিচালিত করেন।

চতুর্থ উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, আল্লার নৈকট্য লাভের জন্য বান্দা আমল ও চেষ্টা করিলে আমল ও চেষ্টায় যে পরিমাণ নৈকট্যের উপযোগী সে হয় আল্লাহ তায়ালা তাহাকে প্রতিদান ও রহমত স্বরূপ উহার কয়েক গুণ বেশী নৈকট্য দান করেন।

পঞ্চম উক্তিটিতে এক হাদীছে আরও উল্লেখ আছে যে, বান্দা আমার প্রতি দ্রুতবেগে আসিলে আমি তাহার প্রতি দৌড়িয়া অগ্রসর হই। এই উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, আল্লার নৈকট্য লাভে বান্দার আমল ও চেষ্টা ধীর ও মন্থর হইলেও আল্লাহ তায়ালা নিজ রহমতে বান্দাকে অধিক ও দ্রুত নৈকট্য দান করেন।

মোসলেম শরীফের এক রেওয়ায়েতে আল্লাহ তায়ালার আরও একটি অশেষ রহমতের উক্তি উল্লেখ আছে—

وَمَنْ لَقِيَنِى بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيْئَةً لَا يُشْرِكُ بِى

شَيْئًا لَقِيْتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً

"কোন ব্যক্তি শেরেকী গোনাহ হইতে পূর্ণরূপে বাঁচিয়া অন্য গোনাহ জগতজোড়া পরিমাণ লইয়াও আমার দরবারে উপস্থিত হইলে আমি সেই পরিমাণেই ক্ষমা লইয়া তাহার প্রতি সাড়া দিব।"

এই উক্তির উদ্দেশ্য হইল—গোনাহের আধিক্যে নিরাশ হওয়া কিম্বা গোনাহ করিয়া অতিরিক্ত ভয়ে আল্লাহ তায়ালা হইতে দূরে সরিয়া যাওয়া হইতে বান্দাকে রক্ষা করা। আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট ও ধাবিত করা পূর্ব্বক বলিতেছেন, অনেক বেশী পরিমাণ গোনাহ লইয়াও আমার দরবারে উপস্থিত হইলে অর্থাৎ আমার নিকট তওবা করতঃ ক্ষমা প্রার্থী হইলে আমি বান্দার প্রতি তদ্রূপ বেশী পরিমাণ ক্ষমাই প্রদর্শন করিব। অবশ্য শেরেকী গোনাহ চিরতরে বর্জ্জন করতঃ পূর্ণ ইসলাম গ্রহণ না করিয়া শত কান্নাকাটি করিলেও শেরেকী গোনাহ ক্ষমা করা হইবে না—ইহাই আল্লাহ তায়ালার বিধান।

এই উক্তির উদ্দেশ্য গোনাহ করার ব্যাপারে অভয় দান করা নহে, বরং গোনাহ করিয়া ফেলিলে সে ক্ষেত্রে আশ্বাস দান পূর্ব্বক তওবার প্রতি আকৃষ্ট করা এবং নৈরাশ্য হইতে রক্ষা করা উদ্দেশ্য।

বোখারী শরীফের সর্ব্বশেষ হাদীছ

ইমাম বোখারী (রঃ) তাঁহার মহান গ্রন্থের সর্ব্বশেষ পরিচ্ছেদ ঐ বিষয়ের প্রমাণে রাখিয়াছেন যাহা মানব জীবনের সর্ব্বশেষ পরিণতি। তাহা এই যে,

মানবের সমুদয় আমল বা কার্য্যাবলী নেক ও বদ—দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া উভয়ের পরিমাপ ও ওজন করা হইবে এবং সেই পরিমাপের ভিত্তিতে ইহজীবনের কর্ম্মের ফলাফল অসীম অনন্ত পরকালে ভোগ করিবে। এই পরিমাপের যন্ত্রটিকে পবিত্র কোরআনে পাল্লা বলা হইয়াছে। হাদীছে ইহাও উল্লেখ আছে যে, উহার উভয় দিকের দুইটি পাল্লা হইবে এবং নিক্তির কাঁটাও হইবে। কিন্তু উহার পূর্ণ আকৃতি কি হইবে এবং আমল বা কর্ম্মের ন্যায় অস্পৃশ্য ও অধাতব বস্তু কিরূপে পরিমাপ করা হইবে তাহা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন।

উল্লেখিত পরিমাপ ও ওজনে প্রথম ঈমান ও কুফরের ওজন হইবে, যাহা মানবের নাজাত পাওয়া না-পাওয়ার মূল চাবিকাঠি। এক পাল্লা হইবে ঈমানের, অপর পাল্লা হইবে কুফরের। ঈমান ও কুফর একত্রিত হইতে পারে না—ঈমান তথায়ই থাকিতে পারে যথায় কুফর মোটেও না থাকে, আর যথায় কুফর থাকে তথায় ঈমান আসেই না। সুতরাং পরিমাপ ও ওজনের এই ধাপে মোসলমানের বেলায় এক পাল্লায় ঈমান থাকিবে, অপর পাল্লা খালি ও শূন্য থাকিবে; ফলে তাহার ঈমানের পাল্লা ভারি হইবে, কুফরের পাল্লা হাল্‌কা হইবে। মোনাফেক, ঈমানহীন ইসলামের দাবীদার ও কাফেরের বেলায় এক পাল্লায় কুফর হইবে অপর পাল্লা শূন্য হইবে। ফলে তাহাদের কুফরের পাল্লা ভারী হইবে, ঈমানের পাল্লা হাল্‌কা হইবে। সুতরাং কাফের-মোনাফেকগণ ওজনের এই ধাপেই চিরজাহান্নামী সাব্যস্ত হইবে। পবিত্র কোরআন ১৮ পারা ৬ রুকুতে আয়াত আছে—

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ - وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ

فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ -

“যাহাদের (ঈমানের) পাল্লা ভারী হইবে তাহারাই হইবে সফলকাম। আর যাহাদের (ঈমানের) পাল্লা হাল্‌কা হইবে তাহারা হইবে নিজের হাতেই নিজে ক্ষতিগ্রস্ত ও চিরজাহান্নামী।”

আয়াতে “চিরজাহান্নামী” বলায় এই পরিমাপ কুফর ও ঈমানের মধ্যে হওয়া নির্দ্ধারিত; যেহেতু কুফরই চিরজাহান্নামী হওয়ার একমাত্র কারণ।

মোসলমানগণ ওজনের এই ধাপে চিরজাহান্নামী হওয়ার অভিসাপ হইতে অব্যহতি লাভের সফলতার পর দ্বিতীয় ধাপে তাহাদের আমল বা ভাল-মন্দ কর্ম্মের ওজন হইবে। এমনকি মৌখিক কথা-বার্ত্তা, মন-মগজের ধ্যান-ধারনাও এই ওজনের

আওতায় আসিবে। এই পরিমাপে এক পাল্লায় নেক আমল হইবে অপর পাল্লায় বদ আমল হইবে। যাহার নেকের পাল্লা ভারী হইবে সে-ই ক্ষমা প্রাপ্ত হইয়া সরাসরি বেহেশতে পৌঁছিবে এবং ভারী হওয়ার তারতম্যের ভিত্তিতে বেহেশতে শ্রেণী-বণ্টন হইবে। পক্ষান্তরে যাহার বদ আমলের পাল্লা ভারী হইবে তাহার বদ আমল যদি কোরআন-হাদীছে বর্ণিত বিভিন্ন বিশেষ সূত্রে ক্ষমা প্রাপ্ত না হয় তবে বদ আমলের দরুন দোযখে যাইবে, কিন্তু তাহার দোযখবাস অস্থায়ী হইবে। এই শ্রেণীর লোকগণ কোরআন-হাদীছে বর্ণিত বিশেষ বিশেষ সুযোগের দ্বারা দোযখ-বাসের মেয়াদ কর্ত্তন বা গোনাহ অনুপাতে দোযখবাসের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর দোযখ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া চিরকালের জন্য বেহেশতে প্রবেশ করিতে থাকিবে। পবিত্র কোরআন ১৭ পারা ৪ রুকূর আয়াতে ইহারই উল্লেখ রহিয়াছে—

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا - وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا - وَكَفٰى بِنَا حَاسِبِيْنَ -

"কেয়ামতের দিন আমি ইনসাফের পাল্লা স্থাপন করিব ; সেমতে কাহারও প্রতি কোন অন্যায় করা হইবে না। কাহারও একটি সরিষা বীজ পরিমাণ নেক বা বদ আমল থাকিলে তাহাও উপস্থিত করা হইবে। আমি পূর্ব্বাপর সকলের হিসাব গ্রহণে যথেষ্ট।"

কেয়ামতের দিন পরিমাপ ও ওজন প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্পর্কে ৮ পারা ছুরা আ'রাফের প্রথমে এবং ৩০ পারা ছুরা আল্-ক্বারিয়াতেও আয়াত রহিয়াছে।

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقُّ - فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ - وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَظْلِمُوْنَ -

"ঐ দিন (তথা কেয়ামতের দিন মানুষের নেক-বদ আমলের) ওজন করা বাস্তব ও সত্য কথা। সেমতে যাহাদের নেকীর পাল্লা ভারী হইবে তাহারাই হইবে সফলকাম। পক্ষান্তরে যাহাদের নেকীর পাল্লা হাল্কা হইবে তাহারাই হইবে ঐ দল যাহারা নিজেদেরই ক্ষতি করিয়াছে আমার আয়াতসমূহের সহিত অন্যায় করিয়া।" (৮ পাঃ)

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ - وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ -

"যাহার নেকের পাল্লা ভারী হইবে সে সফলকাম হইবে এবং শান্তির জীবন লাভ করিবে। আর যাহার নেকের পাল্লা হাল্‌কা হইবে সে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে—তাহার ঠিকানা হাবিয়া দোযখে হইবে।" (৩০ পারা)

৩০ পারা ছুরা জুল্‌জিলাতে উল্লেখ আছে—

يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ - فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ - وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ -

"কেয়ামতের দিন দলে দলে মানুষ নিজ নিজ আমল দেখিবার জন্য চলিয়া আসিবে। যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ নেক আমল করিয়াছে তাহাও দেখিতে পাইবে এবং যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ বদ আমল করিয়াছে তাহাও দেখিতে পাইবে।"

ইহার উদ্দেশ্য এই যে, পরিমাপ ও ওজনের সময় সবই উপস্থিত থাকিবে। অতি ছোট নেক আমলও উপেক্ষিত হইবে না এবং অতি ছোট বদ আমলও লুক্কায়িত থাকিবে না। এইভাবে ওজনের পর নেকের পাল্লা ভারী ও হাল্‌কা হওয়ার তারতম্যে পরিণাম নির্দ্ধারিত হইবে।

প্রকাশ থাকে যে, পাল্লা ভারী ও হাল্‌কা হওয়া শুধু নেক-বদের সংখ্যার ভিত্তিতেই হইবে না। একটি কবিরা গোনাহ তওবা না করিলে সমস্ত নেকের উপর ভারী হইতে পারে। একটি সাধারণ গোনাহ আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টির বিশেষ কারণাধীনে অনেক ভারী হইতে পারে। কোন গোনাহের বিষক্রিয়া এরূপ হয় যে, উহার দরুন অনেক নেক আমল বিনষ্ট হইয়া বিলুপ্ত হয়। তদ্রূপ নেক আমলের মধ্যেও আল্লাহ তায়ালার বিশেষ সন্তুষ্টির বিভিন্ন কারণাধীনে এক একটি নেক আমলের ওজন দশ হইতে সাত শত গুণ বরং তদপেক্ষাও বেশী হইবে। এতদ্ভিন্ন নেক আমলের দ্বারা গোনাহ বিলুপ্ত হইতে থাকে। কোন কোন সাধারণ তথা মোস্তাহাব নেক আমল ওজনে অনেক ভারী হইবে। এইরূপ একটি জিক্‌রের উল্লেখই নিম্নে বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে। এই জিক্‌রটিকে মন-মুখের জিক্‌ররূপে, সর্ব্বদার জন্য অবলম্বন করা অত্যন্ত সৌভাগ্যের বস্তু।

২৭০৩। হাদীছ :—* عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَتَانِ حَبِيْبَتَانِ اِلَى الرَّحْمٰنِ

خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِى الْمِيْزَانِ

"سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ"

অর্থ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসালাম বলিয়াছেন—দুইটি বাক্য আছে যাহা দয়াময় আল্লাহ তায়ালার নিকট অতি প্রিয়, মুখে উচ্চারণ করিতে সহজ ও হাল্‌কা, কেয়ামতের দিন নেকের পাল্লায় অতি ভারী। সেই বাক্যদ্বয় হইল—

ছোব্‌হা'নাল্লাহে ওয়া বে-হামদিহী, ছোব্‌হা'নাল্লাহিল্ আ'জীম।

"আমি আল্লাহ তায়ালার পাক-পবিত্রতায় পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা রাখি এবং তাঁহার সর্ব্ববিধ প্রসংশা করি। মহামহিম আল্লাহ নিষ্কলুষ ও নিষ্কলঙ্ক—(এই আমার জপনা।)

● মহান প্রভু-পরওয়ারদেগার আল্লাহ তায়ালার প্রসংশা ও শুকুর আদায় করা আমাদের সাধ্যের উর্দ্ধে। হাদীছ শাস্ত্রের মহাগ্রন্থ বোখারী শরীফ বাংলা ভাষাভাষী মোসলমান ভাইদের নিকট পৌঁছাইবার যেই সুযোগ তিনি আমাদেরে শুধু নিজ কৃপায় দান করিয়াছিলেন একমাত্র তাঁহার কৃপাই উহাকে সমাপ্তে পৌঁছাইল।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ

اَجْمَعِيْنَ - وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

* বোখারী শরীফের মূল হাদীছ গণনাকারীগণ ২৬০২ সংখ্যা বলিয়াছেন। আমাদের অনুবাদে কিছু সংখ্যক হাদীছ একাধিক বার ভিন্ন ভিন্ন নম্বরে উল্লেখ হইয়াছে—যাহা আমাদের দৃষ্টিগোচরও হইয়াছে। কিন্তু পাঠকদের উপকারার্থে আমরা উহা একাধিক স্থানেই রাখিয়া দিয়াছি, তাই আমাদের অনুবাদে হাদীছ সংখ্যা কিছু বেশী হইয়াছে।

বাংলা

বোখারী শরীফ

সপ্তম খণ্ডের

পরিশিষ্ট

মাওলানা আজিজুল হক সাহেব

অনুবাদক বাংলা বোখারী শরীফ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

ইহা মূল বোখারী শরীফের অংশ নহে। মূল বোখারী শরীফের একটি পরিচ্ছেদ এবং উহার কতিপয় হাদীছের আনুষাঙ্গিক বয়ান।

পরিশিষ্টের সূচীপত্র

দ্বিতীয় সংস্করণের

ভূমিকা

আল্লাহ তায়ালার অসীম প্রশংসা এবং নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি অগণিত দরূদ ও সালাম। বাংলা বোখারী শরীফ সপ্তম খণ্ড উহার পরিশিষ্ট সহ বাংলাদেশের মোসলেম সমাজে দীর্ঘ দিন যাবৎ প্রচারিত হইয়া উহার দ্বিতীয় সংস্করণকালে অধমকে আল্লাহ তায়ালা জীবিত রাখিয়াছেন। এই জীবন-নেয়ামতের দ্বারা একটি বিশেষ উপকার এবং সুযোগ লাভেরও আল্লাহ তায়ালা নিজ কৃপায় অধমকে তৌফিক দিয়াছেন।

পরিশিষ্টের "উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু" শিরোনামার বক্তব্য পাঠ করিলে জানা যাইবে যে, নবীজী মোস্তফা (দঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন—তাঁহার অনতিকাল পরেই মোসলেম নামধারী একটি বিশেষ দল বা ফের্কার আবির্ভাবের কথা। নবী (দঃ) এই ইঙ্গিতও দিয়াছিলেন যে, ঐ দলটির দ্বারা দ্বীন-ইসলাম ও মোসলেম সমাজের ভয়াবহ ক্ষতি সাধিত হইবে। তাই ঐ দলের প্রতি নবী (দঃ) কোপ-ক্রোধও অতিমাত্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, নাগালে পাইলে তিনি তাহাদেরে নিশ্চিহ্ন ও ধ্বংস করিয়া দিতেন। মোসলেম সমাজকে অতিমাত্রায় উৎসাহিত করিয়াছেন তাহাদের ধ্বংস সাধনের প্রতি। উহার উপর ভিত্তি করিয়া ইমাম বোখারী (রঃ) তাহাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার হুকুম জারি করিয়া একটি পরিচ্ছেদ তাঁহার এই মহাগ্রন্থে লিখিয়াছেন।

নবীজী মোস্তফার ছাহাবীগণের যুগেই সেই দলটির আবির্ভাব হইয়াছিল। চতুর্থ খলীফায়ে-রাশেদ আলী (রাঃ) ঐ দলটির বিরুদ্ধে তরবারি ধারণ করিয়া নবীজী প্রবর্ত্তিত বিধান সর্ব্বপ্রথম প্রয়োগকারী হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। তিনি তাহাদের নিধনকার্য্যে নবীজী মোস্তফার উৎসাহ-দানকে পূর্ণরূপে সাফল্য-মণ্ডিত করেন। তাঁহার পরে খলীফা হাসান (রাঃ) কর্ত্তৃক অর্পিত খেলাফত লাভ করিয়া খলীফা বরহক মোয়াবিয়া (রাঃ) ঐ দলের নিধনে সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করেন। তাঁহার পরে ঐ দলের অবশিষ্ট চিহ্নও মুছিয়া যায় এবং তাহারা যেন পুনঃ মাথাচাড়া দিতে না পারে সেইরূপ ব্যবস্থাও তিনি তাঁহার সাধ্যানুসারে করিয়াছিলেন।

এইরূপে ঐ দলটির ধ্বংস সাধন হইলেও তাহাদের দুইটি অশুভ চিহ্ন মোসলেম সমাজের দ্বীন-ঈমানের ক্ষতিকরনে প্রচলিত রহিয়াছে। একটি হইল তাহাদের জঘন্য উদ্দেশ্য হাসিলের পক্ষে সহায়ক কিছু গঠিত জাল হাদীছ।

অপরটি হইল তাহাদের সুপরিকল্পিত ও সুসজ্জিত মিথ্যা এবং অপবাদের বহর যাহাকে গোয়েবলী প্রচারণার দ্বারা তাহারা ইতিহাসের রূপ দান করিয়াছিল। তাহাদের এই দুইটি অপকৌশলের বিষময় ক্ষয়-ক্ষতি সুদূর প্রসারী।

মোসলেম সমাজের কর্ণধার মনীষীবৃন্দ যুগে যুগে ঐ বিষের প্রতিষেধক আবিষ্কার করিয়াছেন—জাল হাদীছগুলির জাল হওয়া প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন, মিথ্যা ইতিহাসকে প্রামাণিকরূপে খণ্ডন করিয়া সত্য ইতিহাস উদ্ধার পূর্ব্বক বড় বড় গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বিষের শত প্রতিষেধক আবিষ্কার হইয়া থাকিলেও আশীবিষের ক্ষয়-ক্ষতি হইতে রেহায়ী পাওয়া যায় কি?

কোন কুচক্রী যদি অসদুদ্দেশ্যে বা নূতন আবিষ্কারকরূপে প্রসিদ্ধি লাভের মানসে ঐসব মিথ্যা হাদীছ কুড়াইয়া সমাজকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা করে, তবে সে অনেক ক্ষেত্রে তাহার হীন উদ্দেশ্যে সাফল্যের মুখ দেখিতে পারিবে। "চিন্তাবিদ" "চিন্তানায়ক" "গবেষক" "সমাজ সংস্কারক" ইত্যাদি খেতাব লাভ করিতে পারিবে! তদুপরি "অমুকের চিন্তাধারা বিশ্বকে দিয়েছে নাড়া" ইত্যাদি আকাশচুম্বি শ্লোগান নিজের নামে দেয়ালে দেয়ালে সুশোভিত করার প্রয়াস পাইবে। পরিণামে সে সমাজকে বিভ্রান্ত করার এক স্থায়ী প্রকৌশলী হইয়া যাইবে। এবং "জাল্লা ও আজাল্লা"—নিজেও ভ্রষ্ট হইল, অপরকেও বিভ্রান্ত করিল—এই সত্যের লা'নৎ ও অভিশাপে পতিত হইবে।

ইহা অমূলক ভীতি ও অগ্রিম আশঙ্কা নহে; আমাদের সম্মুখেই এই অঘটন ঘটিয়াছে।

ছাহাবীগণ সম্পর্কে মোসলেম জাতির প্রতি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নির্দ্দেশকে উপেক্ষা করিয়া এবং পূর্ব্বাপর সকল মহামনীষীগণের মতামত, সিদ্ধান্ত ও গবেষণাকে কটাক্ষ করতঃ বর্জন করিয়া শুধু ঐ ফের্কা ও দলের গর্হিত মিথ্যা ইতিহাসের ভিত্তিতে জনৈক ব্যক্তি খলীফা ওসমান (রাঃ) সহ অনেক ছাহাবীর কুৎসা-চর্চ্চার স্থায়ী সঙ্কলনের জন্ম দিয়া ফেলিয়াছে।

এতদিন ঐসব গর্হিত মিথ্যা ইতিহাসগুলি ইতিহাস নামের কথা-উপকথারূপে বিনা বিচারে সব কিছুর ক্যালেক্টারস্ বা সংগ্রহকারীদের খাতাপত্রের নিভৃত কোণে পড়িয়াছিল। মোসলেম মনীষীবৃন্দ সকলেই ঐগুলিকে উপেক্ষা করিয়াছেন ও মিথ্যা সাব্যস্ত করিয়া পরিত্যক্ত গণ্য করিয়া রাখিয়াছেন। "সমাজ সংস্কারক" এবং "নূতন চিন্তাবিদ" আখ্যা লাভের এক অভিনব ব্যবস্থা হিসাবে ঐ ব্যক্তি খলীফা ওসমান (রাঃ) সহ অনেক বিশিষ্ট ছাহাবীবর্গের গ্লানি-চর্চ্চার ঐসব গর্হিত মিথ্যা বর্ণনাগুলি রং-পলিসের সহিত বিশেষ সংকলনরূপে প্রচার করিয়াছে।

নবীজী মোস্তফার কোপ-ক্রোধ এবং ভবিষ্যদ্বাণীর পাত্র খারেজী দলের অশুভ চিহ্নের বিষময় প্রক্রিয়ার ইহা একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই সূত্রে বক্ষ্যমাণ পরিশিষ্টের মধ্যে ঐ ব্যক্তি এবং তাহার কুখ্যাত সঙ্কলনের সমালোচনা ও খণ্ডন বিশেষ ভাবে হইয়াছে।

ঐ ব্যক্তি সুসম্বদ্ধ একটি রাজনৈতিক দলের সংগঠক। তাহার সমালোচনাকে তাহার দলের রোকন, মোত্তাফেক—উপনেতা ও সদস্যগণ বরদাস্ত করিতে পারে নাই; তাহাদের আঁতে ভীষণ আঘাত লাগিয়াছে। অথচ খলীফা ওসমান (রাঃ) ইসলামের স্তম্ভ চতুষ্টের এক স্তম্ভ, নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অন্যতম নির্ভরযোগ্য সহচর এবং বিশেষ সম্পর্কধারী ঘনিষ্ঠ। অতএব তাঁহার মান-মর্য্যাদা রক্ষার প্রচেষ্টা সকল মোসলমানের নিকট সমর্থনীয় এবং আদরণীয় হওয়া ঈমান ও ইসলামের স্বাভাবিক দাবী। কিন্তু দলীয় একাত্মতা ও অধীনতা মানুষকে অন্ধ করিয়া দেয়। সেই অন্ধতা বশেই ঐ দলীয় কোন কোন ক্ষুদে নেতা এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবীগণের গ্লানি প্রচার ও দোষ-চর্চ্চা যেই দলের দলীয় কর্ম্মসূচীর বিশেষ অংশ সেই দলের সদস্য ব্যক্তি এই নগণ্য অধমের কুৎসা করিবে তাহাতে বিচিত্রের কি আছে? তদুপরি বাংলা বোখারী শরীফ সপ্তম খণ্ড ও পরিশিষ্টের প্রথম সংস্করণে ঐ কুৎসাকারী কিছু সুযোগও পাইয়াছে। কারণ, চতুর্থ খলীফা-রাশেদ হযরত আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেলাফৎ সম্পর্কে সুস্পষ্ট আকিদা বর্ণনা করার কোন আলোচনা উহাতে করা হয় নাই। অধিকন্তু আনুষাঙ্গিক আলোচনা হইতে পূর্বাপর বিচ্ছিন্ন, বরং চাতুর্য্যের সহিত খণ্ডিত আকারে কোন কোন বাক্যাবলীকে বিকৃত রূপ দানের অবকাশ পাইয়াছে। এবং সাধারণ জন-সমক্ষে উহাকে তুলিয়া ধরিয়া অধমকে খলীফা আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিপক্ষ এবং তাঁহার খেলাফৎ অস্বীকারকারী রূপে রূপায়িত করার প্রয়াস পাইয়াছে।

যাহারা ইহা করিয়াছে তাহাদের জন্য ইহা নেহাৎ মামুলী কাজ; তাহাদের গুরু যিনি, তিনি ত খলীফা ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ন্যায় মাহানকে মিথ্যা চার্জসিটের দ্বারা খেলাফৎ বিতাড়নের আসামী সাব্যস্ত করিয়াছে। সেই দলের সদস্যরা অধমের ন্যায় সামান্য মানুষকে মিছামিছি আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেলাফৎ অস্বীকারকারী সাব্যস্ত করিবে তাহাতে বিচিত্র কি?

আল্লাহ তায়ালার লাখ লাখ শুকুর যে, উক্ত কুৎসার ধুম্রজাল ছিন্ন করতঃ কুৎসাকারীদের মুখে চুন-কালী দেওয়ার সুযোগ অধমকে আল্লাহ তায়ালা দান করিয়াছেন। এই দ্বিতীয় সংস্করণে আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেলাফৎ

সম্পর্কে সুস্পষ্ট আক্বিদা বর্ণনা করিয়া দেওয়া হইল। আর যে সব বাক্যাবলীর দ্বারা কোন প্রকার হেরফের এবং কর্ত্তন ও বিছিন্ন আকারে হইলেও বিভ্রান্তি সৃষ্টির অবকাশ ছিল উহার সংশোধন ও বাস্তব রূপ দান এমনভাবে করিয়া দেওয়া হইল যাহাতে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অবকাশ বন্ধের আশা করা যায়।

বিভ্রান্তি সৃষ্টির অবকাশ বন্ধের যথাসাধ্য প্রচেষ্টা করা হইল, ইহার পরেও যদি কেহ কোন ছিদ্র আবিষ্কারে সক্ষম হয় এবং তাহা হওয়া অস্বাভাবিক নহে। কারণ, মানুষ ভুল-ত্রুটির সমষ্টি। তবে ইহা অতি সুস্পষ্ট যে, আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেলাফৎ সম্পর্কে অকাট্য আক্বিদা চুড়ান্তরূপে পরিষ্কার ভাষায় বর্ণিত হওয়ার পর যদি কোথাও কোন উক্তি বা বাক্যে উহার বিপরীত ভাব পরিলক্ষিত হয় তবে তাহা মানবীয় ভুল-ত্রুটিই গণ্য করিতে হইবে। সংশোধনের সুযোগ দানার্থে অবহিত করার অনুরোধ সর্ব্বদার জন্য থাকিল।

একটি উজ্জ্বল পার্থক্য

খলীফা ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রতি মিথ্যা দোষারোপ ও অপবাদ সঙ্কলনের সমালোচনাই পরিশিষ্টে রহিয়াছে এবং তিলে তিলে ঐসব মিথ্যা দোষারোপ ও অপবাদের খণ্ডন প্রামাণিকরূপে করা হইয়াছে। প্রতিটি মিথ্যা ও অপবাদকে ইতিহাস দ্বারা মিথ্যা ও অপবাদ হওয়া প্রমাণ করা হইয়াছে।

ঐ কুখ্যাত সঙ্কলকের পদলেহীরা পরিশিষ্টে বর্ণিত ঐতিহাসিক প্রমাণসমূহের কোন একটিরও উত্তর দান বা খণ্ডন করিতে পারে নাই। এমতাবস্থায়ও তাহারা তাহাদের গুরুকে কোন একটি মিথ্যা হইতে চুল পরিমাণ হটাইতে প রিয়াছে কি ? বা অন্ততঃ নিজেরা তাহার মিথ্যার ধূম্রজাল হইতে হটিতে পারিয়াছে কি ?

আশ্চর্য্যের বিষয়—ঐ কুখ্যাত সঙ্কলনে ব্যথিত হইয়া মোসলেম বিশ্বের খ্যাতনামা মনীষীবৃন্দ সঙ্কলককে সতর্ক করিয়াছেন এবং তাহার সঙ্কলনে পুনর্বিবেচনা করার অনুরোধ করিাছেন, কিন্তু তাহার টনক নড়ে নাই। অবশেষে তাঁহারা সমাজকে ঐ সঙ্কলক হইতে সতর্ক করিতে বাধ্য হইয়াছেন। পরিশিষ্টের শেষ ভাগে ঐরূপ তিনজন মহা মনীষীর সতর্কবাণী ও মন্তব্যের উদ্ধৃতি ইনশা-আল্লাহ তায়ালা পেশ করা হইবে। তাঁহারা পাক-ভারত-বাংলাদেশের অবিস্মরণীয় সর্ব্ববরণীয় মহান এবং মোসলেম জাতির অন্যতম জাতীয় দিশারী। তাঁহারা হইতেছেন—(১) হযরত মাওলানা মুফতী মোহাম্মদ শফী (রঃ) মুফতী-আজম পাকিস্তান। (২) শায়খুল হাদীছ হযরত মাওলানা জাকারিয়া সাহেব সাহারণপুরী, মোহাজেরে মদনী। (৩) হযরত মাওলানা শামছুল হক (রঃ) ফরিদপুরী।

পক্ষান্তরে আমরা সম্পূর্ণ অন্যায় ও অলীক সমালোচনারও মূল্য দিয়াছি। বক্তব্য প্রকাশের সংক্ষিপ্ততা বা প্রকাশ-ভঙ্গির ভুল ব্যাখ্যার আড়ালে কিম্বা শব্দার্থের বিভিন্নতার সুযোগ লইয়া, এমনকি মূল বক্তব্য ছাটকাটের মাধ্যমে সমালোচনার যোগ্যরূপে গড়াইয়া দোষারোপের পুঁজি সংগ্রহকারীকেও আমরা উপেক্ষা করি নাই।

ঐ শ্রেণীর সমালোচনার মুখ চিরতরে বন্ধ করার জন্য খোলাফায়ে-রাশেদীনের চতুর্থ খলীফা আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেলাফত সম্পর্কে এবং নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবীগণের মর্য্যাদা এবং তাঁহাদের দোষ-চর্চ্চা নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে আমাদের মতবাদ ও আকিদা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়া দেওয়া হইল।

অতীত ও বর্ত্তমানের ন্যায় ভবিষ্যতেও আমরা ইনশা-আল্লাহ তায়ালা নিজের স্বার্থেই শত্রু-মিত্র, হিতাকাঙ্খী ও ঈর্ষাপরায়ন প্রত্যেক শ্রেণীর সমালোচকেরই মর্য্যাদা ও মূল্য দান করিব এবং সমালোচনার দ্বারা উপকৃত হইতে যত্নবান হইব।

আমরা পুনরায় অনুরোধ করিতেছি—চতুর্থ খলীফা আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেলাফত বরহক্ক বিশ্বাস করা সম্পর্কে এবং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবীগণের দোষ-চর্চ্চা নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে আমাদের ধ্যান-ধারণা, আকিদা ও মতবাদ আমরা সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়া দিলাম। ইহার বিপরীত আমাদের কোন ভুল আমাদেরকে অবহিত করিলে সানন্দে আমরা উহার সংশোধন করিব। উহার জন্য বিজ্ঞাপন, পুস্তিকা বা পত্র-পত্রিকার সম্পাদকীয় ব্যয় করিতে হইবে না।

বক্ষমান পরিশিষ্টের সমালোচনায় যাহাদের আঁতে ঘা লাগিয়াছে তাহাদের গুরু সাহেব যদি এইরূপ সৎ সাহস দেখাইতে পারিতেন তবে তাঁহার সম্পর্কীয় সমালোচনা চিরতরে মুছিয়া দেওয়া যাইত। কিন্তু তিনি ত পূর্ব্ববর্ত্তী মহামনীষী-গণকে উপেক্ষা করিয়াছেন এবং এই যুগের মনীষীগণকেও প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

আলী (রাঃ) খলীফা বরহক্ক

নির্দ্বিধা ও নিঃসংশয়ে আমরা বিশ্বাস করি এবং প্রত্যেক মোসলমানের এই বিশ্বাস রাখিতে হইবে যে, আলী (রাঃ) খোলাফায়ে-রাশেদীনের চতুর্থ জন—চতুর্থ খলীফা-রাশেদ ছিলেন। অবশ্য যে সব ছাহাবীগণ তাঁহার খেলাফতকে স্বীকৃতি দানে বিরত ছিলেন, যথা—তাল্হা (রাঃ), যোবায়ের (রাঃ)—যাঁহারা রসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মুখে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা লাভ করিয়াছিলেন বেহেশতী হওয়ার এবং আয়েশা (রাঃ), মোয়াবিয়া (রাঃ) এবং তাঁহাদের অনুসরণকারী

ছাহাবী ও তাবেয়ীগণ তাঁহারা আমাদের সমালোচনার উর্দ্ধে এবং বিধানগত ভাবেও তাঁহারা নির্দ্দোষ।

একই রোগী সম্পর্কে দুইজন এম, আর, সি, পি সার্টিফিকেটধারী ডাক্তার নিজ নিজ যুক্তিতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা প্রদান করিলে ডাক্তারদ্বয় সম্পর্কে যে ধারণা বিধেয়, উল্লেখিত ছাহাবী-পক্ষদ্বয় সম্পর্কেও আমাদের ধারণা তদ্রূপই। উভয় পক্ষ যোগ্যতা ও একনিষ্ঠতার সহিত নিজ নিজ যুক্তিতে মোসলেম জাতির মঙ্গল ও কল্যাণ কামনায় খেলাফত-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন পন্থাবলম্বী ছিলেন। তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব এবং যোগ্যতা ও একনিষ্ঠতা সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মত্ পোষণের অবকাশ দানে যথেষ্ট ছিল।

আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেলাফত বরহক ও শুদ্ধ হওয়া সম্পর্কে আমাদের পক্ষে দ্বিধার অবকাশ এই জন্য নাই যে, আলী (রাঃ) খেলাফতের পূর্ণ যোগ্যতা-সম্পন্ন ছিলেন এবং মদীনায় খলীফা নির্ব্বাচকমণ্ডলীর অধিক সংখ্যক নির্ব্বাচনকারী যে ভাবেই হউক তাঁহাকে খলীফা মনোনীত করিয়াছিলেন। তখন বা তাঁহার জীবদ্দশায় পরেও তাঁহার বিরুদ্ধে অন্য কেহ খেলাফতের দাবীদারই ছিলেন না। কারণ, সকলেই আলী (রাঃ)কে খলীফা হওয়ার পূর্ণ যোগ্যই গণ্য করিতেন। বিরোধের কারণ ছিল ভিন্ন, যাহার বিবরণ "খারেজী দলের ইতিহাস, খারেজী দলের বিরুদ্ধে জেহাদ, আলী (রাঃ) ও অপর ছাহাবীগণের বিরোধ" আলোচনায় মূল গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। এবং বিস্তারিত বিবরণ বক্ষমান পরিশিষ্টে দেখিতে পাইবেন।

ছাহাবীগণের দোষ-চর্চ্চা নিষিদ্ধ

বাংলা বোখারী শরীফ ষষ্ঠ খণ্ডের আরম্ভেই এই বিষয়ে বিস্তারিত ও প্রামাণিক আলোচনা দেওয়া হইয়াছে। এই সম্পর্কে আমাদের আক্বিদা এবং পূর্ব্বাপর মোসলেম মনীষী ইমামগণের সর্ব্বসম্মত মতবাদ ইহাই যে, আমাদের জন্য ছাহাবীগণের দোষ-চর্চ্চা জায়েয নহে।

ইহা আমাদের অকাট্য আক্বিদা—মতবাদ ও বিশ্বাস। ইহার বিপরীত কোন শব্দ বা বাক্য যদি আমাদের কথায় বা লিখায় পরিলক্ষিত হয় তবে তাহা আমাদের ভুল সাব্যস্ত করিতে হইবে। ঐরূপ ভুল আমাদিগকে জ্ঞাত করিলে আমরা তাহা সংশোধন করিব এবং ভুল জ্ঞাতকারীর চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।

কোন ছাহাবীর প্রতি কোন একটা দূষণীয় শব্দ প্রয়োগ করা অপেক্ষা এক হাজার বার নিজের ভুল স্বীকার করা উত্তম।

উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু

বাংলা বোখারী শরীফ সপ্তম খণ্ডে ২৫৯৪ নং হাদীছের আলোচনায় খারেজী ফের্কা নামক একটি বিশেষ মোরতাদ বা ভ্রষ্ট দলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। উক্ত হাদীছের পরিচ্ছেদ পরে সেই খারেজী ফের্কা সম্পর্কে একটি বিশেষ পরিচ্ছেদ বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত পরিচ্ছেদে ইমাম বোখারী (রঃ) খারেজী ফের্কার বিরুদ্ধে জেহাদ করার হুকুম বয়ান করিয়াছেন। সেই পরিচ্ছেদে বর্ণিত ছয়টি হাদীছে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) একটি বিশেষ ফের্কা বা দলের আবির্ভাব সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করিয়া ঐ দলটি সম্পর্কে তিনি কঠোর মন্তব্য করিয়াছেন। ঐ দলটির প্রতি হযরত (দঃ) ভীষণ ক্রোধ ও ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন। হযরত (দঃ) ঐ দলের লোকদের সম্পর্কে বলিয়াছেন, তাহারা মোসলমান অপেক্ষা উত্তম নামায আদায়কারী, উত্তম রোযা পালনকারী এবং উত্তম আকারে কোরআন শরীফ তেলাওয়াতকারী হইবে। এতদসত্ত্বেও হযরত (দঃ) বলিয়াছেন—

(১) প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা হইবে ইসলাম হইতে সম্পূর্ণরূপে বহির্ভূত। (২) দৃষ্টান্তের মাধ্যমে রসুলুল্লাহ (দঃ) ইহাও বুঝাইয়াছেন যে, তাহারা দ্বীন-ইসলামকে ভীষণভাবে ঘায়েল করিবে এবং উহার বিরাট ক্ষতি সাধন করিবে। (৩) তাহাদেরে হত্যা করা আল্লাহ তায়ালার নিকট এতই পছন্দণীয় যে, তাহাদের হত্যাকারীকে কেয়ামতের দিন বিশেষ ছওয়ার দান করা হইবে। (৪) তাহাদের কোরআন তেলাওয়াত ইত্যাদি এবাদত-বন্দেগী আল্লার নিকট আদৌ কবুল হইবে না। (কারণ, তাহারা মোনাফেক তাহাদের এই সব এবাদত হইবে মোনাফেকীরূপে)। (৫) তাহাদিগকে ব্যাপকভাবে হত্যা করার জন্য হযরত (দঃ) নির্দ্দেশ দিয়াছেন। (৬) হযরত (দঃ) ইহাও বলিয়াছেন, আমি তাহাদিগকে পাইলে এমন ভাবে নিধন করিতাম যেরূপ আল্লাহ তায়ালা আ'দ ও ছমূদ জাতিকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়াছেন।

উক্ত ফের্কা বা দলটি যে, খারেজী ফের্কাই তাহাও ঐ হাদীছসমূহে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত রহিয়াছে। পাঠকবৃন্দ! এই মুহূর্তে সপ্তম খণ্ড বোখারী শরীফের ২৫৯৪ নং হাদীছের পরিচ্ছেদ হইতে ২৬০০ নং হাদীছ পর্য্যন্ত বিশেষ মনযোগের সহিত পাঠ করিয়া ঐ হাদীছ কয়টিকে হৃদয়ঙ্গম করিয়া নিবেন।

এস্থলে একটি প্রশ্নের উদয় হওয়া স্বাভাবিক যে, এই ফের্কা বা দলটির প্রতি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এত ক্রোধ ও কোপ কেন ছিল? হযরতের যমানায় যে মোনাফেক দল বিদ্যমান ছিল তাহাদের প্রতিও ত হযরত (দঃ)কে এত কোপ ও ক্রোধ প্রকাশ করিতে দেখা যায় নাই।

এইরূপ প্রশ্নেরই বিস্তারিত উত্তরের জন্য অত্র পরিশিষ্ট লেখা হইল। ইহাতে খাজেরী দলের জঘন্যতম বড় বড় অপরাধ সমূহ, মোসলেম জাতির প্রতি তাহাদের কুঠারাঘাত এবং মোসলেম সমাজকে বিধ্বস্ত করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের প্রামাণিক ইতিহাস বর্ণনা করা হইবে। খারেজী দলের সেই ইতিহাসই হইবে উক্ত প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর। প্রথমে তাহাদের ইতিহাসের মোটামুটি আভাস দেওয়া হইতেছে, পরে উহার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইবে।

(১) এই খারেজী দলই হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবীগণের দোষ-চর্চ্চা ও মিথ্যা অপবাদের ইতিহাস গড়াইয়াছে।

(২) তাহারাই ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মোসলেম জাতির শান্তি, শৃঙ্খলা ও শক্তির মুল উৎস নেজামে-খেলাফৎ বা সর্ব্বসম্মত, ঐক্যতাপূর্ণ সুদৃঢ় খেলাফৎ-ব্যবস্থাকে বিধ্বস্ত করে।

(৩) ঐ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ষড়যন্ত্র মুলকভাবে তাহারা খলীফা ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ ছড়ায়।

(৪) তাহারাই খলীফা ওসমান (রাঃ)কে নির্ম্মমভাবে শহীদ করে।

(৫) তাহারা খলীফা ওসমানকে শহীদ করার পর গোপন ষড়যন্ত্র চালাইয়া ছাহাবীগণ সহ সমগ্র মোসলেম জাতির মধ্যে দ্বন্দ্ব ও কলহ সৃষ্টি করে।

(৬) ইতিহাসের সর্ব্বাধিক হৃদয় বিদারক ঘটনা—"জামাল-যুদ্ধ" যাহার ফলে মোসলমানদেরই দুই পক্ষে দশ হাজার লোক শহীদ হইয়াছিলেন একমাত্র এই খারেজী দলের জঘন্য ষড়যন্ত্রেই সংঘটিত হইয়াছিল।

(৭) তাহারাই প্রথমে গা-ঢাকা দিয়া আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সঙ্গে মিশিয়া থাকে এবং শক্তি সঞ্চয়ের পর তাহারা আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষনা করে।

(৮) শক্তি সঞ্চয়ের পর দলবদ্ধভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া তাহারা তাহাদের মতবাদ বর্জ্জনকারী সমুদয় মোসলমানকে, এমনকি চার খলীফা সহ ছাহাবীগণকেও কাফের সাব্যস্ত করে। সেমতে তাহারা সুযোগ বুঝিয়া মোসলমানদের উপর আক্রমণ, হত্যা এবং লুণ্ঠন চালায়।

(৯) তাহারাই গোপন আক্রমণে আলী (রাঃ)কে শহীদ করে।

(১০) সর্ব্বাধিক জঘন্য ও স্থায়ী অপরাধমূলক কাজ তাহাদের ইহাও ছিল যে, তাহারা তাহাদের হীন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য খলীফা ওসমানের এবং আরও কতিপয় বিশিষ্ট ছাহাবীবর্গের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ ও গর্হিত অভিযোগ গোয়েবলের ন্যায় এমনভাবে ছড়ায় ও প্রচার করে যে, ঐ সব মিথ্যা ও গর্হিত বিষয়বস্তুগুলি

সাধারণ্যে সত্যে পরিণত হইয়া যায়। এমনকি ইতিহাস-সঙ্কলক যাহাদের নীতি হইল, প্রচলিত বর্ণনা বিবৃতি ও বিবরণ ইত্যাদি সংগ্রহ (Collection) করা; বাছনী (Selecton) করা তাহাদের কাজ নহে—তাহাদের সঙ্কলিত ইতিহাস গ্রন্থেও সেই সব মিথ্যা ও গর্হিত অপবাদগুলি স্থান পায়। এই ভাবে তাহারা ইতিহাসকে বিকৃত করার প্রয়াস পায়। অধিকন্তু তাহারা ইতিহাস বিকৃতির উপর ক্ষান্ত হয় নাই; তাহারা তাহাদের গর্হিত অপবাদের সমর্থন ও সূত্ররূপে অনেক অলিক কথা হাদীছ আকারেও জাল করিয়া প্রচার করে।

তাহাদের এই অপরকর্ম্মটির বিষ ফল ছিল সুদূর প্রসারী ও দীর্ঘস্থায়ী। এমনকি পরবর্ত্তী কালে যখন তাহাদের স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী ও তাঁহার বর্ণিত নিদর্শন সমূহের সাহায্যে তাহাদিগকে চিনিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়, তখন হইতে তাহাদের নিধন-কার্য আরম্ভ হয়। সর্ব্ব প্রথম হযরত আলী (রাঃ) তাহাদিগকে ব্যাপকভাবে হত্যা করিয়াছিলেন, তাঁহার পরে মোয়াবিয়া (রাঃ) তাহাদের উপর ধারাবাহিক হত্যা কার্য্য চালাইয়া তাহাদের দলকে নিশ্চিহ্ন করিয়াছিলেন।

এইভাবে তাহাদের দল ধ্বংস হয়, কিন্তু খলীফা ওসমান (রাঃ) এবং বিশিষ্ট বিশিষ্ট ছাহাবীবর্গের নামে তাহাদের গোয়েবলী প্রচারণায় সৃষ্ট মিথ্যার বহর ইতিহাস-গ্রন্থাবলীতে থাকিয়া যায়। যাহা দ্বারা আজও বহু লোক বিভ্রান্ত হইতেছে। অধিকন্তু কেহ কেহ ঐ সব ইতিহাস কুড়াইয়া প্রবন্ধ ও পুস্তকের মাধ্যমে সমাজ বিভ্রান্ত হওয়ার স্থায়ী ও সহজ ব্যবস্থা করিতে সুযোগ পাইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে মাওলানা নামে পরিচিত ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন জনাব আবুল-আ'লা মৌদুদী সাহেবের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হালে মৌদুদী সাহেব উর্দ্দু ভাষায় ৩৫১ পৃষ্ঠার একটি পুস্তক জন্ম দিয়াছেন। পুস্তকটির বিষয়বস্তু হইল—"মোসলেম সমাজ হইতে খেলাফত-তন্ত্র বিতাড়নকারী অপরাধীদেরে সেনাক্ত করা।" পরম পরিতাপের বিষয়, মৌদুদী সাহেব উক্ত অপরাধের প্রথম নম্বর আসামী সাব্যস্ত করিয়াছেন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দুই তনয়ার জামাতা খলীফা ওসমান (রাঃ)কে। এতদভিন্ন খলীফা ওসমান (রাঃ)কে অভিযুক্ত করার জন্য তাঁহার সহকর্ম্মী অনেক ছাহাবীর নামে মিথ্যা অপবাদ গড়াইয়াছেন এবং অতিরঞ্জিতভাবে দোষারোপ করিয়াছেন। মৌদুদী সাহেব তাঁহার এই সেনাক্তের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন ঐ সব ভিত্তিহীন মিথ্যা অপবাদসমূহের উপর যেইগুলিকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে গড়াইয়া ছিল ইসলাম ও মোসলমানদের চিরশত্রু কুখ্যাত খাজেরী দল তাহাদের হীন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য—তথা মোসলমানদের খেলাফৎ-ব্যবস্থাকে বিধ্বস্ত করার জন্য। মৌদুদী সাহেব খারেজী দলের জন্ম দেওয়া অপবাদ ও অপপ্রচারগুলি কুড়াইয়াই

ক্ষান্ত হন নাই, ঐ সব পূতি-পচাগুলিকে স্বীয় পাণ্ডিত্যের রংপালিশ দ্বারা সাজাইয়া আকর্ষণীয় রূপ দান করিয়াছেন। এক কথায় তাঁহার পুস্তকটি কুখ্যাত খারেজী দলের মুখপাত্রের ভুমিকা পালন করিয়াছে।

আমাদের দুঃখ-বেদনা, খেদ ও ক্ষোভের সীমা থাকে না ইহা দেখিয়া যে, প্রবীণ মৌদুদী সাহেব তাঁহার সমুদয় জ্ঞান ও গবেষণা (Stuby এবং Research) কতিপয় বিশিষ্ট ছাহাবীর দোষ-কুড়ানো ও দোষ-চর্চ্চায়ই খতম করিয়াছেন। কিন্তু ইসলাম ও মোসলেম বিদ্বেষী কুখ্যাত খারেজী দলের খোঁজ সমাজকে দেওয়ার কোন উদ্যোগ তিনি গ্রহণ করেন নাই। ছাহাবীদের আমলের কেলেঙ্কারীর ইতিতাস সমাজে ছড়াইতে তিনি তাঁহার পাণ্ডিত্যের সর্ব্বময় পুঁজি ব্যয় করিয়াছেন, কিন্তু সেই সব কেলেঙ্কারীর মূলে যে পঞ্চম বাহিনীটি ছিল—সমাজের নিকট তাহাদিগকে ধরাইয়া দেওয়ার কোন প্রচেষ্টাই তিনি করেন নাই।

আরও একটি বিষয় অত্যন্ত বেদনাদায়ক যে—খাজেরী দল তাহাদের মিথ্যা অপবাদের পক্ষে কিছু সংখ্যক হাদীছ জাল করার প্রয়াস পাইয়া ছিল বটে এবং তাহাদের গর্হিত ভিত্তিহীন অপবাদগুলিকে "গোয়েবলী" প্রচারণার দ্বারা ইতিহাসের রূপ দানে কৃতকার্য্য হইয়াছিল বটে, কিন্তু মোসলেম উম্মতের জন্য আল্লাহ তায়ালার বিশেষ করুণা ও রহমতে ঐ সব রোগ-বীজাণুর প্রতিষেধক লাভের উত্তম সুযোগও বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ সব জাল হাদীছ শুধু (Collector) সংগ্রহকারীদের গ্রন্থে স্থান লাভ করিয়া থাকিলেও জাল হাদীছের একটি সংখ্যাও ছনদের কষ্টি পাথরে (Selector) বাছনকারীদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। সুতরাং কেহ যদি কেবল সংগ্রহ-কারীদের ঝোলা হইতে শুধু পূতি-পচা কুড়ায় তবে তাহার দুর্ভাগ্যের জন্য সে নিজেই দায়ী। ইতিহাসের বেলায়ও তদ্রূপ—আমাদের ইতিহাস গ্রন্থগুলি খারেজীদের প্রচারিত বিকৃত ইতিহাসের উপরই ক্ষান্ত নহে। উহাতে সত্য ইতিহাসের আলোও পূর্ণ মাত্রায় রহিয়াছে। অতএব যদি কেহ ইতিহাস গ্রন্থাবলী হইতে পচা-গান্দা বিকৃত ইতিহাসই বোকচা বাঁধিয়া নিয়া আসে এবং সমাজে উহার দুর্গন্ধ ছড়ায়, তবে লা'নৎ ও অভিশাপের ভাগী সে-ই হইবে। তাহার এই খোড়া কৈফিয়ত কেহই শুনিবে না যে, আমি যাহা কিছু কুড়াইয়াছি সবই ইহিতাস হইতে আহরিত।

মৌদুদী সাহেবের উক্ত পুস্তকে তাঁহার ভুমিকা ঠিক এইরূপই। তিনি উহাতে ইতিহাস গ্রন্থাবলীর হাওয়ালা—রেফাসেন্স (Reference) বা বরাতের বহর সাজা-ইয়াছেন, যাহা দেখিয়া সাধারণভাবে মানুষ অধিক বিভ্রান্ত হয়। কিন্তু তাঁহার বোকচায় সমাবেশ কৃত সবই যে, খারেজী দলের খন্দক হইতে নির্গত পূতি-পচা তাহা লক্ষ্য করিলে ঐ সব রেফাবেন্সের কোন মূল্যই থাকে না।

মৌদুদী সাহেব তাঁহার পুস্তকে খলীফা ওসমান (রাঃ) ভিন্ন আরও বিশিষ্ট বিশিষ্ট ছাহাবীগণকে ঘায়েল করিয়াছেন এবং উহার জন্যও মাল-মশল্লা সংগ্রহ করিয়াছেন খারেজীদের দোকান হইতেই। খারেজী দলের উদ্দেশ্য ছিল—খলীফা ওসমান (রাঃ)কে বদনাম করিয়া মোসলমানদের সুখ সমৃদ্ধি ও শক্তির উৎস খেলাফৎ-ব্যবস্থাকে বিধ্বস্ত করা এবং বড় বড় ছাহাবীগণকে অপবাদ দ্বারা ঘায়েল করিয়া ছাহাবীদের প্রতি মোসলমানদের শ্রদ্ধা বিনষ্ট করতঃ মোসলমানদের দ্বীন-ঈমানকে শিথিল করিয়া দেওয়া। আর মৌদুদী সাহেবের উদ্দেশ্য হইল—পূর্ব্বাপর ইমামগণের মতের বিপরীত তিনি যে একটি মতবাদ গড়াইয়া রাখিয়াছেন যে, "ছাহাবীগণ মোসলমানদের জন্য আদর্শ নহেন"; ছাহাবীগণের দোষ-চর্চ্চা করিয়া ঐ কুখ্যাত মতবাদের প্রতি জনমতকে আকৃষ্ট করা।

খারেজী দল এবং মৌদুদী সাহেব উভয়ের কুমতলব সিদ্ধির পথ রুদ্ধ করিতে হইলে তাহারা বিভিন্ন ছাহাবীর প্রতি যে যে অপবাদের কর্দ্দম ছুড়িয়াছে উহার প্রত্যেকটির ধুম্রজাল ছিন্ন করিয়া সত্য প্রকাশ করার প্রয়োজন রহিয়াছে। কিন্তু পরিশিষ্টকে সংক্ষেপ করার তাকিদে নমূনা স্বরূপ শুধু কেবল খলীফা ওসমানের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করা হইবে। অবশ্য প্রথমে ছাহাবা-শ্রেণী সম্পর্কে মোসলমানদের কর্ত্তব্যের উপর আলোকপাত করা হইবে। তারপর ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনা করা হইবে। অতঃপর খারেজী দলের উৎপত্তি এবং তাহাদের ষড়যন্ত্রমূলক কার্য্যকলাপের ইতিহাস বর্ণনা করা হইবে—যাহার মধ্যে খারেজী দলের প্রতি হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ভয়ঙ্কর ক্রোধ এবং ক্ষোভ ও কোপের মূল কারণ নিহিত রহিয়াছে। তারপর খলীফা ওসমানের প্রতি আরোপিত বিভিন্ন অপবাদ খণ্ডন করা হইবে। এই প্রসঙ্গে খারেজী দলের মুখপাত্র মৌদুদী সাহেবের উক্ত কুখ্যাত পুস্তকের কিছু উদ্ধৃতি দেখাইয়া উহার অসারতা প্রমাণ করা হইবে।

وما علينا الا البلاغ

আমাদের দায়িত্ব হইল—সত্যকে পৌঁছাইয়া দেওয়া।

ছাহাবা কেরাম সম্পর্কে মোসলমানদের কর্ত্তব্য

আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টির সেরা হযরত মোহাম্মদ (দঃ)কে অসংখ্য অলৌকিক গুণাবলীর সহিত বিশেষ করুণারূপে জগতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। হযরতের একটি বিশেষ অলৌকিক গুণ ছিল তাঁহার পরশ-দৃষ্টি। যেই সৃজনকর্ত্তার কুদরতে পরশ পাথরে এই তাছীর আছে যে, উহার মামুলী ঘর্ষণে লোহা স্বর্ণ হইয়া যায় সেই সৃজনকর্ত্তার কুদরতেই রসুলের পরশ-দৃষ্টির তাছীরে অল্প সময়ে মাটির মানুষ সোনার মানুষে পরিণত হইয়া যাইত।

হযরতের এই অলৌকিক গুণটিকেই দৃষ্টান্ত দ্বারা এক হাদীছে বুঝান হইয়াছে—

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود من الريح المرسلة

"হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বসন্তের স্বর্ণ-ফলানো মলয় বায়ু অপেক্ষা অধিক ও দ্রুত জীবনীশক্তি সঞ্চারণকারী ছিলেন।" (বোখারী শরীফ)

তাছীর গ্রহণে ক্ষেত্র ও পাত্রের যোগ্যতা তথা অক্ষুণ্ণ ঈমানের সহিত যে ব্যক্তি রসুলুল্লার পরশ-দৃষ্টি এবং সাহচর্যে সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন তাঁহাকেই ছাহাবী বলে।

হযরতের পরশ-দৃষ্টিতে ছাহাবীদের মধ্যে যে গুণাগুণের সঞ্চার হইয়াছিল পরবর্ত্তী লোকদের পক্ষে তাহার অনুভূতি দুরূহ হইলেও আল্লাহ এবং রসুলের যে সব সাক্ষ্য তাঁহাদের জন্য রহিয়াছে উহার দ্বারা তাঁহাদের সেই গুণাগুণের ক্রিয়া ও ফলাফল লক্ষ্য করা যায়। যথা, আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا -

"মোহাম্মদ (দঃ) আল্লার রসুল। আর তাঁহার ছাহাবীগণ কাফেরদের প্রতি অতি কঠোর এবং পরস্পর কোমল। তাঁহাদিগকে দেখিবে—আল্লার প্রতি খুব নত, রুকু-সেজদা রত, আল্লার সন্তুষ্টি ও করুণার অন্বেষণে মগ্ন ও ব্যতিব্যস্ত। আল্লার প্রতি অনুরাগের আভা তাঁহাদের চোখে-মুখে উদ্ভাসিত। তাঁহাদের এই গুণাবলীর বর্ণনা তৌরাত এবং ইঞ্জিলেও বিদ্যমান রহিয়াছে। (২৬ পাঃ ১১ রুঃ)

হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন— لا تسبوا اصحابى فلو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه

"আমার ছাহাবীদিগকে মন্দ বলিও না ; তোমাদের কেহ ওহোদ পর্ব্বত পরিমাণ স্বর্ণ দান-খয়রাত করিলেও তাঁহাদের মাত্র এক মুদ্দ (চৌদ্দ ছটাক) বা তার অর্দ্ধ পরিমাণ (কোন বস্তু) দানের সমান হইতে পারিবে না।" (বোখারী ও মোসলেম)

রসুলুল্লাহ (দঃ) আরও বলিয়াছেন—الله الله فى اصحابى لا تتخذ وهم غرضا من بعدى "আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহকে ভয় কর, আমার ছাহাবীদের সম্পর্কে—আমার পরে তোমরা তাহাদের প্রতি দোষারোপ করিও না।" (মেশঃ)

বিশিষ্ট ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন—

اولئك اصحب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا افضل هذه الامة ابرها قلوبا واعمقها علما......اختارهم الله لصحبة نبيه......

"ঐ সকল লোক—মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবীগণ এই উম্মতের মধ্যে সর্ব্বোত্তম ছিলেন। তাঁহাদের অন্তঃকরণ ছিল সর্ব্বাধিক সৎ-সাধু ও নির্ম্মল। তাঁহাদের এল্‌ম ও জ্ঞান ছিল সর্ব্বাধিক গভীর, তাঁহাদের স্বভাব ও প্রকৃতি ছিল সরল। আল্লাহ তায়ালা স্বীয় বিশিষ্ট পয়গাম্বরের সাহচর্যের জন্য এবং স্বীয় দ্বীনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য বাছিয়া নিয়া ছিলেন তাঁহাদিগকে। সুতরাং হে মোসলেম সমাজ! তোমরা তাঁহাদের ক্ষেত্রে তাঁহাদের বৈশিষ্ট্যের প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রাখিয়া চলিও। (মেশকাত শরীফ)

ছাহাবীদের জীবন-ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে ছাহাবীদের অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যের শত শত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। নিম্নে একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হইল—

ছাহাবী তাল্‌হা (রাঃ) তিনিও খলীফা ওসমানের শহীদ হওয়ার পর আলী রাজিয়াল্লাহু আনহুর বিপক্ষে অস্ত্র ধারণকারীদের একজন ছিলেন। ছাহাবীদের সম্পর্কে ভ্রান্ত মতাবলম্বীগণ তাঁহার কার্য্যকে অন্যায়ের মধ্যে শামিল করিয়া থাকে। একজন সাধারণ লোকের কার্য্যবিধির সহিত তুলনার দৃষ্টিতে উহাকে অন্যায় বলার সুযোগও রহিয়াছে। মৌদুদী সাহেব ত এই ব্যাপারে তাল্‌হা রাজিয়াল্লাহু আনহুর উপর জঘন্যতম আক্রমণ করিয়াছেন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার নিকট তাল্‌হা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর কার্য্যবিধি এতই মকবুল ছিল যে, এই অস্ত্র ধারণের মাধ্যমে তাঁহার আত্ম-বিসর্জনকে আল্লাহ তায়ালা শহীদ হওয়ার সর্ব্বোচ্চ মর্য্যাদা দান করিয়াছেন, যাহার প্রমাণ ইতিহাসে রহিয়াছে—

তাল্‌হা (রাঃ) আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিপক্ষে বছরার রণাঙ্গনে শহীদ হইয়া ছিলেন এবং বছরায়ই সমাহিত হইয়া ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর বহু দিন পর এক ব্যক্তি একাধারে তিন রাত্র স্বপ্নে দেখিল—তাল্‌হা (রাঃ) তাহাকে বলিতেছেন, حولوني من قبري فقد اذاني الماء "আমার বর্ত্তমান কবর

হইতে আমাকে সরাইয়া নেও, পানির দরুণ আমার কষ্ট হয়।" বছরার তৎকালীন শাসনকার্ত্তা ছিলেন ইবনে আব্বাস (রাঃ)। ঐ ব্যক্তি তাঁহার নিকট স্বীয় স্বপ্ন ব্যক্ত করিল। ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রচেষ্টায় বছরার লোকগণ দশ হাজার দেরহামে একটি বাড়ী ক্রয় করিয়া তাল্‌হা (রাঃ)কে তথায় স্থানান্তরের ব্যবস্থা করিল। তাল্‌হা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর দেহ কবর হইতে বাহির করা হইলে দেখা গেল—বাস্তবিকই (নিকটবর্ত্তী একটি ঝরণার) পানিতে তাঁহার দেহের অংশ বিশেষ পানি-ভিজা সবুজ হইয়া গিয়াছে। واذا هو كهيئته يوم اصيب "এবং দেখা গেল, তাঁহার দেহ অপরিবর্ত্তিত রূপে ঠিক ঐ অবস্থায়ই রহিয়াছে যে অবস্থায় তিনি প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন। (বেদায়াহ-ওয়াননেহায়াহ, ৭—২৪৭)

প্রিয় পাঠক! লক্ষ্য করুন, কাফেরদের বিরুদ্ধে একমাত্র দ্বীন ইসলামের জন্য একনিষ্ঠতার সহিত জেহাদে প্রাণ বিসর্জন দিলে যে মর্ত্তবার শহীদ হওয়া যায় আল্লাহ তায়ালা তাল্‌হা (রাঃ)কে সেই মর্ত্তবাই দিয়াছেন। অথচ মৌদুদী সাহেব তাল্‌হা রাজিয়াল্লাহু আনহুর উক্ত কার্যক্রমকে জাহেলিয়ত তথা অন্ধকার বা কুফুরী যুগের কার্য্য বলিয়া কটাক্ষ করিয়াছেন—কত বড় ধৃষ্টতা!

এস্থলে অন্ধকার যুগের কার্য্যক্রমের উল্লেখ ত একমাত্র ঈমানহীন লোকের পক্ষেই সম্ভব হইতে পারে। প্রকৃত প্রস্তাবেত এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণ মোসলমানের একনিষ্ঠতা যাহা হইতে পারে তাল্‌হা রাজিয়াল্লাহু আনহুর একনিষ্ঠতা যে উহা অপেক্ষাও কত উর্দ্ধে ছিল তাহা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন। তাঁহার কার্য্যক্রমের সূক্ষ্ম বিশুদ্ধতা এবং অন্তরের একনিষ্ঠতা যে পরিমাণ পরিপক্ক ও অসাধারণ ছিল তাহা ব্যক্ত করা ত দুরের কথা উহার পরিমাপও আমাদের পক্ষে সহজ নহে; তুলনা মূলকরূপের কিছু আভাস দেওয়া যাইতে পারে—

আলী (রাঃ) ও তাল্‌হা (রাঃ) উভয়ের মধ্যে যে বিরোধ ছিল এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণতঃ মুখে না হইলেও অন্তরে এই অবস্থা বিরাজমান থাকে—দলগত বা ব্যক্তিগত বিদ্বেষ পুরা করা, দ্বন্দ্বের মাধ্যমে ক্ষমতা কুক্ষিগত করা বা কোন স্বার্থের সুযোগ লাভ করা—ইত্যাদি। পক্ষান্তরে তাল্‌হা (রাঃ) এবং তৎপক্ষীয় ছাহাবীদের অভ্যন্তর যে ঐ শ্রেণীর হীন উদ্দেশ্যাবলী হইতে কত পাক-পবিত্র ছিল তাহা বিতর্কে প্রকাশ করা না গেলেও আল্লার নিকট লুক্কায়িত ছিল না।

আমাদের সঙ্কীর্ণ জ্ঞান ও ভাষায় উক্ত ছাহাবীগণের স্বচ্ছ উদ্দেশ্য ও নির্ম্মল একনিষ্ঠতার বাস্তবরূপ প্রকাশ করা সহজ সাধ্য নহে, তবুও নিম্নে তাঁহাদের মূল উদ্দেশ্যের কিঞ্চিৎ আভাস প্রদানের চেষ্টা করা হইল—

খারেজী দলের ইতিহাস আলোচনায় জানিতে পারিবেন, হিজরী ২৫ সনে ছদ্মবেশে মোসলমান দলভুক্ত হইয়াছিল এক ইহুদী মোনাফেক যাহার নাম আবদুল্লাহ

ইবনে সাবা। সেই জঘন্য মোনাফেকের ষড়যন্ত্রে নূতন-পুরাতন মোনাফেক গোষ্ঠির সংযোগে মোসলমানদের শক্তি শান্তি ও শৃঙ্খলার উৎস—সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়মতান্ত্রিক খেলাফৎকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে একটি গুপ্তদল সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহাদের পরিকল্পনার প্রথম পদক্ষেপে তাহাদেরই ঘাতকদলের হাতে খলীফা ওসমান (রাঃ) নির্ম্মমভাবে শহীদ হন। এই গুপ্ত দলটির জঘন্য উদ্দেশ্য যে কত সুদুর প্রসারী ও সুপরিকল্পিত ছিল তাহার সামান্য আঁচ করা যায় ইহা দ্বারা যে, তাহারা খলীফা ওসমানকে শহীদ করিয়া প্রথমতঃ মোনাফেকীর সহিত গা-ঢাকা দিয়া থাকে আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পক্ষে। কিন্তু দ্বিতীয় ধাপে তাহাদেরই সুসঙ্গবদ্ধরূপে গঠিত ঘাতক দল এক যোগে আলী (রাঃ) মোয়াবিয়া (রাঃ) এবং আম্‌র ইবনুল আছ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর উপর ফজর নামাযের সময়ে গুপ্ত আক্রমণের ষড়যন্ত্র করে। সেই আক্রমণে আলী (রাঃ) শহীদ হন, মোয়াবিয়া (রাঃ) ভীষণভাবে আহত হন এবং আম্‌র ইবনুল আছের স্থলে অপর এক ব্যক্তি শহীদ হন। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে ইনশা-আল্লাহ তায়ালা এই সন্ত্রাসবাদী দলটির বিস্তারিত ইতিহাস পর্য্যালোচিত হইবে।

উক্ত সন্ত্রাসবাদী মোনাফেক উপদল কর্ত্তৃক খলীফা ওসমানের হত্যার দরুণ মোসলেম সমাজের উন্নতি ও সমৃদ্ধির উৎস সুপ্রতিষ্ঠিত-খেলাফৎ বিধ্বস্ত হওয়ার পর দেখা গেল, পরবর্ত্তী খলীফা আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নির্ব্বাচনে ঐ সন্ত্রাসবাদী দলটি জবরদস্তি মূলক গায়ে পড়িয়া মোড়লগিরী ও মাতব্বরী করিতেছে। আরও দুঃখের সহিত প্রত্যক্ষ করা গেল যে, ঐ সন্ত্রাসবাদীগণ ছদ্মবেশে আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পক্ষে রহিয়াছে—যাহা স্বয়ং আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুরও ইচ্ছা ও সন্তুষ্টির পরিপন্থী ছিল। কিন্তু তাহাদের দ্বারা অবরুদ্ধ মদিনায় তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাবলম্বনে সাহস পাইতেছিলেন না। এমনকি তৎসম্পর্কে তাঁহাকে বলা হইলে, তিনি তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করতঃ বলিলেন—"তাহাদের বিরুদ্ধে কিরূপে ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়, অথচ তাহারা আমাদের আয়ত্তে নহে, আমরাই তাহাদের আয়ত্তে" (তারীখে কামেল, ৩—১০০)। আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর দৃষ্টিতে নিশ্চয়ই ঐ পরিস্থিতিতে তাঁহার উপর ন্যস্ত খেলাফতের দায়িত্ব পালন করিয়া যাওয়াই মোসলেম সমাজের জন্য কল্যাণমূলক ছিল, তাই তিনি এই পথেই অগ্রসর হইলেন।

এই পরিস্থিতিতে তাল্‌হা (রাঃ) এবং যোবায়ের (রাঃ) যাঁহারা আশারা-মোবাশ্‌-শারাহ্‌ তথা ইহজীবনেই আল্লার রসুল কর্ত্তৃক বেহেশতের প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত দশজন

ছাহাবীর অন্যতম দুইজন ছিলেন। তাঁহারা একমাত্র মোসলেম সমাজের কল্যাণের উদ্দেশ্যে খেলাফৎ বিধ্বস্তকারী সন্ত্রাসবাদীদের প্রভাবমুক্ত শক্তিশালী খেলাফত কাঠামো প্রতিষ্ঠার সাহসে বুক বাঁধিয়া সন্ত্রাসবাদী দল কবলিত মদীনা ত্যাগ করতঃ মক্কায় চলিয়া গেলেন। তথায় আয়েশা (রাঃ)কে ঐ উদ্দেশ্যে দৃঢ়পদ পাইলেন। আরও অনেক ছাহাবী ঐ উদ্দেশ্যে তাঁহাদের সঙ্গে যোগদান করিলেন এবং সকলেই উক্ত সন্ত্রাসবাদী উপদলটির প্রভাবমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতঃ নেজামে-খেলাফৎ পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় ঝাপাইয়া পড়িলেন। সিরিয়া অঞ্চলের শাসনকর্ত্তা মোয়াবিয়া (রাঃ)ও এই উদ্দেশ্য লইয়া দাঁড়াইলেন।

মোনাফেকদের চিরাচরিত স্বভাব "মান্-না-মান্ ম্যঁায় তেরা মেহ্মান" রূপে ঐ মোনাফেকগোষ্ঠি সন্ত্রাসবাদী দলটি আলী রাজিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষে গা-ঢাকা দেওয়ায় গোটা আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পক্ষের সহিত তাঁহাদের সংঘর্ষ বাঁধে। কিন্তু তাঁহাদের মূল লক্ষ্যস্থল ছিল, সুপ্রতিষ্ঠিত খেলাফৎ ধ্বংসকারী সন্ত্রাসবাদী দলটিকে উৎখাত করিয়া সুষ্ঠু খেলাফৎ-কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা। এই লক্ষ্যে তাল্হা (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীগণ তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য—স্বচ্ছ একনিষ্ঠতা, ও আল্লার সন্তুষ্টি লাভের নির্ম্মল স্পৃহাকে এত সুদৃঢ় ও সুকঠিনরূপে আঁকড়িয়া রহিয়াছিলেন যে, তাহা একমাত্র রসুলের পরশ-দৃষ্টিতে তৈরী ব্যক্তিদের জন্যই সম্ভব হইয়াছে। আলী (রাঃ) ও তাল্হা (রাঃ) উভয় পক্ষই আল্লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মোসলেম সমাজের মঙ্গল ও কল্যাণ কামনার যে অনাবিল অকপট একনিষ্ঠতার ধারক ছিলেন উহারই দ্বারা তাঁহারা আল্লাহ তায়ালার নিকট এত মর্য্যাদাবান হইয়াছেন যে, পরস্পর বিরোধের মধ্যেও আল্লাহ তায়ালা তাঁহাদের উভয় পক্ষকে শহীদ হওয়ার সর্ব্বোচ্চ মর্ত্তবা দান করিয়াছেন।

এই সূক্ষ্ম কিন্তু বাস্তব ও সুগভীর তথ্যটিকে উপেক্ষা করিয়া যাহারা আগুণ নিয়া খেলা শুরু করেন তাহাদিগকে সতর্ক করার জন্য দার্শনিক কবি মাওলানা রুমীর একটি দর্শন স্মরণ করাইয়া দিতেছি। ভাষা-জ্ঞানের সঙ্কীর্ণতার দরুণ উহার বাংলা ব্যাখ্যায় অসমর্থ হইয়া কবির মূল উক্তিটি উদ্ধৃত করা হইল মাত্র। নিজে না বুঝিলে কোন দার্শনিক আলেমের সাহায্য গ্রহণ করিবেন—

کار پاکان را قیاس از خود مگیر — گرچه ماند در نوشتن شیر و سیر

অন্য রূপে যাহা অধিক উপভোগ্য—

کار پاکان را قیاس از خود مگیر — گرچه ماند در نوشتن شیر و شیر
شیر ان باشد که مردم میدرند — شیر آن باشد که مردم میخورند

এই দীর্ঘ আলোচনার উদ্দেশ্য হইল আল্লার রসুলের ছাহাবীগণ সম্পর্কে ইসলামের নীতি ও মোসলমানদের কর্ত্তব্য দেখাইয়া দেওয়া যে, ছাহাবীগণের দোষ-চর্চ্চা দোষ-কুড়ানো ত দূরের কথা তাঁহাদের কোন বিষয়কে হাল্‌কা ও সাধরণ দৃষ্টিতে দেখিয়া তাঁহাদের সমলোচনা করাও জঘন্য কাজ। স্বয়ং ছাহাবীদের মধ্যেও আমরা দেখিতে পাই, তাঁহারা ছাহাবী নয় এমন ব্যক্তিকে ছাহাবীর সমালোচনা হইতে বিরত রাখিয়াছেন; এই বলিয়া যে, তিনি ত আল্লার রসুলের ছাহাবী—তিনি আল্লার রসুল হইতে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। বোখারী শরীফ ৫২১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে, একদা মোয়াবিয়া (রাঃ) এশার নামাযান্তে বেতের নামায এক রাকাত পড়িলেন। তাঁহার নিকটেই ছাহাবী ইবনে আব্বাসের খাদেম দাঁড়াইয়া ছিল। সে ইবনে আব্বাসের নিকট আসিয়া ঐ কথা উল্লেখ করিলে, ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাহাকে বলিলেন—دعه فانه قد صحب رسول الله صلى الله عليه و سلم "খবরদার! তুমি তাঁহার সমালোচনা করিও না, তিনি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবী।"

ছাহাবীগণকে পরস্পর সমালোচনা বা দোষারোপ করিতে দেখিয়া ছাহাবী নয় লোকদের দুঃসাহসী হইয়া কখনও সেই আগুন হাতে নেওয়া চাই না। যেরূপ শাহাজাদাগণকে পরস্পর মারামারি করিতে দেখিয়া শাহাজাদা নয় ব্যক্তি কোন শাহাজাদার উপর হাত উঠাইলে তাহাকে অবশ্যই শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

অধুনা—ঈমান শিথিলতার যুগে মোসলেম সমাজের এক বিরাট অংশই এই ব্যধিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহারা ছাহাবীদের যুগে সৃষ্ট কেলেঙ্কারীর জন্য ছাহাবা কেরামকেই দায়ী সাব্যস্ত করিয়া তাঁহাদের দোষ-চর্চ্চা করে বা অন্ততঃ নিজ বিবেকে তাঁহাদিগকে দোষী গণ্য করিয়া থাকে। মোসলেম সমাজে এই ব্যধির প্রাদুর্ভাব আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকের সৃষ্ট খারেজী দলের আর একটা বিরাট সাফল্য। কারণ, তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হইল মোসলমানদের ক্ষতি সাধন করা। মোসলমানদের জন্য পার্থিব ক্ষতি অপেক্ষা তাহাদের প্রাণবস্তু দ্বীন-ইসলাম ও ঈমানের ক্ষতি অনেক বড়।

দ্বীন-ইসলাম ও ঈমান ভূপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হইয়াছে আল্লাহ তায়'লার তরফ হইতে ফেরেশ্‌তা জিব্রাইল মারফৎ। এই ধাপে উহার বাহক ছিলেন একমাত্র হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)কে কেন্দ্র করিয়া একটি সমাজ কায়েম হয়। উক্ত সমাজই সেই দ্বীন-ইসলাম ও ঈমানকে নিজেদের মধ্যে বিস্তার করিয়াছে এবং বিশ্ববাসীর সম্মুখে উহাকে তুলিয়া ধরিয়াছে। সেই সমাজটির আসল গোড়াই ছিলেন ছাহাবা-কেরাম যাঁহাদেরকে স্বয়ং রসুলুল্লাহ (দঃ) সরাসরিরূপে শুধু শিক্ষা দানই নয়, বরং পুরাপুরি গঠন করিয়াছিলেন।

আল্লাহ তায়ালা তাঁহার রসুলের উপর চারিটি দায়িত্ব চাঁপাইয়াছিলেন। পবিত্র কোরআনের বর্ণনা—يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة (১) আল্লার কেতাবের আয়াতগুলি পাঠ করিয়া শুনাইবেন। (২) লোকদের আত্ম-শুদ্ধি ও চরিত্র গঠন করিবেন। (৩) আল্লার কেতাবের তালীম তথা ব্যাখ্যা ও শিক্ষা দিবেন। (৪) ঐ ব্যাখ্যা ও শিক্ষার শুধু ব্যবহারিক জ্ঞানই নয়, বরং (Practical Traning) কার্য্যপদ্ধতি-অভ্যাসও করাইবেন।

আল্লার রসুলের উক্ত দায়িত্ব চতুষ্টয় সরাসরি সম্পাদনের ক্ষেত্র ও পাত্র ছিলেন একমাত্র ছাহাবা-কেরাম। সেই ছাহাবা-কেরামের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, জ্ঞান-বিবেকে, মনে-মুখে, সিনায় সিনায় এবং নৈতিক চরিত্রে চড়িয়াই আল্লার রসুল কর্ত্তৃক বিতরিত দ্বীন, ইসলাম ও ঈমান পরবর্ত্তী মোসলমানদের পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। তাঁহাদের দ্বারাই দ্বীন ও ইসলাম একটি সুষ্ঠরূপ ও সুবিন্যস্ত আকার ধারণ করিয়া পরম্পরা আমাদের পর্য্যন্তও পৌঁছিয়াছে।

যেই সমাজটির মাধ্যমে আল্লার রসুলের পরিবাহিত দ্বীন, ইসলাম ও ঈমান আমাদের পর্য্যন্ত পৌঁছা সম্ভব হইয়াছে, উহার আসল গোড়া এবং মূল ভিত্তি হইল ছাহাবা-কেরাম। তাঁহাদের প্রতি যদি মোসলমানদের আস্থা শিথিল ও নড়বড়ে হয়, তাঁহাদের নৈতিকতার প্রতি মোসলমানগণ বিরূপ ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে, তবে নিশ্চয়ই তাহাদের দ্বীন এবং ইসলামও শিথিল হইয়া পড়িবে। এই বাস্তব সত্যের পরিপ্রেক্ষিতেই পূর্ব্বাপর ইমামগণ "আকায়েদ" তথা ঈমানের ভিত্তিমূল নির্দ্ধারক শাস্ত্রে স্পষ্ট লিখিয়া গিয়াছেন— حبهم دين وايمان واحسان "ছাহাবীদের প্রতি ভালবাসা ও ভক্তি-শ্রদ্ধা দ্বীন, ঈমান ও পরিপক্ক ইসলামের জন্য অপরিহার্য্য বস্তু।"

لا نذكر احدا منهم الا بخير لا مجتمعين ولا منفردين

"আমরা ছাহাবীদের কাহারও সুনাম ভিন্ন বিরূপ আলোচনা করিতে পারিব না—তাঁহাদের একক ভাবেও নহে, সমষ্টিগতভাবেও নহে।"

পক্ষান্তরে মোসলমানদের পরম শত্রু এবং ক্ষতি সাধন চেষ্টায় নিমগ্ন আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকের খারেজী দল মোসলমানদের মধ্যে কেলেঙ্কারি সৃষ্টি করিয়া পার্থিব ক্ষতি সাধনের পর ছাহাবীদের দোষ-চর্চ্চার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া মোসলমানদের প্রাণবস্তু দ্বীন, ঈমান ও ইসলামের ক্ষতি সাধন ব্যবস্থায় অধিক তৎপরতা অবলম্বন করিয়াছে। তাহারা ছাহাবীগণের নামে মিথ্যা অপবাদও গড়াইয়াছে অসংখ্য। ঐ সব অপবাদের প্রভাবে যাহারা ছাহাবীদের প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন হয় তাহারা বস্তুতঃ আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেক ও তাহার খারেজী দলের ইতিহাস জ্ঞাত নহে। তাহারা শুধু ঐ মোনাফেক দলের অপবাদ,

অপপ্রচার এবং বিকৃত মিথ্যা ইতিহাসগুলিই শুনিতে পাইয়াছে। সত্য ও খাঁটী ইতিহাস উদ্ধার করিয়া ঐ বিকৃত ইতিহাস খণ্ডন করিতে পারে সেই পরিমাণ (Stuby) জ্ঞান-চর্চ্চা, সেই পরিমাণ (research) গবেষণা তাহারা করে নাই। ঐ শ্রেণীর অনেকের হয়ত ঐরূপ Stuby ও research করার ক্ষমতাও নাই। অবশ্য সেই ক্ষমতার অভাবে তাহাদিগকে মোটেই ক্ষমার্হ গণ্য করা হইবে না। কারণ, ঈমানের দাবী ও তাগিদ ইহাই ছিল যে, ইতিহাস—যাহাতে আছে শুধু বর্ণনা; বর্ণনার উপর নির্ভরশীল সাক্ষ্য প্রমাণ নাই। সুতরাং উহা দ্বারা ছাহাবীদের ন্যায় পাক-পবিত্র মানুষের প্রতি দোষারোপ করা যাইবে না ; যেহেতু আল্লার তরফ হইতে ঈমান ও ইসলামকে বহন করিয়া আনিয়াছেন যিনি, তথা রসুলুল্লাহ (দঃ) তিনিই ছাহাবীদের প্রতি দোষারোপ হইতে বিরত থাকিতে বলিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ছাহাবীগণ রসুলের পরশ-দৃষ্টিতে গড়ানো ছিলেন। এই হাকিকত ও সত্যের মর্য্যাদা ইতিহাস অপেক্ষা বহু উর্দ্ধে। ইতিহাস সত্য ও মিথ্যা মিশ্রিত। ইতিহাস আমরা গ্রহণ করি না এমন নহে, কিন্তু ছাহাবীদের ইতিহাস আলোচনা করিতে ইতিহাস-ময়দানে সুগভীর গবেষণা ও সবিশেষ দুরদর্শিতার আবশ্যক। সেই সৌভাগ্য যাহার হইবে সে নিশ্চয়ই প্রতিজন ছাহাবীর নৈতিক চরিত্রকে পাক-পবিত্রই দেখিতে পাইবে। পক্ষান্তরে সেই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত লোকদের দ্বীন-ঈমানের জন্য একটি বিশেষ রক্ষাকবচ এই যে, ছাহাবীদের সম্পর্কে তাঁহাদের মর্য্যাদার পরিপন্থি ইতিহাস বা দুর্ব্বল ছনদে হাদীছ আকারের কোন কথা গ্রহণ করা হইবে না। বিশেষতঃ যখন মোসলমানদের পরম শত্রু আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকগোষ্ঠি মোসলমানদের ক্ষতি সাধন উদ্দেশ্যে ছাহাবীদের ইতিহাস বিকৃত করিয়াছে এবং মিথ্যা অপবাদ ও জাল অপপ্রচারকে ইতিহাসের ও হাদীছের রূপ দান করিয়াছে।

ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বৈশিষ্ট্য ঃ

(১) রসুলুল্লার যুগ হইতেই তাঁহার এক লক্ষ্য ছাহাবীদের মধ্যে ওসমান (রাঃ) সকলের ঐক্যমতে আবুবকর ও ওমরের লাগালাগি মর্য্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। ওমর-পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিদ্যমানেই আমরা ছাহাবীগণের মর্ত্তবা নির্ণয়ে এইরূপ নির্দ্ধারণ করিয়া থাকিতাম— আবুবকর (রাঃ) তারপর ওমর (রাঃ) তারপরই ওসমান (রাঃ)। (বোখারী ৫১৬)

(২) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মতি ও সমর্থনযুক্ত ইঙ্গিতেই আবুবকর ও ওমরের পরে খেলাফতের জন্য নির্দ্ধারিত ব্যক্তি ছিলেন ওসমান (রাঃ)। জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, অদ্য রাত্রে এক নেক্কার ব্যক্তি স্বপ্নে দেখিয়াছেন—আবুবকর আল্লার রাসুলের সঙ্গে বাঁধা, আবু

বকরের সঙ্গে ওমর বাঁধা এবং ওমরের সঙ্গে ওসমান বাঁধা রহিয়াছেন। জাবের (রাঃ) বলেন, এই স্বপ্ন সম্পর্কে আমাদের সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত যে, এই বন্ধনের ব্যাখ্যা হইল দ্বীন-ইসলামের খেলাফৎ। আর যে নেক্‌কার লোকটি স্বপ্ন দেখিয়াছেন, তিনি স্বয়ং রসুলুল্লাহ (দঃ)। (মেশকাত শরীফ ৫৬৩)

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা সূর্য্যোদয়ের পরক্ষণে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাদের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, আজ প্রভাত-পূর্ব্বক্ষণে আমি দেখিতে পাইলাম—আমাকে যেন কতগুলি চাবির গোছা এবং দাঁড়ি-পাল্লা দেওয়া হইল। অতঃপর এক পাল্লায় আমাকে রাখা হইল অপর পাল্লায় আমার সমস্ত উম্মৎকে রাখা হইল—এইরূপে ওজন করা হইলে আমার পাল্লা অধিক ভারী হইল। তারপর আমার স্থলে আবুবকরকে ওজন করা হইল তাহার পাল্লাও ভারী হইল। তারপর ওমরকে ওজন করা হইল তাহার পাল্লাও ভারী হইল। তারপর ওসমানকে ওজন করা হইল তাহার পাল্লাও ভারী হইল। তারপরে পাল্লা উঠাইয়া নেওয়া হইল। (মোছনাদে আহমদ—বেদায়া, ৭—২০৪)

আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, যখন (মদিনায়) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করা হইতেছিল তখন প্রথমে হযরত (দঃ) একখানা পাথর রাখিলেন, অতঃপর আবুবকর (রাঃ) একখানা পাথর রাখিলেন, অতঃপর ওমর (রাঃ) একখানা পাথর রাখিলেন, তারপর ওসমান (রাঃ) একখানা পাথর রাখিলেন। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)কে এ-সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে হযরত (দঃ) বলিলেন, هم امراء الخلافة من بعدى "এই ভাবেই তাহাদের দ্বারা আমার পর খেলাফতের আসন পূর্ণ হইবে।" (বেদায়াহ ৭—২০৪)

আবু জর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা কতকগুলি কাঁকর হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাতে তছবীহ পড়িল, অতঃপর আবুবকরের হাতেও তছবীহ পড়িল, অতঃপর ওমরের হাতেও, তারপর ওসমানের হাতেও পড়িল। অতঃপর হযরত (দঃ) বলিলেন, هذه خلافة النبوة "ইহা হইল নবুয়ত পর্য্যায়ের খেলাফতের নিদর্শন।" (বেদায়াহ ৭—২০৪)

সুধী সমাজ লক্ষ্য করিবেন! খলীফা ওসমানের খেলাফৎ সম্পূর্ণরূপে স্বয়ং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সমর্থিত ছিল, বরং তাঁহার স্বপ্নত আল্লার তরফ হইতে ওহী বলিয়া সাব্যস্ত। অধিকন্তু হযরত (দঃ) ওসমানের খেলাফৎকে নবুয়ত পর্য্যায়ের খেলাফৎ সাব্যস্ত করিয়া গিয়াছেন, আর ১৪০০ বৎসর পর মোহুদী সাহেব ওসমান (রাঃ)কে সেই খেলাফৎ বিতাড়ণের প্রথম আসামী সাব্যস্ত করিয়াছেন!

(৩) ওসমান (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিশেষ আদরণীয় ছিলেন। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন—প্রত্যেক নবীরই এক একজন বিশেষ বন্ধু ছিল ; আমার জন্য সেই বন্ধু হইল ওসমান। (মেশকাত শরীফ ৫৬১)

আর এক হাদীছে আছে, একদা রসুলুল্লাহ (দঃ) ওসমান (রাঃ)কে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, انت وليى فى الدنيا و وليى فى الاخرة "দুনিয়াতে তুমি আমার বিশিষ্ট বন্ধু, আখেরাতেও তুমি আমার বিশিষ্ট বন্ধু।" (বেদায়াহ ৭—২১২)

(৪) হযরত ওসমানের প্রথমা স্ত্রী নবী-তনয়া রুকাইয়া (রাঃ) মৃত্যু হইলে পর একদা হযরত (দঃ) ওসমান (রাঃ)কে ডাকিয়া বলিলেন, এখনই জিব্রাইল ফেরেশ্তা আমার নিকট সংবাদ নিয়া আসিয়াছেন যে, আল্লাহ তায়ালা উম্মে-কুলসুমকে রুকাইয়ার সম পরিমাণ মহরে তোমার সহিত বিবাহ দিয়া দিয়াছেন। হযরত (দঃ) ইহাও বলিয়াছেন যে, আমার যদি চল্লিশটি মেয়েও থাকিত পর পর প্রত্যেককে আমি ওসমানের সাথে বিবাহ দিতাম। (বেদায়াহ ৭—২১২)

(৫) হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) এবং জিব্রিল (আঃ) ফেরেশ্তা পর্য্যন্ত ওসমান (রাঃ)কে অধিক লজ্জা করিয়া চলিতেন। একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আবুবকর (রাঃ), অতঃপর ওমর (রাঃ) তারপর ওসমান (রাঃ) উপস্থিত হইলেন। হযরত (দঃ) আবুবকর ও ওমরের আগমণে সংযত হওয়ায় তৎপর হইলেন না। কিন্তু ওসমানের আগমণে হযরত (দঃ) পরিধেয়ে অত্যন্ত সংযত হইলেন। আয়েশা (রাঃ) এই পার্থক্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে হযরত (দঃ) বলিলেন, الا استحيى من رجل تستحيى منه الملائكة "আমি ঐ ব্যক্তির প্রতি অধিক লজ্জা-শরম প্রদর্শন করিব না কি যাহার ক্ষেত্রে ফেরেশ্তাগণ পর্য্যন্ত লজ্জা-শরম করিয়া থাকেন ?" (মোসলেম শরীফ)

খারেজী দলের উৎপত্তি ও তাহাদের ষড়যন্ত্রমূলক কার্য্যকলাপের ইতিহাস

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পরে খলীফা আবুবকর ছিদ্দীকের আমলে ইসলাম পরিত্যাগের একটা বিরাট বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইয়াছিল যাহা মোসলমানদের শান্তি ও শৃঙ্খলার প্রতি মস্ত বড় হুমকি ছিল। কিন্তু উহা ছিল সাময়িক এবং উপস্থিত পরিবর্ত্তনের সুযোগে সৃষ্ট ঘটনা। অধিকন্তু ঐ ঘটনার শত্রুগণ ছিল প্রকাশ্য শত্রু, মোসলমানদের মুখামুখী সংগ্রামে অবতীর্ণ শত্রু। সুতরাং ঘটনা ভয়াবহ হইলেও উহার পরিসমাপ্তি ও অবসান সম্ভব হইয়াছিল।

এতদ্ভিন্ন মোসলমানদের ভিতরে থাকিয়া ইসলামের মূলে কুঠারাঘাত হানার ষড়যন্ত্রকারী কুচক্রী দল সৃষ্টি করার সুযোগ ঐ আমলে ছিল না। ঐ আমলে

মোসলেম জাতির মধ্যে মোনাফেকের অস্তিত্ব থাকিলেও জনসাধারণ মোসলমান প্রথম দিকেত সবই ছিলেন ছাহাবী তথা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পরশ-দৃষ্টিতে গড়ান সোনার মানুষ। খলীফা আবুবকরের আমলে বরং খলীফা ওমরের প্রথম সময়কাল পর্য্যন্ত নূতন মোসলমানের আগমণ হইলেও তাহাদের উপর ছাহাবীদেরই সুদৃঢ় সুগভীর ও সুবিস্তীর্ণ প্রাবল্য ও প্রভাব ছিল।

খলীফা ওমর ফারুকের প্রথম সময়কাল যাওয়ার পর পারস্য, মিসর, সিরিয়া, ইরাক ইত্যাদি বিভিন্ন দেশ জয় হইল। মোসলমানদের মধ্যে বহু বহু গুণ আধিক্য হইল এমন লোকদের যাহারা দেশ বিজয়ের হিড়িকে রাতারাতি হাজার হাজার লাখ লাখের সংখ্যায় ইসলামে দীক্ষিত হইল। এই লোকগণ আল্লার রসুলের পরশ দৃষ্টি হইতে ত বঞ্চিত ছিলই, তদুপরি ইসলামের গুণাবলীতে অপরিপক্কও ছিল। তাহাদের মধ্যে যে কোন ষড়যন্ত্রের বীজ বপন করতঃ আশাতীত ফসল লাভ করা মোটেই কষ্টকর ছিল না। এতদ্ভিন্ন ঐরূপ হিড়িকে মোসলমানদের সংখ্যাধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে মোনাফেকদেরও সংখ্যাধিক্য ঘটে।

এই পরিস্থিতির যখন যৌবনকাল ঠিক সেই মুহূর্ত্তে তথা খলীফা ওসমানের খেলাফতের দ্বিতীয় বৎসর হিজরী ২৫ সনে মোসলমানদের সমাজে আবদুল্লাহ নাম গ্রহণ করিয়া এমন একটি দুর্দান্ত ও ধুরন্ধর লোক ঢুকিয়া পড়ে যে নূতন-পুরাতন মোনাফেকদেরে নেতৃত্ব দানে যথেষ্ট হয়। সে ছিল ইয়ামান দেশের 'সানা' নিবাসী ইহুদী-বাচ্চা। তাহার পিতার নাম 'সাবা' এবং মাতার নাম 'সাওদা'; এই সূত্রেই ইতিহাসে সে 'ইবনে-সাওদা' বা আবদুল্লাহ ইবনে সাবা না'মে পরিচিত।

হযরত ঈসা আলাইহেচ্ছালামের পর তাঁহার দ্বীনকে বরবাদ করার জন্য সেণ্টপল নাম ধারণ করিয়া এক ইহুদী-বাচ্চা মোনাফেক হযরত ঈসা আলাইহেচ্ছালামের উম্মৎ তথা নাছারাদের মধ্যে আবির্ভূত হয় এবং একা তাহার ষড়যন্ত্রে নাছারাদের দ্বীন চিরকালের জন্য সম্পূর্ণরূপে বিকৃত হইয়া যায়। ঈসা (আঃ) আল্লার পুত্র, যাহারা তাঁহাকে আল্লার পুত্র গণ্য করিবে পিতার নিকটে তাহাদের সমুদয় পাপ মোচনের জন্য তিনি শুলিকাষ্ঠে আত্মবিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, ইত্যাদি গর্হিত আকিদা দ্বারা ইহুদী-বাচ্চা সেণ্টপলই নাছারাদের দ্বীনকে এবং তাহাদের আসমানী কেতাবকে বিকৃত করিয়াছিল। এইভাবে সেই ইহুদী-বাচ্চা হযরত ঈসা (আঃ) ও তাঁহার উম্মতের সঙ্গে ইহুদীদের চিরকালীন শত্রুতা সিদ্ধ করিয়াছিল।

মোহাম্মদী উম্মতের ইহুদী-বাচ্চা আবদুল্লাহ ইবনে সাবাও উম্মতে মোহাম্মদীর সঙ্গে তাহার জাতির চিরকালীন শত্রুতা সিদ্ধ করার উদ্দেশ্য লইয়া মোনাফেকীর সহিত মোসলমানদের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিল। হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দ্বীন কেয়ামত পর্য্যন্ত থাকিবে, তাঁহার আসমানী কেতাব

পবিত্র কোরআন অবিকৃত আসল রূপে অক্ষুন্ন থাকিবে, ইহা সর্ব্ব শক্তিমান আল্লাহ তায়ালারই সিদ্ধান্ত। তাই সেন্টপলের দ্বারা নাছারাদের দ্বীন ও আসমানী কেতাবের যেই অবস্থা হইয়া ছিল আবহুল্লাহ ইবনে সাবা মোসলমানদের দ্বীন ও কোরআনের সেই অবস্থা সৃষ্টি করিতে ত সক্ষম হয়ই নাই। কিন্তু নূতন-পুরাতন মোনাফেকগোষ্ঠিকে একত্রিত করিয়া, স্বার্থান্বেষীদেরকে সঙ্গে ভিড়াইয়া সন্ত্রাসবাদী দল গঠন করতঃ মিথ্যার বহর ছড়াইতে এবং মোসলমানদের শান্তি ও শৃঙ্খলা ব্যাহত করিতে সে প্রয়াস পাইয়াছিল। বিশেষ উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করিয়া তাহার দল ঐ সম্পর্কীয় মিথ্যার বহর পুথি-পুস্তকাকারে এমনভাবে ছড়াইয়া দিয়া ছিল যে, পরবর্ত্তী ইতিহাস লেখকগণ পর্য্যন্ত সেই সব মিথ্যার গুজব এবং পুথি-পুস্তক দ্বারা প্রভাবান্বিত না হইয়া পারেন নাই। কেহ যদি ঐ দলের মিথ্যার বহরের নমুনা প্রত্যক্ষ করিতে চান, তবে মীর মোশাররাফ হোসেন কর্ত্তৃক সঙ্কলিত দীর্ঘকালের উপন্যাস "বিষাদ সিন্ধু"-এর প্রতি লক্ষ্য করুন। উক্ত উপকথার অন্যতম নায়ক মোহাম্মদ হানিফা নামক ব্যক্তি ও তাহার কার্য্যকলাপের এই বিরাট কলেবরের উপন্যাসটি যে আদ্যোপান্ত সবই অলিক ও শুধু কল্পনা তাহা বলা বাহুল্য। এমনকি মোহাম্মদ হানীফা নাম এবং তাহার বলিয়া সঙ্কলিত সমুদয় কার্য্যাবলীর বিবরণই শুধু কল্পনা মাত্র।

আবহুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকগোষ্ঠী গোপন দলের গোড়া পত্তনের পর তাকাইতে ছিল, মোসলমানদের কোন অঙ্গে আঘাত হানিলে, অধিক ক্ষতি সাধিত হইবে। সেমতে তাহারা সর্ব্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দিকটাই বাছিয়া নিয়াছিল।

রসুলুল্লাহ (দঃ) দুনিয়া হইতে বিদায় নেওয়ার পর মোসলমানদের শক্তি, শান্তি, শৃঙ্খলা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য উত্তরোত্তর বাড়িতে ছিল। এমনকি খলীফা ওসমানের আমলে গাজিদের ভাতা জন প্রতি একশত দেরহাম বৃদ্ধি করা হইয়াছিল। রোযাদারদের ইফতারী ভাতাও বৃদ্ধি করা হইয়াছিল (বেয়াদাহ, ৭—১৪৮)। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থারও এতদুর উন্নতি সাধিত হইয়াছিল যে, খলীফা ওমর ফারুকের আমলে আরবের স্থল যোগাযোগের এলাকাসমূহ জয় করার পর তাঁহার সিরিয়াস্থ গভর্ণর মোয়াবিয়া (রাঃ) সামুদ্রিক পথেও জেহাদ সম্প্রসারণের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া অনুমতি পাইয়াছিলেন না। খলীফা ওসমানের খেলাফত আমলের চতুর্থ বৎসর হিজরী ২৮ সনে পূর্ণোদ্যমে নৌবাহিনী গঠন করতঃ রোমানদের বিরুদ্ধে ভয়াবহ নৌ-জেহাদে 'কবরছ'—সাইপ্রাস দ্বীপ জয় করা হইয়াছিল।

মোনাফেকগোষ্ঠী ভালরূপেই উপলব্ধি করিতে ছিল যে, মোসলমানদের এত উন্নতি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির উৎস হইল তাহাদের সুষ্ঠু সুদৃঢ় একতা ও শৃঙ্খলা যাহার একমাত্র মূল হইল তাহাদের নেজামে-খেলাফৎ তথা সর্ব্বসম্মত ঐক্যতাপূর্ণ

সুদৃঢ় খেলাফৎ-ব্যবস্থা। সুতরাং আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকগোষ্ঠীর দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল এই নেজামে-খেলাফতের প্রতি। সেমতে সুশৃঙ্খল, সুদৃঢ় নেজামে-খেলাফৎকে বিধ্বস্ত করার পরিকল্পনা লইয়া স্বয়ং আবদুল্লাহ ইবনে সাবা বছরা, কুফা, সিরিয়া ও মিশর এলাকায় ছুটাছুটি আরম্ভ করিল। তাহার ষড়যন্ত্র মূলক ছুটাছুটির নমুনা স্বরূপ ইতিহাসের কতিপয় উদ্ধৃতি বর্ণনা করা হইতেছে।

(১) সিরিয়ার ঘটনা—আবদুল্লাহ ইবনে সাবা সিরিয়ায় পৌঁছিল। তথায় বিশিষ্ট ছাহাবী আবুজর গেফারী (রাঃ) থাকিতেন। তিনি ছিলেন অতি মাত্রায় দুনিয়া ত্যাগী মানুষ। মোনাফেক আবদুল্লাহ ইবনে সাবা তাঁহাকে তথাকার শাসনকর্ত্তা মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে এই বলিয়া প্ররোচিত করিল যে, (বায়তুল-মাল তথা সরকারী ধন-ভাণ্ডারের) ধন-সম্পদকে মোয়াবিয়া আল্লার ধন-সম্পদ বলিয়া থাকে এবং এইভাবে মোয়াবিয়া উহা হইতে মোসলমান জনসাধারণের নাম মুছিয়া উহা নিজের কুক্ষিগত করিতে চায়। সরল প্রকৃতির আবুজর (রাঃ) তাহার কথায় উত্তেজিত হইয়া মোয়াবিয়ার নিকট ছুটিয়া আসিলেন এবং বলিলেন, আপনি কেন জনসাধারণের মালকে আল্লার মাল বলিয়া থাকেন? মোয়াবিয়া (রাঃ) উত্তরে বলিলেন, আল্লাহ আপনার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন—আমরা সবাই কি আল্লার নই? আমাদের সব মাল-দৌলত কি আল্লার নয়? সমুদয় সৃষ্ট কি আল্লার নয়? সর্ব্ব ক্ষমতাই কি আল্লার নয়? আবুজর (রাঃ) প্রতিউত্তরে উহাই বলিলেন যে, আল্লার মাল না বলিয়া মোসলমানদের মাল বলিতে হইবে।

অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে সাবা সিরিয়ায় অবস্থানরত ছাহাবী আবুদ্দরদা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট আসিল। তিনি তাহাকে প্রথম পদক্ষেপেই ধরিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন—من انت اظنك والله يهوديا "তুই কে? কসম খোদার—আমার ধারণা হয়, তুই কোন ইহুদী-বাচ্চা।"

তারপর আবদুল্লাহ ইবনে সাবা ওবাদাহ ইবনে ছামেৎ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট আসিল। তিনিও তাহাকে বুঝিতে পারিলেন এবং পাকড়াও করিয়া মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহুর নিকট উপস্থিত করতঃ বলিলেন, কসম খোদার—এই দুষ্টই আবুজর (রাঃ)কে আপনার বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়াছে।

এই ছিল সূচনা মোয়াবিয়া (রাঃ) এবং আবুজর গেফারী রাজিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যে বিরোধ সৃষ্টির। মোয়াবিয়া (রাঃ) সমুদয় ঘটনা খলীফা ওসমানের নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন। উত্তরে ওসমান (রাঃ) তাঁহাকে লিখিলেন—ان الفتنة قد اخرجت خطمها وعينيها الخ "নিশ্চয় ফেৎনা ও বিশৃঙ্খলা নাক উঁচু করিয়াছে এবং চক্ষু মেলিয়াছে; এখন একমাত্র পথ হইল—স্বীয় কর্ত্তব্য পালনে নিয়োজিত থাকিবে

এবং ঘা আঁচড়াইবে না। আবুজরকে খাতির-তাওয়াজো করতঃ পথের সম্বল ও সাথী সঙ্গে দিয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দাও। (তবরী, ৩—৩৩৫)

(২) বছরার ঘটনা—বছরা এলাকায় একটি লোক ছিল হোকাময় ইবনে জাবালাহ্। সে ছিল অতি বড় দুর্দান্ত চোর ও ডাকাত; পারস্য অঞ্চলে যাইয়া চুরি-ডাকাতি ও অশান্তি সৃষ্টি করিয়া বেড়াইত। খলীফা ওসমানের নিকট তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করা হইল, তিনি বছরার গভর্ণরকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, বছরা শহর-সীমানার মধ্যে ঐ লোকটির গতিবিধি আবদ্ধ করিয়া দেওয়া হউক। আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেক বছরায় আসিয়া ঐ লোকটির বাড়ীতে অবস্থান করিল এবং তথায় আরও কতিপয় লোককে এক গোপন বৈঠকে একত্রিত করিয়া আবদুল্লাহ ইবনে সাবা সাঙ্কেতিক ভাষায় একটি কার্য্য-পরিকল্পনা পেশ করিল। বৈঠকে তাহার পরিকল্পনা গৃহিত হইল এবং ঐ লোকগণ আবদুল্লাহ ইবনে সাবা ও তাহার পরিকল্পনার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিল।

বছরার গভর্ণর গোপনসূত্রে এই সংবাদ জ্ঞাত হইয়া আবদুল্লাহ ইবনে সাবাকে ডাকিয়া আনিলেন এবং তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ঐ দুষ্ট স্বীয় সঠিক পরিচয় গোপন করিয়া বলিল, আমি একজন কেতাবধারী অমোসলেম, ইসলামের প্রতি আমার আকর্ষণ জন্মিয়াছে; আমি আপনার আশ্রয়ে থাকিতে চাই। গভর্ণর তাহাকে বলিলেন, তোমার এই সব কথা আমার মনে লাগে না। তুমি এই এলাকা হইতে বাহির হইয়া যাও। সে মতে সে বছরা হইতে কুফায় চলিয়া আসিল। তথা হইতেও বহিষ্কৃত হইয়া মিশরে অবস্থান করিল। "এবং তথা হইতে বছরা ও কুফাবাসীদের সঙ্গে সর্ব্বদা তাহার পত্র বিনিময় হইতে থাকে এবং গুপ্তচর মারফৎও যোগাযোগ রক্ষা হইতে থাকে।" (তারীখ-তবরী, ৩—৩৬৮)

আবদুল্লাহ ইবনে সাবা কুফা-বছরা হইতে বহিষ্কৃত হইলেও উভয়স্থানে খলীফা ওসমানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী দল তৈরী করিয়াছিল। ৩৪।৩৫ হিজরী সনে যখন মিশর হইতে স্বয়ং আবদুল্লাহ ইবনে সাবার নেতৃত্বে সন্ত্রাসবাদী দল মদিনার প্রতি ধাওয়া করিয়া ছিল। তখন কুফা-বছরা হইতেও এক এক দল সন্ত্রাসবাদী তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া ছিল। সেই হোকায়ম ইবনে জাবালাহ্ই বছরার সন্ত্রাসবাদীদের নেতৃত্ব করিতেছিল। (তবরী, ৩—৩৮৬)

খলীফা ওসমানের বিরুদ্ধে বছরা ও কুফায় আবদুল্লাহ ইবনে সাবার দলের ষড়যন্ত্র ধরাও পড়িতে থাকে। এমনকি ৩৩ হিজরী সনে সন্ত্রাসবাদমূলক প্রচারণার দরুন কুফা হইতে মালেক আশ্তারসহ ৯।১০ জন সন্ত্রাসবাদী নেতা বহিষ্কৃত হয় এবং বছরা হইতেও অনুরূপ দল বহিষ্কৃত হইয়াছিল। (বেদায়াহ, ৭—১৬৬)

আবহুল্লাহ ইবনে সাবার সন্ত্রাসবাদী দলের রোকন তথা মূল কর্ত্তা ছিল নূতন-পুরাতন মোনাফেকগণ এবং দুইজন খান্দানী মোসলমানও তাহাদের মোত্তাফেক্ বা সমর্থক সাজিয়াছিল। একজন মোহাম্মদ ইবনে আবুবকর, অপর জন মোহাম্মদ ইবনে আবু হোজায়ফা। এই দুইজন ছাহাবী-তনয় হইলেও শিশুকালেই তাহারা পিতৃহীন হইয়াছিল। মোহাম্মদ ইবনে আবু বকরের বিধবা মাতাকে আলী (রাঃ) বিবাহ করিলে, সে আলী রাজিয়াল্লাহু আনহুর নিকটই লালিত-পালিত হয়। সে খলীফা ওসমানের এত বড় শত্রু হইয়া দাঁড়ায় যে, যে কতিপয় ঘাতক খলীফা ওসমান (রাঃ)কে শহীদ করার জন্য তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল, মোহাম্মদ ইবনে আবু বকর তাহাদের এক জন ছিল। খলীফা ওসমানের প্রতি তাহার শত্রুতার দুইটি মাত্র কারণ ছিল—একটি ছিল স্বীয় স্বার্থের লালসা, আর একটি ছিল খলীফা ওসমান (রাঃ) এক ব্যাপারে তাহার বিরুদ্ধে রায় দিয়া ছিলেন। যদ্দরুন সে তাঁহার প্রতি ক্রোধ ও কিনা অবলম্বন করে। (কামেল, ৩—৯২)

মোহাম্মদ ইবনে আবু হোজায়ফা পিতৃ বিয়োগের পর ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রতিপালনে থাকে। সে খলীফা ওসমানের নিকট চাকুরী চাহিলে, তিনি তাহাকে অনুপযুক্ত বলিয়া তাহার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। যদ্দরুন সে খলীফা ওসমানের ঘোর শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। (কামেল, ৩—৯২)

আবহুল্লাহ ইবনে সাবা ছাহাবীদের মধ্য হইতে আম্মার ইবনে ইয়াসের (রাঃ)কে প্রভাবান্বিত করিতেও সফলকাম হইয়া ছিল। হিজরী ৩৫ সনের প্রথম দিকে খলীফা ওসমান (রাঃ) দেশের অবস্থা তদারক করার জন্য বিভিন্ন কেন্দ্রীয় এলাকায় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে তদন্তকারীরূপে প্রেরণ করিয়া ছিলেন। সেই উপলক্ষে তিনি আম্মার (রাঃ)কে মিশর এলাকায় পাঠাইয়া ছিলেন। তথায়ই ছিল আবহুল্লাহ ইবনে সাবার দলের কেন্দ্রীয় দফতর। সকল তদন্তকারী নিজ নিজ কার্য্য সমাধা করিয়া মদিনায় ফেরৎ আসিলেন। কিন্তু আম্মার (রাঃ) এত বিলম্ব করিলেন যে, তাঁহার সম্পর্কে কোন দুর্ঘটনার আশঙ্কা করা যাইতে লাগিল। ইতিমধ্যে তাঁহার সম্পর্কে সংবাদ আসিল যে—قد استماله قوم وانقطعوا اليه منهم عبد الله بن سوداء الخ "তাঁহাকে একটি বিশেষ দল প্রভাবান্বিত করিয়া ফেলিয়াছে, সেই দলের অন্যতম ব্যক্তিগণ হইল—আবহুল্লাহ ইবনে সাবা, খালেদ ইবনে মোলজেম, সুদান ইবনে হোমরান, ও কেনানাহ ইবনে বিশর।" (কালেম, ৩—৭৮)

আবহুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকের সন্ত্রাসবাদী খারেজী দলের সর্ব্বপ্রথম লক্ষ্য বস্তুই ছিল মোসলমানদের খেলাফৎ-ব্যবস্থা ধ্বংস করা। ঐ সময় খলীফা ছিলেন ওসমান (রাঃ), সুতরাং তিনি তাহাদের প্রথম লক্ষ্যস্থল হইলেন। এই

দলটি আবির্ভাবের পূর্ব্বে ওসমান (রাঃ) কিরূপ জনপ্রিয় ছিলেন তাহার সাক্ষ্য ইতিহাসেই রহিয়াছে। তাঁহার নির্ব্বাচনের যে ইতিহাস বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে এবং ষষ্ঠ খণ্ডে খলীফা ওসমানের আলোচনায় অনুদিত হইয়াছে; উহাই তাঁহার জনপ্রিয়তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ষড়যন্ত্রকারী খারেজী দল তাহার বিরুদ্ধে মিথ্যা ও অতিরঞ্জনকেই বড় অস্ত্ররূপে ব্যবহার করে এবং উহার দ্বারাই সন্ত্রাসবাদ কার্য্যে কৃতকার্য্য হয়।

উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাহারা খলীফাতুল-মোসলেমীন ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ প্রচার করিতে থাকে। অধিকন্তু খলীফা ওসমান (রাঃ)কে অভিযুক্ত করার জন্য তাঁহার সহকর্ম্মী অনেক ছাহাবীর নামেও মিথ্যা অপবাদ রটাইয়া অতিরঞ্জিতরূপে তাঁহাদের দোষ-চর্চ্চা ছড়াইতে থাকে। ইতিহাস হইতে এই শ্রেণীর ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত সম্মুখে পাঠ করিবেন। তাহারা মিথ্যাকে এরূপ ব্যাপকভাবে এবং পুথি-পুস্তকাকারে সর্ব্বত্র প্রচার করিয়াছিল যে, তাহাদের মিথ্যা অপবাদগুলি ইতিহাসে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। এমনকি অনেক ইতিহাস লিখক যাহারা ঘটনার সব রকম বিবরণকে শুধু সংগ্রহ ও ক্যালেক্সন করাই স্বীয় কর্ত্তব্য মনে করেন তাহারা ত ঐরূপ ব্যাপক প্রচারণার প্রভাবে বিনা দ্বিধায় ঐ সব মিথ্যা বর্ণনাকেও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আর যাহারা সতর্কতা অবলম্বনকারী সংযত লিখক তাহারাও অন্ততঃ "লোকেরা বলে" ইত্যাদি দায়িত্ব এড়ানো মূলক পন্থায় হইলেও ঐ শ্রেণীর অনেক বর্ণনাকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এইভাবে আবদুল্লাহ ইবনে সাবার সন্ত্রাসবাদী দল ইতিহাসকে বিকৃত করিয়াছে। অবশ্য সত্য-মিথ্যা বাছনির ও সিলেক্সনের মাপকাঠি আল্লাহ তায়ালা এস্থলেও বিদ্যমান রাখিয়াছেন এবং এরূপ ক্ষেত্রেই সুষ্ঠ বা বক্র বিবেক-বুদ্ধির পরিচয় হয়।

আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকগোষ্ঠী শুধু ইতিহাস বিকৃতির উপরই ক্ষান্ত হয় নাই। তাহারা তাহাদের মনগড়া অপবাদ ও অভিযোগের সপক্ষে বড় বড় তাবেয়ী যথা ইমাম জুহরী এবং বড় বড় ছাহাবী যথা খলীফা ওমর (রাঃ) স্বয়ং খলীফা ওসমান (রাঃ) প্রমুখের নামে মিথ্যা ও জাল বর্ণনা হাদীছ আকারে প্রচার করিয়াছিল। কাহারও মৃত্যুর পরে তাঁহার নামে মিথ্যা ও জাল বর্ণনা প্রচার করাত খারেজী দলের জন্য নিতান্ত সহজ ছিল। তাহারাত খলীফা ওসমানের বিরুদ্ধে বড় বড় ছাহাবীদের নামে তাঁহাদের জীবদ্দশায়ই সম্পূর্ণ মিথ্যা ও জাল প্রচারপত্র দেশে দেশে ছড়াইয়া দিয়াছিল। এ সম্পর্কে ইতিহাসের একটি উজ্জ্বল সাক্ষ্য—

وزورت كتب على لسان الصحابة الذين بالمدينة وعلى لسان
علي وطلحة والزبير يدعون الناس الى قتال عثمان ونصر
الدين وانه اكبر الجهاد اليوم

"সন্ত্রাসবাদীদের পক্ষ হইতে মিথ্যা ও জাল প্রচারপত্র ছড়ান হইল মদীনাবাসী ছাহাবীদের নামে—বিশেষতঃ ছাহাবী-শ্রেষ্ঠ আলী (রাঃ) তাল্‌হা (রাঃ) যোবায়ের (রাঃ) প্রমুখের নামে। ঐ সব মিথ্যা ও জাল প্রচারপত্রে লোকদিগকে খলীফা ওসমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রতি আহ্বান করা হইয়াছিল। এই কাজকে দ্বীন ইসলামের সাহায্য ও খেদমত বলা হইয়াছিল এবং ঐ যুদ্ধকে তৎকালীন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জেহাদ আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। (বেদায়হ, ৭—১৭৩)

বিশিষ্ট মোহাদ্দেছ, মোফাচ্ছের, সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আল্লামা ইবনে কাছীর এই মিথ্যা ও জাল প্রচারপত্রের আলোচনা উপলক্ষে অতি দৃঢ়তার সহিত একটি মূল্যবান তথ্যও পেশ করিয়াছেন। উক্ত তথ্য দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতিয়মান হয় যে, আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকগোষ্ঠী সন্ত্রাসবাদী দল মিথ্যা ও জাল প্রচারপত্রগুলির প্রচারণা এরূপ ব্যাপকভাবে চালাইয়াছিল যে, উহা ইতিহাসে পরিণত হইয়াছিল এবং ইতিহাস গ্রন্থেও স্থান লাভ করিয়াছে। ইতিহাস-বিশেষজ্ঞ মোহাদ্দেছ মোফাচ্ছের আল্লামা ইবনে কাছীর অভিযোগ করিয়া লিখিতেছেন—

ذكر ابن جرير من هذه الطريق ان الصحابة كتبوا الى الافاق
من المدينة يامر الناس بالقدوم على عثمان ليقاتلوه

"ইতিহাসবিদ ইবনে জরীর তবরী পর্য্যন্ত তাহার ইতিহাসগ্রন্থে ছনদের সহিত এই বর্ণনা লিখিয়া দিয়াছেন যে—খলীফা ওসমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আসিবার জন্য লোকদিগকে আদেশ করতঃ মদিনা হইতে ছাহাবীগণ প্রচাপত্র লিখিয়া চতুর্দিকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।" ঐতিহাসিক ইবনে কাছীর ইহা উল্লেখ পূর্ব্বক লিখিতেছেন—

وهذا كذب على الصحابة انما كتبت كتب مزورة عليهم

"অথচ ঐসব প্রচারপত্র ছাহাবীদের নামে মিথ্যা প্রচারণা ছিল মাত্র এবং ঐ প্রচারপত্রগুলি মিথ্যা ও জালরূপে ছাহাবীদের নামে গড়াইয়া লিখা হইয়াছিল।" (বেদায়াহ, ৭—১৭৫)

আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকগোষ্ঠীর সন্ত্রাসবাদী দল মোসলমান দলভুক্ত থাকিয়া সজোরে নিক্ষিপ্ত দেহ ভেদকারী দ্রুতগামী তীরের ন্যায় মোসলেম সমাজের

যে সব অপূরণীয় ক্ষয়ক্ষতি সাধন করিয়াছিল এস্থলে উহার কতিপয় নমুনা পেশ করা হইবে—

১। মদীনার উপর অতর্কিত আক্রমণে অবরোধ সৃষ্টি করিয়া খলীফায়ে-রাশেদ ওসমান (রাঃ)কে নির্ম্মমভাবে শহীদ করা।

২। পরবর্ত্তী খলীফা আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নির্ব্বাচনে নিজেদের স্বার্থরক্ষা ও সুযোগ লাভের উদ্দেশ্যে অবৈধ শক্তির জোরে নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা নস্যাৎ করিয়া জবরদস্তি মূলক মোড়লগিরী মাতব্বরী ও কর্ত্তৃত্য প্রয়োগের দ্বারা মোসলমানদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টির ব্যবস্থা করা।

৩। আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রতি স্বীকৃতি দানের ব্যাপারে ছাহাবীদের নীতিগত বিরোধকে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সামরিক বিরোধে পরিণত করা এবং সেই সূত্রে সৃষ্ট সংঘর্ষসমূহের প্রতি ক্ষেত্রে মোসলমানদের মীমাংসা ও মিলন প্রচেষ্টাকে অতি জঘন্যরূপে বানচাল করা।

৪। মোসলমানদের মধ্যে বিরোধ-বিবাদ সৃষ্টির সুযোগ লাভের জন্য মোনাফেকী ফন্দি-ফেরেবের মাধ্যমে গা-ঢাকা দিয়া আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর দলে ভিড়িয়া থাকার পর আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা এবং গোপন ঘাতকের সাহায্যে আলী (রাঃ)কে শহীদ করা।

খারেজী দল কর্ত্তৃক মদীনা অবরোধ ও খলীফা ওসমান (রাঃ)কে হত্যা ঃ

হিজরী ৩৫ সনে যখন হজ্জের মওসুম নিকটবর্ত্তী এবং রাষ্ট্রের সমুদয় এলাকার মোসলমান মক্কার ছফরে ব্যতিব্যস্ত—অনেকে যাত্রা করিয়া গিয়াছে, অনেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছে। এই সুযোগে হজ্জের মাস—শাওয়াল মাসের শেষের দিকে ছয় শত হইতে এক হাজার সংখ্যক সন্ত্রাসবাদী মিশর হইতে যাত্রা করিল। তাহাদের নেতৃত্ব করিতেছিল আবদুর রহমান ইবনে আদীছ, কেনানাহ ইবনে বিশর, সুদান ইবনে হোমরান, কাতীরা ইবনে কোলাম। আর তাহাদের সর্ব্বাধিনায়ক ছিল গাফেকী ইবনে হর্‌ব ; وكان معهم ابن السوداء "আর আবদুল্লাহ ইবনে সাবা ত তাহাদের সঙ্গে ছিলই। কুফা হইতেও অনুরূপ একটি দল যাত্রা করিল ; তাহাদের অন্যতম নেতা ছিল আশ্‌তার নখ্‌য়ী। বছরা হইতেও একটি দল যাত্রা করিল ; তাহাদের নেতা ছিল সেই দাগী দুর্দ্ধর্ষ ডাকাত হোকায়ম ইবনে জাবালাহ। এই সন্ত্রাসবাদীদের সহিত মদিনার অন্য কোন এলাকার জনসাধারণের কোনই সম্পর্ক ছিল না। জনসাধারণ তাহাদের উদ্দেশ্য জ্ঞাত হইলে তাহাদের যাত্রা নিশ্চয়ই বাধা প্রাপ্ত হইত। এই সম্পর্কে ইতিহাসের স্পষ্ট সাক্ষ্য—

وكان المصريون لا يطمعون فى احد من اهل المدينة......

"সন্ত্রাসবাদীগণ মদিনাবাসী কাহারও সমর্থনের আশা করিতে পারিতে ছিল না শুধুমাত্র তিনজন ব্যতীত—যাহাদের সঙ্গে পূর্ব্ব হইতেই তাহাদের যোগাযোগ ছিল—মোহাম্মদ ইবনে আবু বকর, মোহাম্মদ ইবনে হোযায়ফা ও ইবনে ইয়াসের। (তবরী, ৩—৩৮৯)

মিশর, কুফা ও বছরা হইতে আগত সন্ত্রাসবাদীগণ মদিনার নিকটবর্ত্তী জু-খশব ও জু-মারওয়া নামক স্থানে শিবির স্থাপন করিয়া মদিনাবাসীদের সমর্থন জোগাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু আলী (রাঃ) তাল্‌হা (রাঃ) যোবায়ের (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীগণ তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া তাড়াইয়া দিলেন এবং বলিলেন—

لقد علم الصالحون ان جيش ذى المروة وذى خشب ملعونون
على لسان محمد صلى الله عليه وسلم

"সৎ লোকগণ সকলেই জানেন, জু-মারওয়া ও জু-খশব স্থানে যে দলটি একত্রিত হইয়াছে তাহারা মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বর্ণনা অনুযায়ী আল্লাহ তায়ালার লা'নৎ ও অভিশাপ প্রাপ্ত।" সন্ত্রাসবাদীগণ মদিনাবাসীদের সমর্থন হইতে নিরাশ হইয়া গেল। এদিকে সিরিয়া, কুফা ও বছরা ইহতে খলীফার সাহায্যার্থে মোসলমান লশকর রওয়ানা হইয়া পড়িয়াছে সংবাদ জ্ঞাত হইয়া সন্ত্রাসবাদীগণ জিল্‌কদ মাসের শেষভাগে (বেদায়াহ, ৭—৮০) হঠাৎ মদিনা আক্রমণ করিয়া মদিনার নিয়ন্ত্রন দখল করিয়া নিল এবং খলীফা ওসমানের বাসভবন অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিল। তখন মদিনার অধিকাংশ লোকই হজ্জ সমাপনে মক্কায় চলিয়া গিয়াছিলেন। সন্ত্রাসবাদীগণ মদিনায় ঘোষণা দিল, আমাদের প্রতি যে হস্তক্ষেপ না করিবে একমাত্র তাহার জন্যই নিরাপত্তা। তাহাদের মোকাবিলায় মদিনাবাসীদের শক্তি অপর্য্যাপ্ত, তাই তাঁহারা নিস্তব্ধ থাকিলেন।

সন্ত্রাসবাদীগণ অবরুদ্ধ খলীফা-ভবনে কোন প্রকার পানাহার বস্তু প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া দিল। সেই পরিস্থিতিতে খলীফা ওসমান (রাঃ) গোপনে আলী (রাঃ) তাল্‌হা (রাঃ) যোবায়ের (রাঃ) এবং নবী-পত্নিগণের নিকট খবর পাঠাইলেন যে, সন্ত্রাসবাদীগণ আমাদিগকে পানি হইতেও বঞ্চিত করিয়া দিয়াছে। আপনারা একটু পানি পৌঁছাইবার চেষ্টা করুন। সে মতে সর্ব্ব প্রথম আলী (রাঃ) তথায় উপস্থিত হইয়া সন্ত্রাসবাদীগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমাদের কার্য্য মোসলমানত দুরের কথা কাফেরদের কার্য্যের সঙ্গেও তুলনা করা যায় না। তোমরা অন্ততঃ পানাহার ত বন্ধ করিও না; কাফেরগণও ত শত্রুকে বন্দী করিয়া তাহাকে পানাহার দিয়া থাকে!

সন্ত্রাসবাদীগণ তাঁহার কথা প্রত্যাখ্যান করিল। তিনি ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। এই সময় নবী-পত্নী উম্মুলমোমেনীন উম্মে-হাবিবা (রাঃ) একটি পানির পাত্র লুকাইয়া লইয়া খচ্চরে আরোহণ করতঃ তথায় পৌঁছিলেন। তাঁহার সঙ্গে সন্ত্রাসবাদীগণ এমন দুর্ব্যবহার করিল যে, তিনি ভীষণ ভাবে আহত হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল। লোকজন তাঁহাকে কোন প্রকারে ফেরত আনিল। এইসব সংবাদ জ্ঞাত হইয়া তাল্‌হা ও যোবায়ের (রাঃ) হতাস হইয়া বসিয়া রহিলেন। অতঃপর ওসমান (রাঃ) স্বয়ং স্বীয় গৃহ-ছাদে উঠিয়া সন্ত্রাসবাদীগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, মোসলমানগণ মদিনায় হিজরত করিয়া আসিলে তাহাদের সুপেয় মিঠা পানির ব্যবস্থা ছিল না। তাই হযরত (দঃ) বলিয়াছিলেন "বীরে-রুমা"—রুমা নামক মিঠা পানির কুপটি উহার ইহুদী মালিক হইতে ক্রয় করতঃ মোসলমানদের জন্য দান করিয়া বেহেশ্‌ত ক্রয় করিয়া নিবে এমন ব্যক্তি কে আছে? সেই সময় আমিই নিজস্ব মাল দ্বারা উহা ক্রয় করতঃ ওয়াক্‌ফ করিয়াছিলাম*! আজ আমাকে উহার এক ফোঁঠা পানি হইতেও বঞ্চিত রাখিয়াছ! এইভাবে ওসমান (রাঃ) সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন, কিন্তু সন্ত্রাসবাদীদের পাষাণ হৃদয়ে কোন তাছির করিল না। খলীফা ওসমানের বাড়ী সংলগ্ন একটি বাড়ী হইতে গোপনে কিছু পানি সরবরাহ করা হইত।

(কামেল, ৩—৮৭)

এই অবরোধ অবস্থায় সন্ত্রাসবাদীগণ খলীফা ওসমানের পদত্যাগ দাবী করে, কিন্তু তিনি তাহা করিতে অক্ষম; যেহেতু তাঁহার প্রতি এই ব্যাপারে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সুস্পষ্ট কড়া নির্দ্দেশ প্রতিবন্ধক ছিল—

ছাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী (দঃ) বলিয়াছেন, হে ওসমান! আল্লাহ তোমাকে একটি জামা পরিধান করাইবেন। লোকেরা যদি তোমাকে উহা খুলিয়া ফেলিতে বলে, তুমি উহা খুলিওনা। (মেশকাত, ৫৬২)

ছাদীছ—অবরোধ অবস্থায় গৃহ-ছাদে উঠিয়া ওসমান (রাঃ) বলিয়াছিলেন, নিশ্চয় হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে একটি বিশেষ আদেশ করিয়া গিয়াছেন, আমি উহার উপর দৃঢ় পদ থাকিব। (তিরমিজি শরীফ—মেশকাত, ৫৬২)

ছাদীছ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা হযরত রসুলুল্লাহ (রঃ) ওসমান (রাঃ)কে ডাকিয়া আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। তিনি আসিলে পর হযরত (দঃ) তাঁহার দিকে মুখ করিয়া বসিলেন এবং তাঁহার উভয় স্কন্ধে হস্তদ্বয় স্থাপন পুর্বক বলিলেন, হে ওসমান! অচিরেই আল্লাহ তায়ালা তোমাকে একটি

---

* এখনও সেই কুপ বিদ্যমান আছে, উহাকে "বীরে ওসমান" ওসমানের কূপ বলা হয়।

জামা পরাইবেন, যদি মোনাফেকগণ তোমার নিকট উহা খুলিয়া ফেলার দাবী জানায়, তবে তুমি কিন্তু উহা খুলিও না—এমনকি তুমি আমার সঙ্গে যাইয়া মিলিত হইবে। হযরত (দঃ) এই কথা তিন বার বলিলেন। (মোছনাদ আহমদ—বেদায়াহ, ৭—২০৭)

খলীফা ওসমানের পদত্যাগ দাবীকারীগণ যে মোনাফেকের দল তাহা হাদীছে স্পষ্টই উল্লেখ রহিয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবেও ঐ দাবীর মুলে ছিল মোনাফেক খারেজী দল।

তারপর জিলহজ্জ মাসের ১৮ তারিখ শুক্রবার দিন মোহাম্মদ ইবনে আবু বকর এবং পূর্ব্বোল্লেখিত মিশর, কুফা ও বছরার সন্ত্রাসবাদী নেতাগণসহ ১৩ ব্যক্তি কেহ বা বাড়ীর দেওয়াল টপকিয়া, কেহ বা বাড়ীর বাহির দরজা পোড়াইয়া খলীফা ওসমানের গৃহে প্রবেশ করিল।

ليس فيهم احد من الصحابة ولا ابنائهم........

"তাহাদের মধ্যে একজনও ছাহাবী বা ছাহাবী-তনয় ছিল না একমাত্র মোহাম্মদ ইবনে আবু বকর—সে ছাহাবী তনয় ছিল।" (বেদায়াহ, ৭—১৮৫)

ঐ সময় ওসমান (রাঃ) নামাযে দাঁড়াইয়া পড়িলেন। নামায বাদ তিনি কোরআন শরীফ তেলাওয়াত আরম্ভ করিলেন। পবিত্র কোরআন শরীফ তাঁহার সম্মুখে ছিল। তিনি বার বার এই আয়াতটি তেলাওয়াত করিতে লাগিলেন—

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ

اِيْمَانًا وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ -

"খাঁটী মোমেনদেরকে যখন বলা হইল যে, শত্রু দল তোমাদের বিরুদ্ধে শক্তি সমবেত করিয়াছে; তাহাদিগকে ভয় কর। তখন তাঁহাদের ঈমান অধিক মজবুৎ হইয়া গেল এবং তাঁহারা এক বাক্যে বলিয়া উঠিল, আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট ও অতি উত্তম কার্য্য-নির্ব্বাহক।"

এই সময় সন্ত্রাসবাদী বিদ্রোহী দলের এক পাষাণ্ড খলীফা ওসমানের কক্ষে প্রবেশ করিয়া এমন ভীষণভাবে তাঁহার গলা টিপিয়া ধরিল যে, শ্বাসরুদ্ধ হইয়া তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে মনে করিয়া ঐ ব্যক্তি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল। অতঃপর মোহাম্মদ ইবনে আবু বকর উপস্থিত হইয়া তাঁহার দাড়ি ধরিয়া এত জোরে ঝাঁকুনি দিল যে, তাঁহার দাঁতে দাঁতে আঘাত লাগার শব্দ শোনা গেল। ওসমান (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, যেই দাড়ি তুমি ধরিয়াছ উহাকে তোমার পিতাও সম্মান করিতেন। তোমার পিতা কখনও

ঐস্থানে হাত লাগাইতেন না, যেস্থানে তুমি হাত দিয়াছ। এতচ্ছ্রবনে মোহাম্মদ ইবনে আবু বকর লজ্জিত হইয়া পিছনে হটিয়া গেল। অতঃপর এক ব্যক্তি একটি খেজুর ডালা নিয়া আসিল এবং খলীফা ওসমানের মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করিল, তাঁহার মাথার রক্তে সম্মুখস্থ কোরআন শরীফ রঞ্জিত হইয়া গেল। মিশরীয় সন্ত্রাসবাদী নেতা গাফেকী ইবনে হর্‌ব যাহার হাতে মদীনার নিয়ন্ত্রণ ভার ছিল—সে লৌহদণ্ড দ্বারা তাঁহার মুখমণ্ডলে সজোরে আঘাত করিল এবং পবিত্র কোরআনকে পদাঘাত মারিয়া তাঁহার সম্মুখ হইতে সরাইতে চাহিল। কিন্তু কোরআন শরীফ ঘূর্ণায়মানভাবে খলীফা ওসমানের সম্মুখে অবস্থিত রহিল। আর এক সন্ত্রাসবাদী নেতা তাঁহার বুকের উপর বসিয়া বর্শা দ্বারা নয়টি আঘাত করিল। অবশেষে মিশরীয় সন্ত্রাসবাদী নেতা সুদান ইবনে হোমরাণ তরবারী নিয়া তাঁহার প্রতি অগ্রসর হইল; তখনই খলীফা ওসমানের স্ত্রী নায়েলাহ হাত দ্বারা প্রতিরোধ করিতে গেলে তাঁহার আঙ্গুল-সমূহ কাটিয়া গেল। সেই তরবারীর আঘাতেই ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ খলীফাতুল-মোসলেমীন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দুই তনয়ার জামাতা ৮০ হইতে ৯০ বৎসর বয়সে ১৮ জিলহজ্জ জুমআর দিনের শেষ ভাগে শাহাদতের শরবৎ পান করতঃ ইহজগত ত্যাগ করিলেন। তাঁহার রক্ত তাঁহার সম্মুখস্ত কোরআন শরীফের যেই আয়াতটির উপর সর্ব্ব প্রথম পতিত হইয়াছিল তাহা ছিল এই—فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم "অচিরেই তোমার শত্রুদের হইতে প্রতিশোধ গ্রহণে আল্লাহ্ তোমার পক্ষে যথেষ্ট হইবেন; তিনি সব কিছু শুনেন ও জানেন।"

সন্ত্রাসবাদীরা খলীফাতুল-মোসলেমীনকে শহীদ করিয়াও ক্ষান্ত হইল না, তাঁহার গৃহের সব কিছু লুণ্ঠনও করিল। এই সব বর্ণনা ঐসব ইতিহাস গ্রন্থেরই যাহার উপর নির্ভর করিয়া মৌদুদী সাহেব তাঁহার কুখ্যাত পুস্তককে নির্ভু্ল সাব্যস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যথা—(বেদায়াহ্, ৭—১৮৮)

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—যে দিন খলীফা ওসমান (রাঃ) শহীদ হইয়াছিলেন, সেই দিন সকাল বেলা তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, অদ্য আমি হযরত নবী (দঃ)কে স্বপ্নে দেখিয়াছি। হযরত (দঃ) আমাকে বলিয়াছেন, হে ওসমান! আজ তুমি আমাদের নিকট ইফ্‌তার করিবে। সে মতে তিনি ঐ দিন রোযা রাখিয়া ছিলেন এবং রোযা অবস্থায়ই দিনের শেষ ভাগে শহীদ হইয়াছিলেন। (বেদায়াহ, ৭—১৮২)

পূর্ব্বের দিনও একটি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন—তাহাও তিনি বর্ণনা করিয়াছেন যে, গত কাল রাত্রে আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি, আমি যেন হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়াছি। তাঁহার নিকট আবু বকর এবং ওমরও বসা

ছিলেন। হযরত (দঃ) বলিলেন, এখন তুমি চলিয়া যাও; আগামী কল্য নিশ্চয় তুমি আমাদের নিকট আসিয়া ইফ্‌তার করিবে।(”)

আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা খলীফা ওসমানের অবরোধ কালে আমি তাঁহার নিকট আসিলাম। তিনি আমাকে সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া বলিলেন, হে ভাই! আমি স্বপ্নে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)কে এই দরওয়াজার নিকট দেখিয়াছি। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ওসমান! শত্রু দল তোমাকে অবরোধ করিয়াছে? আমি বলিলাম—হাঁ। তাহারা তোমাকে পিপাসাগ্রস্ত রাখিয়াছে? আমি বলিলাম—হাঁ। তখন হযরত (দঃ) এক ডোল পানি আমাকে দান করিলেন। আমি প্রাণ ভরিয়া উহা পান করিলাম। হযরত (দঃ) আমাকে বলিলেন, তুমি যদি চাও তবে আমি তোমার সাহায্য করিতে পারি। আর যদি ইচ্ছা কর তবে আমাদের নিকট আসিয়া ইফ্‌তার করিতে পার। ওসমান (রাঃ) বলিলেন, আমি হযরতের নিকট যাইয়া ইফ্‌তার করাকেই গ্রহণ করিয়াছি। (বেদায়াহ, ৭—১৮২)

অবরোধ অবস্থা সৃষ্টির পূর্ব্বে মদীনায় গভর্ণর সম্মেলন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে সিরিয়ার গভর্ণর মোয়াবিয়া (রাঃ) সন্ত্রাসবাদীদের কার্য্য-কলাপে শঙ্কিত হইয়া খলীফা ওসমান (রাঃ)কে বলিয়াছিলেন, আপনি সিরিয়ায় চলুন। তথাকার অধিবাসীগণ আপনার পূর্ণ অনুগত। ওসমান (রাঃ) তদুত্তরে বলিয়াছিলেন—

لا أبيع جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم
وان كان فيه قطع خيط عنقي

“আমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সান্নিধ্য কোন মূল্যেই ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহি—যদিও আমার গর্দ্দান কাটা যায়।”

অতঃপর তিনি তাঁহার হেফাজতের জন্য ফৌজ পাঠাইবার প্রস্তাব করিলে তিনি বলিলেন—لا اضيق على جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم “রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পড়শী—মদীনাবাসীদিগকে আমি সঙ্কটের সম্মুখীন করিতে চাই না।” (কামেল, ৩—৭৯)

অবরুদ্ধ অবস্থায়ও ছাহাবী মুগিরা ইবনে শো’বা (রাঃ) খলীফা ওসমান (রাঃ)কে পরামর্শ দিয়াছিলেন, আপনি আপনার বাড়ীর পেছন দিকের দেওয়াল ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া পড়ুন এবং মক্কায় বা সিরিয়ায় চলিয়া যান। তখনও তিনি বলিয়াছিলেন, সিরিয়াবাসীগণ বাস্তবিকই প্রসংশার পাত্র এবং তথায় মোয়াবিয়া রহিয়াছে—

فلن افارق دار هجرتي ومجاورة رسول الله صلى الله عليه وسلم

"কিন্তু আমি আমার হিজরত-স্থান এবং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সান্নিধ্য কিছুতেই ত্যাগ করিব না।" (বেদায়াহ, ৭—২১০)

এই নির্ম্মল ও স্বচ্ছ প্রকৃতির খলীফাকে সুদীর্ঘ বার বৎসর খেলাফত পরিচালনার পর আশীতীত বয়সে ঐরূপ নির্মমভাবে শহীদ করিয়াছিল আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকগোষ্টির সন্ত্রাসবাদী খাজেরী দল।

মৌতুদী সাহেব এই কেলেঙ্কারীর আসামী সেনাক্ত করিতে যাইয়া সন্ত্রাসবাদী খারেজী দল সম্পর্কে একটি অক্ষরও ব্যয় করিলেন না। পক্ষান্তরে ঐ কেলেঙ্কারীর আসামী খলীফা ওসমান (রাঃ)কে সাব্যস্ত করার জন্য কুখ্যাত সঙ্কলনের শতাধিক পৃষ্ঠা ব্যয় করিয়াছেন।

পরবর্ত্তী খলীফা নির্ব্বাচণে বিদ্রোহী খারেজী দলের কেলেঙ্কারী

সন্ত্রাসবাদী দল খলীফা ওসমান (রাঃ)কে শহীদ করিয়া তাহাদের উদ্দেশ্যে এক ধাপ সাফল্য লাভের পর, এখন উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের জীবন বাঁচাইবার জন্য রক্ষা-কবচেরও আবশ্যক বোধ করিল। উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টার সুবর্ণ সুযোগ এবং রক্ষা-কবচ লাভের সুযোগ, এই উভয়ের জন্য তাহারা নিজেদের মধ্য হইতে খলীফা নির্ব্বাচণের কথা ত চিন্তাই করিতে পারিতে ছিল না। যেহেতু ষড়যন্ত্র ও সন্ত্রাসবাদীতায় তাহারা সাফল্য অর্জ্জন করিলেও জন-সাধারণ মোসলমানদের সংখ্যা অনুপাতে তাহাদের সংখ্যা ছিল নগণ্য। সুতরাং তাহারা ভিন্ন একটি বিকল্প-ব্যবস্থা চিন্তা করিল।

তাহারা শাসন-ক্ষমতায় তাহাদের কর্ত্তৃত্ব এবং খেলাফত-কাঠামোতে তাহাদের দখল ও নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠিত রাখার ব্যবস্থা করিল। পরবর্ত্তী খলীফা হওয়ার অন্যতম যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন আলী (রাঃ)। খলীফা হওয়ার জন্য তাহারা তাঁহার নামই প্রস্তাব করিল। ইহাতে তাহাদেরও সুবিধা হইল যে, জনসাধারণের উপস্থিত ক্ষোভ প্রসমিত হইল এবং খলীফা নির্ব্বাচনে লোকদের সাড়া পাওয়া গেল অধিক।

কিন্তু মদিনা যেহেতু তাহাদের নিয়ন্ত্রনে ছিল, তাই তাহারা জবরদস্তি মূলক তাহাদের আসল উদ্দেশ্য তথা শাসন-ক্ষমতায় তাহাদের কর্ত্তৃত্ব এবং খেলাফত-কাঠামোতে তাহাদের পূর্ণ দখল তাহারা প্রতিষ্ঠিত রাখিল।

আলী (রাঃ) সহ মদিনার বিশিষ্ট ছাহাবীবর্গ তাহাদের এই কারসাজি আঁচ করিতে ছিলেন। তাই তাঁহারা প্রত্যেকেই ঐরূপ পরিস্থিতিতে এবং তাহাদের প্রস্তাবে খেলাফত গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাইতে ছিলেন। কিন্তু তাহারা তাহাদের ঐ অসৎ উদ্দেশ্য লাভ করার জন্য এই ব্যাপারে তাড়াহুড়াও করিল এবং জঘন্যরূপে বল প্রয়োগও করিল। এসম্পর্কে ইতিহাসের কতিপয় উদ্ধৃতি লক্ষ্য করুন—

(ক) খলীফা ওসমান (রাঃ) শহীদ হওয়ার পর মদীনার শাসন-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রনকারী ছিল সন্ত্রাসবাদী নেতা গাফেকী ইবনে হরব। সে খলীফা ওসমানকে শহীদ করার অন্যতম আসামী ছিল। এই সময় তাহারা খলীফা মনোনীত করার জন্য লোক তালাশ করিতে ছিল, কিন্তু পাইতে ছিল না। এমনকি আলী (রাঃ) তাল্‌হা (রাঃ) এবং যোবায়ের (রাঃ)ও ঐ অবস্থায় খলীফা মনোনীত হওয়াকে এড়াইয়া থাকিতে ছিলেন। (তবরী, ৩—৪৫৪)

(খ) সন্ত্রাসবাদীগণ মদীনবাসীকে ডাকিয়া বলিল—

اجلنا كم يومين فوالله لئن لم تفرغوا لنقتلن غدا عليا

وطلحة والزبير واناسا كثيرا نغشى الناس عليا......

"তোমাদিগকে দুই দিনের সময় দেওয়া গেল। এই সময়ের মধ্যে তোমরা খলীফা হওয়ার যোগ্য ব্যক্তি মনোনয়ন করিবে। অন্যথায় পর দিন আমরা আলী, তাল্‌হা, যোবায়ের সহ বহু সংখ্যক লোককে হত্যা করিয়া ফেলিব। এরূপ জবরদস্তিমূলক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে লোকজন আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট আসিতে লাগিল।" (তবরী,—৩—৪৫৬)

(গ) লোকজন আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেলাফতের শপথ গ্রহণ করিলে, তাল্‌হা (রাঃ) এবং যোবায়ের (রাঃ)কে ডাকিয়া আনা হইল। তাল্‌হা (রাঃ) ইতস্তুতঃ প্রকাশ করিলে কুফা হইতে আগত সন্ত্রাসবাদী নেতা খলীফা ওসমান-হত্যার অন্যতম আসামী মালেক আশতার তৎক্ষনাৎ তরবারী উত্তোলন করতঃ তাল্‌হা (রাঃ)কে বলিল...... والله لتبايعن او لاضربن به ما بين عينيك

"খোদার কসম—আলীকে খলীফা গ্রহণের শপথ না করিলে, এখনই তরবারী দ্বারা মাথা দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিব। তখন তাল্‌হা (রাঃ) বলিলেন, তবে ত কোন অবকাশই নাই—এই বলিয়া তিনি শপথ করিলেন এবং যোবায়ের (রাঃ)ও শপথ করিয়া নিলেন।" (তবরী, ৩—৪৫১)

(ঘ) তাল্‌হা (রাঃ) স্বয়ং বলিয়াছেন, আলী (রাঃ)কে খলীফা গ্রহণের শপথ করিয়াছি, এমন অবস্থায় যে, সন্ত্রাসবাদীদের তরবারী আমার মাথার উপর ছিল। সায়াদ (রাঃ) বলেন, বস্তুতঃই তরবারী মাথার উপর থাকা না জানিলেও ইহা জানি যে, তাঁহার শপথ জবরদস্তিমূলক নেওয়া হইয়াছে। (তবরী, ৩—১৫৩)

(ঙ) খলীফা ওসমান-হত্যার অন্যতম আসামী বছরা এলাকার দুর্দ্ধর্ষ ডাকাত ও সন্ত্রাসবাদী নেতা হোকায়ম ইবনে জাবালাহ্ যোবায়ের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট আসিয়া তাঁহাকেও শপথ গ্রহণে বাধ্য করিল। স্বয়ং যোবায়ের (রাঃ)

বলেন, এক ডাকাত আমার নিকট আসিয়াছিল, ফলে আমি শপথ নিয়াছি এমতাবস্থায় যে, আমার গর্দ্দানের উপর ভীষণ চাপ ছিল। (তবরী, ৩—১৫৭)

অবরুদ্ধ মদিনায় শাসন-ক্ষমতা দখলকারী সন্ত্রাসবাদী বিদ্রোহীদের এইরূপ চাপ ও বল প্রয়োগের মধ্যে তাহারা খলীফা নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করিল। অবরুদ্ধ মদিনা যেহেতু তখন তাহাদেরই শাসন ও নিয়ন্ত্রনে ছিল; সুতরাং জবরদস্তি এবং ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তাহারা শাসন-ক্ষমতায় নিজেদের নিয়ন্ত্রন ও বড় বড় পদ এবং খেলাফত-কাঠামোতে তাহাদের পূর্ণ দখল রাখার প্রয়াস পাইল।

এইতথ্য কোন কল্পিত ভাবধারা নহে, বরং ইহা বাস্তব সত্য। আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুও এই বাস্তবকে আঁচ করিয়া থাকিতেন। খলীফা আলী (রাঃ) কোন এক উপলক্ষে বলিয়াছেন—"আমরা তাহাদের (সন্ত্রাসবাদীদের) হর্ত্তাকর্ত্তা নহি, তাহারাই আমাদের হর্ত্তাকর্ত্তা।" (কামেল, ৩—১০০)

সন্ত্রাসবাদীরা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য খলীফা নির্ব্বাচনে বল প্রয়োগ করিয়াছে, তাড়াহুড়া করিয়াছে, শীর্ষস্থানীয় বিশিষ্ট বিশিষ্ট ছাহাবী-জমাতের অনপুস্থিতিতে অবরুদ্ধ মদিনায় নির্ব্বাচন পরিচালনা করিয়াছে। তৎকালীন বিশাল ইসলামী রাষ্ট্রের অন্য কোন অঞ্চলের লোকদের মতামতের তোয়াক্কা করে নাই। বিশেষতঃ মক্কা এলাকা—যথায় হজ্জ উপলক্ষে সমগ্র এলাকার এমনকি মদিনারও শীর্ষস্থানীয় ছাহাবীবর্গ সমবেত ছিলেন তাঁহাদের হইতে সম্পূর্ণরূপে কাটিয়া থাকাবস্থায় এই নির্ব্বাচন পরিচালনা করিয়াছে।

নির্ব্বাচনে এই সব কেলেঙ্কারী না করিলে সন্ত্রাসবাদীদের বাঁচাই কঠিন হইত। তাই তাহারা শুধু নিজেদের রক্ষাকবচ হিসাবে এই কেলেঙ্কারীময় নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করিয়াছিল।

মৌদুদী সাহেব এই সত্যকে উপলব্ধি করিতে না পারিলেও সন্ত্রাসবাদীগণ ইহা ভালরূপেই উপলব্ধি করিতে ছিল। তাই তাহারা অনতিবিলম্বে অবরুদ্ধ মদীনার মধ্যেই নিয়মতান্ত্রিক উপায়কে নস্যাৎ করিয়া, এমনকি স্বয়ং আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মতেরও বিরুদ্ধে খলীফা নির্ব্বাচনে অত্যধিক তাড়াহুড়া করিল। এই ব্যাপারে ইতিহাসের সাক্ষ্য শুনুন—

قالوا ان نحن رجعنا الى امصارنا بقتل عثمان من غير امرة اختلف الناس فى امرهم ولم نسلم فرجعوا الى على فالحوا

عليه واخذ الاشتر بيده فبايعه وبايعه الناس

"সন্ত্রাসবাদীগণ ভাবিল, আমরা যদি ওসমানকে হত্যা করার অপরাধ নিয়া খলীফা নির্দ্ধারিত না করিয়াই নিজ নিজ দেশে ফিরিয়া যাই, তবে লোকদের মধ্যেও

বিরোধ সৃষ্টি হইবে এবং আমরাও বাঁচিয়া থাকিতে পারিব না। সেমতে তাহারা আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট আসিয়া অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিল। এমনকি কুফার সন্ত্রাসবাদী নেতা মালেক আশ্‌তার ঐ সময়ই আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হাত ধরিয়া তাঁহাকে খলীফা মনোনয়নের শপথ করিয়া নিল, তারপর অন্য লোকগণ শপথ করিল। (বেদায়াহ, ৭—২২৬)

আলী (রাঃ) নবীজী মোস্তফার ছাহাবীগণের বিশিষ্টের বিশিষ্ট ছিলেন এবং চার মহানের অবশিষ্ট একজন ছিলেন। ঐ সময় তাঁহার তুলনা ছিল না। তিনি উপস্থিত পরিস্থিতির সমুদয় দিক বিচার বিবেচনা করিয়া মোসলমানদের কল্যান ও মঙ্গল কামনার দৃষ্টিতে অবশেষে খেলাফত গ্রহণ করিলেন। মদিনায় উপস্থিত মোসলমানগণের অধিকাংশের নির্ব্বাচনেই তিনি খলীফা হইলেন। সমুদয় কেলেঙ্কারী ও আপত্তির বিষয়াবলী আঁচ করা সত্বেও তিনি এই পথেই অগ্রসর হইলেন। উপস্থিত পরিস্থিতিতে তিনি উহাকেই মোসলমানদের জন্য মঙ্গল ও কল্যান ধারনা করিয়াছিলেন। তাঁহার আশাছিল যে, মোসলমানগণ সকলে তাঁহাকে স্বীকৃতি দিলে সন্ত্রাসবাদীদেরকে শায়েস্তা করা মোটেই কঠিন হইবে না।

সন্ত্রাসবাদীরা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য জবরদস্তি মূলক সর্ব্বপ্রকার কেলেঙ্কারী করিয়াছে। এবং তাহারা বড় বড় পদ তাহাদের দখলে রাখিয়াছে, খেলাফত-কাঠামোর পুরোভাগে তাহাদের স্থান রাখিয়াছে। এমনকি খলীফা আলী (রাঃ) স্বয়ং নিজেকে তাহাদের সম্মুখে লা-চার নিরুপায় অনুভব করিতেন।

এই সব কেলেঙ্কারীর এক বিন্দুর জন্যও আলী (রাঃ) দোষী ছিলেন না—এই ব্যাপারে আমাদের কাহারও কোন দ্বিধা থাকিলে আমাদের ঈমানের উপর ভীষন আঘাত আসিবে।

এই সব একমাত্র সন্ত্রাসবাদীদেরই দুষ্কৃতি ছিল যাহা তাহারা নির্ব্বাচনী কেলেঙ্কেরীর সুযোগে লাভ করিতে পারিয়াছিল। এবং তাহারা শুধু কেবল নিজেদের স্বার্থে খলীফা আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পক্ষে জবরদস্থি মূলক গা-ঢাকা দিয়া ছিল।

সন্ত্রাসবাদীরা জবরদস্তি ও ষড়যন্ত্রমূলক ঐ সব দুষ্কৃতি ও কেলেঙ্কারী করিয়া খলীফা আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পক্ষে গা-ঢাকা দিয়া থাকায় মোসলমানদের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হইয়া গেল।

১। অনেকে এই নির্ব্বাচনের প্রতি সমর্থন দানে বিরত থাকিলেন।

২। বিশিষ্ট ছাহাবী তাল্‌হা (রাঃ) এবং যোবায়ের (রাঃ) সমর্থন দানের পরও অবরুদ্ধ মদিনা হইতে পলায়ন করিয়া মক্কায় চলিয়া গেলেন এবং সমর্থন প্রত্যাহার করিলেন।

বিশিষ্ট ছাহাবী মুগিরা ইবনে শো'বা (রাঃ) সহ আরও অনেক ছাহাবী গোপনে মক্কায় চলিয়া গিয়া ছিলেন। (বেদায়াহ, ৭—২২৮)

৩। মক্কায় সমবেত শীর্ষস্থানীয় ছাহাবী-তাবেয়ীগণও উক্ত নির্ব্বাচনকে প্রত্যাখ্যান করিলেন।

৪। তৎকালীন ইসলামী রাষ্ট্রের বিশিষ্ট এলাকা সিরিয়ার শাসনকর্ত্তা মোয়াবিয়া (রাঃ)ও এই নির্ব্বাচনকে প্রত্যাখ্যান করিলেন।

এই সব ছাহাবী ও তাবেয়ীগণের ক্ষোভ ও ক্রোধ ছিল একমাত্র দুষ্কৃতী সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—উল্লেখিত ছাহাবীগণ যাঁহাদের ক্ষোভ ও ক্রোধ ছিল খলীফা হত্যাকারী দুষ্কৃতী সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি—যাঁহাদের অগ্রভাগে ছিলেন আয়েশা (রাঃ) আশারা-মোবাশশারা হইতে তাল্‌হা (রাঃ) ও যোবায়ের (রাঃ) এবং মোয়াবিয়া (রাঃ)। এই সব বিশিষ্ট ছাহাবীবর্গের প্রতি ক্ষোভ ও ক্রোধ দেখাইয়াছেন মৌদুদী সাহেব।

এই সব ছাহাবীবর্গকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য মৌদুদী সাহেব ধূঁয়া তুলিয়াছেন যে, পূর্ব্ব হইতেই মদিনা খেলাফত নির্ব্বাচনের কেন্দ্র ছিল, অতএব এই কেন্দ্রীয় নির্ব্বাচনকে প্রত্যাখ্যান করিয়া আয়েশা (রাঃ) তাল্‌হা (রাঃ) যোবায়ের (রাঃ) মোয়াবিয়া (রাঃ) দোষী ও অপরাধী সাব্যস্ত হইয়াছেন।

উল্লেখিত শীর্ষস্থানীয় ছাহাবীগণ যাঁহাদের দ্বীন ঈমান ও ইসলাম এবং ধর্ম্মীয় জ্ঞান ও এখ্‌লাছ-একনিষ্ঠতা কোটি কোটি মৌদুদীই নয় শুধু, আমাদের ন্যায় বিশ্বের মোসলমানদের অপেক্ষা বহু উর্দ্ধে। চৌদ্দশত বৎসরের ব্যবধানে জন্মিয়া তাঁহাদের কার্য্যক্রমের উপর অপরাধের রায় প্রদান করা—ইহাই মৌদুদী সাহেবের সঙ্গে আমাদের মৌলিক মতবিরোধ। এবং ইহাকেই সর্ব্বসম্মত রূপে নিষেধ করিয়াছেন পূর্ব্বাপর ইমামগণ এবং জাতীয় মনীষীবৃন্দ যাহার প্রামাণিক ও বিস্তারিত আলোচনা বাংলা বোখারী শরীফ ষষ্ঠ খণ্ডের আরম্ভে করা হইয়াছে।

সুধীবৃন্দ! প্রায় চৌদ্দ শত বৎসর পূর্ব্বের পরিস্থিতি যাহা ঐ সব ছাহাবীবর্গের সম্মুখে ছিল আমাদের সম্মুখে তাহা নাই—এমতাবস্থায় কিরূপে আমরা তাঁহাদিগকে অপরাধী বলিতে পারি?

মৌদুদী সাহেব মদিনায় নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়া যাওয়ার আইনের পেঁচ দেখাইয়া উহার বিরোধীতার উপর অপরাধের রায় দিয়াছেন। পূর্ব্বাপর খলীফা নির্ব্বাচনের কেন্দ্র মদিনাই ছিল যাহার যুক্তিও মৌদুদী সাহেব দেখাইয়াছেন। কিন্তু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছাহাবীগণের দৃষ্টিতে যদি নিম্নে বর্ণিত আপত্তির কারণসমূহ থাকিয়া থাকে তবে উহাকে কি অপরাধ বলা হইবে? যথা—

১। পূর্ব্বেকার খলীফা নির্ব্বাচনের কেন্দ্র মদিনাই ছিল বটে, তবে প্রথমতঃ ঐ সব নির্ব্বাচনে কোন কেলেঙ্কারী, জবরদস্তি ও বিরোধ হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ পূর্ব্বেকার নির্ব্বাচনসমুহ মদিনায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকিলেও অন্যান্য অঞ্চলের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মতামতের যাচাইও অবশ্যই করা হইয়া ছিল। পক্ষান্তরে আলোচ্য নির্ব্বাচনে খলীফা হত্যাকারী মোনাফেক সন্ত্রাসবাদীগোষ্টি নিজেদের স্বার্থ রক্ষার উপায় করার জন্য গায়ে পড়িয়া কেলেঙ্কারী ও জবরদস্তি করিয়াছে—যাহার ঐতিহাসিক সাক্ষ্য পূর্ব্বে উল্লেখ হইয়াছে। এবং ইহার কারণেই এই নির্ব্বাচনে বিরোধও সৃষ্টি হইয়াছে। মদিনার ভিতরেই অনেকে (হয় ত কোন কৌশলে) নির্বাচনে অংশ গ্রহণ হইতে বিরত থাকিয়া ছিলেন। "বেদায়াহ-ওয়ান্নেয়াহ" ইতিহাস গ্রন্থের ৭ম খণ্ড ২২৬ পৃষ্ঠায় এইরূপ আঠার জন বিশিষ্ট ছাহাবীর নাম উল্লেখ রহিয়াছে। আর মদিনা ছাড়া অন্যান্য এলাকার মতামতের ত কোনই তোয়াক্কা করা হয় নাই।

২। পূর্ব্বেকার নির্ব্বাচন মোছলেম-শিরোমণি ছাহাবীগণের প্রাণকেন্দ্র মদিনার সকল অধিবাসীগণের উপস্থিতিতে হইয়াছিল। পক্ষান্তরে আলোচ্য নির্ব্বাচনকালে মদিনার অধিকাংশ অধিবাসীই হজ্জ উপলক্ষে মদিনার বাহিরে মক্কায় ছিলেন।

৩। পূর্ব্বেকার নির্ব্বাচন যথা—খলীফা ওসমানের নির্ব্বাচন পূর্ণ ধীরস্থিরতার সহিত অতি সুন্দর ও সুষ্ঠুরূপে হইয়া ছিল। যাহার বিবরণ সম্মুখে আসিতেছে এবং বোখারী শরীফের ষষ্ঠ খণ্ডে ১৮৩৪ নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে।

পক্ষান্তরে আলোচ্য নির্ব্বাচনে মদিনার শাসন নিয়ন্ত্রনকারী বিদ্রোহী সন্ত্রাসবাদী দল উদ্দেশ্য প্রণোদিত অবস্থায় যে তাড়াহুড়া করিয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণের উদ্ধৃতি ইতিহাস হইতে প্রদান করা হইয়াছে।

৪। আলোচ্য নির্ব্বাচনকালে মদিনা সম্পূর্ণরূপে খলীফা হত্যাকারী বিদ্রোহী সন্ত্রাসবাদীদের নিয়ন্ত্রনে অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিল। পক্ষান্তরে ইসলামেরই অপর কেন্দ্র মক্কা এলাকায় বিশেষভাবে তখন হজ্জ উপলক্ষে সমগ্র অঞ্চলের বিশিষ্ট ছাহাবী ও তাবেয়ীবর্গ সমবেত ছিলেন এবং তাঁহারা তথায় অপেক্ষারত ছিলেন। এমনকি দুর্ঘটনার পর বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমাগম তথায় অধিক হইতে ছিল। এবং তথায় বিদ্রোহী সন্ত্রাসবাদীদের কোন পাত্তাই ছিল না। কিন্তু সন্ত্রাসবাদীরা তাড়াহুড়া করিয়া জবরদস্তিমূলক তাহাদের অবরুদ্ধ মদিনায়ই নির্ব্বাচন করিয়া নিল।

এমতাবস্থায় তৎকালীন পরিস্থিতির সম্মুখীন ছাহাবীগণের এক পক্ষ যদি ভাবিয়া থাকেন যে, এই নির্ব্বাচনের প্রতি স্বীকৃতি দিলে তাহা খলীফা হত্যাকারী বিদ্রোহী সন্ত্রাসবাদীদের সুযোগ-সুবিধাকে সুদৃঢ় করার নামান্তর হইবে। কারণ, এই স্বীকৃতি

শুধু একা খলীফা আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রতি স্বীকৃতি হইবে না। বরং পুর্ণ খেলাফত-কাঠামোর প্রতিই স্বীকৃতি প্রদান করা হইবে। অথচ ঐ খেলাফৎ-কাঠামোর পুরোভাগ ত দখল করিয়া নিয়াছে বিদ্রোহী সন্ত্রাসবাদীরা। সেমতে সন্ত্রাসবাদী বিদ্রোহীদের বিতাড়ন-পূর্ব্বে এই নির্ব্বাচনের প্রতি স্বীকৃতি দান তাঁহারা মুলতবী রাখিয়াছেন—যাহাকে মোটেই অস্বাভাবিক এবং দোষণীয় বলা যায় না।

সন্ত্রাসবাদী বিদ্রোহীদেরে বিতাড়নের উদ্দেশ্যেই হয়ত ঐ বিশিষ্ট ছাহাবীবর্গ উক্ত নির্ব্বাচনের প্রতি স্বীকৃতি দান মুলতবী রাখিয়া খলীফা হত্যাকারী বিদ্রোহীদের বিচারের দাবী কার্য্যকরী করার জন্য আন্দোলন চালাইয়া ছিলেন। কারণ, তাহাদের বিচারের ব্যবস্থা করা হইলেই হয় তাহারা পলায়ন করিবে না হয় ধরা পড়িয়া দণ্ডিত হইবে।

প্রকাশ থাকে যে, উক্ত নির্ব্বাচনের প্রতি স্বীকৃতি মুলতবীকারীগণ সকলেই, এমনকি মোয়াবিয়া (রাঃ)ও আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিরুদ্ধে পাল্টা খেলাফতের দাবী না করিয়া খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করিয়া দিতে ছিলেন যে, আলী (রাঃ) সন্ত্রাসবাদী খলীফা হত্যাকারী বিদ্রোহীদের বিচার ও শাস্তি বিধান করিয়া দিলে বিনা বাক্যব্যয়ে আমরা তাঁহার প্রতি স্বীকৃতি প্রদান করিব—ইহা ঐতিহাসিক সত্য।

মোয়াবিয়া (রাঃ) আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রতি অধিক সম্মান প্রদর্শন করিতেন। নিজের অপেক্ষা তাঁহাকেই খলীফা হওয়ার অধিক উপযুক্ত বলিয়া স্বীকার করিতেন। (বেদায়া-ওয়ান-নেহায়া ৭—৫৭ × ৫৯ দ্রষ্টব্য)

মোয়াবিয়া (রাঃ) নিজেই বলিয়াছেন—

ونحن لا نرد ذلك عليه ولا نتهمه - فليقدنا من قتل عثمان فانا
اول من بايعه من اهل الشام

"আমরা আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রতি খলীফা ওসমানের হত্যার কোনই দোষ দেই না। আলী (রাঃ) খলীফা ওসমানের হত্যাকারীদিগকে শাস্তি বিধান করিলে আমি মোয়াবিয়া সিরিয়াবাসীগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম তাঁহার খলীফা হওয়া বরণ ও স্বীকার করিব।" (বেদায়া-ওয়ান-নেহায়া ৭—৬৫)

সুধী পাঠক ! স্বচ্ছ হৃদয় ও নির্ম্মল অন্তরে চিন্তা করুন উল্লেখিত ধরনের বাস্তব আপত্তির কারণ দৃষ্টে উক্ত ঐতিহাসিক সত্য ভাবধারা নিয়া যদি বিরোধীতা করা হইয়া থাকে তবে উহাকে কি ঐ শ্রেণীর ছাহাবীবর্গের পক্ষে অপরাধ বলা যাইতে পারে ?

আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রতিও মোটেই কোনরূপ দোষারোপ করা যায় না—করিলে তাহাও অবশ্যই ঈমান বিনষ্টকারী হইবে। কারণ, আলী (রাঃ) অবশ্যই সন্ত্রাসবাদী বিদ্রোহীদের প্রতি ভীষন ক্রুদ্ধ ও বিক্ষুব্ধ ছিলেন। কিন্তু তাহাদের বিচার করনে এবং দণ্ড দানে তিনি সুযোগের অপেক্ষা করিতে ছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল—এই পরিস্থিতিতে সন্ত্রাসবাদী বিদ্রোহীদেরে শায়েস্তা করা ও দণ্ড দেওয়ার জন্য মোসলমানদের ঐক্যবদ্ধ শক্তির প্রয়োজন। অতএব যেই নির্ব্বাচন হইয়াছে উহার প্রতি একতাবদ্ধ রূপে স্বীকৃতী প্রদান করা হইলে পরে সন্ত্রাসবাদীদের বিচার দণ্ড ও বিতাড়ন সবই সম্ভব ও সহয হইবে। তাই তিনি বিচারের আগে স্বীকৃতির দাবী করিতে ছিলেন।

আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর এই নীতি, এই ভাবধারা এই কর্ম্ম-পদ্ধতিকেও মোটেই দোষারোপ করা যায় না। তাঁহার দাবী ও নীতিও নিশ্চয়ই তাঁহার সম্মুখস্থ জটিল পরিস্থিতির সামঞ্জস্যেই ছিল। প্রায় চৌদ্দ শত বৎসর পরে আমাদের ন্যায় লোকেরা আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ন্যায় মহানের কার্য্য-ধারাকে কিরূপে দোষারোপ করিতে পারে? বরং তৎকালীন পরিস্থিতির সম্মুখে আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর দাবীকে শক্তিশালী গণ্য করা হইয়া থাকে।

সার কথা—উল্লেখিত বিশিষ্ট ছাহাবীবর্গ এবং আলী (রাঃ) উভয়পক্ষই উদ্দেশ্যের দিক দিয়া সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ছিলেন। উভয়ের নীতিও তাঁহাদের নিজ নিজ দৃষ্টিতে সঠিক শুদ্ধই ছিল। কার্য্য-পদ্ধতিতে যে গরমিল ছিল তাহা অচিরেই মিমাংসায় পৌঁছিয়া যাইত—যাহা শত শত রাধা-বিপত্তি ভেদ করিয়াও বার বার নিকটবর্ত্তী আসিতে ছিল। কিন্তু জাতির অদৃষ্টের পরিহাস—ধুরন্ধর সন্ত্রাসবাদীরা অতি সন্তর্পনে উভয় পক্ষের মধ্যে এমন বিষবাষ্প ছড়াইতে থাকে যাহার ফলে শুধু কর্ম্ম-পদ্ধতির মতবিরোধটা যুদ্ধ-বিগ্রহে পরিণত হইয়া যায়।

ছাহাবী পক্ষদ্বয়ের মধ্যে সংঘর্ষ সৃষ্টির জন্য যে, একমাত্র সন্ত্রাসবাদীরাই দায়ী উহার জাজ্বল্যমান প্রমান লিপিবদ্ধ ইতিহাস হইতে "জামাল" যুদ্ধের বয়ানে দেখিতে পাইবেন। যাহা প্রতিটি মোসলমানের অন্তরকে এমনভাবে ছেদন করে যে, তাহা সহ্য করার মত নহে।

পাঠক বৃন্দ! ইতিহাসের সুস্পষ্ট (reference) হাওয়ালার মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত ইতিহাসটি ভাল রূপে হৃদয়ঙ্গম করিবেন। তাহাতে আঁচ করিতে পারিবেন যে ছাহাবীদের যুগে সৃষ্ট কেলেঙ্কারীর মূলে খারেজী মোনাফেকদের কি জঘন্য ষড়যন্ত্র ছিল। পক্ষান্তরে ছাহাবা কেরামের প্রত্যেকেরই অন্তঃকরণ অত্যন্ত নির্ম্মল ও স্বচ্ছ ছিল। তাঁহাদের মিলন-চেষ্টাকে সর্ব্বদাই অতি জঘন্যরূপে বানচাল করা হইয়াছে।

জামাল-যুদ্ধের ইতিহাস :

সন্ত্রাসবাদীগণ কর্তৃক খলীফা ওসমান (রাঃ) শহীদ হওয়া এবং আলী (রাঃ) খলীফা মনোনীত হওয়ার ৪।৫ মাস পরেই বছরায় মোসলমানদের দুই পক্ষে সামরিক সংঘর্ষ হইয়াছিল—যাহা "জঙ্গে-জামাল" নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। উহাতে উভয় পক্ষে বহু বিশিষ্ট বিশিষ্ট ছাহাবী সহ দশ হাজার লোক প্রাণ হারাইয়াছিলেন। সেই ঘটনার এক পক্ষে আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সহিত ২০ হাজার লোক ছিল। অপর পক্ষে আয়েশা (রাঃ) তাল্‌হা (রাঃ) এবং যোবায়ের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সঙ্গে ৩০ হাজার লোক ছিল। (বেদায়াহ, ৬—২৩)

উভয় পক্ষের সাক্ষাতের বহু পূর্বেই পথি মধ্য হইতে—

بعث علي رسولا الى طلحة والزبير بالبصرة يدعوهما الى الالفة
والجماعة ويعظم عليهما الفرقة والاختلاف

"আলী (রাঃ) ছাহাবী কা'কা ইবনে আম্‌র (রাঃ)কে বছরা পানে অপর পক্ষের প্রধান—তাল্‌হা ও যোবায়ের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমার নিকট পাঠাইলেন; পরস্পর মহব্বৎ ও একতা বজায় রাখার আহ্বান জানাইয়া এবং বিরোধ ও বিভক্তির বিষময় ফলের প্রতি সতর্ক করিয়া।"

উক্ত ছাহাবী বছরায় উম্মুল-মোমেনীন আয়েশার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাল্‌হা (রাঃ) ও যোবায়ের (রাঃ)কেও তথায় ডাকিয়া আনিয়া বিরোধ অবসান সম্পর্কে আলোচনা করিলেন। আয়েশা (রাঃ) এবং তাল্‌হা ও যোবায়ের (রাঃ) খলীফা ওসমানের হত্যাকারীগণকে শাস্তি দানের কথা উল্লেখ করিলে কা'কা (রাঃ) সে সম্পর্কে নিশ্চয়তা প্রদান করিয়া বলিলেন—

انما اخر قتل قتلة عثمان الى ان يتمكن منهم

"আলী (রাঃ) খলীফা ওসমানের হত্যাকারীগণকে মৃত্যুদণ্ড প্রদানে শুধু এই জন্য বিলম্ব করিতেছেন যে, তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয়ের প্রতীক্ষা করিতেছেন।"

ان هذا الامر الذى وقع دواؤه التسكين فاذا سكن اختلجوا

"যে ঘটনা ঘটিয়াছে উহার ঔষধ হইল, শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনা; শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হইলেই উক্ত অপরাধীগণকে নিপাত করিয়া দেওয়া হইবে।"

فقالوا قد اصبت واحسنت فارجع فان قدم علي وهو على
مثل رأيك صلح الامر

"এতচ্ছ্রবণে আয়েশা (রাঃ) এবং তাল্‌হা ও যোবায়ের (রাঃ) সকলেই বলিলেন, আপনি সঠিক কথা বলিয়াছেন এবং ভাল বলিয়াছেন, আলী (রাঃ) যদি এই মতের উপর থাকেন তবে বিরোধ নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে।"

فرجع الى على فاخبره فاعجبه ذلك واشرف القوم الصلح......
وارسلت عائشة......انما جائت للصلح ففرح هؤلاء وهؤلاء

"কা'কা (রাঃ) আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া উক্ত আলোচনার সংবাদ প্রদান করিলে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং সমস্ত মোসলমানগণ বিরোধ নিষ্পত্তির আশা করিতে লাগিলেন। আয়েশা (রাঃ) ব্যক্তিগত ভাবেও আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট বার্ত্তা পাঠাইলেন যে, তাঁহার আগমণ একমাত্র বিরোধ অবসানের জন্য। এই অবস্থায় উভয় পক্ষে আনন্দের হিল্লোল বহিয়া গেল।" ...... وقام على فى الناس خطيبا

"আনন্দমুখর পরিবেশে আলী (রাঃ) স্বীয় লোকদের মধ্যে দাঁড়াইয়া একটি ভাষণ দান করিলেন। ভাষণের মধ্যে তিনি অন্ধকার যুগের অবস্থার উল্লেখ পূর্ব্বক ইসলামের দ্বারা যে সৌভাগ্য, পরস্পর যে একতা ও ভ্রাতৃত্ব লাভ হইয়াছে তাহারও উল্লেখ করিলেন। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পর আবু বকর (রাঃ) তাঁহার পর ওমর (রাঃ) তাঁহার পর ওসমান রাজিয়াল্লাহু আনহুর আমলের শান্তি ও শৃঙ্খলার উল্লেখ করিয়া বর্ত্তমান ঘটনা প্রবাহের প্রতিও ইঙ্গিত দান করিলেন। এই ভাষণে তিনি এক শ্রেণীর লোকের সমালোচনা করিয়া বলিলেন—

اقوام طلبوا الدنيا وحسدوا من انعم الله عليه بها وعلى الفضيلة
التى من الله بها وارادوا رد الاسلام والاشياء على ادبارها

"এক দল লোক নিজেদের জন্য দুনিয়ার উন্নতি চায় এবং আল্লাহ যাহাদিগকে দুনিয়ার উন্নতি দিয়াছেন তাহাদের প্রতি হিংসা বিদ্বেষ পোষণ করে। তাহারা ইসলাম এবং মোসলমানদের সমুদয় বিষয়কে অবনতির দিকে নিয়া যাইতে চায়।"

এই ভাষণে আলী (রাঃ) একটি গুরুত্বপূর্ণ মনোভাবের আভাষ দান বলিলেন,

الا انى مرتحل غدا فارتحلوا ولا يرتحل معى احد اعان
على قتل عثمان بشئ من امور الناس

"আমি আগামী কল্য এস্থান হইতে যাত্রা করিব, তোমরাও যাত্রা করিও। কিন্তু আমার সহিত ঐরূপ এক ব্যক্তিও আসিও না যে খলীফা ওসমান (রাঃ)কে হত্যার ব্যাপারে কোনও প্রকারে অংশ গ্রহণ করিয়াছে।"

মোসলমানদের এই আনন্দ-হিল্লোল ও সৌভাগ্য-পূর্ণিমা মুহূর্তে সেই আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকগোষ্ঠীর আসল রূপ প্রকাশকারী ভুমিকা ইতিহাসের বর্ণনায় প্রত্যক্ষ করুন—

فلما قال هذا اجتمع من رؤوسهم جماعة كالاشتر النخعى وشريح وعبد الله بن سبأ وغلاب وغيرهم فى الفين وخمسمائة وليس فيهم صحابى ولله الحمد

"আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ভাষণের পর তাঁহার সঙ্গীগণের নেতৃস্থানীয় একটি বিশেষ দল, যেমন—আশতার নখ্‌য়ী, শোরায়হ্ এবং আবদুল্লাহ ইবনে সাবা ও গাল্লাব এবং আরও অনেকে একত্রিত হইল। তাহাদের সঙ্গে দুই হাজার পাঁচ শত লোক ছিল। আল্লার শোকর যে, উহাদের মধ্যে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবী একজনও ছিলেন না।"

এই দলটিই ছিল আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকগোষ্ঠীর সন্ত্রাসবাদী দলের সমষ্টি। তাহারাই খলীফা ওসমানের হত্যা-সংশ্লিষ্ট দল। তাহারা ছদ্মবেশে আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর দলে মিশিয়া রহিয়া ছিল। আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ভাষণে তাহারা নিজেদের বিপদ গণিল, তাই তাহারা ষড়যন্ত্রমূলক পরামর্শে বসিয়াছে। তাহাদের সলা-পরামর্শের বিবরণ ইতিহাসের মুখে শুনুন—

فقالوا ما هذا الرأى......وقد قال ما سمعتم غدا يجمع عليكم الناس وانما يريد القوم كلهم انتم فكيف بكم وعددكم قليل فى كثرتهم........

"তাহারা বলিল, আলীর ভাষণে যে অভিমত ব্যক্ত হইল কি ভয়ঙ্কর সেই অভিমত! তিনি যাহা বলিয়াছেন তোমরা সকলেই তাহা শুনিয়াছ। উভয় পক্ষের সকল লোক সমবেত ভাবে তোমাদের উপর আগামী কল্য আক্রমণ চালাইবে। সকলের আক্রোশ একমাত্র তোমাদের প্রতি। তোমাদের প্রাণ রক্ষার কি উপায় আছে—যখন তোমাদের সংখ্যা তাহাদের অধিক সংখ্যার অনুপাতে খুবই নগণ্য?"

খলীফা ওসমানের হত্যার অন্যতম অপরাধী আশতার নখয়ী দাঁড়াইয়া বলিল, আমাদের সম্পর্কে তাল্‌হা ও যোবায়রের অভিমত ত পূর্ব্বেই জানা ছিল। আলীর অভিমত অদ্যকার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জানা ছিল না। আলী যদি অপর পক্ষের সঙ্গে মীমাংসায় উপনীত হয় তবে নিশ্চয় সেই মীমাংসা আমাদের মৃত্যুদণ্ডের উপরই

হইবে। পরিণাম যখন ইহাই হইবে, তখন পূর্ব্বাহ্নেই আমরা আলীকে ওসমানের স্থানে পৌঁছাইয়া দেই (তথা হত্যা করিয়া ফেলি)। এই মন্তব্যে তাহারা নীরব রহিল। কেহই কোন প্রতিবাদ করিল না। তখন আসল মোনাফেক আবহুল্লাহ ইবনে সাবা দাঁড়াইয়া বলিল, তোমার এই অভিমত অত্যন্ত ক্ষতিকর; আলীকে আমরা হত্যা করিয়া ফেলিলে আমাদের মৃত্যু অনিবার্য্য। কারণ ওসমানকে হত্যাকারী দল—আমাদের সংখ্যা মাত্র আড়াই হাজার; তাল্‌হা ও যোবায়রের সঙ্গীদের প্রতিরোধ করার কোন শক্তিই তোমাদের নাই। পক্ষান্তরে তাহাদের আক্রোশ একমাত্র তোমাদের প্রতি।

গাল্লাব নামক ব্যক্তি বলিল, আমরা আলীর দল ত্যাগ করিয়া কোন এক এলাকায় প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করি। আবহুল্লাহ ইবনে সাবা প্রতিবাদ করিয়া বলিল, এই ব্যবস্থায় জনসাধারণ তোমাদিগকে থাবাইয়া মারিয়া ফেলিবে।

ثم قال ابن السوداء قبحه الله يا قوم ان عزكم في خلطة الناس
فاذا التقى الناس فانشبوا الحرب والقتال بين الناس
ولا تدعوهم يجتمعون

"আবহুল্লাহ ইবনে সাবা —আল্লাহ তাহার মুখ কালা করুন— সর্ব্ব শেষে বলিল, হে সঙ্গীগণ! তোমাদের লোকগণ জনসাধারণের সঙ্গে মিশিয়া আছে। (তোমরা বিচ্ছিন্ন হইবা না, বরং) যখনই উভয় পক্ষের পরস্পর সাক্ষাৎ হইবে, তখনই তোমরা যুদ্ধ বাঁধাইয়া দিবে এবং আক্রমণের সূচনা করিয়া দিবে; তাহাদিগকে বিরোধ মীমাংসার জন্য একত্রিত হওয়ার সুযোগই দিবে না।"

ইহা ছিল আবহুল্লাহ ইবনে সাবার দলের ষড়যন্ত্রমূলক প্রথম পরামর্শ। পরদিন প্রভাতেই আলী (রাঃ) বিরোধ মীমাংসার দৃঢ় আশা লইয়া বছরা পানে যাত্রা করিলেন। আবহুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকের দল কিন্তু তাঁহার সঙ্গ ছাড়িল না।

وسار طلحة والزبير ومن معهما للقائه

"এবং তাল্‌হা ও যোবায়ের (রাঃ) স্বীয় সঙ্গীগণ সহ অগ্রসর হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা ও সাক্ষাতের জন্য রওয়ানা হইলেন।"

ثم بعث على الى طلحة والزبير يقول انكنتم على ما فارقتم
عليه القعقاع بن عمرو فكفوا حتى ننزل فننظر في هذا الامر
فارسلا اليه في جواب رسالته انا على ما فارقنا القعقاع بن عمرو
من الصلح بين الناس

"আরও একটি শুভ লক্ষণ এই যে, আলী (রাঃ) তাল্‌হা ও যোবায়রের নিকট এই বলিয়া দুত পাঠাইলেন যে, যদি আপনারা এখনও ঐ সিদ্ধান্তের উপর থাকিয়া থাকেন যে সিদ্ধান্ত আমার প্রথম প্রেরিত দুত কা'কা ইবনে আমরের উপস্থিতিতে সাব্যস্ত হইয়া ছিল, তবে সর্ব্ব প্রকার উস্কানী মুলক কার্য্য বারণ রাখিবার ব্যবস্থা করিবেন ; যেন, আমরা একত্রে বসিয়া বিরোধ মীমাংসার ব্যাপারে চিন্তা করিতে পারি। এই সংবাদ পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে তাল্‌হা ও যোবায়ের (রাঃ) উত্তর পাঠাইয়া দিলেন যে, আমরা সেই পূর্ব্ব সিদ্ধান্তের উপর অটল রহিয়াছি। উভয় পক্ষের এই বার্ত্তা বিনিময়ে সকলের অন্তরেই শান্তি ও স্বস্তির ভাব ফুটিয়া উঠিল।"

(বেদায়াহ, ৭—২৩৮)

উভয় পক্ষ বছরায় মিলিত হওয়ার পর আলী (রাঃ) এবং তাল্‌হা ও যোরায়ের (রাঃ) একত্রে বসিয়া স্থির করিলেন যে, বিরোধের অবসান ও সামরিক ব্যবস্থা পরিত্যাগ করাই সর্ব্বোত্তম পন্থা। সেমতে আলী (রাঃ) এবং তাল্‌হা ও যোবায়ের (রাঃ) নিজ নিজ লোকদের মধ্যেও উহা প্রচার করিয়া দিলেন—

فباتوا بليلة لم يبيتوا بمثلها للعافية التى اشرفوا عليها والصلح
وبات الذين اثاروا امر عثمان بشر ليلة وقد اشرفوا على الهلكة
وباتوا يتشاورون ليلتهم فاجتمعوا على انشاب الحرب فى السر

"উভয় পক্ষের মোসলমানগণ মীমাংসা ও শান্তির আশা নিয়া এমন স্বস্তির সহিত রাত্রি কাটাইলেন যাহা ইতিপূর্ব্বে কাহারও ভাগ্যে জুটে নাই। পক্ষান্তরে যাহারা খলীফা ওসমানের ব্যাপারে মিথ্যা প্রচারণা চালাইয়া ছিল তাহারা অত্যন্ত অস্বস্তির রাত্রি কাটাইল ; তাহাদের চোখে মৃত্যুর ছবি ভাসিতে ছিল। তাহারা রাত্রে গোপন পরামর্শে স্থির করিল যে, উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধাইয়া দিবে।"

فغدوا مع الغلس وما يشعر بهم فخرجوا متسللين وعليهم الظلمة فقصد
مضريهم الى مضريهم وربيعيهم الى ربيعيهم ويمنيهم الى يمنيهم......
فوضعوا فيهم السلاح ....

"ঐ দুষ্কৃতিকারীগণ পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রভাতের অন্ধকারেই সকলের অজ্ঞাতে সশস্ত্রে বাহির হইয়া পড়িল এবং তাহাদের বিভিন্ন গোত্রীয় লোকেরা নিজ নিজ গোত্রীয় উভয় পক্ষের মোসলমানদের উপর অন্ধকারের মধ্যেই আকস্মিক আক্রমণ করিয়া বসিল।" (কামেল, ৩—১২৪)

এই ভাবে আড়াই হাজার দুষ্কৃতিকারী যখন অন্ধকারের মধ্যে উভয় পক্ষের লোকদের উপর অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া বসিল, তখন তাল্‌হা ও যোবায়র রাজিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষ মনে করিল যে, আলী রাজিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষ বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া আক্রমণ চালাইয়াছে, তাই তাহারা অস্ত্র ধারণ করতঃ রণে লিপ্ত হইয়া পড়িল। অপর দিকে আলী রাজিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষও মনে করিল যে, তাল্‌হা ও যোবায়রের রাজিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষ বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়া আক্রমণ চালাইয়াছে, তাই তাহারাও অস্ত্র ধারণ করিয়া রণে অবতীর্ণ হইল।

فثار كل فريق الى سلاحه ولبسوا اللامة وركبوا الخيول ولا يشعر
احد منهم ما وقع الامر عليه فى نفس الامر

"এইভাবে উভয় পক্ষের লোকগণ অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া অশ্বারোহণে রণ ক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িল। প্রকৃত প্রস্তাবে দুষ্কৃতিকারীগণ যে কুকর্ম্ম করিয়াছে তাহা তাঁহারা বুঝিতেই পারিলেন না। (বেদায়াহ, ৭—২৩৯)

وقامت الحرب على ساق وقدم وتبارز الفرسان وجالت الشجعان
فنشبت الحرب وتواقف الفريقان وقد اجتمع مع على عشرون
الفا والتف مع عائشة نحوا من ثلاثين الفا فانا لله وانا اليه
راجعون - والسبائية اصحاب ابن السوداء قبحه الله لا يفترون
من القتل ومنادى على ينادى الا كفوا الا كفوا فلا يسمع احد

"উভয় পক্ষের যুদ্ধ প্রচণ্ড আকার ধারণ করিল। আলী রাজিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষে বিশ হাজার এবং অপর পক্ষে ত্রিশ হাজার মোট পঞ্চাশ হাজার লোকের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বাঁধিয়া গেল। আল্লাহ মুখ কালা করুন আবদুল্লাহ ইবনে সাবার—তাহার সন্ত্রাসবাদী দল এই সুযোগে বিরামহীনরূপে দ্রুত বেগে হত্যাকাণ্ড চালাইয়া যাইতে লাগিল। আলী (রা:) অবস্থা শান্ত করার জন্য লোক নিযুক্ত করিয়া দিলেন। তাহারা "হে লোক সকল ক্ষান্ত হও—হে লোক সকল ক্ষান্ত হও" বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল। কিন্তু কার চিৎকার কে শুনে?

(বেদায়াহ, ৭—২৩৯)

وتقدمت عائشة وناولت كعب بن سوار مصحفا وقالت ادعهم
اليه وذلك حين اشتد الحرب وحمى القتال فلما تقدم كعب
بن سوار بالمصحف يدعو اليه استقبله مقدمة جيش الكوفيين

وكان عبد الله بن سبا واتباعه بين يدي الجيش يقتلون من قدروا عليه لا يتوقفون في احد فلما رأوا كعب بن سوار رافعا المصحف رشقوه بنبالهم فقتلوه

"যুদ্ধের প্রবল উত্তেজনার সময় আয়েশা (রাঃ) যুদ্ধ থামাইবার সর্ব্বশেষ চেষ্টা এই করিলেন যে, বছরার কাজী কায়াবকে পবিত্র কোরআন শরীফ হাতে দিয়া পাঠাইলেন। তিনি লোকদের মধ্যে কোরআন শরীফ উত্তোলন পূর্ব্বক সকলকে এই পবিত্র কালামের প্রতি আহ্বান করিতে লাগিলেন। কাজী কায়াব কোরআন শরীফ নিয়া অগ্রসর হইলে অপর পক্ষের অগ্রবর্তী অংশ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। সেই অগ্রবর্তী দলটি ছিল আবদুল্লাহ ইবনে সাবা এবং তাহার সন্ত্রাসবাদী দল—যাহারা এই সুযোগে প্রাপ্ত প্রতিটি লোককে হত্যা করিয়া যাইতেছিল। কাহারও জন্য তাহাদের তরবারি থামিতে ছিল না। তাহারা কাজী কায়াবকে কোরআন শরীফ উত্তোলনকারী রূপে দেখিতে পাইয়া সকলে একযোগে তাঁহার প্রতি এমন ভাবে তীর বর্ষণ করিল যে, তিনি স্ব স্থানেই নিহত হইয়া রহিয়া গেলেন।"

(বেদায়াহ, ৬—২৪২)

পঞ্চাশ হাজার লোকের ভীড় ও তুমুল হৈ-হল্লা এবং উহার মধ্যে আড়াই হাজার মোনাফেক সন্ত্রাসবাদী গুপ্ত ঘাতকদের বিরামহীন কারসাজী ও ষড়যন্ত্র এই অবস্থায় শান্তি ফিরাইয়া আনার জন্য নেতৃবৃন্দ ছাহাবা কেরামের সকল প্রকার প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া গেল। অবশেষে উভয় পক্ষের দশ হাজার লোকের খণ্ড-বিখণ্ড দেহ-স্তূপের উপর রণ-ঝঙ্কার স্তব্ধ হইল।

দুঃখ-বেদনায় জর্জ্জরিত আলী (রাঃ) উভয় পক্ষের শহীদানদের জানাযা পড়াইয়া দাফন কার্য্য সমাধা করিলেন এবং শোকবিহ্বল কণ্ঠে স্বীয় পুত্র হাসান (রাঃ)কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—ليت اباك مات قبل هذا اليوم بعشرين عاما "এই দিনের ২০ বৎসর পূর্ব্বে তোমার পিতার মৃত্যু হইয়া গেলে ভাল ছিল!"

উত্তরে হাসান (রাঃ) বলিলেন, يا ابت قد كنت انهاك عن هذا "আব্বাজন। আমি আপনাকে প্রথম অবস্থায়ই এই ব্যাপারে বাধা দিয়াছিলাম।"

আলী (রাঃ) বলিলেন, يا بني اني لم أر ان الامر يبلغ هذا "হে পুত্র! ইহার পরিণতি যে এই হইবে তাহা ধারণাও করি নাই।" (বেদায়াহ, ৭—২৪০)

সুধী পাঠক! শান্ত পরিবেশে, সুস্থির মস্তিষ্কে নির্ম্মল ও স্বচ্ছ অন্তকরণে ইতিহাস হইতে উদ্ধৃত বর্ণনাগুলি গভীর ভাবে অনুধাবণ করুন এবং চিন্তা করুন—ছাহাবীদের আমলে মোসলমানদের মধ্যে যে সব কেলেঙ্কারী ঘটিয়াছে উহার মূলে কি ছিল এবং সেই কেলেঙ্কারীর প্রকৃত অপরাধী কাহারা ছিল?

প্রশ্ন হইতে পারে যে, পঞ্চম বাহিনী আবদুল্লাহ ইবনে সাবার দল ষড়যন্ত্র করিয়া ছিল সত্য, কিন্তু ছাহাবীগণ কেন তাহাদের ফাঁদে পড়িলেন ?

এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, অনেক সময় মৌখিক যুক্তি অতি সরল মনে হয়, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রের প্রতি লক্ষ্য করিলে যে অভিজ্ঞতা হাসিল হয় উহার জ্ঞান মৌখিক যুক্তির জ্ঞান অপেক্ষা অধিক সরল ও স্পষ্ট হয়। মৌখিকরূপে এই প্রশ্ন ত অতি সুস্পষ্ট যে, ষড়যন্ত্রের ফাঁদে কেন পড়িলেন ? কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, মোনাফেক ষড়যন্ত্রকারীদের ফাঁদে মানুষ স্বেচ্ছায় পড়ে না, বরং নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে জড়াইয়া পড়িতে বাধ্য হয়।

ভারতবর্ষের উপর মোসলমানদের সাত শত বৎসরের আধিপত্য বিলুপ্ত হইয়া ইংরেজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার গোড়াপত্তনে মীর জাফরের ভূমিকা স্মরণ করা হউক। সিরাজদ্দৌলা এবং তাঁহার বিপুল সংখ্যক পূর্ণ অনুগত আমলাগণ মীর জাফরের ষড়যন্ত্র-ফাঁদে জড়াইয়া পড়িয়া ছিলেন। যদ্দরুণ পলাশীর রণাঙ্গণে ভারতবর্ষে মোসলেম আধিপত্যের সমাধি রচিত হইয়া ছিল—তাহা কি সিরাজ ও তাঁহার অনুগত আমলাগণের স্বেচ্ছা প্রণোদিত ছিল ?

এই ঘটনায় ত শুধু একজন মীর জাফর ছিল, যাহার ষড়যন্ত্রে সাত শত বৎসরের আধিপত্য ও স্বাধীনতার কবর তৈরী হইয়াছিল। পক্ষান্তরে ছাহাবীদের আমলে কেলেঙ্কারী সৃষ্টির গোড়ায় ২৫০০ (আড়াই হাজার) মীর জাফর ছিল। ছাহাবা কেরাম মানুষ হিসাবে আড়াই হাজার মীর জাফরের ষড়যন্ত্র-জাল ছিন্ন করিতে না পারিলেও আল্লার রহমতে সুষ্ঠু ও বলিষ্ঠ নৈতিকতার দ্বারা মোসলেম জাতির স্বাধীনতা ও আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইয়া ছিলেন। ছাহাবা কেরামের অতুলণীয় বৈশিষ্ট্যের ইহা একটি জ্বলন্ত প্রমাণ। মোসলমানদের স্বাধীনতা হরণে ইংরেজ বণিকগণ অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী লোভী শত্রু সেই যুগেও বিদ্যমান ছিল। কিন্তু ছাহাবা কেরাম তাঁহাদের বলিষ্ঠ নৈতিকতার দ্বারা সেই লোভীদের দাঁত ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন—যাহার একটি নমুনা ইতিহাস হইতে পেশ করা হইতেছে ?

মোসলমানদের সীমান্তবর্ত্তী প্রবল পরাক্রমশালী শত্রু রোম সম্রাট যাহাকে মোয়াবিয়া (রাঃ) বারংবার আক্রমণ চালাইয়া নিস্তেজ করিয়া রাখিয়া ছিলেন। সেই রোম সম্রাট আলী ও মোয়াবিয়ার বিরোধকালে মোসলমানদের কোন এক সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করিলে তৎক্ষণাৎ মোয়াবিয়া (রাঃ) তাহাকে লিখিলেন—

والله لئن لم تنته وترجع الى بلادك يا لعين لاصطلحن انا
وابن عمى عليك ولاخرجنك من جميع بلادك ولاضيقن عليك
الارض بما رحبت

"রে পাপিষ্ঠ মরহুদ! যদি তুই তোর দুরভিসন্ধি হইতে বিরত না থাকিস এবং নিজ দেশে প্রত্যাবর্ত্তন না করিস তবে এখনই আমি আপন জন আলীর সহিত সমস্ত বিরোধের অবসান ঘটাইয়া সম্মিলিত অভিযানে তোকে তোর দেশ হইতেও বিতাড়িত করিব এবং সুপ্রশস্ত ভূপৃষ্ঠ তোর জন্য সঙ্কীর্ণ করিয়া দিব।"

মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহুর এই হুমকী রোম সম্রাটের নিকট পৌঁছার সাথে সাথে সে তল্পী গুটাইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। (বেদায়াহ, ৮—১১৯)

ইতিহাস হইতে আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকের সন্ত্রাসবাদী খারেজী দলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং তাহাদের ষড়যন্ত্র ও সন্ত্রাসবাদ মূলক কার্য্যকলাপের বর্ণনা এখানেই ইতি দেওয়া হইল। বিভিন্ন হাদীছে তাহাদের পরিচয় এবং তাহাদের কার্য্যকলাপ সম্পর্কে যে সব তথ্য ও ভবিষ্যৎবাণী বর্ণিত রহিয়াছে তাহা (অত্র ৭ম খণ্ডের ২৫৯৪নং হইতে ২৬০১নং হাদীছ পর্য্যন্ত) গভীর ভাবে অনুধাবন করুন।

অত্র পরিশিষ্টের আর একটি মূল বিষয় ছিল—বর্ত্তমান যুগে খারেজী দলের মুখপাত্রের ভূমিকা পালনকারী মোহুদী সাহেব রচিত যে পুস্তক ওসমান (রাঃ) এবং তাঁহার সহকর্ম্মী ছাহাবীবর্গের প্রতি ভিত্তিহীন মিথ্যা অপবাদের নির্লজ্জ আক্রমণ চালাইয়াছে উহার খণ্ডন এবং সত্য ইতিহাস উদ্ধার করা। পাঠক সমক্ষে এখন তাহা পেশ করা হইবে। পূর্ব্বাহ্নে একটি তথ্য পেশ করা হইতেছে।

অনেক সময় ঈমান ধ্বংসকারী নানারূপ মুখ-চর্চ্চা ও গুজব সমাজে ছড়াইয়া থাকে। সেই ক্ষেত্রে সৎসাহসী লোকদের ভূমিকা হয় সত্যের দ্বারা সেই মুখ-চর্চ্চা ও গুজবের প্রতিরোধ ও খণ্ডন করা। খলীফা ওসমান (রাঃ) এবং তাঁহার সহকর্ম্মী ছাহাবীদের বিরুদ্ধে খারেজী দল কর্ত্তৃক মিথ্যা অপবাদের অভিযানে সৃষ্ট বিষাক্ত গুজব ও মুখ-চর্চ্চা কিছু অবশিষ্ট যদি সমাজে থাকিয়া থাকে তবে উহার বিরুদ্ধে সৎসাহসী লোকের ভূমিকা গ্রহণ করাই শ্রেয়। খারেজী দলের আবির্ভাব ও তাহাদের সৃষ্ট পরিস্থিতির পর মোহাম্মদী উম্মতের কর্ণধারগণ তাঁহাদের এই দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সুষ্ঠুরূপেই পালন করিয়া গিয়াছেন।

প্রায় হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতে যুগে যুগে মোসলেম সমাজের অনেক মনীষীবৃন্দ ওসমান (রাঃ) ও ছাহাবা কেরাম সম্পর্কে রটানো সমুদয় কেলেঙ্কারীর বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে প্রতিপন্ন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, খলীফা ওসমান (রাঃ) সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে সাবাগোষ্ঠীর সমুদয় অপবাদের খণ্ডন তাঁহারা করিয়াছেন। এই আলোচনায় তাঁহারা বড় বড় কেতাবও প্রনয়ন করিয়া গিয়াছেন। যথা—

(১) হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর কোরআন-হাদীছ ও ইতিহাস বিশেষজ্ঞ কাজী (Gnstice) আবু বকর-ইবনুল আরবী রচিত "আল-আওয়াছেম-মিনাল্ কাওয়াছেম" (ঈমান বিধংসী বিষয়াবলী হইতে রক্ষা পাইবার সুদৃঢ় দুর্গ।)

(২) সপ্তম শতাব্দীর জ্ঞান-বিজ্ঞান পারদর্শী বিদ্যা-বিশারদ হাফেজ ইবনে তাইমিয়া প্রণীত "মেনহাজুছ্‌-ছুন্নতিন্-নববীয়াহ্ ফী নক্‌জে কালামিশ্‌ শীয়ীয়াহ" (শীয়া—খারেজী ফের্কার অপবাদ খণ্ডনে নবীর ছুন্নত তরীকার সরল পথ।)

(৩) দ্বাদশ শতাব্দীর মহা মনীষী শাহ ওলিউল্লাহ দেহ্‌লভীর সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহ আবদুল আজীজ প্রণীত "তোহ্‌ফা এছ্‌না আশারিয়া" (অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে সাবার গঠিত রাফেজী ফের্কা যাহারা কালক্রমে বারটি উপদলে বিভক্ত হইয়াছিল তাহাদের শুভ বুদ্ধি আনয়নের জন্য বিশেষ সওগাত।)

এই সব মনীষীবৃন্দ বিশ্ব-মোসলেম বরণীয়। কোরআন-হাদীছ ও ইতিহসে তাঁহাদের অধ্যয়ন, জ্ঞান-গবেষণা ও ব্যক্তিত্ব বিশ্ব বিখ্যাত। সেই তুলনায় মৌদুদী সাহেবের অধ্যয়ন ও জ্ঞান-গবেষণা অনু পরিমাণও কি না সন্দেহ।

পরম পরিতাপের বিষয়, মৌদুদী সাহেব ঐ মনীষীবৃন্দের উক্ত মহতী প্রচেষ্টাকে এবং মোসলেম উম্মতের জন্য তাঁহাদের হিতৈষী সাধনাকে "খলীফা ওসমানের পক্ষে ওকালতী" আখ্যা দিয়া উহার প্রতি অপেক্ষা করিয়াছেন। শুধু উপেক্ষাই নয়, বরং তাঁহার পুস্তকের ৩২০ পৃষ্ঠায় "وکالت کی بنیادی کمزوری" "ওকালতীর ভিত্তিগত (Funbamental) দুর্ব্বলতা" শিরোনামার দ্বারা ঐ সব সৎ প্রচেষ্টা ও হিত সাধনার অবমাননা করিয়াছেন।

কেহ স্বীয় বাপ-দাদা—বংশের গণ্য-মান্য মুরব্বিগণের হিত প্রচেষ্টাকে উপেক্ষা ও অবমাননা করিলে সে ব্যক্তি বংশের মধ্যে কমিনা সাব্যস্ত হয়। মোসলেম জাতির বাপ-দাদা ও মুরব্বি হইলেন পূর্ব্ববর্ত্তী মনীষীবৃন্দ ও জাতিয় সাধকগণ। সাধনাময় জীবনে তাঁহারা জাতির জন্য যে সব ক্ষাব্যূহ তৈরী করেন এবং হিতকারী ব্যবস্থা রাখিয়া যান উহাকে যে মানুষ উপেক্ষা ও অবমাননা করে সেও নিশ্চয়ই ঘৃণ্য ও হেয় সাব্যস্ত হইবে।

মৌদুদী সাহেব উক্ত মনীষীবৃন্দের মহতী প্রচেষ্টা ও হিতৈষী সাধনাকে ওকালতী বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ার পর নিজের বাহাদুরী ঝাড়িয়াছেন যে, "আমি উক্ত মনীষীবৃন্দের ওকালতীর ধার না ধারিয়া সরাসরি ইতিহাসের আশ্রয় নিয়াছি এবং এই প্রবন্ধের সিদ্ধান্তসমূহে পৌঁছিয়াছি।"

গণ্য-মান্য মুরব্বি উপেক্ষা করিয়া কোন মানুষ অগ্রসর হইতে চাহিলে তাহার ভাগ্যে ঘোড়ার পরিবর্তে সুন্দর গাধাই জুটে—মৌদুদী সাহেবের তাহাই ঘটিয়াছে। যখন তিনি শিরোমনি মনীষীদের উপেক্ষা করিয়া ইতিহাস ময়দানে অবতীর্ণ হইয়াছেন,

তখনই তাঁহার কপাল পুড়িয়াছে। আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকগোষ্ঠীর গর্হিত যে সব অপবাদ ও অপপ্রচার মুখ-চর্চ্চায় এবং সোনাভান, গাজী-কালু, ছয়ফল মুল্লুক, শহীদে কারবালা ও বিষাদ-সিন্ধুর ন্যায় ভিত্তিহীন পুথি-পুস্তকাকারের প্রচার পত্রের মাধ্যমে ইতিহাসের নিভৃত কোণে স্থান পাইয়া ছিল; সুন্দর গাথারূপে ঐগুলিকেই মৌদুদী সাহেব পছন্দ করিয়াছেন। ফলে নিজেও অভিশাপের তলায় পতিত হইয়াছেন, ভক্তদের জন্যও সেই ব্যবস্থা করিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা সমাজকে রক্ষা করুন। আমীন !!

খলীফা ওসমান (রাঃ) সম্পর্কে অভিযোগসমূহের যাচাই হাদীছ ও ইতিহাসের দৃষ্টিতে

পাঠকবৃন্দ ! মৌদুদী সাহেব তাঁহার পুস্তকের ১০৫ পৃষ্ঠায় খলীফা ওসমানের প্রতি মনোবিকার উদ্‌গিরণের উদ্বোধনে যেই কথা বলিয়াছেন, উহা হইতেই তাঁহার বিভ্রান্তি আরম্ভ হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন—تغیر کا آغاز ہوا অর্থাৎ "খলীফা ওসমান হইতে পরিবর্ত্তন ও নীতি-চ্যুতি আরম্ভ হইল।" এই ধারণা নিছক ভ্রান্তিপূর্ণ ধারণা। প্রকৃত প্রস্তাবে—فتنہ کا آغاز ہوا অর্থাৎ খলীফা ওসমানের আমলে মোনাফেক সন্ত্রাসবাদী দল সৃষ্টি হইয়াছিল এবং তাহাদের দ্বারা সন্ত্রাস-বাদমূলক ষড়যন্ত্র ও বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হইয়াছিল। সেই মোনাফেকদের ষড়যন্ত্রের প্রধান অস্ত্রই ছিল মিথ্যা অপবাদ ও গর্হিত অভিযোগের ব্যাপক প্রচার। খলীফা ওসমানের প্রতি নীতি-চ্যুতির অভিযোগটা বস্তুতঃ ঐ সব মিথ্যা অপবাদ ও গর্হিত গুজবের উপরই স্থাপিত, যাহার বিস্তারিত প্রমাণ ইতিহাস হইতে সম্মুখে পাইবেন। এস্থলে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কতিপয় ভবিষ্যৎবাণী বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। এই সব ভবিষ্যৎবাণীর হাদীছ সমূহ দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রতিয়মান হয় যে, খলীফা ওসমানের শাসনে বিন্দুমাত্র নীতি-চ্যুতি ছিল না। হাঁ—মোনাফেকদের সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা ছিল।

১। হাদীছ :—জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা রসুলুল্লাহ (দঃ) ফেত্‌না তথা সন্ত্রাসবাদমূলক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির ভবিষ্যৎবাণী করিলেন। তখন আবু বকর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, أنا أدركها—আমি কি সেই ফেতনার যুগ পাইব ? হযরত (দঃ) বলিলেন, না। অতঃপর ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি পাইব কি ? হযরত (দঃ) বলিলেন, না। তারপর ওসমান (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি পাইব কি ? হযরত (দঃ) বলিলেন, সেই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী সন্ত্রাসবাদীদের লক্ষ্যস্থলত তুমিই হইবে। (মোছনাদ-বাজ্জার—বেয়াদাহ ৭×২০৭)

খলীফা ওসমানের দ্বারা শাসন-ব্যবস্থায় নীতি-চ্যুতি মোটেই হয় নাই। বরং তাঁহার আমলে এই ভবিষ্যদ্বাণীই বাস্তবায়িত হইয়াছিল। হিজরী ২৪ সনে ওসমান (রাঃ) খলীফা হইলেন, হিজরী ২৫ সনে আবদুল্লাহ ইবনে সাবা—ইহুদী-বাচ্চা মোনাফেক মোসলমানদের সমাজে শামিল হইল। মোসলমানদের মধ্যে তাহার শিকড় গাড়িয়া লওয়ার পর চতুর্দিকে ছুটাছুটি করিয়া সন্ত্রাসবাদী দল ও ঘাটি তৈরী পূর্ব্বক তাহার দলের যে Prospectas বা আনুষ্ঠানিক ঘোষনাপত্র সে প্রকাশ করিয়া ছিল উহার মূল বিষয়ই ছিল এই—

ان عثمان اخذها بغير حق فانهضوا فى هذا الامر فحركوه

وابدؤوا بالطعن على امرائكم

"ওসমান অন্যায়রূপে জবরদস্তি পূর্ব্বক খেলাফত দখল করিয়াছে। তোমরা উঠ এবং আন্দোলন গড়িয়া তোল। তোমাদের উপর নিয়োজিত শাসন পরিচালকদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করিয়া আন্দোলনের সূচনা কর।" (তারীখ তবরী, ৩—৩৭৯) এ সম্পর্কে সুদীর্ঘ আলোচনা সম্মুখে আসিবে।

২। হাদীছ :—আবু মুছা আশয়ারী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) নির্জন পরিবেশ উদ্দেশ্যে একটি বাগানের ভিতরে যাইয়া বসিলেন এবং আমাকে বাগানের প্রবেশ পথে প্রহরী নিযুক্ত করিলেন। তথায় আবু বকর (রাঃ) উপস্থিত হইয়া হযরতের নিকট যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। হযরত (দঃ) আমাকে বলিলেন, অনুমতি দাও এবং তাহাকে বেহেশতের সুসংবাদ দান কর। অতঃপর ওমর (রাঃ) আসিয়া অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। হযরত (দঃ) তাঁহার সম্পর্কেও বলিলেন, অনুমতি দাও এবং তাহাকে বেহেশতের সুসংবাদ দান কর। তারপর ওসমান (রাঃ)ও আসিয়া অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। হযরত (দঃ) তাঁহার সম্পর্কে বলিলেন, অনুমতি দাও এবং তাহাকে বেহেশতের সুসংবাদ দান কর—বালা-মছিবত, আপদ-বিপদের সহিত। এতচ্ছ্রবণে ওসমান (রাঃ) বাগানে প্রবেশ করিলেন তাঁহার (মুখ নিঃসৃত) উক্তি ছিল—اللهم صبرا—الله المستعان "আল্লার নিকটই সাহায্য কামনা করি, হে আল্লাহ! ছবর ও ধৈর্য্যের শক্তি দান করিও।" (বোখারী-মোসলেম)

৩। হাদীছ :—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—একদা হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) ফেতনা তথা সন্ত্রাসবাদমূলক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন এবং বলিলেন—সেই ফেতনা উপলক্ষে ঐ মস্তকাবৃত লোকটি মজলুম ও অন্যায়রূপে নিহত হইবে।

এই হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমি সঙ্গে সঙ্গে সেই মস্তকাবৃত লোকটির প্রতি তাকাইয়া দেখিলাম, তিনি ওসমান (রাঃ)। (তিরমিজি)

ওসমান (রাঃ) সম্পর্কে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এইরূপ সাক্ষ্যের ভবিষ্যৎবাণী আরও অনেক হাদীছে বর্ণিত রহিয়াছে কতিপয় হাদীছ সম্মুখে আসিতেছে।

পাঠকবৃন্দ! উল্লেখিত হাদীছসমূহ ও আবদুল্লাহ ইবনে সাবার ইতিহাস দৃষ্টে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হইয়া যায় যে, খলীফা ওসমানের সময়ে ফেতনা তথা সন্ত্রাসবাদমূলক ষড়যন্ত্র ও বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হইয়া ছিল। মৌদুদী সাহেব যাহা বলিয়াছেন—"খলীফা ওসমানের দ্বারা খেলাফত-তন্ত্রের নীতি-চ্যুতি ও পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়া ছিল।" তাঁহার এই উক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও অবাস্তব। পরন্তু এখান হইতেই খলীফা ওসমানের প্রতি মৌদুদী সাহেবের বিষোদ্গার আরম্ভ হইয়াছে।

খলীফা ওসমানের প্রাত স্বজন-প্রীতির ভিত্তিহীন অভিযোগ ঃ

অধুনা শিক্ষিত সমাজের এক বিরাট অংশ যাহারা ইসলামী ইতিহাস শত্রুদের অনুবাদ বা শত্রুদের সংগৃহিত ভাণ্ডার হইতে আহরণ করিরাছে; ইসলামী ইতিহাসের Original বা মূল ভাণ্ডার হইতে উহা আহরণ করিতে পারে নাই। সচরাচর তাহাদের অধিকাংশের মুখেই উপরোক্ত অভিযোগটা শোনা যায়। এতদ্ভিন্ন আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকগোষ্ঠীর মিথ্যা Propagnba—অপপ্রচারের সংঘবদ্ধ অভিযানে ইতিহাস সঙ্কলকদের শুধু (Callection) সংগ্রহ পর্য্যায় ঐ অপবাদ ও অপপ্রচারটা সঙ্কলনভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। তদুপরি কোন কোন বিশিষ্ট জ্ঞান-বিজ্ঞান ও এল্‌মের অধিকারী যাঁহারা নির্ভরশীলও বটেন, কিন্তু তাঁহারা Selection—গ্রহণ পর্য্যায়ে বা আস্থা স্থাপন পর্য্যায়ে নহে, বরং শুধু কথিত আছে ইত্যাদি পর্য্যায়ে স্থান বিশেষে প্রসঙ্গক্রমে ঐরূপ সঙ্কলন হইতে কোন কোন বর্ণনা উল্লেখ করিয়া দিয়াছেন। এইভাবে মুখ-চর্চ্চায় খলীফা ওসমানের বিরুদ্ধে এই অভিযোগটা অধুনা কথিতরূপ ধারণ করিয়া বসিয়াছে। কিন্তু ইহার মূলে কোন সত্যতা মোটেই নাই। আছে শুধু আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকগোষ্ঠী—খারেজী দলের অপপ্রচার। মৌদুদী সাহেব ঐসব অপপ্রচারকেই মূলধন করিয়া এই কুখ্যাত অভিযোগ-টাকে ঐতিহাসিক সত্যরূপে দাঁড় করিয়াছেন এবং তাঁহার পুস্তকের ১১৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"নিঃসন্দেহে ইহা (অর্থাৎ স্বজন-প্রীতি) খলীফা ওসমানের (Police) নীতি ও কার্য্য-পদ্ধতির একটা ভ্রান্ত ধারা ছিল।" মৌদুদী সাহেবের এই

ঊর্দ্ধত্যপূর্ণ উক্তি হাদীছেরও পরিপন্থি, ইতিহাসেরও পরিপন্থি। প্রথমে এ সম্পর্কে কতিপয় হাদীছ উল্লেখ করা হইল—

১। হাদীছ :—একদা সিরিয়ায় কতিপয় ব্যক্তি এক সমাবেশে ভাষণ দান করিলেন, যাঁহাদের কতেক জন হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবীও ছিলেন। তন্মধ্যে মোর্‌রাহ ইবনে কায়াব (রাঃ) দাঁড়াইরা বলিলেন, নিজ কানে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একটি হাদীছ (বর্ত্তমান অবস্থা সম্পর্কে) শুনা না থাকিলে আমি কথা বলিতাম না।

একদা হযরত (দঃ) ফেতনা তথা ষড়যন্ত্রমুলক বিশৃঙ্খলার কথা বর্ণনা করিলেন এবং উহা যে, অতি দুরে নহে তাহাও উল্লেখ করিলেন। এমন সময় মস্তকাবৃত একটি লোক নিকটবর্ত্তী পথে যাইতে ছিলেন। হযরত (দঃ) সেই লোকটিকে দেখাইয়া বলিলেন, ঐ ব্যক্তি সেই সময় হেদায়েতের উপর সুদৃঢ় থাকিবে।

হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী বলেন, তৎক্ষণাৎ আমি লোকটির প্রতি ছুটিয়া গেলাম ; দেখিলাম, তিনি ওসমান (রাঃ)। আমি তাঁহার চেহারা হযরতের প্রতি ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার উদ্দেশ্য কি এই লোকটি ? হযরত (দঃ) বলিলেন, হাঁ। (তিরমিজি শরীফ—বেদায়াহ, ৭×২০৯)

২। হাদীছ :— আবদুল্লাহ ইবনে হাওয়ালা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যখন ফেতনা চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িবে সেই সময় তুমি কি করিবে ? আমি আরজ করিলাম, আল্লাহ এবং আল্লার রসুল যাহা আমার জন্য পছন্দ করেন। হযরত (দঃ) তখন একটি লোককে দেখাইয়া বলিলেন, ঐ ব্যক্তির সঙ্গী হইয়া থাকিও ; সে এবং তাহার সঙ্গীগণ ঐ সময় হক তথা সঠিক নীতির উপর দৃঢ় পদ থাকিবে।

হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী বলেন, আমি ঐ লোকটির পেছনে ছুটিলাম এবং তাহাকে দুই কাঁধে ধরিয়া হযরতের প্রতি তাহার মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার উদ্দেশ্য কি এই ব্যক্তি ? হযরত (দঃ) বলিলেন, হাঁ। তিনি ছিলেন ওসমান (রাঃ)। (তিরমিজি, ফিল্‌বাব—বেদায়াহ, ৭—২০৯)

৩। হাদীছ :—আবদুল্লাহ ইবনে হাওয়ালা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, তিনটি সময়ের ফেতনা হইতে যে ব্যক্তি বাঁচিবে সে প্রকৃত প্রস্তাবেই বাঁচিয়া গেল। (১) আমার মৃত্যু উপলক্ষে (২) দজ্জালের আবির্ভাব উপলক্ষে (৩) একজন খলীফার নিহত হওয়া উপলক্ষে, যিনি ধৈর্য্য ধারণকারী এবং হক ও ন্যায় নীতির উপর দৃঢ়পদশীল হইবেন ; প্রতি ক্ষেত্রে তিনি হক তথা ন্যায় ও সঠিক নীতির পরিচয় দান করিবেন। (ছনদের সহিত বেদায়াহ, ৭—২১০)

৪। হাদীছ ঃ—কায়াব ইবনে ওজরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত রস্থলুল্লাহ (দঃ) ফেতনা সৃষ্টির আলোচনা করিলেন এবং উহা যে, অতি নিকটবর্ত্তী উহা যে, অতি ভয়াবহ আকারের হইবে তাহাও উল্লেখ করিলেন। ঐ সময় চাঁদরে আবৃত একটি লোক যাইতে ছিলেন। তাঁহাকে দেখাইয়া হযরত (দঃ) বলিলেন, সেই ফেতনার সময় ঐ লোকটি হক্ক ও ন্যায় নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবে।

হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী বলেন, তৎক্ষণাৎ আমি ঐ লোকটির প্রতি দ্রুত ছুটিয়া গেলাম এবং তাঁহার বাহুদ্বয় ধরিয়া হযরত (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! এই ব্যক্তিই কি আপনার উদ্দেশ্য? হযরত (দঃ) বলিলেন, হাঁ। সেই লোকটি ছিলেন ওসমান (রাঃ)। (মোসনাদ আহমদ— বেদায়াহ, ৭ - ২১০)

স্থধী সমাজ! লক্ষ্য করুন—উল্লেখিত হাদীছসমূহে আল্লার রস্থলের সুস্পষ্ট সাক্ষ্য বিদ্যমান রহিয়াছে যে, খলীফা ওসমানের আমলে যাহা ঘটিয়া ছিল উহা ফেতনা তথা ষযড়ন্ত্রমূলক ও সন্ত্রাসবাদমূলক বিশৃঙ্খলাই ছিল এবং সেই ফেতনার ব্যাপারে খলীফা ওসমান (রাঃ) মোটেই দোষী ছিলেন না। তাঁহার দ্বারা কোন প্রকার নীতি-চ্যুতি ঘটে নাই। তিনি কোন ভ্রান্ত নীতিতে পরিচালিত ছিলেন না। তিনি ছিলেন হক্ক, হেদায়েত তথা নির্ম্মল সুষ্ঠু সঠিক ন্যায় নীতির উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত।

পক্ষান্তরে মৌহুদী সাহেব খলীফা ওসমান (রাঃ)কে অত্যন্ত নগ্ন ভাষায় ভ্রান্ত নীতির অনুসারী বলিয়া অভিযুক্ত করিয়াছেন। চতুর মৌহুদী সাহেব মোসলমানদের ঈমানী অনুভূতি (Sense) ও চেতনাকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন······ پالیسی کا یہ پہلو অর্থাৎ খলীফা ওসমানের নীতির শুধু এই একটা দিক ভ্রান্ত ও গলদ ছিল। উক্ত ফাঁকির ফন্দিটাকে পূর্ণ রূপ দান পূর্ব্বক গাল ভরিয়া খলীফা ওসমানের প্রশংসা করতঃ বলিয়াছেন, তাঁহার নীতির ঐ একটা দিকই ভ্রান্ত ছিল, বাকি সবই ছিল ঠিক।

মৌহুদী সাহেব আবহুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকগোষ্ঠীর অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হইয়া খলীফা ওসমানের প্রতি যে আঘাত হানিয়াছেন তাহা একটি হইলেও উহা অতি বড়। খলীফা ওসমানের নীতির ভ্রান্তি যাহা মৌহুদী সাহেব নির্দ্ধারিত করিয়াছেন তাহা হইল—নিজ বংশের লোকদিগকে সরকারী পদ বড় ও বেশী দেওয়া এবং বাইতুল মাল (সরকারী ধন-ভাণ্ডার) হইতে নিজ বংশীয় লোকদিগকে বেশী দেওয়া। (কুখ্যাত পুস্তক ৯৯ পৃঃ, উহার উদ্ধৃতি এই প্রবন্ধের "সরকারী পদ সম্পর্কে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ খণ্ডনের" পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

এই দুইটি দোষ যে, গণতন্ত্রী শাসকদের পক্ষে কত বড় হীন দোষ তাহা সকলেই অবগত আছেন। আর ইসলামের বিধানে ত ভয়াবহ কুফল উহার জন্য রহিয়াছে। রস্থলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন—

"যে ব্যক্তি জনসাধারণের উপর কর্তৃত্বের সুযোগে সরকারী পদ প্রদানে স্বজন-প্রীতির দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়, আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য বেহেশত হারাম করিয়া দিবেন। তাহার ফরজ বা নফল কোন প্রকার এবাদৎই কবুল করিবেন না" (মূল গ্রন্থ ৭খণ্ড"রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক পরবর্ত্তী রাষ্ট্রপ্রধান মনোনীত করা"পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

মৌহুদী সাহেব খলীফায়ে-রাশেদ ওসমান (রাঃ) যাঁহার পক্ষে আল্লার রসুলের সুস্পষ্ট ভবিষ্যৎবাণী রহিয়াছে যে, তিনি হক ও হেদায়েতের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবেন। তাঁহাকে ঐ দুষ্ট দোষে দোষী এবং ভয়ঙ্কর অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়াছেন।

মৌহুদী সাহেব মোসলমানদের ঈমানী (Sense) চেতনাকে ভয় করিয়া খলীফা ওসমানের পক্ষে দুই-চারটা বাক্য ব্যয় করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার অপরাধ সাব্যস্ত করা স্থলে আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকগোষ্ঠীর গঠিত অপবাদকে রূপ-সজ্জা দানে তিনি অভিযোগকে জোরদার করার সর্ব্বাত্মক প্রচেষ্টা করিয়াছেন।

এমনকি মৌহুদী সাহেব তাহার কুখ্যাত পুস্তকের ১০০ পৃষ্ঠায় খলীফা ওসমানের স্বজন-প্রীতির তথ্যাটা অতীব দুঃখের সহিত উল্লেখ পূর্ব্বক বলিয়াছেন—"এই স্বজন-প্রীতির শেষ ফল এই হইল যে, তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হইল এবং উহাতে শুধু তিনি শহীদই হইলেন না, বরং গোত্রীয় ঈর্ষার নিস্তেজ অগ্নি পুনরায় লেলিহান হইয়া উঠিল। যাহাতে দগ্ধ হইয়া পূর্ণ খেলাফত-তন্ত্রই ভস্মিভূত হইয়া গেল।" অর্থাৎ গোটা খেলাফৎ ধ্বংস হওয়ার ব্যাপারে অপরাধী হইলেন খলীফা ওসমান (রাঃ); তাঁহার স্বজন-প্রীতির পরিণামেই তিনিও শহীদ হইয়াছেন এবং খেলাফৎও ধ্বংস হইয়াছে। এই জঘন্য মন্তব্যের অসারতা প্রমাণে ইহার বিশ্লেষণই যথেষ্ট। যথা—

মৌহুদী সাহেবের এই মন্তব্যে কয়েকটি দাবী উদ্‌ঘাটিত হয়। (১) খলীফা ওসমানের শহীদ হওয়া সহ তাঁহার আমলের সমুদয় কেলেঙ্কারীর জন্য তাঁহার স্বজন-প্রীতির দোষই মূল কারণ ছিল। (২) খলীফা ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিরুদ্ধে জনগণের বিদ্রোহ ঘটিয়া ছিল। (৩) সেই বিদ্রোহে বিক্ষুব্ধ জনসাধারণই খলীফা ওসমান (রাঃ)কে শহীদ করিয়া ছিল। (৪) খলীফা ওসমানের শহীদ হওয়ার পরবর্ত্তী ঘটনাবলী অর্থাৎ আলী (রাঃ) ও তাঁহার সমর্থনকারী হাজার হাজার ছাহাবী ও তাবেয়ী এবং তাঁহার বিপক্ষ আয়েশা (রাঃ), তালহা (রাঃ), যোবায়ের (রাঃ) ও তাঁহাদের সমর্থনকারী হাজার হাজার ছাহাবী ও তাবেয়ী তাঁহাদের বিরোধ ও দ্বন্দ্ব গোত্রীয় ঈর্ষায় সৃষ্ট ছিল। এই দাবীগুলি মৌহুদী সাহেবের নিজের জন্ম দেওয়া। কারণ, এই শ্রেণীর কোন তথ্যের আবিষ্কারে ইতিহাসের একটি শব্দেরও সমর্থন পাওয়া যায় না। মৌহুদী সাহেবও এই মন্তব্যের উপর কোন রেফারেন্স দিতে পারেন নাই।

এতদ্ভিন্ন চতুর্থ দাবীটি ত ইসলামী আকিদা ও ভাবধারারই পরিপন্থী। এস্থলে পরিশিষ্টের "ছাহাবা কেরাম সম্পর্কে মোসলমানদের কর্ত্তব্য" শিরোনামা পুনঃ পুনঃ পাঠ করুন ; বুঝিতে পারিবেন, ঐরূপ ধারণা কি জঘন্য ! অপর দাবী তিনটিও সম্পূর্ণরূপে বাস্তবের পরীপন্থী এবং ইতিহাসেরও পরিপন্থী। ৩৬৭ পৃষ্ঠায় "খারেজী দলের ষড়যন্ত্র-মূলক কার্য্যকলাপের ইতিহস"শিরোনামার বর্ণনায় প্রামাণিকরূপে জানিতে পারিয়াছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকের সন্ত্রাসবাদী খারেজী দলই সমুদয় কেলেঙ্কারীর মূল ছিল এবং তাহারাই খলীফা ওসমান (রাঃ)কে শহীদ করিয়া ছিল। তাহারা গোপন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে অকস্মাৎরূপে এই কুকীর্ত্তিতে কৃতকার্য্য হইতে পারিয়া ছিল। রাষ্ট্রের চৌদ্দ আনা জনসাধারণ ছিল মোসলমান, সেই মোসলমান জনগণের কোন বিদ্রোহ বা সম্পর্ক খারেজী দলের এই কার্য্যের পেছনে ছিল না। সন্ত্রাসবাদী খারেজী দল সম্পূর্ণ আতর্কিতে কাজ করিয়া তাহাদের উদ্দেশ্যে সফলকাম হইতে পারিয়া ছিল। এই তথ্যের বিস্তারিত ও প্রামাণিক ইতিহাস উক্ত শিরোনামায় পাঠ করিয়াছেন, এস্থলে উহা পুনঃ পুনঃ পাঠ করুন। বিশেষতঃ প্রথম দাবীটি ত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী এবং হাদীছের সম্পুর্ণ পরিপন্থী। "খলীফা ওসমান সম্পর্কে অভিযোগের যাচাই হাদীছ ও ইতিহাসের দৃষ্টিতে" শিরোনামায় বর্ণিত হাদীছ সমূহ পাঠ করুন।

খলীফা ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর কোন ত্রুটিই কোন কেলেঙ্কারীর জন্য দায়ী ছিল না, বরং সব কিছুরই মূল কারণ ছিল খারেজী দলের ষড়যন্ত্র। এই দাবীর সমর্থনে। ইতিহাসে আরও বহু তথ্য বিদ্যমান রহিয়াছে। যথা—

হিজরী ৩৪ সনে ঐ মোনাফেক সন্ত্রাসবাদী ঘাতক দলটি পূর্ণ যৌবন-উন্মাদনার সহিত আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। ঐ সময় তাহারা যে দলীয় Manifesto ইস্তাহার এবং Prospectus অনুষ্ঠানপত্র প্রচার করিয়াছিল তাহাই মূল ঘটনাকে প্রকাশ করিতে যথেষ্ট। এ সম্পর্কে নিম্নে কতিপয় ইতিহাসের উদ্ধৃতি প্রদান করা হইল।

বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ইবনে জরীর তবরী বর্ণনা করিয়াছেন—

ثم قال لهم بعد ذلك انه كان الف نبى لكل نبى وصى وكان
على وصى محمد ثم قال محمد خاتم الانبياء وعلى خاتم الاوصياء
ثم قال بعد ذلك ومن اظلم ممن لم يجز وصية رسول الله صلى
الله عليه وسلم ووثب على وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم
وتناول امر الامة ثم قال لهم بعد ذلك ان عثمان اخذها بغير
حق وهذا وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهضوا فى هذا

الامر فحركوه وابدؤوا بالطعن على امرائكم واظهروا الامر بالمعروف والنهى عن المنكر تستميلوا الناس ......

"আবদুল্লাহ ইবনে সাবা তাহার দল গঠনের পর লোকদিগকে বলিল, এক হাজার নবী এমন গুজরিয়াছেন যাঁহাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ "ওছী" বা খলীফা নির্দ্ধারিত করিয়া গিয়াছিলেন, সেমতে আলী মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের "ওছী"। অতঃপর বলিল, মোহাম্মদ (দঃ) সর্ব্বশেষ নবী ; তদ্রূপ আলী সর্ব্বশেষ "ওছী"। আরও বলিল, সর্ব্বাধিক অন্যায়কারী ও স্বেচ্ছাচারী ঐ ব্যক্তি যে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অছিয়ত ও নির্দ্ধারণকে কার্য্যে পরিণত হইতে দেয় নাই। সে রসুলুল্লার অছীর উপর প্রাবল্য ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিয়া উম্মতের শাসন ক্ষমতা অধিকার করিয়া বসিয়াছে। অতঃপর আরও বলিল, ওসমান অন্যায় ভাবে খেলাফৎ দখল করিয়াছে। রসুলুল্লার অছী ও খলীফা হইতেছেন আলী। সুতরাং হে লোক সকল! তোমরা এই ব্যাপারে উঠ, জাগ এবং আন্দোলন গড়িয়া তোল। তোমরা সর্ব্বপ্রথমে তোমাদের শাসনকর্ত্তা গভর্ণরদেরকে দোষী বলিয়া প্রচার কর। তোমরা প্রকাশ্যে ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ করিয়া বেড়াইও। ইহাতে তোমরা লোকদেরকে আকৃষ্ট করিতে সক্ষম হইবে ; তোমরা লোকদিগকে এই আন্দোলনের প্রতি আহ্বান জানাও।"

এই পরিকল্পনা প্রদান করিয়া আবদুল্লাহ ইবনে সাবা তাহার প্রচারকগণকে সমগ্র দেশে ছড়াইয়া দিল। বিভিন্ন শহরে যে সব সন্ত্রাসবাদী ছিল তাহাদের সঙ্গে পত্র বিনিময়ে ষড়যন্ত্র চালাইল। তাহারা শাসনকর্ত্তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা দোষ গড়াইয়া প্রচারপত্র বিলি করিতে আরম্ভ করিল। শহরে শহরে এই শ্রেণীর প্রচারপত্র আদান-প্রদানে সমগ্র দেশে আন্দোলন ছড়াইয়া পড়িল। (তারীখ তবরী ৩—৩৭৯)

ইতিহাসবিদ ইবনে কাছীর লিখিতেছেন—

ثم يقول وقد كان اوصى الى على بن ابى طالب فمحمد خاتم الانبياء وعلى خاتم الاوصياء ثم يقول فهوا حق بالامرة من عثمان معتد فى ولايته ما ليس له فانكروا عليه .. فافتتن به بشر كثير من اهل مصر وكتبوا الى جماعات من عوام اهل الكوفة والبصرة فتمالئوا على ذلك وتكاتبوا فيه وتواعدوا ان يجتمعوا فى الانكار على عثمان وارسلوا اليه من يناظره ويذكر له ما ينقمون عليه من توليته اقربائه وذوى رحمه وعزله كبار الصحابة فدخل هذا فى قلوب كثير من الناس

"আবদুল্লাহ ইবনে সাবা বলিতে লাগিল, মোহাম্মদ (দঃ) আলীকে ওছী নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন। মোহাম্মদ (দঃ) সর্ব্বশেষ নবী। আলী সর্ব্বশেষ ওছী। অতএব আলী ওসমান অপেক্ষা খেলাফতের অধিক হক্কদার এবং ওসমান অন্যায়রূপে খেলাফৎ দখল করিয়াছে। খলীফা হওয়ার তাহার কোন হক নাই। সুতরাং হে লোক সকল তোমরা ওসমানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কর।

আবদুল্লাহ ইবনে সাবার এই অপপ্রচারে মিশরের অনেক লোক বিভ্রান্ত হইয়া গেল। তাহারা কুফা ও বছরার দলগুলির প্রতিও পত্র লিখিল। পরস্পর পত্রালাপের দ্বারা সকলে একমত হইয়া অঙ্গীকারাবদ্ধ হইল যে, তাহারা ওসমানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে এক যোগে কাজ চালাইয়া যাইবে। তাহারা খলীফা ওসমানের নিকটও এক দল লোক পাঠাইল। তাহারা তাঁহার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করিল। তাঁহার সম্মুখেও উল্লেখ করিল যে, তিনি তাঁহার আত্মীয়-স্বজনকে চাকরীর সুযোগ বেশী দিয়া থাকেন এবং বড় বড় ছাহাবীগণকে চাকরী হইতে বরখাস্ত করিয়াছেন। আবদুল্লাহ ইবনে সাবার দলের এই অপপ্রচারে অনেক লোকের ভিতরেই বিষক্রিয়া সৃষ্টি হইল। (বেদায়াহ, ৭—১৬৮)

খলীফা ওসমানের আমলে আবির্ভূত ফেতনা বা বিশৃঙ্খলার মূলে যে, খলীফা ওসমানের কোন ত্রুটি বা বিচ্যুতি মোটেই ছিল না, বরং উহার মূলে শুধুমাত্র আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র ও সন্ত্রাসবাদিতাই ছিল, ইতিহাসে উহার আরও সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। হাদীছ-তফছীরের এমাম বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ দামেস্ক অধিবাসী ইবনে কাছীর, যিনি মৌদুদী সাহেব অপেক্ষা খলীফা ওসমানের আমলে সৃষ্ট সমুদয় ঘটনাস্থলের অধিক নিকটবর্ত্তী ছিলেন এবং সময়ের দিক দিয়াও ৬০০ বৎসরের অধিক নিকটবর্ত্তী ছিলেন, তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থের উদ্ধৃতি প্রত্যক্ষ করুন—

هؤلاء ممن يؤلب عليه ويمالئ الاعداء في الحط والكلام فيه وهم
الظالمون في ذلك وهو البار الراشد رضي الله عنه

"আবদুল্লাহ ইবনে সাবার সন্ত্রাসবাদী দলের উল্লেখ করিয়া এমাম ইবনে কাছীর বলিতেছেন, "সন্ত্রাসবাদীগণই খলীফা ওসমানের বিরুদ্ধে লোকদিগকে সংঘবদ্ধ করিত এবং তাহারাই তাঁহার দোষ-চর্চ্চা ও ক্ষতি সাধনে জোট বাঁধিয়া ছিল। পক্ষান্তরে খলীফা ওসমান (রাঃ) সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ পাক পবিত্র ন্যায় ও সঠিক নীতির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন।" (বেদায়াহ, ৭—১৬৬)

আরও লক্ষ্য করুন! মৌদুদী সাহেব ১৪০০ বৎসর পর তদন্ত ও গবেষণা চালাইয়া খলীফা ওসমান (রাঃ)কে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন। অথচ সমুদয় ঘটনার উপস্থিত সময়

কালেও তদন্ত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই তদন্তে বিশিষ্ট ছাহাবীবর্গের দ্বারা সমুদয় এলাকার সংবাদ ও রিপোর্ট সংগ্রহ করা হইয়াছিল। সেই রিপোর্ট সম্পূর্ণরূপে খলীফা ওসমানের অনুকুলে ছিল। কোথাও জন-সাধারণ মোসলমানদের মধ্যে কোন প্রকার অভিযোগও পাওয়া যায় নাই—বিদ্রোহত দুরের কথা। ইতিহাস-সাক্ষ্যে সেই তদন্তের রিপোর্ট প্রত্যক্ষ করুন—

হিজরী ৩৫ সালের প্রথম দিকে মদীনাবাসীগণের নিকট বিশেষতঃ তাল্‌হা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট খলীফা ওসমান (রাঃ) পরামর্শ চাহিলেন। তাঁহারা বলিলেন, আপনি নির্ভরশীল বিশেষ ব্যক্তিবর্গকে বিভিন্ন এলাকায় প্রেরণ করিয়া তথাকার অবস্থা জ্ঞাত হউন। সেমতে ওসমান (রাঃ) বিশিষ্ট ছাহাবী মোহাম্মদ ইবনে মাছলামাহকে কুফায়, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পালক পুত্রের ছেলে এবং হযরতের বিশিষ্ট প্রিয়পাত্র উছামা (রাঃ)কে বছরায়, আম্মার ইবনে ইয়াছের (রাঃ)কে মিশরে, খলীফা ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে সিরিয়ায় এবং বিভিন্ন এলাকায় আরও অনেককে তদন্তের জন্য পাঠাইয়া দিলেন। তন্মধ্যে একমাত্র মিশরে প্রেরিত আম্মার (রাঃ)ই তদন্ত শেষে প্রত্যাবর্ত্তনে বিলম্ব করিয়াছিলেন*। তদন্ত কমিশনের অন্যান্য সদস্যগণ সকলেই যথা সময়ে তদন্ত-কার্য্য সমাধা করিয়া মদীনায় ফিরিয়া আসিলেন এবং প্রকাশ্য জন-সমাবেশে বলিলেন—

ايها الناس ما انكرنا شيئا ولا انكره اعلام المسلمين ولا عوامهم وقالوا جميعا الامر امر المسلمين الا ان امرائهم يقسطون بينهم ويقومون عليهم

"হে লোক সকল! আমরা কোথাও কোন অভিযোগ শুনিলাম না এবং খলীফা ওসমান (রাঃ) সম্পর্কে বিশিষ্ট মোসলমানগণ বা সর্ব্ব-সাধারণ মোসলমানগণ কেহই কোন অভিযোগ রাখে না। তদন্তকারীগণ ইহাও স্পষ্ট ভাষায় বলিলেন যে, জন-সাধারণ মোসলমানদের প্রত্যেক কাজেই তাহাদের পূর্ণ স্বাধীনতা বিরাজমান রহিয়াছে। অধিকন্তু তাহাদের শাসনকর্ত্তাগণ তাহাদের মধ্যে ন্যায় ও সুবিচার কায়েম রাখিয়াছেন। তাঁহারা সর্ব্বদা তাহাদের কার্য্য নির্ব্বাহে নিয়োজিত থাকেন।"
(তবরী, ৩—৩৭৯)

এই তদন্তের পর পরই খলীফা ওসমান (রাঃ) একটি ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়াছিলেন উহার বিষয়বস্তু এবং প্রতিক্রিয়া খলীফা ওসমানের নির্ম্মল পবিত্রতাকে সুস্পষ্ট রূপে প্রমাণ করে। উহা সম্পর্কে ইতিহাসের বর্ণনা এই—

* যাহার কারণ "খারেজী দলের উৎপত্তি ও ইতিহাস" শিরোনামার বৃত্তান্তে বর্ণিত হইয়াছে।

ওসমান (রাঃ) প্রতি শহরে শহরে ঘোষনাপত্র পাঠাইয়া দিলেন—"আমি প্রতি বৎসর হজ্জ উপলক্ষে আমার সহকর্ম্মী গভর্ণরদের উপস্থিতিতে তাহাহের কার্য্যক্রমের যাচাই করার ইচ্ছা করিয়াছি। যখন হইতে আমি শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়াছি জাতীকে আমি সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করিতে উদ্বুদ্ধ রাখিয়াছি। সেমতে আমার উপর বা আমার কোন সহকর্ম্মীদের উপর কোন দাবী উত্থাপন করা হইলে, তাহার দাবী আমি পুরণ করিয়া দিব।

ইহাও প্রকাশ থাকে যে, রাষ্ট্রের কোন বস্তুর উপর জনসাধারণের অগ্রে আমার বা আমার বাল-বাচ্চার কোন হক নাই। রাষ্ট্রের সব কিছু জনসাধাণের জন্য।

মদীনাবাসীগণ আমাকে জ্ঞাত করিয়াছে, এক দল লোক গালি-গালাজ ও মার-ধর করার পথ অবলম্বন করিয়াছে। কি জঘন্য যাহারা লুকাইয়া লুকাইয়া গালি দেয় বা লুকাইয়া লুকাইয়া মার-ধর করে। রাষ্ট্রীয় কোন হক সম্পর্কে কাহারও কোন দাবী থাকিলে সে যেন হজ্জ উপলক্ষে সম্মেলনে উপস্থিত হয় এবং তাহার হক আমার হইতে বা আমার সহকর্ম্মী হইতে, উসুল করিয়া নেয়—যে এলাকার হকই হউক। কিম্বা তাহারা যেন মাফ করিয়া দেয়; আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাকারীকে পুরষ্কার দান করিবেন।" সমগ্র এলাকায় এই ঘোষনাপত্রের যে প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল সে সম্পর্কে ইতিহাসের সাক্ষ্য এই—

فلما قرئ فى الامصار ابكى الناس ودعوا لعثمان قالوا
ان الامة لتمخض بشر

"এই ঘোষনাপত্র শহরে শহরে পাঠ করা হইলে, ইহার মর্ম্ম লোকদেরকে কাঁদাইয়া ফেলিল এবং লোকগণ হাত উঠাইয়া ওসমানের জন্য প্রাণ-ঢালা দোয়া করিল। সকলেই বলিল, জাতীর মধ্যে দুষ্ট শ্রেণীর লোক গজাইয়া উঠিয়াছে।"

(তবরী ৩—৩৮০)

তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট এবং ঘোষনাপত্রের বিষয়বস্তু ও উহার ঐতিহাসিক প্রতিক্রিয়া সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত করিয়া দেয় যে, শুধুমাত্র সন্ত্রাসবাদীগণ ছাড়া সর্ব্বসাধারণ মোসলমানদের কোন অভিযোগই ছিল না। না খলীফা ওসমানের প্রতি, না তাঁহার সহকর্ম্মী গভর্ণরদের প্রতি। হাঁ—মোনাফেকগণ এবং সন্ত্রাসবাদীগণ মিথ্যা অভিযোগ ও মিথ্যা দোষ-চর্চ্চার একটা রব চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া রাখিয়া ছিল। এই সবের মধ্যে বাস্তবতা মোটেই ছিল না।

এই সত্যের স্বপক্ষে ইহাও একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, মোসলমানদের প্রাণ-কেন্দ্র রাজধানী মদীনার বুকে খলীফা ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রতি

অভিযোগের ছড়াছড়ি ছিল না। কোন প্রকার বিদ্রোহও ছিল না। খলীফা ওসমানের সঙ্গে বিতর্ক, তাঁহার শাহাদৎ বা হত্যা এবং তৎপ্রসঙ্গে যত কিছু বিশৃঙ্খলা মদীনায় ঘটিয়াছে সবই আবছুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেক ও তাহার সৃষ্ট দলের সন্ত্রাসবাদী লোকগণ মিশর, বছরা ও কুফা হইতে একযোগে মদীনায় আমদানি হইয়া সৃষ্টি করিয়া ছিল। মদীনাবাসীগণ ঐ সব ঘটনার সহিত জড়িত থাকা ত দুরের কথা, বরং হিজরী ৩৪ সনে প্রথমবার যখন খলীফা ওসমানের সঙ্গে বিতর্কের জন্য সন্ত্রাসবাদী দল মিশর, বছরা ও কুফা হইতে মদীনার প্রতি ধাওয়া করিয়াছিল এবং সন্ত্রাসবাদীদের সংখ্যা ও শক্তি মদীনাবাসীদের শক্তি অপেক্ষা অধিক ছিল না, তখন মদীনাবাসীগণ আগন্তুক সন্ত্রাসবাদী দলের বিরুদ্ধে অতিশয় কঠোর মনোভাব দেখাইয়া ছিলেন। খলীফা ওসমান (রাঃ) সন্ত্রাসবাদীদের বাহ্যিক মোসলমান-দল-ভুক্তির প্রতি নজর করিয়া তাহাদের প্রতি ক্ষমার ঘোষনা না করিলে ঐ সময় মদীনাবাসীদের হাত হইতে সন্ত্রাসবাদীদের রক্ষা পাওয়া তুষ্কর ছিল। ইতিহাসের সাক্ষ্যে প্রমাণিত এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ "সরকারী ধন-ভাণ্ডার সম্পর্কে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ খণ্ডন" শিরোনামার বৃত্তান্তে বর্ণিত হইবে। খলীফা ওসমানকে শহীদ করার ঘটনায় মদীনাবাসীদের ভূমিকা ত পূর্ব্বেই ব্যক্ত হইয়াছে।

সুধী পাঠক! আবছুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকের দলীয় ইস্তাহার ও আনুষ্ঠানিক ঘোষনাপত্রে জ্ঞাত হইয়াছেন যে, খলীফা ওসমানের বিরুদ্ধে মৌছুদী সাহেবের আনিত স্বজন-প্রীতির অভিযোগ বস্তুতঃ ঐ মোনাফেক দলের সৃষ্ট অভিযোগই। উহার অবাস্তবতা ইতিহাসের সাক্ষ্যেই সংক্ষেপে অবগত হইয়াছেন। সম্মুখে উহার মিথ্যারূপ আরও বিস্তারিতভাবে অবগত হইতে পারিবেন।

মোনাফেক দলের ইস্তাহার ও ঘোষনাপত্রে আরও একটা জঘন্য অভিযোগের উল্লেখ রহিয়াছে। আমাদের সৌভাগ্য বা মৌছুদী সাহেবের দুর্ভাগ্য যে, তিনি উহার উল্লেখ করেন নাই। সেই অভিযোগটি হইল খলীফা ওসমানের খলীফা নিৰ্ব্বাচিত হওয়া সম্পর্কে- যে, তিনি অন্যায় ভাবে জবরদস্তি মূলক খেলাফতের গদি দখল করিয়াছিলেন। এই ক্ষেত্রে মোনাফেকগণ আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর অধিকারের কথা উল্লেখ করিয়াছে। অধিকন্তু মোনাফেকরা ইহাও বলিয়াছে যে, স্বয়ং হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) আলী (রাঃ)কে খেলাফতের উত্তরাধিকারী নির্দ্ধারিত করিয়া গিয়াছিলেন। মোনাফেকদের এই সব দাবী শুধু প্রমাণহীনই নহে, বরং জাজ্বল্যমান মিথ্যাও বটে। স্বয়ং আলী (রাঃ)ও এইরূপ কোন বিষয়ের উল্লেখ কখনও করেন নাই। কোন একজন ছাহাবীর গোচরেও এইরূপ কোন তথ্য ছিল না। খলীফা ওসমান (রাঃ) সহ তিন জন খলীফার নিৰ্ব্বাচনে ঐরূপ কোন তথ্য

কেহই উল্লেখ করেন নাই, আলী (রাঃ)ও খলীফা নির্ব্বাচনে জনগণের সঙ্গে সঙ্গেই রহিয়াছেন। মোনাফেক দল বস্তুতঃ আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রতিও অনুরাগী ছিল না। তাহারা তাঁহার নামকে শুধুমাত্র প্রতারণামূলক ব্যবহার করিয়াছিল। মোসলমানদের খেলাফত-ব্যবস্থার মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিতে হইলে প্রথমে বর্ত্তমান খলীফার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে হইবে। সুপ্রতিষ্ঠিত জনপ্রিয় খলীফা ওসমানের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে হইলে তাঁহার ন্যায় যোগ্য ও আকর্ষণীয় ব্যক্তির নাম লইয়া দাঁড়াইতে হইবে—একমাত্র সেই হিসাবেই মোনাফেক দল আলী (রাঃ)এর নাম ব্যবহার করিতে ছিল। এক্ষেত্রে খলীফা ওসমানের নির্ব্বাচন-বৃত্তান্ত ছহীহ হাদীছ এবং ইতিহাসের মাধ্যমে উল্লেখ করা মোনাফেকদের অপবাদ খণ্ডনে বিশেষ ফলপ্রসূ হইবে এবং ইহার দ্বারাই প্রমাণ হইবে, খলীফা ওসমানের বিরুদ্ধে কিরূপ মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া হইয়াছিল।

খলীফা ওসমানের নির্ব্বাচন প্রসঙ্গ ঃ

দ্বিতীয় খলীফা ওমর ফারুক (রাঃ) ঘাতকের হাতে ভীষণ ভাবে আহত হইয়া জীবনের আশা পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী খলীফা নির্ব্বাচনের জন্য তিনি নিজেই বিশিষ্ট ছাহাবীবর্গের মধ্য হইতে ছয় সদস্যবিশিষ্ট একটি নির্ব্বাচনী কমিশন গঠন করিলেন। খলীফা ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহুর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পর উক্ত কমিশন তাঁহাদের প্রথম বৈঠকেই সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিজেদের মধ্য হইতে বিশিষ্ট সদস্য আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর উপর খলীফা নির্ব্বাচনের ভার ন্যাস্ত করিলেন। তিনি দিবা-রাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া সর্ব্ব শ্রেণীর লোকদের মতামত যাচাই করিলেন। সর্ব্বসাধারণ মোসলান, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, নেতৃস্থানীয় প্রশাসক শ্রেণী ইত্যাদি সকলের মতামতই তিনি একক ভাবে ও একত্রিত ভাবে এবং প্রকাশ্যে ও গোপনে সংগ্রহ করিলেন। এমনকি পর্দ্দানশীন মহিলা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছোট-বড় শিক্ষার্থীদের মতামতও খুঁজিয়া বাহির করিলেন। বিভিন্ন এলাকার শহর ও গ্রাম হইতে আগন্তুকদের মতামতও যাচাই করিলেন। আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) একনিষ্ঠভাবে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করতঃ বিরামহীনরূপে লোকদের মতামত যাচাই, বুদ্ধি জিবীদের সহিত পরামর্শ এবং সঙ্গে সঙ্গে আল্লার নিকট এস্তেখারা ও দোয়ার মধ্যে চার দিন ব্যাপৃত থাকিলেন। তাঁহার এই অক্লান্ত ও সুদীর্ঘ প্রচেষ্টার ফলাফল ইতিহাসবিদগণ এক বাক্যে ইহাই লিখিয়াছেন যে—

فلم يجد احدا يعدل بعثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه

"ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সমতুল্য কাহাকেও গণ্য করা যায়, এই রূপ আভাস তিনি কোথাও পাইলেন না।" (বেদায়াহ-ওয়ান-নেহায়াহ ৭—১৪৬)

ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর অছিয়ত ছিল—

فاذا مت فتشاوروا ثلاثة ايام وليصل بالناس صهيب ولا
يأتين اليوم الرابع الا وعليكم امير منكم

"আমার মৃত্যুর পর (নির্ব্বাচনী কমিশন) তিন দিন পর্য্যন্ত ছলা-পরামর্শ করিবে। এই তিন দিন মসজিদে-নববীতে নামাযের ইমামত ছোহায়েব (রাঃ) করিবেন। অতঃপর আমার মৃত্যুর চতুর্থ দিন আসিলে ঐ দিন অবশ্যই তোমাদের মধ্য হইতে খলীফা নির্ব্বাচন সম্পন্ন করিবে।" (তবরী ৩—২৯২)

সেমতে চতুর্থ দিনের রাত্রের শেষ ভাগে আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) ঐ আমামা ও পাগড়ী স্বীয় মাথায় বাঁধিলেন, যে আমামা হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) নিজ হস্তে তাঁহার মাথায় বাঁধিয়া দিয়া ছিলেন। তিনি মোহাজের ও আনছার সকলকে একত্রিত করার জন্য লোক পাঠাইলেন। রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রান্তে নিয়োজিত সামরিক বাহিণীর অধিনায়কগণ যাঁহারা হজ্জ উপলক্ষে ঐ সময় মদীনায় উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদিগকেও একত্রিত করার ব্যবস্থা করিলেন। তারপর তিনি ওসমান (রাঃ) এবং আলী (রাঃ) সহ মসজিদের দিকে রওয়ানা হইলেন। ফজরের আজান দেওয়া হইল। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদ লোকে লোকারণ্য। নামাযান্তে আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) আলী (রাঃ)ও ওসমান রাজিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে ভিন্ন ভিন্নরূপে কথা বলার পর হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মিম্বারে আরোহণ করিয়া ভাষণ দান করিলেন—

فتشهد عبد الرحمن ثم قال اما بعد يا على انى قد نظرت فى امر
الناس فلم ارهم يعدلون بعثمان فلا تجعلن على نفسك سبيلا

"আবদুর রহমান (রাঃ) আল্লাহ তায়ালার ছানা-ছিফতের পর বলিলেন, হে আলী! আমি সকল শ্রেণীর লোকদের মতামত যাচাই করিয়াছি। আমি তাহাদের মধ্যে এরূপ আভাস পাই নাই যে, তাহারা খেলাফতের জন্য কাহাকেও ওসমানের সমতুল্য গণ্য করে +। সুতরাং আপনি মনক্ষুন্ন হইবেন না।"

(বোখারী শরীফ ১০৭০ পৃষ্ঠা।)

+ ইহা খলীফা ওসমানের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে প্রধান নির্ব্বাচনী কমিশনার ছাহাবীর সাক্ষ্য যাহা বোখারী শরীফে বর্ণিত।

তারপর আবত্বর রহমান (রাঃ) ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হাত ধরা অবস্থায় উর্দ্ধপানে তাকাইয়া তিন বার বলিলেন—

اللهم اسمع واشهد اللهم اسمع واشهد اللهم اسمع واشهد

"হে আল্লাহ! তুমি শুনিও এবং সাক্ষী থাকিও, হে আল্লাহ! তুমি শুনিও এবং সাক্ষী থাকিও, হে আল্লাহ। তুমি শুনিও এবং সাক্ষী থাকিও।"

اللهم انى قد خلعت ما فى رقبتى من ذلك فى رقبة عثمان

"হে আল্লাহ! আমার কাঁধে যেই দায়িত্ব ছিল তাহা আমি সম্পন্ন করতঃ ওসমানের কাঁধে বোঝা উঠাইয়া দিলাম।" এই বলিয়া সর্ব্বপ্রথম নির্ব্বাচনী কমিশনার আবত্বর রহমান (রাঃ) ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হাতে হাত দিয়া তাঁহাকে খলীফা গ্রহণের শপথ করিলেন। তারপর সমস্ত লোক ওসমান (রাঃ)কে খলীফা গ্রহণ করার শপথ করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে আলী (রাঃ) সেই শপথ করিলেন ↑।" (বেদায়াহ, ৭—১৪৭)

বিশ্ব-ইতিহাসের এইরূপ অপূর্ব্ব ঘটনা ছিল খলীফা ওসমানের নির্ব্বাচন। ইহা দ্বারা খারেজী দলের অপপ্রচারের জঘণ্যতা সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

প্রিয় পাঠক! খলীফা ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রতি স্বজন-প্রীতির অভিযোগ যে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সাক্ষ্য ও অনেক অনেক হাদীছের পরিপন্থী এবং এই অভিযোগের মূল সূত্র যে, শুধুমাত্র সন্ত্রাসবাদী মোনাফেক দলের ষড়যন্ত্রমূলক অপপ্রচার, সুস্পষ্ট ইতিহাসের মাধ্যমে তাহা আপন'রা অবগত হইলেন।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সাক্ষ্যের পরিপন্থী এবং সন্ত্রাসবাদী ষড়যন্ত্রকারী শত্রুদের মুখের প্রচারণা হিসাবে ঐ অভিযোগটার প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন হওয়া প্রতিটি মোসলমানের পক্ষে অতি স্বাভাবিক। তুঃখের বিষয় মৌতুদী সাহেব সেই স্বাভাবিকতার সম্পূর্ণ বিপরীত স্বভাবকে বাছিয়া লইয়াছেন। আরও অধিক তুঃখের বিষয় যে, মৌতুদী সাহেব সন্ত্রাসবাদী মোনাফেকদের মিথ্যার বেসাতিকে

↑ গ্রন্থকার ইবনে কাছীর (রাঃ) এস্থলে ইহাও স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়াছেন যে, শুদ্ধ ইহাই যে, আলী (রাঃ) বিনা বাক্য ব্যয়ে ঐ সময়ই ওসমান (রাঃ)কে খলীফা গ্রহণ করার শপথ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। কোন কোন ইতিহাসবিদ যেমন ইবনে জরীর তবরী ইহার ব্যতিক্রম বর্ণনা বয়ান করিয়াছেন, কিন্তু তাহা শুদ্ধ নহে।

বোখারী শরীফ ৫২৫ পৃষ্ঠায়ও স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে যে, আবত্বর রহমান (রাঃ) শপথ করার পর ঐ বৈঠকেই আলী (রাঃ) শপথ করিয়া ছিলেন।

বোক্‌চা বাঁধিয়া ক্ষান্ত ও শান্ত হইয়া রহিলেন ; উহা খণ্ডনের ভূরিভূরি তথ্য যাহা ইতিহাসে বিদ্যমান রহিয়াছে ঐ সবের প্রতি তাকাইয়াও দেখিলেন না। খলীফা ওসমানের প্রতি স্বজন-প্রীতির অভিযোগ খণ্ডনে আরও অকাট্য প্রমাণ ইতিহাস ভাণ্ডারে প্রত্যক্ষ করুন।

স্বজন-প্রীতির অভিযোগের দুইটি শাখা—একটি হইল বাইতুল-মাল তথা সরকারী ধন-ভাণ্ডার হইতে নিজ আত্মীয়বর্গকে অধিক প্রদান করা। অপরটি হইল সরকারী পদ বড় বড় এবং অধিক নিজ আত্মীয়গণকে দেওয়া। উভয়টির খণ্ডন ইতিহাসের মাধ্যমে, সরল ও সুস্পষ্ট যুক্তির আলোতে ভিন্ন ভিন্নরূপে দেখান হইবে।

সরকারী ধন-ভাণ্ডার সম্পর্কে স্বজন-প্রীতির অপবাদ খণ্ডন ঃ

হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদে সর্ব্ব সমক্ষে মদীনাবাসীগণকে সাক্ষী করিয়া সন্ত্রাসবাদীদের উপস্থিতিতে স্বয়ং খলীফা ওসমান (রাঃ) উক্ত অপবাদের যে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন ইতিহাস হইতে পূর্ণ ঘটনার বিবরণের সহিত সেই উত্তরই পাঠক সমক্ষে পেশ করা হইতেছে—

হিজরী ৩৪ সনের ঘটনা—মদীনার বাহিরে দূর দুরান্ত এলাকায় সন্ত্রাসবাদীদের ষড়যন্ত্রমূলক অপপ্রচারের খবরাখবর জ্ঞাত হইয়া খলীফা ওসমান (রাঃ) মদীনায় গভর্ণর সম্মেলন আহ্বান করিলেন। সেই উপলক্ষে বিভিন্ন প্রদেশের গভর্ণরগণ মদীনায় পৌঁছিলেন। সন্ত্রসাবাদীগণ প্রদেশসমূহে গভর্ণরদের অনুপস্থিতির সুযোগে বিদ্রোহ সৃষ্টির পরিকল্পনা করিয়াছিল। সেই পরিকল্পনা বানচাল হওয়া এবং সন্ত্রাস-বাদীদের পরবর্ত্তী কার্য্যক্রমের বিবরণ ইতিহাসে এরূপ বর্ণিত রহিয়াছে।

ولما رجع الامراء لم يكن للسبائية سبيل الى الخروج......

وكاتبوا اشياعهم من اهل الامصار ان يتوافوا بالمدينة......

"গভর্ণরগণ মদীনার সম্মেলন হইতে দ্রুত নিজ নিজ প্রদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, আবদুল্লাহ ইবনে সাবার সন্ত্রাসবাদী দলের পক্ষে প্রদেশসমূহে বিদ্রোহ সৃষ্টির অবকাশ থাকিল না। তখন তাহারা নিজেদের সহকর্মী ও ক্রীড়নকগণকে পত্র মারফৎ আর এক পরিকল্পনা জ্ঞাত করিল। একযোগে সকলে মদীনায় উপস্থিত হইয়া মূল উদ্দেশ্য সাধন সম্পর্কে পথ খুঁজিবে। পরিকল্পনায় তাহারা ইহাও প্রকাশ করিল যে, বাহ্যিকভাবে তাহারা সদুপদেশ প্রদান করিয়া বেড়াইবে এবং খলীফা ওসমান (রাঃ)কে বিভিন্ন প্রশ্ন করিবে। যাহাতে ঐ বিষয়গুলি জনসাধারণের মধ্যে ছড়ায় এবং খলীফা ওসমানের উপর অভিযোগ রূপে দাঁড়ায়।

পরিকল্পনা অনুযায়ী সন্ত্রাসবাদী আবদুল্লাহ ইবনে সাবার দল বিভিন্ন প্রদেশ হইতে মদীনায় একত্রিত হইল। ওসমান (রাঃ) তাহাদের সংবাদ জ্ঞাত হইয়া মদীনাবাসী দুই জন লোককে তাহাদের নিকট পাঠাইলেন। এই লোক দুইটির উপর কোন ব্যাপারে খলীফা ওসমান (রাঃ) শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রয়োগ করিয়াছিলেন। অবশ্য তাহারা হকের সামনে নত হইয়া ছবর করিয়া ছিল, খলীফার বিরুদ্ধে কোন শত্রুতায় মাতিয়া উঠে নাই। কিন্তু সন্ত্রাসবাদীগণ এই লোক দুইটিকে দেখিয়া তাহাদেরে খলীফার বিরুদ্ধে সহজে কাবু করিতে পারিবে মনে করিল এবং নিজেদের পরিকল্পনা এবং মূল ইচ্ছা তাহাদের নিকট খুলিয়া বলিল।

ব্যক্তিদ্বয় তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, من معكم على هذا من اهل المدينة "তোমাদের এই উদ্দেশ্য সাধনে মদীনাবাসীদের কে কে তোমাদের সঙ্গে আছে? তাহারা বলিল, ثلاثة نفر "তিন জন"। ব্যক্তিদ্বয় জিজ্ঞাসা করিল, هل الا "আর কেহ আছে কি? তাহারা বলিল, لا—"না"। ব্যক্তিদ্বয় জিজ্ঞাসা করিল, তা হইলে এত বড় কাজ তোমরা কিরূপে করিবে? তাহারা বলিল, আমাদের পরিকল্পনা এই যে, কতিপয় বিষয়ের অভিযোগ আমরা খলীফার উপর দাঁড় করিব। এই অভিযোগগুলির বীজ আমরা অনেক লোকের অন্তরে বপন করিয়া রাখিয়াছি। এখন মদীনা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ সেই লোকদের নিকট যাইয়া বলিব যে, আমরা মদীনায় যাইয়া খলীফা ওসমানের উপর অভিযোগগুলি পূর্ণরূপে স্থাপন করিয়া আসিয়াছি। তিনি অভিযোগের কারণগুলি ত্যাগ করিলেন না তওবাও করিলেন না। এইভাবে লোকদিগকে খলীফার প্রতি বিরূপ ভাবাপন্ন করিয়া পুনরায় আমরা অধিক শক্তি সহকারে হজ্জ করার ভান করিয়া বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আসিব এবং অতর্কিতে মদীনা চড়াও করিয়া খলীফাকে অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিব। সে অবস্থায় হয় তিনি পদত্যাগ করিবেন—না হয় আমাদের হাতে প্রাণ হারাইবেন।

উক্ত ব্যক্তিদ্বয় তাহাদের নিকট হইতে খলীফা ওসমানের নিকট আসিয়া সব কিছু জ্ঞাত করিলেন। ওসমান (রাঃ) হাসিলেন এবং দোয়া করিলেন—হে আল্লাহ! এই লোকদিগকে (তাহাদের নাপাক ইচ্ছা হইতে) তুমিই বাঁচাইয়া রাখ, নতুবা তাহারা হতভাগা হইবে। অতঃপর ওসমান (রাঃ) কুফা ও বছরা হইতে আগন্তুক ঐ সন্ত্রাসবাদীগণকে মসজিদে ডাকাইলেন। নামাযের আজান হইল। সন্ত্রাসবাদীগণ খলীফা ওসমানের সম্মুখে মিম্বারের নিকটবর্ত্তী বসিলে উপস্থিত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবীগণ খলীফাকে ঘিরিয়া বসিলেন। খলীফা ওসমান (রাঃ) হাম্দ-ছানার পর ভাষণ দান পূর্ব্বক উপস্থিত সকলকে সন্ত্রাসবাদীদের সমুদয় বিষয়

জ্ঞাত করিলেন এবং ঐ ব্যক্তিদ্বয় দাঁড়াইয়া সাক্ষ্য দিল। তখন মদীনাবাসীগণ এক বাক্যে বলিলেন—

اقتلهم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا الى نفسه
او الى احد وعلى الناس امام فعليه لعنة الله فاقتلوه

"এদেরকে হত্যা করুন। কারণ রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি নিজের জন্য বা অপর কাহারও জন্য লোকদের শাসনকর্তা নিযুক্ত থাকাবস্থায় ক্ষমতা দখলের প্ররোচণা চালাইবে, তাহার উপর আল্লার লা'নৎ বর্ষিবে এবং তোমরা তাহাকে প্রাণে বধ করিয়া ফেলিবে।" কিন্তু খলীফা ওসমান (রাঃ) তাহাদের প্রতি উদারতা দেখাইয়া বলিলেন—

بل نعفو ونقبل ونبصرهم بجهدنا ولا نحاد احدا حتى يركب حدا
او يبدى كفرا ان هؤلاء ذكروا امورا قد علموا منها مثل الذى
علمتم الا انهم زعموا انهم يذاكرونها ليوجبوها على عند من لا يعلم

"আমি তাহাদিগকে মাফ করিয়া দিব, গ্রহণ করিব এবং আমার সৎ প্রচেষ্টা তাহাদেরে বুঝাইব। আমি কাহাকেও প্রাণদণ্ড দিব না—যাবৎনা সে প্রাণদণ্ডের অপরাধ করে বা প্রকাশ্যে কুফরী করে। এই লোকগণ এমন কতিপয় অভিযোগ আনয়ণ করিয়াছে যাহা সম্পর্কে তাহারাও তদ্রূপই জ্ঞাত আছে যেরূপ তোমরা জ্ঞাত আছ। অবশ্য তাহারা বলিয়াছে যে, অভিযোগগুলি আমার সম্মুখে উল্লেখ করিবে—এই উদ্দেশ্যে যে, যাহারা এই সম্পর্কে জ্ঞাত নহে ঐরূপ লোকদেরে আমার উপর ঐ সব অভিযোগ সাব্যস্ত বলিয়া তাহারা বুঝাইবে।"

অতঃপর ওসমান (রাঃ) সুদীর্ঘ বিবৃতিতে তাহাদের অভিযোগগুলির উত্তর এবং স্বীয় কতিপয় সৎ প্রচেষ্টার বর্ণনা দান করিলেন। প্রতিটি বিষয়ের উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে ওসমান (রাঃ) স্বীয় উক্তির উপর মদীনাবাসীদের সাক্ষ্য চাহিতেন। তাঁহারাও এক বাক্যে সাক্ষ্য দিতেন এবং চিৎকার করিয়া সন্ত্রাসবাদীদের প্রাণদণ্ডের দাবী করিতেন। স্বজন-প্রীতির সম্পর্কেও অনেক বিষয়ের উত্তর দিলেন। পূর্ণ বিবৃতির উদ্ধৃতি অনেক লম্বা, তাই নমুনা স্বরূপ শুধু একটি বিষয় উল্লেখ করা হইতেছে। তিনি বলিলেন—

وقالوا انى احب اهل بيتى واعطيهم فاما حبى فانه لم يمل
معهم على جور احمل الحقوق عليهم واما اعطاؤهم فانى ما اعطيهم
فمن مالى ولا استحل اموال المسلمين لنفسى ولا لاحد من الناس

ولقد كنت اعطى العطية الكبيرة الرغيبة من صلب مالى ازمان

رسول الله صلى الله......

“তাহারা অভিযোগ করিয়া থাকে, আমি আমার আপন জনকে অধিক ভালবাসি এবং তাহাদিগকে অধিক দিয়া থাকি। এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য এই যে, আপন জনের সঙ্গে স্বাভাবিক ভালবাসা আছে বটে, কিন্তু কোন অন্যায় ব্যাপারে তাহাদের পক্ষ সমর্থন করা হয় না। বরং তাহাদের প্রাপ্য হক আমি তাহাদেরকে পৌঁছাইয়া দেই।

আর তাহাদেরকে অধিক দিয়া থাকি, কিন্তু তাহা আমার ব্যক্তিগত নিজস্ব মাল হইতে দিয়া থাকি। মোসলমানদের মাল তথা সরকারী ধনভাণ্ডারকে আমি আমার জন্য এবং আমার কোন ব্যক্তির জন্য হালাল মনে করি না। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আমলে এবং আবুবকর ও ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহুমার আমলেও আমি আমার ব্যক্তিগত নিজস্ব মাল হইতে ভাল ভাল এবং বড় বড় দান করিয়া থাকিতাম। অথচ ঐ সময় ত বয়স হিসাবে আমার জন্য ধন-দৌলতের প্রতি স্পৃহার সময় ছিল। আর এখন আপন পরিজনের মধ্যে আমার বয়স সর্ব্বাধিক। আমার বয়স শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছে ; এমতাবস্থায় আমি আমার ব্যক্তিগত নিজস্ব যাহা কিছু ছিল তাহা আপন জনগণকে দিয়া দিয়াছি—তাহাতে বেঈমানগণ নানা রকম কথা বলে।”

এই বক্তৃতার মধ্যে ওসমান (রাঃ) উক্ত নিজস্ব দান ও ব্যয়ের জন্য সরকারী ধনভাণ্ডার হইতে কোন কিছু গ্রহণ না করার প্রমাণে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন—

وانى قد وليت وانى اكثر العرب بعيرا وشاءا فمالى اليوم شاة

ولا بعير غير بعيرين لحجى اكذلك قالوا اللهم نعم

“আমি যখন খলীফা নির্ব্বাচিত হইয়াছি তখন আমি আরবের সর্ব্বাধিক বড় ধনী ছিলাম। আরবের মধ্যে সব চেয়ে বেশী উট-বকরী আমার ছিল। এবং বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে আমার হজ্জের জন্য রক্ষিত দুইটি উট ছাড়া অতিরিক্ত একটি উট বা একটি বকরীও নাই। ওসমান (রাঃ) স্বীয় এই উক্তির উপর মদীনাবাসীদের সাক্ষ্য চাহিলেন—ইহাই কি প্রকৃত অবস্থা নয়? তাঁহারা সকলেই এক বাক্যে আল্লাহকে হাজির-নাজির উল্লেখ করতঃ বলিলেন, হাঁ—ইহা বাস্তব সত্য।”

খলীফা ওসমানের এই বক্তৃতা বর্ণনাকারী এই তথ্যও প্রকাশ করিয়াছেন যে—

وكان عثمان قد قسم ماله وارضه فى بنى امية وجعل ولده كبعض من يعطى

"ওসমান (রাঃ) নিজস্ব সমুদয় ধন ও সম্পত্তি নিজ বংশের লোকদের মধ্যে ভাগ বণ্টন করিয়া দিয়া ছিলেন↑। এমনকি স্বীয় পুত্র-কন্যাকে দানকৃত লোকদের সম শ্রেণীর করিয়া দিয়া ছিলেন।

এই বিবৃতির পর সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি মদীনাবাসীদের মনোভাব সম্পর্কে ইতিহাসের সাক্ষ্য—

ولانت حاشية عثمان لأولئك الطوائف وابى المسلمون الا قتلهم وابى الا تركهم

"সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি ওসমান রাজিয়াল্লাহু আনহুর মন নরম ছিল, আর মোসলমানগণ এক বাক্যে তাহাদের প্রাণদণ্ড দাবী করিতে ছিলেন, কিন্তু ওসমান (রাঃ) তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়ার উপরই দৃঢ় থাকিলেন।" (তবরী ৩—৩৮৪)

খলীফা ওসমান (রাঃ) এই মোনাফেক দলের ষড়যন্ত্র অবগত ছিলেন না।—তাহা নহে, কিন্তু তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে তরবারী ব্যবহার করেন নাই; এই কারণে যে, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত মোসলমানদের নীতিই ছিল মোনাফেকদিগকে বরদাশ্‌ত ও সহ্য করিয়া যাওয়া এবং তাহাদের উপর তরবারী ব্যবহার না করা। হযরতের আমলে কত সময় কত মোনাফেকের মোনাফেকী-ক্রিয়াকলাপ ও ষড়যন্ত্র ধরা পড়ায় ওমর ফারুক প্রমুখ ছাহাবীগণ তাহাদের গর্দ্দান কাটিয়া ফেলার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন। হযরত (দঃ) কখনও উহার অনুমতি দেন নাই। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রাণঘাতি শত্রু মোনাফেক-সর্দ্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইসলামের ও মোসলমানদের এবং স্বয়ং হযরতের ভয়ঙ্কর ক্ষতি সাধনে কত শত ষড়যন্ত্রই না—করিয়া ছিল এবং সুস্পষ্টরূপে পবিত্র কোরআনের আয়াত ও ছুরা নাজেল হইয়া তাহার দলের অপরাধ সাব্যস্তও করিয়া ছিল। এতদ্ভিন্ন তাহার দলে তিন শতের অধিক লোক ছিল। ওহী মারফৎ তাহাদের সকলের পরিচয় হযরত (দঃ)কে জ্ঞাত করা হইয়া ছিল। কিন্তু হযরত (দঃ) তাহাদের বিরুদ্ধে তরবারী ব্যবহার করেন নাই। তরবারী ব্যবহারের অনুমতি প্রার্থনাও তিনি সর্ব্বদা

↑ নিজস্ব মাল দান করা কালে নিজের বংশ এবং আত্মীয়-স্বজনই অগ্রগণ্য, ইহাই ইসলামের বিধান এবং ছুন্নত তরীকা। এমনকি জাকাত-ছদকা যাহা গরীবদের হক সে স্থলেও শরীয়ত মতে জাকাতের পাত্র নিজ আত্মীয় গরীবই অগ্রগণ্য।

প্রত্যাখ্যান করিতেন। প্রথম খলীফার এবং দ্বিতীয় খলীফার আমলেও ঐ নীতিই চলিয়া ছিল। ইতিপূর্ব্বে মোনাফেকদের দলবদ্ধ ভাবে মোসলমানদের বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি ব্যবহারের কোন নজীর পরিদৃষ্টও হয় নাই। খলীফা ওসমান (রাঃ) সেরূপ আশঙ্কা দৃঢ়ভাবে মোটেই উপলব্ধি করেন নাই। সুতরাং তিনি সন্ত্রাসবাদী মোনাফেকদের ব্যাপারে নির্ভীক চিত্তে হযরত (দঃ), খলীফা আবু বকর ও খলীফা ওমরের নীতির উপরই অটল রহিলেন। কারণ, বিষয়টি ছিল অতিশয় জটিল—যে, ইসলামের কলেমা-তৌহীদের স্বীকৃতি ঘোষনাকারীদের উপর তরবারী ব্যবহার করা—যাহা রসুলুল্লাহ(দঃ) করেন নাই এবং তাঁহার পরবর্ত্তী খলীফাদ্বয়ও করেন নাই। ইহা যে, কত বড় বাধা কত বড় চিন্তার বিষয় তাহার গুরুত্ব বর্ত্তমান ক্ষমতা ও গদির মোহান্ধতার যুগে উপলব্ধি করা না হইলেও খলীফা ওসমান (রাঃ) উহার গুরুত্ব খুবই উপলব্ধি করিতেন এবং সতর্কতা অবলম্বনই শ্রেয় মনে করিতেন।

ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, খলীফা ওসমানের বিরুদ্ধে মোনাকেকগণ সর্ব্ব শেষ মুহূর্ত্তে সকলের ধারণা ও চিন্তার বহু উর্দ্ধে যে পন্থা ও শক্তি ব্যবহার করিয়া ছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে একটি নূতন বিষয় ও নূতন সমস্যা ছিল। এই শ্রেণীর কোন ঘটনার উৎপত্তি হযরতের আমলে বা খলীফা আবু বকর ও খলীফা ওমরের আমলে মোটেই হয় নাই। আর খলীফা ওসমান ত ইহাতে প্রাণই হারাইলেন। সুতরাং এই শ্রেণীর সমস্যা সমাধানের কোন ছুন্নত বা ইসলামী নীতি তাঁহাদের প্রত্যক্ষ আমল হইতে গ্রহণ করার উপায় ছিল না। ইতিপূর্ব্বে এই সম্পর্কে চিন্তা করারও প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু এই সমস্যাটি ছিল মোসলেম জাতির প্রতি ভয়াবহ হুমকি। এরূপ ক্ষেত্রেও যদি তরবারী ব্যবহার না করার নীতি চালান হয় তবে গোটা মোসলেম জাতিই মোনাফেকদের দ্বারা আক্রান্ত ও পরাজিত হইতে বাধ্য হইবে, অতএব নূতন ভাবে এই সমস্যার সমাধানের চিন্তার আবশ্যক হইল।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আমল বা প্রত্যক্ষ কার্য্য ধারা হইতে উহার সমাধান পাওয়ার সুযোগ ছিল না। তাই তাঁহার বাণী হইতে প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া সর্ব্বপ্রথম খলীফা আলী(রাঃ) ঐরূপ পরিস্থিতিতে মোনাফেকদের বিরুদ্ধে তরবারী ব্যবহারের নীতি অবলম্বন করেন। তিনি এই মোনাফেকের দল—খারেজী ফের্কার উপর তরবারী চালাইয়া তাহাদিগকে বিনা দ্বিধায় হত্যা করেন।

প্রিয় পাঠক! বাইতুল-মাল তথা সরকারী ধনভাণ্ডার সম্পর্কে স্বজন-প্রীতির অপবাদ যে, সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তীহীন ছিল স্বয়ং খলীফা ওসমানের বিবৃতি হইতেই তাহা প্রমাণিত হইল। খলীফা ওসমানের এই বিবৃতি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদে সর্ব্বসমক্ষে প্রদত্ত হইয়াছিল এবং খলীফা ওসমান (রাঃ) স্বীয় উক্তির উপর মদীনাবাসীদের সাক্ষ্যও গ্রহণ করিয়া ছিলেন।

ইতিহাস গ্রন্থে উক্ত বিবৃতি ও উহার পূর্ণ ঘটনা বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু মৌদুদী সাহেব মোসলেম সমাজের সম্মুখে উক্ত বিবৃতির কোনও আভাস না দিয়া শুধু কেবল মোনাফেক সন্ত্রাসবাদীদের অপপ্রচারে সৃষ্ট মতবাদকেই বার বার বিভিন্ন ভঙ্গিমায় বর্ণনা করিয়াছেন।

মৌদুদী সাহেব শুধু এই স্থানেই নয়, বরং তাহার ৩৫৫ পৃষ্ঠার কুখ্যাত পুস্তকে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত জার্ম্মান অধিপতি হ্যার হিটলারের প্রোপাগাণ্ডা মন্ত্রী হ্যার গোয়েবলের নীতি অবলম্বন করিয়াছেন যে, মিথ্যাকেও যদি বার বার বলা হয় তবে লোকের নিকট উহা সত্যে পরিণত হইয়া যায়।

সরকারী পদ সম্পর্কে স্বজন-প্রীতির অভিযোগ খণ্ডন ঃ

স্বজন-প্রীতির অভিযোগের দ্বিতীয় শাখা—নিজ আত্মীয়গণকে সরকারী পদ বেশী ও বড় বড় দান করা। এ সম্পর্কে স্বয়ং খলীফা ওসমানের অনেক বিবৃতি ইতিহাসে বিদ্যমান আছে, যাহার বিরাট সংগ্রহ পূর্ব্ববর্ত্তী মনীষীবৃন্দের গ্রন্থসমূহে রহিয়াছে। কিন্তু মৌদুদী সাহেব তাঁহাদের মহতী প্রচেষ্টাকে খলীফা ওসমানের পক্ষে ওকালতী বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন এবং মোনাফেক সন্ত্রাসবাদীদের অপপ্রচার বা সেই অপপ্রচারে সৃষ্ট মতবাদ প্রচারের জয়ঢাক সাজিয়াছেন। আমাদের এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে আমরা উক্ত অভিযোগ খণ্ডনে অতি সরল ও অধিক ক্রিয়াশীল আর একটি তথ্য ইতিহাস হইতে উদ্ধার করিয়া পাঠক সমক্ষে রাখিতেছি। বহু কথিত ও চিন্তাবিদ নামে প্রচারিত মৌদুদী সাহেব যদি এই তথ্যটি উদ্ধারের চেষ্টা করিতেন তবে তাঁহার ভ্রান্ত মতবাদের পরিবর্ত্তনে অনেক সাহায্য লাভ হইত। কিন্তু এই দুর্ভাগ্য খণ্ডনের উপায় কি আছে যে, তাঁহার আবির্ভাব যেন একমাত্র আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেক দলের সমর্থনের জন্যই।

তথ্যটি হইল এই ঃ—শাসন পরিচালনের ভার আঞ্চলিক বা বিভাগীয় পর্য্যায়ে যাঁহাদের উপর ন্যস্ত থাকে খেলাফততন্ত্রের ভাষায় তাঁহাদিগকে "আমেল" বলা হয়। খেলাফততন্ত্রে সরকারী বড় পদ বলিতে "আমেল" পদকেই বুঝায়। এই পদকেই মৌদুদী সাহেব "গভর্ণর" পদ বলিয়াছেন ; প্রচলিত ভাষায়ও তাহাই হয়। মৌদুদী সাহেবের অভিযোগ হইল—খলীফা ওসমানের আমলে গভর্ণর বা আমেলের পদ তিনি তাঁহার আত্মীয়দেরকে বেশী দিয়াছেন। মৌদুদী সাহেব স্বীয় পুস্তকের ১০৭ পৃষ্ঠায় ঐরূপ কতিপয় আমেলের নামও উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রিয় পাঠক! খলীফা ওসমান (রাঃ) নিজ আত্মীয়বর্গকে আমেলের পদ অধিক দিয়াছিলেন—এই কথা সত্য বা মিথ্যা তাহার বিচারে লম্বা-চৌড়া দলীল প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। ইহার সত্য-মিথ্যা হওয়ার যাচাই অতি সহজ সরল ও অকাট্য-

রূপে ইহার দ্বারাই হইয়া যাইবে যে, খলীফা ওসমানের সুদীর্ঘ ১২ বৎসরের খেলাফৎ আমলে কতজন লোক আমেল তথা শাসন-কার্য্য পরিচালক পদের সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আর তন্মধ্যে খলীফা ওসমানের আপন জনের সংখ্যা কি ছিল এবং তাহাদের সঙ্গে আত্মীয়তার ঘনিষ্ঠতা কিরূপ ছিল ? আদমের সন্তান সকলের মধ্যেই পরস্পর আত্মীয়তা বিদ্যমান আছে, কিন্তু অভিযোগের সৌধ ঘনিষ্ঠতার উপরই দাঁড়াইতে পারে। আত্মীয়গণের সংখ্যা ও আত্মীয়তার ঘনিষ্ঠতা ইতিহাস হইতে আহরণ করা হইলে আপনা আপনিই মৌদুদী সাহেবের ধূম্রজালে ঢাকা মিথ্যা ও কুখ্যাত অভিযোগের মুখস খুলিয়া যাইবে।

খলীফা ওসমান (রাঃ) ইহজগৎ ত্যাগ করা কালে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন কার্য্যে নিম্ন লিখিত ব্যক্তিবর্গ তাঁহার আমেল ছিলেন—১। আবদুল্লাহ ইবনুল হজরমী (রাঃ) ২। কাসেম ইবনে রবিয়াতা ছকফী (রাঃ) ৩। ইয়ালা ইবনু উমাইয়া (রাঃ) ৪। আবদুল্লাহ ইবনে রবিয়া (রাঃ) ৫। আবদুল্লাহ ইবনে আমের (রাঃ) ৬। সায়ীদ ইবনুল আছ (রাঃ) ৭। আবদুল্লাহ ইবনু সায়াদ ইবনে আবী সারাহ (রাঃ) ৮। মোয়াবিয়া (রাঃ) ৯। আবদুর রহমান ইবনু খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ) ১০। হাবীব ইবনু মাছলামাহ (রাঃ) ১১। আবুল আ'ওয়ার (রাঃ) ১২। আলকামাহ ইবনুল হাকীম (রাঃ) ১৩। আবদুল্লাহ ইবনু কায়েস (রাঃ) ১৪। আবুদ্ দরদা (রাঃ) ১৫। আবু মূছা আশয়ারী (রাঃ) ১৬। জাবের ইবনু ফোলান (রাঃ) ১৭। সেমাক আনছারী (রাঃ) ১৮। কা কা ইবনু আমর (রাঃ) ১৯। জরীর ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) ২০। আশয়াছ ইবনু কায়েস (রাঃ) ২১। ওতায়বা ইবনু নাহ্হাস (রাঃ) ২২। মালেক ইবনু হাবীব (রাঃ) ২৩। নোসায়ের (রাঃ) ২৪। সায়ীদ ইবনু কায়েস (রাঃ) ২৫। সায়েব ইবনু আফ্রা (রাঃ) ২৬। হোবায়েশ (রাঃ) ২৭। ওক্বা ইবনু আমর (রাঃ) ২৮। যায়েদ ইবনে ছাবেৎ (রাঃ)। (তবরী, ৩—৪৪৬, কামেল, ২—৯৫) ২৯। কায়েস ইবনু হোবায়রা—তূস এবং নিশাপুরের আমেল। ৩০। আবদুর রহমান ইবনু সামুরাহ—সিজিস্তানের আমেল। ৩১। এমরান—মকরানের আমেল। ৩২। ওমায়ের ইবনু ওসমান ইবনে সায়াদ—পারস্যের আমেল। ৩৩। ইবনু কোনায়দার কোশায়রী—কেরমানের আমেল। (কামেল, ৩—৫১)

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন এলাকায় এই ব্যক্তিবর্গও আমেল হইয়া ছিলেন—৩৪। হিজরী ২৪ সনে কুফার আমেল সায়াদ ইবনু আবী ওক্কাছ (রাঃ) ৩৫। হিঃ ২৫ সন পর্য্যন্ত আজারবাইজনের আমেল ওত্বা ইবনুল ফারকাদ (রাঃ) ৩৬। হিজরী ২৫ সনে কুফার আমেল ওলীদ ইবনু ওকবাহ (রাঃ) ৩৭। হিজরী ২৬ সনে উন্দুলুসের আমেল আবদুল্লাহ ইবনু নাফে ইবনে আবদুল কায়েস। ৩৮। হিজরী ২৭ সন পর্য্যন্ত মিশরের আমেল আম্‌র ইবনুল আ'ছ (রাঃ)।

হিজরী ২৯ সনে পরিস্থিতির প্রয়োজনে পারস্যের বিভিন্ন এলাকার জন্য এবং খোরাসানের বিভিন্ন এলাকার জন্য ভিন্ন ভিন্ন আমেল নিযুক্ত হইয়া ছিলেন। পারস্যের এলাকা সমূহে—৩৯। হরম ইবনু হাইয়্যান ইয়াশকুরী ৪০। হরম ইবনু হাইয়্যান আবদী ৪১। খিরুরীত ইবনু রাশেদ ৪২। তরজুমান হোজায়মী ৪৩। মেনজাব ইবনু রাশেদ। খোরাসানের এলাকা সমূহে—৪৪। আল-আখ্নাফ ৪৫। হাবীব ইবনে কোর্রাহ ৪৬। খালেদ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনে মোহায়ের ৪৭। আমীর ইবনে আহ্মার। (কামেল, ৩—৫০)

পাঠকবৃন্দ ! আপনারা শুনিয়া বিস্মিত ও আশ্চর্যান্বিত হইবেন, আর আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেক দলের অপপ্রচারে বা মৌদুদী সাহেবের ঢাক পিটানিতে যাহারা প্রভাবান্বিত হইয়াছে তাহারা ত বিশ্বাসই করিবে না—কিন্তু আমরা চ্যালেঞ্জের সহিত বলিতেছি যে, সুদীর্ঘ ১২ বৎসরের খেলাফত আমলে ৪৭ জন আমেল বা কর্ম্মকর্ত্তার মধ্যে খলীফা ওসমানের আত্মীয় শুধু মাত্র পাঁচ জন ছিলেন। তন্মধ্যে তিন জন তাঁহার নিজ বংশের—তথা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের গোত্র কোরায়েশ গোত্রের শাখা উমাইয়া বংশের ; খলীফা ওসমানের সঙ্গে বহু দুর সম্পর্কের আত্মীয় ছিলেন। আর দুই জন তাঁহার বংশের ছিলেন না, শুধু মাত্র দুর সম্পর্কীয় আত্মীয়তা তাঁহার সঙ্গে ছিল। প্রথমোক্ত তিনজন হইলেন—(১) মোয়াবিয়া (রাঃ) (২) ওলীদ ইবনু ওকবাহ্ (রাঃ) (৩) সায়ীদ ইবনুল আছ (রাঃ)। অপর দুই জন হইলেন—(৪) আবদুল্লাহ ইবনু আমের (রাঃ) (৫) আবদুল্লাহ ইবনু সায়াদ ইবনে আবী ছারাহ (রাঃ)।

সুধী সমাজ ! এখন ৪৭-এর মধ্যে তিনের পরিমাণ লক্ষ্য করুন এবং মৌদুদী সাহেবের কুখ্যাত পুস্তকে ৯৯ পৃষ্ঠার একটি উদ্ধৃতির বিচার করুন—

خلیفہ اس امر کا پابند ہے کہ وہ اپنے قبیلے کے ساتھ کوئی امتیازی برتاؤ نہ کریگا مگر بد قسمتی سے خلیفۂ ثالث حضرت عثمان اس معاملے میں معیار مطلوب قائم نہ رکھ سکے انکے عہد میں بنی امیہ کثرت سے بڑے بڑے عہدے اور بیت المال سے عطیے دیے گئے

"খলীফা ওমরের নির্দ্দেশ ছিল, পরবর্ত্তী খলীফা বাধ্য থাকিবেন, তিনি নিজ বংশের সহিত কোন বিশেষ প্রীতিজনক ব্যবহার করিবেন না। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমান (রাঃ) এই ব্যাপারে সন্তোষজনক (Balance) সামঞ্জস্য বা সমতা রক্ষা করিতে পারেন নাই। তাঁহার আমলে (তাঁহার বংশ) উমাইয়া বংশের লোকদিগকে বেশী পরিমাণে বড় বড় সরকারী পদ এবং সরকারী ধনভাণ্ডার হইতে সম্পদ দান করা হইয়াছে।"

সুধীবৃন্দ! খলীফা ওসমানের প্রতি মৌদুদী সাহেবের এই ধৃষ্টতাপূর্ণ অপবাদ মূলক উক্তি সম্মুখে রাখিয়া আর একটি তথ্য জ্ঞাত হইলে অধিক মর্ম্মাহত হইবেন যে, মৌদুদী সাহেব খলীফা ওসমানের বদনামী রটাইতে কি ধূম্রজাল সৃষ্টি করিয়াছেন! সেই তথ্যটি হইল একটি সত্য ইতিহাস—খলীফা ওসমানের উমাইয়া বংশের উক্ত তিন জন আমেলের মধ্যে দুই জনই ছিলেন বহু পূর্ব্ব হইতে স্বয়ং খলীফা ওমর কর্ত্তৃক নিয়োজিত। তাঁহাদের নিয়োগ খলীফা ওসমান কর্ত্তৃক ছিল না, বরং খলীফা ওমর কর্ত্তৃক ছিল। এতদ্ভিন্ন ৪৭ জন আমেলের মধ্যে যে পাঁচ জন আমেল খলীফা ওসমানের আত্মীয় ছিলেন তাঁহাদের আত্মীয়তার সূত্রের দুরত্ব অনুধাবন করিলে জ্ঞানী মাত্রই বলিতে বাধ্য হইবেন যে, এত দুরের আত্মীয়তা অভিযোগের কারণ হইতে পারে না। বরং শুধু খলীফা ওসমান (রাঃ)কে অভিযুক্ত করার জন্যই শত্রুগণ কর্ত্তৃক খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া খোঁজ করতঃ উহার সন্ধান দেওয়া হইয়াছে। উক্ত পাঁচ জনের জীবন-ইতিহাস পর্য্যালোচনায় আরও বহু তথ্যের উদ্ঘাটন হইবে; যদ্দ্বারা আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেক ও তাহার সমর্থকদের মুখ আপনা আপনিই কালা হইয়া যাইবে। ধারাবাহিকরূপে উক্ত পাঁচ জনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করা হইতেছে—

মোয়াবিয়া (রাঃ) ঃ

মৌদুদী সাহেব মোয়াবিয়া (রাঃ) সম্পর্কে দুই শ্রেণীর অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছেন। এক শ্রেণীর হইল—মোয়াবিয়া (রাঃ) কর্ত্তৃক খলীফা ওসমানের হত্যাকারী সন্ত্রাসবাদীদের শাস্তির দাবী উত্থাপন সম্পর্কে। বস্তুতঃ ইহাই মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রতি মৌদুদী সাহেবের আক্রোশের বড় কারণ। এই আক্রোশেই তিনি বে-সামাল হইয়া পুস্তকের ১২৪ হইতে ১২৭ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত বহু অকথ্য কথার সমাবেশ করিয়াছেন। ইহা সমালোচনার জন্য সুদীর্ঘ প্রবন্ধের আবশ্যক। আমরা এস্থানে উল্লেখিত পৃষ্ঠাগুলি হইতে কতিপয় নমুনার উদ্ধৃতি দিব।

খলীফা ওসমানের হত্যাকারী সন্ত্রাসবাদীদের শাস্তি-দাবী সম্পর্কে মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিরুদ্ধে মৌদুদী সাহেবের চার্জ্জসিটে এই তিনটি অভিযোগও রহিয়াছে—(১) হত্যাকারী সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে শাসন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট কোন মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছিল না। সুতরাং কর্ত্তৃপক্ষের উপর তাহাদের শাস্তির কোন দাবী উঠিতেই পারে না। অতএব এই দাবী বেআইনী এবং অন্ধকার যুগের রীতির অন্তর্ভুক্ত। (২) মোয়াবিয়া (রাঃ) হত্যাকৃত খলীফা ওসমানের ওয়ারেস বা উত্তরাধিকারী তথা নিকটবর্ত্তী আত্মীয় ছিলেন না। সুতরাং খলীফা ওসমানের হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করা বা তাহাদের

শাস্তি-দাবী করার অধিকার মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহুর ছিল না। অতএব তাঁহার এই কার্য্য বেআইনী ও শরিয়ত বিরোধী ছিল। (৩) মোয়াবিয়া (রাঃ) এই দাবী করেন নাই যে, আলী (রাঃ) তাহাদিগকে শাস্তি দান করুক, তাঁহার দাবী ছিল, তাহাদিগকে আমার হাওয়ালা করা হউক; আমি তাহাদিগকে প্রাণদণ্ড দিব। মোয়াবিয়ার এই দাবী অন্যায় ও অযৌক্তিক ছিল।

মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিরুদ্ধে এই চার্জ্জ-সিটের ব্যাপারে মৌদুদী সাহেব সাধারণ জ্ঞান পরিপন্থী এবং দিবালোকের ন্যায় সত্য ইতিহাসের সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলিয়াছেন। প্রথম দুইটি অভিযোগ নিছক ভুল। কারণ, যে কোন নরহত্যার মোকদ্দমা দায়ের করা না হইলেও আসামীদিগকে শাস্তি দেওয়া শাসন কর্তৃপক্ষের অবশ্য কর্ত্তব্য। এমনকি কেহ বাদী না হইলেও গভর্ণমেন্ট বাদী হইয়া আসামীদের শাস্তি বিধান করিতে হইবে। শাসন কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে গড়িমশি করিলে জন-সাধারণ উহার দাবী উত্থাপন করিতে পারিবে না—এরূপ কোন যুক্তিও নাই, শরীয়তের মছআলাহও নাই।

কেছাছ—খুনের বদলে খুনের মছআলাহ সম্পর্কে নিকটবর্ত্তী ওলীর দাবী শর্ত্ত রহিয়াছে; মৌদুদী সাহেব সেই মছআলাহ দ্বারা মতলব সিদ্ধির ইচ্ছা করিয়াছেন। ইহা তাঁহার ঘোর অজ্ঞতার পরিচয়। লক্ষ্য করুন, আলী (রাঃ)কে এই সন্ত্রাসবাদী দলেরই সদস্য আবদুর রহমান ইবনে মোলজেম শহীদ করিয়াছিল এবং আসামী ধরা পড়িলে তাহাকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হইয়াছিল। অথচ আলী রাজিয়াল্লাহু আনহুর নিকটবর্ত্তী ওলীদের মধ্যে তাঁহার পুত্র আব্বাস নাবালেগ ছিলেন। কেছাছের বিধানে অনেক ইমামের মতে ইহা একটি অন্তরায়। কিন্তু কোন প্রকার অপেক্ষা ব্যতিরেকেই আসামীকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হইয়াছিল। এ সম্পর্কে আলেমগণ লিখিয়াছেন—لانه كان قتله حدا لا قصاصا "অর্থাৎ এই প্রাণদণ্ড কেছাছ-রূপে ছিল না, বরং বিদ্রোহের সাজা ছিল।" (বেদায়াহ-ওয়ান-হেয়াহ, ৮—১৫)

মানুষের অল্প বিদ্যা অনেক সময় বোকামীর কারণ হইয়া পড়ে। আলোচ্য বিষয়ে মৌদুদী সাহেবের সেই অবস্থাই হইয়াছে। সাধারণ হত্যার ক্ষেত্রে কেছাছের বিধানে যে সব শর্ত্ত আবশ্যক খলীফা ওসমানের হত্যার ঘটনায়ও তিনি তাহাই হাঁকিয়াছেন। অথচ ইহা সাধারণ হত্যা ছিল না, ইহা ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহজনক হত্যাকাণ্ড; ইহার মছআলাহ সাধারণ হত্যার মছআলাহ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

তৃতীয় অভিযোগটি যে, কি মিথ্যা অভিযোগ তাহাও ইতিহাসের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করুন। আলী (রাঃ) মোয়াবিয়া (রাঃ)কে আনুগত্যের আহ্বান জানাইয়া

বিশিষ্ট ছাহাবী জরীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)কে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া ছিলেন। মোয়াবিয়া (রাঃ) বিশিষ্ট ছাহাবী আমর-ইবনুল-আছ (রাঃ)কে এবং সিরিয়ার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে একত্র করিয়া পরামর্শ পূর্ব্বক উহার উত্তর দিয়া ছিলেন। সেই উত্তরের মর্ম্ম ইতিহাসে এরূপ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে—

"তাঁহারা আনুগত্যের অঙ্গীকার দানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলেন যাবৎ না আলী (রাঃ) খলীফা ওসমানের হত্যাকারীগণকে প্রাণদণ্ড দান করেন বা আসামী-গণকে তাঁহাদের হাওয়ালা করেন, যেন তাঁহারা প্রাণদণ্ড দানে সমর্থ হন।"

(বেদায়াহ, ৭—২৫৩)

ইতিহাসের এই বর্ণনায় স্পষ্টতঃই দেখা যায়, মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মূল দাবী ইহাই ছিল যে, আলী (রাঃ) অপরাধীগণকে শাস্তি প্রদান করেন। এই ইতিহাস হইতে চোখ বন্ধ করিয়া মৌদুদী সাহেব মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর উপর অভিযোগ করিয়াছেন যে, তিনি নিজে শাস্তি প্রদানের দাবী করিয়াছিলেন—ইহা তাঁহার অন্যায় ছিল। এই অভিযোগটা কিরূপ সত্যের অপলাপ তাহা পাঠকেরই বিচার্য্য।

মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি আক্রোশ ত্যাগ করার জন্য মৌদুদী সাহেব যদি এই সত্যটি উপলব্ধি করিতেন তবে ভাল হইত যে, খলীফা ওসমানের হত্যার অপরাধীগণের শাস্তির দাবী একা মোয়াবিয়া (রাঃ)ই করিয়া ছিলেন না। বরং সিরিয়া এলাকায় বিশিষ্ট ছাহাবী আমর-ইবনুল-আছ (রাঃ) এবং আরও ছাহাবীগণ সহ তথাকার সমস্ত মোসলমানগণেরই এই দাবী ছিল। এতদ্ভিন্ন উম্মুল-মোমেনীন আয়েশা (রাঃ) এবং আশারা-মোবাশ্শারাহ হইতে তাল্হা (রাঃ) যোবায়ের (রাঃ) সহ আরও বহু ছাহাবী এবং কুফা ও বছরা এলাকার অগণিত মোসলমানেরই এই দাবী ছিল।

মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে মৌদুদী সাহেবের দ্বিতীয় শ্রেণীর অভিযোগগুলি হইল তাঁহার খেলাফত-আমলের কার্য্যবিধি সম্পর্কে। সেই সব অভিযোগ খণ্ডনের পূর্ব্বে প্রয়োজনীয় একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পেশ করা হইতেছে।

আবদুল্লাহ ইবনে সাবার সন্ত্রাসবাদী মোনাফেকগোষ্ঠীর দ্বারা গঠিত খারেজী দলের ঘাতক কর্তৃক আলী (রাঃ) শহীদ হইয়া গেলেন। আর তাঁহার বড় ছেলে হাসান (রাঃ) তাঁহার স্থলে খলীফা নির্ব্বাচিত হইলেন। হাসান (রাঃ) অতিশয় বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার সম্পর্কে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একটি সুপ্রসিদ্ধ ভবিষ্যদ্বাণীও ছিল যে, তাঁহার দ্বারা মোসলমানদের

দুইটি বিরোধমান পক্ষের মধ্যে মীমাংসা ও বিরোধের অবসান হইবে (বোখারী শরীফ)। হাসান (রাঃ) খলীফা নির্ব্বাচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সেই অকাট্য ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হওয়ার কাজ অগ্রসর হইল। হাসান (রাঃ) এবং তাঁহার সমর্থক কুফা ও ইরাকবাসী মোসলমান, আর অপর দিকে মোয়াবিয়া (রাঃ) এবং তাঁহার সমর্থক সিরিয়াবাসীগণ—এই উভয় পক্ষের মধ্যেও আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেক দলের ধারাবাহিক ষড়যন্ত্র দ্বারা রক্তক্ষয়ী বিরোধ সৃষ্টি হইতে ছিল। সেই বিরোধের অবসান চেষ্টায় হাসান (রাঃ) হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়নের কাজ আরম্ভ করিলেন। উহাতে সন্ত্রাসবাদী দলটি চিরাচরিতরূপে মোসলমানদের ঐক্য প্রতিষ্ঠায় নিজেদের প্রমাদ গণিল এবং তাহারা হাসান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিরুদ্ধেও ক্ষেপিয়া উঠিল। এমনকি এক সময় তাহারা তাঁহার উপর আক্রমণও করিয়া বসিল এবং তাঁহার সব কিছু লুণ্ঠন করিয়া নিল। এতদৃষ্টে হাসান (রাঃ) মোসলমানদের ঐক্য প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং অধিক তৎপর হইলেন। মোসলমানদের সর্ব্বনাশকারী এই মোনাফেক সন্ত্রাসবাদী পঞ্চম বাহিনীকে দমাইবার কাজে মোয়াবিয়া (রাঃ)কেই একমাত্র উপযুক্ত মনে করিয়া হাসান (রাঃ) খেলাফতের পদ তাঁহার পক্ষে ত্যাগ করিলেন এবং স্বতস্ফুর্তভাবে এই পদে মোয়াবিয়া (রাঃ)কে বসাইলেন ও বরণ করিলেন। এইভাবে হিজরী ৪১ সনে মোয়াবিয়া (রাঃ) হাজার হাজার ছাহাবা সম্বলিত মোসলেম সমাজের সর্ব্বসম্মত খলীফা নির্ব্বাচিত হইলেন। সমগ্র মোসলেম সমাজের মুখে এবং ইতিহাসেও ঐ বৎসরটিকে “عام الجماعة—ঐক্যের বৎসর” বলা হইয়াছে। (বেদায়াহ, ৮—২১)

ঐক্যমতপূর্ণ সর্ব্বসম্মত খেলাফত পদে অধিষ্ঠিত হইয়া মোয়াবিয়া (রাঃ) ঐ মোনাফেক সন্ত্রাসবাদী বাহিনীকে দমন করাই নিজের প্রথম কর্ত্তব্য রূপে নির্দ্ধারিত করিলেন। তাহাদের বিরুদ্ধে তিনি খড়্গহস্ত হইয়া দাঁড়াইলেন। বিশেষতঃ উক্ত দলের আবির্ভাব সম্পর্কে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করিতে যাইয়া হস্ত উত্তোলন করতঃ ইরাকের দিকে ইশারা করতঃ বলিয়াছিলেন, ঐ অঞ্চল হইতে তাহাদের আবির্ভাব হইবে (বোখারী শরীফ)। বস্তুতঃ ঘটিয়াছিলও তাহাই। ইরাকের কেন্দ্রীয় এলাকা বছরা ও কুফাই উক্ত সন্ত্রাসবাদী দলটির তৎপরতার ঘাটি ছিল। মোয়াবিয়া (রাঃ) সেই বছরা ও কুফায় সন্ত্রাসবাদ কার্য্যকলাপ বন্ধের জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। এই কঠোরতা ছাড়া মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর দীর্ঘ ২০ বৎসর খেলাফত আমলের অবস্থা ইতিহাসের এই সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতেই আঁচ করা যায়—

"মোয়াবিয়া (রাঃ) হিজরী ৪১ সনে সর্ব্বসম্মতরূপে খলীফা নির্ব্বাচিত হইয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকাকালে বহিঃশত্রুদের এলাকায় জেহাদ পূর্ণোদ্যমে জারী ছিল, আল্লার কলেমা তথা ইসলামের প্রতিপত্তি সর্ব্বত্র বিরাজমান ছিল, চতুর্দিক হইতে শত্রুপক্ষের বিজিত ধন-সম্পদের সমাগম ছিল, তাঁহার সময়ে মোসলমানগণ শান্তি এবং ন্যায়-পরায়ণতার মধ্যে দিন কাটিতে ছিল এবং দয়া ও ক্ষমা উপভোগ করিতে ছিল।" (বেদায়াহ, ৮—১১৯)

ইহা অতি সুস্পষ্ট যে, মোয়াবিয়া (রাঃ) উক্ত মোনাফেক সন্ত্রাসবাদী দলটির বিরুদ্ধে যেরূপ খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন তদ্রূপ তাহারাও তাঁহার বিরুদ্ধে আদা-জল খাইয়া লাগিয়া ছিল। খলীফা ওসমানের বিরুদ্ধে তাহারা তাহাদের যে স্বাভাবিক অস্ত্র ব্যবহার করিয়াছিল অর্থাৎ মিথ্যার বহর ছড়াইয়া দেওয়া—সেই অস্ত্রই তাহারা মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধেও অধিক ধারালরূপে বিরামহীনভাবে চালাইয়া গেল। সেই সব প্রচারণা গোয়েবলের প্রচার-বিজ্ঞান অনুসারে ইতিহাসে পরিণত হইয়াছিল। মৌদুদী সাহেব কুখ্যাত পুস্তকের ১৪৭ পৃষ্ঠা হইতে ১৭৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত সেই সব মিথ্যা আমদানি করিয়াই মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহুর ন্যায় হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ঘনিষ্ঠ ও বিশিষ্ট ছাহাবী এবং আল্লার প্রেরিত কালামে-পাকের ওহী লিখকরূপে স্বয়ং রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক নিয়োজিত ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের উপর অত্যন্ত জঘন্যভাবে কালিমা লেপন করিয়াছেন। এরূপ কুকীর্ত্তি ইতিপূর্ব্বে আর কেহ করিয়াছে বলিয়া দেখা যায় না। এই কলির যুগে আরও দুই-এক জন সৈয়দ সাহেব তাহাদের পুথি-পুস্তকে মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহুকে কলঙ্কিত করার দুই-চারটা কথা লিখিয়াছেন বটে। কিন্তু সৈয়দ মৌদুদী সাহেব সেই সব সৈয়দ সাহেবানদের সমুদয় কোশেশের সমষ্টিকেও ছাড়াইয়া গিয়া আরও অধিক অগ্রসর হওয়ার কোশেশ করিয়াছেন। এই শ্রেণীর সৈয়দ সাহেবানরা যদি মনে করিয়া থাকেন, তাঁহারা আলী রাজিয়াল্লাহু আনহুর বংশধর বিধায় তাঁহার বিপক্ষ মোয়াবিয়ার গ্লানি প্রচার করিয়া তাঁহারা নিজ বংশের হক আদায় করিতেছেন তবে তাঁহারা ভুল করিয়াছেন। কারণ সৈয়দ বংশের জ্যেষ্ঠ গোড়া হাসান (রাঃ) নিজেই মোয়াবিয়া (রাঃ)কে খলীফা বানাইয়া এবং বরণ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন আলী রাজিয়াল্লাহু আনহুরই ন্যায় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অপর এক চাচাত ভাই বিশিষ্ট ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের একটি হাদীছ বোখারী শরীফ হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে যে, বেতের নামায সম্পর্কে এক ব্যক্তি মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি কটাক্ষ করিলে, ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন— دعه فانه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم "তাঁহার সমালোচনা করিও না; তিনি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবী।"

সৈয়দ সাহেবানরা যদি এই সতর্কবাণীটি অনুসরণ করিতেন তবে উহা তাহাদেরও মঙ্গল ছিল এবং সমাজেরও তাহাতেই মঙ্গল হইত।

দ্বীন-ঈমানহীন, ন্যায় ও সততাবিহীন শাসকগোষ্ঠী বা জুলুমবাজদের এই নীতি দেখা যায় যে, মানুষের চোখে ধূল দিয়া, আইনের আড়ালে বিপক্ষকে হেস্তনেস্ত করার জন্য তাহার বিরুদ্ধে অতিরঞ্জিত ও মিথ্যা চার্জ্জসিট বা অভিযোগপত্র সাজান হইয়া থাকে। পরম পরিতাপের বিষয় - মৌদুদী সাহেব মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে ঠিক সেই পথই অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী মোনাফেক দলের অপবাদ ও অপপ্রচার কুড়াইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, বরং তাঁহার বিরুদ্ধে সাত দফা অপবাদের চার্জ্জসিট বা অভিযোগপত্র সাজাইয়াছেন। উহা যে কি সব অতিরঞ্জিত মিথ্যা উক্তি ও গর্হিত কথার সমবায় তাহা ইতিহাস-প্রমাণের সহিত বিস্তারিত বর্ণনা করিতে গেলে, এই বিষয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যাই বক্ষমান প্রবন্ধের মূল পৃষ্ঠা সংখ্যা হইতে অধিক হইয়া যাইবে।+

এই প্রবন্ধে মোয়াবিয়া (রাঃ) সম্পর্কে শুধু একটা বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইবে। তাহা এই যে—খলীফা ওসমানের গভর্ণরদের মধ্যে মোয়াবিয়া (রাঃ)ও একজন ছিলেন। তিনি ছিলেন খলীফা ওসমানের খান্দান তথা উমাইয়া বংশের। এই সূত্রে মৌদুদী সাহেব খলীফা ওসমানের বিরুদ্ধে স্বজন-প্রীতির অভিযোগ প্রমাণে মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নামও উল্লেখ করিয়াছেন।

মোয়াবিয়া (রাঃ) খলীফা ওসমানের ৪৭ জন গভর্ণরের মধ্যে তিন জন আত্মীয় গভর্ণরের একজন। কিন্তু খলীফা ওসমানের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক ও আত্মীয়তা শুধু এই ছিল যে, তাঁহাদের উভয়ের দাদার পিতা এক ছিল। অর্থাৎ উভয়ের বংশ চতুর্থ পোশ্‌তে মিলিত ছিল। অন্য কোন ঘনিষ্ঠতার খোঁজ আমরা পাই নাই। অথচ শুধু আর এক পোশ্‌ত পরেই তাঁহার বংশ হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বংশের সহিত মিলিত এবং তিনি হযরতের আপন শ্যালক ছিলেন। হযরত (দঃ) তাঁহাকে পবিত্র কোরআনের ওহী লিখক মনোনীত করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্পর্কে একদা ফেরেশতা জিব্রাঈল (আঃ) রসুলুল্লাহ (দঃ)কে বলিয়াছিলেন—

يا محمد اقرأ على معاوية السلام واستوص به خيرا فانه
امين الله على كتابه ووحيه ونعم الامين

+ মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রঃ) এই আলোচনায় একখানা পুস্তক সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন—"ভুল সংশোধন" উহাই তাঁহার জীবনের সর্ব্বশেষ সঙ্কলন।

"হে মোহাম্মদ (দঃ)! মোয়াবিয়াকে সালাম জানাইবেন, তাঁহার মঙ্গলের প্রতি বিশেষ নজর রাখিবেন। তিনি আল্লার কেতাব ও আল্লার ওহীর উপর আল্লার নিযুক্ত আমানতদার এবং উত্তম আমানাতদার।" (বেদায়াহ, ৮—১২০)

এস্থলে আমরা মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু সিরিয়ার গভর্ণর পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে খলীফা ওমরের ভূমিকার এবং খলীফা ওসমানের কার্য্যক্রমের একটা ফিরিস্তি ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে পাঠক সমক্ষে তুলিয়া ধরিতেছি। ইহা দ্বারা মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পদ প্রাপ্তির ব্যাপারে খলীফা ওসমানের অপরাধের পরিমাণ সহজেই ধরা যাইবে।

হিজরী ১৩ সন খলীফা আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর জীবনের সর্ব্বশেষ বৎসর। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি সিরিয়া অভিযানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সিরিয়ার প্রাণ-কেন্দ্র দামেশ্ক জয় হওয়ার মূহূর্ত্তে খলীফা আবু বকর (রাঃ) ইহজগৎ ত্যাগ করিলেন। এদিকে দামেশ্ক জয় হইল। সিরিয়ার সামরিক সর্ব্বাধিনায়ক আবু ওবায়দা (রাঃ) দামেশ্ক এলাকার শাসন পরিচালনার জন্য মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এজিদ ইবনে আবু সুফিয়ানকে তথাকার গভর্ণর নিযুক্ত করিলেন। ইহা খলীফা আবু বকরের অভিপ্রায় এবং ওয়াদা-অঙ্গীকারও ছিল। খলীফা ওমর (রাঃ)ও এই মনোনয়ন সমর্থন করিলেন। অতঃপর সামরিক সর্ব্বাধিনায়ক সিরিয়ার অন্য এলাকার দিকে মনোনিবেশ করিলেন এবং দামেশ্কের গভর্ণর এজিদ ইবনে আবুসুফিয়ান সমুদ্র উপকূলবর্ত্তী গুরুত্বপূর্ণ এলাকা সমূহ—বেরুত, ছায়দা, আরকা ইত্যাদির প্রতি অভিযান পরিচালনা করিলেন। ঐ সব অভিযানের অগ্রগামী অধিনায়ক রূপে মোয়াবিয়া (রাঃ) বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তখন তাঁহার বয়স ৩০।৩৩ বৎসর। ইতিপূর্ব্বে তিনি খলীফা আবু বকরের আমলে প্রসিদ্ধ জেহাদ জঙ্গে-ইয়ামামায় উপস্থিত ছিলেন এবং মোছায়লামা-কাজ্জাবকে নিহত করায় তিনিও শরীক ছিলেন অতঃপর তাঁহার কার্য্যস্থল সিরিয়ায়ই ছিল।

(বেদায়াহ ৮—১১৭, কামেল ২—২৯৬)

মাত্র এক বৎসরের মধ্যেই মোয়াবিয়ার প্রতি খলীফা ওমরের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। হিজরী ১৪ সনে তিনি দামেশ্কের গভর্ণরকে লিখিলেন, সিরিয়াস্থ কায়সারিয়ায় মোয়াবিয়াকে সর্ব্বাধিনায়ক মনোনীত করিয়া অভিযান পরিচালিত কর। খলীফা ওমর নিজেও মোয়াবিয়া (রাঃ)কে পত্র লিখিলেন—"আমি তোমাকে কায়সারিয়ার সর্ব্বাধিনায়ক মনোনীত করিলাম; তুমি তথায় রওয়ানা হইয়া যাও এবং ঐ দেশবাসীর মোকাবিলায় আল্লার দরবারে সাহায্য কামনা কর ইত্যাদি ইত্যাদি। আল্লার রহমতে মোয়াবিয়া (রাঃ) সেই দেশ জয় করিতে সক্ষম হইলেন। (কামেল ২—৩৪৬)

হিজরী ১৭ সনে খলীফা ওমর (রাঃ) মোয়াবিয়া (রাঃ)কে উর্দ্দুন তথা বর্ত্তমান জর্দ্দানের গভর্ণর নিয়োগ করেন ; তখন দামেশ্‌কের গভর্ণর ছিলেন মোয়াবিয়ার ভ্রাতা এজিদ ইবনে আবু সুফিয়ান (রাঃ)। (কামেল ২—৩৭৫)

হিজরী ১৮ সনে সিরিয়ায় প্লেগ মহামারী দেখা দেয় এবং দামেশ্‌কের গভর্ণর এজিদ ইবনে আবু সুফিয়ান ইন্তেকাল করেন।

فلما مات يزيد بن ابى سفيان وجاء البريد الى عمر بموته رد
عمر البريد الى الشام بولاية معاوية مكان اخيه يزيد

"খলীফা ওমরের নিকট দামেশ্‌কের গভর্ণর এজিদের মৃত্যু সংবাদ যে দুত বহন করিয়া নিয়া আসিয়া ছিল সেই দুতের নিকটই খলীফা ওমর (রাঃ) মৃত গভর্ণর এজিদের স্থলে তাঁহারই ভ্রাতা মোয়াবিয়ার নিয়োগপত্র দিয়া ফেরৎ পাঠাইলেন (বেদায়াহ ৮—১১৮)। আর মোয়াবিয়া স্বীয় স্থান জর্দ্দানের গভর্ণর পদে শোরাহবীল ইবনে হাসানাহ (রাঃ)কে নিয়োগ করিলেন। (কামেল ২—৩৯২)

এই বৎসর প্লেগ মহামারীতে সিরিয়ায় ২৫০০০ লোক মারা যায়। দেশের অবস্থা অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং রোমানদের মধ্যে সিরিয়ার মোসলমানদের উপর আক্রমণের লালসা মাথাচারা দিয়া উঠে। এতদ্ভিন্ন প্লেগ মহামারীতে নিশ্চিহ্ন পরিবার সমূহের বিষয়-সম্পত্তি নিয়া সমস্যা দেখা দেয়। সুতরাং সিরিয়াস্থ শাসন পরিচালকগণ খলীফা ওমর (রাঃ)কে সিরিয়া সফরের আহ্বান জানান। খলীফা ওমর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের পরামর্শে সিরিয়া পৌঁছিলেন। খলীফা ওমর সিরিয়ায় পৌঁছিয়া তিনি তথাকার সীমান্ত পথসমূহ বন্ধ করিয়া সীমান্তের ঘাটিসমূহের পুনঃর্গঠন করিলেন। ঐ দেশের সমুদয় এলাকা পরিভ্রমণ করিয়া জর্দ্দানের নূতন গভর্ণর শোরাহবীল ইবনে হাসানাহ (রাঃ)কে অন্যত্র সরাইয়া দিয়া জর্দ্দানের গভর্ণরও মোয়াবিয়া (রাঃ)কেই করিলেন। এই উপলক্ষে খলীফা ওমর (রাঃ) একটি বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ উক্তি করিয়াছিলেন যে—

انى لم اعزله عن سخطة ولكنى اريد رجلا اقوى من رجل

"শোরাহবীল ইবনে হাসানাহকে তাঁহার কোন ত্রুটি বা তাঁহার প্রতি বিরূপ হইয়া আমি তাহাকে অপসারণ করি নাই, বরং তদপেক্ষা অধিক মজবুত ও প্রজ্ঞাশীল একজন গভর্ণর আমি চাহিয়াছি।" (কামেল ২—৩৯৩)

স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, খলীফা ওমর ফারুকের নজরে মোয়াবিয়া (রাঃ) রাজনৈতিক প্রজ্ঞাশীল এবং মজবুত গভর্ণর ছিলেন। সেই জন্যই খলীফা ওমর কর্ত্তৃক মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর দ্রুত পদোন্নতি হইয়া ছিল। হিজরী ১৪সনে সর্ব্বপ্রথম ওমর ফারুক (রাঃ) তাঁহাকে কায়সারিয়া অভিযানের সর্ব্বাধিনায়ক মনোনীত

করেন। অতঃপর ১৭ সনে তিনি তাঁহাকে উর্দ্দুনের গভর্ণর নিযুক্ত করেন। তারপর ১৮ সনের প্রথম দিকে তাঁহাকে উর্দ্দুনের গভর্ণর হইতে উন্নীত করিয়া দামেশ্‌কের গভর্ণর করেন এবং ঐ বৎসরেরই শেষ দিকে খলীফা ওমর (রাঃ) স্বয়ং সিরিয়ার সমুদয় এলাকা পরিদর্শন করিয়া আবশ্যক বোধে দামেশ্‌ক তথা সিরিয়ার সাথে উর্দ্দুন এলাকাও মোয়াবিয়ার শাসনাধীনে প্রদান করেন।

فاجتمع لمعاوية الاردن ودمشق "মোয়াবিয়ার শাসনে উর্দ্দুন এবং দামেশ্‌ক একত্রিত হইয়া গেল।" (কামেল ৩—৫৮)

এইভাবে মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর কার্য্যদক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা দৃষ্টে খলীফা ওমর ফারুক (রাঃ) কর্তৃক তাঁহার পদোন্নতি হয় এবং সিরিয়ার বিভিন্ন প্রদেশ তাঁহার শাসন ভুক্ত হইতে থাকে। এমনকি হিজরী ২১ সনে মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহুর শাসনে সিরিয়ার সমুদয় সীমান্তবর্ত্তী এলাকা সহ আরও পাঁচটির অধিক প্রদেশ প্রদান করা হয়—

وكان معاوية على البلقاء والاردن وفلسطين والسواحل
وانطاكية وغير ذلك

"হিজরী ২১ সনে মোয়াবিয়ার শাসনে সিরিয়ার এই সব এলাকা ছিল—বল্‌কা, উর্দ্দুন, ফেলিস্তিন উপকূলবর্ত্তী সমুদয় এলাকা, আন্‌তাকিয়া এবং আরও অন্যান্য।" (বেদায়াহ ৭—১১৩, কামেল ৩—৯, তবরী ৩—২২৭)

এস্থলে একটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে—উল্লেখিত ইতিহাস গ্রন্থসমূহেই উক্ত হিজরী ২১ সনে তৎকালীন বৃহত্তম সিরিয়ার অপর পাঁচটি এলাকা—দামেশ্‌ক, হেমছ, হুরান, কান্নসীরীন, আল্‌জাযায়ের এই এলাকাগুলির গভর্ণর ওমায়ের ইবনে সায়াদ আনছারী (রাঃ) বর্ণিত রহিয়াছে এবং এই প্রমাণও সুস্পষ্টরূপে বিদ্যমান আছে যে, স্বয়ং খলীফা ওমর (রাঃ) ওমায়ের ইবনে সায়াদ (রাঃ)কে অপসারিত করিয়া তাঁহার এলাকাগুলি মোয়াবিয়া (রাঃ)কে অর্পণ করিয়াছিলেন* এই উপলক্ষেও খলীফা ওমর ফারুক (রাঃ) মোয়াবিয়া (রাঃ) সম্পর্কে এমন মন্তব্য করিয়াছিলেন যাহা মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে খচিত হওয়ার যোগ্য।

---

* এস্থলে ইতিহাসবিদ ইবনে আছীরের অপর একটি বর্ণনা দ্বারা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হইতে পারে। তাঁহার বর্ণনা এই—খলীফা ওমরের মৃত্যু বৎসর হেমছ ও কন্নসীরীনের গভর্ণর ওমায়ের ইবনে সায়াদ (রাঃ) ছিলেন। অতঃপর ওমায়ের (রাঃ) অসুস্থতার দরুণ খলীফা ওসমানের নিকট ইস্তিফানামা পেশ করতঃ স্বীয় পরিবারবর্গে ফিরিয়া আসার আবেদন

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

ছেহাহ-ছেত্তার হাদীছ গ্রন্থ তিরমিজি শরীফে বর্ণিত আছে—

لما عزل عمر بن الخطاب عمير بن سعد عن الشام وولى معاوية قال الناس عزل عمر عميرا وولى معاوية فقال عمر لا تذكروا معاوية الا بخير فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهد به

"খলীফা ওমর ফারুক (রাঃ) যখন ওমায়ের ইবনে সায়াদকে সিরিয়াস্থ এলাকা সমূহের গভর্ণর পদ হইতে অপসারিত করিয়া উহার শাসন ভার মোয়াবিয়াকে অর্পণ করিলেন, তখন লোকদের মধ্যে ইহার সমালোচনা হইল যে, ওমর (রাঃ) ওমায়ের (রাঃ)কে অপসারিত করিয়া তাঁহার ক্ষমতা মোয়াবিয়াকে অর্পণ করিয়ছেন। এই সমালোচনার উত্তরে খলীফা ওমর (রাঃ) ঘোষনা দিলেন, মোয়াবিয়ার সুনাম ভিন্ন বিরূপ সমালোচনা কেহ করিবে না। আমি হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)কে মোয়াবিয়া সম্পর্কে এই দোয়া করিতে শুনিয়াছি—আয় আল্লাহ! মোয়াবিয়ার দ্বারা হেদায়েত সম্প্রসারিত করিয়া দাও।"

আর এক হাদীছে আছে—খলীফা ওমর (রাঃ) যখন মোয়াবিয়া (রাঃ)কে শাসনকর্ত্তা নিয়োগ করিলেন তখন লোকদের মধ্যে সমালোচনা হইল যে, ওমর (রাঃ) কম বয়সের একটি যুবককে শাসনকর্ত্তা বানাইয়াছেন। তদুত্তরে ওমর (রাঃ) দৃপ্ত স্বরে বলিলেন, মোয়াবিয়াকে শাসনকর্ত্তা নিয়োগ করায় তোমরা সমালোচনা

করিলেন। খলীফা ওসমান তাঁহার আবেদন গ্রহণ করতঃ হেমছ ও কন্নসীরীন মোয়াবিয়ার শাসনাধীনে দিলেন। তারপর আব্দুর রহমান ইবনে আল্‌কামা যিনি ফিলিস্তিনের গভর্ণর ছিলেন তাঁহার মৃত্যুর পর খলীফা ওসমান (রাঃ) ফিলিস্তিনকেও মোয়াবিয়ার শাসনে দিয়া দিলেন। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতেই পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, হিজরী ২১ সনে খলীফা ওমরের সময় ফিলিস্তিন অন্যান্য প্রদেশের সহিত মোয়াবিয়ার শাসনেই ছিল।

বিভিন্ন ইতিহাসবিদের বর্ণনার সমন্বয় সাধনে বলা যাইতে পারে যে, ২১ হিজরীর পর ওমায়ের (রাঃ) অপসারিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার ক্ষমতা মোয়াবিয়া (রাঃ)কে অর্পণ করা হইয়াছিল। অতঃপর পুনরায় পাঁচটি হইতে শুধু দুইটি তথা হেমছ ও কন্নসীরীন এলাকাদ্বয়ের শাসন ওমায়ের (রাঃ)কে দেওয়া হইয়াছিল এবং খলীফা ওসমানের আমলে উহা হইতে তিনি ইস্তিফা দিলে পুনরায় মোয়াবিয়া (রাঃ)কে দেওয়া হয়, কারণ খলীফা ওমরের আমলে একবার এই এলাকাদ্বয় মোয়াবিয়ার অধীনেই ছিল। তদ্রূপ ফিলিস্তিন হিজরী ২১ সনে মোয়াবিয়ার শাসনে ছিল। অতঃপর উহাকে ভিন্নরূপে আব্দুল রহমান ইবনে আলকামার শাসনে দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর পুনরায় উহাকে মোয়াবিয়ার শাসনে দেওয়া হয়, কারণ পূর্ব্বেও উহা তাঁহারই শাসনে ছিল।

করিতেছ ? আমি তাহার সম্পর্কে রসুলুল্লাহ (দঃ)কে এইরূপ দোয়া করিতে শুনিয়াছি—اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به।

“আয় আল্লাহ ! মোয়াবিয়াকে হেদায়েত প্রাপ্ত ও হেদায়েত দানকারী বানাইয়া দাও এবং তাহার দ্বারা হেদায়েত সম্প্রসারিত কর। (বেদায়াহ, ৮—১২২)

খলীফা ওমর ফারুক (রা.) হিজরী ১৭ সনে মোয়াবিয়া (রাঃ)কে গভর্ণর নিয়োগ করার পর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত দীর্ঘ আট বৎসরকাল তাঁহাকে সিরিয়ার বিভিন্ন এলাকার গভর্ণর রাখিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, বরং ক্রমান্বয়ে তাঁহার ক্ষমতা প্রশস্ত করতঃ সিরিয়ার বহু সংখ্যক এলাকাকে তাঁহার অধীন করিয়াছিলেন। তিনি মোয়াবিয়া (রাঃ)কে প্রজ্ঞাশীল মজবুত গভর্ণর বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। মোয়াবিয়ার বিরুদ্ধে সমালোচনাকে তিনি পছন্দ করিতেন না এবং ঐরূপ সমালোচনার উত্তরে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাদীছ দ্বারা মোয়াবিয়ার ফজিলত প্রমাণিত করিয়াছেন।

সুধী সমাজ ! উল্লেখিত ইতিহাসের দীর্ঘ আলোচনা সম্মুখে রাখিয়া বিচার করুন মোয়াবিয়ার ক্ষেত্রে খলীফা ওসমানের স্বজন-প্রীতির অপরাধ কি হইতে পারে ? খলীফা ওমর ফারুক (রাঃ) মোয়াবিয়া (রাঃ)কে তাঁহার কার্য্যদক্ষতা এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞা দৃষ্টে দীর্ঘ আট বৎসর কাল একাধারে সিরিয়ার গভর্ণর পদে বহাল রাখিয়া ছিলেন এবং খলীফা ওমরের অছিয়ত দৃষ্টে তাঁহার মৃত্যুর পর আরও এক বৎসর সেই পদে বহাল থাকার অধিকারী ছিলেন। খলীফা ওমর ফারুক (রাঃ) বৃহত্তম শত্রুর সীমান্ত দেশ সিরিয়ার জন্য একমাত্র মোয়াবিয়াকেই যোগ্য ও আবশ্যকীয় গণ্য করিয়াছিলেন। এমতাবস্থায় খলীফা ওসমানও মোয়াবিয়ার কার্য্যদক্ষতা, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং অধিক অভিজ্ঞতা দৃষ্টে যদি আরও এগার বৎসর তাঁহাকে তাঁহার পদে বহাল রাখিয়া থাকেন তবে তাহা কি অপরাধ হইতে পারে ? যদি ইহা অপরাধ হয় তবে ত এই অপরাধের প্রথম আসামী ওমর (রাঃ) সাব্যস্ত হইবেন।×

× মৌহুদী সাহেব খলীফা ওসমান (রাঃ)কে দোষী সাব্যস্ত করার চেষ্টায় এই ক্ষেত্রে আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকের প্রচেষ্টাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছেন। আবদুল্লাহ ইবনে সাবা ত খলীফা ওসমানের বিরুদ্ধে স্বজন-প্রীতির অবাস্তব অপবাদই রটাইয়া ছিল, আর মৌহুদী সাহেব সেই মিথ্যা অপবাদকে দাঁড় করাইবার জন্য সত্য ইতিহাসকে গোপন করাই নয় শুধু বরং সত্য ইতিহাসের বিপরীত ইতিহাস গড়াইয়াছেন।

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

খলীফা ওমরের পুত্র বিশিষ্ট ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ওসমানের বিরুদ্ধে এই শ্রেণীর অপবাদ মূলক অভিযোগ দৃষ্টেই স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন—

لقد عتبوا على عثمان اشياء لو فعلها عمر ما عتبوا عليه

"এক শ্রেণীর লোক খলীফা ওসমানের বিরুদ্ধে এমন এমন কার্য্যকে অভিযোগ-রূপে রটাইয়াছে যাহা খলীফা ওমর করিলে কখনও উহাকে অভিযোগ গণ্য করা হইত না। (এস্তিয়াব)

ওলীদ হইনে ওকবাহ (রাঃ) ঃ

খলীফা ওসমানের উপর স্বজন-প্রীতির অপবাদ চাপাইবার জন্য তাঁহার ৪৭ জন আমেলের মধ্যে মৌদুদী সাহেব দ্বিতীয় যে ব্যক্তিকে খুঁজিয়া বাহির করিতে সক্ষম হইয়াছেন তিনি হইলেন ছাহাবী ওলীদ ইবনে ওকবাহ (রাঃ)। তিনি উমাইয়া বংশের ছিলেন, কিন্তু খলীফা ওসমানের সঙ্গে তাঁহার বংশ মিল অনেক দুরের ছিল। তাঁহার দাদার দাদা খলীফা ওসমানের দাতার পিতা ছিলেন।

তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে অন্য একটু আত্মীয়তাও ছিল। পাঠকবর্গ উহার বিবরণও শুনুন এবং উহার দ্বারা স্বজন-প্রীতির বিচার করুন। ওলীদ ইবনে ওকবাহ (রাঃ) খলীফা ওসমানের শুধু মা সম্পর্কীয় ভাই ছিলেন—অর্থাৎ তাঁহার মাতার বিবাহ অপর এক স্বামীর সহিত হইয়া ছিল, সেই স্বামীর পক্ষে ওলীদ ইবনে ওকবাহ (রাঃ) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অথচ মাতার দিক দিয়া ওলীদ ইবনে ওকবাহ হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছিলেন। হযরতের আপন ফুফুর মেয়ে ছিলেন ওলীদের মাতা। এই সূত্রেই স্বয়ং খলীফা ওসমান (রাঃ) সন্ত্রাসবাদীদের অভিযোগের উত্তরে বলিয়াছিলেন, "ওলীদ ইবনে ওকবাহ মাতার দিক দিয়া আমার আত্মীয় বটে, কিন্তু মাতার দিক দিয়া ত সে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)এরও ঘনিষ্ঠ। (আল-আওয়াছেম)

তিনি তাহার কুখ্যাত পুস্তকের ১০৮ পৃষ্ঠায় কি ধৃষ্ঠতাপূর্ণ মিথ্যা উক্তি করিয়াছেন যে, খলীফা ওমর মোয়াবিয়াকে শুধু দামেশ্‌কের গভর্ণর করিয়াছিলেন। অথচ বেদায়াহ, তবরী, কামেল-ইবনে আছীর সমুদয় ইতিহাস গ্রন্থেই লেখা রহিয়াছে--হিজরী ২১ সনে খলীফা ওমর মোয়াবিয়াকে সিরিয়ার গুরুত্বপূর্ণ সমুদয় উপকূলবর্ত্তী এলাকা এবং আরও ছয়টি প্রদেশের একক গভর্ণর মনোনীত করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য এলাকার গভর্ণর ওমায়ের (রাঃ)কে অপসারিত করিয়া তাঁহার সমুদয় ক্ষমতাও মোয়াবিয়াকে অর্পণ করিয়াছিলেন। উহার সুদীর্ঘ আলোচনা ইতিহাস গ্রন্থের উদ্ধৃতির মাধ্যমে পাঠ করিয়াছেন।

ওলীদ ইবনে ওকবা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সঙ্গে খলীফা ওসমানের বংশীয় সম্পর্ক এবং আত্মীয়তার দুরত্ব অনুধাবনের পর তাঁহার ব্যক্তিত্বের পরিচয়ও লাভ করুন। ওলীদ ইবনে ওকবাহ (রাঃ) হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একজন ছাহাবী ছিলেন। স্বয়ং হযরত (দঃ) তাঁহাকে বাইতুল-মাল তথা সরকারী ধন-ভাণ্ডারের জন্য লোকদের নিকট হইতে যাকাত, ওশর ইত্যাদি ওসুল করার আমেল বা কর্ম্মকর্ত্তা নিয়োগ করিয়াছিলেন। খলীফা ওমর ফারুক (রাঃ) ওলীদকে আলজাযায়েরের গভর্ণর পদে অধিষ্ঠিত করিয়া ছিলেন। তাঁহার ব্যক্তিগত গুণাবলী সম্পর্কে এক বাক্যে সমস্ত ইতিহাস লিখকগণ যে কয়টি সংক্ষিপ্ত বাক্য লিখিয়াছেন এস্থলে উহার উদ্ধৃতিই যথেষ্ট—

كان احب الناس...... خمس سنين وليس على داره باب

"তিনি তাঁহার শাসিতদের মধ্যে সর্ব্বাধিক প্রিয় ছিলেন এবং জনসাধারণের প্রতি সর্ব্বাধিক সদয় ছিলেন। পাঁচ বৎসর কাল তিনি কুফায় এইভাবেই শাসন পরিচালনা করিয়াছিলেন। এমনকি তাঁহার গৃহে দরওয়াজা ছিল না—জনসাধারণের জন্য তাঁহার গৃহ সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকিত।" (তবরী ৩—৩২৫)

খলীফা ওসমানের বংশের লোক তিনি ছিলেন বটে, কিন্তু খলীফা ওসমানের সঙ্গে তাঁহার মিল তিন পোশ্‌ত পূর্ব্বে; অথচ আর এক পোশ্‌ত পূর্ব্বে—আবদ-মনাফ পোশ্‌তে তাঁহার বংশ হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বংশে মিলিত হয়। খলীফা ওসমানের সামান্য আত্মীয়তাও তাঁহার সহিত ছিল। কিন্তু তাহাছিল শুধু মাতার দিক দিয়া। অথচ মাতার দিক দিয়া তিনি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামেরও ঘনিষ্ঠ ছিলেন। এই শ্রেণীর একজন লোককে দেখাইয়া খলীফা ওসমানের বিরুদ্ধে স্বজন-প্রীতির অভিযোগ করা কিরূপ ধৃষ্টতা তাহা পাঠক সমাজেরই বিচার্য্য।

আর অলীদ ইবনে ওকবা (রাঃ)কে গভর্ণর করায় যদি তাঁহার ব্যক্তিগত কোন ত্রুটির দরুণ অপরাধ হয় তবে সেই অপরাধের প্রথম আসামী হইবেন খলীফা ওমর; তিনি ওলীদ (রাঃ)কে হিজরী ১৭ বা ১৯ সনে আলজাযায়েরের মোসলেম এলাকার গভর্ণর নিয়োগ করিয়াছিলেন+। (তবরী ৩—১৫৭)

+ এস্থলে খলীফা ওসমান বিদ্বেষী মৌদুদী সাহেব খলীফা ওসমানের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গারের কতই না চেষ্টা করিয়াছেন! অবশেষে কোন গোঞ্জায়েশ না পাইয়া কুখ্যাত পুস্তকের ১১২ পৃষ্ঠায় এতটুকু লিখিয়া ছাড়িয়াছেন যে, ওমর (রাঃ) ওলীদকে অতি ছোট একটি পদ তথা ছোট এলাকার গভর্ণরী দান করিয়াছিলেন, খলীফা ওসমানের অপরাধ এই যে, তিনি ওলীদকে কুফার ন্যায় বড় প্রদেশের গভর্ণর বানাইয়াছেন।

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

ছাহাবীদের দোষ-চর্চ্চার ভয়াবহ ব্যধিগ্রস্ত মৌহুদী সাহেব ওলীদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সমালোচনা প্রসঙ্গে তাঁহার মদ্য পানের একটি ঘটনা ইতিহাসের পাতা হইতে আবৃত্ত করিয়া এক গুলিতে দুই শিকার করিয়াছেন। ওলীদ (রাঃ)কে ত নিহত করিয়াছেন এবং খলীফা ওসমানকে আহত করিয়াছেন—এইভাবে যে, তিনি একজন মদখোরকে আত্মীয়তার দরুণ গভর্ণরী পদ দান করিয়াছিলেন। (نعوذ با لله—আল্লার আশ্রয় প্রার্থনা করি।)

খুশীর বিষয় মৌহুদী সাহেব তাহার এইগুলির আঘাত হইতে খলীফা ওমর (রাঃ)কে বাঁচাইয়া নেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "ওলীদ কুফা এলাকার গভর্ণর থাকাকালীন তাহার মদ্য পানের অভ্যাস প্রকাশ পায়।" অর্থাৎ খলীফা ওমর যখন ওলীদকে আলজাযায়েরের গভর্ণর বানাইয়া ছিলেন তখন এই বদ অভ্যাস তাহার ছিল না বা উহা প্রকাশ পায় নাই।

ছাহাবীদের দোষ-চর্চ্চার ব্যধি মৌহুদী সাহেবকে তাহার শেষ মঞ্জিলে পৌঁছাইয়া দিয়াছে, তাই তাঁহার জ্ঞান-চক্ষুর সাথে সাথে চর্ম্ম-চক্ষুও অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্য অন্ধ হইয়া গিয়াছিল। নতুবা যে সব ইতিহাস-গ্রন্থ হইতে তিনি মদ্য পানের ঘটনা কুড়াইয়াছেন ঐ সব গ্রন্থেই নিম্নে বর্ণিত তথ্যগুলিও সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইতেন। কিন্তু এই অভিশাপ খণ্ডনের উপায় কি আছে যে, তাঁহার চক্ষু যেন পয়দাই হইয়াছিল ছাহাবীদের দোষ কুড়াইবার জন্য ?

মৌহুদী সাহেবেরই শ্রদ্ধার পাত্র তারীখ-তবরী (৩—৩২৭ ⁄ ৩৩০) হইতে কতিপয় তথ্য উদ্ধৃত করা হইতেছে—উহা দ্বারাই উক্ত ঘটনার স্বরূপ প্রকাশ পাইবে।

কুফা নগরে আবু যবীর, আবু মোয়ার্‌রে' ও জুন্দুব নামীয় এক শ্রেণীর লোক ছিল—يعتقدون له منذ قتل ابناؤهم ويضعون له العيوب "যাহারা ওলীদ

মৌহুদী সাহেবের বিশ্রী কুশেশের আরও নমুনা দেখুন! লিখিতেছেন, খলীফা ওমর তাঁহার খেলাফতের শেষ সময়ে ওলীদকে আলজাযায়েরের গভর্ণর বানাইয়া ছিলেন। কি ডাহা মিথ্যার পরিবেশন! তাঁহাকে গভর্ণর নিয়োগের সন—হিজরী ১৭ বা ১৯ সন খলীফা ওমরের খেলাফতের মধ্যবর্ত্তী সময় ছিল এবং আলজাযায়ের ঐ বৎসরই জয় করা হয়।

ইতিহাস-তথ্য ত মিথ্যা পরিবেশন করিয়া ওলীদকে হেয় দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, আলজাযায়েরের মোসলেম অধ্যুষিত প্রদেশ ছোট হওয়ার দাবীও যদি ঐ শ্রেণীরই হয় তবে ত সব কোশেশই বৃথা যাইবে। আর যদি এই দাবীটা বিশ্বাসও করা হয় যে, খলীফা ওমরের দেওয়া গভর্ণরীটা ছোট ছিল, কিন্তু মধ্যবর্ত্তী সময়ে কিছু রদবদল হইলেও ইতিহাসের বর্ণনা (কামেল ৩—৪২) মতে ওলীদ ১৭ বা ১৯ সনে আলজাযায়েরের গভর্ণর হইয়া খলীফা ওমরের খেলাফৎকাল এবং তাঁহার পরও ২৫ সন পর্য্যন্ত গভর্ণর ছিলেন। এই দীর্ঘ কাল গভর্ণর থাকিয়া অভিজ্ঞতার কিছু উন্নতি সাধন কি তিনি করিতে পারিয়া ছিলেন না, যদ্দরুণ খলীফা ওসমান কর্ত্তৃক তাঁহাকে উন্নতি দেওয়া সমীচীন গণ্য হইতে পারে ?

রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিত এবং তাঁহার দোষ গড়াইয়া থাকিত। উহার কারণ এই ছিল যে, তিনি তাহাদের কতিপয় পুত্র-পরিজনকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন।”

প্রাণদণ্ড দানের ঘটনা এই ঃ—একদা রাত্রি বেলা কুফা নগরে কতিপয় যুবক এক ব্যক্তির বাড়ীতে চুরি করার জন্য ঢুকিয়া পড়ে। গৃহস্বামী চিৎকার করিল এবং তরবারী লইয়া রুখিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু চোরেরা তাহাকে খুন করিয়া ফেলিল। উক্ত বাড়ীর সম্মুখস্ত বাড়ীতে বসবাস করিতেন মদীনার বিশিষ্ট ছাহাবী আবু শোরায়হ্ (রাঃ)। তিনি এবং তাঁহার পুত্র গৃহ-ছাদে শুইয়া ছিলেন ; পরশীর চিৎকারে তাঁহারা জাগ্রত হইয়া সমুদয় ঘটনা প্রত্যক্ষ করিলেন। আসামীগণ ধৃত হইয়া মোকদ্দমা চলিলে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী আবু শোরায়হ্ (রাঃ) এবং তাঁহার পুত্র সাক্ষ্য দিলেন। শাসনকর্ত্তা ওলীদ (রাঃ) ঘটনার সমুদয় বিবরণ খলীফা ওসমানের নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন। তিনি আসামীদের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। ওলীদ (রাঃ) প্রকাশ্য ময়দানে তাহাদের প্রাণদণ্ড কার্য্যকরী করিলেন।

এতদ্ভিন্ন জুন্দুব নামীয় ব্যক্তির একটি অপরাধে খলীফা ওসমানের আদেশ মতে ওলীদ (রাঃ) তাহাকে শাস্তি দিয়া ছিলেন। যদ্দরুণ তাহার দলীয় লোকগণ ক্ষিপ্ত হইয়া মদীনায় পৌঁছিল এবং খলীফার নিকট ওলীদের অপসারণ দাবী করিল। খলীফা ওসমান (রাঃ) তাহাদের দাবী প্রত্যাখ্যান করিলেন। (কামেল ৩—৫০)

তাহারা মদীনা হইতে বিমুখ হইয়া ফেরত আসিলে কুফা নগরে ওলীদের বিরুদ্ধবাদী যত লোক ছিল সকলে তাহাদের সঙ্গে একত্রিত হইল এবং কোন একটা বিষয় স্থির করিল ; আবু যবীর এবং আবু মোয়ার্‌রেও তাহাদের সঙ্গে ছিল।

فقدما على عثمان ومعهما نفر ......ممن قد عزل الوليد

“তাহারা দুইজন মদীনায় খলীফা ওসমানের নিকট আসিল। তাহাদের সঙ্গে তাহাদেরই দলের কতিপয় লোক ছিল যাহাদিগকে ওলীদ (রাঃ) তাহাদের চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিয়াছিলেন।” সঙ্গী লোকগণ ওলীদের উপর মদ্যপানের দাবী করিল এবং ঐ আবু যবীর ও আবু মোয়ার্‌রে সাক্ষ্য দিল। অনেক ইতঃস্ততের পর পরিস্থিতি শান্ত করার জন্য খলীফা ওসমান (রাঃ) ওলীদের প্রতি মদ্যপানের শাস্তি বেত্রদণ্ডের আদেশ দিলেন এবং তাঁহাকে গভর্ণর পদ হইতে বরখাস্ত করিলেন।

এই প্রসঙ্গে খলীফা ওসমানের দুইটি কথা তাৎপর্য্যপূর্ণ। ওলীদ (রাঃ) বলিলেন—

يا امير المؤمنين انشدك الله فو الله انهما لخصمان موتوران

“আমীরুল-মোমেনীন ! আপনাকে আল্লার দোহাই দিতেছি—কসম খোদার, সাক্ষীদ্বয় দণ্ডিত পুত্র-শোকে আমার পরম শত্রু।” উত্তরে ওসমান (রাঃ) বলিলেন—

لا يضرك ذلك انما نعمل بما ينتهي الينا فمن ظلم فالله ولى
انتقامه ومن ظلم فالله ولى جزائه

"মিথ্যা সাক্ষ্য তোমার প্রকৃত ক্ষতি করিতে পারিবে না ; আমাদের নিকট যেরূপ সাক্ষ্য পৌঁছিবে আমরা সে অনুযায়ী কাজ করিব। অবশ্য যে অন্যায়কারী আল্লাহ তাহার হইতে প্রতিশোধ গ্রহণকারী এবং যাহার প্রতি অন্যায় করা হইয়াছে আল্লাহ তাহাকে প্রতিফল দানকারী।" ওসমান (রাঃ) আরও বলিলেন—

نقيم الحدود ويبوء شاهد الزور بالنار فاصبر يا اخى

"আমরা সাক্ষী অনুযায়ী শরীয়ত নির্দ্ধারিত শাস্তি প্রয়োগ করিব, কিন্তু মিথ্যা সাক্ষ্যদাতার জন্য দোযখ নির্দ্ধারিত হইবে, অতএব হে ভ্রাতা! তুমি ধৈর্য্য ধর।"

খলীফা ওসমানের বুঝ-প্রবোধে ওলীদ (রাঃ) ধৈর্য্যের সহিত বেত্রদণ্ড বরণ করিতে লাগিলেন। আলী (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীগণ যাঁহারা বেত্রদণ্ড প্রয়োগে উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা মদ্যপানের শাস্তি ৮০ বেত্রদণ্ডের স্থলে ৪০ বেত্রাঘাতেই ক্ষান্ত ছিলেন বলিয়া কোন কোন হাদীছে স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বিদ্যমান এই সব তথ্য মৌদুদী সাহেবের চোখেও খোঁচা দিয়াছে মনে হয়। কিন্তু তিনি আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকের সন্ত্রাসবাদী দলের গর্হিত অপবাদ সমূহের খণ্ডন লিখিতে না জানিলেও মুছিতে জানেন অবশ্যই। সেমতেই তিনি মদ্য পানের ঘটনা খুব সাজাইয়া লেখার সাথে সাথে উল্লেখিত তথ্য সমূহের পাশ কাটাইয়া যাওয়ার জন্য টিকার মধ্যে এতটুকু ওকালতী করিয়া গিয়াছেন যে, "ঘটনার সাক্ষীগণকে নির্ভরশীল গণ্য করা না হইলে খলীফা ওসমান এবং উপস্থিত ছাহাবীগণ বেকায়দায় পতিত হইবেন যে, তাঁহারা ঐরূপ সাক্ষীর সাক্ষ্যের উপর দণ্ড দানের সিদ্ধান্ত কিরূপে করিলেন ?"

অর্থাৎ সাক্ষীগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে গ্রহণযোগ্য না হইলেও খলীফা ওসমান কর্ত্তৃক বেত্রদণ্ড দানের আদেশকে বৈধ ও কায়দা মাফিক বানাইবার জন্য উল্লেখিত তথ্যাবলী হইতে চোখ বুজিয়া সাক্ষীগুলিকে গ্রহণ করার সুপারিশ করিয়াছেন। মৌদুদী সাহেবের উদ্দেশ্য হইল—ইতিহাস জঙ্গলের নিভৃত কোন্ হইতে মদ্যপানের যে ঘটনা তিনি জন সমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছেন উহাকে সত্য গণ্য করিয়া ওলীদ (রাঃ)কে মদখোর সাব্যস্ত করা, যদিও উহার সাক্ষী প্রকৃত প্রস্তাবে গ্রহণযোগ্য নহে।

মৌদুদী সাহেবের জানা উচিৎ যে, ওলীদ (রাঃ)কে দণ্ড প্রদান বৈধ হওয়ার জন্য ইতিহাসের উক্ত তথ্যাবলী অস্বীকার করার প্রয়োজন হয় না। খলীফা ওসমান (রাঃ) নিজেও সাক্ষীদের শত্রুতা জ্ঞাত ছিলেন বলিয়া ইতিহাসে উল্লেখ রহিয়াছে—

ذكر ممن يعرف عثمان ممن قد عزل الوليد عن الاعمال

"ঐ লোকগুলি সম্পর্কে খলীফা ওসমান জ্ঞাত ছিলেন যে, তাহারা ঐ লোক যাহাদেরকে ওলীদ (রাঃ) চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিয়াছিলেন।"

কিন্তু তাহাদের সাক্ষ্যকে প্রত্যাখ্যান করার নিয়মতান্ত্রিক তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিতে ছিলেন না। তাঁহার নিকট উক্ত সাক্ষীদের অবস্থা তদ্রূপই ছিল যেরূপ একটি বদকার নারী সম্পর্কে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছিলেন— لو كنت راجما بغير بينة لرجمتها "সাক্ষী ব্যতিরেকে জেনার শাস্তি প্রস্তরাঘাতে প্রাণদণ্ড প্রয়োগ করার অবকাশ থাকিলে, আমি ঐ নারীটির উপর তাহা প্রয়োগ করিতাম।" হযরতের এবং সকলের জানা ছিল, ঐ নারীটি জেনাকারিণী। কিন্তু নির্দ্ধারিত প্রমাণের অভাব ছিল। তদ্রূপ আলোচ্য ঘটনায় সাক্ষীদের মিথ্যাবাদী হওয়া জানা ছিল, কিন্তু উহার উপর নিয়মতান্ত্রিক প্রমাণের অভাব ছিল। তাই উহার উপর দণ্ড দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু উহার দ্বারা ঘটনার বাস্তবতা সাব্যস্ত হইবে না এবং প্রকৃত মিথ্যা সত্য গণ্য হইবে না।।

এতদ্ভিন্ন সন্ত্রাসবাদীগণ ঐ মিথ্যা ঘটনাকে এমন ভাবে প্রচার করিয়াছিল যে, তাহারা আড়ালে থাকিয়া সুধী সমাজকে উহাতে জড়িত করিয়া দিয়া ছিল ; যেরূপ করিয়াছিল কোরআনে বর্ণিত আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহার প্রতি মিথ্যা অপবাদের ঘটনায় আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মোনাফেকের দল। তাহারা নিজেরা আড়ালে থাকিয়া গর্হিত মিথ্যা ঘটনার প্রচারণা সারা মদীনায় ছড়াইয়া দিয়া ছিল। এমনকি বিশিষ্ট ছাহাবী হাস্‌ছান (রাঃ), মেস্‌তাহ (রাঃ) এবং স্বয়ং হযরতের শালী হাম্‌নাহ (রাঃ) ঐ অপবাদে পূর্ণরূপে জড়াইয়া পড়িয়া ছিলেন। পরিস্থিতি এমন জটিল আকার ধারণ করিয়া ছিল যে, দীর্ঘ এক মাসকাল হযরত (দঃ) আয়েশা (রাঃ) হইতে সম্পর্ক ছিন্নরূপে কাটাইয়া ছিলেন। আয়েশা (রাঃ)কে ত্যাগ করার প্রস্তুতি নিতে ছিলেন। সর্ব্বশেষ মুহূর্ত্তে যদি আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার পবিত্রতার পক্ষে অকাট্য ওহী কোরআন শরীফের সুদীর্ঘ বর্ণনা আল্লার তরফ হইতে অবতীর্ণ না হইত তবে ঐ মোনাফেকদের প্রচারণার উৎপীড়নে হযরত (দঃ) আয়েশা (রাঃ)কে ত্যাগও করিতে পারিতেন। অতি আশ্চার্য্যের বিষয়—অপবাদের উৎপত্তি এবং উহার প্রচারণা সব কিছুই আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মোনাফেকের কার্য্য ছিল। পবিত্র কোরআনেও ঘটনার মূলরূপে তাহার প্রতিই ইঙ্গিত রহিয়াছে, কিন্তু সে এমন আড়ালে থাকিয়াই ঐ মিথ্যাকে ছড়াইয়া ছিল যে, নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সে ধরা না পড়ায় মিথ্যা অপবাদের শরীয়তী শাস্তি হদ্দে-কজফ ৮০ বেত্রদণ্ড তাহার উপর প্রয়োগ করা যায় নাই। অথচ কতিপয় সুধী মোসলমান—হাস্‌ছান (রাঃ), হামনাহ (রাঃ) যাঁহারা তাহারই প্ররোচনায় মাতিয়া ছিলেন তাহাদের প্রত্যেকেরই ৮০ বেত্রদণ্ড ভোগ করিতে হইয়া ছিল।

ওলীদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ঘটনায়ও ঠিক তদ্রূপই ঘটিয়া ছিল। মোনাফেক আবদুল্লাহ ইবনে সাবার সন্ত্রাসবাদী এবং ওলীদের শত্রুদল ঘটনাকে সাজাইয়া এমন ভাবে প্রচার করিয়াছিল যে, উহাতে মদীনার সুধী সমাজও ব্যাপক ভাবে জড়াইয়া পড়িয়া ছিলেন এবং তাঁহারা খলীফা ওসমান (রাঃ)কে এই ব্যাপারে অতিশয় উত্ত্যক্ত করিয়া তুলিয়া ছিলেন। খলীফা ওসমান (রাঃ) ঘটনাকে গভীর ভাবে তদন্ত করার জন্য দণ্ড প্রয়োগে বিলম্ব করিতে ছিলেন ইহাকেও সন্ত্রাসবাদীগণ খলীফার বিরুদ্ধে স্বজন-প্রীতির অভিযোগের ধূম্রজাল সৃষ্টির অবলম্বন রূপেই ব্যবহার করিয়াছিল; এই ধূম্রজাল সুধী সমাজেও বিস্তার লাভ করিতে ছিল। সুতরাং খলীফা ওসমান (রাঃ) ঘটনার অবসানই উত্তম মনে করিলেন এবং দণ্ড প্রদান যেহেতু ওলীদের ব্যক্তিগত ব্যাপার, তাই তাঁহাকে বুঝ-প্রবোধ দান করিয়া সাক্ষ্যের বাহ্যিক রূপকেই গ্রহণ করিয়া ছিলেন। সন্ত্রাসবাদীগণ কর্তৃক স্বজন-প্রীতির মিথ্যা অপবাদ নিরসনে এইরূপ মহতী প্রচেষ্টার নজীর খলীফা ওসমানের পক্ষ হইতে অনেকই পাওয়া যায়।

ওলীদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর উক্ত ঘটনার ব্যাপারে সন্ত্রাসবাদীগণের মিথ্যা প্রচারণায় মাতান সুধী লোকগণও খলীফা ওসমান (রাঃ)কে কিরূপ উত্ত্যক্ত ও উৎপীড়িত করিতে ছিলেন তাহার কিছু নমুনা বোখারী শরীফ ৫২২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত একটি হাদীছ দ্বারা আঁচ করা যায়। হাদীছটি বাংলা বোখারী শরীফ পঞ্চম খণ্ড ওসমান (রাঃ) এর আলোচনায় অনুবাদ করা হইয়াছে।

খলীফা ওসমান (রাঃ) উক্ত ঘটনার বিকৃত প্রোপাগাণ্ডার দরুণ অত্যধিক উত্ত্যক্ত, উৎপীড়িত ও বিব্রত হইয়াছিলেন। তাই তিনি ফেৎনা-ফাসাদের অবসান উদ্দেশ্যে দণ্ড দানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পাঠকবর্গ! আপনারা সকলে হয় ত জানেন না, কিন্তু ইতিহাসের সাক্ষ্য বিদ্যমান রহিয়াছে যে, কুফা নগরের কতিপয় দুষ্কৃতী দ্বারা ওলীদ (রাঃ)র বিরুদ্ধে যাহা ঘটিয়াছে এবং ওসমান (রাঃ) বাহ্যিকরূপে উহা সমর্থন করিতে বাধ্য হইয়া ওলীদ (রাঃ)কে বরখাস্ত করিয়াছেন—কুফার বুকে এরূপ ঘটনা ইহাই প্রথম নহে। ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর আমলেও তাঁহার গভর্ণর বিশিষ্ট ছাহাবী সায়াদ ইবনে আবু ওক্কাছ (রাঃ) যিনি আশারা-মোবাশ্শারার তথা এক লক্ষ ছাহাবীদের শীর্ষস্থানীয় দশ জনের একজন ছিলেন—তাঁহার বিরুদ্ধেও কুফার দুষ্কৃতিকারীরা খলীফা ওমরের দরবারে জুলুম-অন্যায়ের অভিযোগের সাথে এই অভিযোগও করিয়াছিল যে, তিনি ভাল ভাবে নামায পড়িতেও জানেন না।

সায়াদ (রাঃ) তাহাদের অভিযোগের বিরুদ্ধে ভীষণ মনঃক্ষুন্ন হইয়া বলিয়া ছিলেন—আমি প্রাথমিক মোসলমানদের পঞ্চম মোসলমান। আমরা দ্বীন-ইসলামের খেদমতে গাছের পাতা খাইয়া মুখে ঘা করিয়া ফেলিয়া ছিলাম। ইসলামের জন্য

জেহাদে প্রথম তীর নিক্ষেপকারী আমি। ওহোদের জেহাদে আমার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে বলিয়াছিলেন, তোমার জন্য আমার মাতা-পিতা উৎসর্গ। আর এখন কুফার বনু-আসাদ গোত্রীয় লোকগুলি আমার উপর অভিযোগ আনে যে, আমি ভালরূপে নামাযও পড়িতে জানি না! এবং তাহারা ইসলামের রীতি-নীতি সম্পর্কে আমার বদনাম করিয়া থাকে! তবে ত আমার পোড়া-কপাল এবং জীবনের সব কিছুই বৃথা।

খলীফা ওমর (রাঃ) তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে কুফার গভর্ণরী হইতে অপসারিত করিলেন। এই ঘটনা ইতিহাস-গ্রন্থে এবং হাদীছ গ্রন্থে বিদ্যমান রহিয়াছে। বোখারী শরীফেও একাধিক জায়গায় বর্ণিত রহিয়াছে।

শাসনকর্ত্তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ ও অভিযোগ দাঁড় করিয়া তাঁহাদিগকে হেস্ত-নেস্ত করা—ইহা কুফাবাসীদের নিরারোগ্য ব্যধি ছিল। হিজরী ২১ সনে তাহারা সায়াদ ইবনে আবু ওয়াক্কাছ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ন্যায় শ্রদ্ধেয় শাসনকর্ত্তার বিরুদ্ধে এই পন্থা অবলম্বন করে। অতঃপর ২২ সনে বিশিষ্ট ছাহাবী আম্মার ইবনে ইয়াছের (রাঃ) গভর্ণরের বিরুদ্ধেও তাহাই করে। তারপর বিশিষ্ট ছাহাবী আবু মুছা আশয়ারী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর উপরও সেই অস্ত্রই ব্যবহার করে। এমনকি খলিফা ওমর (রাঃ) ভয়ানক চিন্তিত হইয়া পড়েন—কুফার গভর্ণর কাহাকে বানাইবেন। বিশিষ্ট ছাহাবী মুগিরা ইবনে শোবা (রাঃ) খলীফা ওমর (রাঃ)কে চিন্তিত অবস্থায় মসজিদে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, হে আমীরুল-মোমেনীন যে বিষয় আপনাকে এরূপ চিন্তাযুক্ত করিয়াছে, উহা নিশ্চয়ই অতিশয় জটিল বিষয় হইবে! ওমর (রাঃ) বলিলেন, কোন্ পথ অবলম্বন করিব ? কুফাবাসী এক লক্ষ লোক তাহারা কোন শাসনকর্ত্তার উপরই সন্তুষ্ট থাকে না এবং কোন শাসনকর্ত্তাই তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। অতঃপর ছাহাবীদের সাথে দীর্ঘ পরামর্শ করার পর উক্ত মুগিরা ইবনে শোবা (রাঃ)কেই কুফার গভর্ণর মনোনীত করিলেন। (বেদায়াহ ৭—১২৬)

এত বড় বড় ছাহাবীদের ন্যায় একই প্রকারে যদি ওলীদ (রাঃ) খলীফা ওসমান কর্ত্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত ও অপসারিত হইয়া থাকেন। তবে তাহাতে ওলীদের ও খলীফা ওসমানের মর্য্যাদার কত দুর লাঘব হইতে পারে তাহা সুধী সমাজের বিচার্য্য।

এই আলোচনায় আর একটি অভিযোগের খণ্ডন হয়। উহাও আবদুল্লাহ ইবনে সাবার দল কর্ত্তৃকই প্রচারিত এবং মৌদুদী সাহেব কর্ত্তৃক রং-রসের সহিত কুখ্যাত পুস্তকে বর্ণিত যে—ওসমান (রাঃ) সায়াদ ইবনে আবু ওয়াক্কাছের ন্যায় ছাহাবীকে বরখাস্ত করিয়া তাঁহার স্থলে আত্মীয় ওলীদকে বসাইয়া ছিলেন।

এস্থলে চিন্তা করা আবশ্যক—সায়াদ (রাঃ) বিশিষ্ট ছাহাবী ছিলেন বটে, কিন্তু খলীফা ওসমানের ন্যায় মুরব্বি তাঁহাকে অপসারিত করিলে তাহাতে দোষ কি হইতে পারে? খলীফা ওমর এই সায়াদ (রাঃ)কেই হিজরী ২১ সনে এই কুফার গভর্ণরী হইতেই অপসারিত করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন সায়াদ (রাঃ) অপেক্ষা বেশী সুপ্রসিদ্ধ, স্বয়ং রসুল (দঃ) কর্তৃক আল্লার তলোয়ার আখ্যায়ীত ইসলামের অজেয় বীর খালেদ ইবনে ওলীদকেও খলীফা ওমর বরখাস্ত করিয়াছিলেন। সুতরাং সায়াদ রাজিয়াল্লাহু আনহুর অপসারণ খলীফা ওসমানের প্রতি দোষারোপের বস্তু হইতে পারে না। অবশ্য ইহার আর একটা দিক আছে, সেইটা হইল—নিজ আত্মীয় ওলীদকে উক্ত পদে বসাইবার জন্য সায়াদ (রাঃ)কে অপসারিত করা। মৌদুদী সাহেব লেখার ভাব-ভঙ্গি দ্বারা পাঠকবর্গকে ঐ দিকেই টানিয়া নেওয়ার কোশেশ করিয়াছেন; ইহাই তাঁহার বিবেক-বুদ্ধির বক্রতার পরিচয়। আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকের দলের ভাবধারা ত এরূপ হইতে পারে, কারণ তাহারা ত আদা-জল খাইয়া লাগিয়া ছিল ইসলামের নেজামে-খেলাফত ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে—খলীফা ওসমান (রাঃ)কে ঘায়েল করার জন্য। সুতরাং তাহারা যদি তিলকে তাল বানাইয়া না লইবে তবে খলীফা ওসমান (রাঃ)কে আঘাত কি দিয়া করিবে? কিন্তু কোন প্রকৃত মোসলমানের ভাবধারা ত ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রতি ঐরূপ হইতে পারে না। অধিকন্তু সায়াদ (রাঃ)কে অপসারণের সুস্পষ্ট সূত্রও সমস্ত ইতিহাস গ্রন্থেই বিদ্যমান রহিয়াছে—

কুফার শাসন কার্য্যের গভর্ণর ছিলেন সায়াদ (রাঃ), আর বাইতুল-মাল তথা সরকারী ধন-ভাণ্ডারের গভর্ণর ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ)। সায়াদ (রাঃ) বাইতুল-মাল হইতে ব্যক্তিগত কাজে ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই যুগে সরকারী তথা জন-সাধারণের অর্থ ও স্বার্থকে পদ বা গদির প্রভাব দ্বারা পদদলিত করিতে দেওয়া হইত না। তাই আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বাইতুল-মালের অর্থ উসুল করিতে সায়াদ (রাঃ)এর প্রতি চাপ প্রয়োগ করিলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটি হইল। সায়াদ (রাঃ)এর মেজাজে অত্যন্ত গরমী ছিল। আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) স্থান ত্যাগ করতঃ সাময়িক ভাবে ঝগড়ার অবসান ঘটাইলেন বটে, কিন্তু ঐ ঝগড়া উভয়ের সমর্থকদের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। খলীফা ওসমান (রাঃ) ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ জ্ঞাত হইয়া সায়াদ (রাঃ)কে তথা হইতে সরাইয়া আনিলেন। (কামেল ৩—৪২)

সায়ীদ ইবনুল আছ (রাঃ) ঃ

খলীফা ওসমানের দীর্ঘ ১২ বৎসর খেলাফত আমলে শাসনকার্য্য পরিচালনের ভারপ্রাপ্ত ৪৭ জন আমেলের মধ্যে যে তিন জন মাত্র খলীফা ওসমানের উমাইয়া বংশের ছিলেন সেই তিন জনের তৃতীয় জন হইলেন—সায়ীদ ইবনুল আছ (রাঃ)। কিন্তু উভয়ের বংশ মিল এত দূরের ছিল যে, তাঁহার দাদার দাদা খলীফা ওসমানের দাদার পিতা ছিলেন। ইহা ভিন্ন উভয়ের মধ্যে আর কোন আত্মীয়তার খোঁজ আমরা ইতিহাসে পাই নাই। ইতিহাসে আছে, তিনি দানশীলতা এবং নেককারী পরহেজগারীতে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। (এছাবাহ্)

তিনি সিরিয়ায় বসবাস করিতেন। খলীফা ওমর (রাঃ) তাঁহার নেককারী পরহেজগারীর সুনামে তাঁহাকে মদীনায় পাঠাইবার জন্য সিরিয়ার গভর্ণর মোয়াবিয়াকে লিখিয়া পাঠান। তিনি মদীনায় পৌঁছিলেন। তিনি অবিবাহিত ছিলেন ; খলীফা ওমর (রাঃ) নিজ তত্ত্বাবধানে তাঁহাকে পর পর দুইটি বিবাহ করাইয়া ছিলেন।

খলীফা ওসমান (রাঃ) তাঁহাকে কুফার গভর্ণর নিয়োগ করিলে সর্ব্ব প্রথম তিনিই তবরস্তানের প্রতি অভিযান পরিচালিত করেন। সেই অভিযানে তাঁহার অধীনে হাসান (রাঃ), হোসাইন (রাঃ) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ), আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ), আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ), হোযায়ফা (রাঃ) প্রমুখ বিশিষ্ট ছাহাবীগণ জেহাদ করিয়াছিলেন। (কামেল ৩—৫৪)

তিনি এতই শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন যে, হিজরী ৩৪ সনে আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকের সন্ত্রাসবাদী দল তাহাদের বিভিন্ন এলাকার সদস্যদিগকে চিঠি-পত্রের দ্বারা এই কথার উপর উত্তেজিত করিয়া দিয়া ছিল যে, খলীফা ওসমানের আমেল বা শাসন-পরিচালকগণকে ভীষণ ভাবে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলা হউক এবং তাহাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হউক। সন্ত্রাসবাদীদের অন্যতম কেন্দ্র কুফায়ই সর্ব্ব প্রথম উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়ীত করার ব্যবস্থা গৃহিত হয়।

শাসনকর্ত্তা সায়ীদ (রাঃ) সন্ত্রাসবাদীদের ব্যাপারেই মদীনায় গভর্ণর সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন। কুফার সন্ত্রাসবাদী দল এই সুযোগেই তাহাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ীত করে। সায়ীদ (রাঃ) মদীনা হইতে স্বীয় কার্য্যস্থল কুফায় রওয়ানা হইয়াছেন, আর ঐ দিকে কুফার সন্ত্রাসবাদী দল জোর প্রচারণা চালাইয়া কিছু লোক সংগ্রহ করতঃ তাহাদেরকে লইয়া কুফার অদূরে “জোরআহ্” নামক স্থানে প্রতিরোধ ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করে এবং সায়ীদ (রাঃ)কে কুফায় প্রবেশে বাধা দানের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। সায়ীদ (রাঃ) ইহা জানিতে পারিয়া পথি মধ্য হইতেই মদীনায় ফিরিয়া আসেন এবং খলীফা ওসমান (রাঃ)কে সব ঘটনা অবগত করতঃ

বলেন যে, সন্ত্রাসবাদীগণ আমার স্থলে আবু মূছা আশয়ারী (রাঃ)কে গভর্ণর চায়। সেমতে ওসমান (রাঃ) তৎক্ষণাৎ আবু মূছা আশয়ারী (রাঃ)কে কুফার গভর্ণর নিয়োগ করিলেন। সেই উপলক্ষে খলীফা ওসমান (রাঃ) তাঁহার সর্ব্বশেষ নীতিও ঘোষনা করিলেন—

والله لا نجعل لاحد عذرا ولا نترك لهم حجة ولنصبرن كما امرنا حتى نبلغ ما يريدون

"খোদার কসম কাহারও জন্য কোন ওজরের অবকাশ রাখিব না। কাহারও জন্য কোন কথার ফাঁক ছাড়িব না এবং আমি আমার প্রতি (হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের) আদেশ অনুযায়ী ছবর ও ধৈর্য্য ধারণ করিয়া যাইব, যদিও আমাকে ঐ পর্য্যন্ত পৌঁছিতে হয় যাহা সন্ত্রাসবাদীগণ ইচ্ছা করিতেছে" (তবরী ৩—৩৭২)। তিনি সন্ত্রাসবাদীগণকে লক্ষ্য করিয়া কুফাবাসীদের প্রতি একটি লিপিও প্রেরণ করিলেন—

بسم الله الرحمن الرحيم

اما بعد فقد امرت عليكم من اخترتم واعفيتكم من سعيد......

"বিছমিল্লাহের রাহমানির রাহীম। অতঃপর—আমি তোমাদের পছন্দণীয় ব্যক্তিকেই তোমাদের শাসনকর্ত্তা নিয়োগ করিলাম এবং তোমাদিগকে সায়ীদের শাসন হইতে অব্যাহতি দিলাম। খোদার কসম—আমি আমার মান-সন্মানকেও তোমাদের জন্য বিলীন করিয়া যাইব, আমার ধৈর্য্যের শেষ বিন্দু তোমাদের জন্য ব্যয় করিব এবং সর্ব্বশক্তি দ্বারা তোমাদের সংশোধন ও উপকারের চেষ্টা করিব। তোমরা এমন যে কোন জিনিষ পছন্দ করিবে যাহা প্রদানে আল্লার নাফরমানী না হয়, তাহা অবশ্যই আমার নিকট দাবী করিয়া এবং এমন যে কোন জিনিষ না পছন্দ করিবে যাহা বর্জ্জনে আল্লার নাফরমানী না হয় তাহা হইতে অবশ্যই নিষ্কৃতি চাহিবে। আমি তোমাদের পছন্দের কাজই করিয়া যাইব; যাহাতে তোমাদের জন্য আমার বিরুদ্ধে কিছু বলার অবকাশ না থাকে।"

খলীফা ওসমান (রাঃ) কুফাবাসীদের প্রতি বিশেষরূপে এই লিপি প্রেরণ করার পর অন্যান্য এলাকায়ও এইরূপ লিপি প্রেরণ করিলেন। (তবরী ৩—৩৭৫)

এই পর্য্যন্ত সেই তিন জন গভর্ণরের আলোচনা শেষ হইল যাঁহাদের বংশগত সম্পর্ক ছিল খলীফা ওসমানের সঙ্গে—১। মোয়াবিয়া (রাঃ) ২। ওলীদ ইবনে ওকবাহ (রাঃ) ৩। সায়ীদ ইবনে আছ (রাঃ)। আরও দুই জন বিতর্কমূলক গভর্ণর আছেন যাঁহাদের বংশগত কোন সম্পর্ক খলীফা ওসমানের সঙ্গে ছিল না, অবশ্য

আত্মীয়তার সম্পর্ক খলীফার সহিত ছিল—একজন আবদুল্লাহ ইবনে আমের (রাঃ), অপর জন আবদুল্লাহ ইবনে সায়াদ (রাঃ)। কিন্তু পাঠকগণ চিন্তা করিয়া দেখিবেন, তাঁহাদের আত্মীয়তা কোন শ্রেণীর ছিল? তারপর বিচার করিবেন, সেই আত্মীয়তার দরুণ বিশেষতঃ ৪৭ জনের মধ্যে শুধু ২।৪ জন ঐ শ্রেণীর আত্মীয়তাধারী হওয়ায় খলীফা ওসমানের প্রতি স্বজন-প্রীতির দোষারোপ করা কতটুকু ন্যায় সঙ্গত! দুঃখের বিষয়—মৌদুদী সাহেব সেই পাইকারী দোষারোপের উপর ভিত্তি করিয়া নেজামে-খেলাফত বিতারণের অপরাধের প্রথম অপরাধী ওসমান (রাঃ)কে সাব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছেন—এইরূপ করা ঈমানদারী হইয়াছে কি?

আবদুল্লাহ ইবনে আমের (রাঃ):

তিনি খলীফা ওসমানের মামাতো ভাই ছিলেন, তিনি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামেরও ঘনিষ্ঠ ছিলেন। হযরতের ফুফাতো ভ্রাতার ছেলে ছিলেন। তাঁহার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে মোহাদ্দেছগণের এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনাই যথেষ্ট যে, আবদুল্লাহ ইবনে আমের (রাঃ) অতিশয় দানশীল, বীরপুরুষ এবং "মাইমূন" তথা বিশেষ বরকতওয়ালা মানুষ ছিলেন। তাঁহার বরকতওয়ালা হওয়ার মূলে ছিল—তিনি নবজাত শিশু অবস্থায় তাঁহাকে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত করা হইলে হযরত (দঃ) বলিলেন, সে ত আমার আকৃতির। হযরত (দঃ) তাঁহার জন্য আল্লার আশ্রয় প্রার্থনা করতঃ স্বীয় মুখের থুথু তাঁহার মুখে দিলেন। নবজাত শিশু আবদুল্লাহ ইবনে আমের হযরতের থুথু গিলিতে লাগিলেন। হযরত (দঃ) তাঁহার সম্পর্কে বলিলেন, তাহার কখনও পানির অভাব হইবে না। হযরতের এই শুভবাণীর বরকত তিনি চিরকাল ভোগ করিয়া গিয়াছেন—তিনি যখন যে কোন স্থানে পানি বাহির করার চেষ্টা করিলেই তথায় পানি বাহির হইয়া আসিত।

খলীফা ওসমান (রাঃ) তাঁহাকে যৌবন বয়সেই বছরার গভর্ণর বানাইয়া ছিলেন। বছরার শাসন আমলে তিনি অপরিসীম কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া ছিলেন। তিনি সম্পূর্ণ খোরাসান, সিজিস্তান, কেরমান ইত্যাদি জয় করিয়াছিলেন এবং পারস্যেরও অবশিষ্ট এলাকা জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রবল আক্রমনেই পারস্যের সর্ব্বশেষ রাজা ইয়াজদ্‌জরদ পলায়ন ও ছুটাছুটির মধ্যে বিপন্ন অবস্থায় নিহত হইয়াছিল। ইহার জন্য আল্লার শোকর-গুজারী স্বরূপ তিনি নিশাপুর হইতে এহ্‌রাম বাঁধিয়া বিভিন্ন বিজয় ও ইয়াজদ্‌জরদের নিহত হওরার সুসংবাদ বহন করতঃ মদীনায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। (এছাবাহ ২—৭১)

আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকের সন্ত্রাসবাদী দল এস্থানেও সেই পুরাতন কায়দায়ই খলীফা ওসমানের প্রতি দোষারোপ করিয়াছে যে, আবু মূছা আশয়ারীর

ন্যায় প্রবীণ ছাহাবীকে অপসারিত করিয়া স্বীয় মামাতো ভাই আবদুল্লাহ ইবনে আমেরকে বছরার গভর্ণর নিযুক্ত করিয়াছেন। এই অভিযোগের বীজ আবিষ্কার করিয়াছিল উক্ত সন্ত্রাসবাদী দল। আর তাহাদেরই ১৪০০ বৎসর পরের জয়ঢাক মৌদুদী সাহেব উক্ত অভিযোগকে রং-পালিশ দ্বারা সাজাইয়াছেন।

এই অভিযোগ খণ্ডনে আমাদের বক্তব্য ঐরূপই যাহা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। আবু মূছা আশয়ারী (রাঃ) হিজরী ১৭ সনে খলীফা ওমর (রাঃ) কর্তৃক বছরার গভর্ণর নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার খেলাফতের শেষ—২৩ সন পর্য্যন্ত ঐ পদে বহাল ছিলেন। শুধু ২২ সনে অল্প কালের জন্য তিনি কুফার গভর্ণর হইয়াছিলেন। তারপর খলীফা ওসমান (রাঃ)ও তাঁহাকে ঐ পদে ২৯ সন পর্য্যন্ত বহাল রাখিয়া ছিলেন। এই দীর্ঘ ১২ বৎসর কাহারও মতে আরও তিন বৎসর অধিক কাল একই পদে থাকার পর বছরা সংলগ্ন পারস্যের বিজিত এলাকা সমূহে সামরিক সঙ্কট দৃষ্টে খলীফা ওসমান (রাঃ) আবু মুছা আশয়ারী (রাঃ)কে সরাইয়া তাঁহার স্থলে নবীন বীরপুরুষ আবদুল্লাহ ইবনে আমের (রাঃ)কে নিয়োগ করেন। এই নিয়োগ-বদলীর স্বর্ণ-ফলন ইতিহাসের পাতায় পাতায় বর্ণিত রহিয়াছে। খলীফা ওসমানের বিদ্বেষীগণ এই নিয়োগ-বদলীকে তাঁহার কুৎসা রূপে প্রচার করিয়া থাকে। অথচ ঘটনার পাত্র ও বদলীর ক্ষেত্র আবু মূছা আশয়ারী (রাঃ) স্বয়ং এই নিয়োগের প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার বিদায় ভাষণে তিনি বছরাবাসীকে বলিয়াছেন—

يا تيكم غلام خراج ولاج كريم الجدات والخالات والعمات

"আমার স্থলে তোমাদের জন্য একজন তরুণ বীরপুরুষ আসিতেছেন। বিপদ-সঙ্কুল সমস্যার দুর্গে ঢুকিয়া পড়িতে এবং উহা জয় করতঃ বাহির হইয়া আসিতে তিনি খুবই পটু। তাঁহার মাতা-পিতা উভয়ের বংশই অতি উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত।" (তবরী ৩—৩১১)

খলীফা ওসমানের ন্যায় মুরব্বি এইরূপ ক্ষেত্রে আবু মূছা আশয়ারী (রাঃ)কে অপসারিত করিয়া থাকিলে তাহাতে খলীফার প্রতি দোষারোপের কি আছে? খলীফা ওমর (রাঃ) কত বার কত শাসনকর্ত্তাকে বরখাস্ত করিয়াছেন। আর যদি বলা হয় যে, নিজের মামাতো ভাইকে গদিতে বসাইবার জন্যই আবু মূছা আশয়ারী (রাঃ)কে বরখাস্ত করা হইয়াছিল তবে তাহা এমন ভাবধারার পরিচায়ক হইবে যাহা একমাত্র আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকের দলীয় লোকের জন্যই শোভা পাইতে পারে। এই নিয়োগ-বদলী সম্পর্কে ইতিহাসবিদগণের যে বর্ণনা বিদ্যমান রহিয়াছে তাহাও অতি সুস্পষ্ট; নিম্নে উহা উল্লেখ করা হইল।

খলীফা ওমরের আমলে পারস্যের অনেক এলাকা জয় হইয়াছিল। তথাকার রাজশক্তি ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়া ছিল বটে, কিন্তু রাজাকে পাকড়াও করা সম্ভব হইয়াছিল না। সে বিভিন্ন এলাকায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া সৈন্য সংগ্রহ করতঃ মোসলমানদের উপর অতর্কিতে গেরিলা আক্রমণ চালাইত; যদ্দরুণ পারস্যে মোসলমানগণ ভীষণ অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার সম্মুখীন ছিল। এই সঙ্কট এড়াইবার জন্য একমাত্র পথ ছিল বছরা হইতে পারস্যে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করা। বছরার গভর্ণর আবু মূছা আশয়ারী (রাঃ) বৃদ্ধ বয়সের ছিলেন। তাই বছরার লোকদের মধ্যেও তাঁহার বদলীর আগ্রহ ছিল (তবরী ৩—৩১৯)। বছরা সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকায় প্রায়শঃ বিদ্রোহ দেখা দিয়া থাকিত তাহা দমনের জন্য সামরিক চাপ প্রয়োগে যেরূপ উত্তেজনা ও উদ্দীপনা বছরাবাসীগণ শাসন-কর্ত্তার মধ্যে দেখিতে চাহিত আবু মূছা আশয়ারী রাজিয়াল্লাহু আনহুর বার্দ্ধক্যতার দরুণ তাহাদের সেই চাহিদা পূর্ণ হইত না। ঐরূপ একটি ঘটনায় اتوا عثمان فاستعفوه منه। "বছরাবাসীগণ খলীফা ওসমানের নিকট আসিয়া আবু মূছা আশয়ারী রাজিয়াল্লাহু আনহুর বদলী দাবী করিল।" (কামেল, ৩—৪৯)

এই সব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে খলীফা ওসমান (রাঃ) কোন প্রকার অসন্তুষ্টি ব্যতিরেকে নিতান্ত স্বাভাবিকভাবে আবু মূছা আশয়ারী (রাঃ)কে গভর্ণরী হইতে সরাইয়া আনিয়া নবীন ও তরুণ বীর হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বরকত বহনকারী আবদুল্লাহ ইবনে আমের (রাঃ)কে বছরার গভর্ণর নিয়োগ করিলেন। এই নিয়োগ-বদলীর যে স্বর্ণ-ফল ফলিয়াছে সুধী সমাজকে তাহা যে কোন ইতিহাস গ্রন্থ হইতে জ্ঞাত হওয়ার অনুরোধ জানাই; তাহাই খলীফা ওসমানের প্রতি এই প্রসঙ্গে অপবাদের সমুচিত জবাব হইয়া যাইবে।

আবদুল্লাহ ইবনে সায়াদ ইবনে আবু সারাহ্ (রাঃ)

খলীফা ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ৪৭ জন আমেলের মধ্যে তাঁহার বংশীয় তিন জন ছাড়া দুই জন মাত্র তাঁহার আত্মীয় ছিলেন। উহারই দ্বিতীয় জন আবদুল্লাহ ইবনে সায়াদ (রাঃ)। তিনি খলীফা ওসমানের দুধ ভাই ছিলেন মাত্র। অন্য আর কোন আত্মীয়তা বা বংশীয় সম্পর্ক তাঁহার সঙ্গে মোটেই ছিল না। কিন্তু সন্ত্রাসবাদীগণ এতটুকু সুযোগকেও ছাড়ে নাই। খলীফা ওসমানের স্বজন-প্রীতির প্রমাণে তাঁহাকেও দাঁড় করিয়াছিল এবং মৌদুদী সাহেব ত এই ব্যাপারকে খলীফা ওসমানের বিরুদ্ধে বিরাট অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়াছেন। খলীফা ওসমান (রাঃ) স্বজন-প্রীতির দোষে কি পরিমাণ দোষী ছিলেন তাহা বিরুদ্ধবাদীদের এই সব প্রমাণের ওজন দ্বারাই সুধী সমাজ পরিমিত করিতে পারেন। বংশের কোন

সম্পর্ক নাই, রক্তের কোন সম্পর্ক নাই, মাতা-পিতা সূত্রের কোন সম্পর্ক নাই; দুগ্ধ পানের দরুণ শুধু মাত্র বিবাহ ক্ষেত্রে হালাল-হারামের একটা শরীয়তী মছআলার উদ্ভব হয়। নতুবা ২ × ২॥ বৎসর বয়ঃ-সীমার ভিতর উভয়ে কোন এক মহিলার দুধ পান করিয়াছে—শুধু এতটুকুর দ্বারা কত বড় আত্মীয় বা কত বড় ঘনিষ্ঠ সাব্যস্ত হইতে পারে তাহা সুধী সমাজেরই বিচার্য্য। বিরুদ্ধবাদীদের বোক্‌চায় যদি স্বজন-প্রীতির কোন মজবুত দলীল থাকিত, তবে তাহারা নিশ্চয়ই মাকড়সার সূতার ন্যায় দুর্ব্বলতম সম্পর্ক লইয়া ঢাক পিটাইবার পথ অবলম্বন করিত না।

আবদুল্লাহ ইবনে সায়াদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিয়োগ সম্পর্কে পুরাতন অভিযোগের পুনরাবৃত্তি করা যায়। কেহ বলিতে পারে যে, খলীফা ওসমান (রাঃ) প্রবীণ ও বিশিষ্ট ছাহাবী আমর-ইবনুল-আ'ছ (রাঃ)কে মিশরের গভর্ণরী হইতে অপসারিত করিয়া তদস্থলে স্বীয় দুধ ভাইকে নিয়োগ করিলেন।

এই অপবাদ ও গর্হিত অভিযোগের উত্তরে আমরা ইতিহাসকেই দাঁড় করিব। আমর ইবনুল আ'ছ (রাঃ)কে মিশর হইতে অপসারিত করার হেতু ও কারণ কাহাকেও গড়াইয়া লইতে হইবে না, ইতিহাসেই উহা বিদ্যমান রহিয়াছে। এস্থলে ইতিহাসের দুইটি উদ্ধৃতি পেশ করা হইতেছে—

(১) لما ولى عثمان اقر عمرو بن العاص على عمله وكان لا يعزل احدا الا عن شكاة او استعفاء

"ওসমান (রাঃ) খলীফা হওয়ার পর আমর-ইবনুল-আ'ছ (রাঃ)কে তাঁহার পদে বহাল রাখিলেন। খলীফা ওসমানের নীতি ছিল—কোন প্রকার অভিযোগ বা পদত্যাগ ব্যতিরেকে তিনি কাহারও অপসারণ করিতেন না।"

(২) كان سبب ذلك ان الخوارج من المصريين كانوا محصورين من عمرو بن العاص فجعلوا يعملون عليه حتى شكوه الى عثمان لينزعه عنهم ويولى عليهم من هو الين منه فلم يزل ذلك دأبهم........

"আমর ইবনুল আ'ছ (রাঃ)কে মিশরের গভর্ণরী হইতে অপসারণের কারণ এই ছিল যে—মিশরের এক দল লোক খলীফা ওসমানের আনুগত্য হইতে বিচ্ছিন্নবাদী ছিল। গভর্ণর আমর-ইবনুল-আ'ছ (রাঃ) তাহাদিগকে কোন্‌-ঠাসা করিয়া রাখিয়া ছিলেন। সুতরাং তাহারা তাঁহার বিরুদ্ধে তৎপর হইল, এমনকি তাহারা খলীফা ওসমানের নিকট তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল এবং মিশর

হইতে তাঁহার অপসারণ দাবী করিল। তাঁহার পরিবর্ত্তে তাঁহার অপেক্ষা নরম ও কোমল প্রকৃতির কোন লোককে তথায় নিয়োগেরও দাবী জানাইল। তাহাদের এই দাবী চলিতেই লাগিল। অবশেষে খলীফা ওসমান (রাঃ) আমর-ইবনুল-আ'ছ (রাঃ)কে সম্পূর্ণরূপে অপসারিত না করিয়া তাঁহাকে নামায ইত্যাদি ধর্ম্ম বিষয়ক গভর্ণর এবং তাঁহারই ঘনিষ্ঠ সহকর্ম্মী আবদুল্লাহ ইবনে সায়াদ (রাঃ)কে সামরিক ও রাজস্ব ইত্যাদির গভর্ণর নিয়োগ করিলেন। অতঃপর ঐ বিচ্ছিন্নতাবাদী লোকগুলি উভয় গভর্ণরের মধ্যে চুকলিখোরী করিয়া পরস্পরের মধ্যে বিবাদ ঘটাইয়া দিল। এমনকি তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর অশোভণীয় বাক্‌বিতণ্ডা পর্য্যন্ত হইয়া গেল। এই পরিস্থিতি দৃষ্টে খলীফা ওসমান (রাঃ) আমর ইবনুল আ'ছ (রাঃ)কে লিখিয়া পাঠাইলেন—لا خير لك في المقام عند من يكرهك فاقدم الى
"যাহারা আপনাকে চায় না তাহাদের মধ্যে আপনার থাকা উত্তম হইবে না, অতএব আপনি আমার নিকট চলিয়া আসুন।" (বেদায়াহ ৭—১৭০)

গভর্ণর আমর-ইবনুল-আ'ছ (রাঃ) খলীফা ওসমানের পক্ষে এবং তাঁহারই হিতে কাজ করিয়া যাইতে ছিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধবাদীগণকে সম্পূর্ণরূপে কোন্‌ঠাসা করিয়া রাখিতে ছিলেন। কিন্তু ওসমান (রাঃ) এতই মোখলেছ ও একনিষ্ঠ খলীফা ছিলেন যে, নিজের কোন হিতের জন্যও ক্ষমতার সুযোগ গ্রহণ করা বিশেষতঃ নিজের জন্য কাহাকেও কোন প্রকার হেরাস করা পছন্দ করিতেন না। তাই তিনি মিশরীয় বিচ্ছিন্নবাদীদের অভিযোগ এবং তাহাদের দাবীর প্রতিও মনোযোগী হইয়াছিলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে সায়াদ (রাঃ)কে মিশরের গভর্ণর নিয়োগ সম্পর্কে বিশেষ একটি আকর্ষণীয় বিষয় এই ছিল যে, তিনি ইতিপূর্ব্বে আফ্রিকার বহু এলাকা জয় করিয়াছিলেন। তিনি আফ্রিকা অভিযানের সর্ব্বাধিনায়ক ছিলেন। সেই অভিযানে তাহার অধীনে মদীনারও অনেক মোজাহেদ ছিলেন—

وفيهم جماعة من اعيان الصحابة منهم عبد الله بن عباس وغيره

"তাঁহার অধীনে বিশিষ্ট ছাহাবীগণও ছিলেন—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং আরও অনেকের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।" (কামেল ৩—৪৫)

আবদুল্লাহ ইবনে সায়াদ (রাঃ) খলীফা ওমরের আমলেও "ছায়ীদ" এলাকার গভর্ণর ছিলেন (এছাবাহ ২—৩০৯) এবং আফ্রিকার বিজিত এলাকা সমূহে এক বৎসরের অধিক কাল গভর্ণর ছিলেন (কামেল ৩—৪৬ × ৪৭)। এমতাবস্থায় আফ্রিকারই একটি দেশ মিশরের গভর্ণর তাঁহাকে বানান হইল—ইহাতে খলীফা

ওসমানের কি দোষ হইতে পারে তাহা সুধী সমাজেরই বিচার্য্য। ইতিহাসের এই সব তথ্য দৃষ্টে এরূপ বলা কি অত্যুক্তি হইবে যে, আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেক এবং তাহার সন্ত্রাসবাদী দলের একমাত্র কাজই ছিল খলীফা ওসমান (রাঃ)কে দোষারোপ করা। তাই অগত্যা তাহারা অন্যায়রূপে কতকগুলি অভিযোগ গড়াইয়া লইয়াছে। দুঃখের বিষয় মৌদুদী সাহেব তাহাদেরই অন্ধ অনুসরণ করিয়াছেন। অন্যথায় ইতিহাস-পাতায় উল্লেখিত তথ্য সমূহ তাহার নজরে ভাসিল না কেন? বাস্তবিকই حبك الشى يعمى ويصم "অন্তরে যাহা বদ্ধমূল হইয়া যায় তাহা মানুষকে অন্ধ ও বধির বানাইয়া দেয়।"

মৌদুদী সাহেব ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে সায়াদ ইবনে আবু সারাহ্ (রাঃ) সম্পর্কে এস্থলে দুইটি দোষ উল্লেখ করিয়াছেন—যাহার উদ্ধৃতিও আমরা মহাপাপ মনে করি। কিন্তু খণ্ডনের জন্য উহার আলোচনা অবশ্যই করিতে হইতেছে। মনে হয়, মৌদুদী সাহেব খলীফা ওসমানকে দোষী সাব্যস্ত করাটাকে নিজের ঈমানের অঙ্গরূপে নির্দ্ধারিত করিয়া নিয়াছেন। তাই উহার জন্য এত কোশেশ। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, তাঁহার সব কোশেশ অন্যায়রূপে পরিচালিত এবং আলোচ্য কোশেশটা ত এত জঘন্য যে, ইহার দ্বারা ঈমান পূর্ণ হওয়ার পরিবর্তে ধ্বংস হইতে বাধ্য। একটি দোষের বর্ণনা মৌদুদী সাহেবেরই ভাষায় শুনুন—

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فتح مکہ کے موقع پرجن لوگوں کے بارے میں یہ حکم دیا تھا کہ وہ اگر خانہ کعبہ کے پردوں سے بھی لپٹے ہوئے ہوں انہیں قتل کردیا جائے یہ انہیں سے ایک تھے

"মক্কা বিজয়ের দিন রসুলুল্লাহ (দঃ) কতিপয় ব্যক্তির নামে আদেশ জারি করিয়াছিলেন, তাহারা কাবা শরীফের গেলাফ ধরিয়া থাকিলেও তাহাদেরকে কতল করিয়া ফেলিবে—ঐ ব্যক্তিদের মধ্যে তিনিও একজন ছিলেন।"

পাঠকবর্গ! লক্ষ্য করিবেন, ঐ ব্যক্তিগণ সেই সময় অবশ্যই কাফের ছিল এবং তাহারা ইসলামের শত্রুতায় অত্যন্ত কঠোর ছিল বলিয়া হযরত (দঃ) সদ্য বিজিত মক্কা শহরে দ্রুত শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রবর্ত্তনের জন্য এই অতি স্বাভাবিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, সাধারণ নগরবাসীদের জন্য নিরাপত্তার ঘোষণা দিলেন, আর যে সব লোকদের দ্বারা বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা ছিল প্রথম হইতেই তাহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডের ঘোষণা প্রচার করিয়া দিলেন; যাহাতে তাহারা আত্মগোপনেই ব্যস্ত হইয়া পড়ে, বিঘ্ন সৃষ্টির অবকাশ না পায়। সামরিক অভিযানে বিজিত এলাকায় এরূপ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন অতি স্বাভাবিক।

কোন ছাহাবী সম্পর্কে ইসলাম পূর্ব্বের—কুফরী সময়ের কোন অবস্থা উল্লেখ পূর্ব্বক তাঁহার মর্য্যাদা ক্ষুন্ন করার চেষ্টা যে কি জঘন্য তাহা সুধী সমাজেরই বিচার্য্য। যদি কেহ ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে, তিনি রসুলুল্লার মাথা কাটিয়া আনার জন্য উন্মুক্ত তরবারী নিয়া ঘুরিয়া ছিলেন, অতএব তাঁহাকে ক্ষমতায় বসান দোষণীয়। খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ) সম্পর্কে অভিযোগ যে, তিনিই দায়ী ওহোদ রণাঙ্গণে মোসলমানদের ক্ষয়ক্ষতির জন্য; যথায় মোসলমানগণ এবং রসুলুল্লাহ (দ) সর্ব্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত ও আঘাত কবলিত হইয়াছিলেন, অতএব তাঁহাকে কোন পদ দান করা অপরাধ; এই শ্রেণীর অভিযোগ কোন ঈমানদার বরদাশ্ত করিবে কি? স্বয়ং রসুলুল্লাহ (দঃ) ঘোষণা দিয়াছেন—الاسلام يهدم ما كان قبله "ইসলামের পূর্ব্বে যত অপরাধ ও গোনাহ থাকে ইসলাম গ্রহণ ঐ সবকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেয়।"

মক্কা-বিজয় দিনের উক্ত আদেশে যে ১২।১৩ জনের নাম ছিল তাহাদের প্রায় সকলেই উপস্থিত আত্মগোপনে প্রাণ বাঁচাইয়া বিভিন্ন উপায়ে ইসলাম গ্রহণের সুযোগ নিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ইসলামের অন্যতম গৌরব আবু জাহল-পুত্র একরেমা (রাঃ)ও ছিলেন। এই সব ছাহাবীদের বিরুদ্ধে কাহাকেও—কোন ছাহাবীকে বা তাবেয়ীকে বা কোন মোসলমানকে জনাব মৌদুদীর ন্যায় অভিযোগ করিতে শুনা যায় নাই। হাঁ—আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেক দলীয় কোন কোন মোত্তাফেকের মুখে ঐরূপ অভিযোগ আবদুল্লাহ ইবনে সায়াদ (রাঃ) সম্পর্কে—তাহাও শুধু খলীফা ওসমানের বিরোধিতার ক্ষেত্রে শুনা গিয়াছে (কামেল)। মৌদুদী সাহেব সেখান থেকেই এই পচা-গন্ধ কুড়াইয়াছেন এবং গুরুদের হইতে এক ধাপ অগ্রসর হইয়া আর একটি অভিযোগের জন্ম দিয়াছেন। উহাও তাঁহারই এবারতে শুনুন—

اور عبد الله بن سعد بن ابی سرح تو مسلمان ہونے کے بعد
مرتد ہو چکے تھے

"আবদুল্লাহ ইবনে সায়াদ ত মোসলমান হওয়ার পর মোরতাদ হইয়া গিয়া ছিলেন।"

মৌদুদী সাহেব খোদার ভয় রাখেন কিনা এস্থলে তাহাও সন্দেহজনক হইয়া পড়িয়াছে। একজন ছাহাবী সম্পর্কে এত বড় গুরুতর কথাকে এরূপ গোলমাল ভাবে উল্লেখ করা কতই না জঘন্য! সাধারণ পাঠক এই বর্ণনার মর্ম্ম কি বুঝিবে? মূল ঘটনা এই যে, আবদুল্লাহ ইবনে সায়াদ (রাঃ) মক্কা বিজয়ের বহু পূর্ব্বে একবার মোসলমান হইয়া কিছু দিন পর ইসলাম ত্যাগ করতঃ মক্কায় চলিয়া আসিয়াছিলেন। মক্কা বিজয়কালে পুনঃ ইসলাম গ্রহণ করতঃ চিরজীবন ইসলামের খেদমতেই

কাটাইয়াছেন। সুতরাং এই অভিযোগের ঘটনাটাও ইসলাম-পূর্ব্বেরই। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের চাচাত ভাই আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের ন্যায় বিশিষ্ট ছাহাবীবর্গ এই আবদুল্লাহ ইবনে সায়াদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নেতৃত্বে কাজ করিয়াছেন (কামেল ৩—৪৫)। কেহই তাঁহার এই সমালোচনা করেন নাই। তাঁহারা ত তাঁহার সম-সাময়িক ছিলেন। মৌদুদী সাহেব ত ১৩০০ বৎসর পরে জন্মিয়াছেন।

ছাহাবা-তাবেয়ীগণ এই শ্রেণীর কোন ইসলাম-পূর্ব্ব অবস্থার কারণে কোন ছাহাবীর অযোগ্যতার ধারণাও করিতেন না। পূর্ব্বালোচিত আল্‌কামাহ ইবনে ওলাছাহ (রাঃ) ত মক্কা বিজয়কালেই প্রথম ইসলাম গ্রহণ করতঃ খলীফা আবু বকর ছিদ্দীকের আমলে মোরতাদ—ইসলাম ত্যাগী হইয়া গিয়া ছিলেন। তারপর পুনঃ ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং খলীফা ওমর (রাঃ) তাঁহাকে "হুরান" এলাকার গভর্ণর মনোনীত করিয়াছিলেন। (বেদায়াহ, ৭—১৪২)

খলীফা ওসমান (রাঃ) সম্পর্কে আরও কতিপয় অভিযোগ

খলীফা ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নীতির ভুল প্রতিপন্ন করিতে ব্যর্থ প্রচেষ্টায় ভিত্তিহীন অভিযোগ আমদানী করার শালীনতাহীন অপরাধ মৌদুদী সাহেব অনেকই করিয়াছেন। এযাবৎ ঐ সবের সংক্ষেপ সমালোচনাই করা হইল। তদুপরি তিনি আরও কতিপয় অসঙ্গত অভিযোগ আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে সেইগুলি তাঁহার প্রলাপ বৈ আর কিছু নহে। ঐগুলির সমালোচনাও পাঠক সমক্ষে পেশ করা হইতেছে—

(১) মৌদুদী সাহেব মোয়াবিয়া (রাঃ), সায়ীদ ইবনুল আ'ছ (রাঃ), আবদুল্লাহ ইবনে সায়াদ (রাঃ) ও আবদুল্লাহ ইবনে আমের (রাঃ) এই চার জন গভর্ণরের শাসিত এলাকাগুলিকে একত্রে যোগ করিয়াছেন। তারপর ভৌগলীক পাণ্ডিত্যে আস্ফালন দেখাইয়া অভিযোগ করিয়াছেন যে, এই সব গভর্ণরদের শুধু যোগ্যতা ইহার জন্য যথেষ্ট ছিল না যে, খোরাসান হইতে উত্তর আফ্রিকা পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ এলাকা একই খান্দানের গভর্ণরদের হাতে দিয়া দেওয়া হয়। অর্থাৎ খলীফা ওসমান (রাঃ) উক্ত সমুদয় এলাকা ঐ চার জন গভর্ণরের হাতে দিয়া ছিলেন—ইহাও তাঁহার নীতির একটা ভুল ধারা; যেহেতু ঐ গভর্ণরগণ একই খান্দানের ছিলেন।

কি দৌরাত্ম! ১৩০০ বৎসর পর প্রায় ৫০০০ মাইল দুরে থাকিয়া মৌদুদী সাহেব রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় খলীফা ওসমান (রাঃ)কে ভুল নীতি গ্রহণে অভিযুক্ত করিলেন—ইহা কিরূপ অনধীকার চর্চ্চা সেই বিচার সুধী সমাজই করিবেন। আমরা

দেখাইতে চাই, এ ক্ষেত্রেও মিথ্যা ও ভিত্তিহীন তথ্যের উপর অভিযোগটার ভিত্তি স্থাপন করা হইয়াছে। কারণ, "খান্দান" অর্থ বংশ—একই খান্দান অর্থ এক বংশ। অথচ যে চার জন গভর্ণরের এলাকাকে মৌহুদী সাহেব একত্রে যোগ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে তৃতীয় জন—আবদুল্লাহ ইবনে সায়াদ ইবনে আবু সারাহ (রাঃ) যাঁহার বদৌলতে মৌহুদী সাহেব স্বীয় যোগের মধ্যে আফ্রিকা মহাদেশের নাম উল্লেখ করার সুযোগ পাইয়াছেন, কারণ তিনি মিশরের গভর্ণর ছিলেন। আর চতুর্থ জন—আবদুল্লাহ ইবনে আমের (রাঃ) যাঁহার বদৌলতে খোরাসানকে যোগ করার সুযোগ পাইয়াছেন, কারণ তিনি খোরাসান সহ বৃহত্তম বছরার গভর্ণর ছিলেন—এই দুই জন পরস্পর বা অপর দুই জনের বা খলীফা ওসমানের এক বংশীয় কখনও ছিলেন না। এই ব্যাপারে মৌহুদী সাহেব যে কোন চ্যালেঞ্জে পরাজিত হইতে বাধ্য হইবেন। আর যদি দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্য বশতঃ শুধু দুগ্ধ পানের সম্পর্ক এবং মাতার ভ্রাতার নছবের সম্পর্কের দরুণ খলীফা ওসমানের মাধ্যমে সকলকে এক খান্দান ধরা হয়, তবে ত সব কিচ্ছাই খতম। কারণ "খান্দান" শব্দের এই বিশাল বিস্তীর্ণ অর্থে আল্লার রসুল (দঃ), তাঁহার খলীফা আবু বকর (রাঃ), তাঁহার উত্তরাধিকারী ওমর (রাঃ) বরং আলী (রাঃ) সহ আদম সন্তানের বিরাট অংশ খলীফা ওসমানের খান্দান ভুক্ত হইয়া যাইবেন। তাহাতে মৌহুদী সাহেব চক্ষু বন্ধ করিয়া যোগ-বিয়োগ দেওয়া ব্যতিরেকেই অভিযোগ খাড়া করার অবকাশ পাইয়া যাইবেন যে, খলীফা ওসমানের খান্দানই পুর্ব্বাপর এবং সর্ব্বত্র ক্ষমতা দখল করিয়াছিল।

(২) মৌহুদী সাহেব মোয়াবিয়া (রাঃ), ওলীদ ইবনে ওকবাহ (রাঃ), আবদুল্লাহ ইবনে সায়াদ (রাঃ) এই তিন জনের ব্যাপারে খলীফা ওসমানের উপর আরও একটা এমন হীন অভিযোগ দাঁড় করিয়াছেন যাহা তাঁহার সমস্ত কুকীর্ত্তিকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। উক্ত ছাহাবীত্রয় সম্পর্কে মৌহুদী সাহেব বলিয়াছেন, তাঁহারা তোলাকার মধ্যে শামিল ছিলেন ; অর্থাৎ মক্কা বিজয় কালে তাঁহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই তথ্যের উপর মৌহুদী সাহেব তাঁহার কুখ্যাত পুস্তকের ১০৯ পৃষ্ঠায় খলীফা ওসমান (রাঃ)কে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন যে, এত বিলম্বে যাঁহারা মুসলমান হইয়াছিলেন ওসমান (রাঃ) তাঁহাদিগকে চাকুরীর উন্নতি দিয়াছিলেন।

পাঠক! এই অভিযোগের আসল আবিষ্কারক আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকের খারেজী দল। তাহারা মুলতঃ উক্ত তিন জনকে গভর্ণরী পদ দেওয়ার উপরই উক্ত অভিযোগ খাড়া করিয়াছিল। সেই অভিযোগ খণ্ডনে বলা হইত যে, উক্ত গভর্ণরত্রয়ের মধ্যে শুধু মাত্র একজন—আবদুল্লাহ ইবনে আমের (রাঃ) ব্যতীত অপর দুই জনকে ত ওমর (রাঃ)ই গভর্ণর বানাইয়া ছিলেন।

চতুর মৌহুদী সাহেব উক্ত খণ্ডন ও জবাবটাকে কাটাইয়া যাওয়ার জন্য শিষ্য হইয়া গুরুদের কথার (Revise) সংশোধন করিয়াছেন যেন খলীফা ওসমান অভিযুক্ত হন এবং খলীফা ওমর উহা হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন। তিনি অভিযোগটাকে এই ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন—

جو لوگ دور عثمانی میں آگے بڑھائے گئے وہ سب طلقاء میں سے تھے

"খলীফা ওসমান তোলাকাদিগকে চাকুরীর উন্নতি দিয়া ছিলেন।"

সুধী সমাজ বিচার করিবেন, যাহাদেরকে গভর্ণরী পদ দেওয়া অপরাধ ছিল না, পরবর্ত্তী সময়ে তাঁহাদেরকে বহাল রাখা এবং তাঁহাদের অভিজ্ঞতা প্রমাণে উন্নতি দেওয়া কি অপরাধ হইতে পারে? এরপর মৌহুদী সাহেব দুঃসাহসী হইয়া আরও অধিক জঘন্য একটি মন্তব্য করিয়াছেন। প্রবাদ আছে— دروغ گورا حافظہ نباشد অর্থাৎ "অবাস্তব কথা দ্বারা যাহারা কাজ ফতেহ করিতে চায় তাহাদের কথায় গড়মিল থাকিবেই।" মৌহুদী সাহেব প্রথম ধাপে অযৌক্তিক পার্থক্যের দ্বারা হইলেও মুল অভিযোগটাকে Revise—সংশোধন করিরাছেন যাহাতে অভিযোগটার আঁচ খলীফা ওমরের গায়ে না লাগে। কিন্তু এই পৃষ্ঠায়ই দ্বিতীয় ধাপে তিনি ঐ তোলাকাদের সম্পর্কে এমন ধৃষ্টতাপূর্ণ ও জঘন্য আক্রমাত্মক উক্তি করিয়াছেন যাহা ১৪০০ বৎসরের মধ্যে কোন মোসলমান করে নাই। এমনকি আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকও বলিতে সাহসী হয় নাই। সেই উক্তির দ্বারা মৌহুদী সাহেব খলীফা ওসমানের সঙ্গে খলীফা ওমরকেই নয় শুধু—খলীফ আবু বকরকেও ভীষণভাবে ঘায়েল করিয়াছেন। কি দুঃসাহস! কি দৌরাত্ম্য। কি জঘন্য উক্তি!—

اسلامی تحریک کی سربراہی کے لئے یہ لوگ موزون نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ وہ ایمان تو ضرور لے آئے تھے مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و تربیت سے انکو اتنا فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں ملا تھا کہ ان کا ذہن اور سیرت و کردار کی پوری

قلب ماہیت ہوجاتی

"ইসলামী আন্দোলনের অধিনায়কত্বের জন্য এই লোকগুলি (তথা যাঁহারা মক্কা বিজয়কালে ইসলাম গ্রহণ পূর্ব্বক ছাহাবী হইয়াছিলেন) উপযোগী গণ্য হইতে পারেন না। কারণ, তাঁহারা ঈমান আনিয়া ছিলেন বটে, কিন্তু নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সাহচর্য্য ও সুশিক্ষা দ্বারা উপকৃত হওয়ার ঐ পরিমাণ সুযোগ তাঁহারা পাইয়া ছিলেন না যাহাতে তাঁহাদের জ্ঞান-বিবেক, চরিত্র ও কার্য্যধারার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারিত।"

সাবাস—মৌত্বদী সাহেব! কি পূতি-গন্ধের উদ্‌গিরণ আপনি করিলেন তাহা বোধ হয় আপনার অনুভূতি আঁচ করিতে পারে নাই। তবে শুনুন—

(১) ছাহাবা কেরামের যে তারতম্যের উপর আপনার মনগড়া রায় প্রদান করিলেন ইহার কোন প্রমাণ আপনার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন মোসলমানের উক্তিতে দেখাইতে পারেন কি? "কচু গাছ কাটিতে কাটিতে মানুষ ডাকাতে পরিণত হয়।" আপনার ভূমিকা কি তদপেক্ষা জঘন্য নয়? এক যুগ পূর্ব্বে আপনি একটা ধূম্রজাল সৃষ্টি করিয়াছিলেন "ছাহাবীগণ সত্যের মাপকাটি নহেন"। দ্বিতীয় ধাপে আপনি কতকগুলি অসত্য ও অবাস্তব ইতিহাসের হাওয়ালা বা রেফারেন্সের আড়ালে ছাহাবীদের দোষ-চর্চ্চা করিলেন। তৃতীয় ধাপে আপনি কোন প্রকার হাওয়ালা ও রেফারেন্স ব্যতিরেকেই দলীলহীন একটা অলীক রায় ছাহাবাদের সম্পর্কে জাহির করিলেন—ইহা কত বড় জঘন্য দুঃসাহস।

(২) মনে হয়—আল্লার রসুলের ছাহাবীগণকে আপনি আপনার ভক্তদের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন এবং নিজের সাহচর্য্যের দ্বারা রসুলের সাহচর্য্যকে পরিমাপ করিয়াছেন। নতুবা মক্কা বিজয়ের সময়ে যাঁহারা মোসলমান হইয়াছিলেন—তাঁহারা সুদীর্ঘ ২ বৎসর কাল রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পরশ-দৃষ্টি ও সাহচর্য্যের অমোঘ মৃতসঞ্জীবনী লাভের সুযোগ পাইয়া ছিলেন। তবুও আপনি তাঁহাদের প্রতি বিরূপ ভাবাপন্ন? ইহা কতই না জঘন্য!

(৩) দুই বৎসর সাহচর্য্য যথেষ্ট না হইলে কি পরিমাণ সময়ের সাহচর্য্য দ্বারা ছাহাবীগণ আপনার রায়ে ইসলামী আন্দোলনের অধিনায়কত্বের যোগ্য হইতে পারেন, তাহা ব্যক্ত করিয়া দিলে আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতাম। কারণ, অযোগ্যতার সময়-পরিমাণ যদি আরও কিছু বর্দ্ধিত হইয়া পড়ে তবে ত ইসলাম-আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ), আমর ইবনুল আ'ছ (রাঃ) এবং আরও অনেক যাঁহাদের ব্যক্তিত্বকে আন্তর্জাতিক পর্য্যায়ে হযরত রসুলল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিরাট মোজেযা গণ্য করা হয়, ঐ শ্রেণীর অনেক ছাহাবীই আপনার দলীল-প্রমাণহীন অলীক রায় অনুসারে অধিনায়কত্বের যোগ্যতা হারাইবেন; যেহেতু তাঁহারা মক্কা বিজয়ের বেশী পূর্ব্বে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন না। ইহা কি কোন মোসলমান বরদাশ্‌ত করিবে?

(৪) খলীফা ওসমান (রাঃ)কে ঘায়েল করার জন্য ১৩০০ শত বৎসর পর ছাহাবীদের যোগ্যতার এই মাপকাঠি আপনি গড়াইয়াছেন এবং মোয়াবিয়া (রাঃ), আবদুল্লাহ ইবনে সায়াদ (রাঃ), ওলীদ ইবনে ওকবাহ (রাঃ)কে আপনার গড়ান মাপকাঠি দ্বারা অযোগ্য ঘোষণা করতঃ খলীফা ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা

আনহুর প্রতি দোষারোপ করিতে প্রয়াশ পাইয়াছেন যে, তিনি এই সব অযোগ্যদিগকে নিজ বংশের হওয়ায় চাকুরীর উন্নতি দিয়া ছিলেন।

এই বিষাক্ত রায় সাব্যস্ত করাকালীন আপনি লক্ষ্য করেন নাই যে, এই অপরাধে খলীফা ওমর (রাঃ) প্রথম অপরাধী সাব্যস্ত হইবেন ? কারণ উক্ত তিন জনকে বহু পূর্ব্বেই খলীফা ওমর (রাঃ) গভর্ণরী পদ দিয়া ছিলেন এবং মোয়াবিয়া (রাঃ)কে একাধারে আট বৎসর গভর্ণর রাখিয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে আরও এক বৎসর সুযোগ দানের অছিয়ত করিয়া গিয়া ছিলেন। মক্কা বিজয় কালে ইসলাম গ্রহণ কারী আরও অনেককে ওমর (রাঃ) গভর্ণর করিয়াছিলেন, যেমন—দামেশকের প্রথম গভর্ণর এজিদ ইবনে আবু সুফিয়ান মক্কা বিজয়কালে মোসলমান হইয়াছিলেন। তিনি ওমর (রাঃ) কর্ত্তৃক দামেশ্‌কের গভর্ণর মনোনীত হইয়া শেষ জীবন পর্য্যন্ত ঐ পদে বহাল ছিলেন (বেদায়াহ, ৭—৯৫)। আলকামাহ্ ইবনে ওলাছাহ্ (রাঃ)ও মক্কা বিজয়কালের মোসলমান ছিলেন। ওমর (রাঃ) তাঁহাকে "হুরান" এলাকার গভর্ণর মনোনীত করিয়াছিলেন এবং সারা জীবন তিনি তথায়ই ছিলেন। (বেদায়াহ, ৭—১৪২)

আপনার জন্ম দেওয়া মাপকাঠির পরিমাপে অযোগ্য গভর্ণর মনোনয়নের অপরাধ ওসমান (রাঃ)কে ছাড়াইয়া শুধু খলীফা ওমরের উপর ক্ষান্ত হইবে না। সেই অপরাধে রসুলুল্লার খলীফা আবু বকরও জড়িত হইবেন। কারণ দামেশকের প্রথম গভর্ণর এজিদ ইবনে আবু সুফিয়ানের নিয়োগ একা খলীফা ওমরের দ্বারাই হইয়াছিল না, এই নিয়োগ সম্পর্কে খলীফা আবু বকর (রাঃ) ওয়াদাদ্ধ ছিলেন (বেদায়াহ, ৭—২৪)। সুতরাং এই নিয়োগে খলীফা আবু বকর জড়িত ছিলেন ; অথচ এজিদ ইবনে আবু সুফিয়ান মক্কা-বিজয় সময়েই মোসলমান হইয়াছিলেন। মৌদুদী সাহেব তাঁহার পুস্তকের প্রতি আলেম সমাজের ধিক্‌কার ও ঘৃণা দেখিয়া উহার সঙ্গে সংযোজনীও বৰ্দ্ধিত করিয়াছেন। তথায় ৩২৫ পৃষ্ঠায় তিনি বিড়ালের মল ঢাকার ন্যায় তাঁহার আলোচ্য এই অবাঞ্ছিত উক্তির দুর্গন্ধ ঢাকিবার জন্য যাহা করিয়াছেন তাহাও সপূর্ণ ব্যর্থ কোশেশ। এইবার তিনি বলিয়াছেন—

مگر یہ پالیسی نہ حضور کی تھی اور نہ شیخین کی کہ سابقین اولین کے بجائے اب ان لوگوں کو آگے بڑھایا جائے اور مسلم معاشرے اور ریاست کی رہنمائی و کار فرمائی کے مقام پر یہ فائز ہوں

"হুজুরের এবং আবু বকর ও ওমরের এই নীতি ছিল না যে, প্রথম দিকে যাঁহারা মোসলমান হইয়াছিলেন তাঁহাদের পরিবর্ত্তে এই লোকদেরকে (যাঁহারা

মক্কা বিজয়কালে মোসলমান হইয়াছিলেন) উন্নতি দেওয়া হউক এবং মোসলেম সমাজের ও রাষ্ট্রীয় অধিনায়কত্বে কোন পদে তাঁহারা অধিষ্ঠিত হউক।"

কাহারও হইতে কোন ভুল তথ্য নিঃসৃত হইয়া পড়িলে সেস্থলে ভুল স্বীকার করিয়া নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। অন্যথায় একটি মিথ্যাকে দাঁড় করিয়া রাখার জন্য দশটা মিথ্যা পরিবেশন করিতে হইবে। মৌহুদী সাহেব সেই ফাঁদেই পড়িয়াছেন। একটি ভুল মন্তব্য পরিবেশনের পর মুখ ঢাকিবার জন্য যে অজুহাত দিয়াছেন তাহাও ডাহা মিথ্যা, ইতিহাসের পরিপন্থী।

সিরিয়ার প্রাণকেন্দ্র দামেশ্‌ক অঞ্চল মোসলমানগণ সর্ব্বপ্রথম জয় করিতে চলিয়াছেন, ঠিক তখনই খলীফা আবু বকর (রাঃ) উহার গভর্ণর-পদের জন্য এজিদ ইবনে আবু সুফিয়ানের পক্ষে ওয়াদা করিলেন। দামেশ্‌ক বিজয় মুহূর্ত্তে তিনি ইহজগত ত্যাগ করার পর খলীফা ওমর (রাঃ) তাঁহার ওয়াদাকে অক্ষরে অক্ষরে কার্য্যে পরিণত করিলেন এবং এজিদ ইবনে আবু সুফিয়ান (রাঃ)কে দামেশ্‌ক অঞ্চলের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ এলাকার সর্ব্বপ্রথম গভর্ণর নিযুক্ত করিলেন। অথচ এজিদ ইবনে আবু সুফিয়ান মক্কা-বিজয় সময়ে ইসলাম গ্রহণকারী ছিলেন (বেদায়াহ, ৭—৯৫)। এতদ্ভিন্ন খলীফা ওমর (রাঃ) মোয়াবিয়া (রাঃ)কে দীর্ঘ আট, বরং নয় বৎসর কাল সিরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের গভর্ণর রাখিয়াছিলেন। হিজরী ২১ সনে তিনি একযোগে সমুদয় গুরুত্বপূর্ণ উপকূলবর্ত্তী এলাকা সহ ছয়টি প্রদেশের একক গভর্ণর খলীফা ওমরের পক্ষ হইতে ছিলেন; মোয়াবিয়া (রাঃ)ও মক্কা-বিজয় সময়ের মোসলমান ছিলেন। ইতিহাসের এই সব তথ্য হইতে অন্ধ ব্যক্তিরাই মৌহুদী সাহেবের উক্ত সংযোজনীর বক্তব্যকে সমর্থন করিতে পারে।

আগে-পরের ছাহাবীদের তারতম্যে আবুবকর ও ওমরের যে নীতির দাবী মৌহুদী সাহেব করিয়াছেন ইতিহাসের আলোচনায় উহা মিথ্যা প্রমাণিত হইল। রসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নীতিও উহাই ছিল বলিয়া তিনি দাবী করিয়াছে। এস্থলে মৌহুদী সাহেব এই হাদীছটি স্মরণ করিলে ভাল হইত—

من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

"যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত কোন বিষয়কে মিথ্যারূপে আমার বলিয়া উল্লেখ করে সে যেন জানিয়া রাখে, তাহার শেষ ঠিকানা জাহান্নামে।"

মৌহুদী সাহেবকে ছাহাবীগণ সম্পর্কে তাঁহার অবৈধ ভূমিকা হইতে সংযত হওয়ার অনুরোধ করিতে অসংখ্য আলেম-ওলামার প্রচেষ্টা ব্যয়িত এবং ব্যর্থ হইয়াছে। পরিশিষ্টের ভূমিকায় যুগ-বরণীয় তিনজন মহা মনীষীর বক্তব্যের উদ্ধৃতি প্রদানের কথা বলা হইয়া ছিল। পরিশিষ্টের সমাপ্তিতে তাহাই পেশ করা হইতেছে—

মৌদুদী সাহেব সম্পর্কে

হযরত মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ শফী (রঃ) মুফতি-আজম পাকিস্তান-এর সর্ব্বশেষ মতামত

[লিখিত একটি প্রশ্নের উত্তরে তাঁহার মতামত ব্যক্ত হইয়াছে। অতঃপর ঐ বক্তব্য "জাওয়াহেরুল-ফেকাহ" নামক কেতাবে প্রকাশিত হইয়াছে।]

প্রশ্ন ঃ— হযরত আকদাছ মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ শফী সাহেব মুফতি আজম পাকিস্তান! আচ্ছালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহূ—

নিবেদন এই যে, জনাব অবগত আছেন যে, এই অধম টেণ্ডুল্লাইয়ার দারুল উলুম ইসলামিয়া মাদ্রাসায় ফতওয়া দান কার্য্যের দায়িত্বে রহিয়াছে। এখানে বিভিন্ন রকমের প্রশ্নাদি আসিয়া থাকে। অনেক সময় এই প্রশ্নও আসিয়া থাকে যে, মৌদুদী সাহেব এবং তাঁহার অনুসারী দল "আহ্‌লুছ-ছুন্নতে-অল-জমায়াত" সম্প্রদায়ের তরিকার উপর আছেন কি না? এবং চার মজহাব হইতে কোন্ মজহাবের সঙ্গে তাহাদের সম্পর্ক? এবং তাহাদের ইমামতীতে নামায পড়ার হুকুম কি?

আর তাহাদের সম্পর্কে যে, প্রসিদ্ধ—"ছাহাবা রাজিয়াল্লাহু আনহুম সম্পর্কে তাহাদের ধ্যান-ধারনা পূর্ব্বাপর মনীষীবৃন্দের বিপরীত"—এই কথার বাস্তবতা কতটুকু? কোন কোন লোক আপনার পুরাতন কোন লেখার ভিত্তিতে আপনার সম্পর্কে বলিয়া থাকে যে, আপনি তাহাদের মতামতের সমর্থক—ইহার প্রকৃত বৃত্তান্ত কি? ইতি—সালাম

আহকার— **মোহাম্মদ অজীহ**
দারুল-উলুম, টেণ্ডুল্লাইয়ার
সিন্ধ্ (পাকিস্তান)

বিছমিল্লাহির রহমানির রহীম

উত্তর ঃ—মাওলানা মৌদুদী সাহেব এবং জমাতে-ইসলামী সম্পর্কে আমার নিকটও কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত প্রশ্ন আসিয়াছে। সেই পূর্ব্বকালে তাঁহার সম্পর্কে আমার যাহা কিছু জানা ছিল—আমার জানা-মতে আমি ঐ সময় ঐ সব প্রশ্নের উত্তর দিয়াছি; যাহার কোন কোনটা প্রকাশিতও হইয়াছে। ঐ সব উত্তর-মালা এখন সংগ্রহ করা সম্ভব নহে।

তবে ইতিমধ্যে তাঁহার অনেক প্রবন্ধ পাঠ করার সুযোগ আমার হইয়াছে এবং তাঁহার কিছু নূতন রচনাবলীও আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন তাঁহার রচনাবলীর সাধারণ প্রতিক্রিয়া এবং তাঁহার দলের অবস্থাসমূহ বেশী করিয়া দেখার সুযোগও আমার হইয়াছে। এই সব অভিজ্ঞতার সমষ্টি দ্বারা তাঁহার সম্পর্কে আমার যে সিদ্ধান্ত সাব্যস্ত হইয়াছে তাহা আমি অবিকলভাবে নিম্নে বর্ণনা করিতেছি। আমার পূর্ব্বেকার লেখাসমূহ যদি আমার এই নূতন লেখার অনুরূপ দেখা যায় তবে ত উহা ঠিকই থাকিবে। আর যদি পূর্ব্বের কোন লেখা আমার এই নূতন লেখার ব্যতিক্রমের হয় তবে পূর্ব্বের লেখাকে মনছুখ—পরিত্যক্ত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। (আলোচ্য প্রশ্নের উত্তরের ব্যাপারে) এখন হইতে আমার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে একমাত্র নিম্নে বর্ণিত লেখাকেই নির্ভরযোগ্য গণ্য করিতে হইবে।

আমার নিজের অভিজ্ঞতা অনুসারে—

● মওলানা মৌদূদী সাহেবের মূল ভ্রান্তি এই যে, তিনি "আকায়েদ ও আহকাম" —ইসলামী মতবাদ ও মছআলা-মছায়েল সম্পর্কে নিজস্ব ইজতেহাদের অনুসরণ করিয়া থাকেন। যদিও তাঁহার ইজতেহাদ পূর্ববর্ত্তী আলেম সম্প্রদায়ের ব্যতিক্রমে হয়।

● অথচ আমার জানা মতে ইজতেহাদের শর্ত্তসমূহ তাঁহার মধ্যে বিদ্যমান নাই।

● এই মূল ভ্রান্তির কারণে তাঁহার রচনার মধ্যে অনেক বিষয় ভুল এবং আহলে-ছুন্নত আলেম সম্প্রদায়ের মতের বিপরীত বিদ্যমান রহিয়াছে।

● এতদ্ভিন্ন তিনি স্বীয় রচনাবলীতে পূর্ববর্ত্তী আলেমগণের উপর, এমনকি ছাহাবায়ে কেরাম রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমের উপরও "তানকীদ" তথা ভুল ধরার যে ভাব-ভঙ্গি অবলম্বন করিয়াছেন তাহা নিতান্তই গলৎ—ভ্রান্তি।

● বিশেষতঃ "খেলাফৎ ও মুলুকিয়ৎ*" প্রবন্ধে কতিপয় ছাহাবায়ে-কেরাম রাজিয়াল্লাহু আনহুমকে শুধু তানকীদই নয় বরং তাঁহাদিগকে তিরস্কার, ভৎর্সনা ও নিন্দা-মন্দের তীর দ্বারা আঘাত করা হইয়াছে।

● আর বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে এই বিষয়টির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হইলেও তিনি নিজ কথার উপর যেরূপ গোঁড়ামি প্রদর্শনের ভূমিকা অবলম্বন করিয়াছেন তাহা আহ্‌লে-ছুন্নত-অল-জমাতের আলেম সম্প্রদায়ের রীতি-নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত।

● এতদ্ভিন্ন তাঁহার সব রচনাবলীরই প্রতিক্রিয়া পাঠকদের উপর বেশীর ভাগই এইরূপ অনুভূত হয় যে, পূর্ববর্ত্তী মনীষীবৃন্দের প্রতি আস্থা থাকে না। আর আমাদের মতে এই আস্থাই দ্বীন-ধর্ম্মকে সুরক্ষিত রাখার বড় প্রাচীর। কেহ এই প্রাচীর হইতে বাহির হইয়া গেলে পূর্ণরূপের ভাল নিয়্যত এবং এখ্‌লাছ ও একনিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও অত্যন্ত ভুলে এবং ভ্রান্ত পথে পতিত হইয়া যাইতে পারে।

* এই প্রবন্ধটিরই সমালোচনা অত্র পরিশিষ্টে করা হইয়াছে।

হাঁ—ইহা সত্য যে, হাদীছ অস্বীকারকারী, কাদিয়ানী বা স্বেচ্ছাচারী শ্রেণীর মধ্যে তাঁহাকে গণ্য করা আমার মতে ঠিক নহে। ঐ শ্রেণীর লোকেরা ত সূদ, জুয়া, মদ ইত্যাদি ইসলামের সুস্পষ্ট হারামকে হালাল সাব্যস্ত করার জন্য কোরআন-হাদীছের বিকৃতি সাধন করিয়া থাকে। ইহার বিপরীত তাঁহার রচনাবলী ঐ শ্রেণীর লোকদের বিরুদ্ধে বিশেষভাবে আধুনিক শিক্ষিত লোকদের মধ্যে ক্রিয়া করিয়াছে এবং তাহাদের উপকার হইয়াছে। শুধু এতটুকু কথাই আমি বলিয়া আসিতেছি। আমার এই কথার উপর ভিত্তি করিয়া যদি কেহ বলে যে, আমি মৌহুদী সাহেবের ঐ সব মতামতের সমর্থনকারী যাহা তিনি পূর্ব্বাপর ওলামা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অবলম্বন করিয়াছেন, তবে তাহা একেবারেই ভুল এবং অবাস্তব কথা হইবে।

● যদিও জমাতের গঠনতন্ত্রে মাওলানা মৌহুদী সাহেব এবং জমাতে-ইসলামী ভিন্ন ভিন্ন পরিগণিত। এবং আইন-কানুনের দৃষ্টিতে মাওলানা মৌহুদীর উপর যাহা প্রয়োগ করা যায় তাহা জমাতে ইসলামীর উপর প্রযোজ্য হওয়ার বাধ্য বাধকতা নাই। কিন্তু কার্য্য ক্ষেত্রে জমাতে ইসলামী মাওলানা মৌহুদীর রচনাবলীকে শুধু কেবল নিজেদের শিক্ষার কেন্দ্র করিয়া ক্ষান্ত থাকে নাই। বরং উহাকে তাহাদের কার্য্যের ভিত্তি এবং প্রোগ্রামও বানাইয়া রাখিয়াছে। তদুপরি প্রতি ক্ষেত্রে পরিদৃষ্ট হয় যে, তাহারা ঐসব রচনাবলীর বিরোধীতাকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করিয়া থাকে*।

● ইহার দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, জমাতে ইসলামীর সদস্যরা ঐসব মতবাদ ও রচনাবলীর সহিত সম্পূর্ণ একমত। যদি কেহ সত্যই এইরূপ হন যে, ঐ ধরণের বিষয়ে মৌহুদী সাহেবের বিরোধী হন এবং আহ্‌লে-ছুন্নত আলেম সম্প্রদায়ের মতামতকে উহার বিরুদ্ধে সঠিক সত্য গণ্য করেন তবে তাঁহার উপর অভিযোগ আসিবে না।

● নামায সম্পর্কে মছআলাহ এই যে, ইমাম এইরূপ ব্যক্তিকে বানানো উচিৎ যে, আহ্‌লে-ছুন্নতের অনুসারী হয়। অতএব যাহারা মৌহুদী সাহেবের ঐসব বিষয়ের সঙ্গে একমত হয় তাহাকে স্বেচ্ছায় ইমাম বানান জায়েয ও দুরুস্ত নহে। অবশ্য যদি তাহাদের পেছনে কোন নামায পড়িয়া থাকে তবে সেই নামায শুদ্ধ গণ্য হইবে।

বন্দা মোহাম্মদ শফী

১২ রবিউল-আউআল ১৩৯৫ হিজরী

[জাওয়াহেরুল-ফেকাহ, ১—১৭০]

---

* লক্ষ্য করুন! মৌহুদী সাহেবের "খেলাফৎ ও মুলুকিয়ৎ" রচনাটি অতি জঘন্য এবং ইসলাম ও মোসলমানদের পক্ষে কলঙ্কময় রচনা। সমস্ত আলেম সম্প্রদায় ইহার প্রতি ক্ষুব্ধ। ইহার বিরুদ্ধে প্রামাণিক সত্য তথ্যাবলী এই পরিশিষ্টে সঙ্কলন করায় বাংলা দেশের জমাত ইসলামী মার্কা খুদে নেতা যাহাদেরে "তেনা" বলিলে অত্যুক্তি হয় না তাহারা পর্য্যন্ত এই পরিশিষ্টের প্রতি ক্ষেপিয়া গিয়াছে।

মৌহুদী সাহেব সম্পর্কে

মাওলানা জাকারিয়া সাহেব মোহাজেরে-মদনী, শায়খুল-হাদীছ মাদ্রাসা মাজাহেরে-উলুম, সাহারন পুর (ইণ্ডিয়া)

"ফেৎনায়ে-মৌহুদিয়ত" (মৌহুদী-ধ্যান ধারনার দ্বারা দ্বীন-ঈমানের বিপর্য্যয়) নামীয় একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ হইতে অতি সংক্ষিপ্ত কতিপয় উদ্ধৃতি মাত্র।

● শায়খুল-হাদীছ সাহেব একজন মৌহুদীভক্তকে লিখিয়াছেন---আপনার সমাবেশে প্রত্যেকেই জোর গলায় বলিয়াছে---(বিরুদ্ধবাদী) লোকেরা (মৌহুদী সাহেবের) রচনাবলী পাঠ করে না, শুধু শুনা কথার উপর ভিত্তি করিয়া রায় দান করে।

শায়খুল-হাদীছ সাহেব বলেন—ঐ উক্তি আমাকে বাধ্য করিয়াছে ; আমি তাঁহার রচনাবলীকে গভীর দৃষ্টিতে পাঠ করায় অনেক সময় ব্যয় করিয়াছি। উহা পাঠে আমি যতই অগ্রসর হইয়াছি ততই স্তম্ভিত হইয়াছি । আমি হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছি যে, ঐ রচনাবলীর গর্হিত মতবাদসমুহকে কি করিয়া আপনি সহ্য করিলেন !

● দ্বীনীয়াৎ বা ধর্ম্মীয় বিষয়াবলী---বিশেষতঃ ইজতেহাদ এবং তাছাওফ বা ছুফীবাদ এবং পূর্ব্বাপর মনীষীবৃন্দের জীবন-সাধনার গবেষণাসমুহের ব্যাপারে আমার এতটুকু ত জানা ছিল যে, মৌহুদী সাহেব ঐ সবের বিরোধী। কিন্তু আমি কখনও ভাবি নাই যে, উহার (তথা তাছাওফ ও পূর্ব্বাপর মনীষীবৃন্দের) বিরুদ্ধে যখন তিনি কলম ধরেন তখন তিনি নিয়ন্ত্রনের সম্পূর্ণ বাহিরে চলিয়া যান। তাঁহার জ্ঞান-বোধে ইহাও থাকে না যে, আমি কাহার বিরুদ্ধে কলম চালাইতেছি !

● মৌহুদী সাহেবের রচনাবলী পাঠ করার বিষময় ফলের উল্লেখে তিনি বলেন—"উহার অতি ছোট একটি হইল—পূর্ব্বাপর মনীষীবৃন্দ এবং ইসলামের কর্ণধারগণের সম্মানে আঘাত ও বেয়াদবী করা। যথা—"হযরত ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মধ্যে খলীফা হওয়ার যোগ্যতা ছিল না।" (মৌহুদী সাহেবের কুখ্যাত "খেলাফৎ ও মুলুকিয়ৎ" সঙ্কলনের সারই হইল এই তথ্য।)

শায়খুল-হাদীছ সাহেব তাঁহার প্রবন্ধে মৌহুদী সাহেবের কতকগুলি বড় বড় কুকীর্তির প্রামানিক আলোচনাও করিয়াছেন। যথা—

● মৌহুদী সাহেবের রচনাবলীর সর্ব্বাধিক ক্ষতিকর বস্তু আমি দেখিয়াছি, পবিত্র কোরআনের মন-গড়া তফছীর। তাঁহার নিজের কথায়ই উহার স্বীকৃতি পাওয়া যায়। তাঁহার "তান্‌কিহাত" পুস্তিকায় বলেন—"কোরআন এবং ছুন্নতে-রসুলের শিক্ষা সকলের আগে ও উপরে। কিন্তু তফছীর ও হাদীছের পুরাতন ভাণ্ডার হইতে নয়।"

● মৌহুদী সাহেবের রচনাবলীতে দৃষ্টি আকর্ষণকারী বিশেষ বস্তু হইল, দ্বীন এবং এবাদৎ-বন্দেগীর প্রতি উপহাস। আর দ্বীনের আলেমগণের সম্মানে আঘাত।

মৌদুদী সাহেব সম্পর্কে

হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রঃ)

হযরত মাওলানা শামছুল হক (রঃ) প্রথম দিকে মৌদুদী সাহেবের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। মৌদুদী সাহেব রচিত কুখ্যাত "খেলাফৎ ও মুলুকিয়ৎ" পুস্তিকা প্রকাশিত হইলে পর মাওলানা শামছুল হক (রঃ) ভীষণভাবে মর্ম্মাহত হইলেন এবং শোকাভিভূত অপেক্ষা অধিক ব্যথিত হইলেন।

তিনি তাঁহার আকর্ষণ ও ভালবাসার হক আদায় করিয়া মৌদুদী সাহেবকে তাঁহার এই রচনার সংশোধন করিবার অনুরোধ অতিশয় হৃদয় গ্রাহীরূপে করিয়াও ব্যর্থ হইলেন। এই বিষয়ে তিনি একাধিক পত্র লিখিয়াও অকৃতকার্য্য হইলেন।

মাওলানা শামছুল হক (রঃ) একাধিকবার মৌদুদী সাহেবের সঙ্গে এই বিষয়ের জন্য সাক্ষাৎ করিয়া মৌখিক অনুরোধেও ব্যর্থ হন। অবশেষে তিনি স্বীয় দেশবাসীকে এবং জাতিকে মৌদুদী সাহেব হইতে সতর্ক করিয়া তাঁহার জীবনের সর্ব্বশেষ সঙ্কলন "ভুল সংশোধন" নামে সম্পাদিত করেন।

● "ভুল সংশোধন" লিখিবার বিভিন্ন কারণ বর্ণনা করিতে যাইয়া তিনি উক্ত সঙ্কলনের ১৪১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

"যেহেতু জনাব মৌদুদী সাহেব শরীয়তের বিধান অনুসারে প্রথমে কতগুলি জরুরী কাজে অগ্রসর হইয়াছিলেন এই জন্যই আমার সমর্থনে ও উৎসাহ দানে আমার বহু দোস্ত মৌদুদী সাহেবের প্রতিষ্ঠিত জমায়াতে যোগদান করিয়াছেন, রোকন হইয়াছেন। এখন যেহেতু মৌদুদী সাহেবের কতগুলি কাজ ইসলামের বুনিয়াদী অছুলের মূলে আঘাত হানিয়াছে, এই জন্য সেই সমস্ত ভাইদেরে সত্য কথা জানাইয়া দেওয়া আমার উপর ফরজ হইয়া পড়িয়াছে। এই ফরজ আদায়ের জন্য আমি কলম ধরিতে বাধ্য হইতেছি। (তাই সংশোধনের উক্ত সঙ্কলন বাংলা ভাষায় রচিত।)

● ছাহবীগণ সম্পর্কে মৌদুদী সাহেবের বিষোদ্গারের প্রথম ধাপের বর্ণনায় তিনি উক্ত সঙ্কলনের ৮—৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

মধুর নামে বিষ—জনৈক ভদ্রলোক পরোপকার এবং লোক সেবার নামে সকলের বাড়ীতে সকলে যাহাতে অতি সহজে সুমিষ্ট ফল খাইতে পারে সেই জন্য সকলেকে বলিলেন যে, আমি তোমাদের বাড়ীতে সুমিষ্ট লেংড়া আমের বীজ লাগাইয়া গেলাম। আসলে ঐ ফলটি ছিল তিক্ত বিষাক্ত বিষবৃক্ষের বিষফল—লেংড়া আম নয়। কিন্তু আমার মত স্থুল দর্শী অজ্ঞ যারা তারা মনে করল যে, খুব ভাল হইল যে, আমরা সহজে সুমিষ্ট লেংড়া আমের ফল খাইতে পারিব। ঐ ভদ্রলোক দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা দিলেন।

رسول خدا کے سوا کسی انسان کو معیار حق نہ بنائے کسی کو
تنقید سے بالاتر نہ سمجھے کسی کی ذہنی غلامی میں مبتلا نہ ہو-

১। আল্লাহর রছুল ব্যাতীত সত্যের মাপকাঠি আর কাহাকেও মানা যাইবেনা।
২। রছুলে-খোদা ব্যতীত অন্য কাহাকেও সমালোচনার উর্দ্ধে মনে করা যায় না।
৩। রসুলে-খোদা ব্যতীত অন্য কাহারও জেহেনী গোলামী অর্থাৎ নির্বিচারে অনুকরণ অনুসরণ করা যাইবে না। (দস্তুরে-জমাতে ইসলামী ৪ পৃঃ)

কথা কয়টি কত সুন্দর ! আমরা মনে করিলাম—শেরক-বেদয়াতের সব অন্ধকার দুর হইয়া গেল, তৌহিদের আলোতে জগৎ আলোকিত হইয়া উঠিল। কিন্তু সুক্ষ দর্শী অন্তঃ-দৃষ্টি সম্পন্ন আলেমগণ বুঝালেন—মনে হয় এতে যেন কি তিক্ত বিষাক্ত বিষ মাখানো আছে। বছর তিরিশেক পরে যখন ঐ গাছ শাখা প্রশাখা ফুল পাতা ছাড়িল তখন আমরা যাহারা স্থুল দর্শী ছিলাম তাহারাও বুঝিলাম ইহা ত লেংড়া আম নয়, ইহা তিক্ত বিষাক্ত বিষ-বৃক্ষের বিষ-ফল। বিষ-বৃক্ষও সাধারণ বিষ বৃক্ষ নয়, যাহা মানুষের দৈহিক জীবন নাশ করে, বরং ইহা এমন বিষ-বৃক্ষ যাহা মানুষের রুহানী জেন্দেগী ধ্বংস করে এবং মূল ঈমানকে বিনষ্ট করে।

সেই বিষ-বৃক্ষ কি ? সেই বিষ-বৃক্ষ অর্থাৎ অতি গোপনে অতি সন্তর্পনে ছাহাবায়ে কেরামের উপর থেকে বিশ্বাস উঠাইয়া দেওয়া। আর ছাহাবাদের উপর থেকে বিশ্বাস উঠে যাওয়ার অর্থই কোরআন হাদীছ থেকে বিশ্বাস উঠে যাওয়া এবং কোরআন হাদীছ থেকে বিশ্বাস উঠে যাওয়ার অর্থই ঈমান হারা হইয়া চির-জাহান্নামী হওয়া। এই জন্যই এই বিষ-বৃক্ষকে মূল ঈমান ধ্বংসকারী বলা হইয়াছে।

● ছাহাবীগণ সম্পর্কে মৌদুদী সাহেবের জঘন্য কীর্তির বর্ণনায় হযরত মাওলানা শামছুল হক (রঃ) উক্ত সঙ্কলনের ১১—১২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

সর্ব শ্রেণীর সাহাবার উপর মৌদুদী সাহেবের জঘন্য হামলা

এই ভদ্রলোক জানিয়া বুঝিয়া অথবা না জানিয়া—চারী শ্রেণীর ছাহাবা রাজিয়াল্লাহু আনহুমদের সব শ্রেণীর উপরই আঘাত হানিয়াছেন, কোন শ্রেণীকেও রেহাই দেন নাই। চারি শ্রেণী (১) নিম্ন (২) মধ্যম (৩) উচ্চ (৪) সর্বোচ্চ। নিম্ন শ্রেণীর হযরত মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু, তাঁহার উপরে মধ্য শ্রেণীর হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ), তাঁহার উপরে উচ্চ শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত আশারায়ে-মোবাশ্‌শরা—হযরত তাল্‌হা ও যোবায়ের (রাঃ) এবং তাঁহাদের উপরে আশারায়ে-মোবাশ্‌শরার মধ্যেও সর্ব উর্দ্ধ শ্রেণীর খোলাফায়ে-রাশেদীনের অন্তর্ভূক্ত ওসমান রাজিয়াল্লাহু আনহুর উপরও মৌদুদী সাহেব আঘাত হানিতে লজ্জা করে নাই।

সাধারণতঃ এই অনুপাতে ছাহাবা (রাঃ) দের দর্জ্জা নির্ণয় করা হইয়াছে যে, যিনি যত অধিক কাল হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছোহবতের নেয়ামত হাছেল করিয়াছেন এবং উম্মতের প্রতি ও ইসলামের প্রতি অধিক দরদ হাছেল করিতে পারিয়াছেন তিনি তত অধিক দর্জ্জা পাইয়াছেন।

● ছাহাবীগণের দোষ-চর্চ্চায় মৌদুদী সাহেবের ইসলাম বিরোধী ভূমিকায় অত্যন্ত ব্যথা প্রকাশে মাওলানা শামছুল হক (রঃ) উক্ত সঙ্কলনের ৩৫ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন—

একটু গভীর ভাবে ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে এবং পুরা ইতিহাস রিসার্চ করিলে দেখা যায় যে, ছাহাবায়ে-কেরামের উপর দোষারোপের মিথ্যা ও জাল ইতিহাসের গোড়া পত্তন কতগুলি কাট্টা শিয়া, ছাবায়ী, মিথ্যাবাদী রাফেজী, ইত্যাদি ইসলাম ও খেলাফত ধ্বংসকারীদের জাল বর্ণনায় এবং ষড়যন্ত্রকারীদের কারসাজিতে ভরপুর রহিয়াছে। আর ইহাদের পদানুসরণ করিয়াই ইসলামের চিরদুশমন ওরিয়েন্টালিষ্ট পার্টির মানস-পুত্র হিট্টি, নিকোলসন ইত্যাদি পাদ্রী ঐতিহাসিকেরা ঐ মিথ্যারই অনুসরণ করিয়াছেন।

মৌদুদী সাহেবও যে ইসলামের শত্রুদের আমদানীকৃত মিথ্যা ইতিহাসের অনুসরণে ছাহাবাদের প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করিয়া ইতিহাস রচনা করিবেন এই আশা আমাদের কস্মিণ কালেও ছিল না। আমাদের আশা ছিল যে, তিনি মিথ্যার রদ করিয়া সত্য খাঁটী ইতিহাস সমাজের সামনে পেশ করিবেন। কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া কেন যে তাহাদের স্রোতে ভাসিয়া গেলেন তাহা কল্পনা করিতেও আমাদের হৃদয়ে ব্যথা পাই।

● ইসলামের শত্রু খারেজী দলের গঠিত ইতিহাসরূপী মিথ্যার পায়রবী করিতে করিতে মৌদুদী সাহেব নিজেও মিথ্যার কিরূপ কারিগর হইয়াছেন তাহার দৃষ্টান্ত দানে মাওলানা শামছুল হক (রঃ) একজন ছাহাবী সম্পর্কে মৌদুদী সাহেব কতগুলি মিথ্যা গড়াইয়াছেন—নমুনা স্বরূপ উহার বর্ণনা দিয়াছেন।

খারেজী দলের দ্বারা ছাহাবীগণের মধ্যে সর্ব্বাধিক আঘাত পাইয়া ছিলেন খলীফা ওসমান (রাঃ)। তিনি তাহাদের মিথ্যার ষড়যন্ত্রে শুধু বদনামই হইয়া ছিলেন না, তাহাদের সৃষ্ট বিদ্রোহে প্রাণও হারাইয়া ছিলেন। প্রায় তাঁহার সমপর্য্যায়েই তাহাদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন মোয়াবিয়া (রাঃ)। তাহারা তাঁহার প্রতিও প্রাণ-নাশক আক্রমণ করিয়াছিল; উহাতে তিনি ভীষণ আহত হইয়া প্রাণে বাঁচিয়া ছিলেন। কিন্তু তাহাদের মিথ্যা অপবাদ তাঁহার উপর সর্ব্বাধিক আরোপ করিয়া তাঁহার বদনাম বেশী করিয়াছে। এমনকি একজন উচ্চ মর্য্যাদা সম্পন্ন ছাহাবী হওয়ার যে সম্মান তাঁহাকে দান করা মোসলমানদের

উপর ওয়াজেব সেই সম্মান দানেও অনেকে উদাসিন। খারেজী দলের ঠিক সেই ভূমিকায়ই অবতীর্ণ হইয়াছেন জনাব মৌহুদী সাহেব। মৌহুদী সাহেব তাঁহার কুখ্যাত প্রবন্ধে এই দুই জনের সমালোচনা ও দোষ-চর্চ্চাই মূল বিষয় রাখিয়াছেন এবং আনুষাঙ্গিকরূপে অন্যান্য অনেক ছাহাবীকে দোষী করিয়াছেন।

মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রতি খারেজী দলের ভূমিকায় মৌহুদী সাহেব যে সব মিথ্যা অপবাদ গড়াইয়াছেন মাওলানা শামছুল হক (রঃ) উহার অনেকগুলিরই বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা নমুনা স্বরূপ কতিপয় দৃষ্টান্তের উদ্ধৃতি দিতেছি। যথা—

● (১) মৌহুদী সাহেবের কেতাব খেলাফত ও মুলুকিয়াতের ১৭৪ পৃষ্ঠায় হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) সম্পর্কে লিখিতেছেন :—

مال غنیمت کی تقسیم کے معاملہ میں بھی حضرت معاویہ رض نے
کتاب اللہ وسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح احکام
کی خلاف ورزی کی۔ کتاب وسنت کی رو سے پورے مال غنیمت
کا پانچواں حصہ بیت المال میں داخل ہونا چاہئے اور باقی
چار حصہ اسی فوج میں تقسیم کئے جانے چاہئے جو لڑائی میں
شریک ہوئی ہو۔ لیکن حضرت معاویہ نے حکم دیا کہ مال غنیمت
میں سے چاندی سونا انکے لئے الگ نکال لیا جائے پھر باقی مال
شرعی قاعدہ کے مطابق تقسیم کیا جائے۔

অর্থাৎ গণীমতের মাল বন্টনের ব্যাপারে হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) কোরআন ও সুন্নার প্রকাশ্য হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন। কোরআন ও সুন্নার হুকুম এই যে, সমস্ত মালে গণীমতের ১/৫ এক পঞ্চমাংশ বায়তুল মালে জমা করিতে হইবে এবং বাকী ৪/৫ চারি-ভাগ যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু হযরত মোয়াবিয়া প্রথমে তাঁহার নিজের জন্য সোনা-চান্দি পৃথক করিয়া রাখিয়া অবশিষ্ট মাল শরীয়তের বিধান অনুসারে ভাগ করার হুকুম দিয়াছেন।"

আমি বলিতেছি—এই কথাগুলি সম্পূর্ণ জাল এবং অসত্য কথা। আমি আরও চ্যালেঞ্জ করিতেছি, শুধু মৌহুদী সাহেব কেন, তাঁহার অন্যান্য সাহায্যকারী বন্ধুরা সম্মিলিতভাবেও কেয়ামত পর্য্যন্ত এই কথার কোন বিশ্বস্ত দলিল পেশ করিতে পারিবেন না। ইহা মৌহুদী সাহেবের ছাহাবার প্রতি বদগোমানী ছাড়া আর কিছুই না। মৌহুদী সাহেবের বদগোমানীর নজির দেখুন :—

তিনি বেদায়া-নেহায়ার হাওয়ালা দিয়া হযরত মোয়াবিয়াকে মিথ্যা দোষারোপ করার অপচেষ্টা করিয়া নিজের ব্যক্তিগত রায় প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন যে, গণীমতের মাল বন্টনের ব্যাপারে হযরত মোয়াবিয়া কোরআন হাদীছের সম্পূর্ণ খেলাফ করিয়াছেন। এবং এই কথার সমর্থনের জন্য মৌদুদী সাহেব বেদায়া-নেহায়ার থেকে বলেন, হযরত মোয়াবিয়া গণীমতের মালের মধ্য হইতে সোনা-চান্দি নিজের জন্য পৃথক করিয়া রাখিতে হুকুম দিয়াছিলেন। অথচ দুঃখের বিষয় মৌদুদী সাহেবের এই উদ্ধৃতিটি বেদায়া-নেহায়ার কেতাবের ৮ম খণ্ডের ২৯ পৃষ্ঠায় যে স্থান হইতে লইয়াছেন সেই স্থানেই মৌদুদী সাহেবের উদ্ধৃতিটির কেবল পরেই لبيت المال অর্থাৎ "সরকারী ধনাগারের জন্য, জন-সাধারণের সম্পত্তির জন্য" শব্দটি বহাল তবিয়তে রহিয়াছে—যাহার দ্বারা জনাব মৌদুদী সাহেবের বদগোমানীর জন্য পেশকৃত বাক্যটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। অথচ মৌদুদী সাহেব এই لبيت المال শব্দটি অতি সন্তর্পনে হজম করিয়া গিয়াছেন। এখানে বাক্যটির মধ্যে لبيت المال শব্দটির অর্থ যে সরকারী ধনাগার এবং জন-সাধারণের সম্পত্তি একথা তো সকলেরই জানা আছে। কাজেই এই শব্দটির উল্লেখ করিলে মৌদুদী সাহেবের কু-ধারণার সোনা-চান্দির মহলটি যে মাঠে মারা যাইত এবং পবিত্রাত্মা মহাত্মা হুজুরের (দঃ) সাথীদের প্রতি কোন প্রকারই যে বদগোমানী করিয়া ফজিলত হাছেল করা যাইত না ; এটা মৌদুদী সাহেব যখন নিজে আরবী ভাষায় জ্ঞান আছে বলিয়া দাবী করিয়া থাকেন তখন হয়ত নিশ্চয়ই ভালভাবে বুঝিয়াছেন।

এই জন্যই আমরা জনাবের সোনা-চান্দির মছআলার মধ্যে لبيت المال (সরকারী ধনাগারের জন্য) শব্দটিকে অনুপস্থিত দেখিতেছি। অথচ অতীব দুঃখের বিষয় যে, মৌদুদী সাহেবকে এই বুদ্ধিটি কে দিল যে, যে কেতাব মৌদুদী সাহেবের নিকট আছে তাহা অন্য কাহারও নিকট থাকিবে না, বা আরবী ভাষায় لبيت المال (লে বায়তিল মাল) শব্দটির যে কি অর্থ তাহা কোন আল্লার বান্দা বুঝিতে পারিবে না। মৌদুদী সাহেবের এই সত্যটি তো অবশ্যই জানা উচিত ছিল যে, এখনও কওমের মধ্যে এমন সহস্র সহস্র আল্লার বান্দা রহিয়াছেন যাহারা পেটের জন্য, ভোগের জন্য, বা পদের জন্য নয়—খালেছ আল্লার জন্যই, আল্লার দ্বীনের হেফাজতের জন্যই যথাসর্বস্ব উৎসর্গ করিয়া আল্লার মনোনীত আরবী ভাষাকে হৃদয়ে গাথিয়া রাখিয়াছেন। এমন দিবালোকে পুকুর চুরির মেছাল আমাদের শ্রদ্ধেয় মৌদুদী সাহেব মুসলিম সমাজকে উপহার দিবেন এই ধারণা আমাদের কোন দিনই ছিল না।

আমরা যদি প্রকাশ্যভাবে لبيت المال শব্দটি দেখিতে নাও পাইতাম এবং খলীফা নিজের জন্য মাল জমা করার কথা বলিয়াছেন লেখা দেখিতে পাইতাম

তবুও কোন পাগলে এই কথা বিশ্বাস করিত না যে খলীফা ইহা নিজের পরিবার পরিজনের জন্য ব্যয় করিতে রাখিতে বলিয়াছেন। কেননা এই কথা সকলেই জানে যে খলীফ নিজেই বায়তুল মালের রক্ষক, কাজেই নিজের জন্য বলিলেও বায়তুল মালের কথাই বুঝা যাইত। আমরা আশ্চর্যান্বিত না হইয়া পারি না যে একজন মুসলমান জ্ঞানী ভদ্রলোক কি ভাবে একটা বেহুদা কথাকে টানিরা খিঁচিয়া কাট্ ছাট্ করিয়া উদ্দেশ্য মূলক ভাবে একজন আল্লার রসুলের সাথীর উপরে দোষ চাপাইতে অপচেষ্টা করিতে পারেন? এর দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, ছাহাবায়ে কেরামদের উপর মৌহুদী সাহেবের ভক্তি ও মহব্বত কত ঠুনকো ও অন্তঃসার-শুন্য এবং তিনি আখেরাতের ব্যাপারে কত উদাসীন এবং ইমানের প্রতি কত নির্ম্মম ও নিষ্ঠুর।

গণীমতের মালের বন্টন ব্যাপারে আমরা হযরত মোয়াবিয়া সম্পর্কে এই বলিতে পারি যে, তিনি এই মাল নিজের জন্য কখনও লইতে পারেন না, লনও নাই! এই মাল তিনি বায়তুল-মাল তথা সর্ব্ব-সাধারণের জন্যই জমা করার হুকুম দিয়াছিলেন! কেউ হয়তো প্রশ্ন করিতে পারে যে, বায়তুল-মালে সমস্ত গণীমতের মালের এক পঞ্চমাংশ যাইবে, শুধু সোনা-চান্দির দ্বারা বায়তুল-মালের এক পঞ্চমাংশ কেন পূরণ করা হইবে? যাহা পূর্ব্ববর্তী খলীফারা করেন নাই।

সুধী পাঠকের এই কথা জানা উচিত যে, বায়তুল মালের সম্পত্তি ক্ষণস্থায়ী নহে, আর তাহার মালিকও ব্যক্তি-বিশেষ নহে, এই জন্যই যে বস্তু অধিক স্থায়ী এবং সংরক্ষণে সহজ, নষ্ট হওয়ার কোনই ভয় থাকে না তাহাই বায়তুল-মালে রাখা যুক্তিযুক্ত। অধিকন্তু হযরত মোয়াবিয়ার (রাঃ) জমানায় বায়তুল-মালের এক পঞ্চমাংশে এত মাল জমা হইত যে যদি উট, বকরী এবং অন্যান্য অস্থায়ী মাল বায়তুল-মালে দাখিল করা হইত তবে তাহা রাখিতে রাজধানীর একটা বিরাট জায়গা একোয়ার করার প্রয়োজন হইত, অথচ এই অস্থায়ী মাল সংরক্ষণও দুস্কর হইত। তখনকার দিনে জন-সাধরণের আথিক অবস্থা এতই ভাল ছিল যে যাকাৎ নেওয়ার লোক খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। এই কারনেই হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) এজতেহাদ করিয়া এই চমৎকার বিধানের দ্বারা বায়তুল-মালে সোনা-চান্দি জমা রাখিয়াছেন, ইহা সুন্নতের খেলাফ নহে।

কোরআন হাদীছ এবং এজমায়ে ছাহাবার ভিত্তিতে হযরত ওমর (রাঃ) বায়তুল-মাল সম্বন্ধে এবং রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে নিয়ম জারী করিয়া গিয়াছেন, হযরত ওসমান, হযরত আলী ও হযরত মোয়াবিয়া তাঁহারা কেহই সেই নিয়মের বিন্দুমাত্রও পরিবর্তন করেন নাই। অবশ্য দরকার বশতঃ এজতেহাদ করিয়া বাড়াইয়াছেন বটে। হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) পূর্ববর্তী খলীফাগণের নীতিকে

(সুন্নতকে) আদর্শকে পরিবর্তন করিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়া যদি কেহ বলেন, তবে তাহা কিছুতেই গ্রহণ যোগ্য নহে, যাবত না তাহা ছহীহ্ দলীল দ্বারা তিনি প্রমাণ করিবেন। কিন্তু মৌদুদী সাহেব দুর্ভাগ্যবশতঃ হযরত মোয়াবিয়ার প্রতি তাঁহার ছুয়েজনের (কু-ধারণার) কারণেই দোষারোপ করিয়াছেন। এটা তাঁহার ইসলামের শত্রুদের গোপন শত্রুতামূলক লিটারেচর বা ইতিহাস পড়ার কারণেও হয়তো হইতে পারে। এই জন্যই হয়ত তিনি হযরত মোয়াবিয়া সম্পর্কে অন্যায়ভাবে বায়তুল-মালে হস্তক্ষেপ করার মত জঘন্য মন্তব্য করিতে দুঃসাহস করিয়াছেন। এটা দুর্ভাগ্য বশতঃ এই জন্য বলিতেছি যে, যে কেতাবের হাওয়ালা দিয়া মৌদুদী সাহেব এই অসহনীয় মন্তব্য করিতে দুঃসাহস করিয়াছেন সেই "বেদায়া নেহায়া" কেতাবের ৮ম জেলদের ২৯ পৃষ্ঠায়ই لبيت المال শব্দটি তো পরিষ্কারভাবে আছেই। যাহার দ্বারা হযরত মোয়াবিয়ার প্রতি বিন্দুমাত্র দোষারোপ করারও সুযোগ থাকে না।

তদুপরি নিম্ন ঘটনাটি পাঠ করিলে সুধী পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, আমাদের মৌদুদী সাহেব হামেশা হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) সম্পর্কে তাঁহার কু-ধারণার কারণে যে গবেষণায় মত্ত হইয়া পড়িয়াছেন, হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) ইহা হইতে সম্পূর্ণ পাক পবিত্র ছিলেন। ঘটনাটি আল্লামা ইবনে হজর মাক্কী তাঁহার জগৎ বিখ্যাত কেতাব "তাত্‌হীরুল জেনান অল-লেছান" এর ২৭-২৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন। ঘটনাটি নিম্নরূপ—

একদিন হযরত মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহু জন-সাধারণের মধ্যে আম্‌রে বিল মারূফ এবং নেহী আনেল মোনকারের امر بالمعروف نهى عن المنكر (বাক স্বাধীনতার) সৎ সাহস আছে কিনা এইটা পরীক্ষার জন্য দামেস্কের শাহী মসজিদে জুমার খোৎবায় ঘোষণা দিলেন—

انه (معاوية) خطب يوم الجمعة فقال انما المال مالنا والفيئ فيئنا فمن شئنا منعناه فلم يجبه احد ثم خطب يوم الجمعة الثانية فقال ذالك فلم يجبه احد ايضا ففعل فى الثالثة كذالك فقام رجل فقال كلا انما المال مالنا والفيئ فيئنا فمن حال بيننا وبينه حاكمناه الى الله تعالى باسيافنا فرضى فى خطبته ثم لما وصل منزله ارسل للرجل فقالوا هلك ثم دخلوا فوجدوه جالسا معه على سريره فقال لهم ان هذا احيانى احياه الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون من بعدى امراء يقولون فلا يرد عليهم يتقاحمون فى النار كما تتقاحم القردة وانى تكلمت اول جمعة

فلم يرد على احد فخشيت ان اكون منهم ثم فى الجمعة الثانية
فلم يرد على احد فقلت انى منهم ثم تكلمت فى الجمعة الثالثة
فقام هذا الرجل فرد على فاحيانى احياه الله تعالى -
تطهير الجنان واللسان صفـ ٢٧

অর্থাৎ—একদা জুময়ার খোৎবায় মেম্বরের উপর বসিয়া সমস্ত জন-সাধারণকে লক্ষ্য করিয়া হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) ঘোষণা দিলেন—"রাষ্ট্রের বায়তুল-মালের সমস্ত সম্পত্তি আমার। আমি যাহাকে ইচ্ছা হয় দিব যাহাকে ইচ্ছা হয় দিব না ; ইহাতে টু শব্দটি করিবার কাহারও অধিকার নাই। এইরূপ বলায় কেহই কোন প্রতিবাদ করিল না। অতঃপর দ্বিতীয় জুময়ায় আবার উপরোক্ত ঘোষণা দিলেন, কিন্তু তখনও কেহই কোন প্রতিবাদ করিল না। পুনরায় তৃতীয় জুময়ায় আবার একই ঘোষণার প্রতিধ্বনি করিলেন ; তখন এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া গেলেন এবং খলীফার কথার প্রতিবাদ করিয়া মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা দিলেন, সাবধান ! রাষ্ট্রের বায়তুল-মালের সমস্ত সম্পত্তি আমাদের জন-সাধারণের, ইহাতে যথেচ্ছা ব্যবহার করিবার আপনার কোনই অধিকার নাই। ইহার মধ্যে যে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিবে আমরা আল্লাহ-প্রদত্ত বিধান মতে তলোয়ারের দ্বারাই তাহার মিমাংসা করিব। হযরত মোয়াবিয়া খোৎবা শেষ করিয়া গৃহে গমন করিলেন এবং ঐ লোকটিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, তখন লোকেরা বলাবলি করিতে লাগিল "এই লোকের আজ আর রক্ষা নাই"। অতঃপর লোকেরা কৌতুহলী হইয়া খলীফার গৃহে গমন করিলেন এবং দেখিতে পাইলেন যে সেই লোকটি খলীফার সহিত একই আসনে বসিয়া আছেন। তখন হযরত মোয়াবিয়া সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন যে, এই ব্যক্তি আমাকে বাঁচাইয়াছে ; আল্লাহ তায়ালা ইহাকে বাঁচাইয়া রাখুন। কেননা, আমি হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি—তিনি বলিয়া গিয়াছেন, "আমার পরে এমন একদল শাসনকর্তা হইবে যাদের অন্যায় কথার প্রতিবাদ করিতে কেহই সাহস পাইবে না, তাহারা এমনভাবে দোজখে প্রবিষ্ট হইবে যেমন করিয়া বানরের দল একের পিছে এক একদিকে ধাবিত হয়। (ইহা পরীক্ষার জন্য) আমি প্রথম জুময়ায় একটি ঘোষণা দিয়াছিলাম, কিন্তু কেহই উহার প্রতিবাদ করে নাই ; উহাতে আমি ভীত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে হয়ত আমি এই দলভুক্ত হইয়া পড়ি নাকি ? অতঃপর দ্বিতীয় জুময়ায় আবার একই ঘোষণা দিলাম, তখনও কেহই উহার প্রতিবাদ করিল না ; তখন আমি মনে করিলাম—হায় ! নিশ্চয়ই আমি সেই দলভুক্ত হইয়া পড়িয়াছি। ইহার পর তৃতীয় জুময়ায় আমি আবার সেই ঘোষণা দিলাম, তখন এই ব্যক্তি দাঁড়াইয়া গেল এবং আমার বিরুদ্ধাচণ করিয়া আমার কথার কঠোর প্রতিবাদ

করিয়া আমাকে রক্ষা করিল, বাঁচাইল। সুতরাং আমি আল্লার কাছে দোয়া করি, আল্লাহ যেন তাঁহাকে বাঁচাইয়া রাখেন।

এখন দেখা যাইতেছে যে, হযরত মোয়াবিয়া এই ঘোষণাটি এই জন্য দিয়াছিলেন না যে, তিনি বায়তুল-মালের একচ্ছত্র মালিক হইবেন বা কোরআন হাদীছের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া বায়তুল-মালের উপর যথেচ্ছা ব্যবহার করিয়া জন সাধারণের সম্পত্তি হইতে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করিবেন। বরং লোকের মধ্যে জামানার পরিবর্তনের কারণে হুজুরের আসল সুন্নত আম্‌রে-বিল-মারূফ-নাহী আনেল-মোন্‌কারের অর্থাৎ সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধের এবং অন্যায়কে অপসারণ করিয়া ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করিবার অন্যায়ের নিকট মাথা নত না করিয়া ন্যায়ের পথে অটল অচল থাকিবার পূর্ণ প্রেরণা ও সৎসাহস আছে কি না; যাহার সহায়তায় দেশের শাসনকর্তাদেরও ন্যায়ের পথে থাকা অতি সহজসাধ্য হয় এবং ন্যায়ের উপর থাকিতে বাধ্য হয়—এই গুণটা পরীক্ষা করার জন্যই এই ঘোষণাটি দিয়াছিলেন। এ'কথার দ্বারা হযরত মোয়াবিয়ার সত্যতা, ন্যায় নিষ্ঠতা, নির্লোভতা নিঃস্বার্থতা এবং শরীয়তের পূর্ণ আনুগত্যের সাথে সাথে ইহাও দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হইল যে, হযরত মোয়াবিয়ার প্রতি আমাদের আহলে সুন্নত অল-জামায়াতের নেক ধারণা অবাস্তব নয় মোটেই, বরং অধিকতর মজবুত প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং বাস্তব সত্য। আর জনাব মৌদুদী সাহেবের বর্ণনা সম্পূর্ণ কুধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং উদ্ধৃতিটি একেবারেই অসম্পূর্ণ। আমরা যেহেতু কাহারও মনের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু সাধারণ পাঠকগণ বলিতে বাধ্য হইবেন যে, ইহা একেবারেই উদ্দেশ্যমূলকভাবে করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা বুঝা যায়—মৌদুদী সাহেবের ইতিহাসজ্ঞানও কত অপক্ক—শত্রুদের থেকে ধার করা ও মনগড়া! এবং ছাহাবায়ে কেরামদের প্রতি তাঁহার আকিদা কত মারাত্মক এবং ধারণা কত খারাপ! সমাজে যখন এই আকিদা ছড়াইবে তখন কি বিষাক্ত প্রতিক্রিয়াই না সৃষ্টি হইবে। ব্যাপারটা যেহেতু আখেরাতের ব্যাপার, ধর্মের এবং ঈমানের ব্যাপার এই জন্যই আমরা জন-সাধারণকে ইহা হইতে বাঁচিয়া থাকিয়া নিজেদের ধর্ম ঈমান এবং আখেরাতের হেফাজত করিতে বলিতেছি এবং মৌদুদী সাহেবের বাক-পটুতায় এবং ভাষা-চাতুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ধর্ম ঈমান এবং পরকাল বরবাদ না করিতে সাবধান করিতেছি।

● (২) মৌদুদী সাহেবের খেলাফত ও মুলুকিয়াত কেতাবের ৭৪ পৃষ্ঠায় হযরত মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহুর সম্পর্কে শত্রুদের শিখান কথা গাহিয়া বলিতেছেন—

ایک اور نہایت مکروہ بدعت حضرت معاویہ کے عہد میں یہ
شروع ہوئی کہ وہ خود اور انکے حکم سے انکے تمام گورنر خطبوں

میں برسر منبر حضرت علی (رض) پرسب وشتم کی بوچھاڑ کرتے تھے
حتی کہ مسجد نبوی میں منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
پر بیٹھ کر روضہ نبوی کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
محبوب ترین عزیز کو گالیاں دی جاتی تھی -

"অর্থাৎ হযরত মোয়াবিয়ার (রাঃ) জমানায় আর একটি ঘৃনিত জঘন্য বেদয়াত এই শুরু হইয়াছিল যে, মেম্বরের উপর বসিয়া তিনি নিজে এবং তাঁহার গভর্ণরগণ হযরত আলীর উপর নিন্দা কুৎসার বৃষ্টি বর্ষণ করিতেন। এমন কি মসজিদে নববীর মধ্যে স্বয়ং রসুলুল্লার (দঃ) মেম্বরের উপর বসিয়া ঠিক রওজা শরীফের সামনে হুজুরের পরমপ্রিয় পাত্রকে গালি দেওয়া হইত।"

আমরা মৌদুদী সাহেবকে মনে করিয়াছিলাম যে, তিনি একজন দক্ষ ইতিহাস-বেত্তা; বিশেষ করিয়া ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে তিনি গভীর জ্ঞান রাখেন। কিন্তু তিনি যে ছাহাবায়ে-কেরামগণের সম্পর্কে এমন ভুল জাল এবং সাজান গোছান মিথ্যা তথ্য সম্বলিত বর্ণনা সমাজের সামনে পেশ করিয়া আমাদের যুব সমাজকে বিভ্রান্ত করিবার অপপ্রয়াস পাইবেন ইহা আমাদের ধারণার বাইরে ছিল। তিনি একটা জামাতের আমীর বা পরিচালক; বহু লোকে তাঁহার তত্ত্ব ও তথ্যের হাওয়ালা দিয়া কথা বলিতে পারে, কাজেই তাঁহার কথার দ্বারা সমাজের যত অধিক উপকার হইবার সম্ভাবনা আছে তদ্রূপ তাঁহার সংগৃহীত তথ্যাদি ভুল হইলে, প্রবঞ্চনাপূর্ণ হইলে উহার দ্বারাও সমাজ তত অধিক বিভ্রান্ত ও প্রবঞ্চিত হইয়া গোমরাহীতে পতিত হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। দুঃখের বিষয় এই দিকে মৌদুদী সাহেব বিন্দুমাত্র দৃষ্টি না দিয়া দুইজন কাট্টা মিথ্যাবাদী শিয়া—আবু মেখনাফ লুত ইবনে ইহিয়ার এবং হেসাম ইবনে মোহাম্মদ ইবনে ছায়েবে কালবির বর্ণনার উপর ভিত্তি করিয়া একজন পবিত্রাত্মা মহাত্মা বিচক্ষণ ছাহাবীর উপর এমন জঘন্যতম হামলা ও দুঃসাহসিক আঘাৎ করিবার অপঃপ্রয়াস পাইয়াছেন। অথচ তিনি 'তারিখে তাবারীর' হাওয়ালা দিয়াছেন, সেই তারিখে তাবারীর লেখক মুহাম্মদ ইবনে জরীর (محمد ابن جرير) পরিষ্কার ভাবে উহা উল্লেখ করিয়া আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, কিভাবে একজন কাট্টা মিথ্যাবাদী শিয়া একজন বিচক্ষণ ছাহাবীর উপর মিছা-মিছি হামলা চালাইয়াছে। ইমাম ইবনে জরীর শুধু এতটুকুই দেখাইতে চাহিয়াছে যে, শত্রুরা ইসলামের মুখোষ পরিয়া ইসলামের উপর, ইসলামের প্রধান স্তম্ভ ছাহাবায়ে-কেরামদের উপর কি ভাবে অতি সন্তর্পনে আঘাৎ হানিবার অপচেষ্টা করিয়া থাকে। তিনি নিজে কোন মন্তব্যই করেন নাই, শিয়া মিথ্যা বাদীরা কি ভাবে মিথ্যা প্রপাগাণ্ডা

করিয়া কি ভাবে ছাহাবায়ে-কেরামের বদনাম করিবার অপচেষ্টা করিয়াছে তাহা দেখাইয়া দিয়া আমাদেরকে সতর্ক ও সাবধান করিয়া দিয়াছেন মাত্র; যাহাতে আমরা এই সমস্ত মিথ্যাবাদীদের বেড়াজালে আটকা না পড়ি।

فما يكن فى كتابى هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قاريه او يستشنعه سامعه من اجل انه لم يعرف له وجها فى الصحة ولا معنى فى الحقيقة فليعلم انه لم يؤت فى ذلك من قبلنا وانما اتى من قبل بعض ناقليه الينا وانا انما ادينا ذالك على نحو ما ادى الينا - مقدمة تاريخ الطبرى ص—٨ *

অথচ মৌদুদী সাহেব যাচাই বাছাই করে কেবলমাত্র দুই একজন কাট্রা মিথ্যাবাদী শিয়ার রেওয়ায়েতকেই (বর্ণনাকেই) তিনি কিভাবে পছন্দ করিয়া লইলেন এবং অন্য সমস্ত ছহীহ্ রেওয়ায়েত (বর্ণনা) বাদ দিয়া এই মিথ্যার সহিত নিজের দায়িত্বে আপন কটাক্ষপূর্ণ মন্তব্য জুড়িয়া দিয়া হুজুরের মহৎপ্রাণ ছাহাবীর উপর কলঙ্ক লেপনের দুঃসাহস করিলেন—এটা তিনিই ভাল ভাবে জানেন। তিনি যদি এটা না জানিয়া এবং না বুঝিয়া আপন কল্পনার ঘোড়া ছুটাইয়া থাকেন তবে এটা হইবে তাঁহার ইসলামী ইতিহাস এবং ইসলামী পবিত্র সমাজ সম্পর্কে চরম অনভিজ্ঞতা এবং চরম দীনতারই পরিচয় মাত্র। আর যদি তিনি জানিয়া বুঝিয়া স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে এইরূপ মারাত্মক পদক্ষেপ করিবার সাহস পাইয়া থাকেন তবে এটা হইবে তাঁহার ইসলাম এবং মোসলেম সমাজের সহিত চরম বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রবঞ্চণারই পরিচয় মাত্র। মোসলেম সমাজ তাঁহাকে ইসলামের ও মোসলমানদের হিতৈষী গণ্য করার পরিবর্তে ইসলমের মূলচ্ছেদকারী গোপন শত্রুদের গোপন হাতিয়ারের বহিঃপ্রকাশ বলিয়া ধারণা করা ছাড়া অন্য কোন পথ পাইবে না। এ কথা সকলেরই জানা উচিৎ যে ইসলামের ইতিহাসের সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের মূল ভিত্তি প্রত্নতত্ত্ববিদদের আনুমানিক ধারণা বা বিজ্ঞান ও দর্শনের যুক্তির ভিত্তির উপর নির্ভরশীল নয়।

---

* মৌদুদী সাহবের রেফারেন্স "তারীখে-তাবারী" সঙ্কলক উহার ভূমিকায় সতর্কবাণী রাখিয়া গিয়াছেন যে—"আমার গ্রন্থে এমন বর্ণনাও থাকিবে যাহাকে পাঠক ঘৃণা করিবে, শ্রোতা উহার প্রতি ক্ষুব্ধ হইবে। উহার সত্যতার কোনই সূত্র নাই, উহার বাস্তব কোন অর্থও নাই। ঐরূপ ক্ষেত্রের জন্য স্মরণ রাখিবে যে, উহার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। কোন বর্ণনাকারের বর্ণনার শুধু সংগ্রহরূপে আমরা উহা লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছি।

(ভূমিকা—তারীখে তাবাবী ৮ পৃঃ)

ইসলামের ইতিহাস বা অন্য যে কোন ইতিহাসই হউক না কেন ইহার সত্যতা মাপের ও যাচাইয়ের একমাত্র মূল-কাঠি, বুনিয়াদ ও ভিত্তি কোরআন ও হাদীছ। এই ভিত্তির মাপ-কাঠিতে যে ইতিহাস বা দর্শনকে আমরা সঠিক পাইব তাহাকেই আমরা সত্য এবং খাঁটী বলিয়া গ্রহণ করিব, আম্লান বদনে মানিয়া লইব। অন্যথায় যে ইতিহাস এবং যে দর্শনকে আমরা এই মূল-নীতির বিরুদ্ধে পাইব তাহাকেই জাল, মিথ্যা এবং ধোকা বলিয়া নর্দ্দমায় নিক্ষেপ করিতে বাধ্য হইব, ইহাই আমাদের সত্য-মিথ্যা বাছাইয়ের মূল তুলাদণ্ড। কিন্তু পরিতাপের বিষয়--জানি না, মৌতুদী সাহেব কি ভাবে একজন পবিত্রাত্মা মহাত্মা ছাহাবী সম্পর্কে এমন সব জাল বর্ণনা ও মিথ্যা মন্তব্যের আশ্রয় নিলেন যাহা দলিল প্রমানাদি ত দুরের কথা স্বাধারণ জ্ঞানেও নর্দ্দমায় নিক্ষেপের উপযুক্ত। মৌতুদী সাহেবের এতটুকু চিন্তা করিবারও অবকাশ হইল না বা স্থযোগ পাইলেন না যে, যে ছাহাবী হইতে একশত ত্রিশখানা ছহীহ্ হাদীছ বর্ণিত আছে—যাহার উপর আমাদের দ্বীন ও ঈমান নির্ভরশীল, সেই মহাত্মা সম্পর্কে এমন ঘৃনিত মিথ্যাবাদী শিয়ার মন্তব্য কি ভাবে দলিল হিসাবে পেশ করা যায় যাহা একজন ইসলামের শত্রুর দ্বারাও সম্ভব বলিয়া আমরা ভাবিতে পারি না। এবং সেই সঙ্গে নিজের কু-ধারণা প্রসূত খেয়ালী মন্তব্য জুড়িয়া দিয়া সমাজের সামনে জগতের দরবারে হযরত মোয়াবিয়াকে হেয় দোষীরূপে চিত্রিত করিবার অপচেষ্টা করিতে মৌতুদী সাহেবের লজ্জা করা উচিৎ ছিল।

যে মিথ্যাবাদীর উপর নির্ভর করিয়া মৌতুদী সাহেব এতবড় জলিলুল-কদর ছাহাবী সম্পর্কে এমন জঘন্য মন্তব্য করিতে সাহস পাইয়াছেন সেই হাদীছ জালকারী মিথ্যাবাদী রাবী, ধোকাবাজ সম্পর্কে বিশ্ববিখ্যাত সর্বজনমান্য ইমামগণ কি মন্তব্য করিয়াছেন নিম্নে তাহা বর্ণিত হইল : "আবু মেখনাফ লুত ইবনে ইয়াহ্ইয়া" এবং তাহার শিষ্য "হেশাম কলবী" সম্বন্ধে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া তাঁহার বিখ্যাত কেতাব মেনহাজুস্-সুন্নার তৃতীয় জেলদের ১৯ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন :

اكثر المنقول من المطاعن الصريحة هو من هذا الباب يرويها
الكذابون المعروفون بالكذب مثل ابى مخنف لوط بن يحى
ومثل هشام بن محمد بن السائب الكلبى وامثالهما من الكذابين
وهو من اكذب الناس وهو شيعى يروى عن ابيه وابى مخنف
وكلاهما متروك كذاب وقال ابن عدى ابوه ايضا كذاب وقال
زائدة والليث وسليمان التيمى هو كذاب وقال يحيى ليس

بشئ كذاب ساقط وقال ابن حبان وضوح الكذب فيه اظهر من ان
يحتاج الى الاغراق فى وصفه - منهاج السنة ص — ١٩ *

এতদ্ভিন্ন আল্লামা জালালুদ্দীন ছুয়ূতী উক্ত রাবী—বর্ণনাকারদ্বয়কে অতি বড় মিথ্যাবাদী বলিয়াছেন। ("আল-লাআলীল-মছনূআ" ১—৩৮৯)

আল্লামা শামছুদ্দীন—ইবনে-খাল্লাকান বলিয়াছেন, "হেশাম কলবী" আবদুল্লাহ ইবনে ছাবার দলের লোক ছিল। (ওফিয়্যাতুল-আ'ইয়ান, ৩—৪৩৭)

আল্লামা জাহাবী (রঃ)ও তাহাকে আবদুল্লাহ ইবনে ছাবার দলের বলিয়াছেন।
(মীযানুল-এতেদাল ২—৮২)

● (৩) মৌছুদী সাহেব তাহার খেলাফত ও মুলুকিয়াত কিতাবের ১৩৫ পৃষ্ঠায় হযরত মোয়াবিয়ার উপর মিথ্যা দোষারোপ করিয়া লিখিতেছেন :

حضرت معاويه (رض) نے ايک صاحب کو اس کام پر مامور کيا
کہ کچھ گواہ ايسے تيار کرے جو اہل شام کے سامنے يہ شہادت ديں
کہ حضرت علی (رض) ہی حضرت عثمان کے قتل کے ذمہ دار ہيں
چنانچہ وہ صاحب پانچ گواہ تيار کرکے لے آئے اور انہوں نے لوگوں
کے سامنے يہ شہادت دی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے
حضرت عثمان (رض) کو قتل کيا ہے -

তরজমা : হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) এক ব্যক্তিকে এই কাজের জন্য নিযুক্ত করিলেন যে, তিনি যেন কিছু সংখ্যক মিথ্যা সাক্ষী জোগাড় করিয়া তাহাদের দ্বারা শামবাসীদের সামনে এই সাক্ষ্য দেওয়াইয়া দেন যে, হযরত আলী (রাঃ)ই হযরত ওসমান (রাঃ) কে হত্যা করিয়াছেন। সেই সূত্রে সেই লোকটি পাঁচজন

---

* ইবনে তাইমিয়া (রঃ) বলিতেছেন—"(মোয়াবিয়া (রাঃ) সম্পর্কে) বেশীর ভাগ দোষ-বর্ণনাই এই শ্রেণীর—যাহাকে মিথ্যাবাদীগণ ও মিথ্যা বর্ণনায় খ্যাত ব্যক্তিগণ বর্ণনা করিয়া থাকে। যথা—আবু মেখনাফ লুত ইবনে ইয়াহইয়া, আর হেশাম ইবনে মোহাম্মদ কল্‌বী এবং তাহাদের ন্যায় অন্যান্য মিথ্যাবাদীগণ।

এই "হেশাম" মানুষের মধ্যে অদ্বিতীয় মিথ্যাবাদী, শিয়া। সে তাহার পিতা হইতে এবং আবু মেখনাফ হইতে নানা বিবরণ বর্ণনা করে। ঐ দুইজন উভয়ই মিথ্যুক সর্ব্ব-বর্জ্জণীয়।

(বিশিষ্ট মোহাদ্দেছ) ইবনু আদী বলিয়াছেন, হেশাম মিথ্যাবাদী এবং হেশামের পিতাও মিথ্যাবাদী। (বিশিষ্ট মোহাদ্দেছ) ইয়াহইয়া বলিয়াছেন, হেশাম মানুষই নয়, মিথ্যাবাদী, সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জণীয়।

বিশিষ্ট হাদীছ বিশারদ ইবনে-হেব্বান বলিয়াছেন, হেশামের মধ্যে মিথ্যা এরূপ প্রকট যে, উহার বিবরণ দানের প্রয়োজন নাই।

মিথ্যা সাক্ষী বানাইয়া আনিল, তাহারা সর্ব্ব সমক্ষে এই সাক্ষ্য দিল যে, হযরত আলীই হযরত ওসমান (রাঃ)কে কতল করিয়াছেন”।

পাঠক! লক্ষ্য করুন, হযরত মোয়াবিয়ার (রাঃ) উপর মিথ্যা তোহ্‌মত লাগাইতে গিয়া মৌদুদী সাহেব নিজের আসল রূপটিকেই সমাজের সামনে একেবারেই জাহের করিয়া ফেলিয়াছেন। কেননা, এই জাতীয় নোংড়া মিথ্যা-বেসাতির ভাণ্ডার খুজিতে গিয়াই তিনি দুনিয়ার যত আস্তাবল আস্তাকুড় ড্রেন আর নর্দ্দমার গলিত ঘৃণিত পুতিগন্ধময় ময়লার স্তুপ জমা করিবার চিন্তায় লাগিয়া গিয়াছেন। কারণ লক্ষ কোটি গুণের মধ্যেও মিথ্যা-মিথ্যি দোষের গন্ধ অনুসন্ধান করার দক্ষতা ও পারদর্শীতা অর্জন করিতে যে ভাইয়েরা অভ্যস্ত তাদের জন্য গুনকে দোষ দেখা বা তাবিল-তুবিল করিয়া গুণের মধ্যে দোষের রূপ বাহির করাটা কিছুমাত্র মুশকিল না হইলেও কোন সত্যান্বেষী সুধী ব্যক্তির জন্য ইহা শোভনীয় নয় মোটেই।

মৌদুদী সাহেবকে যেহেতু দেখা যাইতেছে যে, তিনি এই আজগুবী তোহমতের পিছনেই লাগিয়াছেন, কাজেই তাঁহার সহযোগীতায় আহ্‌লে হকদের কেহই অগ্রসর না হইলেও শিয়া, ছাবায়ী, রাফেজী, খারেজী এবং অরিয়েন্টালিষ্ট পার্টির সহযোগীরা হয়ত সর্বপ্রকারের সহযোগীতার হস্ত প্রসারিত করিয়াই তাঁহার সাহায্যে সহানুভবতার পরিচয় দিবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। মৌদুদী সাহেবের এই আজগুবী চাঞ্চল্যকর কথাটির মূল উদ্যোক্তা কারা? কোথা থেকে কিভাবে তিনি এই ঈমানধ্বংসী তোহতমটির সন্ধান লাভ করিলেন? এবং কোন বলে তিনি এটা সমাজের সামনে উপহার দেওয়ার দুঃসাহস করিলেন? এবং কোন ধরণের মনোবৃত্তির কারণে এই সব সামগ্রীপ্রাপ্তি তাহার জন্য সহজসাধ্য হইয়াছে? কোন্ সব বন্ধুরা তাঁহার এই কাজে সহায়ক হইয়াছেন? এই রহস্যের দার উদঘাটন করিতে আমাদের বিপুল অর্থ-কষ্ট, যথেষ্ট মানসিক-শ্রম ও শারিরীক পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে। মৌদুদী সাহেবের (রেফারেন্স) হাওয়ালাকৃত “এস্তিয়াব” ইত্যাদি কেতাবের হাজার হাজার পৃষ্ঠার লক্ষ লক্ষ লাইনের মধ্যে মৌদুদী সাহেবের মতের সমর্থনের বর্ণনাগুলির সন্ধান যেখানেই আমরা করিয়াছি সেইখানেই সর্ব্বক্ষেত্রে সর্বতোভাবে ইহা ইসলামদ্রোহী ঈমান ধ্বংসকারী মিথ্যাবাদী ধোকাবাজ কাট্টা শিয়া রাফেজী খারেজী ও আবদুল্লাহ বিন ছাবার গোষ্ঠীতে কানায় কানায় পরিপূর্ণ দেখিয়াছি। সেখানে কোন সত্যান্বেণকারীর নাম-গন্ধও পাওয়া যায় নাই। মৌদুদী সাহেবের প্রধান মুরব্বী পাঁচজন মিথ্যাসাক্ষী সম্পর্কীয় বর্ণনার উদ্যোক্তা “নছর ইবনে মোজাহেম মেনকারী” যে, একজন প্রথম নম্বরের কাট্টা শিয়া রাফেজী দলভুক্ত কাট্টা মিথ্যাবাদী—এ কথাটি বিশ্বের দরবারে বিশেষ করে কোরআনি সাহিত্যে ও ইসলামী ইতিহাস সম্পর্কে সামান্যতমও জ্ঞান যাহারা রাখেন

তাঁহাদের নিকট ইহা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট উজ্জল। মোসলেম বিশ্বের সকল যুগের সকল কালের সকল শ্রেণীর সকল সুধীবৃন্দই এই কথা জানেন যে, নছর ইবনে মোজাহেম মেনকারী একজন কাট্টা মিথ্যাবাদী শিয়া রাফেজী দলভূক্ত। ইসলামের এবং মোসলমানদের তথা আহলে-সুন্নত-অল-জামায়াতের মূল মেরুদণ্ড ছাহাবায়ে-কেরামদের বিরুদ্ধে এই ব্যক্তিই ওরিয়েন্টালিষ্ট পার্টির ভক্তদের মত ছাহাবাদের খুটিনাটি মিথ্যাদোষ রচনায় এবং দোষ রটনায় লিপ্ত ছিল এবং সাধারণ লোক এমনকি শিয়া রাফেজী খারেজী মিথ্যাবাদীরাও জানে যে, নছর ইবনে মোজাহেম মেনকারী ঐ সমস্ত মিথ্যাবাদীদের মধ্যে সকলের ওস্তাদ মিথ্যাবাদী।

وفى ميزان الاعتدال للعلامة الذهبى ج ٤ ص ٢٥٣ نصر بن المزاحم الكوفى رافضى جلد تركوه قال العقيلى شيعى فى حديثه اضطراب وخطاء كثير وقال ابو خيثمة كان نصر بن مزاحم كذابا وقال ابو حاتم واهى الحديث متروك۔

পরম পরিতাপের বিষয় এই যে, মৌদুদী সাহেবের দ্বারা আমরা সত্য খাটি ইতিহাস লেখার আশা করিয়াছিলাম এবং এই জন্যই আমরা তাঁহার অনেক কথা ও কাজের সমর্থনও করিয়া আসিতে ছিলাম। এই আশায় যে হয়ত তাঁহার দ্বারা গায়ের-ইসলামীদের মোকাবেলায় ইসলামের অনেক খেদমত হইবে। কিন্তু তিনি যে এমন ঈমান ও ইসলাম ধ্বংসী কাজ—যে কাজে নিদারুন প্রাণঘাতি শত্রুরাও কম সাহস পাইয়াছে সেই কাজে অগ্রসর হইবেন এটা আমরা কল্পনাও করিতে পারি নাই। তিনি তাঁহার কাজে, ভাষায় যাহা প্রমান দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে এটা ইসলামের পরম শত্রু ছাবায়ী পার্টিরই একমাত্র কাজ, অথবা সেই পার্টিরই সংগৃহিত বিষ-বৃক্ষের তত্বাবধানকারী রাফেজী খারেজী ও মোস্‌তা-শ্‌রেকীন ওরিয়েন্টালিষ্ট পার্টির বা তাদের শাগরেদদেরই গা-ঢাকা রূপেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। অন্যথায় তিনি যে "استيعاب—এস্তিয়াব" কিতাবের হাওয়ালা দিয়াছেন সেখানে এস্তিয়াবের লেখক قيل শব্দের দ্বারা এই কথাই বুঝাইয়াছেন যে এই কথার জাল সাক্ষীর আমি মোটেই সমর্থক নই। অধিকন্তু তিনি এই জাল সাক্ষীর কথার উল্লেখ করিয়া ইহাই বলিতে চাহিয়াছেন যে, এইরূপ কথা ইসলামের শত্রুরা ছাড়া অপর কেহই বলিতে পারে না। কাজেই এই শত্রুর কথা আমাদের জানিয়া রাখা দরকার এবং ইহা হইতে আমাদের সাবধান হওয়া দরকার। তিনি তাঁহার কেতাবের ভুমিকায় এই কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, আমি সত্য-মিথ্যা যাচাই ব্যতিরেকে সব রকমের বর্ণনাই নকল করিয়া দিলাম। ইহার মধ্যে কোন কথা অকাট্য সত্যের বিরুদ্ধে হইলে উহা মিথ্যা বলিয়া সাব্যস্ত

করিতে হইবে এবং ঐ মিথ্যা বর্ণনাকারীর বর্ণনার জন্য ঐ মিথ্যাবাদীই দায়ী হইবে, আমি দায়ী হইব না। কেননা আমি সত্য-মিথ্যার যাচাই বাছাই করি নাই। কোন মিথ্যাবাদীর মিথ্যা বর্ণনা তাহার গান্দা আকিদারই জলন্ত সাক্ষ্য বহন করে—ইহাও সত্য পন্থীদের জানা দরকার ; কাজেই আমি সত্য-মিথ্যা সকল বর্ণনাই জমা করিয়া দিলাম।

আমাদের দুঃখ এই জন্যই যে, যে কথা মিথ্যাবাদী নছর ইবনে মুজাহেম মেনকারীর বর্ণনা হইতে লওয়া হইয়াছে এবং যাহা সর্ববাদী সম্মতরূপে মিথ্যায় ভরপুর এইরূপ কথাকে একজন কওমের খেদমতের দাবীদার কিভাবে দলিল হিসাবে পেশ করিতে পারেন ? বিশেষ করিয়া হযরত রসুলুল্লার (দঃ) পবিত্রাত্মা মহাত্মা ছাহাবীর (রাঃ) উপর তোহমত বা মিথ্যা দোষারোপ করিতে গিয়া মৌদুদী সাহেবের মত একজন লোক যাহার ইতিহাস-জ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের ভাল ধারণা ছিল তিনি এমন মিথ্যাবাদী ছাবায়ীর কথাকে দলিল হিসাবে সমাজের সামনে পেশ করিয়া হাসির খোরাকী জোগাড় দিবেন একথা আমাদের কল্পনা করিতেও লজ্জা এবং দুঃখ বোধ হইতেছে।

ইসলামের সত্য ইতিহাস যাদের জানা আছে তারা সকলেই জানেন যে, হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) হযরত আলীর প্রতি হযরত ওসমানের (রাঃ) হত্যার কোন অভিযোগ আনায়নের চেষ্টা কোন দিনই করেন নাই। বরং সর্বদাই তিনি হযরত আলীর প্রতি অধিক সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন এবং নিজের চেয়ে হযরত আলীকেই খলীফা হওয়ার অধিক উপযুক্ত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং হযরত আলী (রাঃ) জীবিত থাকা কালীন কোন দিনই বিভিন্ন লোকের হাজার অনুরোধ উপরোধ সত্বেও নিজেকে খলীফা বলিয়া ঘোষণা করেন নাই। বহু সংখ্যক ছহীহ্ রেওয়ায়েতে ইহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ বেদায়া-নেহায়া কেতাবের ৭ম জেলদের ২৫৭—৫৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রহিয়াছে ; বরং মোয়াবিয়া (রাঃ) নিজেই ঘোষণা দিতেছেন। ونحن لا نرد ذلك عليه ولا نتهمه به -৭-

অর্থাৎ “আমি হযরত আলীর প্রতি হযরত ওসমান রাজিয়াল্লাহু আনহুর হত্যার কোনই দোষ দেই না।” হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) আরো স্পষ্ট ঘোষণা দেন যে—

فليقدنا من قتل عثمان فانا اول من بايعه من اهل الشام البداية ৭৫

হযরত আলী-রাজিয়াল্লাহু আনহু হযরত ওসমানের (রাঃ) হত্যাকারীদিগকে—ইসলামী খেলাফত ও ইসলামী নেজাম ধ্বংসকারীদিগকে অনুসন্ধান করিয়া উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিলে “আমি মোয়াবিয়া সর্ব্ব প্রথমে হযরত আলীর নিকট বায়য়াত (তাঁহাকে খলীফা স্বীকার করার দীক্ষা গ্রহণ) করিব।”

● (৪) মৌদুদী সাহেব হযরত মোয়াবিয়ার উপর দোষারোপ করিয়া খেলাফৎ ও মুলুকিয়াত কেতাবের ১৭৫ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন যে—

حضرت معاویۃ اپنے گورنروںکو قانون سے بالاتر قرار دیا اور انکی زیادتیوں پر شرعی احکام کے مطابق کارروائی کرنے سے انکار کردیا۔

অর্থাৎ হযরত মোয়াবিয়া তাঁহার গভর্ণরদিগকে আইনের উর্দ্ধে স্থান দিতেন এবং শরীয়ত মোতাবেক তাঁহাদের জুলুম অত্যাচারের বিচার করিতে অস্বীকার করিতেন।

কথা কয়টি মৌদুদী সাহেবের কু-ধারণা প্রসূত অজ্ঞতারই পরিচয়। কেননা তিনি তোহমত লাগাইবার জন্য যে উদ্ধৃতিটি পেশ করিয়াছেন উহার মধ্যেই তাঁহার নিজের ভুলের উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়া যাইত যদি তিনি এবারতটি সম্পুর্ণ নকল করিতেন। তিনি এবারতটি পূর্ণ উদ্ধৃত করিলে পাঠক ইহার মধ্যে হযরত মোয়াবিয়ার গুণপনারই পূর্ণ পরিচয় পাইতেন। হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) শরীয়তে-মোকাদ্দাসার উপর কেমন অটল অচল ছিলেন এবং তাঁহার গভর্ণরগণ সামান্য অপরাধ করিলেও তিনি তাহাদিগকে শরীয়ত অনুযায়ী কেমন কঠোর শাস্তি দিতেন—উদ্ধৃতিটি তাহাতেই পরিপূর্ণ রহিয়াছে। জনাব মৌদুদী সাহেবের মিথ্যা দোষারোপ প্রমাণ করিবার একটি কথাও ঐ এবারতে নাই। মৌদুদী সাহেবের দেওয়া এবারতটির সম্পুর্ণ বিবরণ এই ঃ—

একদা বছরার গভর্ণর আবদুল্লাহ ইবনে গায়লান বছরার শাহী মসজিদে ভাষণ দিতেছিলেন। এক ব্যক্তি বাগাওতী করিয়া মসজিদে গণ্ডগোলের সৃষ্টি করিয়া গভর্ণরের উপর পাথর নিক্ষেপ করে। ইহা পরিষ্কার রাষ্ট্রদ্রোহীতা ছাড়া আর কি হইতে পারে? গভর্ণর ইহাকে প্রকাশ্য রাষ্ট্রদ্রোহীতা মনে করিয়া ঐ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করাইয়া হাত কাটাইয়া দেন। এই ঘটনার পর উক্ত লোকটির বংশের লোকগণ ভাবিল, খলীফার গভর্ণরের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সভায় মসজিদের মধ্যে আমাদের লোক এতবড় বিদ্রোহের কাজ করিয়াছে; এই কথা খলীফার কর্ণগোচর হইলে আমাদের প্রতিও খলীফার সন্দেহ হইতে পারে। এই সন্দেহ হইতে বাঁচিবার জন্য তাহারা সকলে গভর্ণরের নিকট উপস্থিত হইয়া এই সুপারিশ করিল যে, জনাব আপনি আমাদিগকে মেহেরবানী করিয়া এই কথাটা লিখিয়া দেন যে, বিদ্রোহীকে আপনি বিদ্রোহের কারণে হাত কাটেন নাই। বরং কেবল মাত্র সন্দেহের কারণে কাটিয়াছেন—যে, হয়ত বিদ্রোহ করিতে পারে; তাহা হইলে আমরা খলীফার এই সন্দেহ হইতে বাঁচিয়া যাইব বলিয়া আশা রাখি। গভর্ণর দয়া পরবশ হইয়া তাহাদিগকে এই কথাটি লিখিয়া দিলেন। অতঃপর ঐ সমস্ত লোক চক্রান্ত করিয়া ঐ লেখাটি লইয়া হযরত মোয়াবিয়ার দরবারে উপস্থিত হইয়া বিচারপ্রার্থী হইয়া গভর্ণরের প্রতি হদ জারীর জন্য আবেদন জানাইল। হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) তাহাদের এই চক্রান্তের খবর সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিলেন। তিনি ঘটনাটি সম্পূর্ণ সত্য মনে করিয়া তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে, শরীয়তের কানুন অনুসারে বিচারকের ভুলের কারণে বিচারককে দণ্ডিত

করা যায় না। এই জন্যই হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) গভর্ণরের উপর শরীয়তের বিধান মতে হদ-কেছাছ তো জারী করিতে পারিলেন না। কিন্তু যেহেতু গভর্ণর বিচারে ভুল করিয়াছে, এই ভুলের জন্য গভর্ণরকে সাথে সাথে বরখাস্ত করিয়া বছরার জন্য নূতন গভর্ণর নিযুক্ত করিয়া ঐ ব্যক্তির হাত কাটার বদলে তাহাকে দিয়ত দিয়া দিলেন।

অথচ মৌহুদী সাহেব নিজের উদ্ধৃতির মধ্যে এই গভর্ণরের বরখাস্তের কথাটি— و عزل عبد الله بن غيلان একেবারেই বাদ দিয়া দিয়াছেন, যাহাতে হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) গভর্ণরদিগকে আইনের উর্দ্ধে স্থান দিতেন এই মিথ্যা কথাটি প্রমাণ করা যায়। কিন্তু আফছোছ! মৌহুদী সাহেবের এই কথাটি অবশ্যই জানা উচিৎ ছিল যে, ইতিহাসের কেতাবগুলির এবারতগুলি শুধু জনাব মৌহুদী সাহেবের মতলব হাছেলের জন্যই লেখা হয় নাই। মৌহুদী সাহেব কি ইহাই মনে করেন যে, নিজের মতলব সিদ্ধির জন্য ছাট-কাট করিয়া তিনি যে এবারতটুকুর উদ্ধৃতি দিবেন তাহা ছাড়া বাকী সমস্ত এবারত তাঁহারই খাতিরে ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে মুছিয়া ফেলা হইবে বা কোন একজন লোকও ঐ কেতাবগুলির আরবী এবারত বুঝিতে সক্ষম হইবে না। কারণ, উক্ত কেতাবের এবারত অন্য লোকে বুঝিলে তো গভর্ণরের বরখাস্তের কথা বাহির হইয়া পড়িবেই এবং হযরত মোয়াবিয়া যে গভর্ণরদের বিচার করিতে গিয়া বিন্দুমাত্র খাতির করিতেন না তাহাও প্রমাণিত হইবে। কাজেই উক্ত কেতাবগুলির এবারত যতটুকু মৌহুদী সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন ততটুকুই রাখিতে হইবে কিম্বা অবশিষ্টটুকু আমাদের একেবারেই হয়ত দেখা চলিবে না বা ভুলিয়া যাইতে হইবে। কেননা, তাহা না হইলে আমাদের শ্রদ্ধেয় মৌহুদী সাহেবের ছাহাবাদের প্রতি বদগোমানি যে কিছুতেই প্রমাণিত হইবে না।

মৌহুদী সাহেবের কেতাবের এবারতের উদ্ধৃতি সংক্ষেপ করার এবং ছাট-কাট করিয়া সত্যকে গোপন করার অভ্যাস নূতন নয় এবং তিনি যে কথার মাঝখানে উল্টা-পাল্টা প্রশ্ন করিয়া মতলব হাছেল করিতে ওস্তাদ তাহাও অনেকেই অবগত আছেন।

তিনি যে এই বিষয় ওস্তাদ একথা আমাদেরও জানা আছে। কিন্তু এই ওস্তাদী যে তিনি আল্লার নবীর একজন শাগেরদ কাতেবে-ওহী—হযরত ওমর এবং হযরত ওসমানের বিশ বৎসরের বিশ্বস্ত গভর্ণর এবং প্রায় অর্দ্ধ বিশ্বের সমস্ত মানুষের বিশ বৎসরের প্রাণ প্রিয় খলীফা মোয়াবিয়ার (রাঃ) উপর মিথ্যামিথ্যি চালাইবেন তাহা কোন মোসলমান আশা করে নাই। অথচ মৌহুদী সাহেব ইসলামের খেদমতের নাম নিয়া এহেন জঘন্য কাজে হাত দিয়াছেন। অধিকন্তু সমস্ত বিশ্বস্ত ঐতিহাসিকের প্রমাণ-লব্ধ বিশুদ্ধ বর্ণনাগুলিকে পশ্চাতে ফেলিয়া অবিশ্বস্ত মিথ্যাবাদী শিয়া, রাফেজীদের উদ্ধৃতির দ্বারা ঐ সমস্ত মহাত্মাদের উপর আঘাত হানিয়া বৃথা পণ্ডশ্রম করিয়াছেন।

(৫) খেলাফত ও মুলুকিয়াত কেতাবের ১৬৩ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন ঃ—

اس دور کی تغیرات میں سے ایک اور اہم تغیر یہ تھا کہ مسلمانوں سے امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی ازادی سلب کرلیگئی......

অর্থাৎ "এই জমানার (তথা হযরত মোয়াবিয়ার শাসন আমলের) পরিবর্তনের মধ্যে বড় একটা পরিবর্তন এই ছিল যে হযরত মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর দ্বারা মোসলমানদের থেকে আম্‌রে-বিল-মা'রূফ, নাহী-আনেল-মোনকার করার অর্থাৎ হক কথা বলার বাক স্বাধীনতা ছিনাইয়া লওয়া হইয়াছিল। অর্থাৎ হযরত মোয়াবিয়া মোসলমানদের হক কথা বলার স্বাধীনতাকে হরণ করিয়া লইয়া ছিলেন।" মৌদুদী সাহেবের এই দাবীটির কোনই ভিত্তি নাই। কেবলমাত্র আপন সন্দেহযুক্ত কল্পনার উপর ভিত্তি করিয়াই তিনি এত বড় কু-উক্তি করিতে সাহস করিয়াছেন। তাঁহার এই কু-ধারণার স্বপক্ষে তিনি কোনই বিশ্বস্ত দলিল পেশ করিতে পারিবেন না। পক্ষান্তরে হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) যে, আম্‌রে-বিল-মা'রূফ, নাহী-আনেল-মোন্‌কারের নীতি জেন্দা রাখাকে বড় ফরজ মনে করিতেন এবং মনে প্রাণে ভাল বাসিতেন ইহার প্রমাণ হযরত মোয়াবিয়ার জীবনে ভুরি ভুরি রহিয়াছে। তন্মধ্য হইতে নমূনাস্বরূপ পাঠকদের খেদমতে আমরা মাত্র একটি ঘটনা পেশ করিতেছি। ইহা পাঠ করিলেই সুধীপাঠক জানিতে পারিবেন যে, মোয়াবিয়া (রাঃ) সৎ-কাজে আদেশ এবং অসৎকাজে নিষেধ করাকে কত বড় উচ্চ মর্য্যাদার ফরজ মনে করিতেন। ঘটনাটি বিখ্যাত মোহাদ্দেস ইবনে হাজর হায়ছমি মাক্কী তাঁহার মশহুর تطہیر الجنان واللسان কেতাবের ২৭-২৮ পৃষ্ঠায় নিম্নরূপ উল্লেখ করিয়াছেন (যাহা পূর্ব্বেও এক স্থানে বর্ণিত হইয়াছে) ঃ

وانہ (معاویہ) خطب یوم الجمعۃ وقال انما المال مالنا والفئ فیئنا فمن شئنا منعناہ فلم یجبہ احد (الی آخر القصۃ) -

অর্থাৎ হযরত মোয়াবিয়া দামেস্কের শাহী মসজিদে একদিন জুমুয়ার খোৎবায় জলদ গম্ভীরস্বরে ঘোষনা দিলেন যে, রাষ্ট্রের বায়তুল-মালের সমস্ত সম্পত্তি আমার ; ইহাতে অন্য কাহারও কোন অধিকার নাই ; আমি যাহাকে ইচ্ছা হয় দিব, আর যাহাকে ইচ্ছা হয় না দিব—আমার এই অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করিবার কাহারও কোন হক নাই। খলীফার এই কথার কেহই কোন প্রতিবাদ করিল না। দ্বিতীয় জুমুয়ায়ও তিনি এই ঘোষনা করিলেন, কিন্তু কেহ প্রতিবাদ করিল না। অতঃপর তৃতীয় জুমুয়ায় যখন তিনি উক্তরূপ ঘোষনা করিলেন তখন একটি লোক দাঁড়াইয়া খলীফাকে লক্ষ্য করিয়া দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষনা দিলেন যে, দেখুন! "এই রাষ্ট্রের বায়তুল-মালে আপনার ব্যক্তিগত কোনই অধিকার নাই। ইহার একমাত্র মালিকানা অধিকার

আমাদের জন-সাধারনের ; আমাদের এই অধিকারে কেহ হস্তক্ষেপ করিতে চাহিলে আল্লাহ প্রদত্ত বিধান মতে তলওয়ারের দ্বারাই ইহার চূড়ান্ত ফয়ছালা করিব।”

এই কথা শুনিবার পর হযরত মোয়াবিয়া স্বাভাবিক ভাবে খোৎবা, নামাজ শেষ করিয়া গৃহে গমন করিয়া ঐ ব্যক্তিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তখন সমস্ত লোকেরা বলাবলি করিতে লাগিল যে, ইহার আজ আর রক্ষা নাই। অতঃপর লোকেরা খলীফার গৃহে গমন করিয়া দেখিল যে, সেই ব্যক্তি স্বয়ং খলীফার সহিত একই আসনে বসিয়া আছে। হযরত মোয়াবিয়া ঐ ব্যক্তির দিকে ইশারা করিয়া উপস্থিত জনগণকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন—দেখ, এই ব্যক্তিই আমাকে বাঁচাইয়াছে, রক্ষা করিয়াছে। আমি আল্লার কাছে দোয়া করি—আল্লাহ তায়ালা তাহাকে বাঁছাইয়া রাখুন। কেননা, আমি হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, ‘তিনি বলিয়াছেন, আমার পরে এমন একদল শাসনকর্তা হইবে যাহাদের অন্যায় কথার প্রতিবাদ করিতে কেহই সাহস পাইবে না। এইরূপ শাসনকর্তারা এমনভাবে দোজখে প্রবিষ্ট হইবে যেমন করিয়া বানরের পাল একের পিছনে এক সারিবদ্ধ ভাবে একদিকে ধাবিত হয়।” ইহার পরীক্ষার জন্যই আমি প্রথম জুমুয়ায় একটি ঘোষনা দিয়াছিলাম, কিন্তু কেহই ইহার প্রতিবাদ করে নাই; ইহাতে আমি ভীত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, হয়ত আমি সেই দলভুক্ত হইয়া পড়িয়াছি। অতঃপর দ্বিতীয় জুমুয়ায় ঐ একই ঘোষনা দিলাম ; তখনও কেহই ইহার প্রতিবাদ করিল না, আমি তখন মনে করিলাম—হায়! নিশ্চয়ই আমি সেই দলভুক্ত হইয়া পড়িয়াছি। ইহার পর আবার যখন আমি ঐ ঘোষণা দিলাম তখন এই ব্যক্তি দাঁড়াইয়া গেল এবং আমার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া প্রতিবাদ করিয়া আমাকে রক্ষা করিল আমাকে বাঁচাইল। সুতরাং আমি আল্লার কাছে দোয়া করি আল্লাহ যেন তাঁহাকে দীর্ঘায়ু দান করেন!

সুধী পাঠক! হযরত মোয়াবিয়ার ন্যায়-নিষ্ঠতা খওফে-খোদা (অন্তরে খোদার ভয়) হুজুরের (দঃ) কথার প্রতি মর্য্যাদা দান ও আমর্‌বেল-মা'রুফ, নাহী-আনেল-মোনকারের জন্য উৎসর্গকৃত প্রাণের পরিচয় তো দেখিলেন ; এখন আপনারাই বিচার করিয়া বলুন আমাদের মৌদুদী সাহেবের খেয়ালী পোলাউ পাকাইবার কি ফযিলত থাকিতে পারে। তাঁহাকে আমরা একজন ভাল লোক বলিয়াই মনে করিতাম, কিন্তু তিনি ছাহাবায়ে-কেরামের প্রতি এইরূপ ভিত্তিহীন অবাস্তব শত্রুর শিখান মিথ্যা কথার পুনারাবৃত্তি করিয়া সমাজকে গান্দা করিবার অপচেষ্টায় মিছামিছি অবতীর্ণ হইবেন এ কথা পূর্বে আমরা ধারণাও করি নাই।

● কোন কোন ঘটনা এরূপ ছিল যাহা বাহ্যিক দৃষ্টিতে মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর উপর প্রশ্নের কারণ হইতে পারিত। আমাদের সৌভাগ্য ছিল

যে, ছাহাবীগণের মধ্য হইতেই বড় বড় মুরব্বিগণের দ্বারা মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সম্মুখে ঐ সব প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে। এবং মোয়াবিয়া (রাঃ) প্রশ্নের এমন সন্তুষ্টজনক উত্তর দিয়াছেন যাহাতে মুরব্বি ছাহাবীগণ পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট এবং শান্ত ও ক্ষান্ত হইয়া গিয়াছেন। সেই সব প্রশ্নোত্তর ইতিহাসে বর্ণিত আছে।

মৌদুদী সাহেব ঐ সৌভাগ্যের স্থলে দুর্ভাগ্য টানিয়া আনিয়াছেন। তিনি মোয়াবিয়া রাজিরাল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রতি দোষারোপের বোঝা ভারি করিবার উদ্দেশ্যে এমন কাজ করিয়াছেন যাহা কোন দুঃসাহাসী জালিয়াত ব্যক্তিই করিতে পারে। তিনি জঘন্য ও বিবৎস মন্তব্যের সহিত ঐ শ্রেণীর প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া মোয়াবিয়া (রাঃ)কে ভীষণভাবে আক্রমণ করিয়াছেন। অথচ ঐরূপ প্রশ্নের উত্তর স্বয়ং মোয়াবিয়া (রাঃ) প্রদান করিয়া ছিলেন, যেই উত্তরে বিশ্ববরণীয় মুরব্বি ছাহাবীগণ সন্তুষ্ট এবং শান্ত ও ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। ইতিহাস গ্রন্থাবলীতে ঐ সব উত্তর বিদ্যমান থাকা সত্তেও মৌদুদী সাহেব উহার প্রতি নিজেও ভ্রুক্ষেপ করেন নাই, সমাজকেও উহার কোন খোঁজ দেন নাই।

মাওলানা শামছুল হক (রঃ) দৃষ্টান্ত স্বরূপ ঐ শ্রেণীর দুইটি বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। একটি মোয়াবিয়া (রাঃ) কর্ত্তৃক রাজকীয় শান-সওকৎ বা জাক-জমক পূর্ণ জীবন অবলম্বন। মৌদুদী সাহেব ইহাকে সম্বল করিয়া মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রতি জঘন্য কটাক্ষপাত করিয়াছেন। আর একটি হইল—"হোজ্‌র ইবনে আদী" নামক এক ব্যক্তির প্রাণদণ্ড দান। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া ত মৌদুদী সাহেব আকাশ ভাঙ্গিয়া মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মস্তকে ছুড়িয়াছেন।

মোয়াবিয়া (রাঃ)এর প্রতি জাক-জমকপূর্ণ জীবন-যাপনের অভিযোগ এবং তাহার জবাব

নিম্নের ঘটনাটি হযরত ওমর ইবনে খাত্তাবের খেলাফতের ও তানার অধিনে হযরত মোয়াবিয়ার গভর্ণরীর জামানায় সংঘটিত হইয়াছিল। একবার হযরত ওমর (রাঃ) বিভিন্ন দেশের গভর্ণরদের কার্য্যাবলী তদন্ত করিতে শামদেশে গিয়া উপস্থিত হন। তখন হযরত ওমরের (রাঃ) নিকট কেহ কেহ এই অভিযোগ করিল যে "হযরত মোয়াবিয়া দরবারে জাক-জমকপূর্ণ পোষাক পরিধান করিয়া আসেন এবং দরজায় দারোয়ান রাখেন, যে কারণে জন-সাধরণের দরবারে পৌঁছিতে বাঁধার সৃষ্টি হয়।" এই অভিযোগ পাইয়া হযরত ওমর (রাঃ) অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া কোড়া হাতে লইয়া হযরত মোয়াবিয়ার নিকট কৈফিয়ৎ তলব করিলেন এবং বলিলেন, তোমাকে পায়ে হাটিয়া মদীনা যাওয়ার শাস্তি দেওয়া দরকার। কৈফিয়তে হযরত মোয়াবিয়া যাহা বলিলেন তাহাতে খলীফার গোসা শুধু

প্রশমিতই হইল না অধিকন্তু তিনি হযরত মোয়াবিয়া সম্পর্কে এমন তারিফ করিলেন যাহাতে হযরত মোয়াবিয়ার শত্রুদের মুখে চুন-কালিই মাখিয়া গেল।

মোয়াবিয়া (রাঃ) এবং ওমর (রাঃ)-এর মধ্যকার প্রশ্ন-উত্তর নিম্নরূপ হইয়াছিল।

لما قدم عمر بن الخطاب الشام تلقاه معاوية في موكب عظيم فلما دنا من عمر قال له انت صاحب الموكب قال نعم يا امير المؤمنين قال هذا حالك مع ما بلغني من طول وقوف ذوي الحاجات ببابك؟ قال هو ما بلغك من ذالك - قال ولم تفعل هذا؟ قد هممت ان آمرك بالمشي حافيا الى بلاد الحجاز قال يا امير المؤمنين انا بأرض جواسيس العدو فيها كثيرة فيجب ان يظهر من عز السلطان ما يكون فيه عز الاسلام واهله ويرهبهم به - فان امرتني فعلت وان نهيتني انتهيت...... فقال عمر لحسن مورده ومصادره جشمناه ما جشمناه (بداية نهاية ج ٨ ص ١٢٤) وفي قصة اخرى فقال عمر (في حق معاوية) والله ما رأيت الا خيرا وما بلغني الا الخير - بداية ج ٨ ص ١٢٠

অর্থাৎ—"খলীফা হযরত ওমর হযরত মোয়াবিয়াকে জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন, হে মোয়াবিয়া! তুমি এত শান-শওকতের সঙ্গে থাক এবং দরজায় দারোয়ান রাখ অথচ জরুরতমন্দ লোকেরা আসিয়া তোমার দরজায় দাঁড়াইয়া থাকে; দারোয়ানের কারণে সহজে তোমার দরবারে পৌঁছাইতে পারে না। ইহা হইলে আমার মতে তোমাকে এই শাস্তি দেওয়া দরকার যে, তোমাকে পায়ে হাটিয়া দামেস্ক হইতে মদিনা যাইতে হইবে। অগ্নিপুরুষ আমিরুল মো'মেনীন হযরত ওমরের এইরূপ প্রশ্ন শুনিয়া হযরত মোয়াবিয়া নির্ভয়ে গম্ভীরভাবে বলিলেন—হে আমিরুল-মো'মেনীন! আমি এমন দেশে এমন শহরে অবস্থান করিতেছি যেখানে শত্রুদের অর্থাৎ রোম সম্রাটের পক্ষ হইতে অনেক গুপ্তচর থাকে। এই জন্য আমি মনে করি যে, গভর্ণরের এমনভাবে থাকা উচিৎ যাহাতে ইসলাম এবং মোসলেম জাতির শান-শওকত প্রকাশ পাইয়া শত্রুদের মনে ভীতির সঞ্চার হইতে থাকে।

আমি আমার ব্যক্তিগত শানের জন্য নয়, ইসলামের জন্যই এইরূপ করি। এখন আপনি যদি অনুমতি দেন তবে করিব, অন্যথায় করিব না। মোয়াবিয়ার উত্তর শুনিয়া দরবারে উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ খলীফাকে বলিলেন—ইয়া আমিরুল মো'মেনীন! যুবকটি কত সুন্দর উত্তর দিয়াছে। ওমর (রাঃ) বলিলেন, তাহার কর্ম ও চিন্তা-ধারার সৌন্দর্য্যপূর্ণ দুরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার কারণেই আমি এতবড় গুরুদায়িত্বের বোঝা তাহার স্কন্ধে চাপাইয়াছি।"

হযরত মোয়াবিয়ার (রাঃ) শাসনকালে তিনি এমন একটা বিশেষ বিভাগ খোলেন যে বিভাগের একমাত্র কাজ ছিল রাজ্যের মধ্যে যেখানে যত হাজতমন্দ অভাবী লোক আছে তাহাদেরকে খলীফার দরবারে হাজির করিয়া দেওয়া ; যাহাতে স্বয়ং খলীফা সকলের অভাবকে দুর করিয়া দিতে পারেন এবং অভাবে বা বিনা বিচারে কেহ থাকিয়া না যায়। البداية والنهاية ج ٨ ص ١٢٧।

হযরত মোয়াবিয়ার (রাঃ) এই সব নীতিগুণ ও তাকওয়ার ফলে মরোক্কো হইতে কাবুল পর্য্যন্ত তিনটি মহাদেশব্যাপী বিশাল দেশে পূর্ণ ইসলামী নেজামের আইন শৃঙ্খলা জারী হইয়াছিল। এবং তিনি বহিঃশত্রু হইতে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে প্রজাদের উপর পূর্ণ পিতৃ বাৎসল্য, উদারতা, বদান্যতা প্রদর্শন করিয়া এমন খেলাফত কায়েম করিয়াছিলেন যে, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বহু দেশ জয় হওয়ার সাথে সাথে দেশের ভিতর এমন শান্তি এবং শৃঙ্খলা কায়েম হইয়াছিল যাহার নমুনা জগতের বুকে পরবর্তীকালে দ্বিতীয়বার আর দেখা যায় নাই। এবং হযরত মোয়াবিয়ার যুগে কোথাও এমন একটা নমুনাও কেহ দেখাইতে পারে নাই যে, একটি প্রজার উপর কোথাও কোন অবিচার অত্যাচার হইয়াছে বা কোথাও একটি নাগরিকেরও অন্নবস্ত্রের বা গৃহের অভাবে সামান্য কষ্টভোগ করিতে হইয়াছে। সংকীর্ণমনা কুসংস্কারাচ্ছন্ন শিয়া ঐতিহাসিক জাষ্টিস আমীর আলীও হযরত মোয়াবিয়ার এইসব মহৎ গুণাবলী বলিতে বাধ্য হইয়াছেন।

On the whole Mabia's rule waes prosperous and peaceful at home and saccessfull abroad. (History of sarasean page 82)

এতবড় ব্যক্তিত্বের এবং মহৎগুণাবলীর অধিকারী যে মহাত্মা, যাঁহার সম্পর্কে হযরত ওমরের (রাঃ) মত সিংহ পুরুষ পর্য্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন এবং হযরত আবহুল্লা ইবনে আব্বাস, হযরত ওমায়ের ইবনে ছায়াদ আনছারীর মত মানুষ বিরুদ্ধপার্টির লোক হওয়া সত্ত্বেও কোনরূপ বিরূপ মন্তব্য তো করেনই নাই অধিকন্তু প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছেন। এমনকি উমাইয়া বংশ তথা হযরত মোয়াবিয়ার বংশের প্রাণঘাতী শত্রুপক্ষ প্রবল প্রতাবান্বিত আব্বাসিয়া খলীফাদের জামানায়ও রাজধানী শহরের প্রত্যেক মসজিদেই লিখিত ছিল—خير الناس بعد علي معاوية
হযরত আলীর (রাঃ) পরে পৃথিবীর মধ্যে সর্বগুণে গুণান্বিত শ্রেষ্ঠগুণশালী শাসনকর্তা হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ)। এমন মহামানবের গীবৎ করার Back biting করার মত দুঃসাহস মৌহুদী সাহেব কিভাবে করিলেন, এটা তিনিই ভাল জানেন।

বিশ্বের জ্ঞানী-গুণীদের মাথা যাহার সামনে নত ; শ্রদ্ধেয় মৌহুদী সাহেব তাঁহার মত পবিত্রাত্মার বিরুদ্ধে বিষোদগার করিয়া আপন অন্তরের বিষকেই প্রকাশ করিয়া দেখাইয়াছেন ; আপন পলিদ কল্পনা জগতের সামনে প্রকাশ করিয়া জাতির

গলায় কলঙ্কের মালা পরাইতে অপচেষ্টা করিয়াছেন। হযরত মোয়াবিয়ার নিষ্কলুষতার উপর কালিমা লেপন করিতে গিয়া আপন চেহরাকেই মৌদুদী সাহেব কালিমাময় করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি যদি ছাহাবায়ে-কেরামের দোষ খোঁজার মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে জ্ঞাত হইতেন, ছাহাবায়ে-কেরামের দরজার গুরুত্ব যদি বুঝিতেন, ছাহাবায়ে-কেরামের মর্তবার শান যদি মৌদুদী সাহেবের হৃদয়ে জাগ্রত থাকিত তবে কিছুতেই এইরূপ জঘন্য কাজ তাঁহার কলমের দ্বারা প্রকাশ পাইত না!

হোজ্‌র্ ইবনে আদীর কতলের ঘটনা

ইমাম বোখারী প্রমুখ ইমামগণের মতে হোজ্‌র ইবনে আদী ছাহাবী ছিলেন না। যদিও মোহাম্মদ ইবনে ছা'দ, ইবনে আবদুল বার প্রমুখ ইমামগণের মতে তিনি একজন ছাহাবী ছিলেন। তাঁহার প্রাণদণ্ডের প্রশ্ন অনেক পুরাতন প্রশ্ন। উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা ছিদ্দীকার (রাঃ) সঙ্গে হযরত মোয়াবিয়া যখন সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন (পর্দার সহিত কথা বলিয়াছেন।) তখন যেহেতু জামানা ছিল সৎ সাহসের এবং আম্‌রেবেল-মারূ'ফ এবং নাহী-আনেল-মোনকারের; কাজেই মা আয়েশা হযরত মোয়াবিয়াকে সর্ব্বপ্রথম এই প্রশ্ন করিয়াছেন—"মোয়াবিয়া তুমি হোজ্‌র্ ইবনে আদীর কতলের কি জবাব দিবা? উত্তরে মোয়াবিয়া বলিয়াছেন, মা! "আমাদের উভয়েরই আল্লার দরবারে হাজির হইতে হইবে। আল্লার দরবারেই এই প্রশ্নের সুষ্ঠু মীমাংসা হইবে। অতএব আপনি আমাকে এবং হোজ্‌র্ ইবনে আদীকে আল্লার দরবারে মীমাংসার জন্য ছাড়িয়া দিন।"

যে কোন খোদা-ভীরু মোমেনের জন্য এর চেয়ে দায়িত্বপূর্ণ কথা আর কি হইতে পারে? এই জন্য মা আয়েশার প্রশ্নের জবাবে হযরত মোয়াবিয়া এই কথাকেই যথেষ্ট মনে করিয়াছেন এবং মা আয়েশাও এই জবাবটি হযরত মোয়াবিয়ার ন্যায়-নিষ্ঠতার জন্য যথেষ্ট মনে করিয়াছেন। হযরত মোয়াবিয়া আরও বলিয়াছেন—

إنما قتلته الذين شهدوا عليه - (البداية والنهاية ج ٨ ص ٥٣)

অর্থাৎ—তাহার বিরুদ্ধে বাগাওয়াতের এত পরিমাণ সত্য সাক্ষ্য পাওয়া গিয়াছে যে, আমি তাহাকে শরীয়তের আইন অনুসারে কতল করিতে বাধ্য হইয়াছি। আমি এ কথার প্রচুর পরিমাণে সাক্ষ্য পাইয়াছি যে, তাহাকে কেন্দ্র করিয়া ছাবায়ী, খারেজী, রাফেজী ফেৎনা ইরাকে শক্তিশালী হইতেছিল। এমনকি ইহারও প্রমাণ আছে যে, হযরত হাছান (রাঃ) হযরত মোয়াবিয়াকে খেলাফত সোপর্দ করিয়া দেওয়ায় হোজ্‌র্ ইবনে আদী তাঁহাকে (হাছানকে) লা'ন তা'ন করিয়াছে।

قتل واحد خير من قتل مائة الف (بداية نهاية ج ٨ ص ٥٤)

অর্থাৎ—এখন হয়ত একজনকে কতল করিলেই দেশের মধ্যে ফেৎনা-ফাসাদ দূর হইয়া পূর্ণ শান্তি ফিরিয়া আসিবে, নতুবা এই একজনকে কতল না করিলে

পরে লক্ষ লক্ষ জনকে কতল করিলেও দেশে পূর্ণ শান্তি ফিরাইয়া আনা যাইবে না। এই জন্যই হোজ্‌র্‌ ইবনে আদীর কতল সংঘটিত হইয়াছে।

হোজর ইবনে আদীকে কতল করিয়া ফেৎনার মূলোচ্ছেদ করা না হইলে কত লোক এই ফেৎনায় জড়িত হইয়া পড়িত এবং সে জন্য কত লোক যুদ্ধে নিহত হইত তাহার ইয়াত্তা কে করিবে ? এ কথাটাকেই হযরত মোয়াবিয়া সংক্ষেপে বলিয়াছেন—

قتله احب الى من ان اقتل معه مائة الف* (بداية نهاية ج ٨ ص ٥٤)

روى احمد بن حنبل.... يا ام المؤمنين - انى وجدت قتل رجل فى صلاح الناس خير من استحياءه فى فسادهم+ (بداية ج ٨ ص ٥٥)

এই জন্যই মা আয়েশা হযরত মোয়াবিয়াকে আর কোন প্রশ্ন করেন নাই। প্রশ্নটি যেহেতু মা আয়েশার সম্মুখে শেষ হইয়া গিয়াছিল সুতরাং মৌদুদী সাহেব এই প্রশ্নটি না তুলিলেও পারিতেন। তিনি একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিতেন যে, ইহা কোরআন-হাদীছের আদৌ-বিরোধী হয় নাই বা ইহার দ্বারা হযরত মোয়াবিয়ার উপর আদৌ কোন দোষ আরোপ করা যায় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় মৌদুদী সাহেব যেহেতু ছাহাবাগণের দোষচর্চ্চা এবং দোষ-চিন্তায় অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, সেই জন্য তিনি হোজ্‌র্‌ ইবনে আদীর পুরাতন প্রশ্ন যাহা শেষ হইয়া গিয়াছে তাহার সহিত আরও কতিপয় সম্পূর্ণ মিথ্যা ভীত্তিক বিষয় জুড়িয়া দিয়াছেন।

মৌদুদী সাহেব বলিয়াছেন যে, জল্লাদ হোজ্‌র ইবনে আদী এবং তাহার সাথীদিগকে কতল করার পূর্বে হযরত মোয়াবিয়ার পক্ষ হইতে না কি এই কথা বলা হইয়াছিল যে, "তোমরা যদি হযরত আলীকে গালী দিতে স্বীকার কর তবে তোমাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে"। এই কথা একেবারেই জাল এবং ইহা ধোকাবাজ মিথ্যাবাদী শিয়া আবু মেখনাফ লুত ইবনে ইয়াহিয়ার মিথ্যা কল্পিত জাল বর্ণনা যাহাকে সম্বল করিয়া মৌদুদী সাহেব এই উদ্‌ভট উক্তি করিয়াছেন। এমন কথার কোনই ভিত্তি নাই। ইহা শুধু মিথ্যাবাদী শিয়া রাফেজীদের কারখানারই পচা গুদামজাত দুর্গন্ধময় মালের নমুনা মাত্র। মৌদুদী সাহেব কিভাবে এমন জালিয়াতদের মিথ্যা কথার তাহ্‌কিক না করিয়া ইহাকে একজন ছাহাবীর বিরুদ্ধে দলিল হিসাবে পেশ করিতে সাহস করিলেন ইহা আমাদের কল্পনার বাহিরে।

---

* অর্থাৎ এক হোজর ইবনে আদীকে প্রাণদণ্ড দিয়া লক্ষ লক্ষ লোক হত্যা করাকে এড়াইয়া যাওয়া আমার নিকট শ্রেয় মনে হইয়াছে।

\+ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বর্ণনা করিয়াছেন—মোয়াবিয়া (রাঃ) আয়েশা (রাঃ)কে ইহাও বলিয়াছিলেন, হে উম্মুল-মোমেনীন ! একজনকে প্রাণদণ্ড দিয়া সকল মানুষের মঙ্গল সাধন করা উত্তম—ঐ একজনকে বাঁচাইয়া রাখিয়া সকলের অমঙ্গল করা অপেক্ষা।

মৌহুদী সাহেব আরও ভিত্তিহীন কথা এই বলিয়াছেন যে, "হযরত মোয়াবিয়ার (রাঃ) উপর হযরত হাছান বছরী চারিটি দোষ আরোপ করিয়াছেন"। এটা নিশ্চয়ই হাছান বছরী মৌহুদী সাহেবের কানে কানে বলিয়া যান নাই! নিশ্চয়ই তিনি কোন মাধ্যম সূত্রে এ কথাটা পাইয়াছেন।

এখন কথা হইল এই যে, সেই মাধ্যম সম্পর্কে মৌহুদী সাহেব একবারও কি ভাবিয়া দেখিয়াছেন যে, আমি কাহার বা কাহাদের বর্ণনা চোখ বুজিয়া দলিল হিসাবে গ্রহণ করিতেছি? বা ইহাও কি মৌহুদী সাহেবের ভাবিয়া দেখা উচিত ছিল না যে, এই বর্ণনাটি যদি মিথ্যাবাদী শিয়া রাফেজীদের জাল বর্ণনা হয় তবে ইহার পরিনাম কত সাংঘাতিক হইবে? অথবা ইহাও কি মৌহুদী সাহেবের একবার চিন্তা করিয়া দেখা উচিত ছিল না যে, এই মিথ্যার দ্বারা মিথ্যামিথ্যি রসুলুল্লার পবিত্রাত্মা ছাহাবীদের প্রতি কলঙ্ক লেপন করিলে আল্লার দরবারে কি জবাব দেওয়া যাইবে? রসুলুল্লার পবিত্রাত্মা সাথীদের উপর কলঙ্ক লেপন করিতে গিয়া মৌহুদী সাহেব যে মিথ্যার ডিপো সংগ্রহে লাগিয়াছেন ইহার দ্বারা তিনি নিজেকেই কলঙ্কিত করিয়াছেন।

এখন শুনুন, যে মিথ্যাবাদীর বর্ণনা কুড়াইয়া মৌহুদী সাহেব আপন ভাণ্ডারকে অপবিত্র করিয়াছেন, সে হইল একজন কাট্টা মিথ্যাবাদী শিয়া আবু মেখনাফ লুৎ ইবনে ইয়াহিয়া; যাহা সমস্ত বিশ্বস্ত আছমাউর-রেজালের কিতাবে স্পষ্টভাবে লেখা রহিয়াছে। যাদের ভিতরে বিন্দুমাত্র খোদাভীতি আছে তাহারা কিছুতেই এত বড় একটা মিথ্যুকের কথার উপর নির্ভর করিয়া তাহার মিথ্যা কথাকে না হযরত হাছান বছরির মুখে তুলিয়া দিতে পারে; না হযরত হাছান বছরির দ্বারা হযরত মোয়াবিয়ার উপর কথাটা মিথ্যামিথ্যি লাগাইবার দুঃসাহস করিতে পারে।

সন্দেহ ভঞ্জন

মৌহুদী সাহেব সম্পর্কে মাওলানা শামছুল হক (রঃ) হইতে যে সব উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হইল উহা তাঁহার সঙ্কলন "ভুল সংশোধন" নামক পুস্তিকা হইতে গৃহিত।

উক্ত পুস্তিকা মৌহুদী সাহেবের মুখোশ খুলিয়া দিতে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে, তাই মৌহুদীভক্তগণ ভীষণ ব্যতিব্যস্ত ও বিব্রত। উহার আঘাত হইতে প্রাণ বাঁচাইবার এক অভিনব পন্থা তাহারা আবিষ্কার করিয়াছে।

পাপের বোঝা—কুখ্যাত "খেলাফৎ ও মুলুকিয়ৎ" প্রবন্ধ হইতে তওবা-এস্তেগফার মৌহুদী সাহেব দ্বারা যদি তাহারা আদায় করিতে পারিত তবে তাহারা অভিশাপ হইতে সহজেই মুক্তি পাইত। কিন্তু তাহারা উহা না করিয়া উল্টা "ভুল সংশোধন" পুস্তিকাকে অস্বীকার করিতে প্রয়াস পায়। "ভুল সংশোধন" পুস্তিকার অকাট্য দলীল প্রমাণের একটি অক্ষরও খণ্ডনের ক্ষমতা তাহাদের হয় নাই। তবে তাহাদের কোন কোন ক্ষুদে

নেতা উক্ত পুস্তিকা মাওলানা শামছুল হক (রঃ)-এর সঙ্কলন হওয়াকে অস্বীকার করে। তাহাদের এই অভিনব পন্থাবলম্বন দৃষ্টে একটি গল্প মনে পড়ে এবং হাসি আসে।

এক ব্যক্তি আরবী ভাষায় পাণ্ডিত্বের দাবী করিত। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল— "নিতম্ব" বা পাছার আরবী কী? উত্তরে নিতম্বের আরবী বলিতে অক্ষম হওয়ায় সে মুখ বাঁচাইবার জন্য বলিয়া উঠিল—আরবদেশে মানুষের নিতম্ব হয় না, তাই উহার আরবী শব্দ নাই। মৌদুদীভক্তরা এই ক্ষেত্রে মুখ বাঁচাইবার সেই কৌশলই অবলম্বন করে।

বাংলাদেশে ইসলামী জ্ঞান-গবেষণা ও আলেম সম্প্রদায়ের দুইটি অন্যতম কেন্দ্র মাওলানা শামছুল হক রহমতুল্লাহে আলাইহের কর্ম্মস্থল ছিল। (১) ঢাকা, জামেয়া কোরআনিয়া—লালবাগ মাদ্রাসা এবং (২) ফরিদপুর—গওহার ডাঙ্গা, দারুল উলুম—খাদেমুল ইসলাম মাদ্রাসা। মাওলানা শামছুল হক (রঃ) "ভুল সংশোধন" পুস্তিকা সঙ্কলনে সুদীর্ঘ গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য আলেম-ওলামার সাথে আলোচনা করিয়া থাকিতেন। সুতরাং তাঁহার এই সঙ্কলন সম্পর্কে শত শত আলেম সাক্ষী রহিয়াছেন।

নিম্নে আমরা শুধু মাওলানা শামছুল হক রহমতুল্লাহে আলাইহের সর্ব্বদার কর্ম্মস্থল দুইটি কেন্দ্রীয় মাদ্রাসার সর্ব্ববরণীয় বিশিষ্ট সাতজন বুজুর্গ আলেমের সাক্ষ্য প্রকাশ করিয়া দিলাম। মৌদুদীভক্ত নেতা বা তেনারা যাহাই বলুক, কিন্তু মোসলমানগণ উক্ত সাক্ষ্যে ইনশা-আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই আশ্বস্ত হইবেন। সাক্ষ্যের অবিকল প্রতিলিপি এই—

মৌদুদী সাহেব সঙ্কলিত "খেলাফৎ ও মুলুকিয়ৎ" নামীয় পুস্তিকার বিরুদ্ধে মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রঃ) একখানা পুস্তিকা সঙ্কলন করিয়াছিলেন—যাহা "ভুল সংশোধন" নামে প্রকাশিত হইয়াছে।

আমরা জানি—এই পুস্তিকা হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী রহমতুল্লাহে আলাইহেরই সঙ্কলিত ও রচিত। স্বাক্ষর—

(১) মুহাম্মদ উল্লাহ (হযরত হাফেজজী হুজুর—খলীফা হযরত থানবী (রঃ), ঢাকা)
(২) হেদায়েতুল্লাহ (প্রিন্সিপাল ও মোহাদ্দেছ জামেয়া কোরআনিয়া, লালবাগ—ঐ
(৩) আবদুল মোয়েজ (খতীব বাইতুল মোকার্‌রাম—মুফতী ও মোহাদ্দেছ লালবাগ মাদ্রাসা, ঢাকা)
(৪) আবদুল মজীদ ঢাকুবী (মোহাদ্দেছ লালবাগ মাদ্রাসা, ঢাকা)
(৫) আবদুল আজিজ (মোহতামেম সাহেব—গওহর ডাঙ্গা মাদ্রাসা, ফরিদপুর)
(৬) আবদুল মান্নান (শায়খুল-হাদীছ গওহর ডাঙ্গা মাদ্রাসা, ফরিদপুর)
(৭) আবদুল মোক্‌তাদের (মোহাদ্দেছ গওহর ডাঙ্গা মাদ্রাসা, ফরিদপুর)

১৯৭৮ ইং মার্চ্চ মাসে মুদ্রিত—যখন সমস্ত সাক্ষীগণ জীবিত রহিয়াছেন এবং সাক্ষ্যের মূল লিপি ও দস্তখত আমাদের নিকট সুরক্ষিত আছে।